প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

হিমালয়ের একটি অঞ্চল

নিকোলাস রোয়েরিক

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ
১ম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৫৫ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নব বর্ষ

বিষম ঝড়ঝঞ্ঝাটে যখন সমস্ত ভারত আচ্ছন্ন সেই সময়ে আসিয়াছিল ১৩৫৪। পঞ্জাবে ও পূর্ব্ববঙ্গে তখন সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের আগুন জ্বলিয়াছে, বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি কোথাও বাড়িতেছে, কোথাও বা তাহাকে সংযত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কলিকাতায় তখন চতুর্দ্দিকে গুণ্ডারাজের এবং সুহ্ রাবর্দ্দি মন্ত্রীসভা-আনীত পাঠান পুলিসের অত্যাচার ও অনাচারের স্রোত বহিতেছে এবং তাহারই প্রবল প্রতিক্রিয়ায় বাঙালীর যুবশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে সশস্ত্র অভিযান চালাইতেছে। সমস্ত দেশের অবসন্ন মনপ্রাণ তখন শুধুমাত্র স্বাধীনতা লাভের আশায় উৎসুক হইয়া আছে। বাহিরের জগতে এক মহাযুদ্ধের চিতার আগুন নিবিবার পূর্ব্বেই আর এক মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাভাসস্বরূপে শক্তিপুঞ্জ দুই ভাগে বিভক্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

বর্ষারম্ভ হইবার কিছুদিন পরেই ভারতের আকাশে স্বাধীনতার আলো দেখা দিল। কিন্তু লোকের মন দেশ বিভাগ ও আত্মীয়বিচ্ছেদজনিত বিষাদে আচ্ছন্ন হওয়ায় আনন্দের স্রোত বহিয়াও বহিল না। তাহার পর পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জ্বলিয়া উঠিল সাম্প্রদায়িক হিংসার দাবানল যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের ধনমনপ্রাণ জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইল। এক কোটির উপর লোক বাস্তুছাড়া, গৃহহারা হইয়া দলে দলে আশ্রয়ের আশায় চলিল পূর্ব্ব বা পশ্চিম মুখে। দাবানলের আগুন দিল্লীতে ও যুক্তপ্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল কিন্তু মহাত্মাজীর প্রয়াসের ফলে এবং ঐ অঞ্চলের প্রকৃত কংগ্রেসকর্ম্মীদের চেষ্টায় তাহা নিবিয়া গেল। অন্য দিকে কংগ্রেসের শান্তির চেষ্টা ও প্রতিহিংসা নিরোধের জন্য হিন্দুর উপর অত্যাচারের সংবাদদানের অনিচ্ছাকে দুর্ব্বলতা ভাবিয়া পাকিস্থানের উচ্চতম অধিকারীবর্গ ছলেবলে কাশ্মীর অধিকার করার জন্য অযুত সংখ্যায় পাঠান উপজাতি ও পঞ্জাবী প্রাক্তন সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া পাঠাইলেন সেখানে লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের অভিযান চালাইতে। ভারত-রাষ্ট্র বিষম বাধাবিঘ্নের মধ্যে কাশ্মীর রক্ষার জন্য সৈন্য ও বিমানবাহিনী পাঠাইতে বাধ্য হইল, আরম্ভ হইল বিনা ঘোষণায় কাশ্মীরের যুদ্ধ। ঘরের যুদ্ধ এইরূপে আরম্ভ হইল এবং বাহিরেও যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে থাকিল। সারা জগৎ যেন আতঙ্কে ক্রমেই অভিভূত হইতে লাগিল। ভারতের বাহিরে চীনেও সমরানল জ্বলিয়া উঠিল এবং ফেলিস্তিনে প্রবল আরব-ইহুদী সংঘর্ষ চলিতে থাকিল। ভারত-রাষ্ট্রের পশ্চিম সীমান্তস্থিত আতঙ্কের ছায়া গিয়া পড়িল পূর্ব্ব সীমান্তের পারে, সেদিকেও আতঙ্কপীড়িত উদ্বাস্তুর স্রোত ক্রমেই স্ফীতধারায় সীমান্তের এপারে বহিয়া আসিতে লাগিল।

কি নিদারুণ দুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল ১৩৫৪ সাল অথচ ইহাই আমাদের স্বাধীনতার প্রথম বৎসর।

আজ ১৩৫৫ সাল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আমাদের সম্মুখে। কিন্তু আজ "নবীন বরষে নূতন হরষে" গান গাহিবার কবিও নাই, তাঁহার প্রিয়তম "শিশু" মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও নাই আশার বাণী শুনাইতে আর্ত্ত ও দুঃখক্লিষ্ট জনগণকে। ঘরে-বাহিরে, চতুর্দ্দিকে, আজ যেন নৈরাশ্য-বাদেরই জয়, দুর্দ্দৈবের আশঙ্কায় সকলেরই মন চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত। এরূপ বিপরীত অবস্থার মধ্যে বর্ষফলের শুভ ভবিষ্যদ্বাণী করে এমন দৈবজ্ঞ কে আছে কোথায়? সকলেই শুনাইতেছেন আসন্ন বিপদের কথা, চারিদিকেই শোনা যায় ক্ষোভ ও রোষের চীৎকার, অভিযোগ-অনুযোগে ছাইয়া গিয়াছে দেশ; অভাব ও কষ্টে জর্জ্জরিত লোকের মন আজ স্বভাবতই অবসন্ন ও ব্যস্তত্রস্ত। দেশের পরিস্থিতি যখন এইরূপ তখন উদ্ধারের পথ দেখাইবে কে, আসন্ন দুর্যোগের মুখে গ্রহশান্তিকর যাগযজ্ঞের হোতা উদ্গাতা কেবা আছে কোথায়?

১৩৫৫ সালের পথ অতি দুর্গম সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের নেতৃবর্গের মধ্যে যদি কিছুমাত্র পৌরুষ থাকে, তবে সে পথে আমরা নিশ্চয়ই পার পাইতে পারিব। দেড় শত বৎসরের নিদারুণ দমন লুণ্ঠন উৎপীড়ন সত্ত্বেও যে দেশে স্বাধীনতার আলো নিবে নাই, এই সেদিনও যেখানে দেশের শতসহস্র

সন্তান বিদেশীর শাসন-উৎপীড়নের মধ্য দিয়া, স্বাতন্ত্র্যের কামনায়, স্বাধীনতা-যুদ্ধের অনলে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছে, এই কয় মাসের মধ্যে সে দেশের সমস্ত বীর্য্য ও সহিষ্ণুতা শেষ হইয়া গিয়াছে, ইহা অবিশ্বাস্য। স্বাধীনতা বিনা-মূল্যে পাওয়া যায় না ইহা তো ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। আমরা দেড়শত বৎসরের দাসত্বের ফলে ভুলিয়াছি যে স্বাধীনতার মূল্যদান করিতে হয় পৌরুষে। যদি আমরা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাই তবে আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে ধীর স্থির ভাবে, দৃঢ়চিত্তে, অনিমেষ সতর্ক দৃষ্টিতে সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে, কেননা স্বাধীন জগতে ক্লীবত্বের স্থান নাই। নৈরাশ্যবাদের অর্থ "ছায়াভয়চকিত মূঢ়ের" আর্ত্তনাদ, তাহাতে সর্ব্বনাশেরই পথ খুলিয়া যায়। আমাদের এখন স্মরণ রাখিতে হইবে সুদূর অতীতের পিতৃপিতামহগণের গৌরবময় বীরত্বের কথা, শোণিত-তর্পণের কথা।

আত্ম-প্রবঞ্চনার দিন চলিয়া গিয়াছে। মুখে বলিব বেদান্তের মায়াবাদের কথা, কাজের বেলায় প্রতিদিন প্রতিক্ষণে চলিব বাস্তববাদের পথে, সকাল সন্ধ্যায় আওড়াইব গীতার জ্বলন্ত ক্ষাত্র-ধর্ম্মের শ্লোক, বিপদের সম্মুখে দিব চরম ক্লীবত্বের পরিচয় এবং তাহার ফলে বিপদ আরও ঘনীভূত হইলে অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া, তর্জ্জনে গর্জ্জনে নিজের অপদার্থতা ঢাকিবার চেষ্টা করিব এবং শেষে "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্ন" হইলে সব কিছু ছাড়িয়া, পলায়ন করিয়া, কপাল চাপড়াইয়া, অদৃষ্টের দোষ দিয়া কাঁদুনী গাহিব, এই কি আজকার দিনে মনুষ্যত্বের নিদর্শন? যদি পৌরুষ থাকে, ১৩৫৫ সালেই ভাগ্যচক্র ফিরিবে, নহিলে নয়।

সর্ব্বশেষে বাংলার কথা। লিখিবার সময় শোনা যাইতেছে যে বাংলার মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন ধুরন্ধর আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বার্থ সম্পর্কিত। যদি দেশের মঙ্গলামঙ্গল ইঁহাদের উদ্দেশ্য হইত তবে তাহার পরিচয় আমরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকালেই পাইতাম বা অন্যরূপে, দেশের মঙ্গলের জন্য মন্ত্রীসভার কার্য্যকলার দোষগুণ ইঁহারা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেন। সেইরূপ কোনও কিছু অভিযোগের অভাবে এবং ঐ মহাশয় ব্যক্তিদিগের মনোবৃত্তির পরিচয় থাকায় আমরা বলিতে বাধ্য যে দেশের এইরূপ দুর্দ্দিনের মধ্যে ইঁহাদের এরূপ স্বার্থান্বেষণ অতিশয় নিন্দনীয়। ইঁহারা আগে প্রকাশ্যে বলুন যে মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করিয়া দেশের কি উপকার ইঁহারা করিতে চাহেন এবং অতীতে ইঁহারা দেশের নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া কি করিয়াছেন যে দেশের লোক ইঁহাদের হাতে শাসনের ভার ছাড়িয়া দিবে। কংগ্রেসের নাম লইয়াই তো কলিকাতা করপোরেশনকে ক্রমে চোরপোরেশনে পরিণত করা হইয়াছে, শেষে কি বি,পি,সি,সি "বঙ্গীয় প্রাদেশিক চৌর-চক্রে" পরিণত হইবে? পূর্ব্ববঙ্গ ডুবাইয়া কি ইঁহাদের আশ মেটে নাই?

ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থান রাষ্ট্রসমস্যা

১৩৫৫ সালের ২রা বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ পর্য্যন্ত ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থানরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ কলিকাতায় একটি সম্মেলনে বাগ্‌বিতণ্ডায় নিযুক্ত ছিলেন। এই বাগ্‌বিতণ্ডার বিবরণ যাহা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা নানা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু যে সিদ্ধান্তসমূহ এই সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে তাহা সোমবার, ৬ই বৈশাখ, ঘোষণা করা হইয়াছে। তাহার ফলে সংস্কার-বিমুক্ত মন লইয়া এই বিষয়গুলির বিচার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সেইজন্য প্রথমেই এই সংস্কারগুলির গতিপ্রকৃতির আভাস দিতে হয়। কারণ এই সংস্কাররাজিই বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সৃষ্টি করিয়া ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়াছে। এই বিভাগের ফলে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই সংস্কাররাজির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

আমরা গত চল্লিশ বৎসরের ঘটনাবলীর নিরিখে এই মনোমালিন্যের বিচার করিব। তাহার পূর্ব্বের ঘটনা বর্ত্তমান আলোচনার বাহিরে রাখিতে চাই। এই চল্লিশ বৎসরের প্রাক্কালে আমরা বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাক্ষাৎ পাই। এই আন্দোলনের সূত্রপাতে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত বাঙালী ইহার বিপক্ষে ছিল। সেই একাগ্রতা বেশী দিন টিকে নাই। ঢাকা নগরীকে রাজধানী করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে একটি মুসলিম প্রদেশের প্রতিষ্ঠা করিবেন—বড়লাট কার্জ্জন এই প্রলোভন দেখাইয়া নবাব সলিমুল্লা প্রমুখ মুসলমান সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর নেতৃবর্গের সহায়তা লাভ করিতে সমর্থ হন। ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই যে ভাঙ্গন দেখা দিল তাহা আর জোড়া লাগিল না। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ প্যাক্‌ট, ১৯১৯-২১ সালের খেলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুর সহযোগিতা, র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেসের "না গ্রহণ না বর্জ্জন" নীতি, সবই ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাতেই শেষ হয় নাই। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ-প্রবর্ত্তিত যে দানবীয় রূপ আমরা কলিকাতা নগরীর বুকে ও তাণ্ডবলীলা নোয়াখালিতে দেখিলাম, এই অভিজ্ঞতার পর ইহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়িল যে হিন্দু মুসলমান আবার প্রতিবেশীরূপে বাস করিতে পারিবে। বিহার প্রদেশে ১৯৪৬ সালে মুসলমানের উপর অনুরূপ দানবীয় অত্যাচার চলিল। ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাসে পঞ্জাবের হিন্দু-শিখ সম্প্রদায়কে সেই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইল। তাহার পর ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারতবর্ষ বিভাগের ঘোষণার অল্পদিন পরে পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব্ব পঞ্জাবের ঘটনা ভারতবর্ষের বুকে এমন রক্তরেখা টানিয়া দিয়াছে যে, তাহা গান্ধীজীর বুকের রক্তেও ধুইয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

১৯৫৫ সালের বৈশাখ মাসের এই চারিটি দিন এই মর্ম্মান্তিক ইতিহাসের মোড় ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কয়েকজনকে এই চেষ্টার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। ফলাফল নিরপেক্ষ হইয়া এই চেষ্টাকে গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া আমরা মনে করি। পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লওয়া একটা অস্বাভাবিক কার্য্য নয়, এর জন্য খুনাখুনি করিতে গেলে যে অবস্থা দাঁড়ায় তাহাই গান্ধীজী প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই নৈতিক অবনতির বেদনায় তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছাও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। প্রতিবেশীর মধ্যে যে আত্মীয়তা ও সৌহার্দ্দ্য স্বাভাবিক তাহাই গান্ধীজী ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিলে তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন। এই কথা ভাবিয়াই আমরা ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী যে অনুরোধ করিয়াছেন—"চুক্তিনামার সর্ত্তাবলী সম্পর্কে রূঢ় সমালোচনা না করিতে"—তাহা মানিয়া লইলাম। এই সর্ত্তগুলি কি ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহার পরীক্ষার সময় আমরা দিব। "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা জনাব গুলাম মহম্মদ "হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া মনস্থির করিতে" অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই সম্পর্কে আমরা বলিতে চাই যে "হৃদয়" দিয়া ভারতবর্ষের বিভাগ আমরা সমর্থন করি না ও করিতে পারিব না। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্য একটা সর্ত্ত সম্বন্ধে আমাদের মনে দ্বিধার ভাব রহিয়া গেল :

> "পাকিস্থান ও ভারতের কিম্বা ইহাদের অংশসমূহের একীকরণের কোনরূপ প্রচারকার্য্য নিরুৎসাহ করা হইবে। অংশসমূহের মধ্যে একপক্ষে পূর্ব্ব বঙ্গ এবং অপর পক্ষে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, কুচবিহার কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্যও ধরা হইবে।"

অর্থাৎ লাট মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া যে আঁচড় কাটিয়া দিয়াছেন তাহা চিরকালের জন্য মানিয়া লইতে হইবে। এরূপ দাবি মানুষের জ্ঞানবিশ্বাসের আশা-আবেগের স্বাভাবিক পরিণতির বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। আমরা মনে করি "পাকিস্থান" রাষ্ট্র যখন ভারতরাষ্ট্র হইতে রাজনীতিক অর্থে ভিন্ন ধর্ম্মী তখন বন্ধুতা বা শত্রুতা সম্বন্ধে অপরাপর রাষ্ট্রের মতই ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধিয়তে এই নীতি অনুসারে তাহা স্থির হইবে। আমরা মনে করি না ভারত-রাষ্ট্রের মুসলমান অধিবাসী এত শীঘ্র তাঁহাদের "পাকিস্থানী" মনোভাব বদলাইয়া ফেলিতে পারিয়াছে। আমরা মনে করি না যে "পাকিস্থান"বাসী হিন্দু ও শিখ এত শীঘ্র তাঁহাদের রাজনীতিক বিশ্বাস বদলাইয়া ফেলিতে পারিবে। এই দুই রাষ্ট্রের এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই দুনিয়ার সঙ্কটময় পথে চলিতে আরম্ভ করা উচিত। কলিকাতা সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ এই বিরুদ্ধ ভাবদ্বয়ের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র, তাহাদের পক্ষে এর বেশী সার্থকতা দাবী করা বিচারসহ হইবে না। যে হিংসার স্রোত ও অপমানের স্রোত দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবাহিত তাহা সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করা রাজনীতিক কৌশলের কার্য্য। সেই কৌশল দুই রাষ্ট্রের আছে কিনা তাহা অদূর ভবিষ্যতে পরীক্ষিত হইবে।

চুক্তিনামার বিস্তারিত বিবরণ

চুক্তিনামার সর্ত্তাবলীর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

যেহেতু উভয় ডোমিনিয়নের গবর্ণমেণ্টদ্বয় স্বীকার করিতে-ছেন যে, সংখ্যালঘুদের ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগ কোন ডোমি-নিয়নেরই স্বার্থের পরিপোষক নহে, তাঁহারা বাস্তত্যাগকে নিরুৎসাহ করার জন্য ও বাস্তত্যাগ বন্ধ করিবার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টির জন্য সম্ভবপর সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা বাস্তত্যাগীদিগকে তাঁহাদের পৈতৃক বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে যত দূর সম্ভব উৎসাহ ও সুযোগসুবিধা দিবেন, সেই হেতু দুই ডোমিনিয়ন নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মানিয়া লইতেছেন :—

১ম ধারা

১। সংখ্যালঘুগণ যে ডোমিনিয়নে বাস করে তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার এবং তাহাদের সুবিচার পাওয়ার ও নাগরিক অধিকার রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সেই ডোমিনিয়নের গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে।

২। ভারতে ও পাকিস্থানে প্রত্যেক লোকের সমান অধিকার, সুযোগসুবিধা, বিশেষ অধিকার ও বাধ্যবাধকতা থাকিবে; সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা থাকিবে না; তাহাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"শিক্ষা বিষয়ক" অধিকার সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

৩। পাকিস্থান ও ভারতের কিম্বা উহাদের অংশসমূহের একীকরণের কোনরূপ প্রচারকার্য্য নিরুৎসাহ করা হইবে। অংশসমূহের মধ্যে এক পক্ষে পূর্ব্ব বঙ্গ এবং অপরপক্ষে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, কুচবিহার কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্যও ধরা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রচারকার্য্য বলিতে ঐ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানও বুঝাইবে।

৪। উভয় গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতেছেন যে আরও ভাল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সংবাদপত্রসমূহের সর্ব্বাঙ্গীণ সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক; সুতরাং উভয় গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতেছেন

যে, প্রত্যেক ডোমিনিয়নে সংবাদপত্রগুলি যাহাতে নিম্নোক্ত কাজসমূহ না করে তজ্জন্য যেখানে সম্ভবপর হইবে সেখানে সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করা হইবে—

(ক) অপর ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য। (খ) কোন ডোমিনিয়নের অধিবাসীদের কিম্বা তাহাদের কোন অংশের মধ্যে উত্তেজনা, ভয় কিম্বা আতঙ্কের সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে প্রকাশ। (গ) এক ডোমিনিয়ন কর্তৃক অপর ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমর্থক অথবা দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এইরূপ অর্থবোধের কোন বিষয় প্রকাশ।

৫। উভয় ডোমিনিয়নে সংখ্যালঘুগণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার বা অন্যায় ব্যবহারের এজাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ার অভিযোগ করিলে তৎসম্বন্ধে সত্বর তদন্ত হইবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

৬। পূর্ব্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলায় প্রাদেশিক সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ড থাকিবে এবং এই প্রাদেশিক বোর্ডের অধীনে জেলা সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ড থাকিবে। এই বোর্ডসমূহ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করিবে, তাহাদের মন হইতে ভীতি দূর করিবে ও বিশ্বাসের ভাব জাগ্রত করিবে। এই বোর্ডসমূহ ক্ষিপ্রতার সহিত সংখ্যালঘিষ্ঠদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিবে এবং সন্তোষজনকভাবে ও ক্ষিপ্রতার সহিত তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা করিবে।

প্রাদেশিক সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ড পাঁচ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্ততঃ তিন জন সদস্য থাকিবেন, উঁহারা প্রাদেশিক আইন সভার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের সদস্যগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট দুই জন প্রভাবপ্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন ও প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা মনোনীত হইবেন। জেলা সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ডের চেয়ারম্যান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং প্রাদেশিক বোর্ডের চেয়ারম্যান এক জন মন্ত্রী প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

৭। উভয় ডোমিনিয়নের গবর্মেণ্ট এবং উভয় ডোমিনিয়নের প্রদেশসমূহের গবর্মেণ্ট তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের ভাল ভাবে জানাইয়া দিবেন যে, যদি কোন সরকারী কর্ম্মচারী সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার কার্য্যে কোন অবহেলা দেখান অথবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করেন অথবা কর্ত্তব্যের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রদর্শন করেন তবে তাঁহাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে।

৮। একক অথবা দলবদ্ধভাবে যদি কেহ সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের মনে ভীতির সঞ্চার করে তবে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

৯। উভয় ডোমিনিয়ন নিম্নলিখিত অভিযোগসমূহ দূর করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন :—

(ক) আমদানী ও রপ্তানি লাইসেন্স মঞ্জুর করা সম্পর্কিত বৈষম্য এবং রেলে মাল প্রেরণের অগ্রাধিকার সম্পর্কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ।

(খ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কটের চেষ্টা অথবা তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করার চেষ্টা বন্ধ করা।

উভয় ডোমিনিয়ন গবর্মেণ্ট তাঁহাদের নিজ নিজ প্রদেশসমূহকে তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায় ঐ নীতি অনুসারে কাজ করিতে বলিবেন।

যে সকল জেলা অথবা স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক চলিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থানে বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য বোর্ড গঠনের নিমিত্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ গবর্মেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবেন। ঐ প্রকার বোর্ড গঠনের যদি দাবী করা হয় তবেই বোর্ড গঠিত হইবে। যদি সম্পত্তির মালিকগণ অনুরোধ করেন তবেই বোর্ড সম্পত্তির তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিবে। তাঁহাদের কার্য্য তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যের ন্যায় হইবে এবং ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিবে না। সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের লোকদের লইয়া এই সকল বোর্ড গঠিত হইবে।

দ্রষ্টব্য—যাঁহারা ১৯৪৭ সালের ১লা জুন অথবা তাহার পরে প্রদেশ ত্যাগ করিয়াছেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবার পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদেরই আশ্রয়প্রার্থী বলা হইবে।

প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্য বিস্তৃত প্রস্তাব রচনার উদ্দেশ্যে উভয় গবর্মেণ্ট অবিলম্বে অফিসারদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিবেন।

২য় ধারা

এই চুক্তি যাহাতে কার্য্যকরী হয় তৎসম্পর্কে সুনিশ্চিত হইবার জন্য দুই ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিগণ দুই মাসে অন্ততঃ একবার সম্মিলিত হইবেন। উক্ত বৈঠকে উপরোক্ত নীতি কোন ডোমিনিয়নে প্রতিপালিত না হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকিলে উত্থাপন করা হইবে। পূর্ব্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে জরুরী প্রয়োজনের আবশ্যকতা হেতু দুই প্রদেশের প্রধান মন্ত্রিগণ মাসে অন্ততঃ একবার উক্ত উদ্দেশ্যে মিলিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত দুই প্রদেশের চীফ সেক্রেটারীদ্বয় পনর দিনে একবার সম্মিলিত হইবেন। যখন আসাম, কুচবিহার ও ত্রিপুরার সমস্যা আলোচিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে তখন পশ্চিম বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী উক্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতির ব্যবস্থা করিবেন।

৩য় ধারা

১। এই সম্মেলন অগৌণে আর একটি আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলন আহ্বান করিবার জন্য সুপারিশ করিতেছেন। এই সম্মেলনে যে অপরাপর প্রদেশ (পূর্ব্ব ও পশ্চিম পঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত) হইতে ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগ হইয়াছে অথবা বাস্তুত্যাগের সম্ভাবনা আছে সেই সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ উপরে উল্লিখিত প্রস্তাব অথবা নিম্নোক্ত ধারায় অপর উপযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণের জন্য সমবেত হইবেন :—

(ক) যে সকল শরণাগত এক ডোমিনিয়ন হইতে অপর ডোমিনিয়নে সাময়িকভাবে বা অন্যভাবে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষা বা রক্ষা সম্পর্কে অপর ব্যবস্থা।

(খ) উপদ্রুত এলাকায় এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠরা তাহাদের স্বার্থ ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ বলিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে এবং বাস্তুত্যাগ বন্ধ হইতে পারে কিম্বা বাস্তুত্যাগীদিগকে পুনরায় তাহাদের বাড়ীঘরে প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে।

২। আরও জানা গিয়াছে যে, ইতিমধ্যে স্বীকৃত আর একটি পৃথক সম্মেলন পূর্ব্ব ও পশ্চিম পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে বিবেচনার জন্য অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ সম্মেলনের ব্যবস্থাও অগৌণে করিবার জন্য এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছেন।

৩। আর একটি আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনও অগৌণে আহ্বান করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। এই সম্মেলনে পূর্ব্ব বাংলা ও আসামের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া পূর্ব্ব বাংলা হইতে আসামে যাইয়া মুসলমানদের বসবাস সম্পর্কে এবং উক্ত সম্মেলন হইবার সাপক্ষে ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে আসামে পূর্ব্ব বাংলার বসবাসকারী মুসলমানদিগের সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কিংবা ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগের সম্ভাবনা থাকিতে পারে এমন কিছু করা হইবে না বলিয়া উভয় পক্ষ সম্মত হইয়াছেন।

৪র্থ ধারা

আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তৎসম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে এবং উভয় ডোমিনিয়ন এতৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট পত্রে উল্লিখিত সংশোধন সহ উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ অবিলম্বে কার্য্যকরী করিবার জন্য দুই ডোমিনিয়ন সম্মত হইয়াছেন। উক্ত কমিটির রিপোর্ট এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ

স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াতে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে শুল্ক নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং মাল চলাচল সম্পর্কে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধিনিষেধ আরোপ করিতে হইয়াছে। উল্লিখিত বিষয় সহ অন্যান্য আরও বহু সমস্যা পরীক্ষার জন্য ভারত-পাকিস্থান সম্মেলন প্রারম্ভেই উভয় ডোমিনিয়নের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, কয়েকজন প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের কর্ম্মচারী এবং বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি কমিটি নিয়োগ করেন। শুল্ক নির্দ্ধারণী ব্যবস্থা ও নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার ফলে যে আর্থিক কষ্ট এবং যাত্রীদের বহু অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়া কমিটি যথাসম্ভব উহার কঠোরতা ইত্যাদি হ্রাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিটি ইহাও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন যে আর্থিক কষ্ট সৃষ্টি হওয়াতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারী ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগ করিতেছেন, কাজেই এইরূপ অবস্থা চলিতে দেওয়া সমীচীন নহে। উভয় ডোমিনিয়নের স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কমিটি নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী সমস্যাগুলিকে যথাসম্ভব সহজ উপায়ে সমাধানের উদ্দেশে কতক সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কমিটির যে সমস্ত প্রস্তাব ডোমিনিয়ন ও প্রাদেশিক মন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। মাল ও যাত্রী চলাচল সম্পর্কিত বিধিনিষেধ।

(ক) উভয় ডোমিনিয়নের যাত্রীদের সাধারণ বিছানাপত্র বলিতে কি বুঝাইবে তাহা উভয়পক্ষের শুল্ক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যুক্তবৈঠকে স্থির করিবেন।

(খ) বিছানাপত্র সম্পর্কিত বিধিনিষেধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিরক্তিকর আচরণ ও যাত্রীদের অযথা হয়রানির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(গ) শুল্ক বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ যাত্রীদের বিছানাপত্র তল্লাসী করিতে পারিবে না।

(ঘ) নীতি হিসাবে গাত্রতল্লাসীর ব্যবস্থা যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে। গোপনে কোন দ্রব্য লইয়া যাইতেছে এইরূপ সন্দেহ জন্মিবার সন্তোষজনক কারণ থাকিলে গাত্র-তল্লাসী লওয়া হইবে। উল্লিখিতরূপ ক্ষেত্রে শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্যে, ঘটনাস্থলে যে সিনিয়র অফিসার উপস্থিত থাকিবেন তাঁহার সমক্ষে গাত্রতল্লাসী লওয়া হইবে এবং তল্লাসীর সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। আইনের প্রয়োগ যাহাতে যথাযথভাবে হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সংযোগরক্ষাকারী অফিসারকে সুযোগসুবিধা দিতে হইবে।

(ঙ) কোন কারণে মহিলাযাত্রীর গাত্রতল্লাসী লওয়া অপরিহার্য্য হইলে সামুদ্রিক শুল্ক আইনের বিধান অনুসারে মহিলা অফিসার দ্বারা তল্লাসী করিতে হইবে।

(চ) যাত্রীদের ব্যক্তিগত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে শুল্ক বিভাগীয় বাঁধাধরা নিয়মের দায় হইতে অব্যাহতি অথবা কঠোরতা হ্রাসের উদ্দেশে উভয় ডোমিনিয়ন স্ব স্ব টেরিফ সিডিউল এবং আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি পুনর্বিবেচনা করিবেন।

(ছ) যাত্রীদের সুখসুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার

নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। 'খ' প্যাসেঞ্জারদের অযথা তল্লাসীর দায় এবং হয়রানি হইতে অব্যাহতি দানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(জ) অনুমোদিত সরকারী কর্মচারী, অর্থাৎ পুলিস অফিসার ব্যতীত অপর কেহ নিষিদ্ধ পণ্য অথবা গোপনে মাল আমদানী রপ্তানী চালাইতেছে কিংবা উক্ত কাজে লিপ্ত এরূপ সন্দেহজনক কোন ব্যক্তিকে সীমান্ত অতিক্রমকালে আটক করিতে পারিবেন না। উল্লিখিতরূপ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিকটবর্ত্তী কাষ্টম ঘাঁটিতে প্রেরণ করিতে হইবে। শুল্ক বিভাগীয় কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর কেহ তাহার জিনিষপত্র তল্লাসী করিতে পারিবে না। অনুমোদিত প্রত্যেক অফিসারকে যথারীতি 'ব্যাজ' ধারণ করিতে হইবে।

(ঝ) শুল্ক বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে 'ব্যাজ' অথবা পরিচয়পত্র রাখিতে হইবে।

(ঞ) কোন যাত্রী কাষ্টমস সীমান্ত অতিক্রম করিলে পুনরায় তাঁহার গাত্র অথবা জিনিষপত্র তল্লাসী করা হইবে না।

১। পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য

পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদির চলাচলের সুবিধার জন্য কমিটি নিম্নোক্ত সুপারিশগুলি পেশ করেন,—

(ক) উভয় ডোমিনিয়নকে যথাসম্ভব পরস্পর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে সমসংখ্যক কাষ্টমস পোষ্ট স্থাপন করিতে হইবে।

(খ) আর্থিক দিক বিবেচনা করিয়া উভয় ডোমিনিয়ন যথাসম্ভব আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ধার্য্যযোগ্য দ্রব্যের তালিকা হ্রাস করিবেন। সুনির্দিষ্ট কতক দ্রব্য ব্যতীত অপরগুলি শুল্কমুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইহাতে পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে।

(গ) উভয় ডোমিনিয়ন অনুরূপভাবে রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণসম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি পুনর্বিবেচনা করিবেন। উভয় ডোমিনিয়নে বর্ত্তমান আমদানীর উপর কোনরূপ শুল্কধার্য্য নাই।

(ঘ) সীমান্তবাসী কোন কৃষক অপর ডোমিনিয়নে চাষ-আবাদ করিলে এবং উৎপন্ন শস্য নিয়ন্ত্রণ তালিকাভুক্ত থাকিলে শস্য সংগৃহীত হইবার পর একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য উক্ত শস্যের একটা অংশ গৃহে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে আইনের কড়াকড়ি যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে।

২। মাল চলাচল ব্যবস্থা

(১) অপর ডোমিনিয়নকে মাল চলাচলের সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ডোমিনিয়নকে আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধানাবলী অনুযায়ী কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; (২) চুক্তিবদ্ধ ভাবে চালানী মালের বহির্বিনিময় ব্যবস্থার দরুন পাওনা কিম্বা দেনা হইলে তাহা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাক্রমে যে ডোমিনিয়ন হইতে মাল প্রেরিত হইয়াছে, কিম্বা যে ডোমিনিয়নে প্রেরিত হইয়াছে তাহার উপর বর্ত্তিবে, যে ডোমিনিয়নের ভিতর দিয়া ইহা চলাচল করিবে তাহার উপর নহে; (৩) অন্যত্র প্রেরিত মাল চলাচলেও আভ্যন্তরীণ মাল চলাচল ব্যবস্থার অনুরূপ সুযোগসুবিধা দিতে হইবে; (৪) উভয় ডোমিনিয়নের শুল্ক বিশেষজ্ঞগণ বৈঠকে মিলিত হইয়া ভৌগোলিক অবস্থান ও মাল চলাচলের সুবিধা অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে মাল চলাচলের যথাসম্ভব সহজ ও সরল পন্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। বিশেষ দ্রষ্টব্য:—উভয় ডোমিনিয়নের সীমান্তবর্ত্তী ঘাঁটিসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মাল চলাচল ঘাঁটি স্থাপনের আবশ্যকতা এবং ইতিপূর্ব্বে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে; (৫) শুল্ক ঘাঁটিতে যে ডোমিনিয়ন হইতে মাল প্রেরিত হইয়াছে সেই ডোমিনিয়নের শুল্ক বিভাগীয় অফিসার কর্ত্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। এই মাল অপর ডোমিনিয়ন হইতে আসিয়াছে এরূপ সন্দেহে ইহা অগ্রাহ্য করা চলিবে না; (৬) মাল চলাচলের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার জন্য এবং যাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য এক ডোমিনিয়নের অফিসারদিগকে অপর ডোমিনিয়নের অফিসারদের সহিত সহযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে হইবে; (৭) যদি কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাহা দূর করিবার জন্য প্রত্যেক ডোমিনিয়নকে অপর ডোমিনিয়নে সর্ব্বসম্মত ব্যবস্থানুযায়ী নির্ব্বাচিত প্রধান প্রধান শুল্ক ঘাঁটিসমূহে ও মাল চলাচল পথের অন্যান্য স্থানে বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসার নিয়োগ করিতে হইবে। এই সব অফিসারকে যাত্রী ও লটবহর চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য কর্ত্তব্যও সম্পাদন করিতে হইবে; (৮) যে সব ক্ষেত্রে শুধু সড়কের পথে কিম্বা জলপথে অথবা অন্য কোনপ্রকার যানবাহনের সাহায্যে সড়কের পথে ও জলপথে মাল চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেই সব ক্ষেত্রে 'আউট এজেন্সী' প্রতিষ্ঠা করিয়া মাল চলাচলের প্রয়োজনীয় সুবিধা করিয়া দিতে হইবে।

৩। যানবাহন

(ক) যানবাহনের উপর যে চাপ পড়িয়াছে তাহা লাঘব করিবার জন্য উভয় ডোমিনিয়নের রেলওয়ে কর্ত্তৃক কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক চুক্তির প্রয়োজন।

ট্রেণযোগে মাল প্রেরণ সম্পর্কে যে সমস্ত অসুবিধা দেখা দিয়াছে ঐগুলি দূর করিবার জন্য পূর্ব্ব অঞ্চলের তিনটি রেলওয়ে এবং পশ্চিম অঞ্চলের রেলওয়ে দুইটির প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কমিটিকে (১) ওয়াগনগুলি যাতায়াতে বিলম্ব, (২) ওয়াগন বরাদ্দ ও ভাড়া নির্দ্ধারণ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবহার এবং (৩) অগ্রাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে।

(খ) সমগ্রভাবে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে ট্রেন ও মালগাড়ী চলাচল সংক্রান্ত বৃহত্তর বিষয়টি সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণকল্পে একটি আন্তঃ-ডোমিনিয়ন রেলওয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠনেরও সুপারিশ জানান যাইতেছে।

(৪) মেরামতের সুযোগ-সুবিধা

আমদানী এবং পুনরায় রপ্তানী সংক্রান্ত নিয়মানুযায়ী সাধারণতঃ যেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এক ডোমিনিয়ন হইতে অন্য ডোমিনিয়নে মেরামতের জন্য যন্ত্রপাতি প্রেরণ ও প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারেও তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু শুল্ক আদায় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যন্ত্রপাতি প্রেরিত হইয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়ম প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়ি অবলম্বন করা হইবে না এবং তিন মাস পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইবে।

বিবিধ বিষয়

(ক) স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। এই অবস্থার প্রতীকারকল্পে বিদেশ হইতে আমদানী মালপত্র যাহাতে অন্য ডোমিনিয়নের ক্রেতাদের অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা যায় তজ্জন্য উভয় ডোমিনিয়নের কর্তৃপক্ষই রপ্তানীর লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে বিশেষ সহানুভূতির সহিত আবেদনপত্রগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন।

অন্তর্ব্বর্তী সময়ের জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। সাধারণতঃ ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে যে সমস্ত মালপত্র জাহাজযোগে প্রেরিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য মাশুলও প্রদত্ত হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। এক ডোমিনিয়নের ব্যবসায়িবৃন্দ অন্য ডোমিনিয়নের বন্দরগুলির মারফত আমদানীর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে কোনও মালপত্রের অর্ডার দিয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা চুক্তি অথবা স্বাভাবিক চালান ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে হইবে। যে সমস্ত ব্যক্তি এই ভাবে মালপত্র আমদানীর জন্য অর্ডার দিয়াছে এবং যথারীতি মালপত্রের মূল্য প্রদান করিয়াছে বা করিতে মনস্থ করিয়াছে তাহাদিগকে এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

(খ) ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, কমিটির কলিকাতার এই বৈঠকে বাণিজ্য চুক্তির নির্দ্দিষ্ট ধারা নির্দ্ধারণ কল্পে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষ এক্ষণে দুইটি ডোমিনিয়নে বিভক্ত হইয়াছে। যত দিন পর্য্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা ও নীতিসমূহ নির্দ্ধারিত না হইতেছে তত দিনের জন্য দেশ বিভাগের পূর্ব্বের সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থাদির বিচার করতঃ এক ডোমিনিয়ন যাহাতে অন্য ডোমিনিয়নের পক্ষে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে। তৎসম্পর্কেও এই কমিটিকে অবহিত হইতে হইবে। এই অবস্থার ফলে বিশেষভাবে পূর্ব্বাঞ্চলের সাধারণ লোকজনের দৈনন্দিন জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। মাছ, টাটকা ফলফুলারি, দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, শাকসব্জী এবং জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জিনিষপত্রের জন্য এক ডোমিনিয়নভুক্ত কোন কোনও অঞ্চলকে অন্য ডোমিনিয়নের সীমান্ত এলাকার উপর নির্ভর করিতে হয়।

(গ) বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের অভিমতাদি সম্পর্কে বিবেচনান্তে কমিটি টাটকা ফলফুলারি, শাকসব্জী, টাটকা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, হাঁস মুরগী প্রভৃতি ও ডিম্ব, স্থানীয় মসলাপত্র, বাঁশ, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি দ্রব্যাদি এক ডোমিনিয়ন হইতে অন্য ডোমিনিয়নে চালানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করিয়া থাকিলে তাহা প্রত্যাহারের সুপারিশ জানাইতেছেন। ইহাদের উপর কোনরূপ শুল্ক ধার্য্য হইয়া থাকিলে তাহাও বাতিল করিতে হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে সর্ষপ তৈল সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছেন। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই এই সভার অধিবেশন হইবে। তত দিন পর্য্যন্ত পাকিস্থান গবর্মেণ্ট কোনরূপ শুল্ক না লইয়া অবাধে পূর্ব্বের ন্যায় মৎস্য (টাটকা ও শুট্‌কী) চালানের অনুমতি দিবেন।

(ঘ) কমিটির অভিমত এই যে, উভয় অঞ্চলের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য উভয়তঃ অত্যাবশ্যক মালপত্র সরবরাহের উদ্দেশ্যে অদূর ভবিষ্যতে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে এক বা একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে তদ্দ্বারা উভয় ডোমিনিয়নেরই স্বার্থ রক্ষিত হইবে। এইরূপ চুক্তি সম্পাদিত ও কার্য্যে পরিণত হইলে বর্ত্তমানে যে সমস্ত অঞ্চল একাধিক ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বকালীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর হইবে এবং উত্তরোত্তর আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। এই বিষয়টি ও এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে উভয় গবর্মেণ্টের মধ্যে আলোচনার জন্য শীঘ্রই তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। ইতিমধ্যে উভয় ডোমিনিয়নের পক্ষে অত্যাবশ্যক আশু-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন।

(ঙ) ডাক তার ও টেলিফোনের হার:

ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, উপরোক্ত বিষয় এবং এক্সচেঞ্জের মারফত পোষ্ট কার্ড এবং অন্যবিধ পত্রাদি প্রেরণের দরুন

বর্ত্তমানে যেরূপ বিলম্ব ঘটিতেছে উহা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে চিঠিপত্র চলাচল ব্যবস্থার জটিলতা হ্রাস করার প্রশ্ন উভয় ডোমিনিয়নের বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক অতি সত্বর পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। এই আলোচনার উদ্যোগ-আয়োজন ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে। শুল্কের আওতায় পড়ে এরূপ পার্শ্বেলের বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন হইতে পারে।

(চ) অতীতে উভয় ডোমিনিয়নেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সহ অন্যান্য মালপত্র বে-আইনীভাবে আটক করা হইয়াছে। কমিটি স্বীকার করিতেছেন যে, বর্ত্তমানে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অবিলম্বে এই ধরণের বে-আইনী আটক বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি উভয় গবর্ন্মেণ্টের আদেশ জারী করা প্রয়োজন। স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই যে সকল মাল চালান হইয়াছে সেগুলি মামুলী নিয়মের বিশেষ কড়াকড়ি না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

সংযোগরক্ষা

কমিটি মনে করেন যে, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং হয়রানি ও সর্ব্বপ্রকার বিলম্বের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য উভয় ডোমিনিয়নের প্রত্যেক স্তরের কর্ম্মচারীদের মধ্যে সংযোগরক্ষা একান্ত আবশ্যক। কাজের চাপ ও ধরণ বুঝিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্পেশ্যাল লিয়াজন অফিসার নিয়োগ ছাড়াও উভয় পক্ষের অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টসমূহের কর্ম্মচারী-দিগকে পরস্পরের সহিত সংযোগ ও সদিচ্ছা রক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সার্থকভাবে কোন চুক্তি বা বিধি পালন করিতে হইলে সর্ব্বস্তরের সরকারী কর্ম্মচারীদের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হয়। উভয় ডোমিনিয়নের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের অধীন সর্ব্বস্তরের কর্ম্মচারীদের মধ্যে এই মনোভাব জাগ্রত করিবার জন্য প্রয়াসী হইতে হইবে।

পাকিস্থানে মাল চালান

কাষ্টমস ফাঁকি দিয়া পূর্ব্ব পাকিস্থানে বে-আইনী মাল চালান একটি বড় রকমের সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। রাণা-ঘাট এবং হিঙ্গলগঞ্জ এ বিষয়ে চূড়ান্ত কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। ২৪পরগণা জেলার হাসনাবাদ থানার এলাকাধীন হিঙ্গলগঞ্জ বাজারটি পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাংলার সীমান্তে অবস্থিত। এই বাজার হইতে কিছু দিন যাবৎ লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্য প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে নদীর অদূর তীরবর্ত্তী পাকিস্থান অঞ্চলে বে-আইনী ভাবে চালান দেওয়া হইতেছে। এই কার্য্যে পাকিস্থানী চোরাকারবারীদের সহিত সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ ও স্থানীয় বাজার কমিটির বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ সহযোগিতা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেস-সদস্যের সংখ্যাও কম নয়। হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জে ইছামতী ও কালিন্দী নদী পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রবেশপথ। সেই পথ দিয়া মাল সারা পূর্ব্ববঙ্গে এমন কি আসাম পর্য্যন্ত চলাচল করে। গত ১লা মার্চ্চ হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে শুল্কপ্রাচীর স্থাপিত হওয়ার পর হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য্যের জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী লইয়া ল্যাণ্ড কাষ্টমস আপিস খোলা হইয়াছে। কিন্তু বসিরহাট মহকুমার সর্ব্বত্র ও হাসনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জে ল্যাণ্ড কাষ্টমসের কর্ম্মচারিগণ, স্থানীয় পুলিস, মহকুমা হাকিম ও কয়েকজন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় বা নিষ্ক্রিয়তায় প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার বস্ত্র, চিনি, সরিষার তৈল, দেশলাই প্রভৃতি অবাধে পাকিস্থানে চলিয়া যাইতেছে। এই বে-আইনী চালানের পিছনে একটি সঙ্ঘবদ্ধ দল কার্য্য করিতেছে। ইহারা যেমন চতুর, তেমনি দুঃসাহসী এবং তেমনি বিত্তশালী ও প্রতিষ্ঠাবান।

দৈনিক ভারতের নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ হইতে অবস্থার গুরুত্ব খানিকটা উপলব্ধি করা যাইবে। উহার কতকাংশ এইরূপ :—

"কিরূপভাবে এই সকল ব্যবসা চলিতেছে তাহার বিবরণ দিতে গেলে প্রথমেই পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ বিভাগ, দ্বিতীয় বসিরহাট মহকুমা হাকিম, তৃতীয় হিঙ্গলগঞ্জের ল্যাণ্ড কাষ্টম অফিসার, চতুর্থ হাসনাবাদের ল্যাণ্ড কাষ্টম অফিসার, ও দুই-এক জন ছাড়া হাসনাবাদের পুলিসকে ইহার জন্য বিশেষ দায়ী করিতে হয়। ইহা ছাড়া হিঙ্গলগঞ্জের বাজার কমিটির প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী এবং হাসনাবাদ বাজার কমিটির সেক্রেটারী ও কয়েকজন সদস্যের কথা বলিতে হয়। এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিঙ্গলগঞ্জ বাজার কমিটির প্রেসিডেণ্ট এক জন চিকিৎসা ব্যবসায়ী কিন্তু এক্ষণে তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি বস্ত্র কারবারীরূপে পরিণত হইয়াছেন। আর হাসনাবাদের বাজার কমিটির সেক্রেটারী এক জন হোটেলওয়ালা এবং অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে উকিল প্রভৃতি আছেন। কিন্তু তাহারাও তাহাদের ব্যবসা ছাড়িয়া লক্ষ লক্ষ টাকা মালের চোরাই কারবার করিতেছে ও প্রচুর মুনাফা খাইতেছে।

প্রত্যহ ৫০।৬০ গাঁইট এবং সপ্তাহে প্রায় ৪ শত গাঁইট বস্ত্র হিঙ্গলগঞ্জে প্রেরিত হয় কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় হিঙ্গলগঞ্জ তো দূরের কথা আশেপাশের ইউনিয়নে একখানি বস্ত্রও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত বস্ত্র, চিনি ও সরিষার তৈল হিঙ্গলগঞ্জে পাঠানো হইয়াছে তাহাতে সে স্থান ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ইউনিয়নের লোকেরা দৈনিক দুইখানি নূতন বস্ত্র, এক সের চিনি ও এক সের সরিষার তৈল পাইতে পারে।

অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ বিভাগের ১২নং ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট হইতে ইচ্ছামত পারমিট ইসু করা হয় হাসনাবাদ ও অন্যান্য স্থানে বস্ত্র লইয়া

যাইবার জন্য। তাহাতে দেখিলাম যে দাগী চোরাকারবারীরা—যাহারা জেলে আছে তাহাদের নামেও এখনও পারমিট ইস্যু করা হইতেছে। সেই পারমিটের বলে কাপড় অবাধে লরী ও রেলযোগে হাসনাবাদে আসে ও ল্যাণ্ড কাষ্টম, পুলিস ও বাজার কমিটির সুপারিশে হিঙ্গলগঞ্জে যাইবে এই নামে নৌকায় উঠান হয় ও পাকিস্থানের দিকে পাড়ি দেয়। মাঝে মাঝে কাজ দেখানো হইতেছে মনে করিয়া যদি বা কখনও কোন নৌকা আটকানো হয় তো হিঙ্গলগঞ্জের ল্যাণ্ড কাষ্টম অফিসার আবার আগাইয়া আসিয়া নিজের দায়িত্বে তাহা ছাড়াইয়া লইয়া যান। পুলিসের যিনি সৎ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত শুনিলাম তিনি প্রথমে এই সকল অনাচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাহাতে কিছু পরিমাণ সফলকামও হইয়াছিলেন। কিন্তু বসিরহাটের মহকুমা হাকিমের নির্দ্দেশে তিনি গত ১০ই মার্চ্চ হইতে কোন কিছু আর করিতে পারিতেছেন না। তাহার ফলে দেখা গেল যেস্থানে দৈনিক ৫।৭ বেল বস্ত্র যাইত সেস্থানে এখন দৈনিক ২০০।৩০০ বেল কাপড়ও চলিয়া যাইতেছে। অনুরূপভাবে সরিষার তৈল ও চিনিও যায়। যাহারা আবার কাষ্টমকে ফাঁকি দিতে চায় তাহারা হাসনাবাদ বাজার কমিটির সাহায্যে রাত্রের অন্ধকারে মাল পরপারে চালান করে। বাজার কমিটির লোকেরা তাহাদের মাল খালাস ও নৌকা ভাড়া পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া দেয়। দেখিলাম মার্টিন রেলে এক জন কুলির সর্দ্দার আমার সম্মুখে ১ ঘণ্টায় ৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিল।

হাসনাবাদের ল্যাণ্ড কাষ্টম অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কি পদ্ধতিতে তিনি মাল ছাড়েন। তিনি একখানি রেলের রসিদ দেখাইলেন। তাহাতে দেখিলাম শুধু পারমিট নম্বর আছে কিন্তু স্থানের উল্লেখ নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন ইহাতেই হইবে এবং তিনি হিঙ্গলগঞ্জের জন্য সরাসরি সেই মালের পারমিট ইস্যু করেন। আমি বলিলাম যে ইহাতেই যদি হইবে বলিলেন তবে পাকিস্থানে মাল পাঠানোর জন্য আপনি কেন পারমিট ইস্যু করিতেছেন এবং সে বিষয়ে আপনার ক্ষমতা কতদূর? তিনি নিরুত্তর রহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম হিঙ্গলগঞ্জে কত বস্ত্র যায়। তিনি আমাকে একখানি হিঙ্গলগঞ্জ বাজার কমিটি কর্ত্তৃক তৈয়ারী বস্ত্রব্যবসায়ীর লিষ্ট দেখাইলেন। তাহাতে দেখিলাম চোরাকারবারী বলিয়া শাস্তি প্রাপ্ত ব্যবসায়ী হইতে যাহারা কোনদিন ব্যবসা জানে না তাহাদের নাম পর্য্যন্ত এই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে এবং রোজই আরও নাম আসিতেছে। সেই তালিকা হইতে দেখা গেল যে, সরকারীভাবেও সপ্তাহে ৪০০ বেল বস্ত্র হিঙ্গলগঞ্জে যায়।

হাসনাবাদ বাজার পাকিস্থানে চালান দেওয়ার জন্য একটি বিরাট ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। রাতারাতি পানের দোকান, মুদির দোকান, বাসনের দোকান প্রভৃতি বস্ত্রের দোকানে পরিণত হইয়াছে। এই বাজার ২৪ ঘণ্টার জন্য খোলা থাকে এবং পাকিস্থানে চালানের জন্য বাজার কমিটির সুপারিশে অসংখ্য বস্ত্র বিক্রয় হয় এবং রাত্রের অন্ধকারে পাকিস্থানগামী নৌকায় চাপানো হয়।"

সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী ব্রহ্মচারী ভোলানাথও কালিন্দী ও ইছামতী নদী পথে সীমান্তের বে-আইনী চোরাকারবার সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। নদীপথ ভিন্ন রেলপথে এবং যশোর রোড ও কৃষ্ণনগর রোড দিয়াও প্রচুর মাল বে-আইনী ভাবে চালান যাইতেছে। রেলপথে কলিকাতা হইতে বনগ্রাম লাইনে বারাসত, মসলন্দপুর, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি প্রত্যেক ষ্টেশনে চোরাকারবারীদের এক একটি ঘাঁটি আছে। ইহারা সুযোগ বুঝিয়া যে কোন একটি ঘাঁটিতে মাল নামায় এবং গোপনে সুবিধা মত এক স্থান হইতে অপর স্থানে সরাইয়া অবশেষে পাকিস্থান এলাকায় লইয়া যায়। এই রাস্তার মধ্যে বারাসত ষ্টেশনে ও বারাসতের চাঁপাডাঙ্গার সংযোগস্থল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এই সংযোগস্থল হইতে তিনটি রাস্তা তিন দিক দিয়া পাকিস্থানে গিয়া পড়িয়াছে। প্রথমটি যশোর রোড, দ্বিতীয়টি বসিরহাট ইটিণ্ডাঘাট রোড এবং তৃতীয়টি কৃষ্ণনগর রোড। এখানে পুলিসের কোন কড়া পাহারা নাই। চোরাকারবারীরা জানে যে একবার মাল লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের সীমানা পার হইতে পারিলেই তাহাদের আর কোন ভাবনা নাই।

ডায়মণ্ডহারবার এবং রাণাঘাটেও এরূপ ঘাঁটি গড়িয়া উঠিতেছে। রাণাঘাটে তিনটি ট্রেন তল্লাসী করিয়া এক দিনে তিন লক্ষ টাকার কাপড় উদ্ধার হইয়াছে। মেলব্যাগে, ট্রেনের জলের ট্যাঙ্কে এবং ট্রেনের তলায় বাঁধা অবস্থায় বহু কাপড় পাওয়া গিয়াছে।

কাষ্টমস ফাঁকি দেওয়া গুরুতর অপরাধ। মুর্শিদাবাদ সীমান্তে বে-আইনী চালান বন্ধ করিবার জন্য তথাকার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, রাত্রে কারফিউ জারী করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নদীয়া এবং ২৪পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয় এবং সংশ্লিষ্ট মহকুমা হাকিমেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। উচ্চতর অধিকারীদের কথা না বলাই ভাল। কলিকাতা এই সব চালানের মূল কেন্দ্র। কলিকাতার পুলিস কমিশনার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে চোরাকারবার বন্ধ করিবার ক্ষমতা পুলিসের নাই, কারণ পুরনো অর্ডিনান্স বাতিল হইয়া গিয়াছে এবং নূতন বিল আইনে পরিণত হয় নাই। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি ব্ল্যাক-মার্কেট বিল নামে একটি বিল ব্যবস্থা-পরিষদে আনিয়াছিলেন এবং নিরাপত্তা বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য ঐ বিল পাস হইতে এক দিন দেরী হওয়ায় বলিয়াছিলেন যে

বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা চোরাকারবারীদের হইয়া বিল পাস হইতে দেরী করাইয়া দিয়াছে। বিলটি পাস হওয়ার পর প্রায় এক মাস তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু বিলটিতে গবর্ণরের সম্মতি তিনি লইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রীসভাও তিন মাসের মধ্যে এই কাজটি করেন নাই।

সীমান্তের চোরাকারবারে বাঙালী এবং মারোয়াড়ী ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। সরবরাহ বিভাগ এবং মন্ত্রীসভা এটা জানেন না ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মন্ত্রী বড়বাজারে মারোয়াড়ীদের নিকট সভায় অভিনন্দন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে বলিয়া আসিয়াছেন যে কাপড়ের চোরাকারবার বন্ধ করিবার ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাই। মন্ত্রী মহাশয়ের দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ মারোয়াড়ীরা গ্রহণ করিয়াছে, বোম্বাই ও আমেদাবাদ হইতে গত কয়েক সপ্তাহে এত কাপড় আসিয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গে সাত মাস কাপড়ের বন্যা বহিয়া যাইতে পারিত। অথচ এদিককার লোকে কাপড় দেড় গুণ দাম দিলেও পাইতেছে না। ইহার ফল হইয়াছে এই যে ভারত-সরকার শুল্ক ব্যবস্থা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে কাপড়ের চালান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের পাঁচ-ছয়টি ঘাঁটিতে কড়া পাহারা বসাইলেই বে-আইনী কারবার বন্ধ হইয়া যায়, তৎসত্ত্বেও তাহা করা হইতেছে না ইহা মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী কাহারও পক্ষে শ্লাঘার বিষয় নহে।

দার্জ্জিলিং-কলিকাতা রেলওয়ে

র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ডে পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং জেলা দুইটিকে মূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দার্জ্জিলিং-কলিকাতা রেল লাইনটি ঐ দুই জেলার সহিত কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রধান যোগসূত্র। লালগোলা-মণিহারিঘাট-কাটিহার হইয়া শিলিগুড়ি যাওয়ার একটা রেলপথ আছে বটে, কিন্তু ঐ লাইনে যাওয়া দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং পথে অনেকবার ট্রেন ও ষ্টীমার বদল করিতে হয়। অল্প সময়ে এবং শিলিগুড়িতে একবার মাত্র ট্রেন পরিবর্ত্তন করিয়া আসিবার এই রেলপথটি ভ্রমণযোগ্য থাকা পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এই পথটির অধিকাংশ পূর্ব্ব পাকিস্থানে পড়িলেও উহা ব্যবহারের দাবী পশ্চিম বঙ্গের কিছু কম নয়।

পাকিস্থানের অতি উৎসাহী লীগ চমূদের উপদ্রবে এবং তথাকার সরকারী কর্ম্মচারীদের উপেক্ষা ও নিষ্ক্রিয়তায় দার্জ্জিলিং-কলিকাতা রেলে ভ্রমণ অসুবিধাজনক এবং কখনো কখনো রীতিমত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। রেলযাত্রীদের উপর স্থানীয় লোকেরা যথেচ্ছ উপদ্রব করিতেছে, কোন প্রতিকার পাওয়া যাইতেছে না।

দার্জ্জিলিং মেলে জনৈক অসুস্থ ও প্রায় পঙ্গু বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহার পত্নী ও কন্যা এবং এক জন ডাক্তারসহ কামরা রিজার্ভ করিয়া দার্জ্জিলিং যাইতেছিলেন। পার্ব্বতীপুরের দুই ষ্টেশন আগে কামরার দরজা খুলিবার জন্য বাহিরে কতকগুলি লোক চীৎকার এবং দরজায় ধাক্কাধাক্কি সুরু করে। দরজা খোলা হয় না। পরের ষ্টেশনে আবার ঐ ব্যাপার; তবে এবার দরজার উপর আঘাত আরও সজোরে। গাড়ী ছাড়িবার সময় ইহারা পার্ব্বতীপুরে দেখিয়া লইবে বলিয়া শাসাইয়া যায়। পার্ব্বতীপুরে গাড়ী থামিলে ইহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলে, তাঁহারা দরজা খুলিয়া দেন এবং একদল লোক কামরায় ঢুকিয়া উপদ্রব সুরু করে। অসুস্থ লোক ডাক্তার সঙ্গে লইয়া গাড়ী রিজার্ভ করিয়া যাইতেছেন বলিলেও ইহারা কর্ণপাত করে না। পার্ব্বতীপুর বলিয়া রক্ষা, গোলমাল শুনিয়া রেল কর্ম্মচারীরা আসিয়া বদমায়েসদের নিরস্ত করেন। পথিপার্শ্বস্থ ছোট ষ্টেশনে দরজা খুলিলে কি অবস্থা হইত তাহা অনুমান করা কঠিন নয় এবং তিনটি ষ্টেশনে একই দলের কার্য্য ও কথাবার্ত্তা হইতে বুঝা গিয়াছিল যে ইহারা ঐ ট্রেনেই ভ্রমণ করিতেছিল।

এই উপদ্রব নিবারণের সহজ উপায় আছে। দার্জ্জিলিং মেল, নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস প্রভৃতি যে-সব ট্রেন ভারতীয় ইউনিয়নের একাংশ হইতে অপরাংশে পাকিস্থানের উপর দিয়া যায় সেইগুলিতে কয়েকটি করিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, ইণ্টার ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ইউনিয়নের দুই অংশের যাত্রীদের জন্য রিজার্ভ রাখা যাইতে পারে। ঐ সব গাড়ীতে "শুধু ইউনিয়নের যাত্রীদের জন্য" এইরূপ কোন লেখা থাকা উচিত এবং পাকিস্থানের মধ্যে ঐ যাত্রীদের মালপত্র টানাটানি এবং তাঁহাদের উপর অপর কোন উপদ্রব যাহাতে না হয় তাহা দেখিবার জন্য প্রত্যেক ট্রেনে উভয় ডোমিনিয়নের এক বা দুই জন করিয়া রেল ও পুলিস কর্ম্মচারী থাকা উচিত। কোন গাড়ীতে যাত্রীদের উপর উৎপাত হইতেছে কিনা ইঁহারা প্রত্যেক ষ্টেশনে নামিয়া তাহা দেখিবেন। পাকিস্থান ও ইউনিয়নের মধ্যে যাঁহারা যাওয়া আসা করিবার সময় ষ্টেশনে ষ্টেশনে অন্যায় ভাবে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁহাদের হয়রানি ও ক্ষতি নিবারণের জন্য পাকিস্থান কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ইউনিয়নের দুই অংশে মালচলাচল সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা যায় এই ভাবে যে ঐ সব মালগাড়ী শীলমোহর করা থাকিবে, পাকিস্থানে কেহ ঐগুলি খুলিতে পারিবে না।

পশ্চিম বঙ্গের সামরিক শিক্ষা

পশ্চিম বঙ্গের তরুণদের সামরিক শিক্ষাদান বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের যে গড়িমসি প্রথম হইতে দেখা যাইতেছিল, তাহা কতকটা দূর হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গ

এখন সীমান্ত প্রদেশ, সামরিক প্রস্তুতির দিক দিয়া এই প্রদেশ এখন আর উদাসীন থাকিতে পারে না, সীমান্তরক্ষী দল এবং দেশরক্ষী বাহিনী গঠনে যত বিলম্ব হইবে পশ্চিম বঙ্গ তথা নিখিল-ভারতের স্বাধীনতা ও স্বস্তি ততই বিপন্ন হইবে একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। প্রাক্তন মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে বিন্দু-মাত্র কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই বরং এরূপ প্রস্তাবকে সন্দেহের চোখেই দেখিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গবর্ন্মেণ্ট এই মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু যতটা তৎপর হওয়া উচিত এখনও ততটা হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা এদিকে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের ও উহার সৈনিকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের আয়োজন করা হইয়াছে। ডাঃ রায়ের গবর্ন্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে সীমান্তের ৩৩০টি গ্রামের প্রত্যেকটি হইতে ২০ জন করিয়া লোক লইয়া ৬৬০০ জনের একটি সীমান্ত রক্ষীবাহিনী গঠিত হইবে। বলা বাহুল্য, স্থানীয় লোক লইয়া গঠিত এরূপ বাহিনী অধিকতর কার্য্যকরী এবং স্বল্পতর ব্যয়সাধ্য হইবে।

বাঙালী সামরিক জাতি নহে এই কথা ইংরেজ আমাদের শিখাইয়া গিয়াছে এবং দুঃখের বিষয় বহু শিক্ষিত বাঙালী এই মিথ্যায় বিশ্বাস করিয়াছেন। ভারতীয় সমর বিভাগে বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠন এবং বাংলার পুলিসে বাঙালী কনেষ্টবল গ্রহণের জন্য যে সব আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ভাবে হইয়াছে তাহা বাংলার শিক্ষিত সমাজের সমর্থন কখনও পায় নাই। ফলে সমগ্র ভারতবাসীর মনে এমনই একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে বাঙালী ভীরু, নিজের দেশ ও পরিবার রক্ষায় অক্ষম, আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার জন্য ভিন্ন প্রদেশের সৈনিক ও বিহারী কনেষ্টবলের উপর অসহায় ভাবে নির্ভর করা ভিন্ন তাহার আর কোন উপায় নাই। অথচ এই অপবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইংরেজ আমলেই ক্লাইভের সৈন্যদল কয়টি বাঙালী হিন্দুর নানা সম্প্রদায় হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। ভিন্ন প্রদেশীয় সৈনিক ও বাঙালী সৈনিকে যে প্রভেদ বাঙালী রেজিমেণ্ট এবং বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও গোলন্দাজবাহিনী প্রভৃতিতে গত দুই যুদ্ধে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়াছে ইংরেজ তাহা বহু আগেই ধরিতে পারিয়াছিল। ইহা পারিয়াছিল বলিয়াই তাহারা ভারতবাসীকে সামরিক ও অসামরিক এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া বাঙালীকে শেষোক্ত পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তাহাকে সমর বিভাগে অপাংক্তেয় করিয়াছে এবং বাংলার নমঃশূদ্র, বাগদী প্রভৃতি সামরিক সম্প্রদায়গুলিকে অপরাধপ্রবণ জাতি আখ্যা দিয়া Criminal Tribes Act পাস করিয়া উহার বলে উহাদিগকে নিকটবর্ত্তী থানার দারোগার ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছে। বক্তিয়ার খিলিজীর আগমনের পূর্ব্বে দেবপাল জয় অভিযান করিয়াছিলেন, শশাঙ্কের সামরিক শক্তিও বড় কম ছিল না, ইঁহারা পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সাহায্যে লড়িতেন, বাঙালী সৈনিক তাঁহাদের সৈন্যদলে ছিল না এরূপ কথাও হাস্যকর। আজও কাশ্মীর রণাঙ্গনে অফিসারদের মধ্যে বাঙালী আছেন এবং তাঁহারা উত্তম যোগ্যতার পরিচয় দিতেছেন কিন্তু সেখানে বাঙালী সৈনিক নাই। এটা বাঙালীর দোষ নয়, ইংরেজের নিকট হইতে যে মিথ্যা সামরিক তথ্য বর্ত্তমান ভারত-সরকার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন উহাই তাহার জন্য দায়ী। বাংলার নমঃশূদ্র, পোদ, দুলে, বাগ্দী প্রভৃতি শ্রেণী হইতে লোক সংগ্রহ করিলে বাংলায় বিরাট ও সবল সামরিক বাহিনী গড়িয়া উঠিতে পারে। ঝড় জলে বড় বড় নদীবক্ষে মাছ ধরায় ইহারাই বেশী দক্ষ। ইহা হইতে মনে হয় যে চাষবাসের শান্তি-পূর্ণ বৈচিত্র্যহীন জীবন অপেক্ষা বিপৎসঙ্কুল উন্মাদনাপূর্ণ জীবনের প্রতি ইহাদের আকর্ষণ বেশী। সৈনিক এবং নাবিক এই দুইটিই ইহাদের মধ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। দেশরক্ষা সচিব সর্দ্দার বলদেব সিংহ এবং ডাঃ রায়ের গবর্ন্মেণ্ট বাংলায় সামরিক বাহিনী গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এখানে প্রথমেই দশ হাজারের বাহিনী গঠনের আয়োজনও হইতেছে তন্মধ্যে ছয় হাজার ছাত্র ও চার হাজার বাহিরের যুবক লওয়ার কথা। আমাদের মনে হয় বাংলার ঐ সব স্বাভাবিক সামরিক জাতিগুলি হইতে সৈন্যবাহিনী রক্ষী বাহিনী ও লস্কর গঠিত হইলে তাহাদের আয়ের নূতন পথ খুলিয়া যাইবে এবং দেশেরও মঙ্গল হইবে।

আমাদের দেশের যে কোন পরিকল্পনা রচিত হয় তাহাতে মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেদের সরকারী চাকুরীপ্রাপ্তিই প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠে। ইহাতে দেশের স্থায়ী কল্যাণ হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ডাঃ রায়ের গবর্ন্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে বাঙালী তরুণদের নৌবহরের কাজ শিখাইবার জন্য তিনটি নৌ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাদ্বারা সরকারী চাকুরীজীবী অফিসার তৈরি হইবে এটা ঠিক, কিন্তু লস্কর মিলিবে কোথায়? আজও কি ভারতীয় ইউনিয়নকে নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের লস্করদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে? বাঙালী ব্যবসায়ী চাঁদসদাগর এবং আরও অনেক সদাগর সিংহল, ব্রহ্ম ও বোম্বাই উপকূলের সহিত বাণিজ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরাট সদাগরী নৌবহর বাঙালী নাবিক ও লস্করেরা চালাইয়াছে। বাঙালী নাবিকেরাই দুর্দ্ধান্ত পর্ত্তুগীজ জলদস্যু-দের সহিত লড়াই করিয়া নৌবহর রক্ষা করিয়াছে এবং তাহা গন্তব্য স্থলে লইয়া গিয়াছে।

বাঙালীকে সামরিক জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে এবং এত লোককে শিক্ষা দিতে সময় লাগিবে। কিন্তু কাজ এখনই আরম্ভ হওয়া দরকার। আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ

দেওয়া দরকার। বাঙালীকে কাপুরুষ করিয়া তুলিবার আর মস্ত উপায় ছিল অস্ত্র আইনের কঠোরতা। অস্ত্র ধারণে ও অস্ত্র চালনায় বাঙালীকে দক্ষ এবং সাহসী করিয়া তোলা আবশ্যক। শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোকদের অস্ত্রের লাইসেন্স বেশী করিয়া দিলে তবেই এই অযৌক্তিক ভীতি দূর হইবে। কর্তৃপক্ষের একটা ধারণা আছে যে অস্ত্রের লাইসেন্স বাড়াইলেই বুঝি বা দেশে ডাকাতির বান ডাকিবে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সমস্ত সশস্ত্র ডাকাতি হয় বিনা লাইসেন্সের অস্ত্রের সাহায্যে। উপযুক্ত লোকদের অস্ত্র দিলে হঠাৎ একজন বা অল্প কয়েকজন লোক অস্ত্র বাহির করিয়া ডাকাতি বা ট্রেনে রাহাজানি করিতে সাহস পাইবে না।

হায়দরাবাদে পাগলামি

প্রতিপক্ষের মতিগতি, প্রকৃতি না বুঝিলে তাহার সঙ্গে তর্ক করা যায় না বা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণভাবে করিতে পারা যায় না। মুসলিম লীগের সঙ্গে তর্কে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা সেইজন্য হারিয়া গিয়াছেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল বলিয়া পরিচিত যাঁহারা আমাদের মধ্যে ছিলেন বা আছেন, তাঁহারা মুসলিম সমাজের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস-অনুপ্রেরণা সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত পরিচয় দিতে পারেন নাই। চারি কোটি মুসলমান যাঁহারা কোন অবস্থায়ই "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না, তাহারা পাকিস্থান আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছিল কেন, তাহার উত্তর জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ আজ পর্য্যন্ত দিতে পারিতেছেন না। সেইরূপ হায়দরাবাদ রাজ্যে যে পাগলামি চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ দুঃখ প্রকাশ করিতে পারেন, হাজি কাসিম রাজভীর নিন্দা করিতে পারেন, নিজাম ওছমান আলী খানের নিকট শান্ত হইবার জন্য অনুরোধ-উপরোধ প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু নিজাম বাহাদুরের ও তাঁহার চেলাচামুণ্ডাদের মতিগতি, প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত থাকিলে, জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ এইরূপ ভাবে বৃথা শ্রম করিতেন না। নিজাম বাহাদুর ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষিত ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিন প্রতিষ্ঠান—মিলিত মুসলিম দল—কতকগুলি বিশ্বাস বা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন। সেই বিশ্বাস বা কুসংস্কার যত দিন তাহাদের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিবে, তত দিন দাক্ষিণাত্যে শান্তি আসিতে পারে না। এই কথাটা ভারতরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে বুঝিতে হইবে, এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ যাঁহারা নিজাম বাহাদুর ও তাঁহার অনুচরবৃন্দের উন্মত্ত কার্য্যাবলীতে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাস বা কুসংস্কারের মূল কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই তাঁহারা ভারতরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে সৎপরামর্শ দিতে পারিবেন, এবং নিজামবাহাদুরের রোগের প্রকৃত চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

ভারতরাষ্ট্রের অধিকাংশ মুসলমান যে এই বিষয়ে মাথা ঘামাইতে চান না, তাহার প্রমাণ আছে; তাঁহারা তফাতে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে চান। এই মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে আচার্য্য কৃপালনীর প্রস্তাবের প্রতি-উত্তরে। গত ৩১শে চৈত্র "জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড" দিবসের বার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে এক সভা হয়, এবং আচার্য্য কৃপালনী একটি বক্তৃতা দেন। তাহার মধ্যে এই কথাগুলি ছিল: "ভারতীয় মুসলমানদের কর্ত্তব্য দলে দলে হায়দরাবাদে গিয়া সেখানকার মুসলমাদের প্রধান প্রতিষ্ঠান ইত্তেহাদ উল মুসলেমিন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও আতঙ্ক-সৃষ্টির প্রয়াস বন্ধ করা। তাহা না হইলে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের শপথ অর্থহীন হইয়া পড়িবে।" এই কথায় কলিকাতার দুইখানি পাকিস্থানী দৈনিক—ইত্তেহাদ ও আজাদ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। এরূপ উপদেশ নাকি অপমানজনক। স্বাভাবিক বুদ্ধির লোকে মনে করিবে যে হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান না করিয়া কৃপালনীজী যে এই অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা মন্দের ভাল। কিন্তু উল্টা বুঝিলি রাম—পাকিস্থানী মনের এই বিকার কৃপালনীজীর সদুপদেশও বাঁকা চোখে দেখিবে, হিন্দু মুসলমান পৃথক নেশন এই উদ্ভট তত্ত্বের ক্ষেপামি এত শীঘ্র ভোলা যায় না। হাজি কাসিম রাজভী যে কথা প্রচার করিতেছেন তাহা মুসলিম লীগ প্রচারিত তত্ত্বের রূপান্তর বলিয়াই কি পাকিস্থানী মুসলিমগণ ইহার গায়ে হাত দিতে চান না! নতুবা কৃপালনীজীর উপদেশ ত একটা কর্ত্তব্য পালনের পথ বাহির করিয়া দিয়াছে, যে পথে চলিলে দাক্ষিণাত্যে শান্তি আসিবে। এই পথে ঠিক ভাবে চলিতে হইলে হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসকসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসক (নিজাম বাহাদুর) ও তাঁহার সিংহাসন রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব ও সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রতিভূ ও ধারক মাত্র; সেই প্রভুত্ব ও অধিকার চিরকাল অটুট থাকিবে। এই প্রয়োজনেই শাসনব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সময়ও নিজাম বাহাদুরের প্রভাব ও বিধিদত্ত অধিকার অব্যাহত রাখিতে হইবে। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া রাজ্যের মুসলমানগণ যে অধিকার ও সুবিধা রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না। প্রায় একুশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৭ সনে যখন ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিন প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে তখন ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ইসলাম ধর্ম্ম-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ মৌলানা আবদুর কাদের সিদ্দিকির সভাপতিত্বে এক সভায় এই তত্ত্ব প্রচারিত হয়। এই একুশ বৎসরে তাহা দানা বাঁধিয়া যে রাজনীতিক রূপ ধারণ করিয়াছে,

তাহা এই সমিতির নিম্নলিখিত ঘোষণায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(1) Monarchy must rule over Hyderabad and be sovereign. The ruler must be a descendant of the Asaf Jahi Dynasty only.
(2) If any change in the constitutional governance of Hyderabad becomes inevitable, nothing which will prejudice the traditional political superiority of Muslims should be done.
(3) Muslims must be in a majority both in the Local Self-Government bodies and in the Legislature.
(5) Urdu must be the official language of the State.
(6) The problem of State srevices being interlinked with the political and cultural superiority of the Muslims and their economic interest, division of the same in proportion to the population is out of the question.

হায়দরাবাদ রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা শতকরা পনর-কুড়ি জনের বেশী নয়; ১ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে ২৫-৩০ লক্ষ। রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়াইবার জন্য শাসক সম্প্রদায়ের চেষ্টার অন্ত নাই। সুদূর দক্ষিণ আরব দেশ হইতে একদল লোক ত আজ দুই শত বৎসর হইতে "বাদশাহী জাতের" পদ লাভ করিয়াছে; দুনিয়ার অগণিত মুসলমান ভাগ্যান্বেষী হায়দরাবাদ রাজ্যে আশ্রয় পায় এবং "নবাবী" করে। এই দাবীদাওয়ার সঙ্গে রাজ্যের অধিকাংশ নরনারীর, ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের, কোন সম্মতি নাই। এই ১ কোটি ৩০ লক্ষের মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক তেলুগু ভাষাভাষী; ৪০ লক্ষ লোক মারাঠী ভাষাভাষী, এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক কানাড়ি ভাষাভাষী। এই অবস্থায় উর্দ্দু ভাষাকে রাজকীয় ভাষা করিবার মধ্যে একটা জোর-জবরদস্তি ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনীতিক প্রাধান্যের জন্য এরূপ একটা মনোবিকারের পরিচয় পাওয়া যায় যাহার লজ্জাজনক প্রকাশ সচরাচর দেখা যায় না। এই মনোবিকারই হায়দরাবাদ রাজ্যে সংঘর্ষের মূল কারণ।

ভারতরাষ্ট্রের আয়ব্যয়ের এক দিক

ভারতরাষ্ট্রের জনসমষ্টির বাৎসরিক আয় মোটামুটি ভাবে ধার্য্য হইয়াছে ৪,৫০০ কোটি টাকায়। এই টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় ত্রিশ-বত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে—প্রাসাদ-বাসী রাজা মহারাজা শেঠ ও পর্ণকুটিরবাসী এই আয়ের অংশ লইয়া বিলাসিতা ও ক্ষুন্নিবৃত্তির উপকরণ সংগ্রহ করে। কার ভাগে কি পড়ে তাহার হিসাবও একটা আছে। এই আয় হইতে রাষ্ট্রের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার ব্যয়—বহন করিতে হয়। একটিমাত্র খরচের বহর দেখিলে তৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় ছিল প্রায় ৫৪।৫৫ কোটি টাকা; অন্যান্য খাতেও এই সামরিক ব্যয় কিছু কিছু ঢুকাইয়া দেওয়া হইত। মোট প্রায় ৬০ কোটি টাকা ছিল। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ছিল প্রায় ১০৪।৫ কোটি টাকা। আজ সেই আয় ও ব্যয় গিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার তিন গুণে। সামরিক ব্যয় বাবদ ১৩৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে ১৯৪৮-৪৯ সনে। এই ব্যয় সংক্ষেপ করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে কোন চেষ্টা হয় নাই।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে যে আলোচনা হয়, সেই উপলক্ষে কোন কোন সদস্য অপব্যয় সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীশিব রাও তর্ক তুলেন যে সৈন্য বিভাগের খাতে দেখান হইয়াছে ঘাস জমির জন্য ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার একটা ব্যয়। আজ মোটর গাড়ীর ব্যবহারে এই ঘাসের জমির প্রয়োজন শেষ হইয়াছে বা তাহার প্রয়োজন কমিয়াছে; এবং এই ব্যয়ের ব্যবস্থাও অবান্তর হইয়া পড়িয়াছে। এই উদাহরণ হইতে সামরিক বিভাগের দরাজ হাতে ব্যয়ের একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় অর্থসচিব শ্রীসমুখম চেট্টি ক্ষমতা হাতে পাইয়াও ইহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের বিভাগেই যুদ্ধের পূর্ব্বে উচ্চপদের কর্ম্মচারী সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৩ জন; আজ তাহা ২৪৬ জন। বাণিজ্য বিভাগে ছিল ১১ জন, আজ তাহা ৯৫ জন। সর্দ্দার প্যাটেল যে বিভাগের কর্ত্তা, তাহাতে এরূপ বৃদ্ধি দেখা যায় না; পূর্ব্বে ছিল ৫৬ জন, আজ হইয়াছে ৬৫ জন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় এরূপ আলোচনা যদি শ্রীসমুখম চেট্টিকে ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে একটু সচেতন করে তবে আমরা করদাতারা তৃপ্তিলাভ করিব। বেশী দিন এরূপ অপব্যয় লোকে সহ্য করিবে না।

ধনকুবের ও সরকারী ট্যাক্স

শ্রীসমুখম চেট্টি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব। তাঁহার সম্বন্ধে রাজনীতিক মহলে একটা বিরূপ ধারণা আছে। সাম্য-বাদের যুগে তাঁহার মতন লক্ষপতিকে কেন্দ্রীয় অর্থসচিব করিবার জন্য শ্রীজবাহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নিন্দাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু গত ১১ই চৈত্র কেন্দ্রীয় আইন-সভায় আয় ব্যয় সম্পর্কে নানা আলোচনার উত্তরে তিনি একটা হক কথা বলিয়াছেন।

> "যে সৎলোক নিজের দেয় ট্যাক্স ঠিক ঠিক ভাবে দেয়, সে কখনও ধনকুবের হইতে পারে না। আমাদের দেশে লোকে ধনকুবের হইতে পারে অসদুপায় অবলম্বন করিয়া। এই নৈতিক অবনতি একটা পৃথক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সকলের চিন্তা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।"

১৯৪৫ সনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু আহমদনগর দুর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন যে কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের রাস্তায় রাস্তায় যে বাতিদানের ব্যবস্থা আছে সেই স্তম্ভে ঝুলাইয়া দিলে ইহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আজ কুড়ি মাস তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা অল্প-বিস্তর লাভ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে এই রক্ত-শোষক শ্রেণীর কাহাকেও পণ্ডিতজীর মতানুসারে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। তাঁহার অর্থসচিব ইহাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সকলের পরিচিত করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবাসীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইংরেজ বিশেষজ্ঞ

দিল্লী হইতে ১লা বৈশাখে প্রেরিত নিম্নলিখিত সংবাদটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে :—

"গত আগষ্ট হইতে এ বৎসর (১৯৪৮ সন) মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৪,৫০০ জন ইংরেজকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (শিল্প) গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতবর্ষে এই সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কারিগর, যান্ত্রিক এবং বাণিজ্য-শিল্পী রহিয়াছে।...

"ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৩১৫ জন বিশেষজ্ঞ, ১১৬৮ জন শ্রেষ্ঠ কারিগর এবং ৪,০৪৩ জন নিম্নস্তরের কারিগর প্রয়োজন।"

এই সংবাদ পড়িয়া যে কয়েকটি প্রশ্ন মনে উদয় হইল, তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। যে সব পুঁজিপতি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা এই ৪,৫০০ জন ইংরেজ আমদানী করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই ভারতবাসী। হঠাৎ ইঁহাদের ইংরেজ-প্রীতি উথলিয়া উঠিল বলিয়া মনে করা কঠিন; ইঁহারা কি ভারতবর্ষে এই বিশেষজ্ঞদের মত লোক পাইলেন না বলিয়াই এই লোকদের নিযুক্ত করিয়াছেন? কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট নিশ্চয়ই এই সংবাদ রাখেন। এই সম্বন্ধে তাঁহাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। কারণ সংবাদটির অন্য অংশে দুইটি মন্তব্য আছে, যাহা প্রণিধানযোগ্য—"যে সমস্ত ভারতবাসী কারিগর বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদিগকে কাজ না দিয়া ইউরোপীয় কারিগরদের নিয়োগ করিতেছে।"

"সরকারী মহল মনে করেন ভারতীয় শিল্পপতিরা যদি ভারতীয় কারিগরদের উপযুক্ত কাজ না দেন, তাহা হইলে বিদেশী কারিগরের উপর নির্ভর করার অভ্যাস কমিবে না।"

এই দুইটি মন্তব্য পড়িয়া মনে হয় যে কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের শিল্পবিভাগীয় মন্ত্রীর নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়া প্রয়োজন। তাঁহার অনুমতি ছাড়া কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এবং নানা শিল্পের নানা বিভাগে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই একটা নিয়ম আছে। দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদে এই সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। আর বেশী দিন দেশের লোকে ইহা সহ্য করিবে না যে, ভারতবর্ষে শিল্প-প্রতিষ্ঠা হইবে অথচ তাহার পরিচালনে ভারতবাসী যোগ্য পদ ও অবসর পাইবে না। "সরকারী মহল" কেবল দুঃখ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারিবেন না। শিল্পপতিদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া রাখিতে হইবে। আজ যখন রাষ্ট্রের উপর শিল্পপতিদের নানা ভাবে নির্ভর করিতে হয়, তখন তাঁহারা রাষ্ট্রের নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। ভারতীয়-করণ ও জাতীয়-করণ আজ ভারতরাষ্ট্রের নীতি। সেই নীতি রক্ষা করিতে হইলে দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

মার্কিন মুলুকে 'সাজ সাজ' রব

মার্কিন মুলুকে "সাজ সাজ" রব উঠিয়াছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন দেখিতেছি। দেশের ব্যবস্থাপক সভার সেনেট ও কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে সাময়িকভাবে দেশে সার্ব্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে; দেশ-রক্ষা বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করিতে হইবে, এবং ১৯ হইতে ২৫ বৎসর বয়সের স্ত্রী-পুরুষকে এই রক্ষি-বাহিনীতে যোগদান করিতে হইবে যদি তাহারা কোন কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকে। এই প্রস্তাব-ত্রয়ের স্বপক্ষে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এই যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন: "ইউরোপ খণ্ডের দেশসমূহ আজ বিধ্বস্ত ও দুর্ব্বল। কম্যুনিজম তাহাদের উপর আক্রমণোদ্যত। এই কম্যুনিজমের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আজ আমাদের মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এক কথায় ইহাকে বর্ণনা করা যায়—ইহা পুলিস রাজ; রাষ্ট্রের দণ্ড সর্ব্বদাই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে দাবাইয়া রাখিতেছে এবং এক কল্পিত শ্রেণী-বিহীন রাষ্ট্রের নামে এক বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এই বিপদে মার্কিন দেশের কর্ত্তব্য স্পষ্ট—তাহাকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে; সর্ব্বদা তাহার ক্ষাত্র-শক্তি সুসজ্জিত ও সুসম্বদ্ধ রাখিতে হইবে।" প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এই ঘোষণার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোকের মনে আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রস্তুতি সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট। যে কারণেই হউক এই ধারণা সৃষ্ট হইয়াছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের নেতৃত্বে দুনিয়ার নানা দেশে ধ্বংসমূলক কার্য্য চলিতেছে; সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহার আশ্রিত ও বশংবদ রাষ্ট্রগুলির সাহায্যে তাহার প্রভাব ইউরোপ খণ্ডে বিস্তার করিতে দৃঢ়সংকল্প। এই সংকল্পে বাধা দিতে, এবং এই কার্য্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ যদি কম্যুনিজমের প্রভাব প্রতিপত্তি এই ভাবে প্রসারিত করিতে দেওয়া হয় তবে ব্যক্তির স্বাধীনতা সর্ব্ব দেশে ক্ষুণ্ণ হইবে।

বর্ত্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দুই পক্ষই পরস্পর পরস্পরকে দোষ দিতেছে। সোভিয়েট পক্ষীয়েরা বলিতেছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ধনে-জনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সামরিক শক্তির বলে আজ দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব স্থাপন ও বিস্তার করিবার দুরাশা পোষণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে তাহাদের এরূপ কোন দুরাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহারা শুধু সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিশ্বজয়ের অভিযানকে ঠেকাইয়া রাখিতে চায়। এই অভিযানের প্রকৃতি জার্ম্মানীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। পট্সড্যাম নামক বার্লিনের উপনগরীতে ১৯৪৫ সনের মে মাসে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সোভিয়েট রাষ্ট্র পদে পদে তাহা লঙ্ঘন করিয়াছে। জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক কাঠামো অটুট রাখিবার

প্রতিশ্রুতি তাহার মধ্যে অন্যতম—সেকসন্ ৩, বি ১৪ ধারামতে এইরূপ অঙ্গীকৃত হইয়াছিল। সোভিয়েট রাষ্ট্র পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তাহার সঙ্গে আমেরিকা, ব্রিটিশ ও ফরাসী-অধিকৃত জার্ম্মানীর সঙ্গে কোন সঙ্গতি নাই। সেকসন ৩, বি—১৫ (সি) ধারামতে সোভিয়েট রাষ্ট্র অঙ্গীকার করিয়াছিল যে "প্রত্যেক অধিকৃত অঞ্চল হইতে এরূপ ভাবে মালপত্র, শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের আদান প্রদান করিতে হইবে যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানী যথাসম্ভব কম করিতে হইবে।" সোভিয়েট রাষ্ট্র এই বিধান ভঙ্গ করিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে জার্ম্মানীর শিল্প-প্রস্তুতির কলকারখানা ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ বিজয়ী রাষ্ট্র-মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইবে। জার্ম্মানীর পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্র অনেক কলকারখানা সরাইয়াছে যাহা এই নিয়ম বিরুদ্ধ।

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাষ্ট্র উতোর গাইতেছে এবং দুই পক্ষের তর্কের ধূম্রজাল ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্থান সংকীর্ণ, সেখানে একনায়কত্ব অপ্রতিহত। এই বিপদ আজ বিশ্বব্যাপী সমস্যায় পরিণত হইয়াছে, এবং আমাদের রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণকল্পে এই বিপদকে একেবারে তুচ্ছ করা যায় না। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু আজ এই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার। তাঁহার বিভিন্ন ঘোষণা পড়িয়া মনে হয় যে আমরা তফাতে দাঁড়াইয়া এই বিপদ সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীন থাকিতে পারিব। সোভিয়েট রাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্বে এই প্রকার মনোভাব সম্ভব কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়াছে। বলা হইতেছে যে আমাদের একপক্ষ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। সে কোন্ পক্ষ? হঠাৎ, শেষ মুহূর্ত্তে তাহা স্থির করা কি সম্ভব? এবং বেশী দিন এই দ্বিধার ভাবের প্রশ্রয় দিলে কি আমাদের রাষ্ট্রের স্বার্থ হানি হইবে না? অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে বিশ্বজগৎ ১৯৩৮-'৩৯ সনের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতেছে। সেই দুই বৎসরে চেকো-শ্লোভাকিয়ার ভাগ্যবিড়ম্বনা আরম্ভ হইয়া দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। দশ বৎসর পরে সেই চেকো-শ্লোভাকিয়ার ভাগ্য লইয়া আবার কৌতুক আরম্ভ হইয়াছে।

কম্যুনিজমের শতবার্ষিকী

একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রায় এই মাসে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এন্জেল্স কম্যুনিষ্ট প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। সেই প্রচারপত্রের মুখবন্ধে বিদ্রোহের আহ্বান ছিল।

> "এক অশরীরী ক্ষোভ ইউরোপের আকাশ বাতাসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে; সেই ক্ষোভ ভাষা পাইবার চেষ্টা করিতেছে এই প্রচারপত্রে; সেই ক্ষোভ সংহত হইতেছে কম্যুনিষ্ট সংঘে। এই ক্ষোভ ও সংঘকে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য ইউরোপখণ্ডের সব প্রাচীনপন্থী শক্তি সংঘবদ্ধ হইতেছে। রোমের পোপ, রাশিয়ার জার, অষ্ট্রিয়ার মেট্টারনিক, ফ্রান্সের গিজো, ও জার্ম্মানীর পুলিস ও গোয়েন্দা, ফ্রান্সের উগ্র উদারনৈতিকগণ দল বাঁধিয়া প্রস্তুত হইতেছে।"

এক শত বৎসরের মধ্যে কম্যুনিষ্ট ভাব ও আদর্শ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জারের রাশিয়া আজ কম্যুনিষ্ট দলের শাসনব্যবস্থার দাপটে নূতন সাম্রাজ্যবাদের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই দলের এক নূতন বিশ্বাসের ধারকরূপে যে দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল, এক শত বৎসর পূর্ব্বেও তাহার মধ্যে মানুষের নৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না; ব্যষ্টির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটা আক্রোশের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কারণ যুগে যুগে এই ব্যষ্টি নিজকে বঞ্চিত হইতে দিয়াছে এবং নিজে জনগণকে বঞ্চনা করিয়াছে। এই ব্যষ্টির নৈতিক বোধ-শক্তির উপর শ্রদ্ধা থাকিলে কম্যুনিজম এতটা নিষ্ঠুর হইতে পারিত না, নির্ম্মম হস্তে এরূপভাবে দুই কোটি লোককে ধ্বংস করিতে পারিত না যেমন করিয়াছিল ১৯১৭ সন হইতে ১৯২৭ সনের, এই দশ বৎসরের মধ্যে। এই নিষ্ঠুরতার পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে তার ফলে শত কোটি লোকের শরীর-মন মুক্ত হইয়াছে; এবং এই মুক্ত মানুষ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করিতেছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে চলিয়াছে সংহারলীলা। কার্ল মার্কস বলিয়াছিলেন, "নিষ্ঠুরভাবে সকল সমাজব্যবস্থা ও চিন্তাপ্রণালীর দোষ উদ্ঘাটন করিতে হইবে।" কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার প্রতি উত্তরে যে আক্রোশের সৃষ্টি হয়, তাহা ত আজ লুকাইয়া রাখিবার উপায় নাই। কার্ল মার্কস এক শত বৎসর পূর্ব্বে পোপ ও জারের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগোষ্ঠী আজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ধনিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতেছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহারা ত নূতন কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। হিংসার প্রতিদানে হিংসাই বাড়িয়া চলিয়াছে। মানবপ্রকৃতি ক্যমুনিজমের কল্যাণে ত কোন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন লাভ করিতে পারিল না।

"উদ্বোধন" পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী

১৩০৫ সালের ১লা মাঘ স্বামী বিবেকানন্দ কল্পিত ও স্বামী ত্রিগুণাতীত সম্পাদিত এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। গত মাসে ইহার ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যার আয়োজন করিয়া স্বামী সুন্দরানন্দ বর্ত্তমান যুগের পাঠকবর্গের নিকট পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা পরিচয় দিয়াছেন। বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ লেখকগণ এই বিশেষ সংখ্যায় তাঁহাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ত্তমান ও অতীত যুগের অনেক সমস্যার কথা আলোচনা করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক পল্লীবাসী ব্রাহ্মণের দেহ অবলম্বন করিয়া ভারতের ভাগ্য-বিধাতা এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, এই কথা জগদ্‌বিদিত। ফেরঙ্গ সভ্যতা সাধনার, শাসনের ও শোষণের চাপে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা তখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, ফেরঙ্গ ভাবধারায় যখন আমাদের পূর্ব্বজগণ অকূলে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তখন দেশের হৃদয়-মন নিশ্চেষ্ট ছিল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। "ইয়ং বেঙ্গল" "ইয়ং বোম্বাই" নূতন উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল সত্য কিন্তু সে সময়েও ভারতপন্থী, আত্মবিশ্বাসী লোক অপ্রতুল ছিলেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় যে "তত্ত্ববোধিনী" গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই উপনিষৎ সাধনার ধারকগণ তাঁহার প্রমাণ। শুনিয়াছি "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা হিন্দি, উর্দ্দু, তেলুগু, তামিল ও মরাঠি ভাষার মাধ্যমেও প্রচারিত হইত। এইরূপ প্রচারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দেশে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, তার মধ্যে আমরা পাই কেশবচন্দ্র সেনকে, বঙ্কিমচন্দ্রকে, সর সৈয়দ আহম্মদকে, আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দকে, থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটিকে।

এই সময়েই পরমহংসদেব প্রায় অলক্ষ্যে ভারতবর্ষের নব সংগঠনে আসিয়া যোগদান করিলেন; এটর্নির পুত্র নরেন্দ্র নাথ নিলেন সন্ন্যাস কিন্তু ভারতবর্ষে করিলেন রজোগুণের ক্ষাত্র ভাবের প্রবর্ত্তন। ইহার প্রেরণা তিনি পাইয়াছিলেন কামারপুকুরের এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণের নিকটে।

"উদ্বোধন" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা "পাঁচ মিশালীর" ভাণ্ডার করিতে গিয়া পাঠকবর্গের এ বিষয়ে আশা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। যে সংস্কৃতি ও সাধনার তিনি ধারক উনবিংশ শতাব্দীর ভারত ইতিহাসে তাহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তুলনামূলক সমালোচনায় তাহা নির্ণীত হইতে পারে। এরূপ আলোচনার চেষ্টা বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা খুব কমই পাইলাম। স্বামী বিবেকানন্দ যে শক্তির আধার ও কেন্দ্র ছিলেন, তাহার রূপ ও গতিপ্রকৃতি কতটা উনবিংশতির ভাব-সংঘাতের সৃষ্টি, কতটা পরমহংসদেবের সঙ্গগুণের ফল, তাহা না বুঝিলে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্ভব ও কর্ম্মপ্রবাহের প্রকৃত মাহাত্ম্য নির্ণয় করা সহজ নয়।

আমাদের অতৃপ্তির কারণ বলিলাম। তৃপ্তি যাহা পাইয়াছি তাহাও বলা উচিত। "উদ্বোধনের" প্রথম সংখ্যায় বিবেকানন্দ যে প্রবন্ধ লিখেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদক মহাশয় আমাদের এক বিরাট্ পুরুষের সম্মুখীন করিয়াছেন; বাংলা ভাষা তাঁহার হাতে খড়্গের মতন খেলা করিয়াছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের নিবেদিতা-চরিত-কথা সুলিখিত; তাঁহারা এই আইরিশ তনয়ার ভারত-ভক্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন অনবদ্য ভাষায়। কিন্তু নিবেদিতার যোদ্ধৃভাব এক বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলনে তাঁহার সহযোগিতার কথা আজও অনুক্ত রহিয়া গেল। "ভারতের মর্ম্মবাণী" প্রবন্ধে যে আদর্শের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই জগতের রক্ষার একমাত্র উপায়। নচিকেতার উপাখ্যান একটা সাধনার ইতিহাস—ব্যক্তির নয়; একটা জাতির।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

একজন চিন্তানায়ক ও সংগঠক মরজগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। পরিণত বয়সে—৮৫ বৎসর বয়সে—তাঁহার তিরোধান হইল। গত পঁচিশ বৎসর তিনি কাশীবাস করিতেছিলেন, এবং কাশীতেই তাঁহার দেহরক্ষা হইল। বর্ত্তমান যুগের কম বাঙালীই সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কর্ম্মকথা জানেন। কারণ তিনি পলিটিশিয়ান ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেইরূপ স্রষ্টা যাঁহাদের কর্ম্মফলে সমাজজীবনে যে নবজীবনের নানা শক্তির উদ্ভব হয়, যাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিকগণ জনগণের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তি দান করেন, তাদের দুর্গতিমোচনে চেষ্টা করেন। সতীশচন্দ্র সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যখন ভারতবর্ষের চিন্তাজগতে আত্মসম্মানবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে, যখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপুলন্‌কার, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও আলীগড়ের সৈয়দ আহম্মদ নূতন চিন্তাধারা ও নূতন কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন তিনি এবং ইঁহারা যে নব-ভারতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার সেবায় এই আজীবন ব্রহ্মচারী নীরবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনামূলক সমালোচনা করিবার সাহস সতীশচন্দ্রের ছিল এবং এই সমালোচনার যন্ত্র ছিল "ডন" (Dawn) নামক পত্রিকা। এই পত্রিকার সাহায্যে দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ থাকিত। সতীশচন্দ্রের কাজ অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে, সেই যুগের ছাত্রসমাজে শ্রেষ্ঠ জনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাঁহার শিষ্যেরাই গবেষকরূপে ভারত ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই "জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ" সংগঠনে অগ্রণী ছিলেন। সেই পরিষদের নানা কল্পনার ভগ্নাংশ আমরা আজ দেখিতে পাই যাদবপুর বিজ্ঞান কলেজে। ১৯১২ সনের পরে সতীশচন্দ্র কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যে আদর্শের প্রেরণায় তিনি ভাব, চিন্তা ও কর্ম্মে সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহা ফুটিবার আয়োজন তিনি দেখিয়া গেলেন। এই সান্ত্বনা তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তকে দীপ্ত করিয়াছিল।

নঈ তালিম

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

পশ্চিম বঙ্গ সরকার বহু আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন; দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন রহিয়াছে ইহার পিছনে। রাজনৈতিক জীবনের নূতন পরিপ্রেক্ষিতে নূতন সমাজ ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে নূতন আদর্শ ও উদ্যমের প্রয়োজন। বহু দিনের শোষিত নিপীড়িত নবজাগ্রত দেশে জাতির জাগরণকে কল্যাণকর ধারায় প্রবাহিত করিতে, দেশকে অর্থে সম্পদে, জ্ঞানে গৌরবে মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে যোগ্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন আবশ্যক। লোকায়ত্ত গবর্ণমেণ্ট জনগণের মঙ্গলের প্রতি অবহিত হইয়াছেন, ইহা এক বিপুল সম্ভাবনাময় নবযুগের সূচনা করিতেছে।

স্বাধীন পশ্চিম বাংলার প্রথম মন্ত্রিসভা অর্থাৎ ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অচলায়তনে নাড়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহারা বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার আয়োজন হিসাবে শিক্ষকের বনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা সুরু হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীকর্তৃক পরিকল্পিত বনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি মুসলিম লীগের শাসনকালে বাংলাদেশে গৃহীত হয় নাই। ভারতের কংগ্রেসশাসিত প্রদেশসমূহে ইহার পরীক্ষামূলক প্রবর্তন হইয়াছিল। তাহার ফলাফল দেখিয়া এই নূতন শিক্ষাপ্রণালীর দোষগুণ বিচার করিতে হইবে। বাংলাদেশে বনিয়াদী শিক্ষা সরকারীভাবে গৃহীত না হওয়ায় ইহার প্রতি এত দিন জনসাধারণের খুব বেশী কৌতূহল জাগ্রত হয় নাই। বর্তমানে যখন এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আয়োজন হইতেছে তখন ইহার স্বরূপ কি এবং অন্যান্য প্রদেশে ইহাতে কিরূপ সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা জানা দরকার।

আমাদের বন্ধ্যা প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিকারকল্পে বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভব। শিক্ষার এই বন্ধ্যাত্ব ও ব্যর্থতার প্রধান কারণ—ইহার মধ্যে দেশের পক্ষে কল্যাণকর—মানুষ তৈয়ার করার উপযোগী কোন বলিষ্ঠ আদর্শ নাই; দ্বিতীয় কারণ—অর্থাভাবে প্রাথমিক শিক্ষা এতদিন নিদারুণভাবে অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলভিত্তি যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর এই পরম সত্যটি উপেক্ষিত হওয়ায় শিক্ষা-ইমারতের বনিয়াদ কাঁচা গাঁথুনি দিয়া বালুর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গম্বুজে শ্বেত পাথরের উপর মীনা এবং চুনির কাজ করার প্রয়াস চলিয়াছে। সার্থক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান অন্তরায়—অর্থাভাব ও আদর্শের অভাব। গান্ধীজী বাস্তব কর্মপ্রণালীর মধ্য দিয়া এই অভাব দুটি দূর করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ মহাত্মাজীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে জড়িত। তিনি গড়িয়া তুলিতে চান সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্বাধীন, সবল সুস্থ, কর্মক্ষম নাগরিকদের—যাহারা পারস্পরিক সহযোগিতায় শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ রচনা করিবে, নিজেদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া জীবনকে শ্রীমণ্ডিত ও দেশকে সম্পদভূষিত করিবে। গান্ধীজীর সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শ এই নূতন শিক্ষার ভিতর দিয়া তিনি রূপায়িত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

বনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, কোন শিল্পকাজের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা। ইহাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলিলে ভুল করা হইবে। সাত বৎসরের জন্য যে পাঠক্রম নির্ধারিত হইয়াছে তাহাতে ইতিহাস, ভূগোল, ব্যবহারিক গণিত, মাতৃভাষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান প্রবেশিকা-মানের বেশী ছাড়া কম হইবে না; ইংরেজীর পরিবর্তে ছাত্রগণ হিন্দী শিখিবে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়, নিছক জ্ঞানবারিপায়ী অপেক্ষা স্বচেষ্টায় সক্রিয় শিক্ষাগ্রহণকারী বিদ্যার্থী যে মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর উপর অধিকতর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত তাহা শিক্ষাবিদ্‌গণকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। শিশুকে বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য; তাহার মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি ও ব্যবহারিক কাজে পটুতা অর্জন করাও শিক্ষার অন্তর্গত। এদেশে শিক্ষিত-মহলে কায়িক শ্রমকে অবজ্ঞা করিয়া মানসিক শ্রমকে উচ্চ স্থান দেওয়ার ফলে যে ভ্রান্ত ও অকল্যাণকর আত্মাভিমানের সৃষ্টি হইয়াছে গান্ধীজী তাহা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে নঈ তালিম তাঁহার সহায়ক।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে বনিয়াদী শিক্ষার স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতিগ্রহণ পরিকল্পনা-রচয়িতার বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশের—ব্রিটেনের—শিক্ষা-কাঠামোর অনুকরণে যে শিক্ষাসৌধের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা চিন্তায় সুখকর হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার

হিসাবমত বাংলাদেশের শিক্ষার বার্ষিক খরচ ধরা হইয়াছে ৫৭ কোটি টাকা, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৪০ কোটি। যেখানে শিক্ষা বাবদ ৩ কোটি টাকার কম খরচ হইতেছে সেখানে ৫৭ কোটি খরচ বরাদ্দ ধরিলে জনসাধারণের বা রাষ্ট্রের আয়ের পরিমাণ শুধু শিক্ষার জন্যই ১৯ গুণ বাড়াইতে হয়। ইহা ছাড়াও জাতিগঠনের, দেশরক্ষার, এবং দেশের ধন-সম্পদবৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় আরও কত বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। স্বর্গের অমৃতফল আর পারিজাত-মন্দার কুসুমের জন্য উর্দ্ধমুখে প্রতীক্ষা করিয়া না থাকিয়া মহাত্মাজী নিজের কুটিরসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে দেশী ফলফুলের আবাদ করার পক্ষপাতী। তিনি বলিয়াছেন: আমার মধ্যে ভাববিলাসীর সঙ্গে একজন বাস্তববাদী মানুষও রহিয়াছে। নিজের জীবন-দর্শনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি বালকবালিকার প্রাথমিক শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের পথ নির্দ্দেশ তিনি করিয়াছেন। অর্থাভাবের দরুন শিক্ষাব্যবস্থা অচল থাকিবে ইহা তিনি মানিয়া লইতে রাজী নন।

গান্ধীজী প্রস্তাবিত মূলনীতি অবলম্বন করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদগণ যে শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠক্রম রচনা করিয়াছেন তাহা বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হয় এবং শিক্ষকের শিক্ষণ ও ছাত্রদের নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সুরু হয়। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে অর্থাৎ কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলে আমলাতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বনিয়াদী শিক্ষা সরকারের সহানুভূতি ও সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হয়। কোন কোন স্থানে সরকার বনিয়াদী বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিলেও জনসাধারণ নিজেদের চেষ্টায় তাহা চালু রাখে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থিত একটি রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বনিয়াদী শিক্ষার ভাগ্যে অনুগ্রহ-নিগ্রহ, আদর-উপেক্ষা উভয়ই জুটিয়াছে। পরিকল্পনা-রচয়িতার ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য ইহার পক্ষে প্রথমে অনুকূল পরিবেশ রচিত হইলেও নূতন শিক্ষা-প্রণালীকে নিজের প্রাণশক্তি ও গুণাবলীর উপর নির্ভর করিয়া অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দিল্লীতে বনিয়াদী শিক্ষার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার উদ্বোধন করেন এবং সভাপতিত্ব করেন ডক্টর জাকির হোসেন। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, কাশ্মীর এবং বেসরকারী বনিয়াদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে এক শতের অধিক শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদ্ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। তিন দিনব্যাপী অধিবেশন চলে; প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্য, শিল্পকার্য্যের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সংযোগ সাধনের উপায় ও শিক্ষকের শিক্ষণ। নিম্নলিখিত মন্তব্যটি সম্মেলনে গৃহীত হয়,—

"গবর্ণমেণ্ট এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় যে সকল বনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে তাহাদের বিবরণীতে প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে যে, ছাত্রদের সাধারণ স্বাস্থ্য, আচরণ এবং শিক্ষার উন্নতি আশাপ্রদ। বনিয়াদী শিক্ষালয়ের ছাত্রগণ অধিকতর কার্য্য-ক্ষম, প্রফুল্ল, আত্মনির্ভরশীল; তাহাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, সহযোগিতামূলক অভ্যাসে তাহারা অভ্যস্ত হইতেছে এবং সামাজিক কুসংস্কার ভাঙিয়া পড়িতেছে। নূতন আদর্শ এবং নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার প্রথম অবস্থার অসুবিধাগুলি বিবেচনা করিলে ভবিষ্যতে ইহা হইতে আরও অধিকতর সুফল লাভের আশা করা যায়।

একটি বনিয়াদী শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সমিতি বিহারে ২৭টি বনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ছাত্রদের নৈতিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতির মাত্রা নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তাহাদের বিবরণ চিত্তাকর্ষক। বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যে সকল গুণের স্ফুরণ আশা করা যায় বলিয়া তাহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে এই নূতন শিক্ষার স্বরূপ অনেকখানি বুঝা যাইবে।

বনিয়াদী শিক্ষার প্রথম ফল হইবে হস্তশিল্পে ছাত্রের নিপুণতা, তাহার ক্রিয়াকুশলতা বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় ফল—উপর হইতে চাপানো শৃঙ্খলাবোধের পরিবর্ত্তে কাজের মধ্য দিয়া শৃঙ্খলা-জ্ঞানের পরিস্ফুরণ; তৃতীয় ফল—বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ; চতুর্থ ফল—সপ্রতিভ ও সক্রিয় অভ্যাসগঠন। আলস্য পরিহার করিয়া ছাত্রগণ দৈহিক এবং মানসিক শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া উঠিবে; পঞ্চম ফল—সুশৃঙ্খলভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাজ করিবার অভ্যাস; ষষ্ঠ ফল—কাজে আনন্দলাভ করিবার ক্ষমতা; সপ্তম ফল—কৌতূহল জাগ্রত করা, অনুসন্ধিৎসা এবং পর্য্যবেক্ষণশক্তি বাড়ানো; অষ্টম ফল—ছাত্রদের সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা; নবম ফল—সহযোগিতা ও সেবার অনুপ্রেরণা লাভ।

বিশেষজ্ঞ সমিতি বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে উল্লিখিত গুণের অধিকাংশই দেখিতে পাইয়াছেন—কোনটি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কোনটি সবে সুরু হইয়াছে। তাঁহাদের মতে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, সুশৃঙ্খল সপ্রতিভ আচরণ ও কথাবার্ত্তা বলা—এ সব বিষয়ে বনিয়াদী

বিদ্যালয়ের ছাত্র সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্র অপেক্ষা অনেক অগ্রসর।

পাটনা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া থানায় বনিয়াদী এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অধীত বিদ্যার তুলনামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। উভয়বিধ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ চার বৎসর কাল একই রকম পরিবেশে, শুধু ভিন্ন পদ্ধতিতে, শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। পরীক্ষার বিষয় ছিল সাহিত্য পাঠ, লিখন, গণিত, সামাজিক পাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। পরীক্ষক তাঁহার বিবরণীর উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

"আমার পর্যবেক্ষণ হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, একই অঞ্চলের ছাত্রগণ বনিয়াদী বিদ্যালয়ে চার বৎসরে যাহা শিক্ষা করিয়াছে তাহা সেখানকার সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক বেশী। মৌখিক পাঠ, প্রাথমিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি ও সামাজিক পাঠ বিষয়ে এই অগ্রগতি আরও অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে।"

আগষ্ট আন্দোলনের পর কারাগারের বাহিরে আসিয়া গান্ধীজী বনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগ-ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিলেন। বালক-বালিকা উভয়ের শিক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন তাহা শুধু শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া শিশুর অশিক্ষিত পিতামাতাকে জ্ঞানালোক দানের দায়িত্বও তাহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

"আমাদের বর্তমান সাফল্যেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব না। শিশুদিগের গৃহে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে; তাহাদের পিতামাতাকে শিক্ষিত করিতে হইবে। বনিয়াদী শিক্ষাকে প্রকৃতই সমগ্র জীবনের শিক্ষা হইতে হইবে।… এখন ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের মধ্যেই আমাদের এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়; নঈ তালিম বা নূতন শিক্ষার প্রয়োগ-ক্ষেত্র শিশুর মাতৃগর্ভ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনে প্রসারিত হইয়াছে।

এই নঈ তালিম অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়। এ শিক্ষার খরচ শিক্ষা-প্রক্রিয়া হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে যতই বিরূপ সমালোচনা হোক না কেন আমি জানি যে, যে শিক্ষা আর্থিক দিক দিয়া স্বাবলম্বনশীল তাহাই সত্যকার শিক্ষা। এ আদর্শ নূতন এবং বৈপ্লবিক, কিন্তু ইহার জন্য আমি লজ্জিত নই। তোমরা যদি কাজ করিতে পার, তোমরা যদি প্রমাণ করিতে পার যে, মনের বিকাশসাধনের ইহা সত্যকার পথ তাহা হইলে যাহারা আজ আমাদিকে বিদ্রূপ করিতেছে তাহারাই এক দিন আমাদের প্রশংসায় মুখর হইবে, নঈ তালিম সর্বজনীনভাবে গৃহীত হইবে এবং যে সাত লক্ষ গ্রাম আমাদের ব্যাপক দারিদ্র্যের চিহ্নস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে তাহা আমাদের সমৃদ্ধির আকর হইয়া উঠিবে। এই সমৃদ্ধি বাহির হইতে আসিতে পারে না, ভিতরের দিক হইতে ইহা গড়িয়া তুলিতে হইবে। নঈ তালিমের ইহাই লক্ষ্য, ইহার কম কিছু নয়।"*

আমাদের বর্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছায়া নাই; কাজেই ইহা ছাত্রের ব্যক্তিত্ববিকাশে বিশেষ সহায়তা করে না। গান্ধীজীর কথায় বলিতে গেলে—বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য, সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ; 'ইহার আদর্শ হইল এমন এক নূতন পৃথিবী রচনা যেখানে জাতি বা বর্ণভেদ থাকিবে না, যাহা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতাপূর্ণ এবং অহিংসা যার ভিত্তি।'

ভারতের রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে, স্বরাজ-সাধনার পথে গান্ধীজীর দান যেমন মহান, নবভারত রচনায় নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলার ব্যাপারেও তাঁহার চিন্তার আলোক তেমনি কল্যাণ-পথের নির্দেশ দিয়াছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মহাত্মাজী পরিকল্পিত শিক্ষা-প্রণালীর মিল নাই, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের শিক্ষাপ্রণালীও ইহার অনুরূপ আদর্শে গঠিত হয় নাই; কেননা জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, মানবের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতা গান্ধীজীর যেমন, অন্যান্য রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের তেমন নয়। বিদেশী দ্রব্যমাত্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বদেশজাত জিনিষের অপকৃষ্টতাবোধ যাহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে তাঁহারা নবশিক্ষাপ্রণালীকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। বিদেশের চাকচিক্য ও আড়ম্বরে তাঁহাদের চক্ষু মুগ্ধ ও মন মোহগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ভারতের আদর্শ, ভারতের বৈশিষ্ট্য, ইহার ঐতিহ্য, ইহার সমস্যা স্বতন্ত্র। গান্ধীজীর শিক্ষাধারার আলোচনা-প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ বলিয়াছেন,—

"নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতের মালমশলা হইতেই এক নূতন আত্মা গড়িয়া তুলিতে হইবে—যে আত্মা হইবে নির্বাদ শক্তিমান। এই আত্মাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে চাই ত্যাগী ঋষিতুল্য মানবের একটি বাহিনী—যেমনটি ছিল খ্রীষ্টের।"

নঈ তালিম বা বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক নূতন প্রাণবান সমাজ গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ শিক্ষাপ্রণালী পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করিয়া যে ফল

* Eighth Annual Report of Nai Talim 1938-45. p 23

লাভ করা গিয়াছে তাহাতে আরও ব্যাপক প্রয়োগে অধিকতর সুফল আশা করা যায়। শিশুর উচ্চতর জ্ঞান লাভে এবং সুপ্ত-মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করিয়া বনিয়াদী শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যেভাবে জুড়িয়া দিবার প্রস্তাব সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। নিম্ন ও উচ্চ বনিয়াদী শিক্ষাক্রমের দুই ভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্র নির্বাচন, সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে জীবন্ত আদর্শ সঞ্চার ও আন্তরিকতার সহিত ইহার অনুসরণ ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নঈ তালিমের ব্যবহারিক প্রয়োগের সুফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—

"আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নঈ তালিম যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম। তবে ইহার নূতন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আমাদের দেশে অধুনা প্রচলিত পুরাতন ভাবধারার সামঞ্জস্য বিধান করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।"*

জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই শ্রেয় ও প্রেয়কে লাভ করা সহজসাধ্য নয়। জাতীয় জীবনের শ্রেয়োলাভের সাধনা কঠিন হইলেও, দুঃসাধ্য হইলেও, দায়িত্ব পরিহার করিয়া সহজতর পথ বাছিয়া লইলে আমাদের মানসিক দুর্বলতা ও অযোগ্যতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। যে পথ কল্যাণের পথ বলিয়া নির্ধারিত হয় তাহা দুস্তর হইলেও নিষ্ঠার সহিত অনুসরণীয়।

*শিক্ষক—পৌষ, ১৩৫৪

নব বর্ষের নবীন সূর্যোদয়

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কৈশোরে আর যৌবনে যার গাহিয়াছি জয়গান,
শুধু যার কথা ভাবিতে ভাবিতে ভরিয়া উঠেছে প্রাণ,
জন্ম জন্ম দেশে দেশে যার করেছি অন্বেষণ,
মন্দিরে যারে স্থাপন করিতে করেছি জীবনপণ ;
মঙ্গলঘট সাজায়ে রেখেছি ; হয়ে অনন্যমনা
করিয়াছি ধ্যান ; হৃদয়-রক্তে আঁকিয়াছি আলিপনা ;
যুগযুগান্ত কেটে গেছে, তবু তুমি সে আসিবে জানি,
আশার বার্তা শুনেছি চিত্তে, শুনেছি আকাশবাণী,
স্পর্শে তোমার সার্থক হবে আমার জন্মভূমি,
তুমি আসিয়াছ, তবু ভাবি আজ, এ তুমি কি সেই তুমি ?

তুমি স্বাধীনতা ? তোমারি কীর্তি ঘোষিছে কাব্যে গানে ?
দেখিতে তোমার স্বরূপ, শুধুই চেয়েছি প্রতীচী পানে।
গণি শতাব্দী, বর্ষ ও মাস, পল-অনুপল গণি,
সারা-এসিয়ার নব-জাগরণে শুনি তব আগমনী।
মহাসমরের মরণ-যজ্ঞে করি তব সন্ধান,
পৃথিবীর মহা-ধ্বংসলীলায় শুনি তব আহ্বান।
তুমি চিরদিন অধিষ্ঠিত কি বিশ্বের বেদনায় ?
সুখ-সন্ধানী যারা তারা বুঝি তোর নাহি দেখা পায়।
জাগরে-স্বপনে জীবনে-মরণে বহেছি বিপুল ব্যথা,
হে চির-এষিতা তুমি এলে আজ, তুমি সেই স্বাধীনতা ?

এ কি রূপে তুমি দেখা দিলে আজ ? কেন এ ছদ্মবেশ ?
কল্পনা কেন পেলে না মূর্তি ? স্বপ্নের এ কি শেষ !
দিকে দিকে দিকে দাবানল-শিখা, বঙ্গ দ্বিখণ্ডিতা,
কাশ্মীর হ'ল ধ্বস্ত শ্রীহীন, পঞ্জাবে জ্বলে চিতা।
বিভীষিকা-ভরা পল্লী নগরে উঠিছে আর্তনাদ,
মানুষের তরে মানুষ পেতেছে মানুষ-মারার ফাঁদ।
ছয় সহস্র বর্ষের কই সিন্ধুর সভ্যতা ?
ক্রীড়া-তরবারি কে আস্ফালিছে হায়দ্রাবাদের হোথা ?
তোমারে লইয়া করে হানাহানি তোমারি পূজারীদল,
তুমি এলে, তবু এলো না কো কেন শান্তি সুমঙ্গল ?

সুরু হোক তবে নূতন এষণা, যাত্রা নূতন পথে ;
প্রাচীন অতীত মিলে যায় যেথা নবীন ভবিষ্যতে
সেই নব যুগে, দীপ্ত তোমার দিব্য মূর্তি ধরি'
হে অভয়া এস ; দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দাও দেবী, দূর করি।
হৃদয়ে হৃদয়ে অগ্নি জ্বালাও, উজ্জ্বল তার শিখা
দূর করে দিক্ বহ্ন্যুৎসবে সব গ্লানি বিভীষিকা।
যে মায়ামন্ত্রে ভুলালে সকলি, সে মন্ত্রে দাও ডাক,
সেই আহ্বানে শঙ্কা এবং সংশয় ঘুচে যাক ;
সব মালিন্য মুছে যাক, আজ করুক জ্যোতির্ময়
এ নব জীবনে নব-বর্ষের নবীন সূর্যোদয়।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২১

সুনীতি করের বাড়ীর কাছে মোটর থামিয়ে প্রশান্ত গাড়ীর দুয়ার খুলতে না খুলতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল বাড়ীর ভিতর থেকে। মেয়েটির চলার ভঙ্গি পরিচিত—অথচ পিছন ফিরে পথ চলাতে এর মুখ দেখা যাচ্ছে না। প্রশান্ত না নেমে ড্রাইভারকে বললে, ওই মেয়েটির পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে চালাও গাড়ী। হর্ন দেবার দরকার নেই।

গাড়ী পাশে আসতেই মেয়েটি একটু সরে চাইলে সে দিকে। সন্দেহ ভঞ্জন হ'ল।

শুভা।

শুভা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসলে, কমরেড প্রশান্ত! ব্যাপার কি?

বলছি। আসবে গাড়ীতে?

শুভা বললে, নিশ্চয়। কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা—! বলতে বলতে গাড়ীর দরজা খুলে প্রশান্তর পাশে বসে পড়ে হাসলে, আর—তোমার গাড়ীখানা ছোট বটে—বসার ব্যবস্থা চমৎকার।

প্রশান্ত বললে, আমার খবর বোধ হচ্ছে কিছু কিছু জান।

কিছু না—সময় আমার এতই কম যে বন্ধুরা কে কোথায় কেমন আছেন জানবার বা জানাবার ফুরসৎ পাই নে।

প্রশান্ত বললে, একটু সময় মানুষের হাতে থাকা ভাল নয় কি?

কি জানি! শুভা তার পানে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। পরে বললে, তুমি তো দেখছি ভালই আছ। আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খানিকটা সময় বাড়তি না থাকলে মানুষ ভালই থাকতে পারে না!

প্রশান্ত ওর কটাক্ষপাতকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে বললে, ভাল থাকা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার।

নিশ্চয়! শুভা কণ্ঠে জোর দিলে।

অথচ তোমাকে দেখলে তা মনে হয় না, শুভা।

জন্মগত অধিকার কিংবা জন্মান্তরগত সুকৃতি অর্থাৎ ভাগ্য সকলের তো সমান নয় কমরেড।

প্রশান্ত স্বরে জোর দিয়ে বললে, তুমি পরিহাস করলেও অস্বীকার করবে না যে চেষ্টার দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা মানুষ অবস্থার উন্নতি করতে পারে।

তা কেন করব—বাঃ রে! দৃষ্টান্ত দেখেও না বোঝে যারা—

যাই বল শুভা—ধন থাকাটা মানুষের অন্যায় নয়, কাউকে বঞ্চিত বা লাঞ্ছিত না করে যে উপার্জ্জন--

শুভা বললে, তোমার মোটরে বসে তোমার যুক্তি খণ্ডন করব এতটা নিরেট নই আমি।

প্রশান্ত বললে, এ ভাবে উপার্জ্জনকে অন্যায় বলবে তবু?

শুভা বললে, ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের বাদানুবাদ চলবে না কমরেড। তোমার ধন আছে ব্যাঙ্কে—দয়া আছে মনে—সবাইকে সুখী করে সুখী হতে চাও—বেশ তো। ব্যক্তিটা তুমি ভাল—তবু কতটুকু তুমি! তুমি পুঁজি-বাদকে ভাল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গলাতে পারবে না—

তোমরাও চেষ্টা কর না কেন এই ভাবে।

কমরেড—তুমি বুদ্ধিমান্ হয়ে এমন প্রস্তাব করবে ভাবি নি। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম লোকেরে শিখায়'—সব কাজের এই হ'ল মূল নীতি। বড় খাঁটি কথা।

প্রশান্ত বললে, তা বলে—

শুভা বললে, তর্ক করব না—কমরেড। যে গুরুমশাই হুঁকো টানতে টানতে ছাত্রদের তামাক সেবনের অপ-কারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, তাঁর বক্তৃতাকে কি বলবে তুমি?

কিছুই বলব না। তাঁর আচরণটা অভ্যাসগত কিন্তু অভিপ্রায়টি নিঃসন্দেহে মহৎ।

শুভা বললে, ছাত্ররা অল্প বুদ্ধি—আর অনুকরণপটু, আমাদের মত ঝুনো আর সাধু হলে—অবশ্য

প্রশান্ত বললে, চল, একটা ভাল রেষ্টুরেন্টে বসা যাক। এভাবে কথা কাটাকাটি করে তোমাকে বোঝাতে পারব না।

চল। কিন্তু পেটে কিছু পড়লেই মাথার গোলযোগ থামবে—আশা করো না।

অভিজাত শ্রেণীর একটা রেষ্টুরেন্টে পর্দ্দানশীন হয়ে বসলে দু'জনে। চা এল—আনুষঙ্গিক এল এবং সেগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য কাউকে অনুরোধ করতে হ'ল না। খাওয়া চলল অত্যন্ত সহজ ভাবে—আর সেই কারণেই আলাপের স্রোত আটকে গেল। মোটরের গতির তালে—পাশাপাশি বসে যে কথা সহজে বলা যেত—নিশ্চল চেয়ারে মুখোমুখি বসে তার সূত্র কিছুতেই টানা গেল না। মনে হ'ল কথা শেষ হয়ে গেছে। দুই বিপরীত স্রোত এক জায়গায় মিলেছে—একটুখানির জন্য—আবার তারা বিপরীত গতি নেবে। তাদের মিলনে যে শব্দ উঠছে তা প্রীতিসম্ভাষণ নয়—পথের কথাও নয়—ওটা সংঘাতই। অনৈক্যজাত সংঘাত—শব্দটাকে প্রতিবাদ বলাই শোভন বা সঙ্গত।

খাওয়া শেষ হলে—অকস্মাৎ প্রশান্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। সিগারেট বার করে বললে, তোমার অসুবিধা হবে না তো?

শুভা বললে, আগে তো হয় নি—

প্রশান্তর রক্ত এই প্রত্যুত্তরে দ্রুত প্রবাহিত হ'ল। সিগারেট রেখে ও শুভার একখানি হাত চেপে ধরে কোমল কণ্ঠে বললে, আগের কথা সব তোমার মনে আছে ?

শুভা বললে, আছে কিছু কিছু।

আমি কি ভালবাসি—না বাসি—

কমরেড বড্ড আপসেট হয়ে গেছ। আগের কথা মনে থাকলেই ভাবাবেগে ভেসে যাওয়া চলবে না। হাত ছাড়াবার চেষ্টা মাত্রও করলে না।

ঘরের আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। হাতের উত্তাপে ভাষা সঞ্চার করবার চেষ্টা করলে না প্রশান্ত। ধরা না-দেবার লীলায় তার প্রকাশ সহজ হয় সুন্দর হয়। বিনা বাধায় তাই বোধ হচ্ছে নিরুত্তাপ—বিস্বাদ। একটি নিশ্বাস মোচন করে ও শুভার হাতখানা ছেড়ে দিলে।

শুভা সহজ ভাবেই বললে, আরও কিছু অর্ডার দেবে—না বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়বে ?

কি খাবে বল ? নিরুৎসুক স্বরে প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

একটু হাওয়া—ফ্যানের নয় প্রকৃতির। বলে শুভা হাসলে।

বিল মিটিয়ে বাইরে এল প্রশান্ত। বললে, তোমায় পৌঁছে দেব ঠিকানায় ?

ধন্যবাদ। ট্রাম বাস যা হয় একটা পেয়ে যাব।

ও পিছন ফিরতেই প্রশান্ত নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগল। শুভা তাকে কি ভাবলে ? নিবিড় সঙ্গ পাবার জন্য ওর এই আকুল কামনাকে কি চাটুবাদ বলে উপেক্ষা করলে শুভা ? আর পাঁচ জনের মত সে-ও কি শুভার কাছে সাধারণ আলাপিত একজন! তাঁদের অন্তরঙ্গতায় কোন দিন কি অনুরাগ-সিক্ত কৌতূহল ভেসে ওঠে নি ? নিকটে টানবার আয়োজনের মধ্যে ছিল দেহগত আকর্ষণ—স্থূল মাংস-কামনার আবেগ ?

না—সোজা উত্তর চায় সে। দলগত নীতি—বা সমাজ-গত বাধা···কিংবা ভালমন্দ মনে করা-করির সঙ্কোচ এসব একপাশে ঠেলে একটি মাত্র সহজ সোজা প্রশ্ন করবে ওঁকে—হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বা আবেগ-উচ্ছ্বাস যাই বলুক—একটি মাত্র প্রশ্ন করবে—ভালবাস আমাকে ?

মোটরের জানালা দিয়ে পিছন দিকে চাইলে প্রশান্ত। শহরের রাজপথে মানুষের আর যানবাহনের ঢেউ ঘন হয়ে উঠছে—চেনা মানুষের কূলে দৃষ্টিকে ভেড়ানো দুঃসাধ্য বটে।

কয়েকখানা জরুরি চিঠির মধ্যে—একখানি এসেছে বাড়ি থেকে। উপার্জ্জনের ভেলায় চড়ে আবার সে স্নেহ-নদীর উপকূলে এসে পৌঁছেছে। বাবা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে থাকলেও চোখের দৃষ্টিতে স্বস্তির ভাব—মা তো আনন্দে চোখের জল ফেলে ভগবানকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সংসারের জোয়ালে পাকাপাকি ভাবে জুড়ে দেবার পরামর্শ ওঁরা বহুদিন থেকেই আঁটছেন—তবে লাখ কথায় নির্ধি মেলানোর যোগাযোগ সহজে তো আসে না। আজকের চিঠিটায় বিয়ের কথা নেই—আছে বিপত্তির কথা। কলকাতা-নোয়াখালি-বিহারের প্রতিক্রিয়া ওদের গ্রামেতেও সুরু হয়েছে। ভয়াবহ রকম কিছু ঘটে নি—তবে যে কোন মুহূর্ত্তে কিছু ঘটাও বিচিত্র নয়। প্রতিবেশীরা পরস্পর সন্দেহাকুল হয়ে বিনিদ্র রাত্রিযাপন করতে আরম্ভ করেছে। দুই পাড়ার সীমানা থেকে যথাসম্ভব লোকজন ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে। গরু ছাগল বাসন-কোসন—সঞ্চিত চাল ডাল আর মেয়েছেলে সরে যাচ্ছে পাড়ার ভিতরে। কোলাহল-মুখরিত বাড়িগুলি দিনে রাত্রিতে খাঁ-খাঁ করে। চুরি হবার ভয়ে রাত্রিতে যে-কেউ একজন বাড়ির লোক শূন্যবাড়িতে শুয়ে থাকে। দিনের বেলায় দেখা হলে এ ওকে শুধোয়, আচ্ছা ভাই—কারা এসব করছে বলতে পারিস ?

ভাই মাথা চুলকে বলে, নইলে কলিকাল আর বলেছে কেন!

কালের দোহাই দিয়ে আসল সমস্যা এড়ানো যায় না—রাত জেগে জেগে দু'পক্ষই বহুতর গুজব সংগ্রহ ক'রে আর দিনে দিনে তা মনের অন্ধকারে মাকড়সার জালের মত লূতাতন্তু বিস্তার করে চলে। নানাবিধ মারাত্মক অস্ত্র—হাত-বোমা বর্শা এসিড রামদাও লাঠি তীর ধনুক কিনা সংগ্রহ করছে এরা। অগ্নিগর্ভ অরণি কাষ্ঠে সামান্য ঘর্ষণ মাত্রই দাবানল জ্বলে উঠবে।

বাড়িটা ওদের প্রান্তদেশে—তাই এত কথা পত্রে জানিয়েছেন মা। প্রশান্ত যেন শীঘ্র এসে তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

সেইদিন সন্ধ্যাকালেই প্রশান্ত বাড়ি রওনা হ'ল।

২২

বাহ্যত গ্রামখানি আগেকার মতই আছে—মানুষের মুখে ভাসছে উদ্বেগ। বর্গীর হাঙ্গামার কথা কেউ বইয়ে পড়েছে—কেউবা গল্প শুনেছে—কেউ কেউ শোনেই নি—অথচ মনে হচ্ছে তেমনতর দুর্দ্দিনই বুঝি সমাগত। তারা এসেছিল বাইরে থেকে···দিনের কার্য্যতালিকায় আর রাত্রির নিদ্রায় সর্ব্বক্ষণ-ব্যাপী ব্যাঘাত দিতে পারে নি—এ হ'ল কি ? 'সসর্পে চ গৃহে বাসে'র মত লাগছে গ্রামখানিকে।

পথের দু'জায়গায় দেখলে গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই হচ্ছে। ছেলেতে বুড়োতে টানাটানি করে ট্রাঙ্ক থলে বোঝাই বাসন আরও কি সব জিনিস গলিপথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভিন্ন পাড়ায়—নিরাপদ স্থানে এও চোখে পড়ল। এই ভাবে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে সব ?

প্রশান্ত গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই পাড়ার যুবক ছেলেরা ছুটে এল। বললে, আপনি এলেন—তবু সাহস হ'ল আমাদের।

বৈঠকখানায় এসে বললে, এ পাড়ার চাঁদা বিশেষ কিছুই ওঠে নি—মালপত্তরও যোগাড় নেই। আপনি এসেছেন—ব্যবস্থা করে যান।

প্রশান্ত বললে, রিলিফ ফাণ্ড খুলছ নাকি।

রিলিফ ফাণ্ডই বটে। বলে কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে ফিস্ ফিস্ করে কি বললে।

প্রশান্ত বলল, এই ভাবে বাঁচবে! ছি!

কি করব—ম্যাজিষ্ট্রেট বন্দুক জমা দেবার হুকুম দিয়েছেন, কেউ বাড়ি চড়াও হলে আত্মরক্ষা করব কি দিয়ে!

যাতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হয় তেমন ব্যবস্থা কর নি কেন। দু'পক্ষ মিলে—

আজ্ঞে পিস কমিটি একটি আছে—তবে তাতে বিশ্বাস কারও নেই। লোক দেখানো কখনো বারোয়ারি তলায়, কখনো দরগা তলায় তার মিটিং বসে—বক্তৃতা হয় কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত!

এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে দুম্ করে একটা পটকা ফাটার শব্দ হ'ল। দক্ষিণ দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে দুম্ দুম্ করে গোটা দুই শব্দ উঠল।

যুবকটি বললে, শুনছেন তো—বোমার আওয়াজ। রাত ভোরই শুনবেন আওয়াজ।

সুতরাং এখানে শান্তির কথা বলা নিরর্থক। দু'পক্ষের এত আয়োজন—শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে না পৌঁছে কি নিরস্ত হবে! তাই মুখে হুমকি আর বিনয়—প্যাঁচ কষাকষির কৌশল ছাড়া কিছু নয়। গত মহাযুদ্ধের আগে এগুলি পোষাক বদল করে রাজনীতির ক্ষেত্র কর্ষণ করে নি কি!

প্রশান্ত বললে, ওবেলা কথা বলব তোমাদের সঙ্গে।

মায়ের পায়ে প্রণাম সেরে বাবাকে দেখতে গেল। তিনি বেশির ভাগ সময় শুয়েই কাটান। শরীরে মেদ বেড়েছে—মনটাও কেমন যেন বিক্ষিপ্ত। কোন কথার যোগসূত্র টেনে রাখতে পারেন না।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন?

দুর্গামোহন ললাটে তর্জ্জনী ঠেকিয়ে হাসলেন। বললেন, গাঁয়ের কথা শুনেছ সব?

শুনেছি। আপনি কি কলকাতায় যেতে চান?

কলকাতায়? কেন? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন। না-না তোমার গর্ভধারিণীকে আর বোনটিকে নিয়ে যাও—আমি কোথাও যেতে পারব না।

আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?

কেন—ভগবান নেই! তিনি করবেন সব।

বলতে বলতে শব্দ করে হেসে উঠলেন, তোমরা বিশ্বাস কর না কিছুই—কিন্তু তিনিই সব করান—আমরা নিমিত্তমাত্র।

প্রশান্তর ইচ্ছা নয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বিভীষিকা বাড়ায়। সে আর কোন কথা বললে না এ সম্বন্ধে।

বিরাজমোহিনী বললেন—ওঁর ভয় বাড়ি ছাড়লেই এখানকার ইট কাঠ কিছুই থাকবে না। কিন্তু বাবা—আপনি বাঁচলে তবে তো বিষয়সম্পত্তি। মথুরার মাও তো যাব যাব করছে। উত্তুর পাড়ায় জিনিষপত্তর সব পাঠিয়ে দিয়েছে—চেষ্টা করছে একখানা বাড়ি ভাড়া নেবার। ওরা চলে গেলে পাড়ায় আর রইলই বা কে! কার ভরসায় থাকব বল?

মাকে আশ্বস্ত করে প্রশান্ত বললে—সব ঠিক হয়ে যাবে—ভেব না মা! ভয় করলেই ভয়।

মা বললেন—তুই এসেছিস—যা ভাল ব্যবস্থা হয়—কর্।

জলযোগ করে সে বেরিয়ে পড়ল পাড়ায়। বহুক্ষণ ধরে এ পাড়া ও পাড়া ঘুরল—হিন্দু মুসলমান বহু লোকের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলাপ করলে। দুই দলই ভীত-সন্ত্রস্ত। রাজনীতির জটিল বিষয় এরা বুঝতে চায় না—দলগত প্রীতি-বিদ্বেষেও বিচলিত নয়। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ—ব্যবসায়গত লাভক্ষতি বা সমাজগত দুর্নীতি অপবাদ এইটুকুতেই ওরা কাঁদে—আনন্দ করে—উত্তেজিত হয়। বহুকাল পাশাপাশি বাস করে—কখনও গালাগালি—কখনও মাথা ফাটাফাটি হয়ে গেছে—আবার একদিল হয়ে গলাগলি করার সুযোগও এসেছে অচিরাৎ। ঝগড়াবিবাদের মধ্য দিয়ে যে ব্যবধান গড়ে ওঠে—তার তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন নয়—কিন্তু এই আকস্মিক বিভেদ—এর মাথা মুণ্ড খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। প্রায় সবাই বলছে—এমনটা হ'ল কেন বাবু?

প্রশান্ত মাতব্বর লোকদের কাছে গেল। এঁদের কেউ কেউ শান্তি কমিটিতে আছেন।

বললে—আপনারা এক কাজ করুন। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছেড়ে দিন।

সবাই অবাক হয়ে বললেন—সে কি—গান্ধীজী পর্য্যন্ত বলেছেন—

প্রশান্ত হাসলে। বললে, আপদ বাড়িয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তিনি দেন নি। অস্ত্রশস্ত্র বাড়িয়ে যদি শান্তিরক্ষা চলতো তো এত বড় যুদ্ধটা হ'ত না।

মিছেই যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা। তার কথায় সায় দিলেন কেউ কেউ—কেউ বা বললেন—তুমি ছেলেমানুষ—কতটুকু জান জগতের। স্বয়ং ভগবান্ জীবজন্তুদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন—আর মানুষকে বলেছেন—কিছু করো না—পড়ে পড়ে মার খাও!

অন্য পক্ষেরও ঐ কথা। বললে—ওরা কলকাতা থেকে গুণ্ডা আনিয়েছে—সে দিন বাজারে দেখলাম ইয়া গালপাট্টা—মুখখানা ঢাকা—এদেশে কোন দিন দেখি নি ওদের—

দু'দলকে এক করে আলোচনা চালাবার চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল। যাঁরা রটনা করছেন রঙ ফলিয়ে—তাঁরা দূরেই রইলেন—যারা এক জায়গায় মিললেন—তাঁরা বললেন—ঠিক কথাই তো—এ ভাবে মানুষ বাস করতে পারে পাশাপাশি? মিটমাট করে ফেলাই উচিত।

কিন্তু মিটমাট করবে কে। কোন পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে কেউ এগিয়ে এলেন না। বললেন—ওরে বাবা, একলায় কি সাধ্যি আমার!

বুড়োরা বললে—ছেলেরা মানে না আমাদের।

ছেলেরা বললে—বুড়োদের মত উস্‌কানি দিতে দ্বিতীয় কেউ নেই—ওদের সরান আগে পিস কমিটি থেকে।

সুতরাং ক'দিন চেষ্টা করেও গ্রামের অবস্থা উন্নত করা গেল না।

পুলিসের পাহারা বসেছে—একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী হয়েছে—তবু ভয় আর সন্দেহ ঘুচছে না মন থেকে।

নন্তু ঠাকুরদার চণ্ডীমণ্ডপে আজকাল ভীড় বেশী। বুড়ো-বুড়ীরা দু'বেলা এসে সাধছে—চলুন রায় মশায়—দুর্গা শ্রীহরি বলে বেরিয়ে পড়া যাক। যা খরচপত্তর লাগে আমরা দেব। যে ক'টি দিন আছি, অশান্তি সহ্য হয় না—তবু মনের শান্তিতে ঠাকুরদেবতা দেখে বেড়ানো যাবে।

ঠাকুরদা হেসে বলেছেন—এমনি করেই পরীক্ষা করেন ভগবান্। ভয় দেখিয়ে বলেন—ওরে আমি আছি, আছি। সম্পদে কে আর তাঁকে ডাকে বল।

প্রশান্তকে দেখে বললেন, কি দাদু শান্তির দূতিয়ালী নিয়ে নাকি!

না দাদু—এ যুগের দূতিয়ালী ভোল বদলেছে, সে কালের মন গলানো কথা মনের বাইরেই পড়ে থাকে।

দাদু বললেন—যা বলেছিস নাতি—লাখ কথার এক কথা। আমরা কেষ্টযাত্রা দেখে কেঁদে বুক ভাসিয়েছি—তোরা এক কথায় তা ডিস্‌মিস্ করে রায় দিস্—রাবিশ। আমাদের কালে মন ছিল বুকে—তোদের মন উঠেছে মগজে। তোদের নিস্তার নেই।

প্রশান্ত বললে—তা তো দেখতেই পাচ্ছি দাদু। কিন্তু ফ্যাসাদ এই—এ কালে তোমরাও রয়েছ—আমরাও রয়েছি—মাঝখানে কোন বাঁধন নেই।

দাদু বললেন—বাঁধন দেবার চেষ্টা কর—

না দাদু, চেষ্টা করে ফল হবে না। জগতে বার বার যত অশান্তি দেখা দিয়েছে—তার কোনটিই তো চেষ্টার দ্বারা শেষ হ'ল না। যুদ্ধের কারণ সবাই জানে—যুদ্ধের কুফল সবাই বোঝে—অথচ যথানিয়মে যুদ্ধে যোগও দিচ্ছে সকলে। কেন এমন হয়?

দাদু বললেন—তোদের রাজনীতিটিতি বুঝি না ভাই—তবে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য বার বার যে যুদ্ধ হ'ল ত্রেতায়—দ্বাপরে—তার মূল-কথা হ'ল দুষ্কৃতের বিনাশ। এক দুষ্কৃত বিনাশ হলে অন্য দুষ্কৃত যে জন্মবে না এমন কথা নয়—তাই সম্ভবামি যুগে যুগে। এই হচ্ছে জগতের সৃষ্টিলীলা।

তোমার সৃষ্টিলীলাকে প্রণাম করি দাদু—।

দাদু হাসলেন—তোমাদের কল্যাণ-বুদ্ধি দিয়েও এ অমঙ্গলকে ঠেকাতে পারছ না তো ভাই—

আমাদের চেষ্টাকে শেষ চেষ্টা মনে করো না দাদু—

দূর বোকা—তা মনে করলে তাঁর সৃষ্টির রইল কি? সৃষ্টিতত্ত্ব যত সোজা মনে করিস তা নয়।

প্রশান্ত বললে—সৃষ্টিতত্ত্ব আর এক দিন শুনব দাদু—আজ সময় কম।

দাদু হো হো করে হেসে উঠলেন—আচ্ছা, আচ্ছা। তবে ও তত্ত্ব শুনে বোঝা যায় না ভাই—আর বুঝলেও শোনানো কঠিন।

মলয়ের মা ওর হাত দুটি ধরে কাঁদলেন, হাঁ বাবা তোমার সঙ্গে দেখা হয় না তার? বলবে তাকে—মাকে এত কষ্ট দিলে ভাল হয় কোন ছেলের। বুড়ো বয়সে জাত খোয়াতে পারি নি—এই হ'ল গিয়ে আমার দোষ!

ওঁকে আশ্বস্ত করে বাড়ি ফিরে এসে মাকে বললে, কোন ভয় নেই মা বাড়িতেই থাক। কলকাতা ত বেশি দূর নয়—খবর পেলেই আসব আমি।

গ্রাম আর সে গ্রাম নেই। পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা মুছে যাচ্ছে—নূতন কিছু আশ্রয়ের মত অন্তত গড়ে ওঠে নি। ট্রান্‌জিশন পিরিয়ড। কি ভীষণ এই অন্তর্বর্ত্তী কাল।—সমাজ-অনুগত মানুষগুলিকে জোর করে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে টেনে আনা হচ্ছে। কে টানছে? সুবিধাবাদীরা? মহাকাল? যুগ-ধর্ম্ম? যে-ই টানুক—এর গতি রোধ করা যাবে না।—দুটি প্রধান শক্তি···শক্তিসঞ্চয়ের নেশায় পৃথিবীর দেশ মহাদেশের নাড়ীতে দিচ্ছে টান। অভয়—হুঙ্কার—স্বস্তিবাণী আর পরমাণু-শক্তি এই নিয়ে চলেছে খেলা। ইউরোপ—ভূমধ্যসাগর মধ্য-প্রাচ্য—ভারতবর্ষ—দ্বীপময় ভারত, আরব জগৎ—চীন—জাপান—দুটি শক্তির অক্ষক্রীড়ার ছকে ছড়িয়ে আছে। খেলা চলেছে পুরোদমে। কিন্তু এই খেলাই যে শান্তির চূড়ান্ত ফলাফল প্রসব করবে—সে ভবিষ্যদ্বাণী করবে কে?—নতুন করে ভাঙ্গাগড়ার মুখে পুরাতন পৃথিবী পাক খাচ্ছে—বিদীর্ণ হচ্ছে ছিঁড়ে গুঁড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে মহাব্যোমে। সূর্য্য টানছে পৃথিবীকে—পৃথিবী টানছে চন্দ্রকে—উপগ্রহে বেষ্টিত হয়ে গ্রহগুলি চাইছে শক্তিমান্ হতে। অবিভাজ্য অণুর অহঙ্কার চূর্ণ করেছে মানুষ—মানুষ আজ ধ্বংসের দেবতা। তবু সে শিব হতে পারে নি; সৃষ্টি সংহারের ভারকেন্দ্রে জগৎকে স্থিত করে রাখবার চেষ্টাই হচ্ছে নূতন পৃথিবী তৈরির ইতিহাস—দাদুর ভাষায় সৃষ্টিলীলা।

আজকার মানুষ সেই লীলার রস আস্বাদ করতে পারছে কি ?

২৩

এক দিন সুচিত্রা বললে, কই বললে না ত কি ধরণের কাজ আরম্ভ করেছ তোমরা ?

মলয় বললে, বলার চেয়ে প্রত্যক্ষ দেখতে চাও কি ?

চাইব না কেন।

সংসার ভেঙে দিতে হবে—ষ্ট্রাইক দি টেণ্ট সুচিত্রা।

সুচিত্রা বললে, ভাল করে না বললে বুঝব কি করে।

মলয় বললে, কাগজ তো পড় আজকাল—রোজই। পৃথিবীর নানা দেশে নানা রকমের গোলমাল—তবু এমন কোন মহৎ চেষ্টার খবর পাও না কি যাতে করে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

সুচিত্রার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, পাই সে খবর। কিন্তু সে কি সার্থক হবে ?

সন্দেহ রাখলে বিশ্বাস আনা কঠিন। এক জনের চেষ্টা—পাঁচ জনের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হলেই কাজ সহজ হয়ে আসে। তুমি ত দেখি কাগজ হাতে পেলেই মহাত্মাজীর প্রার্থনার অর্থগুলি মন দিয়ে পড়।

সুচিত্রা বললে, পড়ি এই কারণে—ওগুলিতে স্পষ্ট সত্যকে খুঁজে পাই।

মলয় হেসে বললে, স্পষ্ট সত্য খুব কঠিন মনে হয় বুঝি ? আর খুব তিক্ত ?

সুচিত্রা বললে, মন আমাদের তৈরি নয় বলেই কঠিন ঠেকে।

তারপর নোয়াখালিতে গিয়ে কাজ আরম্ভ করার দায়িত্ব ও বিপদ আছে—এও জান ত।

সুচিত্রা বললে, জীবনে কোন পরীক্ষাই তো দিলাম না; বইয়ে আর কাগজে লোকের দৃষ্টান্ত পড়ে—ভাল ভাল করলাম শুধু।

মলয় বললে, সংসারের মায়া কাটিয়েছ বুঝি—তাই ইচ্ছে হয়েছে মানুষের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে।

দূর, সংসার ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায়। মহাত্মাজী তো সংসার ছাড়তে বলছেন না কোথাও। সত্য আর ভালবাসা এই মূলধন নিয়েই তো দাঁড়িয়েছেন পরীক্ষা দিতে।

তবু তোমাদের সন্দেহ হয়—এ পরীক্ষা কি সফল হবে ?

তা হয়।

কেন হবে সন্দেহ। সত্য যদি জয়ী না হয় তার শক্তি কমে গেল এ ভাবেবেই বা কেন। কাজকে যথার্থ ভাবে পেতে হলে কাজকেই নিতে হবে বেছে। আর কাজের আনন্দ শক্তি—সে-ও তো কাজের মধ্যেই রইল। যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল বলে—তাঁর মহৎ বাণীকেও যে হত্যা করা হয়েছিল এ ধারণা ভুল।

সুচিত্রা বললে, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফলাফলে লক্ষ্য রেখে কাজ করে। খ্রীষ্টের মহৎ বাণী পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে, আশ্রয় পাচ্ছে না—এও তো দেখছি আমরা।

মলয় বললে, তা হ'লে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভার কথাগুলি তোমার ভাল লাগে কেন ?

সুচিত্রা বললে, হয়তো একটা দেহের মধ্যে দুটো মানুষ বাস করে এইজন্যে। একটা মানুষ চায় সংসারের লাভ-ক্ষতির চুলচেরা বিচার করে তাতে জড়িয়ে থাকতে—আর একটা মানুষ সত্যের কষ্টিপাথরে ফেলে সেগুলিকে যাচাই করতে চায়।

সংসারের লাভক্ষতির দিকটা কি সত্যের দিক নয় ?

সুচিত্রা হেসে বললে, আমি পণ্ডিতলোক নই—পাঁতি দিতে পারব না। বাস্তব দিককে অস্বীকার করে মঙ্গল চেষ্টা বেশী দূর এগোয় না—এই তো দেখি। ধর্ম্ম নিয়ে যারা পাগলের মত হানাহানি কাটাকাটি করে—তাদের কাছে প্রকৃত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করাই হ'ল বাস্তবকে খোলা চোখে দেখা।

প্রকৃত ধর্ম্মের ব্যাখ্যাটি কি ?

মলয়ের কথায় সুচিত্রা কৃত্রিম ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে বললে, যাও—জানি না।

মলয় হো হো করে হেসে উঠল। বললে, এই ত, এত অল্পে রাগ করলে মানুষের সেবা করবে কি করে।

সুচিত্রা বললে, মানুষের সেবা করব—এত বড় অহঙ্কার আমার নেই।

ইস্—ক্রমশঃ বিনয়ে নুইয়ে পড়লে যে! সুচিত্রা রাগ করে পালাচ্ছে দেখে মলয় খপ করে ওর হাত ধরে বললে, ধরে নিলাম মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাই হ'ল মানুষের ধর্ম্ম—আপাতত সে ধর্ম্ম পালনে তুমি অবহেলা করছ।

সুচিত্রা ভ্রুকুটি হেনে বললে, কিসে ?

মানুষ যাতে শান্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে—যাতে শান্তিতে বাস করতে পারে—যথাসময়ে স্নান আহার উপাসনা স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে পারে—এসব দেখা প্রত্যেক সৎ প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য নয় কি ?

তাতে কি !

তাতেই তো সব—সকালের রোদ চড়েছে কতখানি এ দেখেও যে প্রতিবেশী স্বাস্থ্য পালনের নিয়ম না মেনে মনুষ্য ধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ছে তাকে সচেতন করে দেওয়া যায় যদি—

সুচিত্রা বললে, থাম—আর ব্যাখ্যায় কাজ নেই। সামান্য খিদে সহ্য করতে পারে না যারা তারা আবার সেবা করতে যায় কোন্ সাহসে !

নিতান্তই দুঃসাহসে।

হাসতে হাসতে সুচিত্রা ষ্টোভ জ্বেলে ফেললে। খানিকটা হালুয়া আর চা করে মলয়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, চা খেয়ে চল বেড়িয়ে আসি।

আপত্তি নেই।

ব্লকটার বাইরে আসতেই প্রশান্তর সঙ্গে দেখা। প্রশান্ত হাত তুলে ওদের ডাক দিয়েছে।

বললে, তোমাদের খুঁজছিলাম—চল বাসায়।

সুচিত্রা বললে, আর কোটরে নয় ভাই—পার্কে বসা যাক।

কাছাকাছি একটা ছোট মত পার্ক ছিল—তিন জনে তারই মধ্যে প্রবেশ করলে। যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের শ্রী পার্কের কোথাও চোখে পড়ে না—একেই শ্রী বলতে কলকাতার পার্কের কোনটিতেই নেই। অবিচ্ছিন্ন শব্দ ও ধূলিধূমের মধ্যে প্রকৃতির নির্জ্জনতা বা শ্রী খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। যুদ্ধোত্তর যুগে এগুলিকে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা হিসাবে ধরে নিয়ে খানিকক্ষণ বক্তৃতা দেওয়া চলে। স্লিট ট্রেঞ্চের প্রয়োজন মিটে যেতেই সেগুলিকে কবর দেওয়া হয়েছে—তবে মাটিটাকে সমান করে দেবার বা সে মাটিতে ঘাস বুনবার কি মরসুমি ফুল ফোটাবার চেষ্টা কেউ করেন নি। বেঞ্চিগুলিও পায়া ভাঙা ও পিঠ ভাঙা অবস্থায় কোন রকমে খাড়া হয়ে আছে। তারই একটিতে তিন জন এসে বসলে।

প্রশান্ত বললে, তোমার বাড়ি যাওয়া উচিত মলু।

জ্যেঠিমার অবস্থা দেখলাম খুব খারাপ—তাঁকে দেখবার লোকেরও দরকার।

কেন, মেজ বউদি ?

তিনি তো বাড়িতে নেই—মেজদা বাসা করে তাঁদের কলকাতায় এনেছেন। তা ছাড়া দেশের অবস্থাও ভাল নয়।

মলয় সুচিত্রার পানে ফিরে বললে, মা আমাদের কথা বললেন ঠাকুরপো ? কি বললেন !

দেশের অবস্থা সংক্ষেপে জানিয়ে প্রশান্ত বললে, তোমার মা তাঁর আত্মীয়বাড়ি উঠবেন ঠিক করেছেন—কেবল বড় বউদির ব্যবস্থা—

সুচিত্রা বললে, আমরা যাব।

প্রশান্ত চলে গেলে মলয় বললে, যেজন্য আমরা বাড়ি ছাড়লাম চিত্রা—

সুচিত্রা বললে, এক একটি মুহূর্ত্ত এত বড় হয়ে আসে যখন অন্য মুহূর্ত্তের ঘটনাগুলি মুছে যায়। কেন আমরা বাড়ি ছেড়েছি সে কথা এখন থাক। একটি নোয়াখালিতে আমরা সবাই ভিড় করে নাই-বা গেলাম।

ঠিক বলেছ—আমার গ্রামেও তো যথেষ্ট কাজ রয়েছে। বলে সুচিত্রার হাত ধরে ও টানতে আরম্ভ করলে।

সুচিত্রা বললে, আঃ আস্তে—তোমাদের সঙ্গে আমরা দৌড়ে পারব কেন।

মলয় বললে, আমরা হাউই—তোমরা হচ্ছ তার বারুদ। ঠেলে দিয়েছ যখন তখন তাল রাখবে নাই-বা কেন।

আঃ তবু টানে ! এটা পথ না !

মলয় হেসে বললে, আমরাও তো যাত্রী।

২৪

ব্যারাকে ফিরতেই দেখে—মেজদা তালা-লাগানো দোর-গোড়ায় পায়চারি করছেন। মেজদাকে দেখেই মলয়ের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। প্রশান্ত এই মাত্র চলে গেল, দেশের অবস্থা ভাল নয়—মেজদা কোন মন্দ খবর নিয়ে আসে নি তো !

মেজদা।

মেজদা ফিরে চাইলেন—মুখের ভাব তাঁর একটুও কোমল বোধ হচ্ছে না। কোন কথা না বলে প্রখর সন্ধানীর দৃষ্টি দিয়ে ওদের দু'জনকে বিঁধতে লাগলেন।

সুচিত্রা অস্বস্তি কাটিয়ে প্রথম এগিয়ে এল তাঁর দিকে—হেঁট হয়ে প্রণাম করলে তাঁকে। তারপর আঁচল থেকে চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে···তালা খুলে ফেললে।

মলয় বললে, বস মেজদা।

মেজদা ঘরের চারদিকে সেই প্রখর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এইটুকু ঘরে—আচ্ছা ঘরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—এই নানান জাতের মধ্যে থাকিস কি করে ?

মলয় সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, বসবে না ?

মেজদা বললেন, কাজটা জরুরী বলেই এলাম নইলে—একটু থেমে বললেন—তোমার বউদিকে কলকাতায় নিয়ে এসেছি—দেশের অবস্থা শুনেছ বোধ হয়।

মলয় বললে, চা খাবে তো ?

নাঃ—থাক। তাচ্ছিল্যভরে অনুরোধ ঠেলে পাতা বিছানার উপর বসলেন। বসে বললেন, মাকে এত সাধলাম, এলেন না। ভিটে কামড়ে পড়ে থেকে কি যে পরমার্থ লাভ করবেন তা উনিই জানেন ! এখন বায়না ধরেছেন বৃন্দাবন পাঠিয়ে দাও। যত হুজুগের দল নাকি বলেছে—দাদার মত দেখতে এক জন সন্ন্যাসীকে—ওই কাশী মথুরার দিকে দেখা গেছে। ব্যস—আর যায় কোথায়।

তা মা যদি যেতে চানই—

যেতে চাইলেই তো পাঠানো সম্ভব নয়—রেস্তর জোগাড় না হলে তীর্থধর্ম্মই বল—আর বাপের শ্রাদ্ধ, মেয়ের বিয়েই বল কোনটাই হবার জো নেই। রুধির—রুধির, সব আগে চাই রুধির।

মলয় কথা কইলে না। সংসারে এতকাল ব্যবস্থা যা করবার উনিই করেছেন—কোথা থেকে কি করলে ভাল হয় সে উনিই জানেন ভাল। এ বিষয়ে তার মতামতের কোন মূল্য নেই।

মেজদা বললেন, দাদা বিবাগী—তুমি উপার্জ্জন কর না—সংসারের যত দায় আমার। একলা মানুষ নিজের ছেলেপিলে পরিবার দেখব—না জমিজমা দেখব, না—মা বউদিকে দেখব বল। অথচ মার একটা ব্যবস্থা করা দরকার—খুবই দরকার। তাই ঠিক করলাম পুব মাঠের পাঁচ বিঘে জমি বিক্রী করে—মার ব্যবস্থা করে ফেলা যাক। তুমিও তো অংশীদার, তোমার মত চাই—বিক্রী কোবালায় সই চাই—তাই—

মলয় বললে, এ বিষয়ে আপনি যা ভাল বোঝেন করুন—সই সাবুদ যা দরকার করে দেব।

সুচিত্রা দু' কাপ চা ও কিছু খাবার নামিয়ে দিলে দু'জনের সামনে। মেজদার মুখের গাম্ভীর্য্য মিলিয়ে গেছে—প্রসন্ন মুখে উনি হাত বাড়িয়ে একটি পেয়ালা টেনে নিলেন—খাবারের প্লেট থেকেও কিছু খাবার নিলেন, চা খাওয়া শেষ করে বললেন, কাগজ পড় নিশ্চয়, খবর রাখ—তেভাগা ব্যবস্থায় আমাদের দফা রফা। জমির খাজনা টানতে হবে ষোল আনা—ঘরে আসবে না একটি আধলা। কিন্তু ফাঁকি দেব বললেই তো ফাঁকিতে ইচ্ছে করে পড়ে না কেউ। আইন ঠেকাবার ব্যবস্থা আমরাও জানি।

তারপর গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন, সবাইকে জমি ছাড়িয়ে দিয়েছি—ওরা ষ্টাম্প কাগজে লিখে দেয় যে হাল বলদ জমির সার ইত্যাদি যাবতীয় খরচ মালিকের কাছ থেকে পেয়ে চাষ করছি, তবেই—ভাগে দেব জমি।

মলয় বললে, সবাই কি হাল বলদ লাঙল দিতে পারবে?

এই বুদ্ধি নিয়ে বাস করলেই জমি তোমার থাকবে! হাল বলদ দেবে না ঢেঁকি। ওরা লিখে দেয় ভাল—না দেয় পথ দেখুক গে। আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়ে তিনি হেসে উঠলেন।

মলয় হঠাৎ উঠে ভিতরের দিকে গেল। সুচিত্রা ইতিমধ্যে তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছে—কয়লার ধোঁয়ায় ছোট ঘরটা গেছে ভরে। দাঁড়িয়ে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

সুচিত্রা বললে, মেজ বটঠাকুরকে খেয়ে যেতে বল না।

না—দাদা বাসায় গিয়েই খাবেন।

তা যাও—ওঁর সঙ্গে গল্প করগে—এখানে বড্ড ধোঁয়া।

তা হোক। একখানি পিঁড়ি পেতে মলয় বসে পড়লে সেইখানে। বললে, বাড়ি কালই যেতে চাও?

মানে—নিয়ে যাবার মালিক কে—

হাঁ—কালই চল। স্বরে জোর দিয়ে মলয় উঠে দাঁড়াল।

সুচিত্রা অবাক হয়ে ওর পানে চাইলে। বুঝলে ও মনে মনে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে—অস্বস্তি ভোগ করছে।

মলয় এ ঘরে আসতেই মেজদা বললেন, কি বলিস—কাল কাগজগুলো এনে সইসাবুদের ল্যাটা চুকিয়ে ফেলি—কেমন?

মলয় বললে, মার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা—

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন তিনি। তবেই করেছ ব্যবস্থা! উনি কি মানুষ আছেন—না বুদ্ধিশুদ্ধি—আর বলবেনই বা কি! টাকার দরকার তো বটেই—আর জমি না বেচলে—

মলয় তাড়াতাড়ি বললে, বেশ আপনি যা ভাল বোঝেন—

মেজদা খুসী মনে মাথা নাড়লেন। বললেন, এই এতটুকু বেলা থেকে মাথা দিয়েছি সংসারে। কিসে ভাল কিসে মন্দ সে হিসেব আমার যথেষ্ট আছে। একবার হয়েছিল কি জানিস—দশমীর দিন—

মলয় আর একবার উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করলে। মেজদা ইঙ্গিতটা বুঝে গল্পের জের আর টানলেন না। মলয়কে তিনি ভাল মতেই জানেন। দেখতেও পরম বিনয়ী—উঁচু গলায় কাউকে চড়া কথা বলে না কখনো—কিন্তু ওর অন্তরের কাঠিন্য—তার মত অনমনীয় বস্তু আর দ্বিতীয় নাই। কোথা থেকে আঘাত লেগে ওরা মুহূর্ত্তে অমন বদলে যায়—ওদের নীতির মাপকাঠিই বা কি—অন্যায় অপমান বোধ কোন্ তুচ্ছ কারণে উগ্র হয়ে ওঠে—এসব রহস্য আজও তিনি বুঝতে পারেন না। কব্জি উল্টে ঘড়িটা দেখে হঠাৎ তিনি সচকিত হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করলেন, ইস্—রাত হয়ে গেল দেখ! দাঙ্গাহাঙ্গামা না থাকলেও বিশ্বাস নেই এখানকার অবহাওয়াকে। উঠি।

তিনি চলে যেতেই মলয় নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলে। সে কেন মেজদার সর্ত্তে রাজী হয়ে গেল! একি তার দুর্ব্বলতা নয়! মনে স্বীকার করে যে নীতিকে মঙ্গলপ্রসূ বলে—মুখে তাকেই করলে অস্বীকার! যে জমির ওপর জীবন ধারণ করে মানুষ—তার স্বত্বে কেন সে স্বত্ববান হবে না। যাদের উপার্জ্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে—তাদের লোলুপ দৃষ্টি জমির উপস্বত্বে নাই বা রইল! জমি কি তারই যে খেয়ালখুসিমত হস্তান্তর করে দেওয়া চলবে!

এই বাড়ির ঘরে শুয়ে আকাশ দেখা যায় না—আকাশের নক্ষত্র তো দুর্লভ বস্তু। একটু ফাঁকা—একটু হাওয়া—রাতের পৃথিবীর সুপ্তিমগ্ন সামান্য দেহাংশ—এ না দেখতে পেলে আজ তার ঘুম আসবে না।

সুচিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, শরীর খারাপ লাগছে কি? হাওয়া করব?

না।—স্বর গম্ভীর—ভাঙ্গা-ভাঙ্গা।

তবে অমন করছ কেন? অন্ধকারে সরে এসে সুচিত্রা ওর কপালের ওপর একখানি হাত রাখলে।

মলয়ের মনে হ'ল এর চেয়ে চমৎকার সান্ত্বনা পৃথিবীতে নেই। নিস্তব্ধ পৃথিবীর নিঃসঙ্গ অন্ধকারে লক্ষচ্যুত হয়ে ও পরিভ্রমণ করছে। সৌধের অন্তরালে যে আকাশ হীরক-দ্যুতিতে অপরূপ হয়ে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে—তার সুরভি নিশ্বাস ওর উত্তপ্ত কপালে এসে লাগছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে—ঘুম আসবে এই মুহূর্ত্তে। (ক্রমশঃ)

ক্যাপশীয় রঙ্গ-চিত্র

শ্রীকানাইলাল সাহা

ইউরোপে প্রস্তর-যুগ আরম্ভের সময় মধ্য-ইউরোপের অ্যারিগ্‌-ন্যাক্ নামক স্থানে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, এর অনেক আগে আফ্রিকার টিউনিশিয়া প্রদেশের গ্যাফ্‌সা বা ক্যাপ্‌শিয়া নামক স্থানে আর একটি স্বতন্ত্র সভ্যতার সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় ক্যাপশিয়ান সভ্যতা। এর স্থিতিকাল প্রস্তর-যুগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত।

১ নং চিত্র

এই সভ্যতার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কোন কোন গবেষক বলেন: খৃষ্টের জন্মের প্রায় এগার হাজার বছর আগে এক দল ক্যাপশিয়ান অভিযাত্রী জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে উপস্থিত হয়। ক্রমে তারা আধিপত্য স্থাপন করে স্পেনের পূর্ব দিকে। এই অভিযাত্রী দলই স্পেনে ক্যাপশিয়ান সভ্যতাবিস্তারের অগ্রদূত।

কোন কোন গবেষকের অনুমান: স্পেন অভিযানের পূর্বে আর এক দল ক্যাপশিয়াবাসী বর্তমান সিসিলি দ্বীপের ওপর দিয়ে ইটালী দেশে চলে যায়। এই সময় দুটি সংকীর্ণ ভূমি-খণ্ড দ্বারা সিসিলি টিউনিশিয়া ও ইটালীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এই অভিযাত্রীদের দ্বারাই ক্যাপশিয়ান শিল্পের ধারাটুকু ইটালীতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে এই শিল্পের ধারা গ্রিম্যাল্‌ডির (Grimaldi) শিল্পের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় ক্যাপশিয়ান সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়।

খ্রীষ্টের জন্মের সাত হাজার বৎসর পূর্বে যে সংকীর্ণ স্থলভাগ টিউনিশিয়া ও সিসিলিকে সংযুক্ত ক'রে রেখেছিল তা সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হওয়ায় ক্যাপশিয়াবাসীদের ইটালী অভিযান বন্ধ হয়।

গবেষকগণ বলেন: অ্যারিগ্‌ন্যাকের অধিবাসীরা ফ্রান্সের দক্ষিণে, পৌঁছুবার অল্পদিন পরেই ক্যাপশিয়াবাসীরা জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে হাজির হয়। কারো কারো মতে, অ্যারিগ্‌নেশীয় ও ক্যাপশীয় শিল্পের উদ্ভব একই উৎস ও মনোবৃত্তি থেকে। এই সময় ডাকিনী-বিদ্যার প্রচলন ছিল। এই ডাকিনী-বিদ্যার করণ-কারণ থেকেই যে চিত্র-কলার উদ্ভব এ কথা বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্বীকার করেন। গবেষকদের ধারণা, ক্যাপশিয়াবাসীদের অদ্ভুত ধরণের ছবিগুলির সঙ্গে যাদু-বিদ্যার একটি অতি নিকট সম্বন্ধ আছে।

ক্যাপশিয়ার অধিবাসীদের চকমকি পাথরের তৈরি বহু লম্বা সরু সরু যন্ত্রপাতি ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরবর্তী টিউনিশিয়া প্রদেশ থেকে মরক্কো প্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভূখণ্ডের মধ্যে পাওয়া গেছে। তারা উঁচু পাহাড়ের ঝোলানো পাথরের ওপর ছোট ছোট ছবি আঁকতে ভালবাসত এবং এ সম্বন্ধে তাদের আগ্রহও ছিল খুব বেশী। এই সব ছবিতে তাদের জীবনধারণের প্রণালী খুব স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত। এই ধরণের যে সব ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে তার চরম উন্নতি হয়েছিল প্রস্তর-যুগের প্রথম দিকেই।

ক্যাপশিয়াবাসীরাই সম্ভবতঃ রঙ্গ-চিত্রের প্রবর্তক। এদের

২ নং চিত্র

আঁকা মানুষের ছবিগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত ধরণের ও কৌতুকপ্রদ। দেখে মনে হয়, কতকগুলি কাঠি জোড়া দিয়ে যেন মানুষের মূর্তি খাড়া করা হয়েছে (১নং চিত্র)। এইসব মূর্তির কোনটির মাথায় পালকের টুপি পরানো, কোনটির মাথায় আবার কয়েকটি পালক গোঁজা।

পুরুষদের ছবির অধিকাংশই নগ্ন, নীচের ও ওপরের হাতে তাগা-বালার মত গহনা পরানো এবং কাঁধের ওপর ঝোলানো আছে একটি ঝালর-দেওয়া পোশাক। মেয়েদের ছবিগুলি কিন্তু নগ্ন নয়। গায়ে আঁট-সাঁট ঘাঘরা পরানো, কটিতে একটি কোমরবন্ধ এবং মাথায় লম্বা টুপি। এদের কোমর আঁকা হয়েছে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী সরু করে (২নং চিত্র)।

ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চিত্রকলার বিশেষত্ব, প্রত্যেকটি মূর্তি যেন জীবন্ত এবং প্রত্যেকটিতে অঙ্গ-চালনার ভঙ্গীটুকু পরিস্ফুট। এই অঙ্গভঙ্গী আবার অভিব্যক্ত করা হয়েছে উদ্ভট

৩ নং চিত্র

ভাবে। পুরুষরা সব চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে (৩ নং চিত্র)। এদের আঁকা কয়েকটি শিকারের ছবিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ছবিগুলিতে শিকার-রত তীরন্দাজদের ক্ষিপ্রতা খুব স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত (৪ নং চিত্র)।

পণ্ডিতেরা বলেন: এই যুগের শিকারী-শিল্পীরা নিজেদের গতির ক্ষিপ্রতা বাড়াবার উদ্দেশ্যেই ছবিতে গতি-ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করত। ছবিতে যে গতি-ভঙ্গী প্রকাশ করা হবে তার প্রত্যক্ষ ফলটুকু বর্তাবে শিল্পীর নিজেরই ওপর, এই ছিল তাদের ধারণা। এই ক্ষিপ্র গতির প্রভাবেই তারা ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠবে সুদক্ষ শিকারী, এ ধারণাও যে তারা পোষণ করত তা কতকটা অনুমান করা যায়।

এই ছবিগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এই যুগের শিল্পীদের শিল্পের প্রধান অঙ্গ ছিল গতি-ভঙ্গীর (Movement Speed) অভিব্যক্তি। সুনিপুণ রেখাপাতে এই যুগের শিল্পীরা তাদের শিল্পগত বৈশিষ্ট্যটুকু এমন স্পষ্টভাবে রূপায়িত করেছে যে, বর্তমান শিল্পীদের চোখে তা সত্যিই বিস্ময়ের বস্তু। শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তাদের কৃতিত্বের প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

এই যুগের শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি মানুষের ছবি থেকে সে যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনধারার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। তাই এই ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খুবই বেশী।

৪ নং চিত্র

স্পেনের পূর্ব-ভাগে যে সব ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, সে যুগের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করত। অনেক গবেষক তাই অনুমান করেন যে তাদের নগ্ন পুরুষের ছবিগুলি আঁকা হয়েছে চিত্রকলার উদ্ভবের প্রথম দিকে। এই সময় ডাকিনী-বিদ্যার প্রভাব ছিল অত্যধিক। শিল্পী বোধ হয় এই ডাকিনী-বিদ্যার কোন করণ-কারণের গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই বাধ্য হয়েছে নগ্ন মূর্তি আঁকতে।

এই সময়ের শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি শিকারের ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব ছবিতে দেখা যায় পুরুষরা শিকার করছে দল বেঁধে (৫ নং চিত্র), আর মেয়েরা নৃত্যে মেতে উঠেছে (৬ নং চিত্র)।

প্রথম অবস্থায় ক্যাপশিয়াবাসীরা শিকারের আশায় বনের ভেতর ঘুরে বেড়াত। এই সময় সাহারা প্রদেশ এখনকার মত শুষ্ক মরুভূমি ছিল না। এর পশ্চিম দিকটি ছিল শিকারের একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র। সিংহ, ভল্লুক, হায়েনা, জিরাফ, বুনো ষাঁড়, হরিণ, জেব্রা, জলহস্তী, উটপাখী প্রভৃতি বন্য জীবজন্তুর বিহার-ভূমি। ক্রমে সাহারা প্রদেশ যখন মরুভূমিতে পরিণত হতে লাগল এই সব জীবজন্তু তখন চলে গেল দক্ষিণ-আফ্রিকার অভিমুখে। একদল ক্যাপশিয়াবাসী শিকারীও তাদের অনুসরণ করতে করতে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যায়। এই ভাবে তাদের কৃষ্টির খানিকটা দক্ষিণ আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

কেউ কেউ বলেন: স্পেনের ক্যাপশিয়ান অভিযাত্রীরা পশু-শিকারের তত পক্ষপাতী ছিল না। ম্যাগডালেনিয়ার শিকারীদের অনুকরণে তারা ক্রমে মৎস্য-শিকারে অভ্যস্ত হয়। এই সময় তাদের রুচিরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। অবসরকালে তারা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ছবি আঁকত। এই ছবি আঁকা ছিল তাদের অবসর বিনোদনের খেলা।

ক্যাপশিয়াবাসীরা জীবজন্তুর ছবি আঁকা সুরু করে ম্যাগ-ডালেনিয়াবাসীদের প্রভাবে, গবেষকদের অভিমত এইরূপ। ফ্রো-মাঞ্জে গুহায় অনেক শিল্পীর নিজের প্রতিকৃতির সঙ্গে

৫ নং চিত্র

জীবজন্তুর ছবি আঁকা রয়েছে দেখা যায়। এই সব ছবি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, এগুলি ক্যাপশিয়ান শিল্পীদেরই আঁকা। তাঁদের এই ধারণাটুকুর যাথার্থ্য প্রমাণের সপক্ষে বলা যেতে পারে যে, মানুষের মূর্তি আঁকতে ক্যাপশিয়ান শিল্পীরাই ছিল সিদ্ধহস্ত। পূর্ব স্পেন বা দক্ষিণ ফ্রান্সে মনুষ্যমূর্তি আঁকার প্রচলন হয় ক্যাপশিয়াবাসীদের স্পেন-অভিযানের পর। আবার মনুষ্যমূর্তিকে রেখাবদ্ধ করে অঙ্কনের প্রবর্তক এই ক্যাপশিয়ান শিল্পীরাই। তাই মনুষ্য-মূর্তিসহ শিকারের ছবিগুলি ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের আঁকা—তাঁদের এই মত সঠিক বলেই মনে হয়।

পূর্ব-স্পেনের ছবিগুলিতে একটি জিনিষ কিন্তু লক্ষ্য করবার আছে। উভয় সভ্যতার শিল্পীদের চিত্রকলা পাশাপাশি গড়ে উঠলেও প্রত্যেকেই কিন্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখবার চেষ্টা করেছে।

ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চিত্রকলাকে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :—

(১) প্রথম অবস্থায় এরা ছোট ছোট মূর্তি আঁকত। এগুলির অঙ্কন-প্রণালী অতি সাধারণ, তাই এগুলিকে চিত্রকলার নিদর্শন হিসাবে না ধরে রেখাচিত্রের প্রাথমিক পদ্ধতি হিসাবে ধরে নেওয়াই ভাল।

(২) ক্রমে এরা অভ্যস্ত হয়ে উঠল একরঙা রেখা-চিত্রে। এগুলিতে প্রকৃত চিত্রকলার কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

(৩) এর পরের অবস্থার ছবিগুলি বড় বড়। এগুলির অঙ্কন-প্রণালী আর একটু উন্নত ধরণের। এই ধারার রেখা-চিত্রগুলিতে তারা আলো-ছায়ার খেলা দেখাতে সুরু করে।

(৪) তার পর সুরু হয় একরঙা ছবিতে আলো-ছায়ার খেলা। এই আঙ্গিকের ছবিগুলিতে ওদের শিল্পবোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) একরঙা ছবিগুলি ক্রমে একঘেয়ে বোধ হওয়ায় তারা দ্বিবর্ণ ও বহু বর্ণের ছবি আঁকতে সুরু করে। এই সময়ই তাদের চিত্রকলার চরম উন্নতি হয়।

(৬) শেষ অবস্থায় বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রভাবে ক্যাপশিয়ান চিত্রকলার অঙ্গহানি হয়। তাই ধীরে ধীরে ওদের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে থাকে।

ক্যাপশিয়ান চিত্রকলার উৎকর্ষের কালের বিভিন্ন জায়গায় আঁকা ছবিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক এক জায়গার ছবির আঙ্গিক এক এক ধরণের। এই সব ছবির মধ্যে মানুষের ছবিগুলির বিভিন্ন ভঙ্গী লক্ষ্য করবার মত। অনেকে অনুমান করেন, বিভিন্ন ছবিতে রকমারি পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করার জন্যেই এই পার্থক্যটুকু ঘটেছে।

৬ নং চিত্র

এদের আঁকা রঙ-লেপা (silhouette) ছবিগুলিও আকর্ষণ-যোগ্য। এগুলির অঙ্কন-প্রণালী ম্যাগডালিয়ায় শিল্পের মত হলেও ক্যাপশিয়ান্ শিল্পের বৈশিষ্ট্যটুকু সম্পূর্ণভাবে বজায় আছে।

ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চলমান (chattel) শিল্পের কোন নমুনার সন্ধান পাওয়া না গেলেও অনেকের ধারণা, তারা এই জাতীয় শিল্পের সঙ্গেও পরিচিত ছিল। এদের চলমান শিল্পের নমুনাগুলি ম্যাগডালিয়ার শিল্পের নিদর্শনের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেগুলির শ্রেণী বিভাগ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

পূর্ব-স্পেনে ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের আঁকা মণ্ডনশিল্পের নিদর্শন—পোশাক পরিহিত ছবিগুলির সঙ্গে মিশরবাসীদের অলঙ্করণ শিল্পের অনেকটা মিল দেখা যায়।

কারো কারো মতে উভয় অঞ্চলের শিল্পীরা হয়তো একই সময়ে এই আঙ্গিক উদ্ভাবন করে। কেউ আবার বলেন: মিশরবাসীরা তাদের ব্যবহার করা পোশাকগুলি অতি যত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিল। ক্রমে ওদের মণ্ডন-শিল্পের (Decorative Art) আঙ্গিকটুকু আয়ত্ত করে নিজেদের চিত্রকলায় তা প্রতিফলিত করতে সুরু করে।

শেষের যুক্তিটিই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন। স্পেনের চিত্রকলার আবির্ভাব হয়েছিল নব্য প্রস্তর (Neolithic) যুগের অধিবাসীদের ইউরোপ অভিযানের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে। মিশরে সভ্যতার আলো বিকীর্ণ হয় কিন্তু এর অনেক পরে।

জলধর সেন

১৮৬০—১৯৩৯

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম; শৈশব-শিক্ষাঃ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ (১২৬৬, ১ চৈত্র) নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে জলধরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—হলধর সেন। "আমার বয়স যখন তিন বছর,...সেই সময়ে আমার পিতার মৃত্যু হয়।...পিতার মৃত্যুর পর আমরা শুধু পিতৃহীন হলাম না, পথের ভিখারী হয়ে পড়লুম।"

জলধর শৈশবে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে জলধর গোয়ালন্দ স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৭৮ সনে তিনি কুমারখালী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন; পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি থার্ড গ্রেড জুনিয়ার স্কলারশিপ লাভ করেন। এই বৎসর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া সেকেণ্ড গ্রেড স্কলারশিপ লাভ করিয়াছিলেন।

"গণিতের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল বলিয়া জলধর ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইবেন। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সেসন্ জুন মাসে আরম্ভ হইত, এজন্য ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পর তিনি কয়েক মাস বাড়ীতেই বসিয়া ছিলেন। সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় একই স্থানের অধিবাসী। তিনি সে সময় এম-এ পড়িতেছিলেন। জলধরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রবেশের ইচ্ছা শুনিয়া তিনি জানান যে, গরীবের পক্ষে উহার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। তিনি জলধরকে জেনারেল লাইনেই প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। বলিলেন ১০৲ টাকা স্কলারশিপ আছে, আর ৪।৫ টাকা হলেই কলিকাতার খরচ চলিয়া যাইবে। কলিকাতায় গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিলে বিনা মাহিনায় তাঁহার কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।...

কলিকাতায় আসিয়া জলধর এক পুরাতন বন্ধুর বাসায় উঠেন এবং পরদিন প্রাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। এই সাক্ষাতের বিবরণ তাঁহার মুখের কথায় যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাই হুবহু এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।...

বিদ্যাসাগর বললেন—'একজামিনের রেজাল্ট ত ডিসেম্বর মাসে বেরিয়েছে, তুই এই এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত কি করছিলি?' আমি তখন অল্প কথায় আমার বিলম্বের কারণ তাঁকে জানালাম, আর আমার দুরবস্থার কথাও বললাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিস্তব্ধ ভাবে আমার দিকে চেয়ে, আমার দুঃখ কষ্টের কাহিনী শুনলেন। তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—

পরিব্রাজক-বেশে জলধর সেন

'তাইত রে, আমার কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে বোধ হয় স্থান নেই, সব ভ'রে গিয়েছে। দাঁড়া জিজ্ঞাসা করছি।' এই ব'লে, সুর্য্যিবাবুকে ডাকলেন। তিনি এলে বললেন—'দেখ সুর্য্যি, এ ছেলেটি তোমাদের দেশের, এর বাড়ী কুমারখালী। এ ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্ত্তি হ'তে চায়। ভাল ছেলে হে, স্কলারশিপ পেয়েছে।' সুর্য্যিবাবু বললেন, 'আর ছেলে নেবার উপায় নেই, সব ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে।' বিদ্যাসাগর মশায় তখন আমার দিকে চেয়ে বললেন—'শুনলি ত, এ বছর আর আমার কলেজে স্থান হবে না। এ বছরটা অন্য কলেজে ভর্ত্তি হ, আসছে বছর তোকে সেকেণ্ড ইয়ারে নেবো। মাইনে টাইনে কিছু দিতে হবে না।' তার পরই একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—'দ্যাখ তোর কথা যা শুনলুম, তোর খরচ চলবে

কি ক'রে? এই ধর না কেন, জেনারেল এসেম্ব্রীতে যদি ভর্ত্তি হ'তে পারিস, তা হলে তারা ৫৲ মাইনে নেবে,—

জলধর সেন

স্কলারশিপওলাদের এক টাকা রেহাই দেয়। তা হলে আর তোর ৫৲ টাকা থাকলো, তাতে চলবে কি ক'রে রে?' এ কথার আমি আর কি উত্তর দেবো, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি তখন বললেন—'মনে কিছু করিস না, এ বছর তোর কলেজের মাইনে আমি দেবো। তার পর, সেকেণ্ড ইয়ারে ত এখানেই আসছিস। তাই যা, জেনারেল এসেমব্লীতে খোঁজ নে গিয়ে। শুনেছি তারা ভর্ত্তি করে, তাদের বেশী ছেলে হয় নি। আজই সেইটে ঠিক ক'রে, কাল সকালে আবার আমার এখানে আসিস্—বুঝলি?'

আমি তখন কেঁদে ফেলেছি। মানুষের হৃদয়ে যে এত দয়া থাকতে পারে, এ আমি জানতাম না। আমার সেই অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উঠে এসে, আমার মাথায় হাত দিয়ে, যে একটি কথা বলেছিলেন, সে কথা এখনও আমার মনে আছে। বললেন—'ওরে পাগল, দারিদ্র্য অপরাধ নয়। আমিও তোর মত দরিদ্র ছিলাম। যা, কাল আসিস্।' ("দয়ার সাগর ও দীন জলধর": শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।—'জলধর-কথা,' ১৩৪১,)

১৮৭৯ সনে জলধর জেনারেল এসেমব্লীজ ইনষ্টিটিউশনে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮০ সনের শেষে তিনি এল. এ. পরীক্ষা দিলেন বটে কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।

গোয়ালন্দে মাষ্টারি: এল. এ. ফেল করিয়া জলধরকে চাকুরীতে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। ১৮৮১ সনে তিনি ২৫৲ বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার বড় দাদা (জ্যেষ্ঠতাতপুত্র) তখন গোয়ালন্দের ফৌজদারী আদালতের পেশকার; তিনিই চেষ্টা করিয়া চাকুরীটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

বিবাহ: গোয়ালন্দে মাষ্টারি করিবার সময় জলধরের বিবাহ হয় (ইং ১৮৮৫)। তিনি লিখিয়াছেন:—

"সেই যে ৮১ অব্দে ২৫৲ টাকা বেতনে মাষ্টারী আরম্ভ করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আমার সে মাইনে আর বাড়ে নি। ঐ সালের শেষ ভাগে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তাঁরা আমার বেতন ৫৲ টাকা বাড়িয়ে দিলেন।...আমার এ বেতন বৃদ্ধির কারণ এই যে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা নানাভাবেই জানতে পেরেছিলেন যে আমাদের দরিদ্র সংসারে আর একটি লোক বৃদ্ধি হয়েছে। সেই নবাগত লোকটির খোরাকি বাবদ তাঁরা আমার ৫৲ বেতন বৃদ্ধি ক'রে দেন। সে নবাগত আর কেহ নন—আমার স্ত্রী। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।" ("স্মৃতি-তর্পণ": 'ভারতবর্ষ,' মাঘ ১৩৪২)

সাহিত্যানুরাগ: শৈশব হইতেই মাতৃভাষার প্রতি জলধরের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। গোয়ালন্দে অবস্থিতিকালে তিনি কাঙ্গাল হরিনাথের মাসিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য় মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ (জুন ১৮৮১) সংখ্যায় "পূর্ণচন্দ্র" নামে তাঁহার একটি সুলিখিত সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছি। উত্তরকালে জলধর সাংবাদিকের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সংবাদপত্র-সেবায় তাঁহার হাতে খড়ি হয়—সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য়। গোয়ালন্দে মাষ্টারি-কালে তিনি বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সহযোগে, কিছু দিন (বৈশাখ ১২৮৯—আশ্বিন ১২৯২) সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

প্রবাস-যাত্রা: ১৮৮৭ সন জলধরের জীবনে একান্ত দুর্বৎসর। এই বৎসর তাঁহাদের পরিবারে শোকের গভীর ছায়াপাত হইয়াছিল। তিনি "শোকসন্তপ্ত, অধীর চিত্তকে সংযত করিবার জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া এক অনির্দ্দিষ্ট দেশে যাত্রা" করিলেন। তাঁহার "স্মৃতি-তর্পণে" প্রকাশ:—

"পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার [জানুয়ারি ১৮৮৭] নয় মাস পরে এক দিন অপরাহ্ণে গোলদীঘির ধারের ফুটপাথের উপর অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে আমার দেখা।...অশ্বিনীকুমার [দত্ত] সেই রাস্তার মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ধ'রে তিরস্কার ক'রে বললেন, হাঁারে জলধর, এত নিষ্ঠুর তুই,—এই ন' মাসের মধ্যে একটা খবরও দিলি নে। আমি শুষ্ক মুখে বললাম—খবর তো কিছু নেই দাদা,—সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে।

সে কি, আমি যে বুঝতে পারছি নে! আমি বললাম— শুনবেন দাদা! আপনার সঙ্গে শেষ দেখার চার মাস পরে আমার একটি কন্যা-সন্তান হয়। বার দিন পরেই সেটি মারা যায়। তার বার দিন পরেই আমার গৃহিণীও সেই পথে যান। তার তিন মাস পরে আমার মাতাঠাকুরাণীও চলে গিয়েছেন। এখন আমি হিমালয়যাত্রী।...

দুই মিনিট পরেই আত্মসম্বরণ ক'রে অশ্বিনীকুমার ধীরে ধীরে বললেন—"জলধর, এ আনন্দের হাট সকলের ভাগ্যে বেশী দিন টিকে না। হিমালয়ে যাচ্ছ, যাও। দেখ, যদি শান্তি পাও।" ('ভারতবর্ষ,' মাঘ ১৩৪২)

নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে জলধর শেষে ডেরাডুনে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই নি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি। কালীকান্ত সেন নামে বরিশাল জেলাবাসী এক শিক্ষিত ভদ্রলোক ডেরাডুনে এক ইংরেজী স্কুল খুলেছিলেন। আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম ডেরাডুনে এই মাষ্টারজীর আশ্রয়লাভ করি।

মাষ্টারজী আমাকে পেয়ে বসলেন। তিনি বললেন— হিমালয়ে বেড়াতে হয় বেড়াবেন, যখন যেখানে ইচ্ছা যাবেন— একটা আড্ডা তো দরকার। যখন আমার এখানে এসেছেন, হিমালয়-ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এইখানে এসেই বিশ্রাম করবেন এবং সেই বিশ্রাম-সময়ে আমার স্কুলে ছেলেদের পড়াবেন।...

কি করি,—ভদ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেবেন, শীতবস্ত্র দেবেন—তার পরিবর্ত্তে যখন ডেরাডুনে থাকব তখন তাঁর স্কুলের ছেলেদের অঙ্কশাস্ত্রে গাধা বানাব।" ('ভারতবর্ষ,' ফাল্গুন ১৩৪২)

১৮৯০ সনের ৬ই মে জলধর ডেরাডুন হইতে বদরিকাশ্রম যাত্রা করেন। হিমালয়-ভ্রমণ শেষ করিয়া কিছু দিন পরে পুনরায় ডেরাডুনে ফিরিয়া আসেন।

মহিষাদলে মাষ্টারি : মুসাফিরকে শেষ পর্য্যন্ত পুনরায় সংসারে বাসা বাঁধিতে হইল। দীনেন্দ্রকুমার রায় "সে কালের স্মৃতি" কথায় বলিয়াছেন :—

"কিছু দিন পরে জলধর বাবু দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি কুমারখালী ফিরিলে শুনিতে পাইলাম, তিনি লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া তাপিত চিত্ত শীতল করিবার জন্য হিমাচলের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনেক দুর্গম তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রয়েও কালযাপন করিয়াছিলেন ; অবশেষে তিনি কোন মহাজ্ঞানী সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, সেই সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের সময় হয় নাই ; তাঁহার ভাগ্যে আছে—তাঁহাকে দীর্ঘকাল সংসারধর্ম্ম করিতে হইবে, তিনি পুরা সংসারী হইবেন, তাঁহার সংসারধর্ম্মের সকলই বাকি ; তিনি কিরূপে সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন? সাধু তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহার সন্ন্যাসী হওয়া হইল না, তাঁহাকে লোটা-কম্বল ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতে হইল।...

কুমারখালী প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সাহিত্যসাধনায় কাঙ্গালের সাহচর্য্য অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু সংসারী হইবার জন্য আর তাঁহার আগ্রহ হইল না। কিন্তু কাজকর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তিনি কষ্টকর মনে করিলেন। তিনি সংসারত্যাগের পূর্ব্বে মাষ্টারী করিতেন ; কোথাও মাষ্টারী পাইলে আবার ছেলে পড়াইতে আরম্ভ করিবেন— বন্ধুগণের নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

এই সময় আমি মহিষাদলে আসিয়া স্কুলের শিক্ষকের খাতায় নাম লিখাইয়া শিক্ষকরূপে এল, এ, পরীক্ষা দিব— এইরূপ স্থির হইয়াছিল। এ কালের মত সে কালেও কেহ 'প্রাইভেট ষ্টুডেন্ট'-রূপে এল, এ, বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারিত না। মাষ্টারীর লেজুড় জুড়িবার প্রয়োজন হইত।

মহিষাদল স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল। শিক্ষকের জন্য কোন কোন ইংরেজী কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। কাকাই স্কুলের কর্ত্তা ; আমি তাঁহাকে বলিলাম, তৃতীয় শিক্ষকের গণিতে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন ; জলধর বাবু গণিতে বিশেষজ্ঞ। আমি তাঁহাকে জানি, আপনারা ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর শিক্ষক পাইবেন না ; এতদ্ভিন্ন, আমি মাষ্টারী করিয়া এল, এ, দিব, অথচ আমি গণিতে এত কাঁচা যে, কোন গণিতজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। জলধর বাবু যদি দয়া করিয়া আমাদের বাসায় থাকেন, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে সর্ব্বদাই তাঁহার সাহায্য পাইতে পারি ; তিনি চেষ্টা করিলে হয়ত গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিতে পারিবেন।...আমার চেষ্টা সফল হইল। জলধর বাবু মহিষাদল স্কুলে চাকুরী করিতে আসিলেন। ম্যানেজারের বাসের অট্টালিকার কয়েক গজ পশ্চিমে মৃৎ-প্রাচীর পরিবেষ্টিত একখানি খড়ের ঘর ছিল ; সেই ঘরে আমি ও জলধর বাবু একত্র বাস করিতাম। আমি তাঁহার নিকট অঙ্ক শিখিতাম। সেই সময় হইতে তিনি আমার 'মাষ্টার মশায়'। আমি তাঁহার নিকট গণিতবিদ্যা শিখিতাম বটে, কিন্তু সে সময় আমাদের সাহিত্যালোচনারও বিরাম ছিল না।" ('মাসিক বসুমতী,' ভাদ্র ১৩৪০)

১৮৯১ কি ১৮৯২ সনে জলধর ৪০৲ বেতনে মহিষাদল রাজস্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহিষাদলে থাকিতেই তাঁহার হিমালয়-ভ্রমণ-কাহিনী 'ভারতী ও বালক,' 'ভারতী,' 'সাহিত্য' ও 'জন্মভূমি'তে ক্রমশঃ প্রকাশিত

হয়। এ বিষয়ে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ—১২৯৯ সালের মাঘ-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' মুদ্রিত "টপকেশ্বর ও গুচ্ছপাণি"। জলধর লিখিয়াছেন :—

"যখন আমি হিমালয়ের মধ্যে ছিলাম, সেই সময়ে আমার আর কিছুই সম্বল ছিল না, সুধু সম্বল ছিল কাঙ্গাল হরিনাথের বাউলের গানের একখানি বই। আমার এক বন্ধু সেই বইখানির দুরবস্থা দেখিয়া যখন ভাল করিয়া বাঁধাইয়া দেন, তখন তিনি তাহার সহিত কয়েক পৃষ্ঠা সাদা কাগজ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি সেই সাদা পৃষ্ঠাগুলিতে আমার ভ্রমণের কথা একটু-আধটুকু লিখিয়া রাখিতাম,—ওটা একটা খেয়াল-মাত্র; পরে যে কিছু করিব, একথা ভাবিয়া লিখিতাম না; সে অভিপ্রায় থাকিলে যথাযথভাবে অনেক কথা লিখিয়া রাখিতে পারিতাম। যখন মহিষাদলে গেলাম, তখনও ঐ বইখানি আমার সঙ্গে ছিল,...মহিষাদলে এক দিন দীনেন্দ্রবাবু আমার সেই গানের বইখানি দেখিতে পান এবং পেন্সিলে লেখা সেই কথাগুলিও পড়েন। সে সময়ে তিনি 'ভারতী'তে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং 'ভারতী'-সম্পাদিকা মহাশয়াও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। দীনেন্দ্রবাবু আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, আমার হিমালয়-ভ্রমণকথা 'ভারতী'তে লিখিতে হইবে। আমি ত কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলাম। শৈশবকাল হইতে যদিও একটু আধটুকু লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতাম, কাগজপত্রেও সামান্য কিছু লিখিতাম; কিন্তু বাঙ্গালা দেশ ত্যাগের পর হইতে লেখাটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।...কিন্তু দীনেন্দ্রবাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না, জোর করিয়া হিমালয়-ভ্রমণের প্রথম প্রস্তাব লিখিয়া লইলেন এবং নিজেই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া 'ভারতী' পত্রে প্রেরণ করিলেন।...সম্পাদিকা মহাশয়া আমাকে জানাইলেন যে, আমার হিমালয় ভ্রমণ পাঠকগণের ভাল লাগিয়াছে, এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন।...সে যাহাই হউক, আমি 'ভারতী'তে লিখিতে লাগিলাম।...হিমালয়ের কথা তাহার পূর্ব্বে কেহ বাঙ্গালায় হয়ত লেখেন নাই; তাই আমার লেখা যা তা-ই সকলে পড়িতে লাগিলেন। তখন আমার সেই প্রবাস পল্লী হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে, 'জলধর সেন' নামে কোন ব্যক্তি নাই, ঠাকুরবাড়ীর কেহ ছদ্ম নামে হিমালয়-কাহিনী লিখিতেছেন।...আমি যখন 'ভারতী'তে হিমালয়-ভ্রমণ লিখিতে আরম্ভ করি, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ইউরোপযাত্রীর পত্র' প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমি হিমালয় লিখিবার সময় তাঁহারই অতুলনীয় লিখন-পদ্ধতি (style) অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছিলাম;...সে সময় হয়ত বা ঐ লিখন-পদ্ধতি দেখিয়াই অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন।...যাক্‌ সে কথা। আমি প্রায় দুই বৎসর ক্রমাগত লিখিয়া 'ভারতী' পত্রে আমার হিমালয়-ভ্রমণের এক অংশ শেষ করিয়াছিলাম; তাহাই একত্র সংগ্রহ করিয়া পরে 'হিমালয়' ছাপাইয়াছিলাম।" ("ভারতী-স্মৃতি" : 'ভারতী,' বৈশাখ ১৩২৩)

বিপত্নীক জলধরকে সংসারী করিবার জন্য তাঁহার মহিষাদলের বন্ধুরা বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে ডায়মণ্ড-হারবারের সন্নিহিত উস্তি গ্রামের দত্ত-পরিবারে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন, "বিবাহের পর জলধর বাবু মহিষাদলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী দীর্ঘকাল পরে সংসারী হইলেন দেখিয়া আমি রাজসাহীতে চাকরি করিতে চলিলাম। সে বোধ হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা।" ('মাসিক বসুমতী,' আশ্বিন ১৩৪০)

'বঙ্গবাসী' ঃ প্রায় আট বৎসর মহিষাদলে কাটাইয়া জলধর সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির চেষ্টায় তিনি মাসিক ৩০৲ বেতনে 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করিবার সুবিধা পাইলেন (ইং ১৮৯৯)। কিন্তু 'বঙ্গবাসী'র মূলমন্ত্রের সহিত নিজকে খাপ খাওয়ান তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি "দেড় মাস সেবা করবার ভান ক'রে অবশেষে অব্যাহতি লাভ" করিলেন। ('ভারতবর্ষ,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩)

'বসুমতী' ঃ ১৮৯৬ সনের ৮ই আগষ্ট (২৫ শ্রাবণ ১৩০৩) 'বসুমতী' সাপ্তাহিকরূপে জন্মলাভ করে। ১৮৯৯ সনের ২৭এ এপ্রিল (১৩০৬, ১৫ বৈশাখ) হইতে জলধর সহকারী সম্পাদক রূপে 'বসুমতী'তে যোগদান করেন।* কিছু দিন পরে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলে জলধরই 'বসুমতী'র সম্পাদক হন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"১৩০৬ সালের...পূজা কেটে গেল। আমরা অবকাশান্তে এসে কার্য্যে যোগদান করলাম। সেই সময়েই অতর্কিতভাবে আমাদের নিরুপদ্রব শান্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হ'ল, 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রবাবুর সহিত সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবুর সংঘর্ষ উপস্থিত হ'ল।...এই সংঘর্ষের ফলে পাঁচকড়ি বাবু 'বসুমতী' থেকে বিদায় পেলেন এবং তাঁর স্থানে আমি সম্পাদক

---

* দীনেন্দ্রকুমার রায় "জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা" নামে আলোচনায় ('মাসিক বসুমতী,' ভাদ্র ১৩৪৩, পৃ. ৮৯৫) এই তারিখ দিয়াছেন। তারিখটি ঠিক বলিয়াই মনে হয়। মনে রাখা দরকার, জলধরের 'প্রবাস-চিত্র' প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে, তখন তিনি কলিকাতায়। সমাজপতি যখন নিজ প্রেসে 'প্রবাস-চিত্র' ছাপিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহার পরামর্শে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে পুস্তকের প্রকাশক হইতে অনুরোধ করিবার জন্য জলধর মহিষাদল হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন —এ কথা জলধর নিজেই বলিয়াছেন ('ভারতবর্ষ,' বৈশাখ ১৩৪৩ দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনার "তিন-চার মাস পরে" তিনি মহিষাদল ত্যাগ করিয়া 'বঙ্গবাসী'তে যোগদান করেন এবং দেড় মাস পরে 'বসুমতী'র সহকারী সম্পাদক হন।

নিযুক্ত হলাম।...অতবড় একখানা কাগজ আমি একলা কি ক'রে চালাই।...আমার তখন মনে হ'ল সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র-কুমার রায় মহাশয়ের কথা। তিনি তখন সুদূর বরোদায় শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা ভাষা শিখাচ্ছিলেন। তাঁরা দুই জন ব্যতীত সেখানে আর বাঙালী ছিল না। দীনেন্দ্রবাবুর কাজ-কর্ম্ম খুব কমই ছিল এবং অবসরও যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তিনি বাঙালীর সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, এ কথা আমি জানতাম।* আমি তখন উপেন্দ্র বাবুর সম্মতি নিয়ে বরোদায় দীনেন্দ্রবাবুকে পত্র লিখলাম। তিনি সানন্দে আমার সহযোগী হ'তে সম্মত হলেন এবং দশ পনর দিনের মধ্যে কলিকাতায় এসে আমার পাশে বসে তিনিও হাঁফ ছাড়লেন—আমিও হাঁফ ছাড়লাম।" ('ভারত-বর্ষ,' আষাঢ় ১৩৪৩)। প্রায় আট বৎসর কাল জলধর যোগ্যতার সহিত 'বসুমতী'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ১৩১৩ সাল অশুভ মূর্ত্তিতে দেখা দিল। জলধরের সংসারে রোদন-রোল উঠিল; তিনি একে একে কনিষ্ঠ সহোদর ও ভগিনীকে হারাইলেন। পূজার পরেই তাঁহার কন্যা ও পত্নী কলেরায় আক্রান্ত হইলেন। কন্যাটিকে বাঁচান গেল না। তিনি কলেরার কবল হইতে রুগ্না পত্নীকে ছিনাইয়া লইয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে দেশে যাত্রা করিলেন। দীনেন্দ্রকুমার 'বসুমতী'র কর্ণধার হইলেন।

'সন্ধ্যা': তিন চার মাস দেশে কাটাইয়া অন্নচিন্তায় জলধরকে পুনরায় কলিকাতা ফিরিতে হইল। তিনি মাঝে মাঝে সকালবেলা 'সন্ধ্যা'র চায়ের আড্ডায় জমায়েৎ হইতেন।

"সেই সময়ে একদিন [ব্রহ্মবান্ধব] উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন—দেখুন জলধরবাবু, আপনার ত এখন কোন কাজ নেই। প্রত্যহ সকাল বেলা 'সন্ধ্যা' অফিসে আসুন না কেন? মুড়ি বেগুনি আর চা খাবেন—আর 'সন্ধ্যা' কাগজের জন্ত এক কলম কি দু' কলম যা হয় লিখবেন। বাসায় ফিরে যাবার সময় আমি আপনাকে বেশী দিতে পারব না। 'সন্ধ্যা'র সে শক্তি নেই। নগদ দুটি ক'রে টাকা দেব। আমি ভাবলাম—মন্দ কি? বসেই তো আছি, যে দিন আসবো চা যোগ তো হবেই, আর 'সন্ধ্যা' কাগজের এক কলম কি দু' কলম লিখতে আধ ঘণ্টার বেশী সময়ও লাগবে না। দক্ষিণা নগদ দুটি টাকা—যথা লাভ।" ('ভারতবর্ষ,' শ্রাবণ ১৩৪৩) জলধর মাত্র কয়েক দিন 'সন্ধ্যা'র সহিত যুক্ত ছিলেন।

'হিতবাদী': এই সময়ে সংবাদ আসিল, 'হিতবাদী'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ জাপান হইতে প্রত্যাগমন কালে জাহাজে দেহরক্ষা করিয়াছেন (৪ জুলাই ১৯০৭)। 'হিতবাদী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ সেন সখারাম গণেশ দেউস্করকে দিয়া জলধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"উপেন দাদা কাজের লোক; ভূমিকা বা ভণিতা না ক'রে তিনি সোজাসুজি ব'লে বসলেন, 'দেখ জলধর, তোমাকে হিতবাদীর ভার নিতে হবে।' আমি ত অবাক্—এ কি প্রস্তাব। আমি বললাম, 'আমার দ্বারা হবে না দাদা!' তাই নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হলো। অবশেষে আমি বললাম, 'আপনারা যদি সখারামের উপর সম্পূর্ণ ভার দেন, তা হলে আমি তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।' উপেন দাদা কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন 'ভেবে দেখি। তুমি কাল একবার এসো।' পরের দিন গেলাম। তিনি বললেন 'তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হলাম। আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করে দাও।' তাঁর আদেশে সেই দিন থেকেই আমি 'হিত-বাদী'র সেবক হলাম।" ('ভারতবর্ষ,' শ্রাবণ ১৩৪৩)

সুরাট কংগ্রেসে কালাপাহাড়ী কাণ্ডের পর রাজনীতিক মতামত লইয়া 'হিতবাদী'র স্বত্বাধিকারিগণের সহিত সম্পাদকের বিরোধ বাধিল। তেজস্বী মরাঠা-সন্তান তিলকের বিরুদ্ধে কোন কিছু লিখিতে সম্মত না হইয়া চাকরি ত্যাগ করিয়া গেলেন। অতঃপর জলধরই 'হিতবাদী'র সম্পাদক হন (ডিসেম্বর ১৯০৭)।

কিছু দিন পরে জলধর বুঝিলেন, তাঁহার পক্ষে বেশী দিন 'হিতবাদী'র সহিত যুক্ত থাকা চলিবে না। তিনি লিখিয়া-ছেন:—

"হিতবাদীর পরম শুভানুধ্যায়ীরা বলতে আরম্ভ করলেন, হিতবাদীর সুর নরম হয়ে গিয়েছে। সে কথা শুনেও চুপ ক'রে রইলাম। তার পরে অভিযোগ হ'তে লাগলো, আমি বিশারদের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করছি। যে বিশারদ দাদাকে আমি গুরুর মত ভক্তি করি, আমার দ্বারা তাঁর বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, এ অভিযোগ আমি সহ্য করতে পারলাম না—আমি তখন বিশারদ দাদার উদ্দেশে প্রণাম ক'রে তাঁর হিতবাদীর সেবা হ'তে অবসর গ্রহণ করলাম।" ('ভারতবর্ষ,' শ্রাবণ ১৩৪৩)

সন্তোষের গৃহশিক্ষক ও দেওয়ান: জলধর হিতবাদীর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সন্তোষের জমিদার শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরীর ছেলেমেয়ের অভিভাবক ও শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন (ইং ১৯০৯)। তিনি দুই বৎসরাধিক কাল সন্তোষে ছিলেন; কিছু দিন দেওয়ানীও করিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যালেরিয়ার উৎপাতে সে স্থান ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

'সুলভ সমাচার': সন্তোষে অবস্থানকালে 'সুলভ সমাচারে'র সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিবার জন্ত জলধর

---

* "১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতের প্রারম্ভে, বোধ হয় পূজার কয়েক সপ্তাহ পর, আমি অরবিন্দকে বাংলা ভাষা শিখাইবার ভার লইয়া বরোদায় যাই। ...আমি দুই বৎসরাধিক কাল তাঁহার সহবাসে যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।"—দীনেন্দ্রকুমার রায়: 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' (১৩৩০), পৃ. ৩, ৮৪।

অনুরুদ্ধ হন। নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদকত্বে নবপর্য্যায়ের দৈনিক 'সুলভ সমাচার' ১৩১৮ সালের ১লা বৈশাখ (১৯১১, ১৪ এপ্রিল) ক্রীক্ রো হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা গবর্মেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত পত্রিকা ছিল; গবর্মেণ্ট ইহার ২৫ হাজার খণ্ড নির্দ্দিষ্ট মূল্যে (অর্দ্ধ আনা) ক্রয় করিয়া বাংলা দেশের জনসাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। নরেন্দ্রনাথ ভাল বাংলা জানিতেন না, জলধরই তাঁহার নির্দ্দেশমত পত্রিকার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

পত্রিকা প্রকাশের পর চারি মাস যাইতে না যাইতেই নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় (জুলাই ১৯১১)। তখন গবর্মেণ্টের তরফ হইতে জলধরই বর্দ্ধিত বেতনে 'সুলভ সমাচারে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু গবর্মেণ্ট এক বৎসরের অধিক কাল পত্রিকাখানি জীবিত রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এই বৎসর পৌষ মাসে দিল্লী-দরবারের ঘোষণায় বঙ্গবিভাগ রদ হইয়া গেল। দেশে আর অশান্তির কারণ নাই বিবেচনা করিয়া সরকার জানাইয়া দিলেন, ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের পর আর তাঁহারা 'সুলভ সমাচারে'র জন্য অর্থ ব্যয় করিবেন না।

'ভারতবর্ষ' ঃ অতঃপর জলধর ঘটনাচক্রে কেমন করিয়া 'ভারতবর্ষে'র সহিত সংশ্লিষ্ট হন, সে কথা তাঁহার নিজের ভাষায় বর্ণনা করিতেছি ঃ—

"'সুলভ সমাচার' উঠে যাওয়ার সংবাদ পেয়েই আমার পরম হিতৈষী বন্ধু আমার পূর্ব্ব মনিব সন্তোষের কবি-জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং যত দিন আর কোন সুবিধা না হয় তত দিন তাঁর প্যারাগন প্রেসের ভার নিতে বললেন। এখন যেখানে আমাদের ভারতবর্ষ-আফিস হয়েছে পূর্ব্বে সেখানে ট্রাম কোম্পানীর আস্তাবল ছিল। সেই আস্তাবলের ঘরগুলি ভাড়া নিয়ে প্রমথবাবু প্যারাগন প্রেস করেছিলেন। আমি সেই প্রেসের ম্যানেজার হলাম।

তখন 'ভারতবর্ষ' প্রচারের বিপুল আয়োজন চলছে। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী শ্রীমান হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন যে তিনি প্যারাগন প্রেসেই 'ভারতবর্ষ' ছাপতে চান। আমার আর তাতে আপত্তি কি! অতবড় একখানি কাগজ ছাপবার জন্য যা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় আমি তাই করতে লাগলাম। হরিদাসবাবু কিছু টাকা অগ্রিমও দিলেন। তখন 'ভারতবর্ষে'র সঙ্গে আমার ঐটুকুই সম্বন্ধ ছিল।

আমি চার পাঁচ ফর্ম্মার মত কম্পোজ তুলে দিলাম। প্রথম ফর্ম্মার পেজ সাজিয়ে যেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম, সেই দিনই সেই ফর্ম্মার প্রুফ দেখতে দেখতেই অকস্মাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল অমরধামে চলে গেলেন।

তখন চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। 'ভারতবর্ষে'র কর্ম্ম-কর্তাগণ কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। অনেকের নাম প্রস্তাবিত হ'ল। অবশেষে হরিদাসবাবু আমাকেই দ্বিজেন্দ্র-লালের শূন্য পদে জোর ক'রে বসিয়ে দিলেন।" ('ভারতবর্ষ,' ভাদ্র ১৩৪৩)

১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে সূচনা হইতে সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর কাল জলধর অতীব যোগ্যতার সহিত 'ভারতবর্ষ' পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী ঃ জলধরের রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকের সংখ্যা বড় অল্প নহে। আমরা এই সকল গ্রন্থের একটি নির্ভরযোগ্য কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়াছি; বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। প্রবাস-চিত্র (ভ্রমণ)। ১৫ বৈশাখ ১৩০৬, এপ্রিল ১৮৯৯। পৃ. ২০৮।

সূচী ঃ—প্রবাস-যাত্রা, গুরুদ্বার, নালাপাণি, কলুঙ্গার যুদ্ধ, টপকেশ্বর, গুচ্ছপাণি, চন্দ্রভাগা-তীরে, সহস্রধারা, মুশৌরী, তিহরী, অতিপ্রকৃত কথা, উত্তর-কাশী।

২। চাহার দরবেশ (উর্দ্দু উপন্যাস—"অনুবাদিত")। ১৩০৬ সাল (১০ মার্চ ১৯০০)। পৃ. ৮০।

বসুমতী-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩। হিমালয় (ভ্রমণ)। ১৩০৭ সাল (১৩ অক্টোবর ১৯০০)। পৃ. ৩৩৯।

দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখিত ভূমিকা সহ।

৪। নৈবেদ্য (গল্প)। ১ আশ্বিন ১৩০৭ (১৩ অক্টোবর ১৯০০)। পৃ. ১১৪।

সূচী ঃ—অন্ধের কাহিনী, পাগল, প্রতীক্ষা, মা কোথায়?, অদৃষ্ট, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিণী।

৫। পথিক (ভ্রমণ)। আশ্বিন ১৩০৮ (৬ অক্টোবর ১৯০১)। পৃ. ১৬১।

ইহাকে 'প্রবাস-চিত্র' ও 'হিমালয়ে'র পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে।

৬। হিমাচল-বক্ষে (ভ্রমণ)। ১৩১১ সাল (২ সেপ্টেম্বর ১৯০৪)। পৃ. ৬০।

"প্রবাসচিত্র, হিমালয় ও পথিকে যাহা বলিতে পারি নাই, হিমাচল-বক্ষে তাহার কিছু বলিবার চেষ্টা করিলাম।" বসুমতী-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৭। ছোট কাকী ও অন্যান্য গল্প। ? (১০ অক্টোবর ১৯০৪)। পৃ. ১১৬।

সূচী ঃ—ছোট কাকী, মোহ, ডিপুটি বাবু, প্রায়শ্চিত্ত, রমণী, সমাজ-চিত্র, কবি, মৃতের মৃত্যু, মামাবাবু। "শেষোক্ত গল্প দুটি প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের রচনা।"

৮। নূতন গিন্নী ও অন্যান্য গল্প। ১ আশ্বিন ১৩১৪ (১ অক্টোবর ১৯০৭)। পৃ. ১১৭।

সূচী:—নূতন গিন্নী, জুনিয়ার উকীল, কালো মেয়ে, মেয়ে লাথি, সুষমা, ক্ষুদিরাম, রমাঠাকুর, রঘুনাথ।

৯। দুঃখিনী (উপন্যাস)। সন্তোষ, ১৯০৯ (৩০ জুলাই)। পৃ. ৮৯।

"১৮৭৫ অব্দে মধ্য-ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রদানের পর আমি এইখানি এবং আর একখানি [২২ নং দ্রষ্টব্য] গল্পপুস্তক লিখি—তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর।"

১০। পুরাতন পঞ্জিকা (গল্প ও ভ্রমণ)। সন্তোষ, ১৫ আশ্বিন ১৩১৬ (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৯)। পৃ. ১৩২।

সূচী: (ক্ষুদ্র গল্প)—শেফালিকার দুঃখ, বিবাহের ফর্দ, চিতার আগুন। (দেশ ভ্রমণ)—দেশ-ভ্রমণ। (শিকার কাহিনী)—শিকার-কাহিনী, ব্যাঘ্র-শিকার, বাঘের ঘরে অতিথি। (হিমালয়ের স্মৃতি)—হিমালয়ের স্মৃতি, শ্রীনগর, তিহরীর পথে।

"এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত "হিমালয়ের স্মৃতি"র কিয়দংশ বসুমতীর স্বত্বাধিকারী পূজনীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুস্তকাকারে ['হিমাচল-বক্ষে'] প্রকাশিত করিয়া বসুমতীর গ্রাহকগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।"

১১। বিশুদাদা (উপন্যাস)। ইং ১৯১১ (১৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ২২৪।

১২। হিমাদ্রি (ভ্রমণ)। ১৩১৮ সাল (২৩ নবেম্বর ১৯১১)। পৃ. ১৫৯।

সাধু ভাষায় লিখিত 'হিমালয়ে'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

১৩। আমার বর ও অন্যান্য গল্প। ফাল্গুন ১৩১৯ (৫ মার্চ ১৯১৩)। পৃ. ১৮৩।

সূচী: আমার বর, রাধারাণীর ইচ্ছা, পূজার তত্ত্ব, পূজার ভ্রমণ, পিতা-পুত্র, শিবনাথের অধিকার, কন্যাদায়, হরিনাথের পরাজয়, গল্পের মূল্য, মামা-বাবু, বাতাসী।

১৪। কাঙ্গাল হরিনাথ (জীবনী): ১ম খণ্ড। ১৫ আশ্বিন ১৩২০ (২০ অক্টোবর ১৯১৩)। পৃ. ১৫৯।

২য় খণ্ড। জন্মাষ্টমী ১৩২১ (৩১ আগষ্ট ১৯১৪)। পৃ. ১৫২।

১৫। করিম সেখ (উপন্যাস)। ১০ আশ্বিন ১৩২৯ (২৪ অক্টোবর ১৯১৩)। পৃ. ৯৭।

১৬। আলান কোয়াটারমেন (অনূদিত উপন্যাস)। ইং ১৯১৪। পৃ. ১৪৭।

১৭। পরাণ মণ্ডল ও অন্যান্য গল্প। ভাদ্র ১৩২১ (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ১৫৬।

সূচী: পরাণ মণ্ডল, শান্তিরাম, পয়লা বৈশাখ, রঘু পাগলা, আর এক দিন আগে, নসীবের লেখা, কোথায় আমরা যাই, জল—একটু জল, জ্যা কাম কর্‌বি নে?, না।

১৮। আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ। ফাল্গুন ১৩২১ (১৮ এপ্রিল ১৯১৫)। পৃ. ৮২।

বর্দ্ধমানাধিপতির *Impressions* অবলম্বনে লিখিত।

১৯। অভাগী (উপন্যাস):

১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩২২ (৭ অক্টোবর ১৯১৫)। পৃ. ৩১১।

২য় খণ্ড। জন্মাষ্টমী ১৩২৯ (২৭ আগষ্ট ১৯২২)। পৃ. ১৮৪।

৩য় খণ্ড। আশ্বিন ১৩৩৯ (২৭ অক্টোবর ১৯৩২)। পৃ.১২২।

২০। আশীর্ব্বাদ (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৩ (১০ আগষ্ট ১৯১৬)। পৃ. ১৯২।

সূচী: আশীর্ব্বাদ, অপমান, বেয়ারিং চিঠি, বিচার, ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত, দিগম্বর, "লেড়কী মর গেয়ী," কত দূরে, বিধবা, সতীর আসন, দীনের বন্ধু।

২১। দশদিন (ভ্রমণ)। ভাদ্র ১৩২৩ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৬)। পৃ. ১৫২।

২২। বড়বাড়ী (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩২৩ (২ অক্টোবর ১৯১৬)। পৃ. ১৭৯।

ইহা "মিত্রপরিবার" নামে ১৮৭৫ সনে রচিত।

২৩। এক পেয়ালা চা (গল্প)। ১ আশ্বিন ১৩২৫ (৫ অক্টোবর ১৯১৮)। পৃ. ১৫২।

সূচী: এক পেয়ালা চা, আমার মাষ্টারী, কৃপের কথা, নিয়তি, সমাজ-চিত্র, মহৌষধি, তুলসী।

২৪। হরিশ ভাণ্ডারী (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩২৬ (১৫ মে ১৯১৯)। পৃ. ১৮৫।

২৫। ঈশানী (উপন্যাস)। ইং ১৯১৯ (২১ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৯৭।

২৬। পাগল (উপন্যাস)। ১ বৈশাখ ১৩২৭ (১ মে ১৯২০)। পৃ. ১৮২।

২৭। কাঙ্গালের ঠাকুর (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৭ (১৯ আগষ্ট ১৯২০)। পৃ. ১১৭।

সূচী: কাঙ্গালের ঠাকুর, মহামায়ার মায়া, কত দূর!, আনন্দময়ী, মায়ের অভিমান।

২৮। চোখের জল (উপন্যাস)। ১ আশ্বিন ১৩২৭ (১২ সেপ্টেম্বর ১৯২০)। পৃ. ১৮০।

২৯। ষোল-আনি (উপন্যাস)। বসন্ত-পঞ্চমী ১৩২৭ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১)। পৃ. ১৫৭।

৩০। মায়ের নাম (গল্প)। ১ শ্রাবণ ১৩২৮ (২০ জুলাই ১৯২১)। পৃ. ১২৩।

সূচী: মায়ের নাম, মায়ের কোলে, উৎসর্গ, ন্যায়বাগীশের মন্ত্রদান, প্রায়শ্চিত্ত, প্রবাসের কথা, এবং, মোহিতের পরিণাম, বড়-দিদি, অন্তিম প্রার্থনা।

৩১। সোনার বালা (উপন্যাস)। ২৫ পৌষ ১৩২৮ (১ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। পৃ. ১৮৪।

৩২। দানপত্র (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩২৯ (২ সেপ্টেম্বর ১৯২২)। পৃ. ১২৩।

৩৩। জলধর গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৩০, জুলাই ১৯২৩। পৃ. ৬২৪।

সূচী : হিমাদ্রি, চোখের জল, প্রবাসচিত্র, পাগল, পুরাতন পঞ্জিকা, করিম সেখ, আশীর্ব্বাদ।

২য় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ (১৪ মে ১৯২৫)। পৃ. ৫৮০।

সূচী : কাঙ্গাল হরিনাথ, ১ম-২য় খণ্ড ; এক পেয়ালা চা ; দশদিন ; দুঃখিনী ; ষোল-আনি ; নৈবেদ্য।

৩৪। মুসাফির-মঞ্জিল (ভ্রমণ)। মাঘ ১৩৩০ (২৪ জানুয়ারি ১৯২৪)। পৃ. ১৩৬।

সূচী : বামড়া-দেবগড়, সাগর-সঙ্গমে, হিমাচল-পথে।

৩৫। পরশ-পাথর (উপন্যাস)। কার্ত্তিক ১৩৩১, নবেম্বর ১৯২৪। পৃ. ১৫৬।

৩৬। ভবিতব্য (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩২, আগষ্ট ১৯২৫। পৃ. ১৫৪।

৩৭। দক্ষিণাপথ (ভ্রমণ)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (১০ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ২৫৫।

৩৮। তিন পুরুষ (উপন্যাস)। ? [ভাদ্র ১৩৩৪—আগষ্ট ১৯২৭]। পৃ. ১৪৪।

৩৯। বড় মানুষ (গল্প)। আশ্বিন ১৩৩৬ (৯ অক্টোবর ১৯২৯)। পৃ. ১৮৫।

সূচী : বড়মানুষ, স্মৃতি, কবি-ব্যাধি, অদৃষ্ট-লিপি, সন্ন্যাস, জাতিস্মর, গৃহিণীরোগ, অধঃপতন, ব্রাহ্মণ-ভোজন, রামলাল, গুরুগিরি, শেষ আদেশ।

৪০। মধ্যভারত (ভ্রমণ)। মাঘ ১৩৩৬ (১৯ জানুয়ারি ১৯৩০)। পৃ. ২০৪।

৪১। সেকালের কথা (চিত্র)। ১ আশ্বিন ১৩৩৭ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০)। পৃ. ১১১।

সূচী : যমজয়ী চূড়ামণি দত্ত, সেকালের ভোজ, কেরোসিন তেল, আমার প্রথম চা-পান, সেকালের বাল্য-বিবাহ, লর্ড মেয়োর অপঘাত মৃত্যু, বিজয়া-উৎসব, ভাতার-মারীর মাঠ, বালিকা-বিদ্যালয়, সেকালের পাঠশালা, সেকালের ছাত্রশাসন, পাঠশালার ছাত্র ও তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী।

৪২। উৎস (উপন্যাস)। আষাঢ় ১৩৩৯ (২০ জুলাই ১৯৩২)। পৃ. ১০৭।

শিশুপাঠ্য গ্রন্থ : জলধর যে-সকল শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার এই কয়খানির সন্ধান আমরা পাইয়াছি :—

সীতা দেবী। ১ আশ্বিন ১৩১৮ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১১)। পৃ. ৭৬।

কিশোর (গল্প-সংগ্রহ)। ১৩২১ সাল, জানুয়ারি ১৯১৫। পৃ. ১৪২।

শিব-সীমন্তিনী। আশ্বিন ১৩৩১, অক্টোবর ১৯২৪। পৃ. ৯০।

সরল বাংলায় F. W. Bain-লিখিত *In the Great God's Hair*-এর গল্পাংশ।

মায়ের পূজা (গল্প-সংগ্রহ)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, মে ১৯২৭। পৃ. ১৪৬।

আফ্রিকায় সিংহ শিকার। ইং ১৯২৯। পৃ. ১১৬।

রামচন্দ্র। ১ আশ্বিন ১৩৩৭, সেপ্টেম্বর ১৯৩০। পৃ. ১৫৪।

আইসক্রীম সন্দেশ। ? (১০ নবেম্বর ১৯৩৫)। পৃ. ১১১।

১৩২৯ সালে প্রকাশিত 'দানপত্রে' জলধরের 'সাথী' নামে ।০ আনা মূল্যের একখানি পুস্তিকার বিজ্ঞাপন আছে। 'সন্দেশ' ও 'ফটিক' নামেও তাঁহার দুইখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পাঠ্য পুস্তক : জলধর অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থেরও রচয়িতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বাঙ্গালা দ্বিতীয় পাঠ,' 'প্রথম শিক্ষা,' 'শিশুবোধ,' 'নবীন ইতিহাস' ও 'বঙ্গ-গৌরব'-এর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

সম্পাদিত গ্রন্থ : তিনি যে-সকল গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা :—

হরিনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ। ১৩০৮ সাল (৪ নবেম্বর ১৯০১)। পৃ. ২৩২ (বসুমতী)

জাতীয় উচ্ছ্বাস (স্বদেশী গান সংগ্রহ)। ? (৪ নবেম্বর ১৯০৫)। পৃ. ৭৫ + ৫ (বসুমতী)।

প্রমথনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী, ১ম-৩য় ভাগ। ১৩২২-২৩ সাল।

প্রতিভার সম্মান : জলধর দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী ছিলেন। বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান—এমন কি রাজ-সরকারও তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন। ১৩৩৯ সালের ১২ই ভাদ্র রবিবার কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে প্রথম জলধর-সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দ ও রবি-বাসরের সদস্যগণের পক্ষ হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা যে অভিনন্দন পাঠ করেন তাহার শেষাংশ এইরূপ :—"তোমার দৃষ্টি সকলকে সমানভাবে নন্দিত করিয়াছে। তোমার প্রীতি অখ্যাতকে খ্যাত এবং নবীনতাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। স্নেহ-বিতরণে তোমার কার্পণ্য নাই, দারিদ্র্যে তোমার কুণ্ঠা নাই, বিলাসে তোমার স্পৃহা নাই ; সম্মানে তোমার গর্ব্ব নাই, সামাজিকতায় তোমার শৈথিল্য নাই, বাণীর সেবায় তোমার শ্রান্তি নাই। হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, সাহিত্যে ও সমাজে তাই তুমি জ্যেষ্ঠত্বের অধিকারী।

হে তাত, আমরা তোমায় অভিনন্দন করি।" অন্যান্য যে-সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন তাহার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি :—

সভাপতি…তৃতীয় বার্ষিক মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলন…১৩২২
সহ-সভাপতি…বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ…১৩২৯-৩০, ১৩৪৩-৪৫
'রায়-বাহাদুর' উপাধি… …৩ জুন ১৯২৯
সাহিত্য-শাখার সভাপতি…বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, রাধানগর …৬-৭ বৈশাখ, ১৩৩১
ঐ …প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন, ইন্দোর …পৌষ ১৩৩৫
সর্ব্বাধ্যক্ষ…'রবি-বাসর' …১৩৩৮
বিশিষ্ট সদস্য…বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ …১৩৪১
নিখিল-বঙ্গ-জলধর-সম্বর্দ্ধনা… …২-৪ ভাদ্র ১৩৪১
সম্বর্দ্ধনা…বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ …২৮ বৈশাখ ১৩৪২

মৃত্যু ঃ ১৩৪৫ সালের ৮ই মাঘ সহধর্ম্মিণীকে হারাইয়া বৃদ্ধ জলধরের শরীর সেই যে ভাঙ্গিয়া পড়িল আর তাহা সুস্থ হইল না ; তিনি পরবর্ত্তী ২৬এ চৈত্র (১৫ মার্চ ১৯৩৯), ৮০ বৎসর বয়সে, পত্নীর অনুগামী হন।

উপসংহার ঃ ১৩৪১ সালের ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত নিখিল-বঙ্গ-জলধর-সম্বর্দ্ধনায় স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে কথা-শিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরে তাঁহারই রচিত যে মানপত্রখানি জলধরকে দেওয়া হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি :—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের
করকমলে—

বরেণ্য বন্ধু,

তোমার দীর্ঘজীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায়, আমাদের মানস-লোকে তুমি পরমাত্মীয়ের আসন লাভ করিয়াছ।

তোমার অকলঙ্ক চরিত্র, নিষ্কলুষ অন্তর, শুভ্র সদাচার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তোমার স্নেহে তোমার সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ,আমাদের অকপট মনের ভক্তি-অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর।

বাণীর মন্দির-দ্বারে তুমি সকলকে দিয়াছ অবারিত পথ, কনিষ্ঠগণকে দিয়াছ আশা, দুর্ব্বলকে দিয়াছ শক্তি, অখ্যাতকে দিয়াছ খ্যাতি, আত্মপ্রত্যয়হীন, শঙ্কাকুল কত আগন্তুক জনই না সাহিত্য-পূজার বেদী-মূলে তোমার ভরসা ও বিশ্বাসের মন্ত্রে স্বকীয় সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে।

সাহিত-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে তুমি আনন্দ বিতরণ করিতে। সে ব্রত তোমার সফল হইয়াছে। তোমার সৃষ্টি কাহাকেও আহত করে না, তোমার অন্তঃপ্রকৃতির মতই সে সৃষ্টি স্বচ্ছন্দ সুন্দর ও অনাড়ম্বর। তোমার দুঃখ-বেদনাভরা হৃদয় একান্ত সহজেই জগতের সকল দুঃখকে আপন করিয়াছে, তাই, ব্যথিত যে জন সে তোমারই সৃষ্টির মাঝে আপনার শান্তি ও সান্ত্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে।

হে নিরহঙ্কার বাণীর পূজারী, তুমি আজ বঙ্গের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি—তোমার স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

কবি জন্মতিথি এল চির অমলিন, ক্ষয়হীন,
স্বপ্নভাঙা নির্ঝরিণীসম তার উচ্ছলিত প্রাণ,
কুয়াশার জাল ভেদি' বাজিবে যে আলোকের বীন্
সুনীল আকাশে আর কিশলয়ে রবে তার গান।

নূতনের মায়াদণ্ড এই দিন স্পর্শ দিবে গায়,
পুরাতন দ্বারে আসি' ফিরে যাবে শুদ্ধ হতবাক্—
নূতন যৌবন আসি' প্রকৃতির পর্ণ-লতিকায়
নৈবেদ্য সাজায়ে আনি' বাজাইবে মাঙ্গলিক শাঁখ।

ভারতের পূর্ব্বাচলে এই দিনে দিগন্ত সীমায়
তোমার উদয় কবি, নবরবি, তমিস্রা বিনাশি',
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মুগ্ধ আলোকের রশ্মি-প্রতিভায়
চেতনার দোলা দিল প্রাণে প্রাণে নবরূপ আসি'।

ভারতের পুণ্যভূমি আজি মহা সিন্ধু বক্ষসম
উদ্বেলিত ঝঞ্ঝা ঝড়ে উন্মথিত পাশব বিদ্বেষে ;—
হে মহা দিবস, তুমি মুছে দাও অন্তহীন তম,—
প্রেমের অমৃত ভাণ্ড ঢেলে দাও সবারে নিঃশেষে।

পঁচিশে বৈশাখ

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

বিজলী-চঞ্চল-গতি নিষ্করুণ কালের পাখায়
কতদিন এলো গেল কত শুভ্র শারদ শেফালী
রচে গেছে ফুলহার। বসন্তের পেলব শাখায়
পিকের অমিয় ধারা প্রাণপ্রান্তে জ্বেলেছে দেয়ালী।
তবু ত শরৎ নয়—নহে ফুল্ল বসন্তের মাস।
রুদ্র ও রৌদ্রের মাঝে অপরূপ একি সুরঙীন
জীবন্ত যৌবনরসে সুসবুজ রক্তিম পলাশ
আশা ও ভাষায় পূর্ণ বিমুখর ছন্দঘন দিন।

সুদূর পশ্চিম আর পূরবের প্রতিপ্রান্ত দ্বারে
শ্রদ্ধায় নোয়ায়ে শির শতলক্ষ কণ্ঠ দেয় ডাক,
তোমারে স্মরণ করি—হে রবীন্দ্র! হৃদি নমস্কারে
তোমারে স্মরণ করি—হে সুন্দর! পঁচিশে বৈশাখ!
অভাব দারিদ্র্য আছে, পায়ে বাঁধা অজস্র শিকল
তবুও উন্নত শির ; প্রাণে ফোটে সহস্র কমল।

শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার

রবীন্দ্র-ভক্ত এল্‌মহার্ষ্ট সত্যই বলিয়াছেন—"Never was there a man with so many windows for so many winds as Tagore." ইহার তাৎপর্য্য এই, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। সেই প্রতিভার অন্যতম মূর্ত্ত রূপ—তাঁহার গড়া শান্তিনিকেতন। দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি তাঁহার ভাল লাগে নাই, নিজ ছাত্রজীবনের বিষাদময় অভিজ্ঞতা তাঁহাকে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়াছিল। এই বিদ্রোহের ফলে শান্তিনিকেতনের সৃষ্টি।

কবিগুরু শিক্ষাগুরুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার শিক্ষায়তনের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিলেন—আর্য্যাবর্ত্তের পুরাতন 'আশ্রম' ও 'তপোবন'। ইহাই শিক্ষাক্ষেত্রে 'উটজ'-আদর্শ। তাঁহার মতে প্রত্যেক শিক্ষায়তন প্রকৃতিদেবীর ক্রোড়ে এমন স্থানে স্থাপিত হইবে, যেখানে প্রকৃতির রূপ ও মহিমা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তিনি বলেন, আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতার জন্য প্রকৃতির সহিত যোগসূত্র স্থাপন অপরিহার্য্য। জীবনের প্রারম্ভে মন ও চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য অনুকূল আবহাওয়া অতীব আবশ্যক। শুধু ব্রহ্মচর্য্য পালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। "বিরাট প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতি-সঞ্চার করে। জীবনের আরম্ভে অভ্যাসের দ্বারা অভিভূত হবার আগে কৃত্রিমতার জাল থেকে ছুটি পাবার জন্য ছেলেরা ছটফট্ করতে থাকে, সহজ প্রাণলীলার অধিকার তারা দাবি করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে। আরণ্যক ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হ'তে নিঃসৃত হ'য়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ মহান্ শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে দাও—ছেলেদের দেহে মনে শহরের বোবা-কানা-মরা দেওয়ালগুলোর বাইরে।"

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের প্রণালী অভিনব। এখানে রবীন্দ্রনাথ শিশু-মনকে বাঁধাধরার কঠিন বন্ধন হইতে, এবং শিক্ষকের পীড়ন হইতে মুক্ত করিয়া সহজভাবে প্রকৃতির সাহচর্য্যে বিচরণ করিবার সুযোগ দিয়া প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বহু কুফল হইতে শিশুদিগকে সযত্নে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক শিশু-মনেই সমস্ত নূতন ঘটনা বা সত্য সাদর অভ্যর্থনা পায় এবং এইভাবে শিশুরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। জ্ঞান অর্জ্জন করিবার ক্ষেত্রে—প্রকৃতি তাহাদের এক প্রধান সহায়, কবিগুরু ইহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। শিশুমন যেন বহিঃপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির মিলন-তীর্থ।

"শিশুকাল হইতে কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন অন্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে, যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি—, নবীন কৌতূহল চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে, তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্ব্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল, সরস এবং পরিণত হইতে পারে; কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়।" ইউরোপীয় শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের মত আমাদের শিক্ষাগুরুও বলিতেছেন—'প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল নির্জীব ও নিস্ফল হইতে থাকে, অতএব আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিস্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।'"

সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রধান ত্রুটি এই যে, সেখানে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টায় নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা হয়। ইহার ফলে শিশুদের মনের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়—পাঠে তাহাদের মন আকৃষ্ট হয় কম। শৈশবকালেই এই জ্ঞানস্পৃহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী থাকে—আর ঠিক এই সময়েই শিশুরা বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়ে। বিদ্যালয়ের যান্ত্রিক পদ্ধতি তাহাদের কাছে প্রাণবান বলিয়া মনে হয় না, বরং উহা তাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। স্কুলের দেওয়ালগুলি তাহাদের নিকট মৃত মানুষের ঘোলাটে ও রক্তহীন চক্ষুস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। বহির্বিশ্বের, সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ফলেই বিদ্যালয়সমূহ শিশু-মনে ভীতির উদ্রেক করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যের স্কুল 'বেঙ্গল একাডেমি' সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ইহার ঘরগুলা নির্ম্মম, ইহার দেওয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মত—ইহার মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছুই নাই—ইহা খোপ ওয়ালা একটা বড় বাক্স। ছেলেদের যে ভালমন্দ

লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে, বিদ্যালয় হইতে সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্ব্বাসিত।"

আমাদের বিদ্যালয়ে যে তথাকথিত নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রচলিত আছে তাহা শিশুমনের সতেজ ভাবকে নষ্ট করিয়া দেয়। ভাইকাউণ্ট ব্রাইস বলিয়াছেন—"Discipline has its worth, but it may imply some loss of individuality."—নিয়মানুবর্ত্তিতার মূল্য আছে, কিন্তু ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য খানিকটা নষ্ট করিয়া দেয়। শিশুর মন অসাড় এবং জড় হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাদের এই মনোভাবের প্রতি দৃক্‌পাত করা হয় না এবং পাঠের ঝড় তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া যায়। বলপ্রয়োগে মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, ইহা একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা।

মুক্ত বাতাসে, ছায়াচ্ছন্ন আম্রবৃক্ষতলে প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রশান্তবদন রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপনা ভারতের এক গৌরবময় বিস্মৃত-প্রায় যুগের কথা আমাদিগকে মনে করাইয়া দেয়। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ শিশুমনে যে চিত্র আঁকিয়া দেয়, তাহা সহজে মুছিয়া যায় না। "আত্মশক্তির আবিষ্কারই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য," ইহা কবিগুরুর পাঠদানের রীতি হইতে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। কবি কীট্‌সের 'Autumn' বা শেলির 'Intellectual Beauty' পড়াইতেছেন। সেখানে বয়স্ক শ্রোতাও গিয়া বসিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যার দানসত্র অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িয়া বালক ও বয়স্ক সকলের মন পূর্ণ করিয়া দিত। সকলেই প্রয়োজনের বেশী পাইত, এই উদ্বৃত্ত অংশটাই মানুষের ঐশ্বর্য্য। তাঁহার নিয়ম ছিল প্রশ্ন করিয়া করিয়া ছাত্রছাত্রীদের মুখ দিয়া ঠিক শব্দটি বাহির করিয়া লইতেন—ইহাতে তাঁহার শ্রান্তি বা অসন্তোষ ছিল না। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের ইঙ্গিত ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে নিজেদের শক্তি আবিষ্কার করিত; রবীন্দ্র-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য—লঘুতম কথাবার্ত্তা হইতে মোচড় দিয়া রস আদায় করিবার ক্ষমতা, অভাবনীয়ের সঙ্গে তান রাখিয়া রস-সৃষ্টির শক্তি, শিশুমনের সঙ্গে সমসূত্রে নিজেকে অনায়াসে স্থাপন।"*

কবির মতে শিক্ষকগণ হইবেন একাধারে শিক্ষার্থীর বন্ধু এবং উপদেষ্টা। অধ্যাপনার সময় শিশুমনের গতির সহিত শিক্ষকের নিজ মনের গতির সংযোগসাধন করিতে হইবে। শিক্ষাদানকার্য্য যে একটা প্রাণবন্ত জিনিষ, উহা যে যান্ত্রিক-ভাবে সুসম্পন্ন হয় না—এই কথা যেন শিক্ষক সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন। এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া কবি তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীগণের সহিত খেলায় মত্ত হইতেন, অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করিতেন এবং নৃত্যে যোগদান করিতেন। তিনি গাহিয়াছেন—

"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে,
হৃদয় নাচে রে।"

সত্যই উহাদের সহিত নৃত্যে তাঁহার হৃদয় ময়ূরের মত নাচিয়া উঠিত। তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হইত তাহা অনির্ব্বচনীয়, স্বর্গীয়। সেই নৃত্যের সঙ্গে যে সঙ্গীত গীত হয় এবং যে ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়, তাহা অপূর্ব্ব। এ ধরণের নৃত্য একাধারে দেহ ও মনের পুষ্টিসাধন করে।

Dr. Laurin Zilliacus বলেন, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন প্রমাণ করাইয়া দেয়, মানুষের জীবনধারণ শুধু খাদ্যদ্রব্য আহরণ ও ভোজনের জন্য নয়; জীবনের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য আরো কিছু দরকার। এজন্য এখানে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় এবং এই উদ্দেশ্যেই এখানকার বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় কলাবিদ্যা, সঙ্গীত, জাতীয় উৎসব এবং আমোদ-প্রমোদের অবতারণা করা হইয়াছে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জীবনের প্রতি দিকের, প্রতি অংশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন। মনে হয়, আমাদের দেশের স্কুলগুলি হইতে প্রকৃতি ও ভগবান নির্ব্বাসিত, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্বন্ধও খণ্ডিত; এরূপ অবস্থায় কবিগুরু তাঁহার বিদ্যায়তনে এই তিন সত্তার—প্রকৃতি, ভগবান ও মানুষ—একত্র সমাবেশের চেষ্টা করিলেন। মানব শিশু কুসুম-কোরক; তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্যই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা।

প্রকৃতির সহিত শান্তিনিকেতনের প্রাণ যে একসূত্রে গ্রথিত ইহার অন্যতম প্রমাণ—এখানকার ঋতু-উৎসবগুলি। বিভিন্ন ঋতুর আগমনে যে বৈচিত্র্যময় নব নব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহা অতুলনীয়। এক একটি ঋতু-পরিবর্ত্তনের সহিত শিশুর হৃদয়ও স্পন্দিত হয়। যখন নবীন বর্ষার প্রথম বারিধারা আশ্রমে পরম আদরে শিশুদের কপোলে স্নেহচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেয়—সত্যই যখন "এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা, গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা"—তখন তাহারা বর্ষার আগমনে হঠাৎ ছুটি পাইয়া নববর্ষার ন্যায়ই উদ্বেল হইয়া উঠে, আর তখন হয়ত আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে হতভাগ্য ছাত্রগণ দরজা জানালা বন্ধ করিয়া গণিত-সাগর মন্থনে ব্যস্ত। এই হঠাৎ পাওয়া ছুটির মধুর স্মৃতি চিত্তপটে চির দিনের জন্য অঙ্কিত থাকে। শিশুমন তখন আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠে—'আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি।'

রবীন্দ্রনাথের সহিত ফরাসী দার্শনিক রুশোর অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। উভয়েই প্রকৃতির পূজারী। রবিন্‌সন ক্রুশোর

* শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী

গল্প দু'জনের কাছেই সম আদরণীয়। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। রুশো অসামাজিক, আমাদের কবি ঠিক ইহার বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমার ছাত্রেরা ধীরে ধীরে আমাদের প্রতিবাসীদের নানা রকমে সাহায্য করিতে এবং তাহাদের জীবনধারার সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতে শিখে। রবিন্‌সন ক্রুশোর গল্পে আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলনের অভাবনীয় রূপ প্রকাশ পাইয়াছে একটা গল্পের মধ্যে—যেখানে মানুষ প্রকৃতির সহিত মুখোমুখী দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত করিতেছে, তাহার সহিত সহযোগিতা করিতেছে এবং তাহার সহায়তালাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী যে আধুনিক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ তিনি তাঁহার শিক্ষায়তন হইতে শাস্তিপ্রদানের বর্ব্বরোচিত প্রথা তুলিয়া দিয়া উহাকে প্রকৃত শিক্ষানিকেতনে পরিণত করিয়াছেন। অন্যত্র যাঁহার শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী তাঁহাদিগের মধ্যে উৎসাহের ও উদ্দীপনার একান্ত অভাব রহিয়াছে, তাঁহারা শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিতে তৎপর, কিন্তু পাশে বসিয়া প্রীতির দ্বারা তাহার সংশয় ঘুচাইয়া তাহার সহচর হইতে পারেন না। কবিগুরু মনে করেন, মনুষ্যত্বের নামে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত যে, তাঁহারা জীবনে ভুল পথ বাছিয়া লইয়াছেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া কারারক্ষীর কার্য্যভার গ্রহণ করা উচিত। সকল শিক্ষকই যেন মনে রাখেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও সহানুভূতি ক্লাসে এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে, যাহা শিক্ষাদানের কাজকে অনেকখানি সহজ করিয়া দেয়।

কবি অন্যত্র বলিতেছেন—"আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্যগুণে। তিনি এমন জিনিষ দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত, সুতরাং ছাত্রের নিকট ধর্ম্মের বিধানে, স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশী দিয়া আপন কর্ত্তব্যকে মহিমান্বিত করেন।"

কবিগুরুর ভাষা অননুকরণীয়; অতএব তাঁহার ভাষাতেই বলি, "যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি, যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা সেইখানেই আমরা শক্তিলাভ করি; যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর, যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চ্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত, ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্ম্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক; আর যেখানে কেবল পুঁথি ও মাষ্টার, সেনেট ও সিণ্ডিকেট, ইটের কোঠা ও কাঠের আসবাব সেখানে আজও আমরা যত বড় হইয়া উঠিয়াছি, কালও আমরা তত বড়টা হইয়াই বাহির হইব।"

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত—এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতীদের সহিত একমত। মাতৃদুগ্ধ যেমন শিশুর জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য, সেইরূপ শিশুর জ্ঞানবৃদ্ধিকল্পে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অত্যাবশ্যক। মাতৃভাষা যদি শিক্ষার বাহন হয়, তবে চিন্তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা অনেক সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। কবি বলিতেছেন—"শিক্ষা-সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শাড়ি পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।"

কবিগুরুর শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য—শিশু-মনে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করা। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্ক নানা রকম তথ্যে ভরপুর করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা সেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষার উত্তর-পত্রে উগরাইয়া দিয়া আসে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেহ হয়ত চিত্রাঙ্কনে দক্ষ, কেহ বা নৃত্যে পটু, কাহারো সঙ্গীত লাগে ভাল, কেহ বা গাছপালার অনুরাগী; কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে এ সকল প্রবৃত্তি উৎসাহ পায় না। জানিতে চাওয়ার সঙ্গে জানিতে পাওয়ার যে যোগ আছে, সে যোগ ইহাদের বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ওরা কোনো দিন জানিতে চাহিতে শেখে নাই। শান্তিনিকেতনে পড়াশুনাকে ছাত্রজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্যরূপে না ধরিয়া একটা অংশরূপে গণ্য করা হয়; ফলে পড়ার প্রবৃত্তিটি অব্যাহত থাকে। ব্রতী বালকবালিকারূপে এবং অন্যান্য নানা ভাবে তাহাদের মনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ছেলে-মেয়ে ও শিক্ষকদের অনেকবার একথা বলিয়াছেন, "লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি ক'রে থাকি, শান্তিনিকেতনের ছোট সীমার মধ্যে তারই একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করে তোলবার চর্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হ'তে পারে না,

তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়, সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম।"

যে জাতিগত ও শ্রেণীগত বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের বহ্নি আজ সমগ্র বিশ্বকে প্রজ্জ্বলিত করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কবি উদাত্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া মৈত্রী ও মহামানবতার বাণী প্রচার পূর্ব্বক শান্তিনিকেতনকে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের বিদ্যা-নিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-নিকেতন ক'রে তুলতে হ'বে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয় লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্য লাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই—যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা ক'রে সে ধন্য হবে। শিক্ষা-ক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা।" শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনস্থল; সত্যই পূর্ব ও পশ্চিম এখানে হাত মিলাইয়াছে। ইহা মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের অন্যতম অবদান। সুরুলের 'শ্রীনিকেতন' বোলপুর আশ্রমের এক নূতন অঙ্গ। শ্রীনিকেতনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে আধুনিক কালে জীবিকা অর্জন করিবার জন্য নানারূপ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। সুইটজারল্যাণ্ডের স্বাবলম্বী শিক্ষা-উপনিবেশগুলির ন্যায় এখানে স্বাবলম্বন ও শ্রমের মর্যাদা শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীনিকেতনে যেন কবিগুরু বাস্তব জগতে নামিয়া আসিয়াছেন। শ্রীনিকেতনের হলকর্ষণ উৎসবে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্য। "যখন যন্ত্র মানুষকে অমানুষ করছে এবং সমাজকে ভেঙে দিচ্ছে, তখন মাতৃস্বরূপা ধরিত্রীর নিকট আমাদের ঋণের কথা স্মরণ করা উচিত। তিনি আমাদের জীবনধারণের উপাদান যোগাচ্ছেন। আমরাও তাঁর পুষ্টিসাধন করব। এই হলকর্ষণ উৎসব আমাদের কৃতজ্ঞতার প্রতীক। মানব-সন্তান ধরিত্রীরও সন্তান। মানুষের সুখ—পৃথিবী এবং মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বে ও সহযোগিতায়—সর্বগ্রাসী বিরোধিতায় নয়।"

রবীন্দ্রনাথ শান্তির বার্তাবহ ও বিশ্বপ্রেমিক। তাঁহার চরিত্রের এই দুইটি গুণই প্রতিভাত হইয়াছে তাঁহার এই প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমরা যতই ক্ষুদ্র হই না কেন এবং জগতের যে কোনো স্থানে বাস করি না কেন, সমষ্টিগত হিসাবে আমাদের ক্ষমতা আছে—সমগ্র মানবজাতির জ্ঞানে আলোকপাত করা।

শান্তিনিকেতন—তথা বিশ্বভারতী যে শুধু ভারতের গর্বের বস্তু তাহা নহে, ইহা সারা বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ। শিক্ষা যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে, তাহা যে সর্বলোকের এবং সর্ব-কালের—এই আশ্রম লোকচক্ষুর সমক্ষে এই বিরাট সত্য উপস্থাপিত করিয়াছে। কবির আরব্ধ কার্য্যে কত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তিনি শিশুদের কত ভালবাসিতেন এবং তাহাদের শিক্ষা মধুর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া পৃথিবীর রূপ পরিবর্ত্তনে কিরূপ প্রয়াসী হইয়াছিলেন—তাহার মূর্ত্ত প্রয়াস চিরতরে বিরাজমান থাকিয়া শিক্ষাগুরুর যশোগাথা ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নিকট প্রচার করিবে। রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে বুঝিতে হইলে শুধু তাঁহার কাব্যের আলোচনা যথেষ্ট নয়, শান্তিনিকেতনকেও বুঝিতে হইবে; নচেৎ একদেশদর্শিতা হইবে।

বর্ষ-সন্ধি

শ্রীমহাদেব রায়

লেখনীর মসী মুখে রূপ সজ্জা কি রচি তোমার।
মানস দর্পণে স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব তোমার উজ্জ্বল,
এত রূপ এত সজ্জা হে মাধবী, অঙ্গে যে অপার,
কি সযত্ন আবরণে আবরিয়াছিল হিমাঞ্চল।
কান্তি তব জাগিয়াছে প্রতি অঙ্গে রেখায় রেখায়
শিথিল অঞ্চলে যেন সঞ্চারিণী কাঞ্চনী কোমলা,
মাধুর্যের সুর শোভা ধরিয়াছে পল্লবে শাখায়,
দিব্য আভরণ তব সর্ব অঙ্গে হে দিব্য কুন্তলা।

স্বর্ণ-কান্তি শাল শীর্ষে কাঞ্চন কুন্তল মনোহর,
ধরিতে দাঁড়ায়ে যেন আসন্ন বৈশাখ তপশ্চরে,
পলাশে গৈরিক বাসে পতিব্রতা পবিত্র সুন্দর
আচরিছ তপশ্চর্যা শুচিতার বরমাল্য করে।
নববর্ষ-সন্ধি-লগ্ন বাঁধে দৃঢ় গ্রন্থির বন্ধনে
বাঞ্ছিত বৈশাখে আজি সুপবিত্র তোমার অঞ্চলে
এ বিশ্ব-বাসর মুগ্ধ বধূ-বরে মধুর মিলনে,
নব রবি-গীতি-রাগ নববর্ষে কমলের দলে।

সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তি

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

সিন্ধু, পঞ্জাব ও বেলুচীস্থানের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইবার পরে সর জন মার্শাল মত প্রকাশ করিলেন যে সিন্ধুযুগের তাম্রযুগীয় সভ্যতা এক বৃহত্তর তাম্রযুগীয় সভ্যতার অংশমাত্র। এই বৃহত্তর সভ্যতা পশ্চিমে থেসালী ও দক্ষিণ ইটালী এবং পূর্বে হোনান ও চিহলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে দক্ষিণ রুশিয়া (Tripolje I) পর্যন্ত ইহার বিস্তার দেখা যায়। সে যাহা হউক, মার্শালের বক্তব্যের অর্থ এই যে পূর্বে মাঞ্চুরিয়া হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত এই তাম্রযুগীয় সভ্যতা প্রসারিত ছিল। এই মতবাদের প্রধান ভিত্তি সেরামিক্‌স (ceramics) বা পোড়ামাটির তৈজসপত্রের গঠনপ্রণালী, রঙের কাজ ও উহার উপরের নক্সা। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এই মতবাদ ভিত্তিশূন্য নহে তাহা হইলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইটালী পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাম্রযুগীয় কৃষ্টির অভ্যুদয় কি সমসাময়িক না প্রত্যেক দেশে বা নিকটবর্তী কতকগুলি লইয়া গঠিত এক একটি অঞ্চলে এবং প্রত্যেক জাতি বা কতকগুলি জাতি যাহারা এক গোষ্ঠীভুক্ত বা সমগোষ্ঠীয় তাহাদের মধ্যে ইহার বিকাশ বিভিন্ন সময়ে ঘটিয়াছিল ? অথবা মার্শাল যে ভাবে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে এ প্রশ্নও উঠিতে পারে, এই কৃষ্টি কি একটি কেন্দ্র হইতে—মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ? তারপরের জিজ্ঞাস্য, তাহা হইলে সেই কেন্দ্র কোথায় ?

প্রাচীন প্রস্তরযুগ, নূতন প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জযুগ, ও লৌহযুগের কৃষ্টির সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে যে সকল আলোচনা হইয়াছে—তাহা হইতে সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে এক কেন্দ্র হইতে বিস্তৃতি বা বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে এক স্তরের কৃষ্টির সমসাময়িক বিকাশের ধারণা সমর্থিত হয় না। ইতিহাসও এ ধারণার সমর্থন করে না। সিন্ধু উপত্যকার তাম্রযুগের কাল খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরে মিশরে তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ায় খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরে, চীনে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরে, সাইপ্রাসে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বে তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ইউরোপের প্রধান ভূভাগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে আয়র্লণ্ড ছাড়া অন্যত্র প্রকৃত প্রস্তাবে কোন তাম্রযুগ ছিল না। লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হয় খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে মধ্য ইউরোপে ইহার প্রচলন হয় কিন্তু ভারতবর্ষে সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরে লৌহের ব্যবহার জানা ছিল। দক্ষিণ-ভারতে লৌহের ব্যবহার আরও প্রাচীন। দক্ষিণ-ভারতে তাম্র বা ব্রোঞ্জযুগ ছিল না, প্রস্তরযুগ হইতে লৌহযুগের প্রবর্তন হয়। মিশরে ৪র্থ রাজবংশের আমলে (খ্রীঃ পূঃ ৩৭৩৩) লৌহের ব্যবহার হইত। গিজের পিরামিড হইতে লৌহ পাওয়া গিয়াছে, পঞ্চম বংশের আমলের (খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬৬) আবুসিরের স্তূপ হইতে লৌহের কোদালী পাওয়া গিয়াছে। চীনে খ্রীঃ পূঃ ২৩৫৭, ক্রীটে খ্রীঃ পূঃ ১২০০, আসিরীয়ায় খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। (Huxley Memorial Lecture for 1912 ; Journal of the Royal Anthropological Institute, XLII)।

সে যাহা হউক, মার্শালের মন্তব্য হইতে একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে একই প্রকারের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণযুক্ত তাম্রযুগীয় কৃষ্টি এশিয়ার পূর্ব সীমানা হইতে দক্ষিণ-ইউরোপ পর্যন্ত একই সময়ে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রকৃত অবস্থা এই যে প্রাচীন ইতিহাস হইতে দেখা যায়, কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল সভ্যতা বিকাশের কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে সভ্যতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সভ্যতা বিকাশের এই সকল কেন্দ্রের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ ছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রের এই সকল লক্ষণ তাহার প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে সংক্রামিত হইয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে দুই-একটি লক্ষণের সাদৃশ্য তাহাদের মধ্যে সম্পর্কের প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হইতে পারে না। বৈষয়িক ব্যাপারে, অর্থাৎ জীবন-যাত্রার স্থূল প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যেমন যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ, কৃষিকার্যের পদ্ধতি, জলযানের ব্যবহার, বস্ত্রাদি বয়ন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে অল্পবিস্তর সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন সর্বত্র এক। প্রাচীন যুগের মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এই সকল প্রয়োজন নিজেদের অবস্থানুযায়ী মোটামুটি মিটাইবার চেষ্টায় নিয়োজিত হইত। তারপর এই সকল বিভিন্ন কেন্দ্রে কোন নির্দিষ্ট স্তরের কৃষ্টির বিকাশ এক সময়ে ঘটিয়াছিল ইতিহাস এ কথা বলে না। তাম্রযুগীয় কৃষ্টির অভ্যুদয় যে

বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে লক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে উপরে একজন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, পরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক হইবে।

সভ্যতার বিকাশের ধারা সম্বন্ধে ইতিহাস এই প্রকার সাক্ষ্য দিলেও দেখা যায় যে সাধারণ মানুষের চিন্তার গতি খানিকটা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। একজন সাধারণ পূর্ব-পুরুষ বা একজন আদিম মানবের কল্পনা করা লোকের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। শুধু কবিকল্পনার আঁদম ইভ নহে, বহু বিষয়ের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া বহু শিক্ষিত লোকের চিন্তাধারা এই অবৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া চলে। গোড়ায় এই পুরাতন, বদ্ধমূল অভ্যাসের দরুণ সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের চিন্তাধারা এই অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্য করিয়াছে। একটি মাত্র কেন্দ্রে সভ্যতার উৎপত্তি হইয়া তাহা সমগ্র পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়াছে এই কথা শুনিতে হাস্যকর মনে হইলেও কার্যতঃ হাস্যকর মনে করা হয় নাই। প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন যুগের সামাজিক প্রথা, প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট কোন চিন্তা বা ভাব-ধারার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে বসিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধান করিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই পুরাতন, মজ্জাগত অভ্যাস কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হন না। এই পুরাতন অভ্যাসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারা যখন আপনাদের অনুসন্ধানের ফল পুরাদস্তুর বৈজ্ঞানিক ঠাট বজায় রাখিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করেন, পাণ্ডিত্যের প্রতিপত্তি ও মর্যাদার কবচে সুরক্ষিত গবেষকের গবেষণা লোককে সহজে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই আলোচনার মধ্যে দেখা যাইবে।

সর জন মার্শালের যে মন্তব্যের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে সেই মন্তব্যকে আলোচনার সূত্র স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাঁহার সম্পূর্ণ বক্তব্য এইরূপ:

"A civilisation as widely diffused as the chalcolithic, with ramifications extending as far as Thessaly and Southern Italy and as far east, perhaps, as the Chinese provinces of Honan and Chih-li could not have been homogeneous."

১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"I surmise that it (Mohenjo Daro and Harappa culture) will also be found to have formed part and parcel of a much wider sphere of culture which embraced not only South Mesopotamia and India, but probably Persia and a large part of Central Asia, and which may have extended as far west as the Mediterranean where the early Aegean civilisation presents certain somewhat similiar features."

লক্ষ্য করিতে হইবে যে মার্শাল ভারতবর্ষ, দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া, পারস্য ও মধ্য-এশিয়াকে এক বৃহত্তর কৃষ্টি কেন্দ্রের (sphere of culture) বা অঞ্চলের মধ্যে ধরিতেছেন এবং বলিতেছেন যে এই কেন্দ্র সম্ভবতঃ ভূমধ্য-সাগরীয় কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রথম উক্তিতে তিনি বলিতেছেন যে এই বহু বিস্তারিত সভ্যতার লক্ষণসমূহ সর্বত্র এক প্রকারের হওয়া সম্ভব নহে।

যে কৃষ্টিকেন্দ্র ভারতবর্ষ, দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া, পারস্য ও মধ্য এশিয়া লইয়া গঠিত তাহার সহিত ভূমধ্যসাগরীয় কেন্দ্রের সংযোগ—লক্ষ্য করিতে হইবে যে মার্শাল সং-যোগের উপরে যান নাই—তাঁহার মতে প্রমাণিত হয়—(১) Ceramic wares এবং (২) Possible association of religious ideas। এই পোড়া মাটির তৈজসপত্রের এবং ধর্মভাব বা চিন্তার সাদৃশ্য বা সম্পর্কের প্রমাণের আলোচনা করা প্রয়োজন।

সেরামিকসের প্রমাণের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্বে মনে পড়ে এই বিষয়টি সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের বীতস্পৃহা। আরও মনে হয় স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদারের সিন্ধুদেশে আততায়ীর হস্তে অকাল মৃত্যুর ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার কথা।

পটারির উপরে নক্সার বৈচিত্র্য এক একটি কৃষ্টি-কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক। এই নক্সা নানাপ্রকারের দেখা যায়, যথা জ্যামিতিক নক্সা—সরল রেখা, ত্রিকোণ, বৃত্ত, অর্দ্ধবৃত্ত, পঞ্চকোণ, অষ্টকোণ। তারপর জাল, দড়ি, স্ক্রোল, গাছ, পাতা, ফল, ফুল, মালা, বিভিন্ন প্রকারের পাখী ও জন্তু, মূর্তি প্রভৃতি। ইহা ছাড়া স্বস্তিকা, চক্র প্রভৃতি চিহ্ন পাত্রের গায়ে খোদাই বা অঙ্কিত করা হইয়াছে। নক্সার মত পটারির রঙও বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক। পশ্চিম সিন্ধুদেশের আম্‌রির কৃষ্টি প্রাক্-মোহেঞ্জোদারো যুগের এবং বেলুচী-স্থানের নালের (Nal) কৃষ্টির অপেক্ষা প্রাচীন বলা হইয়াছে। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে আম্‌রির পটারি সাধারণতঃ এক রঙের (buff or, light red) বা দুই রংয়ের (bichrome) এবং নক্সা জ্যামিতিক চিত্র। অবশ্য তিন রঙের পটারিও আম্‌রিতে কিছু পাওয়া গিয়াছে। মোহেঞ্জোদারোর পটারিতে উজ্জ্বল লাল জমির উপর কাল রঙের নক্সা দেখা যায়। নক্সায় জ্যামিতিক চিত্রের সঙ্গে গাছ, পাতা, ফুলও জীব-জন্তুর চিত্র। এই রঙের বৈশিষ্ট্যকে black-on-red technique বলা হয়। এই টেকনিক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল মনে হয়। এই দুইটি টেকনিক ব্যতীত বেলুচীস্থানের নাল, সুনদারা প্রভৃতি স্তূপে ও উত্তর বেলুচীস্থানের ওয়াজির সীমান্তের দাবার কোট প্রভৃতি স্তূপে প্রাপ্ত পটারিতে দুইটি টেকনিক দেখা

যায়। নালের বহু রঙের বা Polychrome technique আম্‌রির টেকনিকের পরিণত অবস্থা বলিয়া মনে করা হয়। দাবারকোটের টেকনিক মোহেঞ্জোদারোর টেকনিকের সঙ্গে সম্পর্কিত বলা হইয়াছে। সিন্ধুর ঝুকর, লোহুমঞ্জো-দারোর পটারিতে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপে মোহেঞ্জোদারোর টেকনিক অনুসৃত হইয়াছে।

পঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচীস্থানের প্রাচীনযুগের স্তূপসমূহ হইতে প্রাপ্ত পটারি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত মোটামুটি এই যে গঠন ও রঙের বৈশিষ্ট্য এবং নক্সা বা কারুকার্য হইতে একটি কৃষ্টিকেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায় যাহার সহিত পশ্চিমে সিষ্টান, সুসা ও দক্ষিণ মেশো-পটেমিয়া, উত্তরে পশ্চিম তুর্কীস্থানের আনাউ-এর সংযোগের কিছু সূত্র পাওয়া যায়। বেলুচীস্থানের পেরিয়ানো গুণ্ডাই ও ঝোব উপত্যকার অন্যান্য স্তূপে প্রাপ্ত পটারির নক্সা ও গঠনে সিষ্টানের পটারির সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। ঐ সকল স্তূপে প্রাপ্ত ভেসের গঠনে আনাউ-এর (deposits of culture II) ভেসের গঠনের সাদৃশ্য দেখা যায়। সিন্ধুর আম্‌রি প্রভৃতি স্তূপের পটারির নক্সার কতকগুলির সঙ্গে মেশোপটেমিয়ার আল-উবাইদ, সামারা, পশ্চিম-পারশ্যের সুসা এবং টেপে মুসেয়ানির নক্সার মিল দেখা যায়। সিন্ধুর ফিকে রঙের জ্যামিতিক নক্সার পটারির সঙ্গে পারশ্য, মেশোপটেমিয়া ও আনাউ-এর পটারির সঙ্গে যতটা মিল দেখা যায় মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার পটারির সঙ্গে ততটা মিল দেখা যায় না। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদেশিক সভ্যতার সংযোগের কথা যখন বলা হয় তখন সেরামিকসের এই সাক্ষ্য স্মরণ রাখিতে হইবে। পঞ্জাব, সিন্ধু, ও বেলুচী-স্থান লইয়া যে কৃষ্টি-কেন্দ্র দেখা যায় সেই কেন্দ্রের মধ্যেই প্রাক্‌-সিন্ধুযুগের, সিন্ধুযুগের ও উত্তর-সিন্ধুযুগের কৃষ্টির পরিচয় পটারির সাহায্যে ও স্তরবিন্যাসের প্রমাণের দ্বারা পাওয়া যায়। লোহুঞ্জোদারো ও মানছারের নিকটবর্তী স্তূপসমূহে যে পটারি পাওয়া গিয়াছে বিশেষজ্ঞের মতে তাহা মোহেঞ্জোদারোর পরবর্তীকালের। ঝুকর প্রভৃতি স্তূপের উপরের স্তরগুলি হইতে ইন্দো-সাসানীয় আমলের নক্সাযুক্ত পটারি পাওয়া গিয়াছে।

এ সম্বন্ধে আরও দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। ওয়াজিরস্থান ও উত্তর বেলুচীস্থানের কয়েকটি প্রাচীনযুগের স্তূপ হইতে প্রাপ্ত পটারি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সর অরেল ষ্টাইন্‌ বলিতেছেন,

"But so much is certain in view of the geographical position which these sites of the chalcolithic period in North Baluchistan occupy that they help us very usefully to link up the prehistoric civilisation now revealed in the Lower Indus with that traced already before in Iran and easternmost Mesopotamia."

প্রাচীন যুগের স্তূপগুলির ভৌগোলিক অবস্থান যে এই সংযোগ নির্ণয়ের কাজে বিশেষভাব সাহায্য করিয়াছে তাহার স্বীকৃতি পাওয়া যাইতেছে। ঝোব উপত্যকায় প্রাপ্ত পটারির নক্সা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,

"The resemblance of motifs useu in the painted pottery to that from culture strata ascribed to the pre-Sumerian times in Mesopotamian sites and hence approximately dateable, is very striking indeed."

অর্থাৎ উত্তর বেলুচীস্থানের পটারির বয়স মেশো-পটেমিয়ার সুমেরযুগের পটারি অপেক্ষা প্রাচীন। এ motif বা নক্সার সঙ্গে হোনানের ইয়াং-শাও, সা-কুও-টান এবং কানসুর নক্সার সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে। হোনানের এই ইয়াং-শাও কৃষ্টি নূতন প্রস্তরযুগের (late Neolithic age) এবং কানসুর চিত্রিত পটারি তাম্রযুগের বলিয়া অনুমান করা হয়। ইয়াং-শাও কৃষ্টির বয়স খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-২০০০ বলা হয়। সর্‌ জন মার্শাল তাম্রযুগের কৃষ্টির বিস্তৃতি দক্ষিণ ইউরোপ পর্য্যন্ত দেখা যায় বলেন। একজন পণ্ডিত সিন্ধু দেশের মানছার হ্রদের নিকটবর্তী ঝাঙ্গার স্তূপ হইতে প্রাপ্ত পটারির টেকনিকের (black ware with incised patterns) সঙ্গে ইউরোপের দানিউব অঞ্চলের "বেলবিকার" (bell-beaker) টেকনিকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। বাঙ্গালোরের নিকটবর্তী পুত্তানহাল্লিতে ঠিক এই টেকনিকের পটারি পাওয়া গিয়াছে। এই স্তূপের বয়স লৌহযুগের আরম্ভ-কাল বলিয়া মনে করা হয়। পশ্চিম বেলুচীস্থানের কলবার কুল্লী স্তূপের পটারিতে মিশরের পদ্ম নক্সা দেখা যায় বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। মোহেঞ্জোদারোতে (D site) প্রাপ্ত একটি ভেস সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে—

"Which in beauty of form, intensity of feeling and vigour of execution is unsurpassed by the painted pottery recovered in Transcaspia, Persia, Sumer or Baluchistan."

উপরে সেরামিকস সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের সীমান্তের অর্থাৎ ইরাণ ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী কয়েকটি অঞ্চলের রঙের টেকনিকে (Pale ware) বৈদেশিক টেকনিকের সহিত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। নক্সায় প্রধানতঃ জ্যামিতিক প্যাটার্ণের টেকনিকে বিদেশের টেকনিকের মিল দেখা যায়। মোহেঞ্জোদারোর টেকনিক সিন্ধু উপত্যকার নিজস্ব টেকনিক। জ্যামিতিক নক্সা, ঢেউ, মালা, শিকল, স্ক্রোল, পাতা, ফুল, জীবজন্তুর মধ্যে মাছ প্রভৃতির নক্সাকে conventionalised pattern বলা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাচীনযুগের পটারির রং ও নক্সা

করিবার শিল্পীদিগের মধ্যে এই সকল নক্সা "বাঁধা গৎ" ছিল। সুতরাং এই সকল নক্সাকে বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক বলা যায় না। ইরাণ, মেসোপটেমিয়া ও আনাউ-এর পটারির সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার পটারির যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাহার প্রকৃত মূল্য এখন সহজে যাচাই করা যাইতে পারে। দেখা যাইবে যে অতি দুর্বল বনিয়াদের উপর বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করা হইয়াছে।

সেরামিকসের প্রমাণ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। এইবার মার্শালের ব্যবহৃত দ্বিতীয় প্রমাণের কথা বলা যাইতে পারে।

হরাপ্পা, মোহেঞ্জোদারো ও বেলুচীস্থানের বিভিন্ন স্তূপ হইতে বহু সংখ্যক পোড়ামাটির স্ত্রী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর জন মার্শাল, সর অরেল ষ্টাইন এবং অন্য বহু পণ্ডিতের মতের এই স্ত্রী মূর্তিগুলি দেবী প্রতিমা বা representations of the Mother Goddess। এই সিদ্ধান্তে আসিতে যুক্তি প্রয়োগ যাহা করিবার তাহা মার্শালই করিয়াছেন, অপরাপর পণ্ডিতের নিকট এই সিদ্ধান্ত দাঁড়াইয়াছে স্বতঃসিদ্ধান্তের মত, অর্থাৎ প্রমাণপ্রয়োগনিরপেক্ষ। মার্শাল এই সিদ্ধান্তে আসিবার জন্য যে সকল যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার প্রমাণকে evidence of analogy নাম দেওয়া যায়। এই evidence of analogy-কে আর একটু বিশদ করিলে দাঁড়ায় evidence of possible association of ideas, ইহার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। মার্শাল বলিতেছেন সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী-মূর্তির অনুরূপ মূর্তি পারশ্য হইতে ঈজিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ এলাম, মেশোপটেমিয়া, ট্রান্সকাস্পিয়া, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট, বলকান এবং মিশরে পাওয়া গিয়াছে। (M. I. C. vol. 1 p. 50) তারপর তিনি বলিতেছেন এই সকল মূর্তি সম্বন্ধে প্রচালিত মত এই যে they represent the Great Mother or Nature Goddess (M. I. C. vol. 1-p. 50) তাম্রযুগের সিন্ধু উপত্যকায় এবং বেলুচীস্থানে এই সকল মূর্তি পাওয়াতে মনে করা যায় যে এই কাল্ট যতটা বিস্তৃত ছিল বলিয়া এ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল প্রকৃতপ্রস্তাবে তদপেক্ষা বেশী বিস্তৃত ছিল। ইহাই evidence of possible association of ideas।

সিন্ধু ধর্মের আলোচনার সময়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে; কারণ এই মতবাদের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে মার্শালের প্রচারিত এবং দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতসমাজে গৃহীত এই মতবাদ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটি কথা বলা আবশ্যক।

হিন্দু ধর্মের মধ্যে বহু অনার্য ভাব রহিয়াছে, আর্য সভ্যতার উত্তরাধিকার দাবি করিলেও হিন্দুগণ অনার্যদের নিকট অনেক ধর্ম বিশ্বাস, দেবদেবী প্রভৃতি ধার করিয়াছে একথা বলিতে বিদেশী পণ্ডিতগণ বড় ভালবাসেন, দেশী পণ্ডিতগণও তাঁহাদের দেখাদেখি ভালবাসিয়া থাকেন। প্রাক-আর্যযুগের অধিবাসীদিগের নিকট, সম্ভবতঃ দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর নিকট হইতে হিন্দুরা স্ত্রী-দেবতার পূজা করিতে শিখিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় হিন্দুদিগের তথাকথিত আর্যকৃষ্টি বার আনা অনার্য ভেজাল, দ্রাবিড়দিগের নিকট ধার করা। স্ত্রী-দেবতার পূজা অনার্য-দিগের জিনিস, ইহার উৎপত্তি ম্যাট্রিয়ারকাল সমাজে। এই সমাজব্যবস্থা এককালে সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল, এখনও দ্রাবিড়দিগের মধ্যে দেখা যায়। এইভাবে পুরাতন আর্য বনাম দ্রাবিড় মামলার জের সূক্ষ্মভাবে, নানাপ্রকারে টানিয়া চলা হইতেছে। স্ত্রী-দেবতার পূজা যে আর্যদিগের নিকট অপাংক্তেয় ছিল এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ, প্রমাণ ব্যতিরেকেই নিঃসন্দেহ। সেজন্য দেখা যায় যে ফারনেল ও ওপার্টের সাক্ষ্যের বলে মার্শাল বলিতেছেন,

> "As a fact, there is no example of the ancient Aryans, whether in India or elsewhere, of having elevated a female deity to the supreme position occupied by the Mother-Goddesses."*

আর্যদিগের ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ অপঠিত জ্ঞানের বাহুল্যের পরিচয় পাওয়া যায় আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের উক্তিতে,

> "The sancity of the cow is foreign to the Rigveda and appears far more suggestive of the religions of Asia Minor. Egypt and Crete than of Indo-European invaders." (Hutton, Census Report, 1931, Vol. I, Part I, pp. 395, 396.)

যে দুইটি মত উদ্ধৃত করা হইল তাহার তুল্য অযথার্থ উক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

উপরে যাহা বলা হইল অবান্তর হইলেও সতর্কতার প্রয়োজন কতখানি জানাইবার জন্য তাহা বলা হইল।

মার্শাল যে প্রমাণের বলে সিন্ধু ধর্মের সহিত সিন্ধু উপত্যকা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত দেশগুলিতে প্রচলিত প্রাচীন যুগের ধর্মের সংযোগ দেখাইয়াছেন সেই evidence of analogy সম্বন্ধে এখানে অধিক আলোচনা স্থগিত রাখিয়া এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে উল্লিখিত দেশগুলিতে প্রাচীন যুগে প্রচলিত স্ত্রীদেবতার উপাসনার আলোচনা করিলে এবং

---

* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের "Mother Goddess Worship in the Vedic Literature—*Indian Culture* vol VIII No 1 & 2 (1941 1942) দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তিগুলির তুলনা করিলে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে analogy র প্রমাণ দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং সংযোগের কথা উঠে না।

কিন্তু যে প্রমাণের দ্বারা কিছু প্রমাণিত হয় না তাহাই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং শুধু সংযোগ নহে পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নিকট সিন্ধু-সভ্যতার প্রচুর ঋণের কথা পুনঃপুন বলা হইয়াছে। এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাউক।

পটারি এবং স্ত্রীদেবতার উপাসনার প্রমাণের বলে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার সংযোগ প্রমাণিত হয় এই মতবাদ প্রচারিত হইলে পণ্ডিতগণ সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের গবেষণার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হইয়া সিন্ধুবাসীদিগের জাতি, বৈষয়িক কৃষ্টি, ধর্ম, এক কথায় সমগ্র সিন্ধু-সভ্যতা ও সিন্ধু-সভ্যতার বাহকদিগকে সেই ক্ষেত্রের মধ্যে গ্রহণ করিল।

সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া পণ্ডিতগণের দৃষ্টি প্রথমে স্বভাবতই মেশোপটেমিয়ার উপর পড়িল। কারণ এশিয়ার এই অঞ্চলে মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতা সমধিক প্রসিদ্ধ এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজ বহুকাল এই সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মেশোপটেমিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানও এ সম্পর্কে উপেক্ষার বিষয় নহে। মেশোপটেমিয়ার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার প্রকৃত সংযোগসূত্র কি প্রকারের পূর্বের এক প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই মত প্রচারিত ও অনেকটা গ্রাহ্য হইয়াছে যে ভূমধ্যসাগরীয় ও আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর লোক সমুদ্রপথে সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়া মেশোপটেমিয়ার সভ্যতাকেই ভারতবর্ষের মাটিতে ঢালিয়া সাজাইয়াছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি মেশোপটেমিয়া হইতে এই মতবাদ প্রকৃতপ্রস্তাবে মেডিটারেনীয়ান থিওরীর একটি অংশ। মেডিটারেনীয়ান থিওরী অনুসারে সভ্যতার উৎপত্তি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বলিতে যে সকল অঞ্চল বুঝায় তাহার মধ্যে ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলি এবং এশিয়া মাইনরের কথা এখানে সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

ঈজিয়ান সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে এশিয়া-মাইনরের ট্রয়, গ্রীসের টিরিন্স (Tiryns) এবং ক্রীটের নোসাস ও ফেসষ্টাস (Cnossus, Phaestus) হইতে। ঈজিয়ান সভ্যতাকে প্রাক-হেলেনিক, মাইসিনিয়ান বা মিনোয়ান সভ্যতাও বলা হয়। শ্লিম্যান কর্তৃক ট্রয় হইতে যে সকল নিদর্শন উদ্ধার করা হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ঐ সভ্যতার বয়স খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বৎসর বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ক্রীটে ইভান্সের ও অন্যান্য পণ্ডিতের প্রত্নতাত্ত্বিক অবিষ্কার হইতে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরের মধ্যে ক্রীট প্রস্তরযুগ হইতে ব্রোঞ্জ যুগে উপনীত হয় এবং অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসর পরে ক্রীটের ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। ["The golden age of Crete lasted about a century" (B. C. 1500-1400).] । পণ্ডিতগণের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে ঈজিয়ান সভ্যতার প্রকৃত অভ্যুদয় যে সময়ে ঘটে সেই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৪০০) ইউরোপীয় আর্যবাদ অনুসারে বৈদিক আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঈজিয়ান সভ্যতার বয়সের যে হিসাব করা হইয়াছে সেই হিসাব অন্ততঃ আংশিকভাবে নির্ভরযোগ্য মনে করিলে তাম্রযুগের সিন্ধু-সভ্যতার সহিত ঈজিয়ান সভ্যতার সংযোগ কল্পনা করা সম্ভব নহে। ক্রীটের সভ্যতার যখন স্বর্ণযুগ (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-১৪০০) মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা তখন পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

তারপর এশিয়া-মাইনর। এশিয়া-মাইনরের গ্রীক নাম আনাতোলিয়া, তুর্কগণ এই নাম গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ফ্রিজিয়া, গ্যালিসিয়া, কাপাডোসিয়া এই অঞ্চলে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা ফ্রিজিয়ার নিকট বিশেষ ঋণী। রোমানগণ ফ্রিজিয়া হইতে কিবেলের (Cybele, 'Great Mother, Mother of the Gods) পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। ফ্রিজিয়ানদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহারা সম্ভবতঃ থ্রেসের ইলিরিয়ান গোষ্ঠীর একটি শাখা। ইতিহাসে ফ্রিজিয়ার অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে পশ্চিম এশিয়া-মাইনরের হালিস নদীর উপত্যকায় প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হিটাইট জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। এশিয়া-মাইনর হইতে তাহাদের রাজ্যের সীমা সিরিয়া ও মিশরের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আনাতোলিয়ায় যে তাম্রযুগের সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা এই হিটাইট জাতির কীর্তি বলিয়া অনুমান করা হয়। খ্রীঃ পূঃ ৩য় সহস্রকের শেষের দিকে শক্তিশালী হইয়া তাহারা পূর্ব এশিয়া-মাইনর অধিকার করে এবং খ্রীঃ পূঃ ১৯২৫ অব্দে হাম্মুরাবির বংশকে বাবিলোনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করে।

হিটাইট ও ফ্রিজিয়ানদিগের ধর্ম সম্বন্ধে পরে সিন্ধু ধর্মের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইবে, এখানে সিন্ধু-সভ্যতার বাহকগণ ও তাহাদের স্ত্রীদেবতার উপাসনা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের এই মতের সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে।

কর্ণেল সেওয়েল ও ডাঃ গুহের অভিমত উল্লেখ করিয়া

ডাঃ হাটন বলিতেছেন যে সিন্ধু-সভ্যতার অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে বেলুচীস্থান ও সিন্ধু-উপত্যকায় এবং সমগ্র উত্তর-ভারতে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতি উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এই গোষ্ঠী পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে মেশোপটেমিয়া হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর এই মত পাওয়া যাইতেছে যে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী-মূর্তিগুলি **Great Mother** বা **Nature goddess**-এর প্রতিমূর্তি। এই দেবীর পূজা—

"Is believed to have originated in Anatolia (probably in Phrygia) and spread thence throughout most of Western Asia."

মায়ার্সের মতে উহা আনাতেলিয়া বা সিরিয়া হইতে মেশোপটেমিয়ায় আসিয়াছিল। হাটনের মতে—

"The religious history of pre-Vedic India was probably similar and parallel to that of eastern Mediterranean and of Asia Minor."

মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে মেডিটারেনিয়ান থিওরীর প্রচারকগণের মতে সিন্ধু জাতি ও সিন্ধুধর্ম পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। সিন্ধু জাতির মধ্যে যে আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে সেই গোষ্ঠী ঐ অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল অনুমান করা হইয়াছে (ডাঃ হাটন)। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ঈজিয়ান এলাকা ও আনাতোলিয়ার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঈজিয়ান সভ্যতার সম্বন্ধে উপরে বলা হইয়াছে যে তাম্রযুগের সিন্ধু-সভ্যতা ও ব্রোঞ্জযুগের ঈজিয়ান সভ্যতাকে সমসাময়িক বলিয়া মনে করা চলে না। প্রাচীনত্বের হিসাব করিলে এবং সংযোগ প্রমাণ করিবার মত তথ্য পাওয়া গেলে বরং অনুমান করিতে হয় যে সিন্ধু-কৃষ্টির প্রভাব ঈজিয়ান এলাকায় প্রসারিত হইয়াছিল। তারপর পণ্ডিতগণ ঈজিয়ান সভ্যতার বাহকদিগকে লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর লোক বলিয়া মনে করেন না। অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের মধ্যে এই অঞ্চলে একটি মিশ্র জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রস্পেক্টরস্ বা আর্মেনয়েড মারিনার্স (Prospectors or Armenoid Mariners)। আনাতোলিয়া সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত এই যে নূতন প্রস্তরযুগের কাল হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর লোক এই অঞ্চলের অধিবাসী। তাম্রযুগের হিটাইটগণ এই গোষ্ঠীয়। হিটাইটগণের পরে যে ইলিরিয়ান গোষ্ঠীর ফ্রিজিয়ানগণ এই অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠে সেই ইলিরিয়ান গোষ্ঠী গোলমুণ্ড, লম্বামুণ্ড মেডিটারেনিয়ান নহে। হিটাইটগণ দক্ষিণ-সিরিয়ায় মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। ইহার পরে দেখা যাইবে যে তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে মেশোপটেমিয়ার প্রভাব পরিস্ফুট। ডাঃ হেডনের মতে হিটাইটগণের মধ্যে প্রোটো-নর্ডিক (অর্থাৎ আর্য) সংমিশ্রণ ছিল।

সিন্ধুজাতি ও সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি যাঁহাদের মতে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের অভিমত ও ইতিহাসের সাক্ষ্য তাঁহাদের সমর্থন করে না।

মিশরের প্রসঙ্গ এখানে উঠাইবার প্রয়োজন নাই। মিশর প্রাচীন সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র এবং প্রাচীন মিশরীয়গণ ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর হইলেও সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে মিশরের উপর জোর দেওয়া হয় না।

সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে মেশোপটেমিয়া ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে ও যে সকল যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে অতি সংক্ষেপে তাহার কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু যাহা বলা হইয়াছে ও যে সকল যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার প্রকৃত মূল্য যাচাই করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এই প্রকারের আলোচনার এখানে স্থানাভাব, তাহা ছাড়া ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা আছে। কিন্তু একথা বুঝিবার ও বলিবার সময় হইয়াছে যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অপরের মুখে দুইটি মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট বা তিক্ত বাক্যে রুষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকা যাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহে তাহাদের পক্ষে শোভা পায় না। ভারতীয়ের এবং বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। এজন্য লেখক ও পাঠক উভয় পক্ষকে শ্রমস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই আলোচনার সঙ্গে মানসিক ভাবের কোন সম্পর্ক নাই, এই আলোচনা হইবে তীক্ষ্ণ, সত্যানুসন্ধানী, বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

সে যাহা হউক, সিন্ধু-সভ্যতার সহিত মেশোপটেমিয়ার বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সংযোগ ছিল এবং সিন্ধু-সভ্যতা মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত তাম্রযুগের কৃষ্টির অংশমাত্র যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহাদের ব্যবহৃত দুইটি প্রধান যুক্তি, সেরামিক্‌সের থিওরী এবং Possible association of ideas-র থিওরী সংক্ষেপে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সিন্ধু-সভ্যতার ও সিন্ধু জাতির উৎপত্তি যাঁহারা মেশোপটেমিয়া বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বলেন তাঁহাদের অভিমতের ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই পরীক্ষা ও আলোচনার ফলে দেখা যায় যে একমাত্র সেরামিক্‌সের থিওরীর কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রহিয়াছে। কিন্তু সেরামিক্‌স হইতে যাহা প্রমাণ হয় তাহা এইরূপ: পশ্চিম সিন্ধু ও বেলুচীস্থানের কয়েকটি স্তূপ হইতে তাম্রযুগের যে সকল পটারি পাওয়া গিয়াছে তাহা মোহে-

ঞ্জোদারো ও হরাপ্পার পটারি হইতে ভিন্ন এবং মোহেঞ্জো-দারো ও হরাপ্পা যুগের পূর্ববর্তী। এই পটারির সহিত সিষ্টান, ইরাণের বিভিন্ন অঞ্চল, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া এবং মধ্য-এশিয়ার আনাউতে প্রাপ্ত পটারির কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্য আবার কয়েকটি conventionalised motifs বা অভ্যস্ত নক্সা ছাড়া অন্য কিছুতে নাই। তাহা হইলে এই পর্যন্ত বলা যায় যে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম সিন্ধু ও বেলুচীস্থান এবং ভারতবর্ষের বাহিরের এই অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন প্রকার সংযোগ হয়ত ছিল অথবা সংযোগ থাকা সম্ভব। মেশোপটেমিয়ার বাহিরে সংযোগের অনুসন্ধান করা বাহুল্য, কারণ পশ্চিম এশিয়ায় মেশোপটেমিয়ার সভ্যতার তুল্য প্রাচীন ও সমৃদ্ধ আর কোন সভ্যতার পরিচয় জানা নাই। তারপর দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ার বা স্নমেরীয় সভ্যতা ছিল বাবিলোনীয়, আসিরীয় এবং সাধারণভাবে সমগ্র পশ্চিম-এশিয়ার সভ্যতার ভিত্তি (সর জন মার্শাল)।

শুধু এই সংযোগ ছাড়া সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির সম্বন্ধে কোন কথা উঠে না, মেশোপটেমিয়া সম্পর্কেও উঠে না। কারণ মেশোপটেমিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতার কতকটা সমসাময়িক, পূর্ববর্তী নহে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্নমেরীয় সভ্যতার কয়েকটি নিদর্শন মোহেঞ্জোদারোর উপরের স্তরগুলি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

এখন ভারতবর্ষের মধ্যের ও ভারতবর্ষের বাহিরের যে দেশগুলির মধ্যে সংযোগ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় সেই সকল দেশ একটি কৃষ্টি-কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই কৃষ্টি-কেন্দ্রের পশ্চিম সীমানায় এলাম, স্নমের এলাকা-উত্তর সীমানায় আনাউ এলাকা, দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় বেলুচীস্থান-সিন্ধু-পঞ্জাব এলাকা। মধ্যে সিষ্টান বা জাবুলীস্থান পশ্চিম এলাকা ও পূর্ব এলাকার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে।

দেখা প্রয়োজন এই সীমানার মধ্যে আর কোন কৃষ্টি-কেন্দ্র আছে কি না।

সিন্ধু-সভ্যতাকে এশিয়া মাইনরের নিকট ঋণী প্রমাণ করিতে একদল পণ্ডিত এত ব্যস্ত হইয়াছেন যে সিন্ধু উপত্যকার নিকটতী মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন কৃষ্টি-কেন্দ্রটি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই অথবা দৃষ্টিকে তাঁহারা আকৃষ্ট হইতে দেন নাই। মধ্য-এশিয়ার এই প্রাচীন কৃষ্টি-কেন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনার এখানে স্থানাভাব ঘটিতেছে। এ সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অভিমতের সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইতেছে।

পূর্বের এক প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হেডনের একটি মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার মত এইরূপ:

"There is reason to believe that a great pre-historic civilisation spread from Central Asia to the plateau of Iran and to Syria and Egypt long before 4000 B.C., and the Sumerians who were a somewhat later branch of this Central Asian people, entered Mesopotamia before 5000 B.C."

অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ সহস্রকের বহুপূর্বে মধ্য-এশিয়ায় একটি বড় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল এবং মধ্য-এশিয়া হইতে এই সভ্যতা ইরাণ, সিরিয়া ও মিশরে বিস্তৃত হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। স্নমেরীয়গণ এই মধ্য-এশিয়ার জাতির শাখা এবং খ্রীঃ পূঃ ৫ম সহস্রকে তাহারা মেশোপটেমিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। ডাঃ হেডনের মতে এলামের সভ্যতার অভ্যুদয় খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের ব্যাপার। বলা বাহুল্য, এই কাল নির্ণয় বেশীর ভাগ অনুমান মাত্র। আসল কথা এই যে, তিনি স্নমেরীয় এলামাইট সভ্যতাকে প্রাচীনতর মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত করিতেছেন এবং প্রাচীনতম ভূমধ্য-সাগরীয় সভ্যতার উৎপত্তি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতা হইতে এইরূপ বলিতেছেন। হোনানের ইয়াংশাও কৃষ্টিকেও তিনি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করেন। বয়সের হিসাবে ফ্রিজিয়ান সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০, এশিয়া-মাইনরের সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-২০০০ ও ইয়াংশাও কৃষ্টি খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০ বৎসর বলিয়া অনুমান করা হয় একথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

মধ্য-এশিয়ার এই কৃষ্টি-কেন্দ্র কোথায় ছিল এবং কোন্ গোষ্ঠীয় জাতি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার প্রবাহ দূর-দূরান্তরে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার আলোচনা পরে হইবে।

মধ্য-এশিয়ার যে কৃষ্টি-কেন্দ্র এলাম-স্নমের এলাকার সহিত যুক্ত অতি নিকটবর্তী সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে তাহা যুক্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইলে টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস, নীলনদ বা ভূমধ্যসাগর নহে, সিন্ধু ও অক্সাসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

স্বপ্ন-শিল্পী

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

[যে সকল প্রতিভাবান তরুণ ইংরেজ সাহিত্যিক প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দ) নিহত হন, অলিফান্ট ডাউন (Oliphant Down), তাঁদেরই একজন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনের অবসান হয়। বর্তমান একাঙ্কিকাখানি তাঁরই লেখা 'দি মেকার অব ড্রিম্‌স'-এর অনুবাদ।]

কুশীলব : পিয়েরট, পিয়েরেটে, শিল্পী।

সন্ধ্যা। একটি পুরাতন কুটিরের অভ্যন্তরে বিবর্ণ ওক কাষ্ঠে নির্মিত একখানি কক্ষ। কোনও আলো জ্বালা হয় নি; কেবল পিছনের বড় বড় জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসছে আর একটা চুল্লীতে গন্‌ গন্‌ করে আগুন জ্বলছে। জানালার পাশেই একটি দরজা—দরজা থেকে বাইরের একটি এবড়ো-খেবড়ো সড়ক নজরে পড়ে। চুল্লীর উল্‌টো দিকে একটি ছোট খাবারের টেবিলের উপর সাজিয়ে-রাখা কাপ-ডিসগুলি আগুনের আভায় ঝিক্‌মিক্‌ করছে। ওক কাঠে তৈরি একটি উঁচু বসবার আসন যেন শীতের ভয়েই জানালা থেকে আড়াল করে চুল্লীর কাছে রাখা হয়েছে—আগুনে আসনের শিরাগুলি গরম করে তোলাই বুঝি উদ্দেশ্য। ঘরের মাঝখানে লাল কাপড়ের আচ্ছাদন দেওয়া একটি টেবিল; টেবিলের চারপাশে কয়েকখানি চেয়ার মুখোমুখি করে রাখা হয়েছে। চুল্লীর কাছে একটি কেৎলী দেখা যাচ্ছে; মাথার উপরে চিম্‌নীর গায়ে ঝোলানো আছে একটা লণ্ঠন। লণ্ঠনের শিখা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জানালার বাইরে ক্ষণিকের জন্ম একটি মূর্তি দেখা গেল, এবং পরক্ষণেই 'ক্লিক্' করে তালা খোলার শব্দ হ'ল। ঘরে ঢুকল পিয়েরেটে। সে দরজার কাছে তার লম্বা কোটটা টাঙিয়ে রাখলে, তার পর শীতে কাঁপতে কাঁপতে চুল্লীর কাছে গিয়ে ক্ষণকাল আগুন পোহালে। তারপর লণ্ঠনের শিখাটি বাড়িয়ে দিয়ে কেৎলীটা চুল্লীর উপর রাখলে এবং টেবিলে বসে দু'জনের মত চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানালায় ঝোলানো সস্তা পর্দাটা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে কি যেন দেখলে—তারপর হতাশ ভাবে আবার গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করলে। চায়ের পাত্রে সে ধীরে ধীরে এক, দুই, তিন চামচে চা ঢাললে। এমন সময়ে বাইরের গানে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল। সে যেন কি শুনলে—তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—বাইরে থেকে কার গান ভেসে আসছে :—

> "চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে,
> চাঁদ পড়েছে ধরা তরুশাখার জালে,
> আলোয় গানে ভরা জ্যোৎস্নায় যায় ধেয়ে—
> ধবলীরে বিদায় জানায় সন্ধ্যাকালে।"

গানের ধ্বনি ক্রমেই কাছে এল এবং জানালার বাইরে একটি সাদা মোচাকার (conical) টুপী দেখা গেল। পিয়েরট ঘরে ঢুকল।

পিয়েরট—(টুপীটা পিয়েরেটের কাছে ছুড়ে ফেলে) উঃ! কি ঠাণ্ডা আজ—আমার পা দুটো যেন বরফ হয়ে গেছে।

পিয়েরেটে—এই নাও তোমার চটি জুতো—গরম করে রেখেছি। (পিয়েরেটে হাঁটু গেড়ে বসে পিয়েরটের জুতো খুলতে আরম্ভ করল।)

পিয়েরট—(গান)—

> 'চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে,
> সে যে বাঁকিয়ে মুখ যাবে চলে জানি,
> আলোয় গানে ভরা জৈ্যষ্ঠ দিল ছেয়ে
> লক্ষ কোটি তারায় তারায় আকাশখানি।'

…চা কি এখনো তৈরী হয়নি?

পিয়েরেটে—প্রায় হয়ে এসেছে। কেৎলীর জলটা ফুটে উঠতেই যা দেরী।

পিয়েরেটে—বাজারে• আজ কি ঠাণ্ডা! আমার গান মোটেই ভালো হয়েছে বলে মনে হয় না—ঠাণ্ডায় আমি গাইতেই পারি না।

পিয়েরেটে—তোমার অবস্থা দেখছি কেৎলীটার মতই—সেও ঠাণ্ডায় গাইতে পারে না। ওহে কেৎলী বাবাজী, দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করুন না।

পিয়েরট—হায়! কেৎলীটা যদি ওর নিজের সুরের সঙ্গে প্রেমে পড়বার পথ চিনত!

পিয়েরেটে—মনে হয়, ও জানে। ওই শোন, পাখীর মত ও এবার গেয়ে উঠেছে। আমরা এই পাপিয়ার সুর-নির্য্যাস দিয়ে চা তৈরী করব। (চায়ের পাত্রে সে ফুটন্ত জল ঢালতে লাগল) এস।

পিয়েরট—(আগুনের দিকে চেয়ে) কি আশ্চর্য্য! ওর সৌন্দর্য্য ছিল, আকৃতিও ছিল, কিন্তু প্রাণ কি আছে?

পিয়েরেটে—(রুটি কেটে কেটে মাখন মাখিয়ে টেবিলের

• বিলাতে ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায় হাটে-বাজারে গান গেয়ে বেড়ায়।

উপর রেখে) ওখানে বসে আগুনের সঙ্গে গজ গজ করার চেয়ে এখানে এসে খেয়ে দেয়ে একটু তাজা হও দেখি !

পিয়েরট—আমি ভাবছিলাম— ।

পিয়েরেটে—এস, এস, চা খাও। চুল্লীর কাছে বসলে তোমার ভাব কেবল ধোঁয়া হয়ে চিম্‌নী দিয়ে উড়তে থাকে।

পিয়েরট—সারা দুনিয়াটাই একটা চিমনী। ছেঁড়া কাগজের মত একটা বাজে জিনিষ মানুষকে দাও, দেখবে তাতে আগুন ধরেছে—আন্দোলন সুরু হয়েছে; অথচ, আসল বস্তু যে ধোঁয়ার মতই মিলিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কারও নজর নেই।

পিয়েরেটে—মেজাজ ঠিক কর, পিয়ের। দেখ, রুটিতে আমি কেমন পুরু করে মাখন মাখিয়েছি।

পিয়েরট—তোমার মেজাজ তো দেখছি সব সময়েই ঠিক থাকে।

পিয়েরেটে—আমি যে সুখী হবার চেষ্টা করি।

পিয়েরট—উঃ !

(পিয়েরট টেবিলের কাছে সরে এসেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটছে। পিয়েরট ভাবপ্রবণ ভঙ্গীতে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে।)

পিয়েরেটে—চা ঠিক হয়েছে ত ?

পিয়েরট—তা একরকম হয়েছে !

পিয়েরেটে—এক রকম ! দাও, আমি তোমাকে আবার নতুন করে তৈরী করে দি।

পিয়েরট—না না, এই-ই ঠিক আছে। তুমি মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে ওস্তাদ।

পিয়েরেটে—বটে ! পাগলা কুকুরটাকে বেঁধে রাখব নাকি ?

পিয়েরট—ভাল কথা, সেই মেয়েটির সঙ্গে আজ তোমার দেখা হয়েছিল ?

পিয়েরেটে—কোন্ মেয়েটি ?

পিয়েরট—সেই যে, ঘোড়-দৌড়ের মাঠের কাছে দাঁড়িয়েছিল। খাসা চেহারা—গলায় বড় বড় মালা জড়ান।

পিয়েরেটে—না, আমি তাকে দেখি নি।

পিয়েরট—কিন্তু আমি দেখেছি এবং সেও আমাকে দেখেছে। আমি যতক্ষণ গান গেয়েছি, ততক্ষণ সে আমার দিকে চেয়েছিল—হাততালি দিয়েছে ঘন ঘন। মেয়েদের যে এমন সুন্দর চেহারা আর এমন রসানুভূতি থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস করা সত্যিই বড় কঠিন।

পিয়েরেটে—ও ছদ্মবেশী।

পিয়েরট—কখনই নয়। আর হলেই বা, তুমি জান্‌লে কি করে ? তুমিও তো তাকে দেখ নি।

পিয়েরেটে—বোধ হয় দেখেছি।

পিয়েরট—দেখ, পিয়েরেটে, ঈর্ষা করা তোমার উচিত নয়। যখন তুমি আর আমি এই গান শোনানোর ব্যবসা খুলি, তখন ঠিক হয়েছিল যে আমাদের সম্পর্ক থাকবে অংশীদারের মতই—তার বেশী নয়। আমি যদি বিয়ে করার উপযুক্ত কারও খোঁজ পাই, তবে তাকে বিয়ে করব। আর তোমাকে বিয়ে করতে চায়, এমন কারও সন্ধান পেলে তুমিও তাকে বিয়ে করতে পারবে।

পিয়েরেটে—আমার একটুও ঈর্ষা হয়নি। কি বাজে বকছ ?

পিয়েরট—(আত্মগত ভাবে গান)

> চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস্ না লো চেয়ে,
> তুষার-ধবল অধরে তার মেঘের ছায়া,
> আলোয় গানে ভরা জ্যৈষ্ঠ দিল ছেয়ে
> দুখের ছোঁয়ায় প্রভাত-পাখীর গানের মায়া।

পিয়েরেটে—'শো' ভাঙার পর কি তুমি আর মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিলে ?

পিয়েরট—না, সে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। যথেষ্ট চা খেলুম। এবার যাই, তাকে খোঁজবার চেষ্টা করি।

পিয়েরেটে—তার চেয়ে এই চুল্লীটার পাশে এসে বস না। আমাকে এই মোজাগুলোয় তালি দিতে সাহায্য করলেও তো পার।

পিয়েরট—আমার কাজে বাগড়া দেবার চেষ্টা কর না। তালি দেওয়াই বটে ! তালি দেওয়ার চেয়ে জীবনে দামী কাজ আরও কিছু আছে বলে আমার মনে হয়।

পিয়েরেটে—আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এক ধারা। প্রথমে আমরা ছেঁড়া মোজা পায়ে দি, তারপর সেই মোজায় লাগাই তালি। তারাই হ'ল বুদ্ধিমান, যারা মোজার সদ্ব্যবহার করতে জানে—সময় থাকতে যথাসম্ভব তালি দিয়ে নেয়।

পিয়েরট—ঠিক্, ঠিক্। তুমি আমাকে একটা নতুন গানের ভাব জোগালে।

পিয়েরেটে—গাইতে আরম্ভ কর তা হলে।

পিয়েরট—কিন্তু গানটা আমি এখনও বাঁধতে পারি নি। তোমার কথা শুনে ভাবটা আমার মনে ঝিলিক দিয়েছে মাত্র।

(সে লাফিয়ে টেবিলের উপর উঠে অভিনেতার ভঙ্গীতে দাঁড়াল।)

> জীবন হ'ল ছেঁড়া সুতোর জট-পাকান গুলি,
> তোমরা কি কেউ পার এ জট খুলতে ?
> মুখে কেবল অহর্নিশি অহঙ্কারের বুলি—

(সে এক মুহূর্ত্ত থামল, তারপর তাড়াতাড়ি ছন্দ মেলাবার তাগিদে বলে উঠল) 'মানুষ বলে জিগির চাই তুল্‌তে'।... এ অবিমিশ্র গানের ছকমাত্র—আসলে গান নয়।

পিয়েরেটে—তুমি 'শো'-তে এ গান গাইতে চাও নাকি ?

পিয়েরট—(টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে) তোমার মধ্যে একটুও আবেগ নেই। শিল্পীদের গায়ের চামড়া হবে শিশুদের মতই পাতলা—যেন একটুতেই বেঁধে।

পিয়েরেটে—এখন ঘরে থাক পিয়ের, বাইরে যেয়ো না—বড় ঠাণ্ডা।

পিয়েরট—তুমি বুঝি চাও যে আমি তোমার খুঁতখুঁতানি শুনি বসে বসে।

পিয়েরেটে—এইমাত্র না তুমি বললে যে, আমার মেজাজ সব সময়ে ঠিক থাকে।

পিয়েরট—এই তো আবার আমার সঙ্গে খচ্ খচ্ আরম্ভ করলে।

পিয়েরেটে—অন্যায় হয়েছে, পিয়ের। কিন্তু বাজারে আজ সত্যি বড় শীত পড়েছে। তার ওপর তোমার জুতো যা পাতলা।

পিয়েরট—যতই বল না কেন, আমি ঘরে থাকব না। আমি সেই মেয়েটির খোঁজে যাচ্ছি। কে জানে, ও-ই হয়ত আমার স্বপ্নচারিণী।

পিয়েরেটে—তুমি কেবল আদর্শ মেয়েদের স্বপ্ন দেখে বেড়াও কেন ?

পিয়েরট—তুমি কি কখনও আদর্শ পুরুষের স্বপ্ন দেখ না ?

পিয়েরেটে—না, আমি বাস্তববাদী হবার জন্যই চেষ্টা করি।

পিয়েরট—মেয়ে জাতটাই একেবারে কল্পনাশক্তিহীন। তারা নেহাতই মায়ের জাত। এই মা হবার ইচ্ছেটাই যখন জোরে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে ; তখন তারা বলে, 'আমরা প্রেমে পড়েছি। অত্যন্ত জঘন্য আর নীচ এই মনোবৃত্তি। আমি এমন এক নারীকে চাই যাকে বেদীর উপর বসিয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতে পারি আর প্রেম নিবেদন করতে পারি।

পিয়েরেটে—(ভাবগদগদ স্বরে)

> পথে চেয়ে 'পিয়ের', থেকো নাকো চাঁদের,
> জোছ্ নাতে তার একটি হৃদয় পড়ছে ঢলে,
> আলোয় ভরা গানে ওরা মধু জ্যৈষ্ঠের
> থাকবে নাকো চিহ্ন কোনও দিন ফুরলে।

পিয়েরট—না, আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। যাক্ আমি চললাম। (বাইরে যেতে যেতে পিছন ফিরে সে বিদ্রূপের সুরে গাইতে লাগল) "চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস্ না লো চেয়ে।"

পিয়েরেটে—গানের ক্রমবিলীয়মান সুর শুনতে লাগল। তারপর চুল্লীর কাছে গিয়ে আগুনটাকে বাড়িয়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। একটি হারানো কবিতা তার মনে পড়ল। হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তির মত জ্বলন্ত কয়লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পিয়েরেটে আবৃত্তি করতে লাগল।)

> 'একটি আছে কুমারী এই বিশাল দুনিয়ায়—
> আছে মিশে লোকের ভিড়ে নগরে হাটে,
> কেঁদে ওঠে পথিক যারা সে পথ দিয়ে যায়,
> তৃপ্তিহীনা এই কুমারী ভবেরি নাটে।
> গোলাপ-রাঙা অধরে তার উঠচে কেঁপে সুর—
> প্রকাশ তাহার হয় না যে হায় মুখের বাণীতে,
> চোখ দুটি তার দুঃখমলিন, হৃদয় ভারাতুর,
> দেয় না সাড়া এই মনোরম দিনের ধ্বনিতে।
> ভাবসাগরের অতল তলে ঘুমে অচেতন
> সেই কুমারীর মনের মানুষ কিসের নেশাতে,
> রাত্রি হ'ল মধুর আরো—জাগ্ল শিহরণ
> প্রিয়ার চোখে প্রিয়মুখের স্বপন-চুমাতে।
> জানি, জানি, এমন পুরুষ আছেই দুনিয়ায়,—
> যে পারে এ নারীর প্রাণে আগুন জ্বালাতে,
> সে পুরুষের খোঁজ কে দেবে ? খোঁজ যে নাই হায়,—
> এই কুমারীর হৃদয় কে গো পারবে জুড়াতে ?
> প্রেমবিধুরা এই কুমারীর দেখা যদি পাও,
> মিথ্যা তারে শুনায়ো না সান্ত্বনা-বাণী,
> নীরব থেকে অন্তরে তার গোপন রাখতে দাও
> তৃপ্তিহীনার স্বপ্নরঙীন আলেখ্যখানি।'

(তার চোখে অশ্রু উপচে উঠল। দুই হাতে সে মুখ ঢাকলে। কে যেন ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে দরজার কড়া নাড়লে। পিয়েরেটে অবাক হয়ে তাকাল। দরজায় আবার আঘাত পড়ল।)

পিয়েরেটে—ভেতরে এস।

(দরজা যেন আপনা হতেই খুলে গেল। বাইরে দেখা গেল শিল্পীকে—চাঁদের আলোয় সে এসে দাঁড়াল। অদ্ভুতদর্শন ও স্নিগ্ধ চেহারা এই বৃদ্ধের। যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাকে মোটেই দুর্ব্বল দেখায় না। যাদের দেখে শিশুর দল আপনা থেকেই মজে যায়, এই বুড়ো তাদেরি অন্যতম। তার পরনে নীল কাঁচের মত রঙীন একটা অদ্ভুত আকারের আলখাল্লা, তাতে রূপোর বোতাম আর বড় বড় পকেট—আলখাল্লাটিতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা। তার জুতোয় বড় বড় বগলেস পরানো, জুতোর হিলদুটো টকটকে লাল রঙের। তাকে দেখে বিত্তশালী শিল্পী বলে মনে হয় না—গেঁয়ো চারণ বলেই ধারণা জন্মায়। কোনও কথা না বলে সে ঘরের মধ্যে এল এবং দরজাটা আপনা থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল।)

পিয়েরেটে—(ব্যস্তসমস্ত হয়ে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে) ওঃ, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার—কড়ানাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দেওয়া উচিত ছিল।

শিল্পী—ঠিক আছে, ব্যস্ত হয়ো না। দরজা খোলায় আমি অভ্যস্ত; বিশেষতঃ, আমি যে সব দরজা খুলেছি তাদের অনেকের চেয়ে তোমার দরজা সহজেই খোলে। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, এমন অনেকে আছে যারা ইচ্ছে করে দরজায় পেরেক মেরে রাখে—তাদের দরজার কড়া নেড়ে কোনও ফল নেই। ভাল কথা, আমি কে তা ভেবে বোধ হয় অবাক হচ্ছ?

পিয়েরেটে—আমি ভাবছি, তোমার বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে।

শিল্পী—সেই পুরনো মেয়েলী ভাবনা। যাক্, তোমাকে ধন্যবাদ। আমার ক্ষিদে পায় নি। আমি খাই কম—খুবই কম খাই। একটু হাসি অথবা একটুখানি হাতের ছোঁয়া পেলেই আমি দিন কাটিয়ে দিতে পারি।

পিয়েরেটে—তুমি বসবে তো, অন্ততঃ—এটাকে নিজের ঘর মনে করে একটু জিরিয়ে নাও।

শিল্পী— (কাষ্ঠাসনের কাছে এগিয়ে গিয়ে) আমি যেখানেই যাই, সেখানেই আমার নিজের ঘর বলে মনে করা আমার স্বভাব। বলতে কি, লোকে বলে আমায় ছাড়া তোমরা নাকি ঘর বাঁধতে পার না। উনুনের পিঠে আমার পাদুটো রাখ্‌তে পারি কি? এটাও আমার পুরনো অভ্যাস। আমি সব সময়েই এম্‌নি রেখে থাকি।

পিয়েরেটে—এখানকার লোকেরা বলে—

'না রাখ্‌লে পা উনুনের পিঠে
প্রণয় যে গো লাগে না মিঠে।'

শিল্পী—খাঁটি কথা। গৃহস্থালির গোপন যাদুও এই-ই। পিয়েরেটি, তুমি কাঁদ্‌ছিলে।

পিয়েরেটে—বোধ হয় কাঁদ্‌ছিলুম।

শিল্পী—মন খোলো। আমি সব জানি। সবই তো পিয়েরকে নিয়ে—নয় কি? তুমি তাকে ভালোবাস, অথচ সে তোমাকে এতটুকু গ্রাহ্য করে না। কি অদ্ভুত জায়গা এই পৃথিবী! আর তুমি তার জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলছ।

পিয়েরেটে—না না, আমি বড় একটা কাঁদি না। কিন্তু আজ রাতে ওর আচরণ অস্বাভাবিক রকম খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি ওকে খুশী করবার জন্য।

শিল্পী—কি বললে? খুঁতখুঁতে।

পিয়েরেটে—অবিশ্যি, ওর তেমন দোষ নেই। যা শীত পড়েছে। তার ওপর কিছু দিন থেকে 'শো'-তেও তেমন রোজগার হচ্ছে না। পিয়ের চায় কোনও দৈনিক কাগজে আমাদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতে, এতে বিজ্ঞাপনের কাজ হবে। সম্পাদককে ফ্রি পাশে "শো" দেখতে দেবার বন্দোবস্ত করবে, প্রবন্ধ ছাপান যাবে বলে তার ধারণা।

শিল্পী—তুমি কি মনে কর যে পিয়ের তোমার চোখের জলের উপযুক্ত পাত্র?

পিয়েরেটে—নিশ্চয়ই।

শিল্পী—মনে রেখ, নষ্ট করবার মত চোখের জল আমাদের নেই। যে সামান্য অশ্রু আমাদের আছে, তা দিয়ে কেবল হৃদয়কেই ভিজিয়ে রাখা যায়। এই অশ্রু যখন সব শুকিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে, তখন হৃদয়ও যাবে শুকিয়ে।

পিয়েরেটে—পিয়ের অপূর্ব্ব মানুষ। আমার মত তুমি তাকে জান না। সত্যি কথা যে সে সব সময়ই অতৃপ্ত—সব সময়ই খিট্‌খিট্‌ করে; কিন্তু তার কারণ, সে কারও প্রেমে পড়ে নি। জানই তো, প্রেম পুরুষের জীবনে এক মস্ত পরিবর্ত্তন ঘটায়।

শিল্পী—ঠিক কথা। কিন্তু প্রেম কি তোমার জীবনে কোনও পরিবর্ত্তন এনেছে?

পিয়েরেটে—নিশ্চয়ই। আমি পিয়েরের চটি জুতো গরম করে রাখি, তাকে চা তৈরি করে দি, আর তার জন্য কিছু করবার সুযোগ পেয়ে সর্ব্বদা নিজেকে সুখী মনে করি। তাকে যদি ভাল না বাসতুম, তা হলে এ সব কাজে বিরক্তি আসত।

শিল্পী—তুমি কি ঠিক জানো যে এই হ'ল প্রকৃত প্রেম?

পিয়েরেটে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!

শিল্পী—যখনি তুমি পিয়েরের কথা ভাবো, তখনি কি দুটি ছোট্ট খালি পায়ের আওয়াজ শুনতে পাও? যখনি সে কথা বলে, তুমি কি তোমার বুকে আর মুখে দুখানি ছোট্ট গোলগাল হাতের ছোঁয়া পাও?

পিয়েরেটে—(উত্তেজিত ভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক—ঠিক পাই।

শিল্পী—তা হলে তোমার প্রেম খাঁটিই বটে। কিন্তু পিয়েরের কথায় তোমার মনে এমন কাব্য জেগে ওঠে কেন?

পিয়েরেটে—কারণ—কারণ সে পিয়ের।

শিল্পী—কারণ সে পিয়ের! সেই পুরনো যুক্তি!

পিয়েরেটে—স্বীকার করি, সে একটু ভাববিলাসী। কিন্তু তার আত্মাই যে ঐ রকম। আমার স্থির ধারণা, চেষ্টা করলে বড় কাজও সে করতে পারে। তুমি কি তার হাসি দেখেছ? কি সুন্দর সে হাসি! যখন সে আমার দিকে তাকায় না, তখন আমিও মাঝে মাঝে অমনি করে হাসতে চেষ্টা করি—ওরকম হাসিতে আমাকে কেমন মানায়, তা জানতে ইচ্ছে করে। (চিন্তাকুল ভাবে) মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্যের দিকে চেয়ে হাসির মাত্রা কমিয়ে আমার দিকে চেয়ে সে একটু বেশী হাসলে ভাল হ'ত।

শিল্পী—হুঁ। তা হলে সে অন্যের দিকে চেয়েও হাসে?

পিয়েরেটে—এমন একটা দিন কদাচিৎ আসে যেদিন না সে 'শো' দেখানোর সময় একজন না একজন অপরূপ নারীর

দেখা পায়। আজও একজনের দেখা সে পেয়েছে—লম্বা তার গড়ন, গোলাপী তার গাল। তারি সন্ধানে সে এখন বেরিয়েছে। অবশ্য, মেয়েরা এর জন্য দায়ী নয়—তারা ওর সঙ্গে প্রেমে না পড়ে থাকতে পারে না। (গর্বিত ভাবে) আমার মনে হয় সবাই পিয়েরের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে।

শিল্পী—কিন্তু ধরো, এই সব অপরূপ নারীদের কেউ যদি তাকে বিয়ে করতে চায়?

পিয়েরেটে—না না, তারা তা করবে না। অপরূপ নারীরা কখনো গরীব গাইয়েকে বিয়ে করে না। আর পিয়ের যদি কোনও দিন বিয়ে করতে উদ্যত হয় তা হলে আমার মনে হয়, আমি—আমি শূন্যে বিলীন হয়ে যাব। দূর ছাই, এসব আমি তোমায় বলছি কেন? মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমার অনেক—অনেক দিনের চেনা। (পিয়েরেটে সাদা টেবিল-ক্লথটা মুড়ে রাখছিল। শিল্পী আসন ছেড়ে তার দিকে এগিয়ে গেল।)

শিল্পী—(অত্যন্ত ধীরে ধীরে) বোধ হয়, তুমি আমাকে অনেক, অনেক দিন ধরেই চেনো।

(তার সুরে এমন মমতা আর আন্তরিকতা ফুটে উঠল যে, পিয়েরেটে টেবিল-ক্লথের কথা ভুলে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। শিল্পী পিয়েরেটের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্ত্তকাল হাসল। তারপর গালে জিভ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করে চুল্লীর দিকে এগিয়ে গেল।)

পিয়েরেটে—(শিল্পীর কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট ধনুক টেনে বার করে) এটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

শিল্পী—(চকিত হবার ভান করে) আহা-হা। ওটা তোমাকে দেখাবার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমার মনেই ছিল না যে, ওটা আমার পকেটের বাইরে ঝুলছিল। এক কালে আমার খুব তীর ছোঁড়া অভ্যাস ছিল। আজকাল আর সুযোগ হয় না।

(শিল্পী পিয়েরেটের হাত থেকে ধনুকটা নিয়ে পকেটে রাখলে)

(দূরে পিয়েরটের গান)

> চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস্ না লো চেয়ে,
> চাঁদ ফেলেছে জাল যে তাহার সাগর-জলে,
> আলোয় গানে ভরা যে যায় ধেয়ে,
> বিস্মরণে সুর সে শেখায় গোলাপ-দলে।

শিল্পী—(গানের সুর ক্রমেই কাছে আসতে শুনে ফিস্-ফিস্ করে) ও কে?

পিয়েরেটে—পিয়ের!

(জানালার বাইরে আবার মোচাকার টুপিটি দেখা গেল। পিয়েরটের প্রবেশ।)

পিয়েরট—না, কোথাও তার দেখা পেলুম না। (শিল্পীকে দেখে) তুমি কে?

শিল্পী—তোমার কাছে আমি অপরিচিত, কিন্তু পিয়েরেটি আমাকে পলকেই চিনেছে।

পিয়েরেট—কোনও পুরনো অগ্নিশিখার মত বোধ হয়?

শিল্পী—সত্যিই আমি পুরনো অগ্নিশিখা। অনেকদিন ধরেই আমি দুনিয়াটাকে আলোকিত করে রেখেছি। তবে তুমি আমায় পুরনো বললেও দুনিয়ায় এমন অনেকে আছে যারা আমায় বয়সের অনুপাতে তরুণ বলেই মনে করে। বলতে পার—আমি কত দিন পৃথিবীতে বিচরণ করছি।

পিয়েরট—(মেপে দেখবার ভঙ্গীতে দু' হাত ফাঁক করে) এই এত দিন।

শিল্পী—সারা দিন ধরে রঙ্গ দেখাবার ফলে তোমার শিরায় শিরায় রঙ্গ জমে গেছে।

পিয়েরেটে—তোমার অভদ্র হওয়া অসঙ্গত, পিয়ের।

শিল্পী—(পিয়েরটের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করবার জন্য অধীর হয়ে) পিয়েরেটি তোমার রাতের বাজার করা হয়ে গেছে তো?

পিয়েরেটে—ঠিক কথা! আমাকে এখনি ছুটতে হবে! দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল বলে। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাকবে তো?

শিল্পী—(তাকে ঠেলে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে) কথা দিতে পারি না, তবে চেষ্টা করব, চেষ্টা করব।

(পিয়েরেটে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ—শিল্পী সকৌতুকে পিয়েরটকে দেখতে লাগল।)

শিল্পী—তারপর, বন্ধু পিয়ের? ব্যবসা তেমন জোর চলছে না, এ্যা!

পিয়েরট—জোর! হাসি যদি ব্যবসা হয় তা হলে জোরই বলতে হবে, কিন্তু তাতে টাকা মেলে না। যা হোক, আজ একটা কাজের মতো কাজ করেছি, এক সম্পাদকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছাপাবার বন্দোবস্তও করেছি। এতে টাকা আসবে। (গান)

> 'আবার আসিয়ো রে বন্ধু,যখন তমাল ঘেরা কুটির মোরা গড়ব,
> আসিয়ো নাকো, বেলাশেষে যখন মৌমাছিদের গুণব,
> যখন দীঘির জলে ভেকের খেলায় মজব
> যখন শিশির ভেজা শশার নাচন দেখব।'...

আমি এই গানখানি লিখেছি।

শিল্পী—পিয়ের, দুনিয়ার সমস্ত ধনরত্ন পেলেও তুমি সুখী হতে না।

পিয়েরট—কি বলছ! হতুম না! দুনিয়ার সমস্ত ধনরত্ন আমাকে দিয়ে দেখ, দেখ, আমি কি ভাবে খরচ করি। প্রথমেই স্কুল গড়ব, মানুষকে উঁচুদরের জিনিষ বুঝতে শেখাব।

শিল্পী—তুমি কেবল যশ ঐশ্বর্য্য আর ফাঁকা আদর্শের স্বপ্ন দেখছ। ফলে, আসল বস্তু ফেলছ হারিয়ে। তুমি অতৃপ্ত—

কিন্তু কেন? কারণ, কি করে যে সুখী হতে হয়, তা তুমি জান না।

পিয়েরট—(আবৃত্তির সুরে)

জীবনটা যে পাগলা নদী,
তার তীরে বসে বড়শী বাই;
কে তুই বাঁধিস্ রে গান নারীর কেশে?
এইখানে আজ আয় না ভাই।

(ব্যাখ্যার ভঙ্গীতে) এই আর একখানি গান আমি বেঁধেছি। এটি হ'ল দ্বিতীয় চরণ। আমার মাথায় ভাব এমনি হুড়মুড় করেই এসে পড়ে। এক্ষুনি তৃতীয় চরণটিও বেঁধে গানটিকে শেষ করতে হবে।

শিল্পী—তুমি এমন একখানি গান লেখ না, যার শেষ নেই। অনন্তকাল ধরে যাকে বাড়ানো চলে।

পিয়েরট—দূর! এ অত্যন্ত নিরেট প্রস্তাব।

শিল্পী—নিরেট কিনা, তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কারণ, এই ধরণের গান গাইতে হ'লে শিল্পীকে সব সময়ে খুশী থাকতে হবে।

পিয়েরট। ব্যবসায়ে আর একটু জোয়ার না এলে আমার পক্ষে খুশী হবার উপায় নেই।

শিল্পী—আচ্ছা, তোমার আমার মধ্যে একটু বৈষয়িক আদান-প্রদানে কোনও আপত্তি আছে কি?

পিয়েরট—মোটেই না। তুমি কোন্ সিটের টিকিট কিন্‌তে চাও? সামনের সিটগুলি ভেলভেট মোড়া—বার আনা করে টিকিট। এর পেছনে আছে কাঠের চেয়ার ছ'আনা করে। সব শেষের সিটগুলি দু-আনা ক'রে। তুমি নিশ্চয়ই বার আনারই একখানা নেবে। ক'খানা টিকিট চাও?

শিল্পী—তুমি বোধ হয় জান না, আমি কে?

পিয়েরট—জানা না জানায় কিছু এসে যায় না। সকলেই 'স্বাগতম্'। তুমি যে দয়া ক'রে শো দেখতে এসেছ, তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিল্পী—পিয়ের, আমি স্বপ্ন-শিল্পী।

পিয়েরট—কিসের শিল্পী?

শিল্পী—এই ক্লেদাক্ত পৃথিবীতে যে সব স্বপ্ন উড়ে বেড়ায়, আমি তা তৈরি করি।

পিয়েরট—দেখ, তুমি একটু জিরিয়ে নাও। মনে হচ্ছে, তুমি বড় নাটুকে হয়ে পড়েছ।

শিল্পী—পিয়ের, পিয়ের, তোমার উচ্চাভিলাষী মন আমার কাছে ধরা দেবে না, জানি। শিশুর মন, সাধারণ মানুষের মন এক নিমেষেই ধরা দেয়। আমি স্বপ্ন তৈরি করি—যে স্বপ্ন ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে মানুষের অন্তরে ঢুকে তাদের পুলকিত করে তোলে। শরৎকালে 'সোয়ালো' পাখীর দল কোথায় উড়ে চলে যায়, তা কি তুমি জানতে চাও নি কোনো দিন? তারা যায় আমার কর্ম্মশালায়।—সেখানে গিয়ে আমাকে জানায় কারা স্বপ্নের সন্ধান করছে, আর গত বসন্তে তারা যে স্বপ্নসম্ভার নিয়ে গিয়েছিল তার বায়নাক্কাও দাখিল করে।

পিয়েরট—থাক্, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এই আজগুবি কাহিনী বিশ্বাস করাতে চাও না।

শিল্পী—ফুল যখন ঝরে পড়ে তখন কি তোমার খোঁজ নেবার ইচ্ছা জাগে নি, কোনও দিন, কোথায় হারিয়ে যায় ফুলের রূপবৈচিত্র্য? খোঁজো নি কখনও শীতের দিনে কোথায় বাসা বাঁধে প্রজাপতির দল? আমার কারখানায় শীত খুব বেশী নয়।

পিয়েরট—আমি তোমার কর্ম্মশালার কথা আগে ভাবি নি।

শিল্পী—আমার কর্ম্মশালা অনেকটা হারানো মালের আপিসের মত—দুনিয়ায় যে সব সুন্দর বস্তু আদর পায় না, তাদেরি ঠাঁই সেখানে। সেখানে বসেই আমি গড়ে তুলি আমার বিখ্যাত স্বপ্ন—সে স্বপ্নের নাম প্রেম।

পিয়েরট—বাঃ, বাঃ, বেশ বলছ তো তুমি!

শিল্পী—তুমি বুঝি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?

পিয়েরট—কিছু কিছু বিশ্বাস করছি বটে। কিন্তু এ রকম স্বপ্ন বেশী দিন বাঁচে না। বাঁচে না, এ বাঁচতে পারে না। আকৃতি এর হয়তো আছে, কিন্তু প্রাণ নেই; অথবা প্রাণ যদি থাকে, তা হলে আকৃতি নেই। নাঃ, বিশ্বাস করতে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করছি—কিন্তু এক ধোপেই যে রঙ উঠে যায়।

শিল্পী—তুমি কেবল নকল জিনিষই দেখেছ; দাঁড়াও, আগে আসল বস্তুটাও দেখ।

পিয়েরট—কিন্তু কোন্‌টা আসল, তা চিনব কি করে?

শিল্পী—ভূরি ভূরি লক্ষণ আছে। যেই তুমি আসল বস্তুটিকে পাবে, অমনি ওড়বার বেগ জাগবে তোমার কাঁধে—এ হ'ল প্রেম-বিহঙ্গের পক্ষবিস্তার। এর পর তোমার ইচ্ছে হবে তারকাদের মধ্যে উড়ে যেতে, আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে বসতে, চাঁদকে গান শোনাতে। এর কারণ হচ্ছে, একটা বড় চাঁদকে ঘিরে আমি আমার স্বপ্ন গড়ে তুলি। একটু একটু করে আমি সেই চাঁদকে গুঁড়ো করে ফেলি—ফের তাকে বড় হয়ে গড়ে উঠতে দি। চাঁদ যে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে তা বোধ হয় তুমি দেখেছ। এক পক্ষকালের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পিয়েরট—ভারী মজা তো! আচ্ছা, সোয়ালো পাখীরাই কি তোমার সমস্ত স্বপ্ন বয়ে নিয়ে আসে?

শিল্পী—সব সময় নয়। আমার আরও দূত আছে। প্রতি রাত্রে ঘড়ীতে যেই চারটা বাজে, অমনি পাঁজির পাতা থেকে একটা দিন খসে পড়ে। সেই দিন ছুটে যায় অনেক আগের দিনের দেশে—আমার কর্ম্মশালায়। আমি তার

ঠোঁটে লাগিয়ে দি' একটু টকটকে লাল রঙ, আর পরিয়ে দি তাকে সোনার জরী; তারপর বলি: "ফিরে যাও, হে ক্ষুদ্র গতক্লান্ত, যাও, দুনিয়ায় গিয়ে স্মৃতি হয়ে বাস করো।" কিন্তু আমার সেরা স্বপ্ন রাখি আজকের জন্ত। আমি শিশুদের কিনে আনি, তাদের গায়ে জড়িয়ে দি' স্বপ্ন-আঙরাখা, তারপর রাহাখরচ হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দি' অভিযানে সেই চিরাচরিত প্রথায়।

পিয়েরট—আমি আমার সারাজীবন স্বপ্ন দেখে চলেছি। কিন্তু সে সব স্বপ্ন নেহাতই আমার নিজের গড়া। মনে হয়, ঠিকমতো মালমশলা মেশাতে পারি নি।

শিল্পী—তুমি আসল মশলাটাই বাদ দিয়ে এসেছ। তোমার স্বপ্নে যে একটুখানি দুঃখ মেশানো চাই-ই, নইলে মিষ্টির আধিক্যে মুখ মেরে আসবে। এ সত্যের খোঁজ আমিও অতি অল্প দিনই পেয়েছি। তাই ত ভোরবেলা যে শিশির মুক্তো গড়ে, আমি তারই কয়েকটি নিয়ে আমার স্বপ্নে ছিটিয়ে দি' অশ্রুর অঞ্জলি।

পিয়েরট—(পরমোল্লাসে) অশ্রুর অঞ্জলি! কি সুন্দর! সত্যি বলছি, একটা স্বপ্ন আমার একবার পরখ ক'রে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে—অবশ্য আমার নিজের গড়া স্বপ্ন নয়।

শিল্পী—অনেক স্বপ্ন আছে; কিন্তু তুমি সত্যি কি পরখ করতে চাও?

পিয়েরট—সত্যিই চাই, কিন্তু ইতস্ততঃ ছড়ানো স্বপ্নের খোঁজ করব কি করে?

শিল্পী—আমি এক সময় একটা স্বপ্ন গড়েছিলুম—সেটা ঠিক তোমারই উপযুক্ত। এই স্বপ্নটি আমি একটি শিশুর গায়ে জড়িয়ে দি'। সে আজ বিশ বছর আগের কথা। সেই শিশু আজ পূর্ণযৌবনা তরুণী—বড় বড় নীল চোখ তার—অপূর্ব্ব তার কেশদাম।

পিয়েরট—বলো, বলো, তার কথা বলো;—শুনেও তৃপ্তি পাব।

শিল্পী—বলার চেয়েও বেশী করব। তাকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময়ে দাবিনামাখানা আমার কাছেই রেখে দিয়েছিলুম—সেখানা এই—তোমাকে দিয়ে যাব।

পিয়েরট—ধন্যবাদ। কিন্তু, এ নিয়ে আমি কি করব?

শিল্পী—কেন! এর জোরে তুমি তাকে দাবি করতে পারবে। পড়ে দেখ, এতে তার চেহারার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে। ভাগ্যবান তুমি!

পিয়েরট—তার গাল দুটি কি গোলাপী? গলায় কি তার মালা?

শিল্পী—না।

পিয়েরট—তা হলে সে নয়। কোথায় তার সন্ধান পাব?

শিল্পী—তা তোমার নিজেকে খুঁজে নিতে হবে। এখন তোমার একমাত্র কাজ হচ্ছে খোঁজা।

পিয়েরট—আমি এখুনি খুঁজতে বেরুব। (যেন খুঁজতে বেরুতেই উদ্যত হ'ল।)

শিল্পী—আমি হ'লে আজ রাতে বেরুতুম না।

পিয়েরট—কিন্তু আমি যে শিগ্‌গীর তার সন্ধান চাই। আমার আগেই হয়তো অন্য কেউ তার খোঁজ পাবে।

শিল্পী—পিয়ের, কোন এক সময়ে একজন লোক ব্যাঙের ছাতা কুড়ুতে চেয়েছিল।

পিয়েরট—(রসভঙ্গের জন্য বিরক্ত হয়ে) ব্যাঙের ছাতা!

শিল্পী—পাছে আর সবাই তার আগে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে, এই ভয়ে সে রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়েছিল। ভোর যখন হ'ল তখন সে কোথাও ব্যাঙের ছাতা দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। বাগান থেকে ফিরে সে দেখলে যে তার বাড়ীর দোরগোড়ায়ই এক প্রকাণ্ড ব্যাঙের ছাতা ফুটে আছে।...অভিজ্ঞের উপদেশ নাও, একটু অপেক্ষা করে যাও।

পিয়েরট—এই যদি তোমার উপদেশ হয়...। যাক, ব'ল তো, তোমার কি মনে হয়, যে, আমি তার সন্ধান পাব?

শিল্পী—আমি নিশ্চয় করে' তা বলতে পারি না। তুমি কি নিজেকে বোকা মনে কর?

পিয়েরট—তা, নিশ্চয়ই। তুমি এমন খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করো যে, আমি ভারি বিপদে পড়ি। কিন্তু আমাকে যদি একথা স্বীকার করতে হয়, অবশ্য গোপনে, অবশ্য...(সে ইতস্ততঃ করতে লাগল।)

(প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের ইচ্ছায়) ঠিক! ঠিক!

পিয়েরট—হাঁ, তবে আত্মপ্রশংসা করছি বটে।

শিল্পী—যা বলেছ! ঐখানেই তো তোমার আসল বিপদ। যখন তুমি তারার পানে চেয়ে চেয়ে হাঁটো, তখন ছোট্ট জোনাকিটি তোমার পায়ের চাপে মারা পড়তে পারে তো? আমি তোমার গানের তৃতীয় চরণটি বেঁধে দি, কি বলো?

জীবনটারে ডাকে নারী,
মাঝি, তুই রাখিস তোর পেতে কান
নইলে, রাত্রি যখন যাবে চলে
তখন বইবে চোখে বান।

(শিল্পীর দরদমাখানো চিত্তহারী স্বর কিছু আগে পিয়েরেটেকে যেমন বেঁধে রেখেছিল, পিয়েরটকেও তেমনি আটকে রাখলে। তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে এমন সময় জানালার বাইরে একটি লাল জামা দেখা গেল, বাজার ক'রে ঘরে ঢুকল পিয়েরেটে।)

পিয়েরেটে—ওঃ, তুমি আছ তা হলে। ভারি আনন্দ হ'ল আমার।

শিল্পী—কিন্তু আমাকে এবার যেতেই হবে। আমাকে অনেক ঘুরতে হয়।

পিয়েরেটে—(দরজা আটকে দাঁড়িয়ে) না, এক্ষুনি তুমি চলে যেতে পারবে না।

শিল্পী—আমাকে জানালা দিয়ে উড়ে যেতে বাধ্য করো না—অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থায়ই মানুষ তা করে।

পিয়েরট—(বক্তৃতার ভঙ্গীতে সকৌতুকে)—পিয়েরেটি, আমাদের অতিথিকে সম্মান দেখাও। তুমি যার আদর-যত্ন করছ, সে যে কে, তা সামান্যই জানো। স্রোতে ভেসে যাওয়া অসংখ্য মাছের মতো দুনিয়ায় যে সব স্বপ্ন ভাসছে, তারি স্রষ্টা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। উনি ওঁর সেরা সৃষ্টির দাবিনামা আমাকে দিয়েছেন, এখন আমার খোঁজ করতেই যা দেরি। (নিতান্ত অন্তরঙ্গতার সুরে) আহা, যদি জানতুম, কোথায় গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে।

শিল্পী—যাবার আগে আমি তোমাদের একটা শ্লোক শুনিয়ে যাই—

মেয়েরা সব এক একটি পাঠশালা গড়ি
মারুক্ বেত—জনম-বোকা পুরুষদেরে ধরি।

(সে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা নোয়ালে। তারপর নিঃশব্দে দ্রুত বেরিয়ে গেল।)

পিয়েরেটে—(তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলে)। ইস্! কি তাড়াতাড়িই না চলে গেল! আর ত তাকে দেখা যায় না।

পিয়েরট—অবশেষে আমার আদর্শ জয়যুক্ত হতে চলেছে। একটি চমৎকার বিয়ের আয়োজন হবে;—রূপালী ঝালর-দেওয়া সাদা জামা থাক্‌বে গায়ে, হাতে থাক্‌বে সোনায় মুখ বাঁধানো একগাছি লম্বা ছড়ি। (গান)

তখন আরও যদি খেলি লুকোচুরি,
শিশির ভেজা ঘাসে তোমার চরণ ভিজে
হয়ত জাগবে কাঁপন,
তাই ত আমি জ্বালিয়ে দিয়ে বটের ঝুড়ি
উত্তাপে তার শুকিয়ে নিতে তৃণে নিজে
করব রাত্রিযাপন।

পিয়েরেটি, আমি যেন সত্যিই লাভ করতে চলেছি পুরুষের শাশ্বত অধিকার অর্থাৎ প্রেম।

পিয়েরেটে—আমি তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ শুভ কামনা করি।

পিয়েরট—(ক্ষ্যাপাইবার উদ্দেশ্যে গান)

আমরা দোঁহে মিলব স্বপনে,
এই জেনেছি মনে মনে।
স্বর্ণা আমার গড়বে স্বপন,
স্বপ্ন তোমার গড়বে কানন,
আমার দেখা পাবে তুমি
স্বর্ণা যখন বইবে,
তোমার দেখা পাব যখন
কানন কথা কইবে।

পিয়েরেটে—অনেক টাকা আয় করতে হবে আমাদের, যাতে করে সে যা চায় তা তুমি তাকে দিতে পার। যতক্ষণ না আমার পা ভেঙে যাবে, ততক্ষণ আমি নাচব, আর লোকে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠবে—'আহা, মেয়েটি যে নাচতে নাচতে মরাই পড়ল।'

পিয়েরট—ঠিক বলেছ তুমি! আমরা দু'জনে একত্রে শো দেখাব। আমাকে এখুনি কাগজের জন্য প্রবন্ধটা লিখে ফেলতে হবে। (সে দেরাজ খুলে লেখবার উপকরণাদি বার করলে, তারপর টেবিলের সামনে বসে লিখতে আরম্ভ করলে।) "সম্প্রতি এই শহরে একটি ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায় আসিয়াছে। তাহারা গীতিনাট্য ও প্রহসন অভিনয় করে। পিয়েরট তাহার অপূর্ব্ব নৃত্যগীত দ্বারা দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেছে এবং পিয়েরেটের পল্লীনৃত্যে সবাই পুলকিত হইতেছে। পিয়েরেটে বিংশতিবর্ষীয়া সুন্দরী অভিনেত্রী। মিলনান্তক নাটক অভিনয়ে অপূর্ব্ব তাহার দক্ষতা। তাহার কেশদাম···।" কোন্ রঙ?

পিয়েরেটে—সুন্দর, পরিপূর্ণ সুন্দর!

পিয়েরট—কি অদ্ভুত! নিত্য যাকে দেখছি, তার চুলের কি রঙ, তারও খোঁজ রাখি নে। যাক্। (আবার পড়তে লাগল) "তাহার কেশদাম সুন্দর আর···" চোখ?

পিয়েরেটে—নীল, পিয়ের।

পিয়েরট—"কেশদাম সুন্দর আর চক্ষুর্দ্বয় নীলবর্ণ।" সুন্দর! নীল! আহা! না, নিশ্চয়ই এ সব বাজে।

পিয়েরেটে—কি বাজে?

পিয়েরট—আমি একটা বিষয় চিন্তা করছিলাম। প্রায় সব মেয়েরই চুল সুন্দর আর চোখ নীল।

পিয়েরেটে—সত্যিই পিয়ের, আমরা সবাই তো আর কিছু অপূর্ব্ব হতে পারি না।

পিয়েরট—তোমার কণ্ঠস্বর কি মধুর! না, আমি এর কিছু বুঝতে পারছি নে। নিশ্চয়ই এসব বাজে। (সে তার পকেট থেকে দাবিনামাখানা বার করে পড়তে লাগল।)

পিয়েরেটে—কি সব বাজে? পিয়ের, আমাকে কি বলবে না?

পিয়েরট—পিয়েরেটি, একটু আলোর নীচে গিয়ে দাঁড়াও।

পিয়েরেটে—কেন? কি হয়েছে?

পিয়েরট—মনে হচ্ছে, হয় নি কিছু। (দাবিনামা পাঠ ও পিয়েরেটেকে নিরীক্ষণ) "যে চোখ বলে, 'আমি ভালবাসি,' যে বাহুযুগল বলে, 'আমি তোমাকে চাই,' যে অধর বলে, 'কেন দেবে না?···পিয়েরেটি, একি সম্ভব? তুমি যে এত সুন্দর তা তো আগে চেয়ে দেখিনি। তোমাকে

আর একটুও আগের মত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, তোমার আসল মুখখানি যেন হারিয়ে ফেলেছ; গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে যেন তোমার নূতন মুখখানি তৈরি করা হয়েছে।

পিয়েরেটে—এসব কি, পিয়ের?

পিয়েরট—প্রেম। শেষ পর্য্যন্ত আমি খুঁজে পেয়েছি। তুমি কি বুঝতে পারছ না?

'বোকার মত ঘুরতে ছিলাম গোলকধাঁধার পিছে পিছে,
প্রিয়ে, তোমার পাঠশালাতে পাঠ না নিলে জীবন হ'ত মিছে।'

...ভাবলেও অবাক হই যে, রোজ তোমাকে দেখেছি, অথচ তোমাকে ঘিরে গড়ে ওঠে নি আমার কোনও স্বপ্ন—স্বপ্নই বটে! আঃ, সত্যিই এ সেই সুন্দর স্বপ্নমালার একটি। তাই তো মনে হচ্ছে, যেন ভোরের আলোয় আমার অন্তর ভরে উঠেছে।

পিয়েরেটে—আঃ, পিয়ের।

পিয়েরট—উঃ, আমার কাঁধে কি ওড়বার গতিবেগই না জেগেছে। আমি উড়ে যেতে চাই উর্দ্ধে—বহু উর্দ্ধে। তুমি কি চাও না আকাশের গায়ে হেলান দিতে? তারকাদের গান শোনাতে?

পিয়েরেটে—আমি যে বহু দিন ধরেই আমার প্রিয়তমের অপেক্ষায় চাঁদের রাজ্যে বাস করছি। পিয়ের, আমাকে তোমার হাসি উপভোগ করতে দাও। এক চুমুতে তোমার হাসিটুকু ঢেলে দাও আমার মুখে।

(দু'জনে পিছনে দু'হাত বাড়িয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট আটকে রাখল)

পিয়েরেটে—(মাথা সরিয়ে নিয়ে পরম শান্তির নিশ্বাস ফেলে) ওঃ, কি সুখীই না আজ হয়েছি। আজই যদি সব-কিছুর অবসান হয়ে যেত।

পিয়েরট—এস, আমরা আগুনের কাছে বসে উনুনের পিঠে পা রাখি। এর পর থেকে আমাদের জীবনে বিরাজ করুক চির শান্তি। (তারা আগুনের কাছে গিয়ে বসল। পিয়েরট মৃদু সুরে গাইতে লাগল)

চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে—
অনেক বেঁকে পথ গেছে ঐ স্বর্গলোকে,
আলোয় ভরা গানে ভরা জ্যৈষ্ঠ আসে ধেয়ে—
ঘুম দিয়ে যায়, চুম দিয়ে যায় তোমার চোখে।

[চিম্‌নীর গায়ে ঝোলানো লণ্ঠনের তেল শেষ হয়ে গেছে; শিখাটা তখনো পুড়ছে লাল হয়ে, আর তারি আভা পড়েছে দু'জনের মুখে। ধীরে ধীরে নেমে আসছে যবনিকা।]

তিরুমঙ্গই আলোয়ার

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

আলোয়ার অথবা মরমী (Mystic) বৈষ্ণবগণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম এবং নবম শতকের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। তামিল ভাষায় আলোয়ার শব্দের অর্থ—সেই সাধকবৃন্দ যাঁহারা ভগবৎপ্রেমের পূত মন্দাকিনীধারায় স্নাত হইয়া পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন। পার্থিব ভোগৈশ্বর্যে আকৃষ্ট ভ্রান্ত নরনারীকে মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া, অমৃতের আস্বাদের সন্ধান দিয়া—ভক্তিরসাত্মক চারি হাজার থেবারম্ (তামিল স্তব) ইঁহারা রচনা করেন। উপনিষদ এবং গীতার সরল ভাষ্য রূপান্তরে এই সমস্ত থেবারমে স্থান পাইয়াছে। রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ নরসিংহ ইত্যাদি ভগবানের বিভিন্ন মূর্তির উদ্দেশ্যে এই সমস্ত স্তোত্র রচিত হইয়াছে। ভারতের এক শত আটটি বৈষ্ণব মন্দিরে উক্ত বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ-ভারতে শ্রীরঙ্গম্ শ্রীবৈকুণ্ঠম্ শ্রীবিল্লিপুত্র তিরুপ্পতি কুম্বকোনম্ প্রভৃতি তীর্থ বৈষ্ণবগণের প্রধান উপাসনা-কেন্দ্র। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ মতে ভগবান বিষ্ণু দ্বাদশ জন আলোয়ারের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন। আলোয়ারগণ প্রপত্তিমার্গের উপাসক ছিলেন। ব্রহ্মপদে পূর্ণ আত্মসমর্পণকে প্রপত্তি বা শরণাগতি বলে। প্রপত্তিমার্গের ছয়টি অংশ—(১) 'আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ'—ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্তই ব্রহ্মের অংশ, এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও প্রেম। (২) 'প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্'—হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা প্রভৃতি ধর্ম-বিরুদ্ধ কার্যের বর্জন। (৩) 'রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ'—ঈশ্বরই একমাত্র ত্রাণকর্তা বলিয়া ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস। (৪) 'গোপ্তৃত্ব বরণ'—ভগবান পরম করুণাময় হইলেও প্রার্থনা ব্যতীত তাঁহার করুণাকণা লাভ করা যায় না—এই বিশ্বাস। (৫) 'কার্পণ্যম্'—স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও অহংভাবের পরিপূর্ণ বর্জন। (৬) 'আত্ম-নিক্ষেপঃ'—ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণ। এই সমস্ত আলোয়ারের অধ্যাত্মরাজ্যের ভাবধারা থেবারমগুলিতে প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরম ভক্ত এবং মনীষী শ্রীনন্দ মুনি এই সমস্ত থেবারম সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। এই প্রপত্তিমার্গ আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে চিঙ্গলপুট জিলায় রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় চোলরাজ অধিরাজেন্দ্রের রাজত্বকাল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রামানুজ শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরে অবস্থান করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করেন। পুণ্যতোয়া কাবেরী নদী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া মেখলারূপে মন্দিরটিকে বেষ্টন করিয়া আছে। মন্দিরে শ্রীরঙ্গরাজ (বিষ্ণু) অধিষ্ঠিত। বিগ্রহের আদিমূর্তি ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী ভগবান; অনন্তশয্যায় ইনি শয়ন করিয়া আছেন। বিগ্রহের নাভিমূল হইতে উৎপন্ন পদ্মে ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী পদসেবায় নিরত। বিষ্ণুর অপর একটি মূর্তি আছে—এই মূর্তিটি বিশেষ আড়ম্বরের সহিত নিত্য পূজিত হইয়া থাকে। আচার্য রামানুজের সাধনক্ষেত্র বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীরঙ্গম্ অতি পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি বৈষ্ণবপর্ব উপলক্ষে সাধক এবং উপাসকগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। দক্ষিণাপথের সাধকপ্রবর তিরুমঙ্গই আলোয়ার কর্তৃক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিরুমঙ্গই আলোয়ার চোলদেশের অন্তর্গত থিরুকুরিয়ালোর নামক স্থানে এক শৈব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে ইনি শূদ্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম নীল। তাঁহার পিতা এক জন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। সেই সময় ধনুর্বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। অশ্বারোহণে এবং সমর-কৌশলে তিনি বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। চোলরাজ তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করেন। তিনিও সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সন্তুষ্ট হইয়া চোলরাজ তাঁহাকে কিছু ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে তিনি চোলরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মদগর্বে স্ফীত সেনাপতি নীল রাজ্যের সর্বত্র অবাধ লুণ্ঠনকার্যে ব্রতী হন। কিন্তু তিনি চোলরাজকে নিয়মিত কর প্রদান করিতেন।

এই সময় তিরুবলী নামক স্থানে কুমুদ্বল্লী নামে এক ধর্ম-পরায়ণা কুমারী বাস করিতেন। তাঁহার জীবন-কাহিনী সবিশেষ কিছুই জানা যায় না। এক পরম বৈষ্ণব কর্তৃক তিনি লালিত পালিত হন। তিরুবলী মন্দিরে অধিষ্ঠিত বিগ্রহের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। এই মন্দিরে নারায়ণ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। কুমুদ্বল্লী অপরূপ সৌন্দর্যময়ী ছিলেন। রমণীকুলমুকুটমণি কুমুদ্বল্লীর পাণিগ্রহণেচ্ছু বহু রাজকুমার নিয়ত তাঁহার নিকট উপনীত হইতেন। কিন্তু কেহই এই কুমারীর হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইলেন না। সেনাপতি নীল শীঘ্রই তাঁহার অপার্থিব সৌন্দর্যের কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। এই কুমারীর প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বে তিনি কুমুদ্বল্লীর পালক-পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় কন্যার পাণিপ্রার্থী হইলেন। পিতা কন্যার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক-যুবতী মুখোমুখি দাঁড়াইয়া—এই সময় ভগবান্ পুষ্পধন্বা অলক্ষ্যে উভয়ের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তরুণী দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে একান্ত বাঞ্ছিত দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। সে হাসিতে যেন স্বর্গীয় সুষমা ঝরিয়া পড়িতেছে। কুমারী আত্মবিস্মৃত হইলেন। আর সেনাপতি নীল অনুভব করিলেন যেন এক মহীয়সী দেবীমূর্তি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। নয়ন ভরিয়া তিনি এ রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। সেনাপতি নীল দেখিলেন—কুমুদ্বল্লীর দেহযমুনা যৌবনের নিরুপম সৌন্দর্যে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। প্রেমের আবেশে তাঁহার মনপ্রাণ আজ উন্মুখ হইয়া উঠিল, তিনি কুমুদ্বল্লীর জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। কুমুদ্বল্লী বলিলেন—'ভদ্র, একমাত্র পরম বৈষ্ণব ব্যতীত কেহ আমার পাণিগ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ আমার সমস্ত দেহমন বিষ্ণু-ভক্তকে সমর্পণ করে নারায়ণ-সেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করাই আমার একমাত্র কাম্য।' 'দেবি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'—এই বলিয়া নীল তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষা লইয়া তিনি প্রেমাস্পদার নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, 'দেবি, আশা করি এবার তুমি আমাকে গ্রহণ করবে।' কুমুদ্বল্লী মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—'ভদ্র, আপনার এ বাহ্যিক দীক্ষা কিছুই নয়। আপনি প্রতিদিন এক হাজার আট জন বৈষ্ণবকে আহার্য প্রদান করে তাদের সেবাপূজা করবেন এবং তাঁদের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ আমায় এনে দেবেন। এ ব্রত আপনাকে এক বছর ধরে পালন করতে হবে।'

—'তথাস্তু।'

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর অতিবাহিত হইল। নীল কুমুদ্বল্লীর নির্দেশ প্রতিপালন করিলেন। কুমুদ্বল্লী সানন্দে নীলকে পতিরূপে বরণ করিলেন।

সেনাপতি নীলের জীবনে এক বিরাট্ পরিবর্তন দেখা দিল। প্রতিদিন বৈষ্ণবগণের সেবাপূজার ভিতর দিয়া তাঁহার মনপ্রাণ পরমপিতা জগদীশ্বরের দর্শনমানসে অশান্ত হইয়া উঠিল। নীল বুঝিতে পারিলেন তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য বৈষ্ণব-গণের পদরেণুরও তুল্য নহে। তাই তিনি সাধ্বী পত্নীর পূর্ব-নির্দেশমত প্রতিদিন এক হাজার হরিভক্তের সেবাপূজায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। এইভাবে তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি কপর্দকহীন হইয়া পড়িলেন। সম্বলের মধ্যে রহিল শুধু রাজকর বাবদ দেয় অর্থ। কিন্তু তিনি কি তাঁহার এই মহান্ ব্রত হইতে বিরত হইতে পারেন! বরং

নিজে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন তবু নরনারায়ণের সেবাব্রত হইতে বিচ্যুত হইবেন না এই তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প। ভগবানে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া তিনি রাজকর ব্যয় করিলেন।

প্রাগুক্ত ঘটনার কয়েক মাস পর নীলের নিকট হইতে রাজস্ব পাইতে বিলম্ব দেখিয়া চোলরাজ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেন। নীলের সেবাব্রতের কথা অতিরঞ্জিত ভাবে রাজার নিকট পৌঁছিল। প্রথম হইতেই তিনি নীলের আচরণে মর্মজ্বালায় জ্বলিতেছিলেন। তাই কালবিলম্ব না করিয়া নীলকে বন্দী করিয়া আনিতে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। বীরের ন্যায় নীল রাজসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। নীলের কল্লার বাহিনীর নিকট রাজসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। দারুণ অপমানে চোলরাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া স্বয়ং এক বিরাট্ বাহিনী লইয়া নীলকে শাস্তি দিতে চলিলেন। নির্ভীক নীল রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। চোলরাজ তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন—

—'কেন তুমি রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেছ ?

—'বৈষ্ণবগণের সেবায় ঐ অর্থ ব্যয় করেছি ; আমার মনে হয় এতে অর্থের সদ্ব্যবহারই হয়েছে। রাজকোষে অর্থ প্রেরণ করলে তা শুধু আপনার অত্যগ্র ভোগের সামগ্রী সংগ্রহেই সাহায্য করত। জনসাধারণের কোন উপকারে আসত বলে মনে হয় না।'

—বেশ, তোমার উত্তরে আনন্দ লাভ করলাম। তোমার সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করতে রাজী আছি যদি তুমি পুনরায় সেনাপতির পদ গ্রহণ করে আমার অধীনে কাজ কর। কিন্তু যে পর্যন্ত না তুমি আমার প্রাপ্য রাজস্ব দিচ্ছ—সে পর্য্যন্ত তুমি আমার বন্দী থাকবে।

নীল কারাগারে বন্দীজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সত্যং শিবং সুন্দরমের পূজারী নীল। তিনি কি জীবনের ক্ষণিক দুঃখকষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়া তাঁহার লক্ষ্য শ্রেয়কে ত্যাগ করিবেন? তাহা হইলে তাঁহার জীবনের সাধনাই তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যাইবে। চিরসুন্দরকে লাভ করিবার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, তাহা ক্ষুরধার দুর্গম—'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। রুদ্ধ কারাগৃহে ভক্ত নীল আকুল প্রাণে ভগবানের চরণে প্রাণের আকুতি নিবেদন করিতে লাগিলেন—'প্রভো! তোমার ভক্তগণের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ ভিন্ন অন্য খাদ্য আমি স্পর্শ করি না। বৈষ্ণবদের অভুক্ত রেখে কোন্ প্রাণে আমি এখানে আহার করব! অনশনে বরং প্রাণত্যাগ করব তবু ব্রত ভঙ্গ করতে পারব না। দয়াময় প্রভো! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' ভক্তশ্রেষ্ঠ নীল অনশনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এক দিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নচ্ছলে ভগবানের প্রত্যাদেশ পাইলেন। কাঞ্চীপুরের অন্তর্গত বেগবতী নদীগর্ভ হইতে ভগবান তাঁহাকে গুপ্তধন গ্রহণ করিতে বলিলেন। ভগবানের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাতে তিনি রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, কাঞ্চীপুর গিয়া তিনি রাজস্ব পরিশোধ করিবেন। চোলরাজ তাঁহাকে সশস্ত্র রক্ষীবর্গের তত্ত্বাবধানে কাঞ্চী পাঠাইলেন। কাঞ্চীর বরদারাজ তাঁহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সেখানে গুপ্তধন উদ্ধার করিয়া তিনি চোলরাজের রাজস্ব সুদে আসলে পরিশোধ করিলেন। এই অলৌকিক ব্যাপারে চোলরাজ ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—সেনাপতি নীল সাধারণ ব্যক্তি নহেন। তিনি একজন মহাপুরুষ। ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা তাঁহার সমস্ত কার্যের পিছনে রহিয়াছে। তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি নীলের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং বারংবার ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন। ভক্তপ্রবর নীল প্রসন্ন হাস্যে তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিলেন। চোলরাজ নীলকে রাজস্ব ফিরাইয়া দিলেন এবং তদীয় পুণ্য কৃত্যের জন্য প্রভূত অর্থ রাজকোষ হইতে প্রদান করিলেন।

নীল পুনরায় পূর্ণোদ্যমে বৈষ্ণব সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বৈষ্ণবগণের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বর্ধিত হইল। পুনরায় তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বৈষ্ণবসেবা যাহাতে বন্ধ না হয় তজ্জন্য কুমুদবল্লী তাঁহাকে একান্ত ভাবে অনুরোধ করিলেন। নীল উপায়ান্তর না দেখিয়া ধনিক সম্প্রদায়ের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিরাট সংঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। লুণ্ঠন করিয়া যে ধনরত্ন সংগৃহীত হইত তাহা হইতে তিনি এক কপর্দকও নিজের ভোগের জন্য গ্রহণ করিতেন না। সমস্ত অর্থই তিনি ভক্তগণের সেবায় ব্যয় করিতেন।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। এক দিন লক্ষ্মী আর নারায়ণ ছদ্মবেশে নীলের নিকট উপনীত হইলেন। বনপথে নীল সদলবলে উদ্গ্রীব হইয়া পথচারীদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সহসা এক ধনিকের ছদ্মবেশে সস্ত্রীক নারায়ণ সেখানে উপস্থিত হইলেন। দস্যুদল চারিদিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ছদ্মবেশী নারায়ণ তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি তিরুবলীতে বাস করেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি আরও বলিলেন—দস্যুতা পাপ। ব্রাহ্মণের কথায় নীল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—'ঠাকুরমশাই, আমরা যা করি সেটা মোটেই

দস্যুবৃত্তি নহে; আমরা ধনীর ধনরত্ন লুণ্ঠন করি দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য। অফুরন্ত ধনরত্ন আপনার অধিকারে—তা শুধু আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের ভোগে ব্যয়িত হয়ে থাকে। সাধারণের কোনই উপকার হয় না। আপনার সঞ্চিত অর্থ জনসাধারণের উপকারে এলে তার সদ্ব্যবহারই হবে। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে সঙ্গে যা-কিছু আছে দিয়ে দিন।' ছদ্মবেশী নারায়ণ তখন সমস্ত ধনরত্ন ও স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কাররাশি দস্যুকরে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে কেহই সওলক্ষ দ্রব্যের পোঁটলাটি উঠাইতে পারিল না। নীল সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু পোঁটলাটি একচুলও নড়িল না। ব্রাহ্মণ উহা মন্ত্রপূত করিয়াছেন; সুতরাং মন্ত্রটি শিখাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া নীল মত প্রকাশ করিলেন। ছদ্মবেশী নারায়ণ মৃদু হাসিয়া নীলের কানে কানে বলিলেন—'ওঁ নমো নারায়ণায়।' সঙ্গে সঙ্গে নীলের সমস্ত শরীরে এক অপূর্ব্ব পুলকশিহরণের সঞ্চার হইল। তিনি অভিভূতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—ওঁ নমো নারায়ণায়। ভাবাবেশে তিনি বিহ্বল হইলেন।

এদিকে সমস্ত ধনরত্নসহ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইলেন। নীল দেখিতে পাইলেন সমস্ত বনভূমি আলোকিত করিয়া গরুড়-আরোহণে লক্ষ্মী-নারায়ণ আকাশ-পথে চলিয়াছেন। তখন তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার চির আরাধ্য দেবতা নারায়ণ আজ তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন। অনুশোচনায় তাঁহার সমস্ত অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। ভক্তের মনোভাব ভগবানের অগোচর রহিল না। অকস্মাৎ নীলের কানে আকাশবাণী ভাসিয়া আসিল—'প্রিয় ভক্ত তিরুমঙ্গই, তোমার কৃত কর্মের জন্য অযথা নিজকে দোষী করো না। তুমি শ্রীরঙ্গমে গিয়া দেব-দেউল নির্মাণ কর। সেখানে আমার মূর্ত্তি স্থাপন করে সেবাপূজার ব্যবস্থা এবং আমার মহিমা সাধারণ্যে প্রচার কর। তা হলেই তোমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত হবে।' এই ঘটনার পর হইতেই নীলের জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। শ্রীরঙ্গম্ মন্দির-নির্মাণ-কার্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু নীল তখন কপর্দকশূন্য। উপায়ান্তরবিহীন হইয়া তিনি নেগাপতমে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করেন। মন্দিরের সুবর্ণ-নির্মিত বুদ্ধ-মূর্তি দ্বারা নীল আরব্ধ কার্য সমাধা করেন।

তিরুমঙ্গই আলোয়ারের (নীল) কতিপয় কবিতার বিচ্ছিন্ন অংশ কাঞ্চীতে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কবিতা হইতে অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার প্রমাণ করিয়াছেন, তিরুমঙ্গই আলোয়ার খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গম্ মন্দির নির্মাণ এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-কার্য সুচারু ভাবে সম্পন্ন হইল। এই সময় পরম যোগী এবং সিদ্ধ নাম্মালোয়ার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমে আগমন করেন। তিরুমঙ্গই আলোয়ার তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তিনি অশেষ মনোযোগের সহিত এই মরমী সিদ্ধপুরুষের ধর্ম-ব্যাখ্যান শ্রবণ করেন। অতঃপর তিরুমঙ্গই তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। শৈবাচার্য শ্রীজ্ঞান সম্বন্ধর তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। শৈবাচার্য তাঁহার অধ্যাত্ম-সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হন। তিরুমঙ্গই আলোয়ার এক হাজার থেবারম্ (তামিল স্তোত্র) রচনা করেন। সমস্ত থেবারম্ তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীরঙ্গরাজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এই থেবারমগুলি 'পেরিয়া থিরুমোলি' নামে অভিহিত। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ 'দিব্য প্রবন্ধমে' তাঁহার রচিত অধিকাংশ স্তব স্থান পাইয়াছে। তাঁহার রচনায় বহু কিম্বদন্তী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্তবগুলি সহজ সরল অথচ ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়। দাস্য ভাবে তিনি ভগবানকে আরাধনা করিয়াছেন। নিজেকে তিনি পরম পুরুষের পদে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন।

রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই পার্থিব প্রেম ভগবৎ প্রেমে রূপান্বিত হইয়া ভগবানকে পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। তাঁহার মতে ভগবদারাধনায় বাহ্য আড়ম্বর কিছুই নহে, একমাত্র ভগবানের নামই সার। সচ্চিদানন্দের করুণাকণা লাভ করিতে হইলে নির্মল-চিত্তে পরম পিতাকে স্মরণ মনন করাই যথেষ্ট। ভাগবতে ভক্তির নয় প্রকার লক্ষণের উল্লেখ আছে—শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চনা বন্দনা দাস্য সখ্য এবং আত্মনিবেদন। তিরুমঙ্গই আলোয়ার দাস্য এবং আত্মনিবেদনের (আত্ম-নিক্ষেপঃ) ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবানের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রেম-ধর্মের কথা স্মরণ করিলে এমার্সনের উক্তি মনে পড়ে—"When it breathes through man's intellect, it is genius. When it breathes through his will, it is virtue. When it flows through his affection, it is love."

তিরুমঙ্গই আলোয়ার এবং তদীয় সহধর্মিণী কুমুদবল্লীর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই। কারণ প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ইঁহাদের শেষ জীবন সম্বন্ধে নীরব। প্রাচীন ভারতের বিস্মৃতপ্রায় ধর্মগুরুদের জীবনের তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে দেশবাসীর অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

মুদ্রামূল্যাবনতি

শ্রীবিমলাকান্ত সরকার

কিছুকাল হইতে মুদ্রামূল্যাবনতির (Devaluation) কথা শোনা যাইতেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে মুদ্রামূল্যাবনতি হইয়াছে। ইংলণ্ডেও হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল এবং অনেক প্রধান দেশে যে ইহার আশঙ্কা একেবারে নাই তাহা বলা যায় না।

সাধারণতঃ দেশে যে টাকা চলিত থাকে তাহা কোনও ধাতুর সহিত জড়িত। এই ধাতুর মূল্যের যাহাতে বেশী হ্রাস বৃদ্ধি না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'সোনা'র কথা ধরা যাক। ইহা অধিকাংশ দেশে চলিত মুদ্রা। সোনার মূল্য নানা কারণ বশতঃ (যেমন শিল্পাদির জন্য নিয়মিত চাহিদা এবং আহরিত প্রভূত ভাণ্ডার হেতু) অপেক্ষাকৃত স্থির। সোনার মূল্য ধাতু হিসাবে অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অনুসারে বাজারে যেরূপ কেনাবেচা হয়—মুদ্রা হিসাবেও সেইরূপ হইবার কথা। মুদ্রা তৈয়ারী করিতে অর্থাৎ ছাপ ইত্যাদি দিবার জন্য যাহা খরচ হয় তাহার হিসাব কেবল ধরিয়া লইতে হয়। ইংলণ্ডে 'সভরেন' ১১৩·০০১৬ গ্রেন সোনা দিয়া তৈয়ারী হইত; আমেরিকাতে 'ডলার' ২৩·২২ গ্রেন সোনা দিয়া তৈয়ারী হইত। ঐ ঐ পরিমাণ সোনার মূল্য বাজারেও ঐ দরে চলিত হইবার কথা—কেবলমাত্র খরচার জন্য 'Brassage' মূল্যের তফাৎ হইতে পারিত।

আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ আরভিং ফিশার ঠিক করিয়াছিলেন যে সাধারণতঃ—যেমন মুদ্রার পরিমাণ (ওজন) আমরা হ্রাস বৃদ্ধি করি না অপর পক্ষে জিনিষপত্রের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি সহিয়া যায় অর্থনৈতিক স্থৈর্য্যের (stability) জন্য জিনিষপত্রের দাম মুদ্রার পরিমাণ অনুযায়ী কমি বেশী না হইয়া সেই পরিমাণে মুদ্রার ওজনের বেশী কমি করা দরকার। জিনিষপত্রের দাম সাধারণতঃ যদি শতকরা ১০% কমে তাহা হইলে মুদ্রার ওজন ১০% কমাইতে হইবে, জিনিষপত্রের দাম যদি ১০% বাড়ে তাহা হইলে মুদ্রার ওজনও সেই পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। এক ক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা (Quantity) বাড়িবে, অপর ক্ষেত্রে তাহা কমিবে। ধরা যাক আমেরিকায় ১০% জিনিষপত্রের দাম কমিল তাহা হইলে পূর্ব্বের আমেরিকার ডলার অনুসারে তাহার ওজন ২·৩২২ গ্রেণ কমাইতে হইত এবং মুদ্রার পরিমাণও সেই অনুসারে বাড়িত।

অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক সূত্রানুসারে উহাকেই মুদ্রামূল্যাবনতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু আর এক অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। যখন দেশে মুদ্রাস্ফীতি খুব হয়—মুদ্রার মূল্য খুবই কমিয়া যায়—তখন স্বর্ণমান (বা কোনও ধাতু মান) পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা দরকার হইয়া থাকে। নতুবা কি বৈদেশিক বাণিজ্যে অথবা কি স্বদেশীয় চুক্তিমূলক বা অন্য রূপ আদান প্রদানে ভীষণ বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য ও স্বদেশীয়—সামাজিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বর্ণমান সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মুদ্রামূল্যাবনতি দরকার হয়। ফ্রান্সে ও ইউরোপীয় কোনও কোনও দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেল সেখানকার মুদ্রার মূল্য খুবই কম হইয়া গিয়াছে। তখন বহুদেশে স্বর্ণের ওজন মুদ্রাতে সেই পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইল। সম্প্রতি ফ্রান্সে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হইল এবং অবাধ স্বর্ণপ্রচলন ও স্বর্ণ মুদ্রণের ব্যবস্থার কথায় মনে হয় স্বর্ণমানও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে।

এইরূপ কেন করা হয় তাহার অন্তর্নিহিত অর্থ জানিতে হইলে মুদ্রার বিষয়ে অনেক কথা জানা দরকার। বহু প্রাচীন প্রথা অনুসারে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনের বিষয় প্রথমেই বলা হইয়াছে। এই প্রথা ঠিক মত রাখিতে হইলে সকল রকমের মুদ্রার পরিমাণ নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ করা দরকার। এখন প্রায় সকল দেশেই ব্যাঙ্কে যে সকল চলতি (Deposits) হিসাব থাকে এবং ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া 'নোট' (Notes) যাহা টাকা হিসাবে বাহির করা হয়—তাহাও মুদ্রারই রূপান্তর। নোট ভাঙ্গাইয়া মুদ্রা সকল সময়ই পাওয়া যায়। যদি নোট প্রচুর পরিমাণে বাহির করা হয় তাহা হইলে সাধারণতঃ মোটামুটি হিসাব অনুসারে 'টাকার' সংখ্যা বেশী হইল সুতরাং জিনিষের মূল্য বাড়িল। তাহা হইলে 'সোনা'র মূল্যও সেই অনুসারে বাড়িল। অর্থাৎ মুদ্রা হিসাবে 'সোনা'র মূল্যে ও 'জিনিষ' হিসাবে 'সোনা'র মূল্যে তফাৎ হইল। 'জিনিষ' হিসাবে 'সোনা'র মূল্য বেশী হইলে যে সমস্ত মুদ্রা সোনার থাকিবে তাহা লোকে গলাইয়া ফেলিয়া 'জিনিষ' হিসাবে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে অর্থাৎ তখন স্বর্ণমান আর থাকিবে না।* সেইজন্য এখন প্রায় সকল রকমের স্বর্ণমান বিধিবদ্ধ বা নিয়মিত হইয়া থাকে যাহাতে মুদ্রার মূল্য ও মুদ্রার ধাতুর মূল্য একই হয়। এই যে বিধিবদ্ধ মুদ্রামান তাহার উদ্দেশ্য কি—বৈজ্ঞানিকভাবে জানা দরকার। যদিও সাধারণতঃ—প্রতীয়মান হইতে না পারে, কিন্তু সামাজিক কল্যাণের জন্য মুদ্রামান যাহাতে দেশের (বার্ষিক) আয় ঠিক-

---

* দেশের জিনিষের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় আমদানী বেশী হওয়া সম্ভব এবং তাহার মূল্য দিবার জন্য 'সোনা' পাঠাইতে হওয়ায় দেশ হইতে 'সোনা' চলিয়া যাইতে পারে।

মত উৎপাদনে, বিভাজনে ও হিতসাধনে প্রয়োজিত হয় তাহা দেখা দরকার। এখন মনে হইতে পারে যে মুদ্রামানের দ্বারা তাহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনা না করিয়া দুই-একটা উদাহরণ দ্বারা ইহার অর্থ সম্যক্ প্রকাশ করা যাইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি নানাপ্রকারের হইতে পারে। সাধারণতঃ জিনিষের মূল্য যখন সাধারণ ভাবে বাড়িয়া যায় তখনই আমরা মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে বলিয়া থাকি। যখন এইরূপ অবস্থা হয় তখন সাধারণতঃ দরিদ্র ও বৃত্তিভোগীদের ধন ধনীদের নিকট ও কর্ম্মীদের (active classes) নিকট পক্ষান্তরিত হইয়া থাকে। ধনীরা 'জিনিষ'-পত্র তৈয়ারী করাইয়া থাকেন, তাহার মূল্য বেশী হওয়ায় আরও প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী করিবার চেষ্টা ও ইচ্ছা হয়—এই 'জিনিষ'-পত্রগুলি (consumption articles) সাধারণ লোকে কিনিয়া থাকে, তাহাদের আয়, মাহিনা ইত্যাদি সেই পরিমাণে বাড়ে না, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা আয়ের বেশী অংশ খরচ করিতে হয়; ফলে ধনীরা লাভবান হয় এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুদ্রামানের দ্বারা সামাজিক কল্যাণ যাহাতে সাধিত হয় সেইটাই সমাজের বেশী দেখা দরকার ইহাই এখনকার মত। যখন সমাজ-কল্যাণও সাধিত হয় এবং মুদ্রামূল্যের স্থৈর্য্যও থাকে তখন সকল দিকেই সুবিধা কিন্তু দুইটির মধ্যে কোন্‌টি পছন্দ করা উচিত এই লইয়া যখন সমস্যা উদ্ভূত হয় তখন মুদ্রামূল্যের স্থৈর্য্য অপেক্ষা সমাজ হিতসাধনই বেশী প্রয়োজনীয় ধরা হয়। এই রকম বিবেচনা করিবার নানারূপ ক্ষেত্র উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা যেরূপ স্থৈর্য্যের কথা বলিলাম ঐরূপই হইয়া থাকিত। কিন্তু ক্রমশঃ অধিকাংশ দেশেই মুদ্রাস্ফীতি বা অন্য নানাকারণ উপস্থিত হওয়ায় সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ মুদ্রামানের ক্ষেত্র তৈয়ারী হইল। সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ মুদ্রামান অনুসারে কোনও ধাতব মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ 'কাগজ টাকা' (ব্যাঙ্ক-এর আমানত টাকা ও নোট প্রভৃতি) দ্বারা সমস্ত কার্য্যাদি হইয়া থাকে, অবশ্য 'মুদ্রার' নামটি পূর্ব্বের ন্যায় রাখিয়া দেওয়া হয় (Money of account)। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেট ব্রিটেনে ধাতবমুদ্রা রহিত করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু 'মুদ্রা'র নাম 'পাউণ্ড-ষ্টার্লিং' রাখিয়া দেওয়া হইল। ১৯৩৫ সালে যে সমস্ত দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তাহারা স্বর্ণমুদ্রার মূল্য ঠিক রাখিবার চেষ্টায় দেখিলেন ১৯২৬ সালে জিনিষপত্রের যাহা দাম ছিল তাহা অপেক্ষা প্রায় শতকরা ৫ ভাগ জিনিষপত্রের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। মোটামুটি হিসাবে ধরা যায়—সম্ভবতঃ জিনিষপত্রের উৎপাদন খুব বেশী হইয়াছিল অপর পক্ষে উপার্জ্জন বা ব্যক্তিগত আয় সমষ্টি অথবা মুদ্রার পরিমাণ সেইরূপ ভাবে বাড়ান সম্ভব হয় নাই। অপর পক্ষে গ্রেটব্রিটেন স্বর্ণমুদ্রার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করায় কেবল 'কাগজ-টাকা'র দ্বারা ব্যবস্থা করায় সেখানে জিনিষপত্রের দাম বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। আমেরিকাতে ক্রমশঃ অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। সেখানেও দেখা গেল জিনিষপত্রের দাম কমিয়া যাইতেছে। 'সোনা'র দাম জিনিষ-হিসাবে যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে মুদ্রা হিসাবে তাহার চাহিদা বেশী হইবে, যথেষ্ট সরবরাহ হইলে মোটের উপর ঠিক অবস্থা হইয়া যাইবে। কিন্তু 'সোনা'র যদি যথেষ্ট সরবরাহ না হয়—এবং যে পরিমাণ 'টাকা' দরকার তাহা না পাওয়া যায়—তাহা হইলে আপনাআপনি টাকার এই মূল্য নিরূপণ ব্যবস্থা বাতিল হইয়া যায়। সেখানেও (আমেরিকাতেও) ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে স্বর্ণমাণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং 'কাগজ-টাকার' উপর নির্ভর করায় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া গেল। এইরূপ অবস্থা কিন্তু বেশী দিন রাখা হইল না—১৯৩৪ সালে একটি আইন করা হইল। এই আইন অনুসারে 'ডলার'-এর ওজন কমাইয়া দেওয়া হইল। পূর্ব্বে ১ আউন্স সোনায় ২৫ ডলার হইত, এই আইনে ৩৫ ডলার হইল; পূর্ব্বে ১ ডলারে ২৫·৮ গ্রেন* সোনা থাকিত, এখন সেস্থলে ১৫·২৩ গ্রেন সোনা দেওয়া হইল। 'মুদ্রা'র মূল্য কমিল সোনার মূল্য বাড়িল। বাহিরের সাধারণ মূল্যের সহিত 'মুদ্রা'র মূল্যের সামঞ্জস্য করা হইল। মুদ্রার ওজনের ও মূল্যের অবনতি হইল। সাধারণ স্বর্ণমান হইতে ইহা অনেকটা পৃথক। ইহাকে বলা হয় Gold value standard অথবা স্বর্ণমূল্যানুযায়ী মান।

ফ্রান্সে যে মুদ্রামূল্যাবনতি হইল তাহা জানিতে হইলে আরও কিছু বলিতে হইবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সুইডেনের অধ্যাপক ক্যাসেল আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময় দর সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে এই দর সম্বন্ধে বিশেষ কঠিন কিছু সমস্যা ছিল না। ইংলণ্ডে একটি 'সভারেন'-এ ১১৩·০০১৬ গ্রেন সোনা থাকিত; আমেরিকাতে একটি ডলারে ২৩·২২ গ্রেন সোনা থাকিত সুতরাং একটি ডলারের সহিত সভারেনের $\frac{২৩·২২}{১১৩·০০}$ ১৬ বিনিময়মূল্য ছিল। অর্থাৎ ১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এ ৪·৮৬৬৫৬ 'ডলার' পাওয়া যাইত। সেই অনুসারে জিনিষ-পত্র দুই দেশে কেনাবেচা চলিত, কেবল সোনা পাঠাইবার খরচের জন্য সামান্য দরের কম বেশী হইতে পারিত। বিধিবদ্ধ মুদ্রামান হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রার সহিত দেশের চলিত মুদ্রার কোনও সম্বন্ধ না থাকিতে পারিত। এই বিধিবদ্ধ মুদ্রামান অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশের জিনিষপত্রের মূল্যের সহিত জড়িত থাকিত।

* ২৩·২২ গ্রেন খাঁটি সোনার সমান।

ইহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইলে আরও সুবিধা হইবে। সাধারণ জিনিষপত্রের দাম কমিল না বাড়িল জানিবার নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। এখন মোটের উপর Index number (weighted) অর্থাৎ শতকরা সাধারণ জিনিষ-পত্রের দরকার অনুসারে দাম কম-বেশী নিরূপণ উপায়টি ঠিক বলিয়া ধরা হয়। ডাল, চাল, আটা প্রভৃতি দ্রব্য সাধারণ লোকেরা ক্রয় করিয়া থাকে—এখন বিলাসদ্রব্যও অনেকে ক্রয় করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত' কম। সুতরাং বিলাসদ্রব্য যেখানে ১, অন্যান্য দ্রব্য সেখানে ২ ধরা যাইতে পারে।[১]

১৯২৬ সালে এইরূপ ভাবে ধরিয়া সাধারণ জিনিষপত্রের মূল্য ১০০ ধরা যাউক। ১৯৪৮ সালে ঐরূপ ভাবে দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করিয়া যদি দেখা যায় তাহা ১২৫ হইয়াছে তখন বলা যাইতে পারে সাধারণ দ্রব্যের মূল্য ২৫ ভাগ, অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা $\frac{১}{৪}$ বাড়িয়াছে।[২]

অধ্যাপক ক্যাসল বলেন যে দেশে যেরূপ দ্রব্যের সাধারণ মূল্য বাড়িবে কমিবে পূর্ব্বের তুলনামূলক বিদেশীয় মুদ্রা-বিনিময় হার সেইরূপ ভাবে কম-বেশী হইবে। ১৯১৪ সালে দ্রব্যের মূল্য যদি ১০০ ছিল ১৯২০ সালে আমেরিকায় তাহা ২২৬, গ্রেটব্রিটেনে ২৮২ এবং ১৯২৪ সালে আমেরিকায় তাহা ১৪৯ ও গ্রেট ব্রিটেনে তাহা ১৬৬ হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং সমান প্রায় ৪'৮৬...ডলার ছিল। এই নিয়ম অনুসারে তাহা হইলে ১৯২০ সালে ১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং $= ৪'৮৬ \times \frac{২২৬}{২৮২}$ অর্থাৎ সম্ভবতঃ প্রায় ৩'৯...ডলার এবং ১৯২৪ সালে তাহা $\frac{১৪৯}{১৬৬} \times ৪'৮৬$...অর্থাৎ প্রায় সম্ভবতঃ ৪'৩৬...ডলার হইবে। অনেকে বলেন সাধারণতঃ এই নিয়মটিই প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়াছিল মুদ্রা-বিনিময় হার একটু তফাৎ হইয়াছিল। তাহার কারণ ধরা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে অবাধ দ্রব্য-বিনিময় হয় না, quota system হইয়া থাকে এবং অযথা দ্রব্য বহন করায় খরচ বেশী পড়িয়া যায়।

যেখানে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে সেখানে স্বর্ণ দ্বারা মুদ্রা বিনিময় হার মোটের উপর বহাল থাকে। ধরা যাউক, আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে বেশী মাল রপ্তানী হইল। তাহা হইলে আমেরিকাতে ইংলণ্ড হইতে বেশী "মূল্য" দিতে হইবে। ইংলণ্ডের মুদ্রা আমেরিকায় প্রচলিত নয়, সুতরাং স্বর্ণ পাঠাইতে হয়। যদি স্বর্ণ পাঠাইবার দরকার হয় তাহা হইলে ডলার পাউণ্ড হারে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচ পর্য্যন্ত তফাৎ হইতে পারে।

<table>
<tr>
<td>১
জিনিষ　বার্ষিক　তুলনামূলক
খরচ　সংখ্যা
(লক্ষ পাউণ্ড)
গম　৬০　৫
বার্লি　৩০　৫
মাংস　১০০　১০
দুগ্ধ প্রভৃতি ৬০　৭$\frac{১}{২}$
...
...
মোট ১০০

Bowleyর পুস্তক দ্রষ্টব্য।

(অভিনব তুলনামূলক শতৈকিক সংখ্যা)</td>
<td>২　সাধারণ
Index Number

১৯১৪ শতৈকিক ১৯৪৮ শতৈকিক
সংখ্যা　সংখ্যা
চাউল ৪৲ ১০০ ১৫৲ $\frac{১৫}{৪} \times ১০০$
(মণ)　= ৩৭৫৲
ডাল ৫৲ ১০০ ২০৲ ... ৪০০৲
(মণ)

শতৈকিক
সংখ্যা $= \frac{২০০}{২}$ ... $= \frac{৭৭৫}{২}$
১৯১৪ = ১০০ ১৯৪৮ = ৩৮৭$\frac{১}{২}$

মন্তব্য :—৩ নং কলমে
শতৈকিক সংখ্যা $\frac{২০০}{২}$
= ১০০ না ধরিয়া

১নং 'কলমে'র নিয়ম অনুসারে ভাগ করা যায়।</td>
<td>Weighted Index Number
প্রয়োজন মত তুলনামূলক
শতৈকিক সংখ্যা
১৯১৪এ মূল্য ও শতৈকিক সংখ্যা (প্রয়োজন অনুসারে)　১৯৪৮এ মূল্য ও প্রয়োজন অনুসারে শতৈকিক সংখ্যা
চাউল—
৪৲ × ৪০ কোটী মণ　১৫৲ × ৪৫ কোটী মণ
= ১৬০ কোটী টাকা　$১০০ \times \frac{৬৪৫}{১৬০}$
১০০　= ৪০৩
ডাল—
৫৲ × ৮ কোটী মণ　২০৲ × ১২ কোটী মণ
= ৪০কোটী টাকা　$১০০ \times \frac{২৪০}{৪০}$
১০০　= ৬০০

শতৈকিক সংখ্যা
১৯১৪ $= \frac{২০০}{২}$　১৯৪৮ $= \frac{১০০৩}{২}$
= ১০০　= ৫০০$\frac{১}{২}$</td>
<td>মন্তব্য :—
সাধারণ শতৈকিক সংখ্যা অনুসারে ১৯৪৮ সালে প্রায় ৪ গুণ বাড়িল কিন্তু প্রয়োজন ও সরবরাহমূলক তুলনায় প্রায় ৫ গুণ বাড়িল। দাম ইত্যাদি এখানে প্রায়ই কাল্পনিক।
সুবিধার জন্য বাছাই জিনিষের পাইকারী দর অথবা জীবিকা নির্ব্বাহের জিনিষের শতৈকিক সংখ্যা ধরা হয়।</td>
</tr>
</table>

৯

১ পাউণ্ড ৪'৮৬ ডলার ছিল। ডলারের চাহিদার দরুন তাহা (পাউণ্ড) ৪'৮৭ ডলারে দাঁড়াইতে পারিত। তদপেক্ষা বেশী তফাৎ হইলে ইংলণ্ড হইতে "সোনা" পাঠাইবার খরচ পোষাইয়া যাইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত "সোনা" পাঠান দরকার না হয় ব্যাঙ্কগুলি যোগান দিয়া থাকেন। সেইজন্য মুদ্রা বিনিময় হার তফাৎ হয়। "সোনা" পাঠাইয়া দেনা পরিশোধ করিতে হইলে মোটামুটি হিসাবে আমেরিকায় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাইত এবং ক্রমশঃ রপ্তানী কমিয়া যাইত—অর্থাৎ তাহার খাঁটী মুদ্রা বিনিময় হার বজায় থাকিত।

এখন বিধিবদ্ধ মুদ্রামানে এইরূপ স্বতঃই হার ঠিক করিবার কিছু উপায় রহিল না। সোনার অপব্যবহার দূর করিবার জন্য অনেক দিন হইতে নানা উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছিল। তাহার মধ্যে 'Gold exchange managment' একটি। ধরা যাউক ক দেশ খ দেশকে জিনিষপত্র বেশী পাঠাইতেছে। তাহা হইলে খ দেশ হইতে ক দেশে সোনা পাঠাইতে হইত। এই উপায়ে খ দেশ ক দেশে তাহার নানারূপ গবর্ণমেণ্ট বা কোম্পানীর কাগজ (Securities) কিনিয়া রাখিয়া দিল। তাহাতে খ সুদ ইত্যাদি পাইতে লাগিল এবং ক দেশে জিনিষের মূল্যের দরুণ সোনা না পাঠাইয়া ঐ কাগজ হস্তান্তরিত করিতে লাগিল। ক দেশ যদি তাহাতে আপত্তি না করে তাহা হইলে সোনা না পাঠাইয়া আমদানী-রপ্তানী করার কোনও আপত্তি থাকে না। অনেক দেশই যদি এইরূপ সোনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায় তাহা হইলে সকলের আমদানী-রপ্তানীর ব্যবস্থা করার জন্য একটি সর্ব্বদেশীয় ব্যাঙ্ক (International Bank)* থাকা দরকার। তাহাতে স্ব স্ব দেশের নামে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টের কাগজ (Goverment Paper and Securities) কেনা থাকিলে স্বর্ণমান না থাকিলেও আমদানী-রপ্তানীর মূল্য দেওয়ায় অসুবিধা হয় না। এইরূপ চেষ্টা আগে হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকটি কারণে ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। বিশেষতঃ ১৯২৮ সালে ফ্রান্স সোনা ছাড়া আর কিছু লইতে চায় নাই। সেইজন্য ইহারই রূপান্তর আর একটি ব্যবস্থা করা হইল। 'Sterling Area' বলিয়া কয়েকটি দেশের সমষ্টিগত একটি বাণিজ্যস্থান ঠিক হইল। গ্রেট ব্রিটেনের সাম্রাজ্য মধ্যে যতগুলি দেশ আছে সেইগুলি—কানাডা ছাড়া—এবং পর্টুগাল, নরওয়ে, সুইডেন, জাপান, আর্জেণ্টিনা প্রভৃতি কয়েকটি দেশ এই ব্যবস্থাতে যোগ দিল (১৯৩১)। পাউণ্ড-ষ্টার্লিং ঐ সময় স্বর্ণমান বিবর্জ্জিত হইল এবং বিধিবদ্ধ মুদ্রামানে পর্য্যবসিত হইল। অন্যান্য দেশগুলি যাহারা ইহার সহিত যোগ দিল তাহারাও সোনার সহিত সম্পর্ক রাখিল না গ্রেট-ব্রিটেনে ষ্টার্লিঙে গবর্ণমেণ্ট কাগজ ইত্যাদি কিনিয়া রাখিল এবং পরস্পরের আমদানী-রপ্তানীর দাম কাটাকাটি করিয়া ঐ কাগজ দিয়া শোধ করিতে আরম্ভ করিল।

এই রকম অবস্থাতেও যেরূপ মুদ্রা-বিনিময় হারের কথা বলা হইল সেইরূপ হার কার্য্যকরী হইতে পারে। ইহা স্বর্ণমানের ন্যায় স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ কোনও দেশের হার তাহার অনুকূল হইলে ক্রমশঃ সে দেশের দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং ঐ হার আয় অনুকূল না হইয়া প্রতিকূলগামী হইয়া পূর্ব্বহারে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু যখন কোনও দেশের মুদ্রামূল্য খুবই কমিয়া যায় এবং তাহার বিনিময় হার ঠিক রাখিবার জন্য যে কাগজ-টাকা বা সোনা রাখা দরকার তাহা না থাকে তখন এই বিনিময় হারের কোনও বাধ্যবাধকতা থাকে না এবং কপিধ্বজবিহীন পার্থের রথের ন্যায় যথেচ্ছ ছুটিয়া চলে এবং কোনও মানাই মানে না। বলা বাহুল্য এ ক্ষেত্রে অন্তর্জাতীয় কাজকর্ম্ম বা আমদানী রপ্তানী করা অতীব দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়।

সুতরাং স্বর্ণমান বা বিধিবদ্ধ স্বর্ণমান স্থির করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। স্বর্ণমান ঠিক করিতে হইলে পুরানো দর ঠিক রাখার চেষ্টা বৃথা হইয়া থাকে। গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য অনেক দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সম্ভব হয় নাই। মুদ্রার মূল্য খুবই কমিয়া যাওয়ায় মাহিনা ও অন্যান্য চুক্তিমূলক দেনা খুবই বেশী দরে স্থির হইয়া গিয়াছিল। ধরা যাক ১৯১৪ সালে যে মজুর দৈনিক ১ শিলিং লইত ১৯২৫ সালে সে হয়ত ২ শিলিং পাইত। ১৯২৫ সালে যদি চেষ্টা করা যায় যে শিলিঙের মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় হইবে তাহা হইলে মজুরকেও ১ শিলিং লইতে হইত। কিন্তু তাহা কি হঠাৎ সম্ভব? সুতরাং স্বর্ণমানও বজায় রহিল, দেশের জিনিষপত্রের মূল্য ও মাহিনা ইত্যাদিও কমিল না, এইরূপ ব্যবস্থা মুদ্রামূল্যাবনতি দ্বারা করা হইয়া থাকে। মধ্য ইউরোপে মুদ্রামূল্যাবনতি অনেক দেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে মুদ্রার পরিমাণ বাড়ান হইল না কিন্তু মুদ্রার ওজন যে পরিমাণে মুদ্রার মূল্য হ্রাস হইয়াছিল সেই পরিমাণে করা হইল। তাহা হইলে সোনার মূল্য বাহিরে অর্থাৎ ব্যবহার্য্য দ্রব্য হিসাবে খুবই বেশী হইয়া গিয়াছিল এখন মুদ্রা হিসাবেও বেশী হইয়া গেল এবং তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করার সুবিধা হইল। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় হারও স্থিরীকৃত হইল, সেই

* ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাস হইতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (International Monetary Fund) নামে একটি প্রতিষ্ঠান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কও (International Bank for Reconstruction and Development) গঠিত হইয়াছে। প্রথমটি 'টাকা' আগাম দেওয়া ইত্যাদি ব্যাঙ্কের ন্যায় কতকগুলি কার্য্য করিতে পারিবে।

অনুসারে আমদানী রপ্তানী করায় কোনও বাধা রহিল না। বর্তমানে ফ্রাঙ্কের কথা ধরা যাউক, নূতন যে আইন হইল তাহাতে ২১৪·৪ ফ্রাঙ্ক এক ডলারের সমান ধরা হইয়াছে, আগে ১১৯ ফ্রাঙ্ক এক ডলারের সমান ধরা হইয়াছিল।*

এখন প্রশ্ন হইতে পারে মুদ্রাস্ফীতির সময়ও মুদ্রামূল্যাবনতি করা হয় এবং মুদ্রাস্বল্পতার সময়ও (Deflation) মুদ্রামূল্যাবনতি করা হয় তাহা কিরূপে সম্ভব? উত্তর হইতেছে যে মুদ্রাস্বল্পতার সময় যে মুদ্রার মূল্যের অবনতি করা হয় তাহা একটি আদর্শের জন্য। তখন সমাজের অবস্থার অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক সামঞ্জস্য (equilibrium in social economy) অথবা দেশের আয়ের (বার্ষিক) উৎপাদন, বিভাজন ও হিতসাধনের যাহাতে সম্পূর্ণ উৎকর্ষ হয় তাহার জন্য সৃষ্টি করা হয়। ইহাতে সোনার মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হয় এবং পরিমাণের উন্নতি করা হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় যে মুদ্রার মূল্যের অবনতি করা হয় তাহা সে রকম আদর্শানুযায়ী নহে। যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক হঠাৎ সমস্ত ওলট্‌পালট্‌ না হইয়া যায় তাহারই জন্য। এক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা অথবা সাধারণ জিনিষপত্রের মূল্যের কোনও কমি বেশী করা হইল না।

* যদিও আগে বলা হইয়াছে যে সম্ভবতঃ স্বর্ণমানে ফিরিয়া যাইবার জন্য এইরূপ মুদ্রামূল্যাবনতির চেষ্টা করা হইয়াছে তথাপি আমার ধারণা বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়ের হারের স্থৈর্য্যের জন্যও এইরূপ করা সম্ভব হইতে পারে। যেখানে কেবল বিধিবদ্ধ মুদ্রামান প্রচলিত সেখানে যদি কোনও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক থাকে অথবা পূর্ব্ব কথিত ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে মুদ্রাবিনিময়ের হার সাধারণ মূল্যের আপেক্ষিক সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিতে পারে (relative price level) কিন্তু হার ঠিক রাখিবার জন্য যথেষ্ট কাগজপত্র বা "টাকা" না থাকিলে চেষ্টা করা বৃথা বিশেষতঃ মুদ্রামূল্য ক্রমশঃই কমিতে থাকিলে হার যে কোথায় দাঁড়াইবে কেহ বলিতে পারে না। যদি সাধারণ মূল্য (price level) কেবল বদ্‌লাইয়া না যায় তাহা হইলে মুদ্রাবিনিময় হারের কিছু ইতরবিশেষ (foreign exchange method) করিলেই মোটের উপর ঠিক হইয়া যায় কিন্তু যেখানে সাধারণ মূল্য কেবলই বদ্‌লাইয়া যাইতেছে সেখানে বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় হার আইন দ্বারা ঠিক করিয়া পরে সেই অনুসারে মুদ্রাসংখ্যার ব্যবস্থা ব্যাঙ্কের সুদের (Bank rate method) দ্বারা ঠিক করাই সুবিধা। সুতরাং অন্য দেশের মুদ্রার মূল্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া দেশের মুদ্রার মূল্য কমাইলেও তাহাকে মুদ্রামূল্যাবনতি বলা যাইতে পারে।

এই প্রবন্ধটি রচনা করিবার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকাদির সাহায্য লওয়া হইয়াছে,—

ক Keynes—Treatise on money.

খ Bernstein—Money and the Economic System.

গ Smith—Economics.

ঘ Taussig -Principles of Economics, vol 1.

ঙ League of Nations publication—International Currency Experience.

চ Statesman, Eastern Economist প্রভৃতি সংবাদপত্রাদি।

ছ Bowley—Elements of Statistics.

জ S. K. Basu.—Recent Banking Developments

ভারতে রেশমশিল্প

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

গুটীপোকা নামে এক জাতীয় কীটের দেহনির্গত লালা হইতে রেশম পাওয়া যায়। ইহারা নিশাচর 'মথ'। এক একটি 'মথ' একবারে হাজার হাজার ডিম্ব প্রসব করে; দশ হইতে বার দিনের মধ্যে ডিম্ব কাটিয়া শুঁয়াপোকা বাহির হয়। এই অবস্থায় ইহাদিগকে বলা হয় পলু। এই বাচ্চাগুলি বেজায় পেটুক এবং মাসখানেক ধরিয়া নানা প্রকার বৃক্ষের পাতা আহার করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহারা তৎপর খাদ্য বন্ধ করিয়া মুখ হইতে লালা নিঃসরণপূর্ব্বক নিজ নিজ অঙ্গের চতুর্দ্দিকে যে আবরণের সৃষ্টি করে তাহাকে বলা হয় গুটী। তিন-চারি দিনের মধ্যে এই গুটী একটি পাতি লেবুর আকার প্রাপ্ত হয়। এই সময় উক্ত কীট গুটীর ভিতরে পলু হইতে পিউপা এবং পিউপা হইতে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয় এবং গুটীর একটি দিক কাটিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। একটি গুটি হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ২০০ হইতে ১,২০০ গজ দীর্ঘ রেশম-সুতা পাওয়া যাইতে পারে। কোন কোন প্রকার রেশম অবিচ্ছিন্ন নহে। উহা হইতে উপযুক্ত যন্ত্র-সাহায্যে তুলা, পাট প্রভৃতির ন্যায় পিঁজিয়া সুতা বাহির করা হয়।

রেশমশিল্পকে প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—প্রথম অংশ হইল, রেশম-গুটী উৎপাদন করা। ডিম্ব হইতে সুস্থ ও সবল কীট উৎপাদনপূর্ব্বক উপযুক্ত খাদ্য-

দানে তাহাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া গুটী তৈয়ারী করা পর্য্যন্ত এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। এই গুটীগুলি ক্রয় করিয়া গুটী হইতে সুতা বাহির করা, সুতাকাটা যন্ত্রসাহায্যে খারাপ রেশম (অর্থাৎ যে রেশম অবিচ্ছিন্ন নহে) হইতে সুতাকাটা প্রভৃতি পদ্ধতিগুলি দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত। পূর্ব্বে অবশ্য অবিচ্ছিন্ন রেশম ব্যতীত অন্য জাতীয় রেশম বিশেষ কোন কাজে লাগান সম্ভব হইত না, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুলা, পাট প্রভৃতির ন্যায় রেশম হইতে সুতা কাটিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ব্যবসায়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। রেশম-শিল্পের তৃতীয় অংশ হইল, সুতা হইতে বস্ত্রবয়ন ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি তৈয়ারী এবং আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, রেশমশিল্পের এই তিনটি বিভিন্ন অংশ, একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পুরনো আমলে এই তিনটি অংশই কুটিরশিল্প হিসাবে একই শ্রেণীর লোকদ্বারা পরিচালিত হইত। রেশম ব্যবসায়ের প্রথম অংশকে বলা হয় সেরিকালচার (sericulture), প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সম্মিলিত নাম কাঁচা রেশম শিল্প, এবং তিনটি অংশের একত্রিত নাম রেশম-শিল্প।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার কীট কর্ত্তৃক চারি প্রকার রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে :—১। তুঁত রেশম—এক কথায় ইহাকেই রেশম বলা হয়। তুঁত গাছের পাতা খাইয়া এই জাতীয় কীট জীবন ধারণ করে ; ২। এঁড়ি রেশম—এই কীটগুলি এরণ্ড গাছের পাতা খায় ; ৩। মুগা রেশম—এই জাতীয় কীটের খাদ্য হইল শাম ও হুয়ালু গাছের পাতা ৪। তসর রেশম—এই কীট আসান, শাল, অর্জ্জুন ও অন্যান্য বন্য বৃক্ষের পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

উপরোক্ত চারি প্রকার রেশমের মধ্যে প্রথম দুই প্রকারের কীটকে সেবাযত্ন দ্বারা গৃহে প্রতিপালন করা যায় ; কিন্তু অন্য দুই প্রকার রেশমকীট বনে জঙ্গলে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহারা মানুষের আয়ত্তের বাহিরে এবং এই উপায়ে রেশম যাহা পাওয়া যায় তাহা উন্নত ধরণের নহে। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার রেশম অবিচ্ছিন্ন সুতার আকারে পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার রেশম হইতে যন্ত্রসাহায্যে সুতা কাটা হইয়া থাকে। জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তুঁত রেশমই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রেশম এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইহার উৎপাদন ইত্যাদি নানা দিক দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতিসাধন করাও সম্ভব হইয়াছে। কাজেই জগতের রেশমশিল্পের ব্যবসা-ক্ষেত্রে তুঁত রেশমই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে এবং রেশমশিল্প বলিতে এক কথায় আমরা তুঁত রেশম শিল্পই বুঝিয়া থাকি।

বিভিন্ন প্রকার রেশম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্নভাবে নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে।

তুঁত রেশম

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কম বেশী তুঁত রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে জাপানই এই শিল্পে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী ; ১৯৩৪ সালে বিভিন্ন দেশ হইতে কাঁচা রেশম রপ্তানীর পরিমাণ নিম্নের তালিকা হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

দেশের নাম	শতকরা পরিমাণ
জাপান	৮২'৩
চীন	১১'০
ইটালী	৪'৯
ফ্রান্স	০'১
স্পেন	০'১
তুরস্ক, সিরিয়া প্রভৃতি	১'৬

এই বৎসর ভারতবর্ষে মোট ৭,৫০০,০০০ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা হইতে বিদেশে কিছু রপ্তানী হয় নাই। অথচ ১৮৬০ সালে শুধু বঙ্গদেশ হইতেই প্রায় ১,৬০০,০০০ পাউণ্ড কাঁচা রেশম বিদেশে গিয়াছিল ; কিন্তু জগতের রেশমের বাজারে জাপানী রেশমের আবির্ভাবই হইল রেশমশিল্পে বাংলার চরম অবনতির কারণ। অতি অল্পদিনের মধ্যেই অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া জাপান রেশমশিল্প জগতের মধ্যে শীর্ষ স্থান লাভ করিয়াছে। ১৯২৯ সনে জাপানে যে কাঁচা রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার দাম ছিল ৭০০,০০০,০০০ ইয়েন (প্রায় ১১০ কোটি টাকা) এবং উৎপন্ন রেশমজাত দ্রব্যের মূল্য ছিল ২০০,০০০,০০০ ইয়েন (৩২'৫ কোটি টাকা)।

প্রগতিশীল এবং আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নত কতকগুলি দেশ জাপান হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রেশম ক্রয় করে বলিয়াই জাপান রেশমশিল্পে এতাদৃশ সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৩৪ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাপানে উৎপন্ন রেশমের প্রায় শতকরা ৮২ ভাগ ক্রয় করিয়াছে, ১৯২৯ সনে কিনিয়াছে শতকরা ৯৭ ভাগ। মাল ক্রয় করিবার পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত যন্ত্রাদি সাহায্যে ইহারা রেশমের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া থাকে, কাজেই জাপানকে উৎকৃষ্টতর রেশম সরবরাহের জন্য যত্নবান হইতে হয়। রেশমশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই বলিয়াই বাংলাদেশ আজ রেশম-শিল্পের চরম অবনতি হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে মহীশূর, মান্দ্রাজ, বাংলা, কাশ্মীর ও জম্মু এই কয়টি অঞ্চলই তুঁত রেশমশিল্পে অগ্রণী। পঞ্জাব এবং আসামেও অল্প পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত বিহার, বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্যপ্রদেশে রেশম-উৎপাদন প্রচেষ্টা চলিতেছে। এক সময় বাংলার ছাব্বিশটি জেলায়ই গুটীপোকার চাষ হইত কিন্তু ১৯৩০ সনের কাছাকাছি সময়ে মাত্র তিনটি জেলায় অল্প পরিমাণে রেশম উৎপাদন করা হইয়াছে। প্রথম

মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে মহীশূর রাজ্যে ৫৫,০০০ একর জমিতে তুঁতগাছের চাষ হইত।

আসাম, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম প্রভৃতি স্থানে অদ্যাবধি প্রাচীন পদ্ধতিতে গৃহস্থেরা অল্প পরিমাণে গুটীপোকার চাষ করে এবং গুটি তৈয়ারী হইলে তাহা হইতে সুতা বাহির করিয়া দেশী তাঁতের সাহায্যে এক প্রকার মোটা বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। বাংলা, মহীশূর ও মাদ্রাজে সূক্ষ্ম সুতা কাটিবার যন্ত্রাদি প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, বাংলা তথা ভারতের রেশমী সুতা বা বস্ত্র জাপানের রেশমী সুতা ও কাপড় অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। জাপানে সরকারী পরীক্ষণাগারে বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত রেশম-কীটের ডিম্ব সরকার-মনোনীত ব্যক্তিদের কাছে বিক্রয় করা হয়। কারণ রেশমশিল্পের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে রেশম-কীটের সুস্থ ও সবল ডিম্ব উৎপাদনের উপর। জাপানে সরকারী তত্ত্বাবধানে ডিম্ব হইতে মথ উৎপন্ন করা হয় এবং তাহা হইতে যে ডিম্ব পাওয়া যায় তাহাই সাধারণ লোকেরা ক্রয় করিতে পারে। যদি এই ডিম্বগুলি সরকারী পরীক্ষণাগারে দোষযুক্ত বলিয়া অমনোনীত হয় তবে তাহা দ্বারা রেশম উৎপাদন করানো আইনসঙ্গত নহে। জাপানে সরকারী সাহায্য-নিরপেক্ষ ভাবে গুটি উৎপাদন আইন দ্বারা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফ্রান্স এবং ইটালীতেও বীজকীট উৎপাদন সরকারের তত্ত্বাবধানে হইয়া থাকে। কারণ উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ ডিম্ব হইতেই উৎকৃষ্ট রেশম আশা করা যায়।

গুটী তৈয়ারী হইলে কীটগুলি যথাসময়ে তাহা কাটিয়া বহির্গত হয়; কিন্তু ইহাতে অবিচ্ছিন্ন সুতা পাওয়া যায় না। সেইজন্য কীটগুলিকে, গুটী কাটিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ পিউপা অবস্থায় মারিয়া ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়ার নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত আছে। তবে বর্ত্তমান কালে প্রায় সর্ব্বত্রই সূর্য্যের উত্তাপ বা উত্তপ্ত বাষ্প-সাহায্যে দম বন্ধ করিয়া পিউপাগুলিকে ধ্বংস করা হয়। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। মৃত পিউপাগুলি দ্বারা রেশমগুটীর যাহাতে কোন ক্ষতি সাধিত না হয় তজ্জন্য আট হইতে ষোল ঘণ্টার মধ্যে মধ্যে গুটীসমূহকে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইতে হয়। এর পর গুটীগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত গুদাম ঘরে জমা করার পর বিভিন্ন ওজনের গুটীসমূহকে পৃথক করিয়া এক এক জায়গায় রাখা হয়। ইহাতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ধরণের সুতার মধ্যে একটা মোটামুটি পার্থক্য সহজে বুঝা যায়। তৎপর 'রিলিং বেসিন' নামক পাত্রে গুটীগুলি ফুটাইয়া ব্রাশ দ্বারা থেঁতলাইয়া দিতে হয় এবং যে পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সুতা না পাওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত রেশম বাদ দিতে হয়। সুতা জড়ান হইয়া গেলে সুতার গুণাগুণ লক্ষ্য করা অধিকতর সহজ; একজন্য জাপানে জড়ান সুতা পুনরায় জড়াইয়া লওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এখন নাটাই হইতে সুতা বাহির করিয়া অল্প পাক দিয়া ফেটিবদ্ধ করা হয়; প্রতি ফেটিতে প্রায় ২'৪ আউন্স রেশম থাকে, প্রতি বেলে রেশম থাকে ১৩৩'৩ পাউণ্ড।

ডিম্বের নিমিত্ত যে সমস্ত কীটকে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হইতে দেওয়া হয় সেই সমস্ত কীটের গুটী, রেশম জড়াইবার সময়ে পরিত্যক্ত অংশ এবং ইঁদুর, পিপীলিকা, পরপিণ্ডোপজীবী কীটপতঙ্গাদি কর্ত্তৃক নষ্ট গুটীর রেশমও নানা কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংলাদেশে তকলী বা টাকুর সাহায্যে এই গুটীগুলি হইতে কিঞ্চিৎ মোটা সুতা তৈয়ারি হইয়া থাকে। এই সমস্ত রেশম হইতে যে বস্ত্র বয়ন করা হয় তাহা আমাদের কাছে মটকা নামে পরিচিত। কাশ্মীর, মহীশূর প্রভৃতি স্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উপরোক্ত প্রকারের রেশমগুটী বাংলাদেশে আমদানী হইয়া থাকে। হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, বাংলাদেশে প্রায় ১৫,০০০ জন স্ত্রীলোক এই জাতীয় রেশমগুটী হইতে সুতা কাটিয়া থাকে। মহীশূর স্পান্ সিল্ক মিলস্ লিমিটেড ও জয়া স্পান্ সিল্ক মিলস্ লিমিটেড যন্ত্রসাহায্যে পরিত্যক্ত রেশমগুটী হইতে সুতা তৈয়ারী করে।

দেখা যাইতেছে, রেশম-শিল্পের প্রথম অংশ বা সেরিকালচার চাষীদের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। তদ্ব্যতীত কাঁচা রেশমগুটীর মূল্য বিশেষ ভাবে উঠা-নামা করে বলিয়া চাষীদের পক্ষে অন্যান্য কৃষির সঙ্গে রেশমের চাষ করা বিশেষ সুবিধাজনক। ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান সমতল দেশে বৎসরে সাত-আট বার পর্য্যন্ত রেশমের চাষ করা সম্ভব, কারণ তুঁতগাছে পাতা প্রচুর পরিমাণে থাকিলে একবারের মত রেশমের চাষ করিতে সময় লাগে মাত্র এক হইতে দেড় মাস। গুটী তৈয়ারী হইলে চাষীরা সঙ্গে সঙ্গেই উহা বিক্রয় করিয়া দেয়, কাজেই উহারা নগদ অর্থ লাভে বঞ্চিত হয় না। তবে শুধু রেশমচাষের জন্যই রেশমচাষ অনেক দেশেই হইয়া থাকে। বাংলাদেশে এমন পরিবারও ছিল যাহারা একই সময় প্রায় দুই হাজার পাউণ্ড রেশমগুটী উৎপন্ন করিত। প্রমাণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রেশমশিল্পের চরম উন্নতির সময় বাংলাদেশে এইরূপ পরিবার ছিল প্রায় ছয় হাজার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দেশে যদি গুটী হইতে সুতা বাহির করিবার উন্নত প্রণালীর প্রচলন ও ব্যাপক বন্দোবস্ত না থাকে তবে রেশমকীট ও গুটী উৎপন্ন করা লাভজনক নহে। বাংলার রেশমশিল্পের অবনতির ইহাও একটি কারণ।

রেশমকীটের চাষ করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তন্মধ্যে দেশের আবহাওয়া, কীটের শ্রেণীভেদ, কীটের খাদ্য, দেশের সরকারের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৭০ হইতে ৮০ ডিগ্রী ফারেনহিট্ উত্তাপ সকল অবস্থায়ই কীটের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বায়ুমণ্ডলে

জলীয় বাষ্প হ্রাস প্রাপ্ত হইলে তুঁতগাছের পাতা শুষ্ক হইয়া যায়, ফলে কীটের পক্ষে আশানুরূপ খাদ্য পাওয়া কষ্টকর হইয়া ওঠে। অন্য পক্ষে জলীয় বাষ্পের আধিক্য হইলে কীটগুলি খুব মোটা হইয়া যায় এবং রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্য বর্ষা ঋতু কীটের পক্ষে অতি দুঃসময়। বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসই কীট-উৎপাদনের প্রশস্ত সময়।

রেশমগুটী সাধারণতঃ দুই প্রকার। এক প্রকার কীট বৎসরে একবার ডিম্ব প্রসব করে; ইহাদের বলা হয় ইউ-নিভোল্ট। দ্বিতীয় প্রকার কীট বৎসরে বহুবার ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, ইহাদের মাল্‌টিভোল্ট বলা হয়। দক্ষিণ-চীন, ইন্দোচীন, শ্যাম, আসাম, মান্দ্রাজ, বাংলা এবং মহীশূরে মাল্‌টিভোল্ট কীটের চাষ হয়; কিন্তু জাপানে এবং আমাদের দেশের কাশ্মীর, জম্মু, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে ইউনিভোল্ট কীট উৎপন্ন হইয়া থাকে। একবার প্রসবকারী কীটের রেশম নানা দিক দিয়া বহুবার প্রসবকারী কীটের রেশম অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। আসাম, বাংলা প্রভৃতি স্থানে যে গুটী উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে রেশম থাকে এক হইতে দেড় গ্রেন, কিন্তু জাপানী রেশমের প্রতিটি গুটী হইতে রেশম পাওয়া যায় প্রায় ৩ গ্রেণের উপর। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইউনিভোল্ট কীটের চাষ ভাল হয় না, হইলেও উহারা ক্রমে ক্রমে মাল্‌টিভোল্ট কীটে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আবার শীতপ্রধান দেশে মাল্‌টিভোল্ট কীটের চাষ করিতে গেলে উহারা ইউনিভোল্ট কীটে পরিণত হয়। তবে বর্ত্তমানকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে এই অসুবিধা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছে।

জাপানে প্রায় ৪০০ রকমের তুঁতগাছ আছে। উহার মধ্যে মাত্র নয় রকম তুঁতের পাতাই রেশমকীটের আহার্য্য। তুঁত বিরাট আকারে বা ঝোপবদ্ধ অবস্থায় জন্মে। বাংলা, মহীশূর, মান্দ্রাজে ঝোপ-আকারে এবং কাশ্মীর, জম্মু ও পঞ্জাবে বড় তুঁতগাছ জন্মান হইয়া থাকে। জাপানের অনুকরণে বাংলাদেশে সম্প্রতি বড় ঝোঁপের আকারে তুঁতগাছ উৎপন্ন করা হইতেছে। ইহাতে খরচ অল্প হয় এবং সময়ও লাগে কম। এক একর জমিতে ৩০০ তুঁতগাছের বড় ঝোপ জন্মাইলে উহা হইতে বৎসরে ১২,০০০ হইতে ১৫,০০০ পাউণ্ড পাতা পাওয়া যায়; উক্ত পরিমাণ ছোট ঝোপ হইতে পাতা মেলে ২০,০০০ হইতে ২৪,০০০ পাউণ্ড। সেরিকালচারে সাফল্য লাভ দেশের সরকারের দায়িত্ববোধের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। জাপান এই বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য। বাংলা ও মহীশূর সরকার এই বিষয়ে জনসাধারণকে যে সাহায্য প্রদান করিতেছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

রেশম গুটান হইলে উহা বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত গুদাম-ঘরে সঞ্চিত করিয়া রাখা দেশের সরকারের উচিত। কারণ সাধারণ লোকের নিকট মাল খরিদ করিলে ক্রেতাদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী এবং ইহাতে ব্যবসায়ের দুর্নাম হইয়া থাকে, যাহা কোন ব্যবসায়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে। জাপানে ইয়াকোহামা ও কোবে বন্দরে এতাদৃশ গুদাম অবস্থিত। কলিকাতায়ও এইরূপ গুদামঘর আছে।

দেখা যাইতেছে, সকল দেশে কাঁচা রেশম উৎপন্ন করা সম্ভব নহে বটে, কিন্তু রেশমের চাহিদা সর্ব্বত্রই কম-বেশী বর্ত্তমান। সুতরাং সরকারের আনুকূল্য লাভ করিলে উপযুক্ত গবেষণার ফলে আমাদের দেশেও রেশমশিল্পের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। জাপান রেশমশিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত গবেষণাদির যে-সকল ব্যবস্থা আছে তাহা অনুকরণীয়। ১৯২৯ সনে জাপানে শুধু রেশমচাষ শিক্ষা দিবার জন্য ১৬টি স্কুল ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য অনেকগুলি কলেজ বর্ত্তমান ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে ২২৫টি স্কুলে রেশমের চাষ শিক্ষা দেওয়া হইত। টোকিও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি যে গবেষণা-কার্য্য চালায় তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কাঁচা রেশম নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণ গড়ে প্রায় ৪০,০০,০০০ পাউণ্ড, অথচ দেশে উৎপন্ন হয় প্রায় ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ২,৫০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত। যে পরিমাণ রেশমজাত দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী হয় তাহা ১৯৩৭-৩৮ সালে ছিল প্রায় ৩৬,৩৬৩,০০০ গজ। কাজেই একমাত্র দেশের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ভারতে রেশমশিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য মনোযোগী হওয়া উচিত। তবে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রেশম ব্যবহারের জন্য বর্ত্তমান যুগে প্রাণীজ রেশম ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে কিন্তু অদ্যাবধি কৃত্রিম উপায়ে রেশম উৎপাদনের যন্ত্রাদি স্থাপিত হয় নাই।

এঁড়ি-রেশম

আসাম ও বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলেই প্রধানতঃ এঁড়ি রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরণ্ডি গাছের পাতা খাইয়া এই জাতীয় কীট জীবনধারণ করে বলিয়া এঁড়ি-রেশম এণ্ডি, এরণ্ডি প্রভৃতি নামেই সমধিক প্রচলিত। এঁড়ি-রেশমের ব্যবসায় অদ্যাবধি কুটির-শিল্পের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই জাতীয় রেশম হইতে অবিচ্ছিন্ন সুতা পাওয়া যায় না। তবে তকলী বা চরকার সাহায্যে যে সুতা পাওয়া যায় তাহা পরিত্যক্ত তুঁত-রেশম হইতে প্রাপ্ত সুতা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। এঁড়ি-রেশম চাষের প্রণালী অনেকটা তুঁত রেশম চাষেরই অনুরূপ।

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গরিব চাষীরা অল্প পরিমাণে এঁড়ি-রেশমের চাষ করিয়া

থাকে। প্রচুর পরিমাণে রেশম-উৎপাদন প্রচেষ্টা অনেকবার চলিয়াছে। তবে নানারকম অসুবিধার জন্য তাহা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। একটি প্রধান কারণ হইল, রেশমগুটী উৎপাদনোযোগী যন্ত্রের অভাব। বিদেশী কোম্পানীগুলি গুটী ক্রয় করিবার নিমিত্ত যে মূল্য দিতে স্বীকৃত হয় তাহা অতিশয় নগণ্য। তবে এরণ্ডি চাষের সঙ্গে অল্প পরিমাণে এঁড়ি-রেশম চাষ বেশ লাভজনক বলিয়াই মনে হয়। মাদ্রাজ প্রদেশের চিতুর জেলায় মাত্র দুইটি গ্রামে ২৫০,০০০ হইতে ৩০০,০০০ একর জমিতে এরণ্ডির চাষ হয়। এখানে আনুষঙ্গিক হিসাবে এঁড়ি রেশমের চাষ চলিয়াছিল, তবে উল্লেখযোগ্য কোন ফললাভ হয় নাই। কিন্তু মনে হয়, বিশেষ বন্দোবস্ত করিলে এবং সরকারের সাহায্য লাভ করিলে এদেশের এঁড়ি-রেশমশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কারণ পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই এই জাতীয় রেশমের চাষ হয় না।

মুগা-রেশম

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আসামের বিভিন্ন জেলায় মুগা-রেশমের চাষ চলিয়া আসিতেছে। তবে কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলায়ই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং বৎসরের সকল ঋতুতেই সুষ্ঠুভাবে মুগার চাষ হইয়া থাকে। গারো, কাছাড়ী, রাভা প্রভৃতি আসামের বিভিন্ন আদিম অধিবাসিগণই বিশেষভাবে মুগার কীট প্রতিপালন করিয়া থাকে। ডিম্ব ফাটিয়া শুঁয়াপোকা বাহির হইলেই সেগুলি শাম, সুয়ালু গাছে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহারা গাছের পাতা খাইয়া বাড়িতে থাকে। একটি গাছের পাতা শেষ হইলে উহাদের অন্য গাছে আনয়ন করা হয়। চারি হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই যখন কীট গুটী তৈয়ারী করিবার উপযুক্ত হয়, তখন উহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া একটু যত্ন লইলেই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে উহারা গুটী তৈয়ার করে। গুটীমধ্যস্থিত পিউপাগুলি অগ্নির উত্তাপ দ্বারা মারিয়া ফেলিয়া গুটীগুলি রৌদ্রে শুকান হয়। তৎপর বিক্রয়ের নিমিত্ত পাঠানো হয়। পলাশবাড়ী এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ মুগা দ্বারা বস্ত্রবয়নশিল্পে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এঁড়ি-রেশমের ন্যায় মুগার গুটী হইতেও সুতা বাহির করা এবং সুতা হইতে বস্ত্র তৈয়ার করার জন্য কোন যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয় না। বৎসরের সকল ঋতুতেই মুগার চাষ চলিতে পারে। মুগার গুটী বাহিরে রপ্তানী হয় না।

মুগার রং স্বর্ণাভ; কাজেই নানাপ্রকার মূল্যবান বস্ত্র বয়নের নিমিত্ত ইহার বিশেষ চাহিদা আছে। তবে মুগার চাষ বিশেষ শ্রমসাধ্য বলিয়া মুগার বস্ত্রাদি দুর্মূল্য। কীটগুলি উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষের উপর বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং বাদুড়, পিপীলিকা প্রভৃতি তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিতে পারে। ঝড়-বাদলেও অনেক কীট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চীন ও জাপানের কোন কোন অঞ্চলে মুগার ন্যায় এক প্রকার রেশমের চাষ হয়। প্রতি একরে জাপানে প্রায় ছয় হাজার হইতে দশ হাজার গুটী পাওয়া যায়। বিশেষ গবেষণা সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আসামে প্রচুর পরিমাণে মুগা উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

তসর-রেশম

তসরের কীট মুগার কীট অপেক্ষা আহারে বিহারে অধিকতর যথেচ্ছাচারী। রেশম উৎপাদন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মুগার কীটকে গৃহে আনয়ন করিয়া যত্ন লওয়া যায়। কিন্তু তসর-কীটের বেলায় তাহা সম্ভব হয় না। ইহারা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে বৃক্ষের উপর বিচরণ করে, ইচ্ছানুযায়ী ভক্ষণ করে এবং সাধ্যানুসারে গুটী উৎপন্ন করে। ফলে রেশম হয় নিকৃষ্ট ধরণের। গুটী তৈয়ারী হইতে সময় লাগে এক হইতে দুই মাস। দশ বৎসর বয়স্ক কোন আশ্রয়-বৃক্ষ প্রায় ৫,০০০ কীটের আহার্য্যের সংস্থান করিতে পারে। কীট ও গুটীগুলি সর্ব্বদা পাহারা দিয়া রক্ষা করিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তসর-কীট শাল, আসান, অর্জ্জুন প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। এই সমস্ত বৃক্ষ ব্যতীতও সিধা, কালচেরী, তাল, ডুমুর, দেশীবাদাম, বহেড়া, মহুয়া, আম প্রভৃতি গাছের পাতাও ইহাদের খাদ্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তসর উৎপন্ন হয়। সিংভুম জেলাই তসরের প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র, তবে ছোটনাগপুর উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বাংলা, সংযুক্ত প্রদেশের নানাস্থানেও তসরের চাষ হইয়া থাকে। শুধু বিহারেই বৎসরে গড়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার তসর উৎপন্ন হয় এবং ইহার অধিকাংশই বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে রপ্তানী হয়।

গুটী হইতে সুতা ও বস্ত্র প্রস্তুতপ্রণালী মুগা রেশমের ন্যায়ই সেকেলে ধরণের। পনর দিনে একটি স্ত্রীলোক পাঁচ শত তসর-গুটী হইতে সুতা বাহির করিতে পারে। এই পরিমাণ সুতার ওজন হয় প্রায় ১ পাউণ্ড। অধিকাংশ সুতা ও বস্ত্র তৈয়ারী হয় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

পরিমাণের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, তুঁত-রেশমের পরেই তসরের স্থান। একমাত্র বিহার প্রদেশেই ৬০,০০০ লোক তসর-কীট উৎপাদনে নিযুক্ত আছে। তাহা ছাড়া সুতা বাহির করা, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কাজেও বহু লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। তসর-কীট উৎপাদন-কার্য্য উপযুক্তভাবে পরিচালিত হইলে তসর-শিল্পেও ব্যবসায়গত উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এস নব-বৈশাখ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নমো নমঃ বৈশাখ,
রক্তেতে রঙ্গীন এস যুগবৈশাখ,
তব অভিনন্দনে বাজে ঐ জয়শাঁখ,
বন্দিগো বৈশাখ।
দৈন্ত ও অনশন রচে দিল প্রাঙ্গণ,
স্বজনিত পশ্চাৎ সম্মুখে ভাঙ্গন।
হাঁকো তুমি শঙ্খে,
ভাঙ্গনের পঙ্কে
ফোটে ঐ ছদ্ম
স্বজনের পদ্ম,
গা'ক তব কীর্ত্তি গো হিমালয় মৈনাক।
এস নববৈশাখ।
নাচো তুমি দুর্জ্জয়, চমকাক্ বিদ্যুৎ,
আনো কালবৈশাখী, কেঁপে যাক্ শিবদূত।
বৃষ্টির ঝাপটা,
দেখাও সে দাপটা
খুলে যাক শিবজট, কেঁপে যাক সাপটা।
কড় কড় হানো বাজ, আনো ভীম ঝঞ্ঝা,
করো পাপ ধ্বংস, চাহে আজ মন যা।

হুঙ্কারি মহাকাল ডঙ্কাতে গর্জ্জায়,
শঙ্কিত চারি দিক তার ভীমনৃত্যে,
নন্দী ও ভৃঙ্গীর ঘন ঘন মালসাট্,
স্কন্ধে হাড় ঠকমক্ ভূতপ্রেতভৃত্যে।
ভারতের মানবের আজ বুঝি অন্তিম,
বন্ বন্ ঘোরে তাই ধূর্জ্জটি হস্ত,
মহামন্বন্তরের ধ্বংসের মহাপাপ
তাই নিয়ে সূর্য্য যে যাবে আজ অস্ত।
পাপে ভরা সন্ধ্যায় এলে তুমি রিখে,
রক্তেতে রঞ্জিত ধ্বংসের দৃশ্যে,
এ ভারতবর্ষ,
আজ তুমি কর্ষো,
আনো তুমি বর্ষণ করুণার বর্ষা,
শক্তি মা উদ্দাম নয় আজি হর্ষা,
করো তুমি শান্ত গো মা-কালীর খড়্গো,
হোক্ রণরঙ্গিণী শ্রীজগদ্ধাত্রী,
তব কৃপাকল্যাণে ধ্বংসের সন্ধ্যায়
আনো তুমি বৈশাখ চাঁদভরা রাত্রি।

ইন্দোচীন

গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ জগতের বিভিন্ন দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। তবে মাত্র পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে দুই-দুইটা মহাসমর সংঘটিত হইয়া যাওয়ার ফলে ইহা আজ পতনোন্মুখ, একথা জোর করিয়া বলা চলে। সাম্রাজ্যবাদ পতনোন্মুখ হইলেও সাম্রাজ্যবাদীর আশাভরসা কিন্তু এখনও নির্ম্মূল হয় নাই। তাই আজ, সদ্যগত দ্বিতীয় মহাসমরের পরেও, যখন জগতের বিভিন্ন অংশ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চলিয়াছে এবং যুদ্ধজনিত বিরাট্ ক্ষয়ক্ষতির ফলে বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বিষ-দাঁত একরূপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই সময় ইন্দোনেশিয়ায় এবং ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদের শেষ পরীক্ষা চলিয়াছে। প্রথমোক্ত অঞ্চলে ওলন্দাজ ও শেষোক্ত ভূখণ্ডে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর দল স্বাধীনতা-প্রচেষ্টাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে উদ্যত। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে তথ্য ও সংবাদাদি বিদেশে প্রেরিত হইয়া বহির্জ্জগতেও কতকটা ইহার সপক্ষে জনমত গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার কথা বাহিরে অজ্ঞাত না থাকিলেও ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ আমরা পাইতেছি না। এই সুন্দর দেশটিতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর দল আড়াই লক্ষ ফরাসী, নিগ্রো ও জার্ম্মান সৈন্ত লইয়া প্রচণ্ড ও নির্ম্মম দমননীতি চালাইতেছে। ইন্দোচীন নামেই প্রকাশ—ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং চীন উভয়েরই যোগাযোগ বিদ্যমান। বৃহত্তর ভারতে—অন্যত্রও যেমন এখানেও তেমনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তর নিদর্শন রহিয়াছে। এশিয়াবাসী যখন পরাধীনতার নাগপাশমুক্ত হইয়া স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করিতে সবেমাত্র চলিয়াছে তখন এই অঞ্চলটিতে প্রচণ্ড দমননীতি চালাইয়া ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা অশেষ অদূরদর্শিতারই পরিচয় দিতেছে। প্রত্যেক এশিয়াবাসী ইন্দোচীনের মুক্তি-সংগ্রামে সহানুভূতিশীল। তবে নিরীহ ইন্দোচীনবাসীদের আর্ত্তনাদ বাহিরে সেরূপ পৌঁছাইতেছে না। স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশেও যাহাতে তাহাদের সপক্ষে জনমত গঠিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

ইন্দোচীনে পাহাড়ের উপর বৌদ্ধ শ্রমণদের একটি 'ওয়াট কু' বা ধ্যানধারণার নিভৃত স্থান

ঠাট্‌কে'র একটি মন্দিরে একপ্রকার বাদ্য দ্বারা অপদেবতার তৃপ্তিবিধানরত যাদুকরীগণ

আঙ্কোর ভাট গামী রাজপথের পার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীনকালের একটি সর্পমূর্ত্তি

হয়ে নামক স্থানের একটি প্রমোদোদ্যানে স্বামীসহ আনামী রাজকন্যা
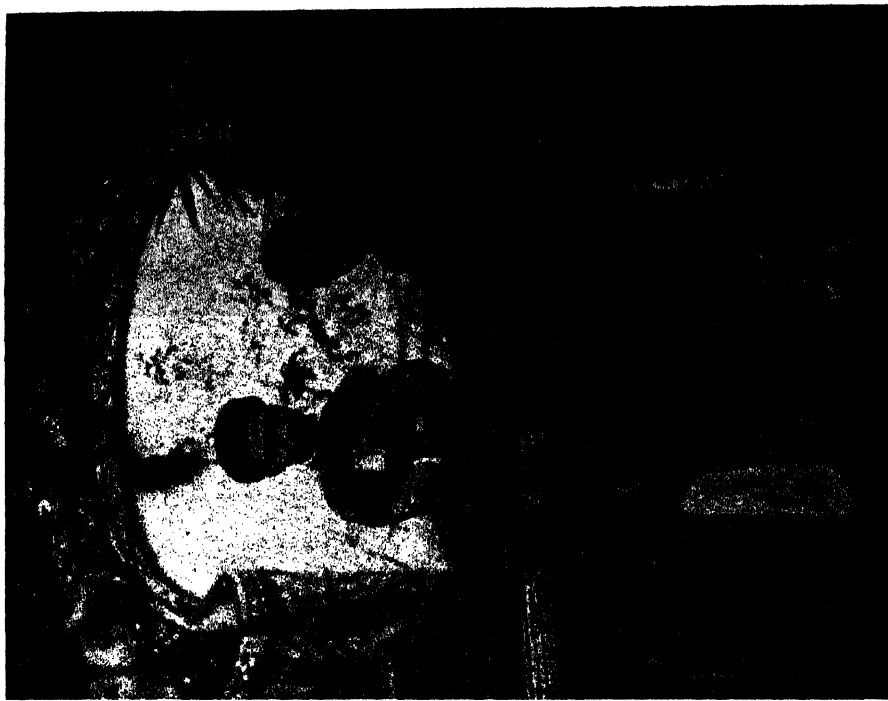
চৈতন্যদেব —শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন

ভারতীয় চিত্রকলায় রচনাশৈলী

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় চিত্রকলা বলতে বিশেষ ধরণে আঁকা ‘ঐতিহাসিক ঘটনা বা পৌরাণিক কাহিনীর ছবিই বোঝাত—যেমন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, পরলোকগত সুরেন গাঙ্গুলী প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীর ছবিগুলো জল-রঙের ‘ওয়াশ’-এর ছবি বা টেম্পারা রঙে মুঘল বা রাজপুত ধরণে আঁকা ছবি। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রানুমোদিত দেহের গঠনভঙ্গী বা রাজপুত-মুঘল চিত্রকলায় অনুসৃত গঠনকৌশলই এঁরা মেনে চলতেন। ফলে মাঝে এমন একটা সময় এসেছিল যখন শুধু ঐ বিশেষ আঙ্গিকের পুনরাবৃত্তিই চলছিল। রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে নূতনত্বের অভাবে ছবি গতানুগতিক হয়ে পড়ছিল—সর্ব্বোপরি ছবি হয়ে উঠছিল প্রাণহীন—নীরস।

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ শুধু একটা নূতন আঙ্গিকই সৃষ্টি করেন নি—তিনি চিত্রকলায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কি করে এই ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি সৃষ্টি হ’ল—সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘পুরাতন ছবিতে দেখলুম ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে দিয়েছে সোনা রূপা সব। কিন্তু একটি জায়গায় ফাঁকা, তা হচ্ছে ভাব, কোথাও কোন কার্পণ্য নেই; কিন্তু ভাব দিতে পারে নি। মানুষ আঁকতে সবই যেন সাজিয়ে সাজিয়ে পুতুল বসিয়ে রেখেছে। আমি দেখলুম, এইবারে আমার পালা। ঐশ্বর্য্য পেলুম, কি করে তার ব্যবহার তা জানতুম, এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে। বাড়ী এসে বসে গেলুম ছবি আঁকতে, আঁকলুম “সাজাহানের মৃত্যু”।’ আজকের দিনে যখন বাংলার চিত্রশিল্পে নানাদেশীয় প্রভাব এসে পড়ছে এবং নানাবিধ রচনাশৈলীর পরীক্ষা চলছে তখন একথাগুলো বিশেষ করেই মনে রাখা দরকার—নইলে ছবির ভাব ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের মত অসামান্য প্রতিভাশালী শিল্পী বিরল। তাঁর রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে যে দুর্লভ শিল্প-প্রতিভা এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়—তার তুলনা খুব কমই মেলে। ভারতীয় চিত্রকলায় যে ধারা তিনি বইয়ে দিয়েছেন, নূতন নূতন পথে প্রবাহিত হয়ে তা নব নব রূপরসের সৃষ্টি করে চলেছে। ভারতীয় চিত্রশিল্পে দেখা দিয়েছে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন রচনাশৈলী এবং নূতন বিষয়বস্তু। শিল্পকলা তাতে প্রাণবন্ত হয়েই উঠেছে।

দৃষ্টিভঙ্গীর নূতনত্ব, রচনাশৈলীর অভিনবত্ব নন্দলালের শিল্পসৃষ্টিতে সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে। কোন বিশেষ শৈলীতে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি—তাই দেখি তাঁর সাধনার পথ বৈচিত্র্যে ভরপুর। পৌরাণিক কাহিনীর অনবদ্য রূপায়ণ যেমন তাঁর ছবিতে দেখি, তেমনি দেখি আধুনিক কালের ছবিতে নূতন নূতন আঙ্গিক নিয়ে নব নব পরীক্ষা। তাঁর আঁকা “শিব”, “সতীর দেহত্যাগ” ইত্যাদি মহাভারতের ছবিগুলো ভারতীয় শিল্পের অতুলনীয় সৃষ্টি। শান্তিনিকেতনের দৃশ্যাবলী, ঝড় এবং মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার ছবিগুলিতে রচনাশৈলীর

গুরুশিষ্য —শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন পথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন। চৈতন্যের জন্ম, যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা ইত্যাদি ছবিগুলো আর একরূপ আঙ্গিকে সার্থক সৃষ্টি।

যামিনী রায় প্রথম জীবনে পাশ্চাত্ত্য রীতিতে ছবি এঁকে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন; কিন্তু সে ধারা বর্জ্জন করে ভারতীয় শিল্পে এক নূতন রচনাশৈলী তিনি প্রবর্ত্তন করেছেন—রসিক-সমাজে তাঁর ছবির বিশেষ কদর হয়েছে। আমাদের দেশের আগেকার দিনের পটুয়ারা যে পট অঙ্কন করত, তাতে তুলির জোর ছিল এবং রং ও রেখার বাহুল্য বর্জ্জন করে ছবির এক সহজ কিন্তু সরস রূপ তারা সৃষ্টি করেছিল; কিন্তু অশিক্ষিত শিল্পীমনের ছাপ তাদের ছবিতে প্রকট থাকত। যামিনীবাবুর ছবিতে পটের ছাপ আছে, কিন্তু শিক্ষিত শিল্পীর তুলিকা অল্প রং এবং সামান্য কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখার বিন্যাসে বিশিষ্ট এক রচনাশৈলী সৃষ্টি করেছে। প্রথম দৃষ্টিতে পট বলেই মনে হয়—কিন্তু যামিনীবাবুর ড্রয়িং অত্যন্ত জোরালো এবং ভাবব্যঞ্জক—পটচিত্রের সঙ্গে তাঁর ছবির পার্থক্য ওখানে। যামিনী বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করার সৌভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের হয়েছিল। ১৯৪১ সনে রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়ায় যান। সেই উপলক্ষে একটা কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। শিল্পবিভাগের ভার পড়ে আমার উপর। বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের ছবি সেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। সেবারে ছবি সংগ্রহের জন্য যামিনী বাবুর কাছে গিয়ে পটের পদ্ধতিতে আঁকা কিছু ছবি আমাদের প্রদর্শনীর জন্য দিতে অনুরোধ করেছিলাম। সেই সময় ছবি সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর মুখে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পটের ছবির সঙ্গে তাঁর ছবির প্রভেদ কোথায় তাও বুঝিয়ে বলেছিলেন। হুবহু পটের অনুকরণেই ছবি তিনি আঁকেন, এ রকম একটা ভুল ধারণা তখন আমার ছিল—মনে হয় এ রকম ভুল ধারণা অনেকেরই রয়েছে।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীও নিত্য নূতন ধরণের চিত্ররচনার সাধনায় নিমগ্ন। তাঁর বুদ্ধের ছবিগুলো এবং রামায়ণের ছবি রচনারীতির অভিনবত্বে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করে। তাঁর আঁকা "সাঁওতাল নৃত্য", "বাজার" এবং টেম্পারা রঙের দৃশ্যচিত্রের ছবিগুলিতেও ভারতীয় চিত্ররীতির গতানুগতিক ছাপ নেই। একই গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে সুন্দরের রূপকে তিনি সঙ্কীর্ণ করে তোলেন নি। রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই তাঁর শিল্পসাধনা অগ্রসর হচ্ছে। সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিগুলিতে যদিও নূতনত্বের প্রবল ছাপ নেই, তবু ছবির প্রধান বস্তু যে রস, তা সেগুলোতে পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্যমান। তাঁর আঁকা, "মা", "যশোদা ও কৃষ্ণ", "গুরুশিষ্য" ছবিগুলি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শান্তিনিকেতনের বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চিত্রাবলীর রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন দুটোই তাঁর বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। শান্তিনিকেতনের দেওয়ালে আঁকা

এঁর ফ্রেস্কোগুলি নয়নানন্দকর। তথাকথিত ভারত-শিল্পের গতানুগতিক রচনারীতি এঁর ছবির মধ্যে নেই।

গগনেন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলায় এক নূতন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পে তিনিই কিউবিজমের প্রবর্ত্তন করেন। রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে তাঁর দান সামান্য নয়।

নূতন নূতন পথ অবলম্বন করে গোপাল ঘোষ, শুভো ঠাকুর এঁরাও খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু উৎকট অভিনবত্বে এদের রচনা চোখ এবং বিশেষ করে মনকে মাঝে মাঝে পীড়াই দেয়। শৈলীর নূতনত্বই যখন শিল্পীর মনকে বেশী অধিকার করে থাকে—তখন ছবিতে ভাবব্যঞ্জনা বা রস ক্ষুণ্ণ হয়। তবুও এঁদের ছবিতে রেখা ও রঙের সমাবেশ জোরাল; তা ছাড়া মনে হয় নূতন নূতন পথ অনুসরণে যে সাহসের দরকার, তা এঁদের যথেষ্ট আছে।

মা ও ছেলে —শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনতম শিল্পীদের মধ্যে অনেকে বাংলার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছবি এঁকে খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁদের রচনানীতিও গতানুগতিক নয়; এদের তুলিতেও জোর আছে, কিন্তু কতকগুলি ত্রুটি এঁদের ছবিতে সুপরিস্ফুট। শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, তোমাদের এই সব ছবিতে যখন ল্যাণ্ডস্কেপ আঁক, তখন গাছের গোলাকৃতি বা জমির উঁচুনীচু বোঝাতে যতটা আলোছায়ার ব্যবহার কর—সেই ছবিতেই মানুষ বা জীবজন্তুর বেলায় ততটা কর না; ফলে একই ছবির মধ্যে দু-ধরণের টেক্‌নিক প্রয়োগ কর। পরিপ্রেক্ষিত দেখাবার বেলায় সামনের জিনিষ বড় করেই আঁক, দূরের জিনিষ ছোট করেই আঁক। কিন্তু সেই ছবিতেই সামনের জিনিষ ও দূরের জিনিষ প্রায় একই রকম ফিনিশ কর, মুঘল বা রাজপুত ছবির মত। আর যে-ধরণের ছবি তোমরা আঁক, তাতে ওয়াশ বা টেম্পারাতে ছবি না ক'রে, তেলরঙে আঁকলে ছবি আরো ভাল হয়।

পাহাড়ী মেয়ে —শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

আচার্য্য নন্দলাল এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—তোমাদের "ছবিগুলি অনেকটা ফটোর মত হয়ে যাচ্ছে। ছবির রূপ আলাদা, আর ফটোর রূপ আলাদা। নেচার থেকেই আঁকবে, কিন্তু আঁকবে ছবির রূপ—শিল্পদৃষ্টিতে ছবি আঁকবে। আর ফটোর মত হচ্ছে বলেই expressive (ভাবব্যঞ্জক) হচ্ছে না—ছবির প্রধান বস্তু যে রস, তোমাদের ছবিতে তার অভাব থেকে যাচ্ছে। expression বা ভাবব্যঞ্জনার অভাবে মানুষগুলো যেন সাজান পুতুলের মত মনে হয়।" উপদেশ দিয়েছিলেন (পৌরাণিক বিষয়) নিয়ে ছবি আঁকতে—তাতে ভাবব্যঞ্জনার দিকে আপনিই বেশী নজর পড়বে।*

স্বাধীন ভারতে আমাদের জাতীয় জীবনের আজ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা চলছে—চিত্রকলার ক্ষেত্রেও বাংলাকে গৌরবমণ্ডিত করে তুলতে হবে নূতন ভাবধারা, নূতন বিষয়বস্তু এবং রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যে।

* এ সম্বন্ধে ১৩৫৩ সনের পৌষের প্রবাসীতে লেখকের 'শিল্পপ্রসঙ্গে আচার্য্য নন্দলাল' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মহিলা-শিল্পী শ্রীঊষা সেনগুপ্তা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

একথা সত্য যে, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সুকুমার শিল্পে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিবার জন্য উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক এবং

১নং চিত্র

শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। যথোচিত শিক্ষাদ্বারা পরিমার্জ্জিত না হইলে সহজাত শক্তির আশানুরূপ বিকাশ হয় না এবং উৎসাহের অভাবে শিল্পীর সৃষ্টিপ্রেরণাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও যে দেখা যায় তাহার প্রমাণ নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে মহিলা-শিল্পী শ্রীঊষা সেনগুপ্তার দীর্ঘকালব্যাপী একাগ্র শিল্পসাধনা। এই মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের বধূ, সুদূর মফস্বলে লোকচক্ষুর অন্তরালে বহুকাল যাবৎ শিল্প-কলার সাধনায় রত আছেন। কোন শিল্প-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ তিনি পান নাই অথবা কোন শিল্পাচার্য্যের নিকটেও তাঁহার শিল্পশিক্ষার হাতে খড়ি হয় নাই। আপনার শিল্পী-মনের খেয়ালেই আজ দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যাবৎ তিনি মাটি দিয়া মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়িয়া চলিয়াছেন। মাটির মূর্ত্তি ভঙ্গুর, মাটির দেহের মত তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। তাঁহার গড়া অধিকাংশ মৃন্মূর্ত্তিরই চিহ্নমাত্র আজ বিদ্যমান নাই; মাটির গড়া মূর্ত্তি মাটিতেই বিলীন হইয়া গিয়াছে।

নিজের কাজকে কি ভাবে স্থায়ী করা যায়, সে বিষয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। মফস্বলে প্রস্তর দুষ্প্রাপ্য, কাজেই পাথর দিয়া মূর্ত্তি গড়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। নানারূপ পরীক্ষণ চলিল—শেষে তিনি ইট খোদাই করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সুরু করিলেন। ইহাতে তিনি কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছেন বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট ইষ্টকমূর্ত্তিসমূহের প্রতিচ্ছবি তিনটিই তাহার প্রমাণ।

এই মহিলা-শিল্পীর জন্মস্থান কুমিল্লা। তাঁহার পিতা পরলোকগত রজনীকান্ত দেব। তিনি কুমিল্লা বারের একজন শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অধ্যয়ন ছিল বহুবিস্তৃত। তাঁহার শ্রীমুখাৎ দেবদেবীর বর্ণনা ইত্যাদি শুনিয়া অতি শৈশবেই শ্রীমতী ঊষার মনে অস্ফুটভাবে রূপসৃষ্টির প্রেরণা জাগে। তাঁহার নিজের কথায়ই বলি—

"...কোন রকমে ম্যাট্রিকটা দেই। তার পর হইতে গৃহকর্ম্মের অবসরে দিন রাত কত কষ্ট করিয়াই যে চর্চ্চা রাখিয়াছি তাহা একমাত্র ভগবান জানেন। কুমিল্লায় দুই বার এগজিবিশন হয়, তাহাতে এবং কয়েকবার সরস্বতী পূজায় মূর্ত্তি গড়িবার সুযোগ পাই এবং এগজিবিশনে পুরস্কার লাভ করি। তখন বয়স মাত্র ১৬।১৭ ছিল। কুমিল্লার রাজনৈতিক নেতা শ্রীযুক্ত

২নং চিত্র

অখিল দত্তের বাড়ীতে আমার গড়া কয়েকটি মূর্ত্তি ছিল। প্রসিদ্ধ নেতা অধ্যাপক রঙ্গ একবার কুমিল্লা আসিয়া মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া খুশী হন ও একটি মূর্ত্তি মাদ্রাজে লইয়া যান।"

শিল্পী শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্তের সহিত বিবাহের পর শ্রীমতী উষা ত্রিপুরা জেলার নাছিরনগর গ্রামে তাঁহার মামাশ্বশুরের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। শহরের কোলাহল হইতে বহুদূরে অবস্থিত এই ছায়ানিভৃত পল্লীগ্রামটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার শিল্পীমনকে মুগ্ধ করিল। গ্রামের উত্তর প্রান্তসীমা দিয়া প্রবহমাণ লঙ্খন নদী আর তাহার ওপারের মেদীর হাওরের দৃশ্য-সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এখানকার প্রকৃতির নব নব রূপবৈচিত্র্য এই মহিলা-শিল্পীকে আত্মপ্রকাশের বেদনায় আকুল করিয়া তুলিল। মাটির কাজ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া তিনি সুরু করিলেন ছবি আঁকা—সেগুলি মুখ্যতঃ দৃশ্য-চিত্রাঙ্কন।

৩নং চিত্র

নছিরনগরে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি স্বামীর সহিত তাঁহার কর্ম্মস্থল শ্রীহট্টে চলিয়া যান, সম্প্রতি সেখানে মূক-বধির বিদ্যালয়ে শিল্পকলার শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত আছেন। ইদানীং তিনি মাটির মূর্ত্তিগুলিকে কি ভাবে দীর্ঘস্থায়ী করা যায় এবং মৃন্মূর্ত্তিতে পাথরের ধর্ম্ম (Character) ফোটানো যায় সে সম্বন্ধে

শ্রীউষা সেনগুপ্তা

নানারূপ পরীক্ষা করিতেছেন। এই মহিলা-শিল্পীর পক্ষে পরম গৌরবের কথা এই যে, তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

বাংলাদেশে মহিলাদের মধ্যে ভাস্কর্য্য-শিল্পে কেহ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। শ্রীউষা সেনগুপ্তার সহজাত শিল্পপ্রতিভা এবং নিপুণ হস্তের পরিচয় তাঁহার ইট খোদাই মূর্ত্তিগুলির প্রতিচ্ছবিতেই পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ ইটের গায়ে শিল্পসুষমা ফুটাইয়া তুলিতে তিনি যে কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, উপযুক্ত সুযোগ পাইলে তাহার নিপুণ হস্ত-স্পর্শে পাষাণের কঠিন-গাত্রেও অপরূপ শিল্পমাধুরী বিকশিত হইয়া উঠিবে।

সামঞ্জস্য

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

নলিনী চৌধুরীর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এত বয়স বাঙালী বড় একটা পায় না। এই তার আশী চলছে। তবে ইদানীং তিনি একটু কাহিল হয়ে পড়েছেন। নানা প্রকার ছোট-খাটো ব্যাধি তাঁর লেগেই আছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ছোট বড় কোন বিধিনিষেধই তিনি মেনে চলতে চান না। এই নিয়ে কিছুদিন যাবৎ তাঁর বড় এবং একমাত্র পুত্র সুধীরের সঙ্গে মতান্তর চলেছে। ফলে সুধীর পিতাকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে পড়েছে।

সুধীরের স্ত্রী শোভনা বললে, বুড়ো বয়েসে অমন লোকের একটু হয়েই থাকে। তা নিয়ে রোজ রোজ কথা বাড়িয়ে লাভ কি!

সুধীর একটু উষ্ণ কণ্ঠে বললে, যাকে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় সে-ই তার মর্ম্ম বোঝে। তুমি বুঝবে কি!

শোভনা হাসিমুখে জবাব দিলে, তা বটে! সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত যাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হয় ঝঞ্ঝাট পোহাবার মর্ম্ম তারই বেশী বোঝার কথা!

কথাটা মিথ্যে নয়। সুধীর নীরব থাকে। তা ব'লে পিতার সম্বন্ধে সে মোটেই অমনোযোগী নয়। আপিসে যাবার পূর্ব্বে সে রোজই সেদিনের ঔষধ থেকে আরম্ভ ক'রে আহার-বিহারের একটা সুপরিকল্পিত রুটিন করে দিয়ে যায়। স্ত্রীকে উপদেশ দেয় সেই অনুযায়ী কাজ করতে, বাপকে অনুনয় করে সেই ভাবে চলতে। কিন্তু সুধীর বাড়ীর বাইরে পা বাড়াতেই নলিনী চৌধুরী পুত্রের সকল বিধিনিষেধ, অনুনয়-বিনয় লঙ্ঘন করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। সন্তর্পণে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হন। শোভনাকে উদ্দেশ করে বলেন, তোমার নিতাই এখনও বাজার থেকে ফিরে আসে নি বুঝি মা? হতভাগা আজ বাজারসুদ্ধ কিনে আনবে দেখছি!

শোভনা হাসিমুখে প্রতিবাদ জানায়, সে ত অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে। কিন্তু আপনি আবার এই রোগা দুর্ব্বল শরীর নিয়ে উঠে এলেন কেন বাবা।

নলিনী বলেন, অসুখ মনে করলেই অসুখ মা, নইলে কি এমন হয়েছে। বরং দিন-রাত শুয়ে থেকে থেকে সর্ব্বাঙ্গে আমার বাত ধরে গেল।—কথা বলতে বলতে ততক্ষণে তিনি রান্নাঘরে প্রবেশ করেছেন। শোভনা একখানি আসন পেতে দিতেই তিনি নিঃশব্দে উপবেশন করলেন। ভৃত্যকে উদ্দেশ করে বললেন, আজ কত করে মাছ নিয়ে এলে নিতাইবাবু। টুকরোটি বেশ পাকা রুই থেকেই এনেছ দেখছি।

নিতাই হাসিমুখে জবাব দেয়, আজ্ঞে, পাকা রুই সস্তায় পাওয়া গেছে, কিন্তু সিঙ্গিমাছ পুরো চার টাকা সেরে আনতে হয়েছে।

শোভনা ধমক দিয়ে বলে, মাছের দাম নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না নিতাই। কাজ না থাকে ত যাও।

নিতাই একটু অপ্রস্তুতভাবে দ্রুত প্রস্থান করে।

নলিনী চৌধুরী আপন খেয়ালেই মাথা নেড়ে বলেন, নিতাই কিছু মিথ্যে বলে নি। দেশে যে পরিমাণ রোগের মরসুম পড়েছে তাতে রুই কাতলা খাবার লোকেরই যে অভাব মা।

নলিনী চৌধুরী থামতে পারলেন না। কোন দূর অতীতের স্মৃতি যেন অকস্মাৎ তাঁকে মুখর করে তুলেছে। তিনি বলে চললেন, 'সে দিনের কথা আজ তোমাদের কাছে গল্প বলেই মনে হবে। তোমাদের কেন, সময়েতে আমার নিজেরও ভুল হয়ে যায়।'—শোভনা চুপ ক'রে থাকে। বুড়ো শ্বশুরের কাছে তাঁর বাল্যকালের গল্প শোনা ওর প্রতিদিনের একটি নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। রোজই তাকে সেই একই কথা ধৈর্য্য সহকারে শুনতে হয়। লা'গেও মন্দ নয়। তার একক নিঃসঙ্গ জীবনপথে বৃদ্ধ শ্বশুর ছোট একটি শিশুর মতই তার চেতনাকে মধুর ভাবে ঘিরে আছে।

নলিনী চৌধুরী পুনরায় বলেন, তোমাদের মহামূল্য সিঙ্গিমাছ আমাদের ছোটবেলায় পয়সায় এক থালুই পাওয়া যেত। চার আনার মাছ কিনলে একটা লোক দরকার হ'ত তা বয়ে নিয়ে আসতে। অন্য মাছেরও অভাব ছিল না। আর সে সব কি তোমাদের এই বরফ দেওয়া মাছ—এমনি চটাচটা পুঁটি মাছ ভাজা মুশুর ডালের সঙ্গে আট দশ গণ্ডা এক এক জনে আমরা খেয়ে ফেলতাম। সে মাছে তেলের দরকার হ'ত না মা। মাছের তেলই যথেষ্ট। মাছের তেমন স্বাদ যেন ভুলেই গেছি।

নলিনী চৌধুরী থামলেন। জিভের সাহায্যে ঠোঁট দুখানা বারকয়েক ভিজিয়ে নিয়ে পুনরায় সোৎসাহে আরম্ভ করলেন, সেদিনের কথা আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। মাছ-মাংসের চিরদিনই আমি ভক্ত। গ্রামের বাড়ীতে অন্ততঃ পাঁচ-ছ'গাছা ফেঁকা জাল সব সময়ের জন্য মজুত থাকত। কোনটা বজুরি ট্যাংড়া ফাঁস, কোনটা পুঁটির ফাঁস, কোনটা বা ভাসা মলান্তির। মোটের উপর মাছের আকার বুঝে ফাঁসের নাম। সবচেয়ে বড় ফাঁসের জাল হ'ল রুই, কাতলা, বোয়াল ধরবার জন্য। সে যুগে ক'টা লোক আর মাছ কিনে খেত মা।

মাছের কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধ সহসা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। মুদ্রিত নেত্রে চুপ করে বসে থাকেন। শোভনা কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্বশুরের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। একটা চোখ এবং একখানা কান তার সর্ব্বদা সজাগ রয়েছে। আহা বুড়ো মানুষ। শিশুর মত অসহায়। ছোট ছেলেরই মত অকারণ অভিমানী।

শোভনা জিজ্ঞেস করে, তারপর বাবা?

নলিনী চোখ খোলেন। মৃদু কণ্ঠে বলেন, সুধীরের মার রান্নার খুব খ্যাতি ছিল। তোমাদের আজকালকার মত রান্না সে নয়। নিতান্তই সাধারণ রান্না। কিন্তু সে কি ভুলবার কথা মা—আজও মুখে তা লেগে আছে।—বৃদ্ধের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এর পরে কথার ধারা যে কোন্ পথে যাবে এ যেন সহজ সংস্কারবশেই শোভনা টের পায়। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যই সে একমুখ হেসে বলে, কেন বাবা আমরা বুঝি একেবারেই রাঁধতে শিখি নি?

নলিনী সহজ কণ্ঠেই জবাব দেন, সে কথা আর বলি কি করে মা! রাঁধ তোমরা ভালই। তার চেয়েও ভাল তোমাদের রান্নার নামগুলো। কালিয়া, কোপ্তা অথবা কোর্ম্মার নাম সে যুগে তাঁরা জানতেন না। কিন্তু একই ঝোলের রকমারি স্বাদের বুঝি তুলনা হয় না।

শোভনা প্রশ্ন করে, মা বুঝি খুব ভাল রান্না করতেন বাবা?

নলিনী উৎসাহিত হয়ে উঠেন। পরমুহূর্তেই চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা বেদনার ভাব ফুটে ওঠে। তিনি মৃদু কণ্ঠে বলেন, তাই ত সকলে বলত মা। ভালো রান্নার মূল রহস্যটি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কোন্ মাছের সঙ্গে বেগুন আর বড়িভাজা দিলে, কোন্ মাছটি ঝোলের চেয়ে ভাতে কিংবা কোনটি পাতুরি করলে মুখরোচক হবে একথা কেউ কোনদিন তাঁকে শিখিয়ে দেয় নি, অথচ সকলের রুচির সঙ্গে তাঁর রান্নার চমৎকার সমন্বয় ছিল।

শোভনা মৃদুকণ্ঠে বলে, চেষ্টা ত করি বাবা কিন্তু হয় না যে—

বৃদ্ধ যেন সহসা অনেকখানি সজাগ হয়ে ওঠেন। না জেনে পুত্রবধূকে কোন প্রকার আঘাত করে বসেন নি ত! তিনি বারকয়েক মাথা নেড়ে বলেন, কে বলে হয় না মা! এই যে সেদিনে তুমি পাবদা মাছ বড়িভাজা আর ধনে শাক দিয়ে রেঁধেছিলে। বলি নি তোমায়, এমনটি বহুদিন খাই নি? সুধীরের মা চলে যাওয়ার পর এমন স্বাদ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম? তোমার ঐ সিঙ্গিমাছের ঝোলটাই মা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

শোভনা মৃদু কণ্ঠে বলে, কিন্তু ও ছাড়া যে আপনার আর কিছু সহ্য হয় না।

বৃদ্ধ ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন,—'সহ্য হয় না' তোমায় কে বললে মা? সুধীর বুঝি এই সব তোমায় বুঝিয়েছে? মিথ্যে কথা, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। এ কি তোমার আজকালকার ভেজাল খাওয়া শরীর যে একটুতেই ভেঙ্গে পড়বে? এই বুড়ো হাড়ে এখনো কথা কয় মা। চেয়ে দেখ ত তুমি, এতখানি বয়েসেও একটি দাঁত পড়েছে আমার? জান, এখনও মাংস চিবিয়ে খেতে পারি আমি!

শোভনা বাধা দিয়ে বলে, খেতে পারা আর সহ্য হওয়া না হওয়া ত এক কথা নয় বাবা?

বৃদ্ধ পুনরায় গরম হয়ে উঠলেন, এ তো তোমার কথা নয় মা। নিশ্চয় সুধীরের ডাক্তারও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে। আমার কি সহ্য হবে আর কি হবে না সে কথা ব'লে দেবে ডাক্তার! ওরা পাগল, একেবারে বদ্ধ পাগল। এই তোমায় আমি বলে রাখছি ও ডাক্তারের কোন বিধানই আমি আর মানব না। তুমি বরং তোমার খুড়োমশায়কে একটা খবর পাঠাও। শুনেছি তিনি বড় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, তাঁকে দিয়েই চিকিৎসা করাব।

শোভনা আপত্তি জানায়, আমার কাকা হোমিওপ্যাথ নন্ বাবা—

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বললেন, বয়স হলে অমন ভুলভ্রান্তি একটু আধটু হয়েই থাকে। তিনি যে বড় কবরেজ সে কথাটা আমার মনেই ছিল না।

শোভনা হেসে বললে, এর দুয়ের কোনটাই তিনি নন্ বাবা। কাকাবাবু এলোপ্যাথ চিকিৎসক।

বৃদ্ধ বলে উঠলেন, এ হতেই হবে। যেমন সুধীর তেমনি তার ডাক্তার। মাথায় আমার কিছু আর রাখে নি। না খেতে দিয়ে দিয়ে মাথার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে ফেলেছে। —তিনি একটু থেমে পুনরায় বললেন, তা বলে চিকিৎসকের যে নামই তোমরা দাও না কেন—মূলত সব চিকিৎসাই এক মা। শুধু নামেরই রকমফের।

শোভনার মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল, কিন্তু কোন প্রতিবাদ এল না। বরং কি ভাবে সিঙ্গিমাছ রান্না করবে শ্বশুরকে সেই কথাটাই ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে। এমনি ধারা কিছুদিন ধরে তাঁকে জিজ্ঞেস করে আসতে হচ্ছে। পরিষ্কার করে কথাটা শুধাতে তার আটকায়। মোট কথা ডাক্তার এবং স্বামীর অনুজ্ঞায় যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও শোভনা কোনমতেই শ্বশুরের পাতে শুধু মাত্র রুগীর পথ্য তুলে দিতে পারছে না। এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গেও তার বাদানুবাদ লেগেই আছে।

সুধীর বলে, ব্যাধির চিকিৎসা দরকার।

শোভনা বলে, রোগ যাঁর নিছক বার্দ্ধক্য তাঁকে চিকিৎসার নামে উপোস করিয়ে মারতে আমি পারব না।

সুধীর বিস্তর চেঁচামেচি করলেও প্রতিবাদের অভাবে তা

আপনি বন্ধ হয়ে যায়। এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় নরম সুরে বলে, আচ্ছা এই করে যে তুমি বাবার কত বড় ক্ষতি করছ এ কথাটাও কি তুমি কিছুতেই বুঝবে না ?

শোভনা বলে, কথাটা যেদিন বুঝব সেদিনে আর এত কথার দরকার হবে না। কিন্তু দোহাই তোমার, সব কথা না জেনে মিথ্যে গোল কর না।

সুধীরকে থামতে হয়। কিন্তু কথাটা শোভনা ভুলতে পারে না। এবং পারে না বলেই প্রতিদিন একবার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে জিজ্ঞেস করে। বৃদ্ধ সব খবর রাখেন না। রাখবার কথাও নয়। তাই প্রত্যহ তাঁকে রান্নাঘরে দেখা যায়। দেখা যায় খাদ্য নিয়ে নানা প্রকার আলোচনা করতে, সিঙ্গি মাছের প্রতি তাঁর নিদারুণ অনাসক্তির কথাটা প্রকাশ করতে।

শোভনার প্রশ্নে বৃদ্ধ যেন সজাগ হয়ে উঠেছেন, তুমি কি আজ আমায় সিঙ্গিমাছ খাওয়াতে চাও ?

পাকা রুই মাছের টুকরোটা তখনও সম্মুখেই পড়ে আছে। সেই দিকে চোখ পড়তে শোভনা যেন কেমন লজ্জিত হয়ে পড়ল। নম্র কণ্ঠে বললে, আপনি যে সকালবেলা আপনার পেটের গোলমালের কথা বলছিলেন।

বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন, বলেছিলাম বুঝি ! ভুল বলেছিলাম মা। আসলে গোলমাল আমার পেটের হয় নি, হয়েছে আমার মাথার। এক বলতে আর বলি। বুড়ো বয়সে চিন্তাশক্তির অবসাদ ঘটেছে।

শোভনার ঠোঁটের কোণে পুনরায় একটুখানি করুণ হাসি দেখা গেল। চোখ মুখ স্নেহ মমতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। আহা, অসহায় বৃদ্ধ। যত জ্বালা হয়েছে তার। মোটকথা স্বামীর রূঢ়তা এবং ডাক্তারের অসংখ্য বিধিনিষেধ এ দুয়ের কোনটাই সে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ খোলা মনে নিজের ইচ্ছামত চলতেও যেন কোথায় আটকাচ্ছে। পাশাপাশি দু'রকমের ব্যবস্থা করতে সে পেরে উঠছে না। এই নিয়ে প্রতিদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাদপ্রতিবাদ হতে দেখা যায়। বৃদ্ধ শ্বশুরকে স্নেহে এবং সেবায় চতুর্দ্দিক থেকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখতে চায়। তার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের কতকটা আকাঙ্ক্ষা অন্তত এই পথ ধরেই পূর্ণ হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। সুধীর পয়সা রোজগার করে। পয়সা সে যথেষ্টই পায়। তার বাইরের একটা সমাজ আছে। তার মত স্বল্পপরিসর গণ্ডীর মধ্যে এক রোগজর্জ্জরিত বৃদ্ধকে নিয়ে অষ্টপ্রহর পা গুণে গুণে চলতে হয় না, তাঁর সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের সম্মুখীন হতেও হয় না। কাজেই সুধীরের পক্ষে উপদেশ দেওয়া সহজ হলেও তা পালন করা তার স্ত্রীর পক্ষে তেমন সহজে ঘটে উঠে না।

শোভনা নতমুখে বসে আছে। সেই দিকে খানিকক্ষণ সস্নেহে চেয়ে দেখে বৃদ্ধ পুনরায় বলে ওঠেন, সুধীরের ডাক্তারের উপর আমার আর একতিল বিশ্বাস নেই। তুমি দেখে নিও মা তোমার খুড়োমশাই নিশ্চয় আমার কথায় সায় দেবেন।

অন্ধকার পথে চলতে চলতে সহসা শোভনা যেন একটুখানি আলোর সন্ধান পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠল। সাগ্রহে শ্বশুরকে বললে, আমি আজই কাকাবাবুকে খবর পাঠাব বাবা।

বৃদ্ধ খুশীভরা কণ্ঠে বললেন, তাই পাঠিয়ো মা। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, সুধীরের ডাক্তার আমায় না খেতে দিয়ে হজমশক্তির দফাটিও রফা করে দিয়েছে।

শোভনার মুখে পুনরায় একটুখানি ম্লান হাসি দেখা গেল ; যে কথা বৃদ্ধ বার বার তাকে বোঝাতে প্রয়াস পাচ্ছেন, তা বিশ্বাস করতেই সে চায়, কিন্তু শ্বশুরের সংশয় শোভনাকে বেদনা দেয়। স্বামীর যুক্তি এবং বর্ত্তমান ডাক্তারের অমুজ্ঞা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তোলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শোভনাকে তার কাকাবাবুর নিকট খবর পাঠাতে হ'ল।

খেতে বসে আজ বার বার বৃদ্ধকে রান্নার তারিফ করতে শোনা গেল। এমন রান্না নাকি তিনি বহুদিন খান নি। এক কথায়—খাসা। রুই মাছের ঝোলটার উপরই যেন নজর তাঁর বেশী। পূর্ণ উৎসাহে পরম পরিতোষের সঙ্গে তিনি বার বার চেয়ে নিয়ে আহার করলেন। একমুখ হেসে শোভনাকে বললেন, একেই বলে রান্না, মা। যেমন হয়েছে ডুমুরের সুক্তো, তেমনি করেছ মুলোর ঘণ্ট। সবার সেরা রেঁধেছ মাছের ঝোলটি, তা বলে সোনা মুগের ডালও কারুর চেয়ে কম যায় না।

শোভনা বৃদ্ধের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

বৃদ্ধ পুনশ্চ বললেন, তুমি এক দিনে আমার দশ দিনের পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছ মা। যেমন সুধীর—তেমনি জুটেছে তার ঐ ডাক্তারটি। এরা আমার শরীরের ধাত জানে না। উল্টো ব্যবস্থা দিয়ে আমায় হয়রান করছে বৈ ত নয়।

বৃদ্ধ থামলেন। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে বসে রইলেন। সুধীরের ডাক্তারের উপর তাঁর বাহ্যিক যত বিরাগই থাক না কেন, অন্তরে তিনি তাঁর বার আনা ব্যবস্থাই স্বীকার করতেন, কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে নানাবিধ বিধিনিষেধ মেনে চলতে তিনি চান না। আজন্মের সংস্কার এবং অভ্যাস পদে পদে বাধা দেয়। পুত্র পিতাকে যতই নিয়ম মেনে চলতে বলে পুত্রবধূর কাছে বৃদ্ধের বায়না ততই বৃদ্ধি পায়। শোভনার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের দুর্ব্বলতার স্থানে মোচড় দিয়ে কাঙালের মত দু'হাত পেতে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকেন। এই এক স্থানেই তাঁর যত কাঙালপনা, নইলে আজ এতখানি বয়সে তিনি নিজের

ইচ্ছাকেই বরাবর প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। কোথাও বিন্দুমাত্র এর অন্যথা হবার উপায় ছিল না।

সুধীরের বয়স তখন বছর তিনেক হবে যখন তার মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। গুটিকয়েক মৃত সন্তান প্রসব করার পর সুধীরই প্রথম টিকে গিয়েছিল কিন্তু সেই প্রথম টিকে যাওয়া সন্তানই তাঁর শেষ সন্তান। সেই থেকেই সুধীরের মা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে লাগলেন। সুধীর বাঁচল বটে, কিন্তু তার মাকে যেতে হ'ল। মৃত্যুটাকে অত্যন্ত গভীর ভাবে অনুভব করলেও নলিনী চৌধুরীর বাহ্যিক ব্যবহারে তার কোন প্রকাশ কারুর চোখে পড়ল না। শুধু পুনরায় বিয়ের তাগিদ এলে তিনি অত্যন্ত সহজ গলায় আত্মীয়-স্বজনকে বললেন, না —এবং সেই থেকেই পুত্রের সকল ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

শোভনার মৃদু আহ্বানে বৃদ্ধের অন্যমনস্কতার ঘোর কেটে গেল। তিনি বললেন, আমায় কিছু বলছিলে মা?

শোভনা বললে, হ্যাঁ বাবা—কাকাবাবু এলে সব কথা আপনি নিজেই খুলে বলবেন কিন্তু।

বৃদ্ধ সোৎসাহে বলেন, নিশ্চয় বলব মা। আমার ভুল হয়ে গেলে তুমি স্মরণ করিয়ে দিও। আর সুধীরের ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশনগুলো হাতের কাছে গুছিয়ে রেখ, তোমার কাকাবাবুর দরকার হতে পারে।

শোভনা প্রস্থান করলে।

বৃদ্ধ পুনরায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। অতীতে তিনি যা কিছু ভাল বলে জেনেছেন তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটতে তিনি দেন নি। তাঁর মনের দৃঢ়তা আত্মচেতনার সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করে গেছে। তাঁর সেদিনের সে মনোবল আজ আর নেই, তার স্থানে এক দুর্নিবার দুর্বলতা তাঁকে পেয়ে বসেছে। নইলে তিনি…

পুনরায় তাঁর চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। পুত্রবধূ দেখা দিয়েছে—সেই সঙ্গে তার ডাক্তার কাকাও।

বৃদ্ধ তাঁকে পরম সমাদরে আহ্বান করলেন, আসুন বেয়াই মশাই। একটু থেমে তিনি যেন একটু অনুযোগ দিয়ে বললেন, এমনিতে আপনাদের ত আর দেখা পাওয়া যায় না—

প্রত্যুত্তরে হেসে ডাক্তার বলেন, ডাক্তারের আবির্ভাব যত কম হয় ততই মঙ্গল।

বৃদ্ধ খুব খানিক হেসে নিলেন এবং আরও দু-চারটে বাজে কথার পর তাঁকে আহ্বান করবার যথার্থ কারণ সবিস্তারে জানালেন।

ডাক্তার পরম গম্ভীরভাবে বৃদ্ধের অভিযোগ এবং অনুযোগগুলি একের পর এক শুনে গেলেন। কখনও কৌতুকে তাঁর দু'চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল, কখনও বা হাসিমুখে বৃদ্ধের কথায় সায় দিয়ে আলোচনার ধারাটাকে একটা সহজ পথে নিয়ে আসছিলেন এবং নিতান্ত মনোযোগের সঙ্গে পূর্ব্বের প্রেস্ক্রিপশনগুলি দেখে নিয়ে হাসিমুখে বললেন, আপনার কিছুই হয়নি ত! এতখানি বয়সে বুকে অমন একটু সর্দ্দিভাব থাকবেই—আর হজমশক্তি হ্রাস পাওয়াটাও নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। ডায়েট একটু হালকা—অর্থাৎ যতটা সহ্য করতে পারেন তাই খাবেন। আর ওষুধ যা খাচ্ছেন তাতে আপত্তির কিছু নেই, তবে সেই সঙ্গে একটা এনজার্স ইমালসন হলে ভাল হয়।

ডাক্তার উঠলেন, কিন্তু পুনরায় তাঁকে ফিরতে হ'ল। শরীরটা কিছু খারাপ থাকায় সুধীর একটু শীঘ্রই ফিরে এসেছে। বাড়ীতে ডাক্তারের আবির্ভাব দেখে একটু যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অবগত হয়ে সে আশ্বস্ত কণ্ঠে খুড়শ্বশুরকে প্রশ্ন করলে, কেমন দেখলেন?

শ্বশুরকে নিয়ে সুধীর তার নিজের ঘরে এসে বসেছে।

ডাক্তার বললেন, নূতন কিছুই নয়। যেমন চলছে চলুক। তবে একটা ইমালসনের ব্যবস্থা কর।—তিনি চলে গেলেন। কিন্তু সুধীর পুনরায় পিতার ঘরে আসতেই তিনি হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন, আমি তখুনি বলেছিলাম তোর ঐ ডাক্তার কিছু জানে না। এখন হ'ল ত! তোর ডাক্তার শুধু চিনেছে সিঙ্গিমাছ আর থানকুনি পাতার ঝোল। আর বোতল বোতল ওষুধ গেলানো। খেতে দিচ্ছ সিঙ্গিমাছ, তার জন্যে আবার হজমি আরক কেন? আর কখনও আমি তোর ডাক্তারের ওষুধ খাব মনে করেছিস—কক্ষনো নয় এ আমি আজ তোকে সাফ জানিয়ে রাখছি।

সুধীর বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল। শোভনার মুখে একটু যেন চাপা হাসি দেখা গেল। সুধীর বললে, এসব আপনি কি বলছেন বাবা! কাকাবাবুও যে একই ব্যবস্থার কথা বলে গেলেন।

বৃদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন, বলে গেলেন! তুমি বললেই আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হবে? দু'মিনিটে তোমাকে তিনি সব কথা বলে গেলেন, আর দু'ঘণ্টা ধরে আমাদের যা বলেছেন সব মিথ্যে? শোন কথা মা, হতভাগা ছেলের কথা শোন—

শোভনার মুখে পুনরায় যেন চাপা হাসি দেখা গেল, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। উত্তর দিলে সুধীর, আপনি মিথ্যে রাগ করছেন বাবা। সত্যি মিথ্যে একটা ফোন করেই না হয় একবার ভালভাবে জেনে নিন না।

বৃদ্ধ পুনরায় রেগে উঠলেন। বললেন, জানতে হয়, তুমি নিজে জান গিয়ে। আমায় যা বলবার তা তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন।

সুধীরের সঙ্গে তার স্ত্রীর একবার দৃষ্টি বিনিময় হতেই সে আর কথা না বাড়িয়ে অন্যত্র প্রস্থান করলে।

বৃদ্ধ আর একবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠেই পুত্রকে না দেখে থেমে গেলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুত্রবধূকে উদ্দেশ করে বললেন, বুঝলে মা, সুধীর আমার তেমন ছেলে নয়—যত নষ্টের গোড়া তার ঐ ডাক্তার।

শোভনা হাসিমুখে প্রস্থান করলে।

প্রসঙ্গটা তখনকার মত চাপা পড়ে গেলেও এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ল না। দিন চলে যায়। বৃদ্ধ ঔষধ সেবন একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছেন। শোভনা অনুযোগ দেয়। বৃদ্ধ হেসে বলেন, তোমার কাকাবাবুর ওষুধ যে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না মা।

শোভনা বললে, অন্য ওষুধ খেতে কাকাবাবু ত নিষেধ করেন নি বাবা।

বৃদ্ধ বললেন, খেতেই হবে এমন কথাও তিনি বলেন নি ত মা!

শোভনা এই নিয়ে আর কথা বাড়াতে চায় না। নিঃশব্দে অন্যত্র প্রস্থান করে। কিন্তু বয়সের ধর্ম্ম স্বভাবের গতিকে উপেক্ষা করে চলতে পারে না। এক সময় বৃদ্ধকে শয্যাশায়ী হতে হ'ল। সুধীর তখন আপিসে। শোভনা আশঙ্কায় এতটুকু হয়ে গেছে। বৃদ্ধের মতে এটা শুধু একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা।—যা সকলেরই হতে পারে। কিন্তু শোভনার মনে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। একটি বেলার তাণ্ডবে বৃদ্ধকে যেন একেবারে দুমড়ে ভেঙে ফেলেছে। ডাক্তারের কাছে খবর পাঠান হয়েছে, সেই সঙ্গে সুধীরকেও।

শোভনার অদৃষ্টে জুটল নিষ্ঠুর তিরস্কার। কোন প্রতিবাদই সে করলে না। তার মন নিয়ে ঘটনাটার বিচার ত ওরা করবে না। ওদের চুলচেরা হিসাবে ব্যতিক্রম ঘটেছে তাই ওরা অকরুণ হয়ে উঠেছে। শোভনা শুধু নিঃশব্দে শ্বশুরের পরিচর্য্যা করে চলেছে।

রাত্রে একলা ঘরে স্ত্রীকে পেয়ে সুধীর সহসা অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠল, তোমার অন্যায় প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই এমনটি ঘটেছে।

শোভনা শান্ত কণ্ঠে বললে, সে বিচার না হয় পরে করো কিন্তু দোহাই তোমার, একটু আস্তে কথা বল। বাবা এখন ভালই আছেন এবং জেগে আছেন।

সুধীর কিন্তু থামতে পারলে না। সে তেমনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই বলে চলল, এমনি করেই ইদানীং তুমি আমার মুখ চাপা দিয়ে আসছ। একটি বারও তোমরা কেউ আমার দিকটা ভেবে দেখছ না। সারাদিন পরিশ্রম করে এসে—

পুনরায় বাধা দিয়ে শোভনা বললে, তুমি কিছুতেই কি চুপ করবে না?

বারবার বাধা পেয়ে পেয়ে সুধীর যেন ক্ষেপে গেল, বলতে লাগল, চুপ করেই এতদিন ছিলাম, কিন্তু তোমরাই তা থাকতে দিচ্ছ না। তোমাদের আজ আমি পরিষ্কার করেই জানিয়ে দিতে চাই যে এমনি খেয়ালখুশী মত যদি তোমরা চলতে চাও তা হলে বাবাকে আমি দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব। নয়তো অন্য কোথাও…

পাশের ঘরে কোন কিছু পতনের শব্দে উভয়ে চমকে উঠল। শোভনা ত্রস্ত পদে সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। সুধীরও তাকে অনুসরণ করলে।

বৃদ্ধ অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যে তিনি পুত্র এবং পুত্রবধূর বাদানুবাদ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন একথা বুঝবার উপায় নেই।

শোভনা একমুহূর্ত্তেই ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। খাটের পাশের টেবিলের উপরকার বড় ঔষধের শিশি দুটো মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে।

স্ত্রী একবার স্বামীর মুখের প্রতি চোখ তুলে চাইলে, আর স্বামী স্ত্রীর পানে নির্ব্বাকভাবে তাকালে।

সুধীর নিম্ন কণ্ঠে বললে, তোমার হতভাগা মিনির কাজ…

শোভনা একথার কোন উত্তর দেওয়াও আবশ্যক বোধ করলে না। উবু হয়ে বসে কাঁচের টুকরোগুলো একস্থানে জড়ো করতে লাগল। চোখ দুটো কি জানি কেন তার ঝাপসা হয়ে গেছে।

* * *

কয়েক দিনেই বৃদ্ধ পুনরায় একটু সামলে নিয়েছেন। চিকিৎসক নির্দ্দেশিত আহার্য্যই তিনি এখন গ্রহণ করছেন। তবে ইদানীং সিঙ্গিমাছের প্রতি তাঁর আসক্তিটা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। পুত্রবধূকে ডেকে বলেন, মাছগুলোর চেহারাটাই যা বিদ্‌ঘুটে নইলে খেতে অতীব সুস্বাদু, মা। তিনি পরম পরিতোষের সঙ্গে আহারে মনোনিবেশ করেন।

শোভনার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, কিন্তু গোপনে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

মধ্য-পশ্চিম

২১শে ডিসেম্বর শনিবার এগারটায় শিকাগো হইতে ট্রেনে রওনা হইয়া দুইটার সময় লিঙ্কনের স্মৃতিবিজড়িত স্প্রিংফিল্ড নগরে পৌঁছিলাম। স্প্রিংফিল্ড ইলিনয় রাজ্যের রাজধানী। শিকাগো হইতে দূরত্ব ২০০ মাইল। ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে ট্রেন ছুটিতেছিল। পথে তিনটি ষ্টেশন, কান্‌কাকি, গিব্‌সন সিটি ও ক্লিণ্টন। রওনা হইবার সময় এবং প্রায় সারা রাস্তাই বরফ পড়িতেছিল। ট্রেনের দুই ধারে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর। আগাগোড়া বরফে ঢাকা। স্প্রিংফিল্ড শিকাগোর দক্ষিণে। এখানে বরফ ছিল না। মাঝে মাঝে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল। ওয়েব্‌ষ্টারের সহিত হোটেলে গিয়া উঠিলাম। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে শহর সুসজ্জিত। হোটেলের লাউঞ্জে উত্তমরূপে সাজানো খ্রীষ্টমাস তরু। চারিদিকেই আনন্দ। পরের দিন বৃষ্টি কাটিয়া গেল। তারপর যে তিন দিন এখানে ছিলাম সে তিন দিন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল।

স্প্রিংফিল্ড এব্রাহাম লিঙ্কনের কর্মক্ষেত্র। তাঁর জন্ম হইয়াছিল কেণ্টাকি রাজ্যে। সাত বৎসর বয়সে তিনি ইণ্ডিয়ানা রাজ্যে আসিয়া কয়েক বৎসর বাস করেন। পরে যৌবনে ইলিনয় রাজ্যের সালেম গ্রামে আসেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান। বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। সালেম গ্রামে প্রথম এক মুদির দোকানে কাজ করেন। পরে নিজেই একটি দোকান করেন। কিন্তু সে দোকান লোকসান হইয়া উঠিয়া যায়। তখন কিছু আইন পড়িয়া স্প্রিংফিল্ডে আসিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানে বেশ পসার হয়। পরে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়া এখান হইতে ওয়াশিংটন চলিয়া যান। যুক্তরাজ্য তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। তৎকালে আমেরিকায় দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। লিঙ্কন উহা রহিত করিয়া দেন। ইহাতে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাজ্য হইতে আলাদা হইয়া পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে সঙ্কল্প করে। লিঙ্কন তাহাতে বাধা দেন। উভয় রাষ্ট্রে যুদ্ধ হয়। লিঙ্কন জয়ী হন। দেশের ঐক্য রক্ষা হয়। সে ঐক্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই ঐক্যের জন্যই আজ এরা এত বড়। এদেশের লোক লিঙ্কনকে খুব শ্রদ্ধা করে। গৃহ-বিবাদের দিনে ইনিই এদের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিজয়ী লিঙ্কন পরে গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হন।

পরদিন রবিবার। সুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছে। সকালেই বাহির হইয়া পড়িলাম। ওয়েব্‌ষ্টারকে সঙ্গী করিলাম। উভয়ে লিঙ্কনের সমাধি-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। হুলেট নামক একজন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হইল। কলিকাতা হইতে আগত দর্শকের সাক্ষাৎলাভে বৃদ্ধের কি উৎসাহ! আমি বলিলাম, আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা খুবই বেশী। গত যুদ্ধের পূর্বে এদেশকে জানিবার কৌতূহলও বিশেষ ছিল না। তবে ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের কথা আমরা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে পাঠ করিতাম। বৃদ্ধ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিলেন। গান্ধীজীর সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ তন্ন তন্ন করিয়া আমাকে সমাধিমন্দিরের সমস্ত দেখাইলেন। পরে এই সমাধিমন্দিরের প্রাণস্বরূপ এইচ, ডব্লিউ, ফে মহাশয়ের গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। ফে মহাশয়ের বয়স ৮৮। এই লোলচর্ম বৃদ্ধ লিঙ্কনের পরম ভক্ত। এই সমাধির পার্শ্বেই বাস করেন। লিঙ্কনের স্মৃতি-বিজড়িত ছোট-বড় বহু জিনিস সংগ্রহ করিয়া যক্ষের ধনের মত আগলাইতেছেন। আমাকে একটি একটি করিয়া সব দেখাইলেন। তন্মধ্যে লিঙ্কনের একটি ছোট চেয়ার দেখিলাম। তিনি ইহাতে বসিয়া কাজ করিতেন। বৃদ্ধদ্বয় আমাকে এই চেয়ারে বসাইবেনই। পুরাতন চেয়ার। বহু স্মৃতি এর সঙ্গে বিজড়িত। আমার আড়াই মণী বপুকে ইহার উপর স্থাপন করিতে কিছুতেই ভরসা পাইতেছিলাম না। বৃদ্ধদ্বয় নাছোড়বান্দা। তাঁহারা বলিলেন, "আপনি বসুন। যে চেয়ারে লিঙ্কন বসিতেন সে চেয়ারে বসিলে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে।" অগত্যা চেয়ারের উপর অতি সন্তর্পণে বসিতেই হইল। সহসা ফে মহাশয় বলিলেন, "আপনার পিতা যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রা ধার করিয়াছিলাম। আজ আপনার হাতে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেছি।"

আমি প্রথমে কথাটির অর্থ বুঝি নাই। বলিলাম—আমার পিতা তো এদেশে আসেন নাই।

বৃদ্ধ হাসিয়া একটি স্বর্ণমণ্ডিত মুদ্রা পকেট হইতে বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। বলিলেন, "আপনার কয়টি সন্তান?" আমি বলিলাম, "তিনটি।" বৃদ্ধ তখন আরও দুইটি মুদ্রা আমাকে দিলেন। বলিলেন, "আমার কথা বলিয়া আপনার সন্তানগণকে এই মুদ্রাগুলি দিবেন। তারা যখন এখানে আসিবে তখন আমাকে স্মরণ করিবে। আমি তো তখন থাকিব না।" মুদ্রাগুলিতে লিঙ্কনের মূর্তি মুদ্রিত। লিঙ্কনের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ এই গিল্টিকরা মুদ্রাগুলি, লিঙ্কন স্মৃতি-কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত ও প্রচারিত। বিশিষ্ট অতিথিগণকে স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ এইগুলি দেওয়া হয়। তখন বৃদ্ধ হুলেট আর একটি স্বর্ণমণ্ডিত মুদ্রা আমার হাতে দিলেন। আমি

ইঁহাদের হৃদয়স্পর্শী ব্যবহারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমি বলিলাম, "তিনটি তো পাইয়াছি। আর কেন?" ছলেট মুদ্রাটি দেখাইয়া বলিলেন, "এটি স্প্রিংফিল্ড মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক নির্মিত ও প্রচারিত। সম্পূর্ণ অন্য ধরণের।" এই সহৃদয় উপহার প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। বলিলাম, "বেশ, এটি আমার ভাইপো লইবে।" এখনও ঐ মুদ্রা চতুষ্টয়ের মধ্যে আমি বৃদ্ধদ্বয়ের তথা স্প্রিংফিল্ড-বাসিগণের হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করি। বৃদ্ধ ফে-র সহাস্য মুখখানি এখনও মুদ্রাগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ করি।

বৈকালে জনৈক সরকারী কর্মচারী হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। নাম হ্যারল্ড ব্রাডশ। ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টের গবেষণা ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ। এখানে আমার কাজের কিরূপ প্রোগ্রাম হইবে প্রথমে সে সম্বন্ধে আলোচনা হইল। পরে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "স্প্রিংফিল্ডে এসেছেন। চলুন এব্রাহাম লিঙ্কনের স্মৃতিচিহ্নগুলি আপনাকে দেখাইয়া লইয়া আসি। আমি এগুলি কয়েক বার দেখিয়াছি। কিন্তু যখনই যাই তখনই পুনরায় নূতন কিছু দেখিতে পাই।"

আমি বলিলাম, "আমি সকালে লিঙ্কনের সমাধিমন্দির দেখিয়া আসিয়াছি।"

ব্রাডশ বলিলেন, "তবে চলুন প্রথম লিঙ্কনের নিজ বাড়ী ও পরে সালেম গ্রামে যাওয়া যাইবে। তাঁহার নিজ বাড়ী খুব কাছে। সালেম গ্রাম ১৫ মাইল দূরে।"

অদূরস্থিত লিঙ্কনের নিজ বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একটি মহিলা গৃহের রক্ষণকার্যে নিযুক্ত এবং আগন্তুকগণের প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিতেছেন। এটি ভিন্ন লিঙ্কনের দ্বিতীয় নিজ বাড়ী ছিল না। সরকার এই বাড়ীটি কিনিয়া লইয়া লিঙ্কনের সময় যেরূপ ছিল ঠিক সেই ভাবে রক্ষা করিতেছেন। বাড়ীটি ছোট, দোতলা, খুব সাদাসিধা। উপরে নীচে তিনটি করিয়া ঘর। ঘরগুলি বেশী বড় নয়। আসবাবপত্র খুব সামান্য। একটা বৈঠকখানা ঘর একটু সাজান। ব্রাডশ বলিলেন, এঘরটি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়। যেন একটু বেশী সজ্জিত। লিঙ্কনের সাদাসিধা অভ্যাসের সঙ্গে এটা যেন খাপ খায় না। হয়তো বা প্রেসিডেন্ট হইবার পর বিশিষ্ট অতিথিদের বসাইবার জন্য ঘরটি সাজাইয়াছিলেন। লিঙ্কন-পত্নী যে স্থানে যে চেয়ারে বসিয়া জামা প্রভৃতি বুনিতেন, লিঙ্কন যেখানে বসিয়া কাজ করিতেন সব ঠিক সেই ভাবে আছে। সবই খুব সাদাসিধা। সাজাইবার চেষ্টাও বিশেষ লক্ষিত হয় না।

তারপর সালেমের দিকে চলিলাম। সুন্দর রাস্তা। দু'ধারে দিগন্তবিস্তৃত শূন্য প্রান্তর। ব্রাডশ গাড়ী চালাইতেছেন; আমি পাশে বসিয়া। নানা বিষয়ে আলাপ চলিতেছে। এ দেশে লোকবসতির বিরলতা সর্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি। মাঠই বেশী। শুনিলাম ভুট্টাই এখানকার প্রধান ফসল। একটি ছোট বনাকীর্ণ পাহাড় দেখিলাম। তাহার নীচে একটি ছোট লোহার কারখানা। পাহাড়ের উপরে সালেম গ্রাম।

আসল গ্রামটি দুই মাইল দূরে ছিল। লিঙ্কনের সময় সেখানে বহু লোকের বাস ছিল। ক্রমশঃ গ্রামটি পরিত্যক্ত হয়। জনশূন্য গ্রামটিও নষ্ট হইয়া যায়। শুধু কাঠের ঘরগুলির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান থাকে।

১৯১৮ সনে আসল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ লইয়া এই পাহাড়ের উপর গ্রামটিকে ঠিক পূর্বের মত পুনর্গঠিত করিতে আরম্ভ করা হয়। একটি স্থানীয় লিঙ্কন-সমিতি এই কাজ আরম্ভ করেন। পরে সরকার ইহার ভার লন। লিঙ্কনের সময় যেরূপ ছিল সরকার বাড়ীগুলিকে ঠিক সেইভাবে নির্মাণ করিয়া রক্ষা করিতেছেন। ছোট ছোট কাঠের ঘর; সামান্য বিছানা। বিছানার সরঞ্জামের মধ্যে কাঁথাই প্রধান। আসবাব নাই বলিলেই চলে। গ্রাম্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কয়েকটি দোকান। তাহার মালপত্র অতি সামান্য রকমের। কামারশালা, মুদির দোকান, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে। গ্রামটি আমাদের দেশের গ্রামেরই মত ছিল বলিয়া মনে হয়। ঘরগুলিও আমাদের দেশের গ্রামের সাধারণ লোকেদের ঘরের মত। সেদিন ভারতবর্ষের গ্রাম ও আমেরিকার গ্রামে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। আজ তাহাদের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। একটি ছোট সংগ্রহশালা আছে। তার মধ্যে লিঙ্কনের ব্যবহৃত অনেক জিনিস বিদ্যমান। ব্রাডশ একটি শীল-করা পেট্‌রার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। লিঙ্কনের পুত্র এটি উপহার দেন। এর মধ্যে লিঙ্কনের বহু চিঠিপত্র আছে। পেট্‌রাটি দিবার সময় লিঙ্কনের পুত্র একটি সর্ত করিয়া দেন যে ১৯৪৭ সনের অমুক মাসের পূর্বে এ পেট্‌রা যেন খোলা না হয়। তাই এতদিন ইহা বন্ধই আছে। ব্রাডশ বলিলেন, "আমি কয়েক বার এখানে আসিয়াছি। অথচ এই পেট্‌রাটি দেখি নাই। ইহা খুলিবার দিন যে এত নিকটবর্তী তাহাও লক্ষ্য করি নাই। দেখুন, আমি ঠিকই বলিয়াছি যে, এখানে আমি যখনই আসি তখনই নূতন কিছু দেখি।"

আমি—"আচ্ছা খুলিবার তারিখ সম্বন্ধে এইরূপ সর্তের অর্থ কি?"

ব্রাডশ—"এই সমস্ত চিঠির মধ্যে পরিবারের অনেকের ব্যক্তিগত কথাবার্তা নিশ্চয়ই আছে। তাহাদের জীবিতকালে সেগুলির প্রকাশ হয়তো তাঁহারা পছন্দ করিবেন না। সেজন্যই এই সর্ত।"

শ্রদ্ধা-বিনম্র চিত্তে এই সব দেখিলাম। এই কাষ্ঠ-কুটীর (লগ কেবিন) হইতেই লিঙ্কন হোয়াইট হাউস্ বা "সাদা

বাড়ীতে" গিয়াছিলেন। এখানে তিনি ছিলেন সামান্ত মুদির দোকানের কর্মচারী।

ব্রাডশ লিঙ্কনের একজন ভক্ত। লিঙ্কন বলিতে গদগদ। বলিলেন—"লিঙ্কন অতি সামান্ত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার ভাষা এত প্রাঞ্জল, এত সরল এবং এত মর্মস্পর্শী যে তাহার মধ্য হইতে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাছিয়া ফেলা খুব সহজ।" কথাটি শুনিয়া আমার বিশেষ করিয়া লিঙ্কনের দুইটি বক্তৃতাংশ মনে পড়িল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী লিঙ্কন প্রেসিডেন্টের কার্যে যোগ দিবার জন্ত স্প্রিংফিল্ড ত্যাগ করিয়া যান। সেদিনকার বিদায়-সভায় তিনি বলিয়াছিলেন—

"২৫ বৎসরের বেশী আমি আপনাদের মধ্যে বাস করিয়াছি। এত কাল ধরিয়া আপনাদের কাছে সদয় ব্যবহার ভিন্ন অন্ত কিছুই পাই নাই। যৌবন কালে আমি এখানে বাস করিতে আসিয়াছিলাম। আজ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি এখানেই পৃথিবীর পবিত্রতম বন্ধনগুলি গ্রহণ করিয়াছি। আমার সমস্ত সন্তান এখানে জন্মিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক জন এখানেই চিরনিদ্রায় মগ্ন।

বন্ধুগণ, আমার যা কিছু আছে এবং আমি যা কিছু হইয়াছি সবই আপনাদের জন্ত। আমার অদ্ভুত ঘটনাবহুল অতীত আজ আমার মনের মধ্যে ভিড় করিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে। আজ আমি আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি। জর্জ ওয়াশিংটনের উপর যে দুরূহ কার্য বর্তিয়াছিল আজ তদপেক্ষা কঠিন কাজের ভার গ্রহণ করিতে আমি যাইতেছি। পরমেশ্বর তাহার সহায় ছিলেন। পরমেশ্বর যদি আজ আমার সঙ্গে না থাকেন তবে আমি নিশ্চয়ই বিফল হইব। কিন্তু সেই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যদি আমাকে চালাইয়া লন আমি কিছুতেই বিফল হইব না, সফল হইবই। আসুন আমরা প্রার্থনা করি আমাদের পিতৃপিতামহের প্রতি প্রসন্ন ভগবান যেন আমাদিগকে ত্যাগ না করেন। তাঁহারই চরণে আমি আপনাদিগকে সমর্পণ করিতেছি। অনুরূপ সরল বিশ্বাস লইয়া আপনারাও তাঁহার দয়া আমার জন্ত মাগিয়া লউন—ইহাই আপনাদের নিকট প্রার্থনা করি।"

১৮৬৩ সনের ১৯শে নবেম্বর গেটিসবার্গের রণক্ষেত্রে লিঙ্কন এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"চার কুড়ি সাত বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই মহাদেশে এক নূতন জাতির জন্ম দিয়াছিলেন। সে জাতির জন্ম স্বাধীনতায়; মানুষমাত্রই সমান অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে এই মহাভাব ছিল তাহাদের সাধনা। আজ আমরা গৃহ-যুদ্ধে ব্যাপৃত। আজ পরীক্ষা হইবে সেই জাতি অথবা স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ মানবের সমতাসাধক অনুরূপ যে-কোন জাতি পৃথিবীতে বাঁচিতে পারে কিনা? সেই গৃহযুদ্ধের একটি মহা-রণক্ষেত্রে আজ আমরা মিলিত হইয়াছি। যাঁহারা জাতিকে বাঁচাইবার জন্ত নিজেরা মৃত্যুবরণ করিল তাঁহাদের চির-বিশ্রামের জন্ত এই মহারণক্ষেত্রের একাংশ আজ আমরা উৎসর্গ করিব। ইহা আমাদের অবশ্যকর্তব্য।

কিন্তু লৌকিক আচারের কথা ছাড়িয়া দিলে এই মহারণ-ক্ষেত্রকে উৎসর্গ বা পবিত্র করিতে আমরা কে? যে জীবিত এবং মৃত বীরগণ এখানে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহারাই ইহাকে পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছেন। সে পুণ্যভূমির পবিত্রতা বাড়াইবার বা কমাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা আজ এখানে কি কথা বলিলাম পৃথিবী তাহা ভুলিয়া যাইবে। তাঁহারা এখানে যাহা করিয়া গেলেন তাহা পৃথিবী কদাপি ভুলিবে না। অতএব আসুন আমরা আজ সেই বীরগণের অসমাপ্ত কর্মে নিজেদেরই উৎসর্গ করি। যে মহাকার্যের জন্ত তাঁহারা সংগ্রাম করিয়া গেলেন আসুন তাহা সমাধা করিবার জন্ত আমরা আত্মোৎসর্গ করি। আসুন আমরা জীবন পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করি—

যে কাজে এই বীরগণ জীবন দিলেন আমরা সেই কাজের প্রতি অনুরাগী রহিব; আমরা সঙ্কল্প করিতেছি যে যাঁহারা মরিলেন তাঁহাদের মৃত্যু আমরা বৃথা হইতে দিব না; পরমেশ্বরের অনুশাসনে এই জাতির স্বাধীনতামন্ত্রে আজ নবজন্ম হইল; এবং জনগণ কর্তৃক জনহিতে জনশাসন পৃথিবী হইতে আমরা কখনও বিলুপ্ত হইতে দিব না।"

ব্রাডশ'র সঙ্গে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শহরে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ৭৫০০০ লোক-অধ্যুষিত সুন্দর শহরটি দেখিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর কাজে ব্যস্ত রহিলাম। ষ্টেট ক্যাপিটলেই আমার কাজ বেশী ছিল। প্রত্যেক ষ্টেটেই ষ্টেট ক্যাপিটলটি খুব গৌরবের স্থল। ইহা নগরের কেন্দ্র-স্থলে অবস্থিত। বড় গম্বুজ এবং বড় বড় ঘর। ষ্টেটের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মর্মরমূর্তি ইহার চারিদিকে বসানো। ষ্টেটের অতীত ইতিহাসের ছবি দেওয়ালে ঝুলানো। আইন-সভার অধিবেশন এই ভবনে হয়। সরকারের কেন্দ্রীয় আপিস-গুলি সাধারণতঃ এই ভবনে। রাষ্ট্রের স্বাধীনতার এবং মর্যাদার প্রতীক এই ষ্টেট ক্যাপিটল। স্প্রিংফিল্ডে ষ্টেট ক্যাপিটলের সদর দরজায় এব্রাহাম লিঙ্কনের দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপিত। এখানে যে কয়জন সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ হইল তন্মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাজেট ডিরেক্টর টি, আর, লেথ এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের উইলার্ড আইস। লেথ প্রবীণ, সদালাপী এবং সদা সহাস্যবদন। নিজের বিভাগের তথ্যাদি ইঁহার নখদর্পণে। গণতন্ত্রের নিরঙ্কুশ প্রবণতা এবং কর্ম-সচিবগণের নিয়মানুবর্তিতার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা—এই দুইয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য ইঁহাতে দেখিতে পাই। এই দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাবের সুষ্ঠু সমন্বয় ইঁহার কথাবার্তায়

লক্ষ্য করিলাম। উইলার্ড আইস যুবক, সম্পূর্ণ অন্ধ। অথচ ইনি ট্যাক্স আইনে একজন বিশেষজ্ঞ। ইঁহাদের বিবিধ ট্যাক্স সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমার সঙ্গে রেভেনিউ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ একটি বৈঠকে মিলিত হন। তাহাতে এই অন্ধ যুবকটির আইনজ্ঞান দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম।

২৫শে ডিসেম্বর বুধবার বড়দিন। বেলা এগারটায় রেল-যোগে স্প্রিংফিল্ড ত্যাগ করিলাম। দুটায় শিকাগো আসিয়া অন্য ট্রেনে রাত আটটার সময় ম্যাডিসন নগরে পৌঁছিলাম। ম্যাডিসন উইস্‌কন্‌সিন ষ্টেটের রাজধানী। শিকাগো হইতে প্রায় ১৪০ মাইল উত্তরে। উইস্‌কন্‌সিন রাজ্যের বৃহত্তম নগর মিলওয়াকি পথে পড়িল।

ম্যাডিসন ছোট শহর। জনসংখ্যা ৮৫০০০। উইসকন্‌সিন রাষ্ট্র কৃষিপ্রধান। পনির প্রস্তুত করিবার জন্য বিখ্যাত। এই রাষ্ট্রে সহস্র স্বাভাবিক হ্রদ বিদ্যমান। গ্রীষ্মকালে মৎস্যশিকারে ও প্রমোদভ্রমণার্থ এখানে বিস্তর লোকসমাগম হয়। ম্যাডিসন নগরটি এইরূপ দুইটি হ্রদের মধ্যস্থলে অবস্থিত। হ্রদ-দ্বয়ের নাম মোনোনা ও মেণ্ডোটা। মেণ্ডোটার আয়তন ২১ বর্গমাইল। মেনোনা তাহার অর্দ্ধেক। মেনোনার অদূরে ক্যাপিটল এবং অন্যান্য সরকারী ভবন। মেণ্ডোটার পারে উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ব-বিদ্যালয়। আমার হোটেলটি ছিল ক্যাপিটলের খুব কাছে। নাম হোটেল লোরেন। হ্রদ-দ্বয়ের কোনটির পারেই প্রশস্ত রাজপথ নাই। তবে প্রত্যেকটির তীরেই বসিবার ও ঘুরিবার স্থান আছে। মেণ্ডোটার পারে সাঁতারের ক্লাবও আছে। শীতে সব জায়গাই জনশূন্য; আশেপাশে শুধু স্তূপাকার বরফ। কিন্তু দেশের এ হিমাবগুণ্ঠিত রূপ অতীব নয়নসুখকর। বিশ্ব-বিদ্যালয়টির বেশ নাম আছে। কিছু ভারতীয় ছাত্র এখানে পড়িতেছে।

যে কয়দিন এখানে ছিলাম মেঘ বৃষ্টি ও বরফের খেলাই দেখিয়াছি। যে তাপে বরফ গলে সাধারণতঃ তাপ তার চেয়ে ১০।১৫ ডিগ্রি নীচে থাকে। কখনও আরও নীচে নামিয়া যায়। রোদ উঠিলে ঠাণ্ডা বেশী হয়। একটু ঠাণ্ডা কমিলেই মেঘ হয় এবং বৃষ্টি বা বরফ পড়ে। বরফ তো আর গলে না, কাজেই শীত যতই প্রচণ্ড হয় ততই বরফের স্তূপ উঁচু হয়। রাস্তাগুলিকে কষ্টেসৃষ্টে চলনসই করিয়া রাখা হয়। প্রায়ই কুয়াশা ও ধোঁয়া হয়। 'স্মোক' (ধোঁয়া) এবং ফগ (কুয়াশা) কথা দুইটির সংমিশ্রণ করিয়া ইহারা নামকরণ করিয়াছে স্মগ। এখানকার বাজেট-ডিরেক্টর ই সি. গিজেল আমাকে বলিলেন, "এবার তো বরফ কম। অন্যবার অন্ততঃ হাঁটু-সমান বরফ এ সময় হয়-ই। আর আপনি সেন্টপলে যাইতেছেন। সেখানে দেখিবেন কোমর-সমান বরফ।"

এই ষ্টেটে একটি প্ল্যানিং বোর্ড দেখিলাম। ১৯২৯ সন হইতে বোর্ডটি আছে। এত আগে স্বতন্ত্র প্ল্যানিং বোর্ড অন্য কোন রাষ্ট্রেই গঠিত হয় নাই। কিন্তু ইহার উপর রাষ্ট্রীয় সরকারের নীতির খুব বেশী প্রভাব লক্ষ্য করিলাম না। স্থানীয় সরকারগুলির উপদেষ্টা হিসাবেই ইহার কাজ সমধিক।

২৭শে ডিসেম্বর সকালে ট্যাক্স বিভাগের কমিশনার এ. ই. ওয়েগনার মহাশয়ের আপিসে যাই। তাঁহার সেক্রেটারী আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "বিশেষ জরুরী কার্যে ওয়েগনার মহাশয়ের মিনিট পাঁচেক দেরী হইবে। সেজন্য তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি, আপনি তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।"

সেক্রেটারী মহাশয়া তখন নানা বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করিলেন। বলিলেন, "দু'দিন আগে আপনাকে পাইলে আমাদের খুব সাহায্য হইত।" আমি বলিলাম—"কি ব্যাপার বলুন দেখি।"

মহিলাটি বলিলেন, "আমার ছোট বোনের এক বন্ধু ভারতবর্ষে আছেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে একটি শাড়ী বড়দিনের উপহার-স্বরূপ আমার বোনকে পাঠাইয়াছেন। শাড়ীটি পরম মনোরম। কিন্তু আমরা কেহ পরিতে জানি না। ভদ্রলোক অবশ্য শাড়ী পরিবার নিয়ম সম্বন্ধে অনেক-গুলি ফটো সহ ছাপান উপদেশাবলী ভারতবর্ষ হইতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও আমাদের ভুল হইতেছিল। পরে এক লাইব্রেরিতে গিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা লইয়া আসি। তাহাতে শাড়ী পরিবার নিয়ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সহ একটি প্রবন্ধ ছিল। তাহা দেখিয়া আমরা দু'জনে মিলিয়া শেষে কৃতকার্য হই। কি সুন্দর শাড়ী! পরিবার পর আমার বোনকে অপূর্ব সুন্দরী দেখাইতেছিল। আপনাদের দেশের মেয়েরা কি সর্বদা ঐরূপ শাড়ী পরেন?"

বলিতে বলিতে মহিলাটির কণ্ঠ গদগদ হইয়া উঠিল। অচিরাগত ওয়েগনার মহাশয়ের সহিত সরকারী কর-সংগ্রহ-বিষয়ক নানাবিধ আলোচনান্তে হোটেলে ফিরিলাম।

২৮শে ডিসেম্বর শনিবার। বসুমতী হিমারতা; প্রকৃতি 'স্মগে' আচ্ছন্না। বিশেষ কাজ না থাকিলে কেহ বাহিরে আসে না। বেলা দুটায় বিমানযোগে ম্যাডিসন ত্যাগ করিয়া বেলা চারটায় সেণ্ট পল বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছিলাম। উপর হইতে শুধু তুষারাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তরই দৃষ্টিগোচর হইল। রচেষ্টার নামক একটি ষ্টেশনে বিমানটি নামিয়াছিল।

ম্যাডিসন হইতে সেণ্ট-পল বিমানযোগে ২৩৩ মাইল। ইহা আমেরিকার উত্তর সীমানাস্থ মিন্নেসোটা রাজ্যের রাজধানী। বিমানঘাঁটি হইতে মোটরযোগে হোটেলে আসিতে এক ঘণ্টা লাগিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়িতেছে। সর্বত্র বরফে ঢাকা। মিসিসিপি নদীর পাশ দিয়া আসিতেছি। নদীর জল জমিয়া গিয়াছে। নদীর নিকটেই আমার হোটেল। নাম হোটেল

লাউরী। নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকিয়া দেখি ঘরের রেডিওটি খোলা রহিয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক একটি অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসলীলার সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। বুঝিলাম শহরে একটি খুব বড় এলিভেটরে আগুন লাগিয়াছে। দশ লক্ষ বুশেল গম সহ এলিভেটারী পুড়িয়া যাইতেছে।

পর দিবস ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার। আকাশ হইতে শেফালিকা ফুলের মত বরফ ঝরিতেছে। সর্বত্র স্তূপাকার বরফ। বিকালে বরফ পড়া বন্ধ হইল। বেশ রোদ উঠিল। কিন্তু ঠাণ্ডা খুব বেশী। পরিষ্কার আকাশে উজ্জ্বল সূর্য্য। সূর্য্যের দিকে তাকান যায় না। উজ্জ্বল রৌদ্র মনকে বাহিরে টানে। কিন্তু বাহিরে আসিলেই ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইতে হয়। রোদের কোনই তাপ নাই; বরফ গলাইবার ক্ষমতাও নাই। বিকালের দিকে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু রাস্তায় হাঁটা যায় না। পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যে-কোন সময় পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। আপাদ-মস্তক নানাবিধ গরম কাপড়ে ঢাকা থাকিলেও নাক ও মুখের অনাবৃত অংশ যেন জমিয়া যায়। হোটেলের মধ্যে তাপ ৭০ বা ৭৫ ডিগ্রী। বাইরের তাপ শূন্যের উপরে কচিৎ উঠে। কখনও শূন্যের ১৭।১৮ ডিগ্রী নীচে নামিয়া যায়। বাহিরে আসিবামাত্র নাক হইতে খানিকটা স্বচ্ছ জল গলিয়া পড়িল। কোটের উপর তাহা জমিয়া শক্ত হইয়া গেল। ট্রামে প্রবেশ করিলে গলিয়া ঝরিয়া গেল। ট্রামের মধ্যে কেন্দ্রীয় তাপ ব্যবস্থা আছে। নচেৎ তাহার মধ্যে অধিকক্ষণ বসা সম্ভব হইত না। ট্রামে শহর দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

সেণ্ট পল ও মিনিয়াপলিস নামক শহর দুইটি পরস্পর-সংলগ্ন। কোথায় এক শহরের সীমানা শেষ হইয়া অন্য শহর আরম্ভ হইল তাহা বলিয়া না দিলে বুঝা সম্ভব নয়। ইহারা যমক-শহর নামে সুপরিচিত। গুরুত্বে, আকারে ও লোক-সংখ্যায় মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে শিকাগোর পরেই যমক-শহরের স্থান। শহরদ্বয় বাণিজ্যপ্রধান। লোকসংখ্যা আট লক্ষ। কাঁচা লোহা ও গম চালান দিবার কারবারই এখানকার বড় কারবার। আটা ও ময়দার বড় বড় কলও এখানে অনেক। মিন্নেসোটা রাজ্যের উত্তর প্রান্তে বড় বড় লৌহ-খনি আছে। এ অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। রাজ্যের উত্তর সীমানায় সুপিরিয়র হ্রদ। সুপিরিয়র হ্রদের তীরে ডুলুথ বন্দর। বন্দরটি যমক-শহর হইতে কিঞ্চিদধিক শত মাইল দূরে অবস্থিত। ওপারে কানাডা রাষ্ট্রের পোর্ট আর্থার নামক বন্দরে পৃথিবীর বৃহত্তম গমের আড়তসমূহ বিদ্যমান। কানাডায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর সীমানায় সুপিরিয়র হ্রদ, মিসিগান হ্রদ, হুরণ-হ্রদ, ইরী হ্রদ, অণ্টেরিও হ্রদ প্রভৃতি বড় বড় হ্রদ পর পর সাজান রহিয়াছে। এই হ্রদমালা স্থানে স্থানে খালদ্বারা সংযুক্ত হইয়া সেণ্ট লরেন্স নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। সেণ্ট লরেন্স মণ্ট্রিয়ল নগরের পাদদেশ ধৌত করিয়া আটলাণ্টিকে পতিত হইতেছে। ডুলুথ ও পোর্ট আর্থার বন্দরদ্বয় হইতে এ অঞ্চলের বহু মালপত্র জলপথে দেশের ভিতরে ও আটলাণ্টিকের পথে দেশের বাহিরে রপ্তানি হয়। বন্দর হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরেই ডুলুথের স্থান। এখান হইতে মিন্নেসোটার কাঁচা লোহা বিশ্ববিখ্যাত পিট্‌স্‌-বার্গের লোহার কারখানায় প্রেরিত হয়। যমক-শহরের যাবতীয় বাণিজ্যদ্রব্য ডুলুথের পথেই যাতায়াত করে। যমক-শহর হইতে ডুলুথের দূরত্ব শতাধিক মাইল। ডুলুথে ও সেণ্ট পল-মিনিয়াপলসে বড় বড় 'এলিভেটর' আছে। এক একটি এলিভেটর লক্ষ লক্ষ মণ গম চালান দেয়। ইহারা বস্তা ব্যবহার করে না। যন্ত্রসাহায্যে রাশি রাশি গম গুদাম, গাড়ী বা জাহাজে স্থানান্তরিত করে। 'এলিভেটরে'র ব্যবহার যত বেশী হইবে পাটের চাহিদা তত কমিবে। এই হিসাবে 'এলিভেটর' পাটের প্রতিযোগী।

ট্রামে চলিতে চলিতে দু'ধারে সুন্দর সৌধশ্রেণী দেখিতেছি। আমেরিকার সমস্ত শহরের মত এই যমক-শহরও সুসজ্জিত এবং সমান ও সমান্তরাল পথশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। রাস্তায় পথচারী নাই বলিলেই হয়। লোক ঘর হইতে বাহির হইয়া যত শীঘ্র পারে ট্রাম বা অন্য যানে আরোহণ করে। রাস্তায়, প্রান্তরে, বাড়ীর ছাদে, গাড়ীর মটকায়, গাছের নগ্ন শাখায় শুধু বরফের স্তূপ। মিউনিসিপ্যালিটির বরফ-ঠেলা গাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ীগুলির সামনে বিরাট্ পাখা। সেই পাখা দিয়া রাস্তার মধ্যস্থলের বরফস্তূপ ঠেলিয়া দিতেছে। তাহাতে রাস্তার পাশে পর্বত-প্রমাণ বরফ জমিতেছে। পরে বরফ-বাহী গাড়ী আসিয়া যন্ত্রসাহায্যে সেই বিরাট স্তূপকে উড়াইয়া গাড়ীর মধ্যে ফেলিতেছে, আর শহর হইতে দূরে লইয়া গিয়া সেই বরফরাশি রাখিয়া আসিতেছে। ট্রাম লাইনের পাশেই গত দিনকার অগ্নিদগ্ধ এলিভেটরটি দেখিলাম। বিরাট্ 'এলিভেটর'। বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া সম্পূর্ণ ভস্মীভূত অবস্থায় ইহা পড়িয়া আছে। তখনও স্থানে স্থানে আগুন জ্বলিতেছে। বরফ আগুনের মধ্যে পড়িয়া গলিতেছে। পাশে সরিয়াই আবার জমাটবদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এইরূপে স্থানে স্থানে বহু জটাজুট সৃষ্টি হইয়াছে। নিকটেই মিসিসিপি নদী। নদীর উপর সুদৃশ্য সেতু। তাহার উপর দিয়া ট্রাম লাইন গিয়াছে। নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। মার্চ পর্যন্ত এই বরফ বাড়িবে। তারপর যখন এই দিগন্তবিস্তৃত বরফরাশি গলিতে সুরু করিবে তখন মিসিসিপি নদীর দক্ষিণাংশে বন্যা দেখা দিবে। এই বন্যা নিবারণ করাই টেনেসি উপত্যকা কর্তৃপক্ষের অন্যতম কর্তব্য। শহর ঘুরিয়া ফিরতি ট্রামে হোটেলে আসিলাম। তখন ৫টা বাজিয়াছে। তাপ শূন্য ডিগ্রী। রাত্রে তাপ শূন্যের ১৩ ডিগ্রী নীচে নামিয়া গেল।

৩০শে ডিসেম্বর সোমবার সকালে মিনিয়াপলিসের মিউনিসিপ্যাল আপিসে গেলাম। সেখানে শিকাগোর ১৩১৯ নং বাড়ীর পাব্‌লিক এড্‌মিনিষ্ট্রেশন সার্ভিসের কতিপয় বিশেষজ্ঞ কাজ করিতেছিলেন। নগরের শাসন-প্রণালীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান মানসে মেয়র মহাশয় এই সমিতিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সমিতির বিশেষজ্ঞগণ শাসনযন্ত্রের সমস্ত অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেছেন। ইঁহাদের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া ইঁহাদের কর্মপদ্ধতি দেখিলাম। ইঁহাদের মধ্যে হেষ্টভেড্‌ নামক জনৈক ইঞ্জিনীয়ার যুবক আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতেছিলেন। ইঁহাকে লইয়া নিকটস্থ একটি হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিলাম। আপিসে ফিরিবার পথে দেখি বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। পরিষ্কার নীলাকাশ। ধরণী রৌদ্রস্নাতা। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান্‌ সূর্য্য। তাহার দিকে তাকান যায় না। কিন্তু রৌদ্রের একটুও তাপ নাই। বরফ গলাইতেও সে রৌদ্র অসমর্থ। সূর্যের এবংবিধ রূপ আমাদের কল্পনাতীত। আমি হেষ্টভেড্‌কে বলিলাম, "আমাদের পুরাণে আছে যে এক অসুর সূর্যকে শাসন করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন যে পদ্মফুল ফুটাইতে যতটা তাপ প্রয়োজন তার বেশী তাপ সূর্য্য প্রকটিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু এদেশে দেখিতেছি সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বলতা আছে, তাপ আদৌ নাই। সূর্যের আর এক রূপ দেখিয়াছি নবেম্বর মাসে লণ্ডনে। ধোঁয়াটে আকাশে নিস্তেজ সূর্য্য। সে সূর্য্য রৌদ্র বিকিরণ করে না। চিত্রিত সূর্যের ন্যায় তাহার দিকে যতক্ষণ ইচ্ছা তাকাইয়া থাকা যায়। সূর্যের সে রূপ তবুও আমরা কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু এ রূপ ভাবিতেই পারি না। এ সূর্য্য আমাকে বহুবার বিভ্রান্ত করিয়াছে। ঘরে বসিয়া ভাবিয়াছি যে একটু রোদ পোহাইয়া আসি। বাহিরে আসিয়া হতাশ হইয়াছি।"

হেষ্টভেড্‌ আমাকে ক্যাপিটল ভবনে লইয়া গেলেন। সেখানে সকলের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া তিনি স্বকার্যে ফিরিয়া গেলেন। সরকারী আপিসগুলির বেশীর ভাগ এই ভবনে অবস্থিত। কতকগুলি আপিস রাস্তার ওপারে আর একটি বাড়ীতে। দুইটি বাড়ীর মধ্যে মাটির নীচে দিয়া সুড়ঙ্গ-পথ আছে। শীতের অত্যধিক প্রকোপের জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। এখানে ড্রিস্‌কল ও আর্লবার্গ নামক দুই জন কর্মচারী আমাকে যথাসম্ভব সহায়তা করেন। ড্রিস্‌কলের পদবী কমিশনার অব্‌ এড্‌মিনিষ্ট্রেশন আর আর্লবার্গ তাঁহার সহকারী।

পরদিনের কর্মসূচী স্থির করিয়া বৈকালে হোটেলে ফিরিলাম। ঐদিন বেশ রোদ ছিল। সকাল ন'টায় তাপ ছিল শূন্যের দশ ডিগ্রী নীচে। সর্বোচ্চ তাপ চার ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়াছিল। তখন বেলা ২টা। বৈকাল ৬টায় তাপ নামিয়া শূন্যে আসিল। রাত্রি ২টায় শূন্যের ষোল ডিগ্রী নীচে নামিয়া গেল।

বৈকালে হোটেল লাউঞ্জে বসিয়া আছি। লোকজন আসিতেছে, যাইতেছে। একটি বৃদ্ধ আমার পাশে আসিয়া বসিলেন। প্রশ্ন করিলেন—

"আপনি কোন্‌ দেশের লোক ?"

আমি—"ভারতবর্ষের"

বৃদ্ধ—"ইংরেজ কি আপনাদিগকে স্বাধীনতা দানে কৃতকার্য হইবে ?"

কথাটা কানে ঠেকিল। একটি ইংরেজী প্রবাদবাক্য আবৃত্তি করিলাম—"ইচ্ছা থাকিলে উপায় হইবেই।"

বৃদ্ধ—"আমাদের ভারতবর্ষে কোন স্বার্থ নাই। কাজেই ওদেশের খবর বিশেষ রাখি না। চীনে আমাদের কিছু স্বার্থ আছে। কাজেই চীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ উদ্বেগ আছে।"

আমি—আমরাও গত যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার বিশেষ খবর রাখিতাম না। অবশ্য জর্জ ওয়াশিংটন ও এব্রাহাম লিঙ্কনের নাম অনেকেই জানিতেন।"

বৃদ্ধ মিনেসোটার হ্রদমালার সৌন্দর্য এবং আকর্ষণের কথা বলিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ উঠিয়া গেলে ভাবিলাম এমন কাট-খোট্টা কথাবার্তা এদেশে তো কাহারও কাছে শুনি নাই। বৃদ্ধের কথার মধ্যে ঘৃণাও নাই, প্রীতিও নাই। ভারতবর্ষ ও ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে এখানে ওখানে দু-একটি কথা শুনিয়া তাহার মনে যেটুকু দাগ লাগিয়াছে তাহাই সরলভাবে প্রকাশ করিলেন মাত্র।

বাংলার বাচ

শ্রীশান্তি পাল

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ জলকে জয় করিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। সেই সুদূর অতীত হইতে জলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য মানুষ কত রকমের জলযান আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে তাহার সীমা-পরিসীমা নাই। নদীমাতৃক বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাংলাদেশের মাঝিমাল্লারা আগেকার দিনে যে সেই সকল জলযানে আরোহণ করিয়া দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিত এ তথ্য আমরা বহু প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে পাই।

সেকালের নাবিক বা মাঝি-মাল্লাদের ভিতর যে রীতিমত পাল্লা দেওয়া চলিত তাহার অনেক প্রমাণ পুথিপত্রে আমরা পাই। এই বাচখেলার ভিতর দিয়া বাংলাদেশের ভদ্র-ইতর নির্ব্বিশেষে সকলেই শক্তিচর্চ্চা বা শরীরচর্চ্চা করিত। জনসাধারণও ইহা হইতে প্রচুর আমোদ উপভোগ করিত। তাই এক সময়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পাল-পার্ব্বণে বাচ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া গ্রামের বাচ-প্রতিযোগিতার বিবরণ হইতে পূর্ব্ববঙ্গের বাচ সম্পর্কে অনেক কিছু জানিতে পারি। ঐ অঞ্চলের বাচের বিশেষত্ব এই যে, এখানকার বৃহদাকারের বাচের নৌকাগুলিতে একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাট জন মাঝি বৈঠা হাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৌকা বাহিতে পারে। সেই সকল বাচ নৌকার গলুই পনর হইতে কুড়ি হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এখানে অনেক সময় নৌকার মালিকের নামানুসারে নৌকার নামকরণ হইয়া থাকে। যথা—শুধিয়ামধু, বুধিয়ামধু, বাসের-নাও ইত্যাদি। কোটালীপাড়ার বাচ-প্রতিযোগিতায়ও বাংলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এক এক বাচ-দৌড়ে সাধারণতঃ দশ-বারখানি নৌকা যোগদান করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

কোটালীপাড়ায় সাধারণতঃ দুই প্রকার বাই-নৌকা বা বাচারী নৌকা ব্যবহৃত হয়। ইহার একটিকে প্রকৃত বাচারী ও অপরটিকে জেলে-বাচারী বলে। বাচ-বাচারী ও জেলে-বাচারীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, বাচ-বাচারীর গলুই কিঞ্চিৎ লম্বাটে ধরণের এবং ইহার গঠনসৌষ্ঠবও অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের।

জেলে-বাচারীর গলুই ছোট এবং গঠনসৌষ্ঠব বাচ-বাচারীর তুলনায় অনেকাংশে হীন। বাচ-বাচারী অনেকটা ছিপের মত আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘ ছাঁচের তৈয়ারী। জেলে-বাচারীর গঠনপ্রণালীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ডরার দিকটা কিঞ্চিৎ ফাঁক থাকে। কারণ, এই নৌকাগুলি এমনভাবে তৈয়ারী যে, ইহাতে বাচখেলা ও মাল বহন দুই কাজই সম্পন্ন হইতে পারে; অর্থাৎ বাচের সময় বাচখেলা এবং অন্য সময় মহাজনী নৌকার মত ব্যবহার করা চলে। বাচারীর গলুই অতিশয় লম্বা ধরণের হওয়ায় তাহা জেলে-বাচারীর মত জলপথে দৈনন্দিন ঘর-সংসারের কাজকর্ম্ম চালাইবার উপযোগী নহে, তবে কোন কোন স্থানে ঐ ধরণের নৌকায় ধান বোঝাই করিয়া আনিতে দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃত বাচারী নৌকাগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ হইতে ষাট হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই 'হাতে'র মাপ কিন্তু সাধারণ হাতের মাপ হইতে কিঞ্চিৎ বেশী। ছোট আকারের বাচারী অর্থাৎ জেলে-বাচারীগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পনর হইতে কুড়ি হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই শ্রেণীর নৌকাগুলিকে সময় সময় বাচ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেও দেখা যায়। বড় নৌকাগুলিতে পঞ্চাশ-ষাট জন মাঝি আরোহণ করে। আরোহীদের ভিতর সকলেই নৌকার দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে হাতবৈঠা লইয়া বসে। নৌকার মাঝখানে মালিক ও মোড়লশ্রেণীর পাঁচ-সাত জন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া থাকেন এবং টিকারা ও কাঁসরের তালে তালে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচিয়া নাচিয়া ও নিজেদের রচিত গান গাহিয়া মাঝি-মাল্লাদের উৎসাহিত করেন। বৃহৎ বাচারীর আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, বাচের সময় তাহাতে দুই জন করিয়া মাঝি হাল ধরিয়া থাকে। গ্রামের ওস্তাদ ও পুরাতন মাঝিরাই এই হাল ধরার কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কারণ বাচের সময় নিপুণতার সহিত হাল না ধরিতে পারিলে বিশেষ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে।

নদীবক্ষ বিস্তৃত হইলে বাচের সময় একসঙ্গে আট হইতে দশখানি নৌকা ছাড়া হয়। কিন্তু নদীর বুক অপরিসর হইলে তিন-চারিখানির বেশী একসঙ্গে ছাড়া হয় না। পূর্ব্বে কোটালীপাড়ায় বহুস্থানে বাচ খেলা হইত। উৎসাহের অভাবে এবং নানারূপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় ইদানীং অনেক স্থানে বাচের রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। তবে এখনও বিশ্বকর্ম্মা পূজা, শারদীয়া ষষ্ঠীপূজা, দশহরা অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিন এবং লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে চৌধুরীর হাট, ঘাঘর, বাহির শিমুল, রাধাগঞ্জ বুরুয়া, বিলবাঘিয়া প্রভৃতি স্থানে নামমাত্র বাচ-খেলা

হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রামে রঙ্গস্থলে পঞ্চাশ-ষাট-খানি নৌকার সমাবেশ হইত। এখন পাঁচ-সাতখানির বেশী হয় না। কোটালীপাড়ায় বাচ-নৌকা এক রকম নাই বলিলেই চলে। দশ-বার বৎসর পূর্ব্বে সেখানে অন্যূন ছোটবড় চল্লিশ-পঞ্চাশখানি বাচ-নৌকা বা বাচারী একত্র দেখা যাইত। উৎসবক্ষেত্রেও যেরূপ জনসমাগম হইত এখন তাহার এক-অষ্টমাংশও হয় কিনা সন্দেহ। সবই যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। কোটালীপাড়ার এ বিষয়ে এমন অবনতি হইয়াছে যে এখন সারা গ্রাম ঢুঁড়িলে সাত-আটখানির বেশী জেলে-বাচারী পাওয়া যাইবে না।

বাচের সময় অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানেও মাঝিরা নানাপ্রকার গান গাহিয়া থাকে। তন্মধ্যে ব্রজলীলা সম্বন্ধীয় গানেরই প্রচলন বেশী। বাচ-নৌকা যখন মালিকের ঘাট হইতে রঙ্গক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়, যখন গ্রাম-বধূরা বরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তখন এই গানটি কাঁসার তালে তালে গীত হয়।

"কয় নীলমণি, ও জননী!
সাজাইয়া দাও গোষ্ঠে যাব আমি।
যাব গোচারণে রাখাল সনে
বলাই দাদা শিঙেয় দিচ্ছে ধ্বনি।
দে মা! মোহন বাঁশী মোহন চূড়া
কটিতে মা বাঁধ পীতধরা—
দেও মা পায়ে নূপুর, হাতে বলয়
রাখালবেশে সাজিয়ে দেও তুমি
(শোন মা!) গাভী বৎস রাখালগণে
সবাই চেয়ে আছে আমার পানে
আমি না গেলে মা, গোচারণে—
ধেনুগণ খায় না তৃণ-পানি।"

আড়ঙে অর্থাৎ রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া এবং দুই-তিন ক্ষেপ বাচ টানিবার পর বাচ-ক্ষেত্রের দুই ধার দিয়া নৌকা ধীরে ধীরে চালাইবার সময় তাহারা কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা শ্রীমতীর মর্ম্মবেদনাদ্যোতক গান গাহিয়া থাকে।

তারপর যখন বাচ খেলা শেষ হইয়া যায়, যখন গৃহাভিমুখে ফিরিবার জন্য মাঝিরা প্রস্তুত হয়, তখন এই গানটি গাহিতে থাকে—

"বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল
কানাই এবার গৃহে ফিরে চল।
ওই দেখ গগনেতে নাহি আর বেলা
গোষ্ঠের খেলা খেলবে কত বল?

ডেকে বলে বলাই ও নীলমণি
তোর লাগিয়া কাঁদিছে জননী
চল রে সকাল সকাল গৃহেতে যাই
গোঠের খেলা সাঙ্গ হ'ল।"

শেষে নৌকা মালিকের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে, বাচ-খেলোয়াড়রা বাই-নৌকা হইতে নামিয়া গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে। কোটালীপাড়ায় মাঝি-মাল্লাদের ভিতর এখনও পর্য্যন্ত এই প্রথা বজায় রহিয়াছে। এখানকার বাচখেলায় যারা অগ্রণী তন্মধ্যে সূর্য্যকান্ত হাজরা, অধরচন্দ্র বাড়াই—প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমানদের কোন বাচারী-নৌকা কোটালী পাড়ায় আর বড় একটা দেখা যায় না। তাহারা দুই তিন বৎসর হইতে আর প্রতিযোগিতায় যোগদানও করে না।

মুর্শিদাবাদ বা অন্যান্য জেলায় বাচখেলার সময় 'জারি' গান গাওয়া হয়।

ঢাকা অঞ্চলে বাচখেলার সময় যে সকল গান গাওয়া হয় তাহার একটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। বাচ-খেলায় হারিয়া গেলে মাঝিরা এই ধরণের করুণরসাত্মক গান গাহিয়া থাকে—

"নিমাই সন্ন্যাসের কথা মায় যেন শোনে না,
আমি যাবো ঐ বৃন্দাবনে, আমার মা যদি শোনে
শুনলে পরে শচীরাণী বাঁচবে না প্রাণে।
আমি মায়ের একা পুত্রধন—
আমি বিহন মায়ের এ সংসার সং-সারের জীবন।
আমার মায়েরে তোমরা করো সান্ত্বনা।"

খুলনা বরিশাল অঞ্চলে বাচের সময় যে ধরণের 'জারি' গান গাওয়া হয় তাহারও যৎকিঞ্চিৎ নমুনা দিলাম। নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে মাঝিরা এই গান গাহিয়া থাকে—

"গুরুমান পথ চেন কেন বেড়াও ঘুরে
হাট করতে এসেছ বান্দা ভবের হাটুরে।
ভবের হাটে এসে বান্দা বেচ কেন খাও
আলিস্থি কর না বান্দা আল্লার নাম নাও।"

এইবার আমরা কলিকাতার উপকণ্ঠের পল্লী অঞ্চলের আধুনিক বাচের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বে আমরা বালি, উত্তরপাড়া, বরাহনগর, বেনিয়াটোলা, আহিরীটোলা, বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের বাচ-সঙ্ঘের বিষয় মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আড়িয়াদহের প্রসিদ্ধ বাচ সম্পর্কে

যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকদের গোচরীভূত করিতেছি। এখানে একটি কথা বলা দরকার। বাংলা-সাহিত্যে বাংলার বাচ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে বড় একটা আলোচনা হয় নাই। ইহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস আজও পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই।

১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাহেশের রথ উপলক্ষে আড়িয়াদহের পরলোকগত রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয় পান্‌সীতে করিয়া শ্রীরামপুর বেড়াইতে যান। তথায় গিয়া তিনি চাপদানির জমিদারের সহিত মিলিত হইলে পর উভয় পক্ষের নৌকার মাঝিদের ভিতর এক প্রীতি-প্রতিযোগিতার কথাবার্ত্তা হয়। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ইহা সমর্থন করেন এবং নিজ নিজ পক্ষের মাঝিমাল্লাকে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করেন। তাঁহারা এই ঘটনা হইতেই এখানে প্রতি বৎসর মাহেশের মেলায় আসিয়া প্রতিযোগিতার সূত্রপাত করেন। এই দুই ব্যক্তি মহা আড়ম্বরের সহিত নৌকা-প্রতিযোগিতা অর্থাৎ বাচখেলা চালাইতেন। প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবার জন্য উভয় পক্ষই প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নিজ নিজ এলাকার শক্তিমান্ মালা জাতীয় লোকদিগকে হাল ও দাঁড়ে নিযুক্ত করিতেন। কখনও কখনও জিদের বশবর্ত্তী হইয়া জমিদারদ্বয় নৌকা বাজি রাখিয়া খেলা চালাইতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া আড়িয়াদহের স্বর্গগত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামস্থ ভদ্রযুবকদিগকে ঐ খেলায় তালিম দিতে লাগিলেন। তিনিও অল্প দিনের মধ্যে একটি নূতন দল গঠন করেন। কিছুদিন অভ্যাসের পর সেই নূতন দলের ভিতর কেহ হাল ধরায়, কেহ বা দাঁড় টানায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইহাই আড়িয়াদহ বাচ-সঙ্ঘের জন্ম কথা।

আড়িয়াদহ, বালি, উত্তরপাড়া, বরাহনগর, চাতরা প্রভৃতি স্থানে নদীবক্ষে যতবার বাচ খেলা হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আড়িয়াদহের যুবকেরা জয়ী হন। ১৯১০ সনে আড়িয়াদহ 'রোয়িং-ক্লাব' সর্ব্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হয়। আড়িয়াদহ রোয়িং ক্লাবে দাঁড় টানায় ও হাল ধরায় যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতারণ ভট্টাচার্য্য, নৃত্যগোপাল ঘোষাল (হালি), দাশরথি কর, হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল রোয়িং এ্যাসোসিয়েশন'-এর সৃষ্টি হওয়ার পর 'লীগ' খেলা আরম্ভ হয়। আড়িয়াদহ ক্লাবের সভ্যেরা বহুবার এই লীগ-প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। উক্ত অনুষ্ঠানের কিছুকাল পরেই 'ট্রফী' খেলাও সুরু হয়। ইহাতেও আড়িয়াদহ বহুবার জয়লাভ করে। ১৯৩৭-৩৮-৩৯ উপর্য্যুপরি এই তিন বৎসর লীগ ও ট্রফীতে জিতিয়া আড়িয়াদহ রেকর্ড সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়—এরূপ রেকর্ড ইতিপূর্ব্বে আর কোন ক্লাব করিতে পারেন নাই। যাঁহারা চ্যাম্পিয়ানশিপ বা বিজয়ী বীর আখ্যা লাভ করিবার সময় দাঁড়ী ও হালী ছিলেন তাঁহাদের নাম—শ্রীযুক্ত তারাপদ কুণ্ডু (হালী); নিরঞ্জন দাস (সোয়ার) অনন্তদেব ঘোষাল, বলাইলাল ভট্টাচার্য্য, তারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, কালীচরণ দাস, বৈদ্যনাথ পাল, বলাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের দেশে পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে বাচখেলা সাধারণতঃ বৈঠার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁধা-দাঁড়েও বাচখেলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পূর্ব্ববঙ্গের বাচ-নৌকাগুলি আসলে ছিপ নৌকা। ইহার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ-ষাট হাত পর্য্যন্ত। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ পল্লীসমূহে বাঁধা-দাঁড়ে বাচ-খেলা হইয়া থাকে। ইহাদের বাচ-নৌকাগুলি অনেকটা পান্‌সীর আকারে নির্ম্মিত। ইহাতে ছয়খানি দাঁড় থাকে। এই পদ্ধতিতে দাঁড় টানিবার সময়ও দেহের সমস্ত ভার ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। এই পদ্ধতিতে বিশেষ করিয়া কব্জি, বাহু, কাঁধ, কটি ও বুকের পেশীগুলি বেশী ক্রিয়াশীল হয়।

বাচ-খেলায় জয়লাভ দাঁড় ক্ষেপণের কৌশলের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। হাত, বাহু, কাঁধ প্রভৃতি দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ চালনারও অনেক নিয়ম আছে। এ সম্বন্ধে বিদেশী পদ্ধতি প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য। দাঁড় ক্ষেপণ কিরূপে সুষ্ঠু ভাবে করা যাইতে পারে—কেমন করিয়া নিরর্থক ক্লান্তির হাত এড়ানো যাইতে পারে তাহা কিছুদিন দাঁড় চালনা অভ্যাস করিলে দাঁড়ীরা নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন। দাঁড় ক্ষেপণই হোক আর হাল ধরাই হোক, যতদূর সম্ভব সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন দলের দাঁড়ীদের দাঁড়টানা-পদ্ধতি তাঁহাদের বিপক্ষদলের দাঁড়ীমাঝি অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও কেবল সামঞ্জস্যপূর্ণ দাঁড় ফেলার জন্য তাঁহারা জয়ী হইয়াছেন। হাল ধরার উপরেও অনেকাংশে জয়-পরাজয় নির্ভর করে।

বাচখেলায় যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা একমাত্র সন্তরণ ছাড়া আর কোন খেলায়ই পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সকল দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবিদের অভিমত এই যে, নৌচালনা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহা সন্তরণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। নদীবহুল বাংলা দেশে বাচ খেলার কদর যে হ্রাস পাইতেছে, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। এই নির্দ্দোষ ক্রীড়ার অনুষ্ঠান যাতে দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় সে বিষয়ে দেশহিতৈষী মাত্রেরই অবহিত হওয়া উচিত।

পুস্তক-পরিচয়

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড) —শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ. ৩২+২৫২ শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ষোলখানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য চারি টাকা আট আনা।

এই গ্রন্থখানি পুরাতন "অমৃত বাজার পত্রিকা"র ফাইল হইতে নির্ব্বাচিত অংশের সঙ্কলন। বর্ত্তমানে "অমৃত বাজার পত্রিকা" একখানি সুপরিচিত ইংরেজী দৈনিক পত্র। কিন্তু প্রথমে ইহা ছিল একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। মুখ্যতঃ রাজনৈতিক সংবাদপত্র হইলেও ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভাষা, সাহিত্য ও দেশের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত নানা সভা-সমিতি বিষয়ক বহু আলোচনা ইহাতে হইত। অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম তিন বৎসরের বিভিন্ন সংখ্যায় এই সমুদয় বিষয়ে যে সকল আলোচনা ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে সঙ্কলন করিয়া যোগেশবাবু এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

প্রথম খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা সংকলিত হইয়াছে:—(১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা; (২) সিবিল সার্বিসে ভারতবাসী; (৩) বিচার ও শাসন; (৪) মামলা-মকর্দ্দমা; (৫) রাজনৈতিক সভাসমিতি, (৬) হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা; (৭) জমিদার ও জমিদারী; (৮) জনসাধারণ ও মধ্যবিত্ত; (৯) কৃষি ও বাণিজ্য; (১০) মুসলমান সমাজ ও রাজনীতি; (১১) হিন্দুসমাজ সংস্কার; (১২) ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ; (১৩) কেশবচন্দ্র সেন। এই সমুদয় বিষয়ের আলোচনা পৃথকভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং প্রতি উদ্ধৃত অংশের শেষে পত্রিকার যে সংখ্যায় উহা বাহির হইয়াছিল তাহার তারিখ দেওয়া আছে। ইহা ব্যতীত পরিশিষ্টেও কতকগুলি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে।

এইরূপ গ্রন্থ বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও খুব বেশী নাই। সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" নামক গ্রন্থে এই ধরণের আলোচনা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। গ্রন্থকার কেন কেবলমাত্র অমৃত বাজার পত্রিকা হইতে সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন তাহা গ্রন্থের প্রথমেই "পূর্ব্বাভাষ" নামক ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অমৃত বাজার-পত্রিকার সাহায্য যে খুবই মূল্যবান গ্রন্থকার তাহা বিশদভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে, "শিশিরকুমার ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক।" তৎকালে "সমাচার চন্দ্রিকা"ও লিখিয়াছেন যে, "নিরপেক্ষভাবে স্বাধীনতা প্রদর্শন ও দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার চেষ্টা অমৃত বাজারের ন্যায় কোন পত্রিকায়ই দেখা যায় না।" বস্তুতঃ ভারতবাসীর অবনতির মূলে যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই যে উন্নতির একমাত্র উপায় নানা ভাবে তাহা প্রতিপন্ন করাই ছিল ঐ পত্রিকার মূল নীতি। আর সেকালে অমৃত বাজারই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিশীল পত্রিকা। সুতরাং গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন যে, "আমাদের সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলমুক্তির সম্ভাবনার কথা তখন কিরূপে বাঙালীর মনে উৎসারিত হয় ইহাতে তাহার সূত্র মিলিবে।"

এই শ্রেণীর গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপাদানের সংগ্রহ হিসাবে যে বহু মূল্যবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর—এমন কি উচ্চশিক্ষিত বাঙালীরও—জ্ঞান অতিশয় অল্প। এই যুগের যে ইতিহাস আমরা জানি তাহা প্রধানতঃ ইংরেজরাজের ইতিহাস। কিন্তু এই শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে যে সমুদয় গুরুতর পরিবর্ত্তনের ফলে আমরা মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগে উপনীত হইয়াছি তাহার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই—এবং ইহার মূল কথাগুলিও অনেকের নিকট অজ্ঞাত। অথচ আমাদের জাতীয় জীবনের বিবর্ত্তন বুঝিতে হইলে ইহার সহিত সম্যক্ পরিচয় থাকা দরকার। সম্প্রতি আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিতে বা বুঝিতে হইলেও ইহার মূলসূত্র ঐ যুগেই খুঁজিতে হইবে। কেবল অতীতের কথা নহে, ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় শক্তি কোন্ দিকে চালিত হইবার সম্ভাবনা বা হওয়া কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলেও জাতীয় জীবনের ঐ গোড়ার কথা জানা আবশ্যক। সুতরাং বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের—উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস যাহাতে আমরা জানিতে পারি তাহার জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু বহু আয়াস স্বীকার করিয়া যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, এই প্রকার ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ হিসাবে তাহা চিরদিনই আদৃত হইবে। বস্তুতঃ এই প্রকার উপকরণ বহুল পরিমাণে সংগৃহীত না হইলে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হইবে না।

আলোচ্য গ্রন্থে যে সকল সঙ্কলন স্থান লাভ করিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে। তবে 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা' শীর্ষক অধ্যায়ে যে সকল উক্তি ও মতবাদ সংগৃহীত হইয়াছে বর্ত্তমানকালে তাহা পাঠ করিয়া অনেকেই আমাদের দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজনৈতিক চিন্তার ধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হইতেছিল তাহার সন্ধান পাইবেন। সিপাহী বিদ্রোহ (৪০ পৃঃ) ও ভারতে ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব (৪৫ পৃঃ) সম্বন্ধে ১৮৭০ সালে অমৃত বাজার পত্রিকায় যে সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল অতি আধুনিক কালের পূর্ব্বে তাহার সম্ভাবনাও আমরা কল্পনা করি নাই। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার জন্য কিভাবে মুসলমানদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কিছু আভাসও ১৮৭০ সালের পত্রিকায় পাওয়া যায় (১৭৪ পৃঃ)। সকলেই জানেন যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত কেবল ছোটখাট শাসন-সংস্কারই ইহার প্রধান আবেদনের বিষয় ছিল। কিন্তু ১৮৭০ সালেই পত্রিকায় "ভারতবর্ষের স্বাধীন শাসন-প্রণালীর সূত্রপাত হিসাবে প্রতিনিধি সভা স্থাপনের প্রস্তাব অনেক যুক্তি তর্ক দিয়া সমর্থিত হইয়াছে" (৫৭ পৃঃ)। রাজনৈতিক সভা-সমিতি শীর্ষক অধ্যায়ে যে সমুদয় সঙ্কলন আছে তাহা হইতে আমরা সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আলোচনার একটি সমসাময়িক চিত্র দেখিতে পাই। "হিন্দুসমাজ সংস্কার" অধ্যায়েও অনেক নূতন তথ্য আছে (১৮৩ পৃঃ)। আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন নাই। এযাবৎ যাহা বলিয়াছি আশা করি তাহা হইতেই আলোচ্য গ্রন্থের প্রকৃতি ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভবপর হইবে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি ও দ্বিতীয় খণ্ড যাহাতে শীঘ্রই প্রকাশিত হয় তাহার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ অনুরোধ করি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বাংলা সাময়িক-পত্র—(১৮১৮-১৮৬৮)। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, নূতন সংস্করণ, মাঘ ১৩৫৪। মূল্য পাঁচ টাকা।

এই অধুনা-প্রখ্যাত পুস্তক ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটক, নভেল ও কবিতায় পরিপ্লাবিত দেশে বার বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর পুস্তকের দুইটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া নূতন সংস্করণের প্রকাশ অভাবনীয় না হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করিতেছে। কেবল সুধীসমাজ নহে, সাধারণ পাঠকও যে ইহার সমাদর করিয়াছেন, তাহা আনন্দের বিষয়।

ইহার একটি কারণ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা সাময়িক-পত্রের প্রসারের যে ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, তাহার সংগত, প্রামাণ্য ও ধারাবাহিক বৃত্তান্ত এই পুস্তকই প্রথম বাঙালী পাঠকের গোচরে আনিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এই বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তৎকালীন পত্রিকাগুলির পুরাতন ফাইলে যে ঐতিহাসিক উপাদান বিক্ষিপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য অবস্থায় ছিল, উৎসাহী কর্ম্মীর অভাবে তাহার সম্পূর্ণ অনুসন্ধান হয় নাই। এরূপ অনুসন্ধানের জন্য যে ধৈর্য্য, পরিশ্রম, ও যত্নের আবশ্যক তাহা এখনও বাংলাদেশে সুলভ নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু অভিজ্ঞ ও সাবধানী গবেষক নহেন, তাঁহার অনুরাগ ও অধ্যবসায় অনন্যসাধারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনি একাই একটি জীবনে যাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহার একনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সাধনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য উপকরণ সংগ্রহ হিসাবে তাঁহার অন্যান্য নিতভাণী ও তথ্যবহুল বহু গ্রন্থের মত বর্ত্তমান গ্রন্থও যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পরিচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া বাহুল্যমাত্র।

বর্ত্তমান সংস্করণের শুধু এইটুকু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক যে, ইহাতে অনেকগুলি নূতন পত্র-পত্রিকার বিবরণ সংযোজিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত সাময়িক-পত্রগুলির বিবরণ ছিল, এবার তাহা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে—১৮৬৮ এপ্রিল পর্য্যন্ত।

শ্রীসুশীলকুমার দে

জেলে ত্রিশ বছর—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

এই পুস্তক "যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, বীরত্ব দেখাইয়াছেন, অত্যাচার-নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন, দেশবাসী যাঁহাদের নাম জানে না, সেই সব অজ্ঞাতনামা বীর দেশপ্রেমিকের উদ্দেশ্যে" উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী এইরূপ উৎসর্গ করিবার যোগ্যতম ব্যক্তি, কেননা তাঁহার জীবনের কাহিনী ঐরূপ জ্বলন্ত ও নিষ্কাম দেশপ্রেমের অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজিকার পেশাদারী দেশ-প্রেমের দিনে, যেখানে চতুর্দ্দিকে স্বার্থান্বেষী ভণ্ড তথাকথিত "ত্যাগীদিগের" চক্রান্তে দেশ ডুবিতে বসিয়াছে সেই বাংলাদেশে ত্রৈলোক্যবাবুর এই কারাকাহিনী প্রকাশ অতিশয় সময়োপযোগী হইয়াছে।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁহারা প্রকৃতই জীবন-মরণ পণ করিয়া কোনও ফলের আশা না রাখিয়া সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছিলেন, "মহারাজ" তাঁহাদেরই একজন। সেই কারণেই বোধ হয় এই পুস্তক এত হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। ইহার প্রতিটি পরিচ্ছেদ পড়িলে আরও পড়িবার, আরও জানিবার ইচ্ছা বাড়ে। এই পুস্তক বাংলার প্রত্যেক স্কুলে সাধারণ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট হইলে দেশের ছেলেমেয়েদের বিশেষ উপকার হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবে আশা করি, কেননা বাংলার ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রকৃত পরিচয় এইরূপ পুস্তকেই পাওয়া সম্ভব।

ক. চ.

রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

এখানি আলোচনা-গ্রন্থ, কবির কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কবিতা ও কাব্যগুলির আলোচনা। ইহার পূর্ব্বে ভিন্ন গ্রন্থে গ্রন্থকার ধারাবাহিকভাবে কবির অন্যান্য কাব্যের আলোচনা করিয়াছেন। ভূমিকায় লেখক বলিতে-ছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ও মানসের উৎসমূলে পৌঁছিবার চেষ্টাই 'রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝরে'র একটিমাত্র লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনের কথা আমাদের আকর্ষণ করে। সেই আলোচনায় যদি নূতনত্ব থাকে তাহা আমাদের আনন্দের কারণ হয়। গ্রন্থকার সুলেখক, বাল্য হইতেই তিনি কবির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এবং রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে তিনি গভীরভাবে অবগাহন করিয়াছেন। তাঁহার রচনা সরস। আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁহার মন্তব্যগুলি অনেক সময় আমাদের চমৎকৃত করে।

কবির প্রথম সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ ১২৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইখানিতে সেই 'বনফুল' হইতে আরম্ভ করিয়া, 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' এবং 'শৈশব সঙ্গীত' পর্য্যন্ত কাব্যগুলির আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনার আলোচনায় লেখক 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র সাহায্য লইয়া তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে যে-সব প্রভাব পড়িয়াছে এই দুইখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থে সেইসব সূত্রের মূল বর্ণিত আছে। রবীন্দ্রকাব্যের পারিপার্শ্বিক নির্ণয় করিতে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের উপর মহর্ষির প্রভাব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অন্যান্যের প্রভাব, এবং তাঁহার প্রাথমিক রচনার উপর বিহারীলাল ও হেমচন্দ্রের প্রভাবের কথা বলিয়াছেন। শেষোক্ত প্রভাব অল্পকালের মধ্যেই অন্তর্হিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

No 10606

৪৮শ ভাগ ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীন পশ্চিম বাংলা ?

যে জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনের ফলে আজ ভারতবর্ষের চারি-পঞ্চমাংশ স্বাধীন ভারতে পরিণত হইয়াছে, তাহার জন্ম এবং পুষ্টি প্রথমে বাংলাদেশেই হয়। বাংলাদেশেই বঙ্গবিভাগের পরে বয়কট, সন্ত্রাসবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধের আরম্ভ হয় এবং ভারতের স্বাধীনতার অভিযানে এদেশবাসী প্রথমে সফলকাম হয় এই বাংলাদেশেই ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে বাধ্য করিয়া। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়া বাংলা ও বাঙালী হিন্দু যেরূপ ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, যেরূপ কারাবরণ ও আত্মবলিদান দিয়াছে, তাহার পরিমাণ সমস্ত ভারতের, বাংলা-বর্জ্জিত অন্য অংশ সকলের, সমষ্টিগত আহুতি অপেক্ষাও অধিক। আজ স্বাধীনতা আসিয়াছে এবং জগতের নিয়মানুসারে আজ বাংলার অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে যাওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজ বাংলার যে অংশ ভারতরাষ্ট্রে রহিয়াছে তাহা চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং ধ্বংসের পথে দ্রুত চলিয়াছে। কেন এ রকম হইল সেকথা কি কেহ ভাবিয়াছেন ?

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই শতাব্দীর গোড়াতেই বুঝিয়াছিল যে ভারতকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে হইলে বাঙালীর সর্ব্বনাশ, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুর ধ্বংস করিতেই হইবে। সেই জন্য প্রথমে বাঙালীরই উপর দমননীতির প্রচণ্ড প্রয়োগ আরম্ভ হয়। বাঙালী তাহাতে দমে নাই, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও সে তাহার আদর্শ ছাড়ে নাই। চণ্ডনীতির প্রয়োগে কার্য্যসিদ্ধি হইল না দেখিয়া চতুর ইংরেজ অন্য পথ গ্রহণ করিল। বাঙালীকে ভাতে মারিয়া তাহার সংগ্রামশক্তিকে ক্ষীণ করিবার পথ সে বাহির করিল। প্রথমে সে বাংলায় গৃহবিবাদ লাগাইল মুসলমানের প্রতি কপট প্রেম নিবেদন করিয়া। এই প্রেমের স্বরূপ দেখা দিল বাঙালী হিন্দুকে তাহার জন্মগত অধিকার ও প্রাপ্য স্বার্থ হইতে সকল দিক দিয়া বঞ্চিত করিয়া মুসলমানকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্যের অধিক দিয়া। দ্বিতীয়তঃ, সে বাংলার সকল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বাঙালী বহিষ্কার করিয়া ভিন্ন প্রদেশীয়দিগকে অন্যায় ভাবে অধিকার দান করিয়া তাহাদিগকে নিজের দলে টানিল। ভিন্ন প্রদেশীয় ধনলুব্ধ অভ্যাগতের দল পরম উৎসাহে বাঙালীর ধ্বংসসাধনে ইংরেজের সহায়তা করিতে লাগিয়া গেল। ইংরেজ বণিক বাঙালীর কারবার খর্ব্ব করিবার জন্য মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, গুজরাটি, এবং উত্তর-প্রদেশীয়দিগকে ব্যবসায়ে সুবিধা দিল। ব্রিটিশ সরকার চাকুরীতে "Bengalis need not apply" "বাঙালীর আবেদন বৃথা" এই নীতি প্রকাশ্যে চালনা করিতে লাগিল। বাংলার ও বাঙালীর ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে বিদেশী ও ভিন্ন প্রদেশীয়ের করায়ত্ত হইল, বাংলায় শোষণ সবেগে চলিতে লাগিল। আজ বিদেশী শোষক অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন কিন্তু ভিন্ন প্রদেশীয় শোষক বাংলার হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিতেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলা আজ আগেকার চাইতেও অসহায় ও পরাধীন। বাঙালীর বুকের উপর বসিয়া ভিন্ন প্রদেশীয় চোরাকারবারী বাংলার রক্তমাংস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। আজ ইংরেজ তাহাদিগকে সহায়তা করিতেছে না, তবে তাহাদের শোষণ বন্ধ করা যায় না কেন ?

বাঙালীর সংঘবদ্ধ শক্তিকে খর্ব্ব করার জন্য পূর্ব্ববঙ্গকে কাটিয়া ছেদ করায় তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, অথচ পশ্চিমবঙ্গের সিংহভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং উত্তরবঙ্গের পূর্ণিয়ার অংশ কাটিয়া যখন বিহারের কুক্ষিগত করা হইল তখন কংগ্রেসের দু'চারিটি প্রস্তাবনা এবং সমালোচনা ভিন্ন আর কোন সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। এইরূপই বা হইল কেন, একথাও বিবেচনা করার সময় আজ আসিয়াছে; কেননা আজ বাংলা চিরদিনের জন্য তাহার ঘরবাড়ী ও ভাই-বোনের এক অংশকে হারাইতে বসিয়াছে।

এইরূপ অবস্থার কারণ বাংলা বলিতে ব্রিটিশ সরকার বুঝিত বিদ্রোহীর আবাসভূমি। বিদ্রোহীর উচ্ছেদ করার জন্য সে বাঙালীর সর্ব্বস্ব মুসলমান ও ভিন্ন প্রদেশীয়ের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল এবং বাংলার যে অংশে খনিজ ও আরণ্যসম্পদ

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সে অংশকে ভারতের পশ্চাৎপদতম প্রদেশের অন্তর্ভুত করে। কিন্তু ইংরেজের এ চেষ্টাও ব্যর্থ হইত যদি না কংগ্রেস মুসলমান তোষণনীতির পথ লইত। কংগ্রেসের ধুরন্ধরদিগের ধারণা হইল সারা বাংলাদেশ যদি মুসলমানের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় তবে মুসলমান খুশী হইবে এবং বাংলা শোষণ-কার্য্যে ব্যস্ত ভিন্ন প্রদেশীয়দিগেরও উপকার হইবে, সুতরাং বাংলাকে খরচের খাতায় লেখাই যুক্তিযুক্ত। এই মত লইয়াই কংগ্রেসের এক মহারথী বলিয়াছিলেন, "what matter's if Bungaal perishes" "বঙ্গাল উচ্ছন্নে গেলেই বা কি এসে যায়"? বাংলার প্রতি এই বিষম বিশ্বাসঘাতকতার কোনও প্রতিবাদ কোন দিনই বাংলার কংগ্রেস হইতে হইল না, কেননা, তখন হইতেই বাংলার নেতার দল দলগত রাষ্ট্রনীতির অধঃপতনের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই নেতৃবর্গের আমলেই বাংলার চরম দুর্গতি হইল। ইঁহারা বাংলা বলিতে বুঝেন—ও বরাবরই বুঝিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ইঁহাদের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত সদাশয় তিনিও অবহেলা মাত্র করিয়াছেন। অন্যেরা বিদেশী ও ভিন্ন প্রদেশীয়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর সর্ব্বনাশেসহায়তাই করিয়াছেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন। যদি এই অভাগা আত্মবিস্মৃত প্রদেশকে বাঁচিয়া থাকিতে হয় তবে এই প্রদেশের শাসনভার যাঁহাদের উপর অর্পিত, পশ্চিমবঙ্গবাসীকে দৃঢ়তার সহিত স্থির কণ্ঠে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে বাংলার শোষণ আজই বন্ধ করিতে হইবে। যে তস্করের দল এতদিন বাংলার সর্ব্বনাশই করিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে, সততার সহিত চলিতে যদি তোমরা না চাও তবে তোমরা দূর হও বাংলাদেশ হইতে। পশ্চিম বাংলা পূর্ণ-আয়তন ও স্বপ্রতিষ্ঠ না হইলে সমস্ত বাঙালী জাতির দাসত্ব অনিবার্য্য এটা আজ সকলের বুঝিবার সময় আসিয়াছে, এবং ইহাও সত্য যে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেক অধিবাসী সচেষ্ট না হইলে পতনের আর বিশেষ দেরী নাই।

স্বাধীন বাংলার মন্ত্রীসভা

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভা পাঁচ মাস গবর্মেণ্ট পরিচালনার পর জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে ডাঃ বিধান রায় নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভা চালনা, এবং কি অবস্থায় ডাঃ রায় গবর্মেণ্ট হাতে পাইয়াছিলেন, তিন মাসে তিনি কি করিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ কাজ বাকী আছে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৫ই আগষ্ট ডাঃ ঘোষের প্রথম কাজ ছিল উচ্চতম পদগুলিতে লোক নিয়োগের দ্বারা স্থায়ী শাসনযন্ত্র গঠন। তাঁহার নির্ব্বাচিত লোকদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইলে দেখা গেল যে জনসাধারণ যাহাদিগকে স্বদেশবিরোধী কাজের জন্য শাস্তিলাভের যোগ্য বলিয়া মনে করিত তিনি বাছিয়া বাছিয়া তাহাদেরই অনেককে আনিয়া কয়েকটি উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা গত বৎসর শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'-তে আলোচনা করিয়াছি। যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটটি যুদ্ধের সময় প্রাইস-কণ্ট্রোলার থাকাকালে প্রচণ্ড দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগে অপসারিত হইয়াছিলেন, নোয়াখালীর পৈশাচিক ঘটনাবলী ঘটিবার পূর্ব্বাহ্নে লীগ সৈনিকদের প্রস্তুতির সংবাদ পাইয়া যে ব্যক্তি তথাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আসন শূন্য করিয়া নিজের চামড়া বাঁচাইবার জন্য পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিকে ডাঃ ঘোষ বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার নির্ব্বাচনের সময় এই ব্যক্তি সেই উপকারের ঋণ কতকটা শোধ করিয়াছে। কলিকাতার সহিত লেশমাত্র অভিজ্ঞতাবর্জ্জিত এমন একটি লোককে তিনি পুলিস-কমিশনার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন যিনি হিজলী বন্দীশালায় গুলি চালনায় দুই জন রাজবন্দীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্যমাত্র করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনারের পদে এমন একটি লোককে তিনি বসাইয়াছেন যাঁহার আমলে মোটর ভেহিকেল বিভাগটিতে দুর্নীতি সমানেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইতেছিল। এই দুই ব্যক্তির উপর কলিকাতা পুলিস পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিবার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়াছে, পুলিসের সকল দক্ষতা ও সততা রসাতলে গিয়াছে, শহরবাসী হাড়ে হাড়ে উহার ফল ভুগিতেছে। কোন ব্যাপারেই বিনা "তদবিরে" পুলিসের সাহায্যলাভ আজকাল অসম্ভব।

ডাঃ ঘোষের আমলে রেশন অর্দ্ধেকেরও বেশী কমাইয়া দেওয়া হয়। মফস্বল হইতে চাউল-সংগ্রহের সুবন্দোবস্ত তিনি করিতে পারেন নাই বলিয়া সংগ্রহকার্য্য একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার গবর্মেণ্ট চাউল-সংগ্রহে অক্ষম হইয়া রেশন আধপেটারও কম করিয়া দিলে লোকে পুত্রকন্যার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বাহির হইতে অল্প পরিমাণে চাউল আনিবার চেষ্টা করিতে থাকিলে দলে দলে এই প্রকার বিপন্ন লোক ধরিয়া হাজতে ভরা হয়। লোককে সিভিল সাপ্লাইয়ের কাঁকরমিশ্রিত পচা চাউল এবং সোপষ্টোন ও তেঁতুলবীচির গুঁড়া মিশ্রিত আটা খাইতে বাধ্য করা হয়। গুটিকয়েক লোক আটায় ভেজাল দেওয়ার জন্য ধরা পড়ে, ঢক্কানিনাদে ডাঃ ঘোষের কৃতিত্ব জাহির হয় কিন্তু তাঁহার আমলেই উহারা মুক্তি লাভ করে।

চোরাকারবার দমনের নামে হৈ চৈ অনেক হয়, ডাঃ ঘোষ কড়া কড়া বক্তৃতাও অনেক দেন, কিন্তু একটিও বড় চোরাকারবারী না ধরিয়া যথারীতি চুনোপুঁটি গ্রেপ্তারই চলিতে থাকে। একটি চোরাকারবার বিল ব্যবস্থা-পরিষদে পাস করা হয় কিন্তু উহাতে এমন মারাত্মক গলদ থাকিয়া যায়

যাহার ফলে উহা আজও আইনে পরিণত হইতে পারে নাই। বিলের একটি বিধান ছিল যে হিন্দু যৌথ পরিবারের একজন চোরাকারবারে ধরা পড়িলে পরিবারের সকলে দণ্ডিত হইবে, এবং আর একটি ছিল এই যে সরাসরি বিচারে তিন বৎসর পর্য্যন্ত জেল হইবে। চোরাকারবার দমন বিষয়টি কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় গবর্মেণ্টের মিলিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত; ভারত-শাসন আইন অনুসারে উহা ব্যবস্থা-পরিষদে উত্থাপনের পূর্ব্বে ভারত-সরকারের অনুমতি লইতে হয় এবং বিলটি বড়লাটের সম্মতি লাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়। বিলের খসড়া ভারত-সরকারের নিকট প্রেরিত হইলে তাঁহারা বলেন যে যৌথ পরিবারের একজনের অপরাধে সকলের শাস্তির বিধান তুলিয়া দেওয়া উচিত এবং সরাসরি বিচার করিলে শুধু জরিমানা এবং তিন বছর জেল দিতে হইলে সাধারণ বিচারের ব্যবস্থা করা উচিত। ডাঃ ঘোষ ভারত সরকারের এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্বের আকারেই উহা পাস করাইয়া লয়েন এবং তাহার জন্যই বিলটি আইনে পরিণত হইতে পারে নাই।

ডাঃ ঘোষের আমলেই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুত্যাগী লোক আসা আরম্ভ হয়। ডাঃ ঘোষ ইঁহাদের জন্য কিছুই করিবেন না বলিয়া বদ্ধপরিকর হন এবং তাঁহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করেন না। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এ বিষয়ে পশ্চিম-বাংলা সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন জানিতে চাহিলে ভারত-সরকারের পুনর্ব্বসতি সচিব জবাব দেন যে কিছুই করা হয় নাই। ডাঃ ঘোষ এ বিষয়ে কি করিতে ইচ্ছা করেন ভারত-সরকার জানিতে চাহিলে তিনি এক কথায় জবাব দেন যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তিনি কাহারও আসার পক্ষপাতী নহেন, যদিও নিজের অভয় আশ্রম এবং মালিকান্দা আশ্রম তিনি সকলের আগে গুটাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া লোক আসিয়া পড়িলে তিনি কি করিবেন জানিতে চাহিলেও তিনি ঐ একই জবাব দেন যে তিনি আসিতে দিবেন না।

পশ্চিম বঙ্গের পাঁচ শত মাইলব্যাপী সীমান্ত রক্ষার আয়োজন করা একান্ত আবশ্যক এবং অবিলম্বে তাহা দরকার ডাঃ ঘোষকে এই কথা যাঁহারা বলিয়াছিলেন তাঁহারা 'কমিউনাল' এবং 'ওয়ারমংগার' আখ্যা পাইয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষ এ বিষয়ে একেবারে কিছুই করেন নাই। দেশের যুবকেরা যাহাতে স্বাধীনতা রক্ষার উপযুক্ত হইতে পারে তাহার জন্য তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া দরকার—ডাঃ ঘোষ ইহাও বুঝিতে চাহেন নাই এবং তাহার জন্য কিছুই করেন নাই। ফলে ইহাদেরই মধ্যে কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল দল ডাকাতি ইত্যাদি করিতে আরম্ভ করে এবং অন্যভাবেও এ প্রদেশের ভাল সামরিক উপাদান নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে ও টাকায় লীগ গবর্মেণ্ট কর্তৃক বনিয়াদী শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্য সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা অনুসারে দুইটি ট্রেনিং কলেজ বাংলায় স্থাপিত হইয়াছিল। উহার অধ্যাপকগণ দেশে ও বিদেশে উপযুক্ত শিক্ষালাভের পর অধ্যাপনাকার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ডাঃ ঘোষ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই কলেজ দুইটি তুলিয়া দেন এবং বলেন যে তিনি বাংলায় ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনা অনুসারে বনিয়াদী শিক্ষা আরম্ভ করিবেন। কলেজ দুইটিতে প্রায় ২০ জন অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে ছয় জনকে বাছিয়া লইয়া ওয়ার্দ্ধা প্রেরণ করা হয়। এই বাছাই কার্য্য করেন ডাঃ ঘোষের ভগিনী এবং অভয় আশ্রমের একজন শিক্ষয়িত্রী। এই ছয় জন এম-এ, এম-এসসি, বি-টি অধ্যাপকের সঙ্গে উঁহাদের সমকক্ষ এবং সমান বেতনে নিযুক্ত হইবার জন্য অভয় আশ্রমের দুই জন নন-ম্যাট্রিক শিক্ষককেও পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কেননা অভয় আশ্রমের বিদগ্ধ চূড়ামণিদিগের মতে মুড়ি-মুড়কীর একই দর।

ডাঃ ঘোষ যখন কার্য্যভার গ্রহণ করেন তখনও কলিকাতা দাঙ্গার স্পেশ্যল তদন্ত কমিশন কাজ করিতেছে এবং উহার প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই কমিশনের রিপোর্ট ভাবী ইতিহাস-রচয়িতার নিকট একটি অতি মূল্যবান উপাদান হইত ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। মুসলিম তোষণের জন্য ডাঃ ঘোষ তদন্ত বন্ধ করিয়া দেন। সরকারের টাকায় যে পর্য্যন্ত তদন্ত হইয়াছে তাহার ফলাফল জানিবার জন্য কমিশনকে একটা 'ইণ্টেরিম রিপোর্ট' দিতে বলা উচিত ছিল কিন্তু ডাঃ ঘোষ তাহাও করিলেন না।

ডাঃ বিধান রায়ের তিন মাসের কার্য্যকাল

জানুয়ারীর শেষের দিকে ডাঃ বিধান রায় মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। ডাঃ ঘোষ যে সব অযোগ্য এবং স্বদেশদ্রোহী কার্য্যের কলঙ্কবিশিষ্ট লোককে উচ্চপদে বসাইয়া গিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদিগকে অপসারিত করিলেন না হয়ত এই কারণে যে এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলে প্রত্যেক মন্ত্রীসভাই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া স্থায়ী শাসনযন্ত্রের উচ্চতম পদে লোক বদলের রীতি অবলম্বন করিবে। আমেরিকায় এই প্রথা ছিল এবং ইহা যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হওয়ায় এখন একেবারে উঠিয়া গিয়াছে।

ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভা রেশন বাড়াইয়াছেন এবং অল্প পরিমাণে নিজের বা পরিবারের প্রয়োজনে বাহির হইতে চাউল আনিলে অযথা লোককে হয়রান করা বন্ধ করিয়াছেন। সংগ্রহকার্য্য এখন ভাল চলিতেছে।

ডাঃ ঘোষের আমলে ভারত-সরকার আয়কর এবং পাট-শুল্কের যে ভাগ নিমায়ার এওয়ার্ড অনুসারে বাংলা দেশ পায়,

তাঁহার পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং পশ্চিম বঙ্গের ভাগ অতিশয় অন্যায় ভাবে কমাইয়া দেন। ডাঃ ঘোষের অর্থসচিব এই অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই যাহার ফলে পশ্চিম বাংলা ভারত-সরকারের নিকট তাহার ন্যায্য পাওনা বার্ষিক প্রায় তিন কোটি টাকায় বঞ্চিত হয়। ডাঃ রায়ের অর্থ সচিব কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত দরবার করিয়া ইহার অনেকটা প্রতিকার করিয়া আনিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী সমস্যায় রায় গবর্মেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। একটি পুনর্ব্বসতি বোর্ড গঠিত হইয়াছে, এই কার্য্যের জন্য একজন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বাস্তুহারা সর্ব্বস্বান্ত লোকদের দেওয়ার জন্য আট কোটি টাকা আদায় হইয়াছে এবং ঘরবাড়ী তৈয়ির জন্য মালমসলা ও ঋণ দান সুরু হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ছাত্রদের বাসের ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে। পতিত জমি দখল করিয়া বাস্তুত্যাগীদের উহা সস্তায় বিলি করিবার জন্য আইন হইতেছে।

সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি সীমান্তরক্ষী দল গঠিত হইয়াছে। সীমান্তের গ্রাম হইতে বলিষ্ঠ লোক লইয়া ফৌজ তৈরির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অফিসার ট্রেনিং পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। সামরিক শিক্ষাদানের আয়োজনও সুরু হইয়াছে। অফিসারের অভাব অতিশয় তীব্র বলিয়া এখনও ব্যাপকভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না। অফিসার ট্রেনিং-এর উপরেই বেশী ঝোঁক দেওয়া হইতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন দুর্নীতির একটি বিরাট্ আগার ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কর্পোরেশনের নূতন নির্ব্বাচনের ভোটার তালিকা এমন ভাবে প্রস্তুত হইতেছিল যাহাতে বর্ত্তমান মতলবী এবং দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের হাতেই আরও তিন বৎসরের জন্য কর্পোরেশন থাকিয়া যাইত। নির্ব্বাচক-তালিকার ত্রুটিশূন্যতার উপর নির্ব্বাচনের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ডাঃ রায়ের গবর্মেণ্ট কর্পোরেশন ভাঙিয়া দিয়া একজন এডমিনিষ্ট্রেটারের উপর উহার পরিচালনভার দিয়াছেন এবং নির্ব্বাচক-তালিকা প্রস্তুত করিবার দায়িত্বও তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। কর্পোরেশনের দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধান এবং উহা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটি তদন্ত কমিটিও গঠিত হইয়াছে এবং উহার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কাজ বিশেষ অগ্রসর এখনও হয় নাই।

রাণাঘাট এবং হিঙ্গুলগঞ্জ দিয়া পাকিস্থানে বেআইনি মাল চালানের চোরাকারবার প্রচণ্ডভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। কাপড় বিনিয়ন্ত্রণের পর এই চোরাকারবার উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীরা পর্য্যন্ত এই চোরাই চালানের কারবারে দু'পয়সা লাভ করিবার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এই পাপ এখন অনেকটা সংযত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই পাপের মূলে এখনও ঠিকমত আঘাত পড়ে নাই।

গত মার্চ্চ মাসের দিকে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে লোক আগমন অত্যধিক বাড়িয়া উঠে। সেখানে নানা প্রকার উপদ্রব, বিশেষতঃ রেলে যথেচ্ছ তল্লাসী বাস্তুত্যাগের কারণ হইয়া উঠে। গত মাসে আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনে সকল বিষয় আলোচিত হইয়া পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় এবং চীফ সেক্রেটারীদ্বয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। ইহাতে অনেকটা সুফল হইয়াছে। বাস্তুত্যাগ অনেক কমিয়া আসিয়াছে, এবং পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর মনের অশান্তি অল্প কিছু কমিয়াছে।

ডাঃ রায়ের সম্মুখে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দুর্নীতি নিবারণ। দেশে দুর্নীতি একেবারে অবাধ এবং উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে এবং সমাজের সকল স্তরে উহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাপড় বিনিয়ন্ত্রণের পর কাপড় লইয়া মিলমালিক এবং ব্যবসায়ীদের চূড়ান্ত কারসাজি চলিতেছে; কাপড় এখন দ্বিগুণ মূল্য ভিন্ন পাওয়া যায় না। এই অবস্থার প্রতিকার না হইলে এবং দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা না হইলে লোকে ডাঃ রায়ের অনেক সৎকাজ সত্ত্বেও তাঁহার উপর সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইয়া পড়িবে। সরকারী কর্ম্মচারীদের উচ্চতম অধিকারীবর্গ নিজেরা হয় দুর্নীতিপরায়ণ নতুবা দুর্ব্বলতার জন্য দুর্নীতির পরোক্ষ প্রশ্রয়দাতা। উভয়েরই সমান কুফল ফলিতেছে। সৎ ও দক্ষ কর্ম্মচারী পুরস্কৃত হইবে ও প্রমোশন পাইবে এবং অসৎ ও অযোগ্য লোকেরা নিন্দিত হইবে ও তাহাদের প্রমোশন বন্ধ থাকিবে, শাসনযন্ত্র দক্ষ ও কর্ম্মক্ষম রাখিবার ইহাই মূল নীতি; পৃথিবীর সকলদেশে এই নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে, আমাদের দেশে লীগ আমলে সাম্প্রদায়িক কারণে ইহার কিছু ব্যতিক্রম হইলেও তখন পর্য্যন্ত মোটামুটি ভাবে এই নীতি রক্ষিত হইয়াছে। সুপরিচিত অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের প্রমোশন দেওয়া এবং যাহারা যোগ্যতা দেখাইয়াছে ও ইংরেজ-লীগ আমলে পর্য্যন্ত দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই তাহাদের প্রমোশন বন্ধ রাখার রীতি ডাঃ ঘোষ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ডাঃ রায় উহা এখনও পরিবর্ত্তন করেন নাই, বরং উহারই জের টানিয়া চলিতেছেন। প্রধানতঃ এই কারণেই সরকারী শাসনযন্ত্র কর্ম্মক্ষম ও লোকের আস্থাভাজন না হইয়া তাহার বিপরীত পথে চলিতেছে এবং ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

কাপড়

ডাঃ বিধান রায়ের 'গবর্মেণ্টের সবচেয়ে শোচনীয় ব্যর্থতা কাপড়ের চোরাবাজার দমনে অক্ষমতা। প্রধানতঃ এই কারণে তাঁহার গবর্মেণ্ট কিছুতেই জনসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করিতে

পারিতেছে না। কাপড়ের চোরাবাজারের মূলে মিলমালিকদের এবং বড় ব্যবসায়ীদের কারসাজি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। কাপড় বিনিয়ন্ত্রণের সময় বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের হাতে ৬৫ হাজার গাঁইট কাপড় ছিল; তন্মধ্যে ১০ হাজার গাঁইট পাকিস্থানের প্রাপ্য ছিল। পাকিস্থান টাকা দিতে পারে নাই বলিয়া কাপড় লইতে পারে নাই, এখন লইবার ব্যবস্থা করিতেছে। এতদ্ব্যতীত বাংলার মিলগুলিতে মাসিক ৭০০০ গাঁইট কাপড় তৈরি হয়; সুতরাং বিনিয়ন্ত্রণের পর পাঁচ মাসে আরও ৩৫ হাজার গাঁইট কাপড় বাংলাতেই তৈরি হইয়াছে। পাঁচ মাসে কলিকাতায় ৯০ হাজার গাঁইট কাপড় জমা হইয়াছে তথাপি লোকে কাপড় পাইতেছে না। উপরন্তু এই সময়ের মধ্যেই আরও প্রায় ৪৫ হাজার গাঁইট কাপড় বোম্বাই হইতে আমদানী হয়। পশ্চিম বঙ্গের মাসিক কাপড়ের চাহিদা খুব বাড়াইয়া ধরিলেও ১৩ হাজার গাঁইটের বেশী নহে, সেই হিসাবে আট মাস বাজার ভাসাইয়া দেওয়ার মত কাপড় কলিকাতায় মজুত ছিল।

মিলমালিকেরা দেশের লোকের স্বদেশী মনোভাবের সুযোগ লইয়া তাহাদের নিকট নিকৃষ্ট কাপড় অধিক মূল্যে বেচিয়া আজ এই সমৃদ্ধ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন কিন্তু সমৃদ্ধির শিখরে উঠিবামাত্র তাঁহারা ক্রেতাসাধারণের সহিত জঘন্যতম জুয়াচুরী করিতেও দ্বিধা করেন নাই। কাপড়ে যে পরিমাণ সুতা দেওয়ার কথা তাহা দেওয়া হয় না বলিয়া আজকালকার কাপড় জালি এবং নরম হয়; ঠাস বুনানি বন্ধ হইয়াছে বলিয়া কাপড় টেকসই মোটেই হয় না। বিক্রয়ের ক্ষেত্র ছাড়া উৎপাদনে পর্য্যন্ত এই প্রকার জুয়াচুরি আরম্ভ হইয়াছে। উপরোক্ত হিসাবের সওয়া লক্ষ গাঁইট কাপড়ের কয় গাঁইট কলিকাতায় আছে তাহা জানা কঠিন। তবে এটা দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় কাপড় চীনদেশ হইতে আরব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিক্রয় হইতেছে। পাকিস্থান বন্দরসমূহ হইতেই হয়ত এই ব্যবসায় চলিতেছে। কয়েক দিন আগের এক সংবাদে দেখা গিয়াছিল যে বিনিয়ন্ত্রণের পরবর্ত্তী কয়েক মাসের মধ্যে মিলমালিকেরা ৩০ কোটি টাকার বেশী অতিরিক্ত লাভ করিয়াছেন। ছাপা দাম অপেক্ষা গাঁইট পিছু হাজার টাকা করিয়া মিলমালিকেরা আদায় করিতেছে ইহা সর্ব্বজনবিদিত কথা এবং এই হিসাবে একমাত্র কলিকাতাতেই ৯০ হাজার গাঁইটে হাজার টাকা গাঁইট হিসাবে নয় কোটি টাকার খেলা হইয়া গিয়াছে। পাইকারেরা খুচরা বিক্রেতাদের নিকট হইতেও অনুরূপ টাকা আদায় করিয়াছেন। কাপড়ের ব্যাপারে ডাঃ রায়ের গবর্মেণ্টের অসহায়তা দেশের লোকে ভাল চোখে দেখিতে পারিতেছে না। এই অক্ষমতাকে তাহারা বিস্ময়কর না ভাবিয়া রহস্যজনক মনে করিতেছে। চোরাকারবার অর্ডিনান্স প্রস্তুত হইতেছে দুই সপ্তাহ আগের এই প্রতিশ্রুতি আজিও কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় দেশবাসীর এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইতেছে যে কাপড়ের চোরাকারবারের ব্যাপারে রায়-মন্ত্রীসভা বণিক সম্প্রদায়ের হাতের পুতুল মাত্র।

কৌপীনবস্ত হইবার সম্ভাবনা

অনেক দেশের মন্ত্রীবর্গের অনেক বক্তৃতা আমাদের পড়িতে হয় ও সমালোচনা করিতে হয়। ভারতরাষ্ট্র ও পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর নানা বক্তৃতা আমরা পড়িয়াছি ও সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বৈশাখ মাসের ২ তারিখে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা আমাদের এক অদ্ভুত মনোভাবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছে, এবং ভাবিতেছি এক জন মন্ত্রী নিজের অক্ষমতার কাহিনী ও নিজের বিভাগের অযোগ্যতার পরিচয় এমন করিয়া দিতে গেলেন কেন, এবং তার পর তিনি কোন্ সাহসে মন্ত্রী-পদটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারেন। সেন মহাশয়কে ধন্যবাদ যে তিনি এমন সাফ জবাব দিতে পারিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গে "বস্ত্রের সঙ্কট কংগ্রেসের দুর্নাম আনিয়া দিয়াছে।" এই দুর্নাম নিবারণের জন্য তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। কারণ তিনি নাকি বুঝিতে পারিয়াছেন যে "এই দুর্নীতি নিবারণ পুলিসের কাজ নহে, এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের কাজ নহে।" প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় এই দায়িত্বহীনতা সম্বন্ধে কি বলেন? তাঁহাদের সরবরাহ-মন্ত্রী ত নি-খরচায় এই কর্ত্তব্য পালন করিবার উপযুক্ত পাত্রকে দেখাইয়া দিয়াছেন। কংগ্রেসের "দুর্নাম" নিবারণের কাজ কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর নয়, কংগ্রেসী মন্ত্রীর নয়। সেই কাজ "গণমত ও লোকমতের।" গণমত ও লোকমত দুই-তিনটি উপায়ে এই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে। প্রথম, কাপড়চোপড় না কিনিয়া পূর্ব্ববঙ্গের উপকার করিয়া; দ্বিতীয়, কৌপীনবস্ত হইবার চেষ্টা করিয়া; তৃতীয়, চোরাকারবারীকে ঠেঙ্গাইয়া ও বস্ত্রাদি লুঠপাট করিয়া। এই তিন উপায় সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের মন্ত্রী-সভার মতামত কি তাহা জানিতে পারিলে আমরা গণমত ও লোকমত গঠনে সাহায্য করিতে পারি।

সেন মহাশয়ের বক্তৃতার স্থান, কাল ও পাত্রের মধ্যে সুসঙ্গতি আছে। তিনি কালোবাজার ও মুনাফাকারীর কেন্দ্রস্থল কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে বক্তৃতা দিয়াছেন; কালোবাজারী ও মুনাফাখোরকে বলিয়া দিয়াছেন—তোমাদের কার্য্যকলাপ দমন করিবার জন্য সরকারের কোন শক্তি নাই; সুতরাং তোমরা নির্ভয়ে এই সমাজ-বিধ্বংসী কাজ চালাইয়া যাইতে পার। কোন্ সময় তিনি এই বক্তৃতা দিলেন? যখন লোকমত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, কাপড়ের বাজারের অনাচারে যখন নিজের হাতে শাস্তি না দিয়া আশা করিতেছে যে

গবর্মেণ্ট এই লুণ্ঠন বন্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন। এই বক্তৃতার শিক্ষা এই—যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস।

তার পর এক মাস অতীত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট আবার শুল্ক বোর্ডের হাতে কাপড়ের ব্যবসায়ের লাভালাভের হিসাবনিকাশের ভার দিয়াছেন; তাঁহারা বলিয়াছেন যে আগামী তিন মাস তাঁহারা সজাগ দৃষ্টি দিয়া দেখিবেন যে কাপড়ের ব্যবসায়ীরা তাহাদের লোভ সংযত করে কিনা। এই তিন মাসে কয় শত কোটি টাকা তাহাদের হাতে অন্যায় লাভরূপে যাইবে, তাহার হিসাব তাঁহারা দেখিয়াছেন কি? তাঁহারা বলিতেছেন যখন কাপড়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হয়, তাহার পূর্ব্বে কাপড়ের কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীরা সকলে স্বীকার করিয়াছিল যে দেশের লোকে ন্যায্য মূল্যে যাহাতে কাপড় পায় সেই ব্যবস্থা তাহারা করিবে। এই প্রতিজ্ঞা তাহারা ভঙ্গ করিয়াছে—এই অভিযোগও কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট করিয়াছেন। এই অভিযোগের বিচার হয় নাই। চোরাকারবারীরা আরও তিন মাস সময় পাইল আমাদের শোষণ করিবার। এই সুযোগ তাহাদের দেওয়া হইল কেন, তৎসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট নিরুত্তর, এবং শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে গবর্মেণ্টের করণীয় কিছু নাই। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের নিষ্ক্রিয়তা এইরূপ অপদার্থ লোকের পরিপোষক। যাহারা চোখের সামনে, তাহাদের দোরগোড়ায় নিত্য চোরাকারবারীর লীলাখেলা দেখিতেছে, তাহাদের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা আর কতদিন সম্ভব হইবে তাহা বলিতে পারি না। "গণমত ও লোকমত" এই দায়িত্ব, চোরাকারবার বন্ধ করিবার দায়িত্ব, লইতে প্রস্তুত আছে কি? তখন প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের মত মন্ত্রীবরের প্রয়োজন হইবে না, প্রয়োজন থাকিবে না।

চোরাকারবারীর কৌশল

এক দিকে ব্যবসায়ীর সীমাহীন লোভ, অন্য দিকে অফুরন্ত অভাব দেশের স্ত্রী-পুরুষকে চোরাকারবারীর সহায়ক করিয়াছে। এই ঘৃণ্য ব্যবসায় চলিতে পারিত না যদি সমাজের গণমন তজ্জনিত নৈতিক অবনতি সম্বন্ধে সজাগ থাকিত। আমরা অনেক সময় ভাবি যে চোরাকারবারী ও তাহাদের সহায়কেরা যত সব কৌশল অবলম্বন করিতেছে, যে বুদ্ধিবৃত্তি এই কৌশল উদ্ভাবনে নিযুক্ত আছে, তাহা সৎপথে চলিলে, দেশের গঠনমূলক কার্য্যে নিয়োজিত হইলে কি অসাধ্যসাধন না করিতে পারিত। আজ আমাদের নিকট নানাবিধ কৌশলের যে বিবরণ পৌঁছিতেছে, তাহাতে সমাজের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া আমরা ম্রিয়মাণ হইতেছি। এতৎসম্বন্ধে কতকগুলির নিদর্শন দিলে দেশের আপামর জনসাধারণ বুঝিতে পারিবেন এই পাপ কত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। অমৃতসহরে, শিখধর্ম্মের পীঠস্থানে, পর্য্যন্ত এই পাপ দেখা দিয়াছে। এক দিন দেখা গেল এক বিবাহের বরযাত্রী রাস্তা দিয়া চলিতেছে। ঘোড়ার উপর, উটের উপর লোক আছে, একটা ঘেরাওকরা ডুলিও চলিতেছে, চার জন তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। হঠাৎ পুলিসের কেমন খেয়াল হইল, তাহারা ডুলি আটক করিয়া দেখিবার দাবি করিল। আব্রু-প্রথার সম্মানরক্ষার্থে ভয়ঙ্কর আপত্তি উঠিল, পুলিস শুনিল না। ডুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখিল কয়েক মণ গম তাহাতে আছে। এই ত গেল পশ্চিম সীমান্তের কথা। পূর্ব্ব সীমান্তে শ্রীচৈতন্য দেবের লীলাস্থল নদীয়া জেলায় ইহা অপেক্ষা কৌশলী লোক ধর্ম্মের, বৈষ্ণব ধর্ম্মের, আচরণে বা আশ্রয়ে, কি করিয়া চোরাকারবার চালাইতেছে তাহা বর্ণনা করিতেছি। চৌদ্দ মাদলের এক সংকীর্ত্তনের দল চলিতেছে। শ্রীখোলের ধ্বনির অস্পষ্টতা শুনিয়া পুলিসের কেমন সন্দেহ হইল, তাহারা সঙ্কীর্ত্তনের দলকে আটকাইল; খোলের চামড়া একদিকে খুলিয়া দেখিল ঠাসা কাপড় তাহার মধ্যে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাঁহারা খোলের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহারা ইহার এই অপব্যবহারের কল্পনা করিতে পারিলে কি হইত জানি না। আর একটা কৌশলের বর্ণনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে আমাদের নৈতিক অবনতি কোথায় গিয়া নামিয়াছে। কলিকাতার হ্যারিসন রোডের একটি বাড়ীতে এক দিন দ্বিপ্রহরে আসিয়া হাজির হইলেন চারটি মহিলা—এক জন প্রৌঢ়া, তিন জন যুবতী। এক জনের কোলে ৮।১০ মাসের ছেলে। সঙ্গে ২৭।২৮ বৎসরের একটি যুবক, ৮।১০ বৎসরের একটি বালক। তৃষ্ণার্ত্ত জল চাহিলেন এবং শিশুটির জন্য একটু দুধ চাহিলেন। নীচের বারাণ্ডায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বাড়ীর মেয়েরা উপরে গেলে পর এই আগন্তুকেরা যাহা আরম্ভ করিলেন তাহা লজ্জাজনক। তিনটি মহিলা একে একে পুঁটুলি হইতে কোরা কাপড় ও শাড়ী নিজেদের কোমরে ও বুকে যখন জড়াইতে লাগিলেন তখন শালীনতা রক্ষিত হয় নাই। বাড়ীর লোকে টের পাইয়া ভর্ৎসনা করিলে যুবকটি চম্পট দিল; মেয়ে চারিজন সমস্ত গুছাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। এই অবস্থা কেন হইল, তাহা বুঝিতে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন হয় না। ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ অবনতি কল্পনা করা কঠিন ছিল। আজ অভাবে স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ন্যায়-অন্যায় বিচারের বোধ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ আমলে নৈতিক অবনতি সম্বন্ধে শাসকগোষ্ঠীর স্বাভাবিক মনোভাব ছিল আমাদের পরিহাস করিয়া নিজের দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়া। আজ স্বাধীন ভারতে এই অধোগতি চূড়ান্ত ভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থার ভার যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহারা কি কেবল বক্তৃতা করিয়া কর্ত্তব্যের শেষ করিবেন? না, সমাজ-জীবনের চিরন্তন

সততা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন? সে শিক্ষা অক্ষর পরিচয়ের উপর নির্ভর করে না; বনিয়াদি শিক্ষার উপর নির্ভর করে না; সে শিক্ষার জন্ত বিরাট দালানকোঠার প্রয়োজন হয় না। সে দায় তাঁহারা স্বীকার করিবেন কি?

পাকিস্থানে চিনির দর বাইশ টাকা

চিনি বিনিয়ন্ত্রণের পর চিনির মিলমালিকেরা ভারত-সরকারকে বলিয়াছিলেন যে মণকরা ৩৫।৴০ আনা দরের কমে তাঁহারা চিনি বিক্রয় করিতে পারিবেন না। ইহার কমে তাঁহাদের পড়তা পড়িবে না। ভারত-সরকার ঐ হিসাবই শিরোধার্য্য করিয়া চিনির দর ৩৫।৴০ বাঁধিয়া দিয়াছেন। ভারতীয় ইউনিয়নে চিনি এখন এক টাকা সের দরে বিকাই-তেছে। অথচ পাকিস্থানে এই মিলমালিকেরাই চিনি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছেন পাইকারী ২২৲ টাকা দরে। নিজের দেশে বেশী দাম লইয়া বিদেশে সস্তায় মাল বেচাকে বলে ডাম্পিং, সভ্যজগতের বাণিজ্যে ইহা গুরুতর অপরাধ। ভারতীয় চিনির মিলমালিকেরা এই ঘোর অন্যায় কার্য্য করিয়াও পার-পাইয়া যাইতেছেন কাহাদের মুরুব্বীয়ানার জোরে দেশবাসী তাহা জানিতে পারিলে ভাল হয়। অন্যদিকে যদি ইহা ডাম্পিং না হয় তবে বলিতে হইবে যে তাঁহারা অতি অসংভাবে ২২৲ দরের পরিবর্ত্তে ৩৫।৴০ ধার্য্য করিয়া দেশবাসীকে ঠকাইতেছেন।

বাংলার পশ্চিম সীমা

বাংলাদেশের যে অংশটি ইংরেজ গবর্মেণ্ট ১৯১১ সালে বিহারে জুড়িয়া দিয়াছিল তাহা ফেরত পাওয়ার আশা ক্রমশঃই যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ ইহা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, বাংলার ন্যায্য দাবি মুখে স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার কথা উঠিলেই কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ বড় বড় কথা বলিয়া সমস্যা চাপা দিবার চেষ্টা করেন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে কিন্তু একমাত্র বাংলার বেলায়ই ঐ নীতি প্রয়োগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরূপ মনোভাব দেখা যায়। অন্ধ্র ও কর্ণাটক ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের যে দাবি তুলিয়াছে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে এবং মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ ভাঙিয়া নূতন ভাবে গড়িবার আয়োজন হইতেছে। সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বিন্ধ্য ও হিমাচল প্রদেশ নূতন করিয়া গঠনের বেলায়ও এই দাবি স্বীকৃত হইয়াছে।

বাংলার দাবি উপেক্ষিত হওয়ার জন্ত বাঙালী নেতাদের ক্রটিও উপেক্ষণীয় নহে। বিহার বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে হিন্দীভাষীতে পরিণত করিয়া পাকাপাকি ভাবে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার জন্ত গত দশ বৎসর যাবৎ যে প্রবল চেষ্টা করিতেছে বাংলা কংগ্রেস তাহার বিরোধিতার কোন আয়োজন করে নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেস-সভাপতি হওয়ার পর বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলায় ফিরিবার আশা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বিহারী নেতারা এত দিনের মধ্যে ঐ সব এলাকা হিন্দীভাষীতে পরিণত করিতে না পারার জন্ত কংগ্রেস-সভাপতি কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছেন। বিহার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে বিনা যুদ্ধে বিহার বাংলাকে এক ইঞ্চি মাটি ছাড়িবে না। বিহারের দৈনিক পত্র 'সার্চ্চলাইট' বাঙালী অঞ্চল বাংলায় ফিরিয়া আসার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় মন্তব্য করিয়াছে। জামসেদপুরে বাঙালী সভা লাঠি চালাইয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। মানভূমে বাঙালী সম্মেলন পুলিস বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মানভূম সিংভূমে যাঁহারা এই আন্দোলন চালাইতে-ছেন পুলিস তাঁহাদের পিছনে লাগিয়াছে। বিহারের পুলিসের ডি-আই-জি স্থানীয় পুলিসের নিকট বাঙালী আন্দোলন-কারীদের নাম ধাম ও কার্য্যকলাপের রিপোর্ট চাহিয়াছেন। বিহার মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে প্রবল উৎসাহী এবং বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ ইহার সমর্থক ও উৎসাহদাতা।

যেখানে কংগ্রেস-সভাপতির মনোভাব এইরূপ সেখানে বাংলার তরফ হইতে ইহা লইয়া প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা ত হয়ই নাই, বরং ইনি বাংলায় আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সমস্যা আলোচনা ও উহা সমাধানের জন্ত যতটা চাপ দেওয়া হইতে পারে তাহাও করা হয় নাই। কয়েক দিন আগে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন একমাত্র নববঙ্গ সমিতি এই বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন, প্রাদেশিক কংগ্রেস বা অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যান নাই। আমরা বার বার বলিয়াছি যে যতই দিন যাইতেছে বিহারের বাংলা-ভাষী অঞ্চল ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগ ততই কমিয়া আসিতেছে। নূতন রাষ্ট্রবিধির খসড়াতে প্রাদেশিক সীমানা পরিবর্ত্তনের জন্ত যে ধারা সংযোজিত হইয়াছে তাহা পাস হইলে ঐ এলাকা ফেরত পাওয়ার উপায় আর থাকিবে না। ধারাটির বিধান এই যে, প্রাদেশিক সীমা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে যার এলাকা কমিবে সেই প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি প্রয়োজন হইবে। বলা বাহুল্য, বিহার উহা কখনও দিবে না।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং শ্রীসুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম্মী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাংলাভাষী অঞ্চল ফিরাইয়া আনিবার আন্দোলনে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষ সাফ জবাব দিয়াছেন যে উহা হইবার নহে, কারণ ওয়ার্কিং কমিটির

মত নাই। ওয়ার্কিং কমিটির মত যে নাই, তাহা ভাল করিয়াই জানা ও বুঝা গিয়াছে কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির ২০ জন সদস্যের মত নাই বলিয়া একটা প্রদেশ ও জাতি তাহার ন্যায্য দাবি ছাড়িয়া দিবে কেন? বিশেষতঃ যেখানে এই মত না থাকা অন্যায়, অযৌক্তিক এবং কংগ্রেসের গৃহীত নীতি ও প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য না হইলেও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে যথেষ্ট জোর খাটাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনিও তাহা করেন নাই। কেন করেন নাই তাহা বুঝা খুব কঠিন নহে। ইঁহারা দুই জনেই পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন এবং তাহার জন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র উভয়েই করিতেছেন। চোরাগলি দিয়া যাঁহাদের মসনদে আসিতে হইবে তাঁহারা কংগ্রেস সভাপতি এবং কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিরাগ অর্জন করিতে পারেন না। সুতরাং দেশ চুলায় যাউক, মানুষ স্থানাভাবে গাদাগাদি করিয়া কলেরা, বসন্ত ও প্লেগে লাখে লাখে উজাড় হউক, তাহাতে ইঁহাদের আসিয়া যায় না, প্রধান মন্ত্রিত্ব করায়ত্ত করিয়া আশ্রিত পোষণ ও ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ ইঁহাদের পাইলেই হইল। কিছুদিন আগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে কিন্তু উহা এতই আন্তরিকতাহীন যে কাহারও দৃষ্টি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

বাংলাভাষী অঞ্চল ফেরত আনার আন্দোলনে বর্দ্ধমান বিভাগের নেতাদের উপেক্ষা এবং উদাসীনতাও কম নয়। শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি প্রভৃতিও দলের কোলে ঝোল টানায় এত ব্যস্ত যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙালী জাতির অস্তিত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই আন্দোলনে মন দিতে চাহিতেছেন না।

আগামী জুন মাসে রাষ্ট্রবিধির খসড়া গণপরিষদে গৃহীত হইবে। এখনও যদি দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন না হয় এবং গণপরিষদের বাঙালী সদস্যেরা যদি পূর্ব্ববৎ নীরব থাকেন তবে বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদ প্রস্তাব পাস করিয়া যাহাতে এই দাবি গণপরিষদে পেশ করে তাহার জন্য কোন কোন সংবাদপত্র অনুরোধ করিয়াছিল। দেখা যাইতেছে তাহা করা হয় নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্ল সেন, শ্রীসুকুমার দত্ত, শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মাইতি, শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের সদস্যেরা অন্ততঃ ইহা করিবেন, কিন্তু তাঁহারাও কেহই ইহাতে অগ্রসর হন নাই। গণপরিষদ অন্ধ্র, কর্ণাটক প্রভৃতির দাবি পূর্ণ করিবার জন্য একটি সীমানা কমিশন গঠন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং ইহাও শোনা যাইতেছে যে বাংলার পশ্চিম সীমা পুনর্গঠনের কোন কথা উহাতে থাকিবে না। নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে এই সমস্যা উত্থাপন করা একান্ত উচিত ছিল, কিন্তু তাহাও করা হয় নাই। কংগ্রেস-সভাপতি এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যেখানে বাংলার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাবে সচেতন, সেখানে ভারতের সকল প্রদেশের ন্যায়নিষ্ঠ ও আদর্শবাদী লোকদের সকল ব্যাপার জানাইয়া নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে এবং গণপরিষদে তাঁহাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করা উচিত ছিল এইজন্য যে তাহা না করিলে মুষ্টিমেয় বাঙালী সদস্যকে ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে হইবে, বিশেষতঃ তাঁহাদেরও নিজস্ব যোগ্যতা, কর্ম্মশক্তি ও বাগ্মিতার যেখানে একান্তই অভাব রহিয়াছে। এই সমস্যা এখন সাধারণ আন্দোলনের অতীত হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি এবং বিহার গবর্মেণ্ট যেখানে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে, সেখানে শুধু কলিকাতায় সভা-সমিতিতে কোন ফল হইবে না। অধিকতর সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করা দরকার। প্রয়োজন হইলে বাঙালীকে সত্যাগ্রহে পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইতে হইবে। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে সময় একেবারেই নাই। আগামী জুন মাসে রাষ্ট্রবিধি পাস হওয়ার আগে যাহা করিবার তাহা করিতেই হইবে।

রাজসাহীর চর লইয়া বিরোধ

পদ্মার একটি খাসমহল চরে রাজসাহীর কয়েকজন মুসলমান ধান কাটিতে আসিলে মুর্শিদাবাদ পুলিস তাহাদের বাধা দেয় এবং পাল্টা আক্রমণে বিব্রত হইয়া গুলি চালায়। গত ২৫শে এপ্রিল এই ঘটনা ঘটে। ২০শে মে ঢাকা হইতে প্রকাশিত পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্টের এক ইস্তাহারে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মুর্শিদাবাদ পুলিসের কার্য্যে নিন্দা করা হইয়াছে এই কারণে যে, চরটি রাজসাহী খাসমহলের অধীন, সুতরাং মুর্শিদাবাদ পুলিসের সেখানে যাওয়ার কোন অধিকার ছিল না।

আমাদের বিশ্বাস ঢাকা গবর্মেণ্টের এই ইস্তাহারে গলদ আছে। চর সরন্দাজপুরের দখল লইয়া যখন গোলযোগ হয় তখন ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, যে-চর যে-জেলার চৌকিদারীর অধীন, সেই চর সেই জেলার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। পদ্মার এমন কয়েকটি চর আছে যাহা চৌকিদারী হিসাবে এক জেলা এবং কালেক্টরী হিসাবে অপর জেলার অধীন। এই নীতি অনুসারে চর সরন্দাজপুরের কালেক্টরী মুর্শিদাবাদ কিন্তু চৌকি রাজসাহী বলিয়া উহা রাজসাহীর অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকা ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপে কাজ চলিবে বলিয়া স্থির হয়। এখন অকস্মাৎ ঢাকা গবর্মেণ্ট উপরোক্ত চরটির চৌকি মুর্শিদাবাদ এবং কালেক্টরী রাজসাহী

হওয়ায় উহা নিজেদের বলিয়া দাবি করিতেছেন কোন্ যুক্তিতে?

২৫শে এপ্রিল রাজসাহী হইতে কতকগুলি লোক ঐ চরে ধান কাটিতে আসে। এই সময় সেখানে জলি ধান নামে এক প্রকার ধান হয়। মুর্শিদাবাদ পুলিস সংবাদ পাইয়া উহাদিগকে বাধা দেয় এবং নিজেরা আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালায়। ইহাতে জনদুয়েক নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয় এবং অনধিকারপ্রবেশকারীরা পলায়ন করে। পরদিন পূর্ব্ববঙ্গের একদল পাকিস্থানী পুলিস চরটির বিপরীত দিকে রাজসাহীর অন্তর্গত মোক্তারপুরে আসিয়া ছাউনি ফেলে। ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক পঞ্জাবী পুলিস ছিল। ইহারা আসিয়াই স্থানীয় হিন্দুদের উপর বেপরোয়া মারপিট আরম্ভ করে। তিন দিন ধরিয়া এই ব্যাপার চলে। স্থানীয় মুসলমানেরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হয় এবং হিন্দুদের নানাপ্রকার সাহায্য করে কিন্তু পুলিসের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস পায় না। সংবাদ পাইয়া রাজসাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সেখানে যান। পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের রাজসাহীর সদস্য শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীও ঘটনা-স্থলে গিয়া তদন্ত আরম্ভ করেন। একা রাস্তায় বাহির হওয়া তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে তদন্তের জন্য ঘরের বাহির হইতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করেন নাই। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে ক্যাম্পে লইয়া যান। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া এই মর্ম্মে ঘোষণা করেন যে কোন পুলিস কাহারও উপর অত্যাচার করিলে তাহা সহ্য করা হইবে না, উহাদিগকে শাস্তি পাইতে হইবে। ইঁহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং শ্রীপ্রভাস লাহিড়ীর নির্ভীকতা দেখিয়া অবশেষে স্থানীয় হিন্দুরা আশ্বস্ত হয় এবং ঘর হইতে বাহির হইতে সাহস পায়। বলা বাহুল্য, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানেরা ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। ইহাদের একজন রাজসাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যের নিন্দা করিয়া 'ইত্তেহাদ' পত্রে এক চিঠি প্রকাশ করিয়াছে। তবে ইহাও এখন দ্রষ্টব্য যে হিন্দুনেতা যদি কেহ সাহসের সহিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, তবে পূর্ব্ববঙ্গ সরকার এখন তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টিত হইতেছেন।

সুন্দরবনের কথা

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি বাংলার ক্ষাত্র-শক্তি উজ্জীবিত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। মুখে অহিংসার কথা উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি এই সম্বন্ধে যে কোন কর্ত্তব্য আছে, তাহাও বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্য দেশের পুলিস পাহারার উপরে যে তাঁর কোন দায়িত্ব আছে, সেই বোধ তাঁর মধ্যে দেখিতে পাই নাই। ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব-সীমান্ত—পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত রক্ষা সম্বন্ধে সেই মন্ত্রীসভার যে বিশেষ একটা দায়িত্ব আছে তার কোনরূপ প্রমাণ আমরা ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের আমলে দেখিতে পাই নাই। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবিষয়ে একটু সজাগ হইয়াছেন; তিনি পূর্ব্বের নিশ্চেষ্টতা ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্ব ও উত্তর অঞ্চলের গ্রামবাসীদের দেশ-রক্ষায় আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া আমরা আনন্দিত। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভাও যে এই বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং সীমান্তের সমস্ত অলি-গলির সন্ধান পাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে এখনও সন্দেহ আছে। সেইরূপ সন্দেহ না থাকিলে সুন্দরবন প্রজা-মঙ্গল সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ব্রহ্মচারী ভোলানাথ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর নিকট ছুটিতেন না সুন্দরবনের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য। এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণতঃ রাশিয়ার শিল্প-বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে যতটা খবর রাখেন, ততটা খবর নিজেদের দেশের সম্বন্ধে রাখেন না। এই অজ্ঞানতার জন্যই আজ ব্রহ্মচারী ভোলানাথ সুন্দরবন সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা আমাদের নিকট নূতন ঠেকিবে। সুন্দরবন বাঘের রাজ্য এই কথাই মাত্র আমরা শুনিয়াছি; কিন্তু এই কথা আমরা জানি না যে এক সময়ে সুন্দরবন বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চল ছিল, তার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। বাখরগঞ্জ, খুলনা, ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশ লইয়া এই অঞ্চল বিস্তৃত। দেশ-বিভাগের ফলে আজ বাখরগঞ্জ ও খুলনার সুন্দরবন অঞ্চল ভারতরাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আজ ২৪-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার সমগ্র অংশ লইয়া পশ্চিম বঙ্গের সুন্দরবন গঠিত। এই বিভাগের কল্যাণে এই অঞ্চল ভারতরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ইহার সামরিক গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রচুর। ব্রহ্মচারী ভোলানাথের কথা উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

> "এই বিরাট্ কৃষিযোগ্য উর্ব্বরা ভূমি-খণ্ড পূর্ব্ব-বঙ্গের বাস্তত্যাগীদের বসতি স্থাপনযোগ্য, এবং জ্বালানি কাঠ, কাঠ, মধু, দুগ্ধ, মৎস্য প্রভৃতি এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

> "জমি বিশেষ উর্ব্বরা হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলে লোক-বসতি অত্যন্ত বিরল। এখানে প্রতি একরে (৩ বিঘায়) ৩০-৪০ মণ ধান উৎপন্ন হয়।...এখানে বহু জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে। আর যেটুকুও বা আবাদ হয়, তাহাও সেই সনাতন পদ্ধতিতে।...যদি উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা যায়, তবে সুন্দরবন দেশের খাদ্য-ভাণ্ডারে পরিণত হইতে পারে।"

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের জন্ত কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ববঙ্গের অত্যাচারিত হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ যখন পশ্চিম বঙ্গে বসতি স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প, যখন তাহাদের জন্ত, তাহাদের বাসস্থান, চাষ-আবাদের জন্ত, স্থানের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। ব্রহ্মচারী ভোলানাথ সেইরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের চর অঞ্চলে যে সব লোক পদ্মা মেঘনার জলরাশির মধ্য হইতে সোনা ফলাইতেছিল, তাহাদের পক্ষে সুন্দরবন উপযোগী হইবে—পশ্চিমবঙ্গের নদীবিরল বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর জেলা হইতে অধিকতর উপযোগী হইবে। এই কথা বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টকে সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নতি ও সংগঠনের জন্ত বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গের পরিধি অনেক কমিয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সমুদ্রকূল হইতে জমির উদ্ধার করিয়া নিজের আয়তন বাড়াইতে হইবে; দামোদর, ময়ূরাক্ষী, গঙ্গার বন্তা নিয়ন্ত্রণ করিয়া অনুর্ব্বর জমিকে উর্ব্বর করিতে হইবে; অনাবাদী জমিকে আবাদ করিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট জনগণকে রোগশূন্ত করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা-মধ্যে সুন্দরবনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সেই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মচারী ভোলানাথ প্রকৃত উপকারের সম্ভাবনা দেখাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্ত তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

তিনি আর্থিক উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষার উপায় সম্বন্ধেও ব্যাকুল হইয়া তিনি কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রীর নিকট ছুটিয়া গিয়াছেন। যে কাজে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী অবহেলা করিয়াছিলেন তাহা তিনি করিয়াছেন, এবং সুন্দরবনের সমস্ত আটঘাট সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকায়, তার অলি-গলির সন্ধান জ্ঞাত থাকায় তিনি যে সব ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন, এই অঞ্চলের সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যে সব প্রস্তাব তিনি করিতে পারিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই প্রস্তাবগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১) এই অঞ্চল রক্ষার জন্ত আঞ্চলিক সেনাবাহিনী নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) বসিরহাট ও হাসনাবাদের নিকট দিয়া প্রত্যহ নদীপথে লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড়, চিনি, সরিষার তৈল প্রভৃতি গোপনে পূর্ব্বপাকিস্থানে চালান যাইতেছে। সুতরাং ইচ্ছামতী ও কালিন্দী নদী দিয়া মাল চলাচল বন্ধ করিয়া সীমান্ত-অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্ত মাল প্রেরণের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে গোপনে মাল চালান বন্ধ হয়, তাহার জন্ত ব্যাপক তল্লাসীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) অবিলম্বেই কলিকাতা হইতে হাসনাবাদ হইয়া হিঙ্গুলগঞ্জ পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। (৪) কলিকাতা, বসিরহাট, হাসনবাদ এবং হিঙ্গুলগঞ্জের মধ্যে, টেলিফোনের সংযোগসাধন করিতে হইবে। (৫) কলিকাতা, বসিরহাট, ইটিণ্ডাঘাট পথের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। (৬) কয়েকটি পাকা রাস্তা তৈয়ার করিয়া সমগ্র অঞ্চলের গমনাগমন সহজসাধ্য করিতে হইবে। (৭) অবিলম্বেই হিঙ্গুলগঞ্জে একজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে।

যে সব সন্ধান ব্রহ্মচারী ভোলানাথ দিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থার উন্নতি হইবে; পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীদের লইয়া যে সমস্তার সৃষ্টি তাহার কথঞ্চিৎ সমাধান হইবে। এই দুইটি বিষয় ভাবিয়া আমরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিমণ্ডলীকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা সুন্দরবনে গমন করিয়া সর-জমিনে বর্ত্তমান অবস্থার ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করুন। এই জ্ঞান হইতে কর্ম্মের প্রেরণা আসিবে। সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যভাণ্ডারে পরিণত হইবে; পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষায় তাহার অধিবাসী জলেস্থলে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

কেন দেশত্যাগ করে ?

"বরিশাল হিতৈষী" সাপ্তাহিক পত্রিকা আজ পঞ্চাশ বৎসর হইতে দেশসেবা করিতেছে। অশ্বিনীকুমারের হাতে-গড়া মানুষ শ্রীদুর্গামোহন সেন প্রায় ত্রিশ বৎসর এই পত্রিকার সম্পাদকরূপে ইংরেজ আমলে ও পাকিস্থানী আমলে নির্ভীক ভাবে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। শাসক-সম্প্রদায়ের ভ্রূকুটি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। আজ দেখিতেছি তাঁহারও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে। ৭ই বৈশাখের সংখ্যায় তিনি কেন পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু দেশত্যাগ করে এবং তাহার আয়োজন করে এই প্রশ্নের সপক্ষে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন—"এই সব ঘটনা লইয়া কোন উচ্চস্তরের আলোচনা করাও চলে না, আর সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মত ব্যক্তিদের নিকট বলাও চলে না।" বাস্তবিকই ঘটনাগুলি সামান্ত, কিন্তু ইহা যে "তিলে তিলে তুষানল জ্বলিতেছে" তাহার পরিচায়ক তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

(১)

মোক্তারবাবু কাছারিতে গিয়াছেন, তাঁহার বৃদ্ধা

পত্নী বাসায়। এক দল মুসলমান ছেলে-মেয়ে হাবেলীর বেড়া ভাঙিয়া লইতেছে—তিনি নিষেধ করিলেন—অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিলেন—এখন তিনি যদি স্বামী বাসায় ফিরিলে ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন তুমি যখন সসম্মানে আমাকে এখানে রাখিতে পার না—তখন অন্যত্র লইয়া যাও—তাহা হইলে মোক্তার বাবুর মুখ থাকে কোথায়।

(২)

চকবাজারের দোকানদার। এক জন মুসলমান গেঞ্জির দাম জিজ্ঞাসা করিল। দাম বলা হইল—সে চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া আবার দাম জিজ্ঞাসা করিল—দোকানদার বলিল দাম তো একবার বলিয়াছি। সক্রোধে উত্তর হইল মশায় আমায় লুঙ্গি পরা দেখিয়া বুঝি তুচ্ছ করেন? সে বলিল আমরা জিনিষ বিক্রয় করিতে বসিয়াছি, কাহাকেও তুচ্ছ করি না, লুঙ্গি পরিয়া আসুক, আর উচ্চ পোষাক পরিয়া আসুক। গর্জ্জিয়া উঠিল খরিদ্দার, কি মশায় আমায় ন্যাংটি পরা বলেন। জুটিয়া গেল ৪০-৫০ জন স্বধর্মী। লোক আসিল—দোকান যায় যায়—হিন্দু দোকানদারগণ ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

(৩)

মোক্তার লাইব্রেরি—হিন্দু অধিক, মুসলমান কম, কিন্তু মুসলমান মোক্তার মহাশয়দের মধ্যে ২।৩ জন প্রত্যহ এমন অশ্লীল ভাষায় তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করেন যে তাহা কোনও মানুষ সহ্য করিতে পারে না। পুলিস সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবার ভয় দেখান হইল—উত্তর হইল—আমাদের গায় হাত দিলে বদলী করাব সুন্দরবনে।

(৪)

কড়া জামরুল খাইতে মুসলমান আসিয়াছে, বলা হইল বড় হইলে খাইও এখন নষ্ট কর কেন? কে শোনে কথা। একটি হিন্দু বালক একটু কড়া কথা বলিল, অমনি আসিল ৪০।৫০ জন। হিন্দু ক্ষমা চাহিল—তাহার পর শান্ত। ইহারা কিন্তু চিরকালের প্রতিবেশী।

হিন্দুর জমি চাষ করিতে সাহায্য করিবে না, হিন্দুর জমির ফসল জোর করিয়া কাটিয়া লইবে—এরূপ অসহযোগের অভিজ্ঞতা ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়া কত দিন লোক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার কথা ভাবিতে হয়। তাহার উপর পারিবারিক সম্মানের উপর হাত উঠাইতে যখন মুসলমান জনতার সংস্কারে বাধে না, তখন দেশত্যাগের সমস্ত আয়োজন পূর্ণ হইয়া যায়। এই সব কথা সত্য; শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাহা জানেন এবং স্বীকার করেন। তবুও গান্ধীজীর নিকট যে শিক্ষা তিনি পাইয়াছেন তাহা অনুসরণ করিয়া তিনি বলিতেছেন যে ধৈর্য্য দ্বারা মুসলমানের বিদ্বেষ ও ক্রোধকে জয় করিতে হইবে; ইংরেজের আমলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার যে সাহস আমাদের ছিল, পাকিস্থানী আমলে তাহা হারাইবার কোন কারণ নাই। মুসলমানও মানুষ, তার সৎবুদ্ধি, সৎপ্রবৃত্তি এখন আচ্ছন্ন হইয়া আছে; এই অবস্থায় সে মর্ম্মান্তিক অপমান ও অত্যাচার করিতে পারে। তাহা সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলে, তার সদবুদ্ধি ও সৎপ্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। যে অন্যায় সে করিয়াছে, তাহাতে সে লজ্জিত হইবে। গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় যে কার্য্য নোয়াখালিতে আরম্ভ হইয়াছে—এই বিশ্বাস ও ভরসার উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত; মানবপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত। শ্রীদুর্গামোহন সেন মহাশয়ের মত যাঁহারা আজীবন দেশসেবা করিয়াছেন, তাঁহারা একথা বোঝেন না, এরূপ কথা বলিবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। তিনি যে সব ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অনুরূপ অপমান ও ক্ষতির কথাও হয়ত তিনি জানেন। তিনি যে কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহার ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সত্য—"কথার অতীত বিষাদ আমার, কথায় জানাব কত!" কিন্তু যুগে যুগে রাষ্ট্র বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া মানবমন পরাজয় মানে নাই; মানব-প্রকৃতি অন্যায় ও অপমানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। বাঙালী হিন্দু আবার সেই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছে। ভয় পাইলে চলিবে কেন? আবার সংগ্রাম করিতে হইবে।

শুল্ক বিভাগে অবাঙালী

বাঙালীর নিজস্ব বেকার-সমস্যা যুদ্ধের পর অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্থানে যাওয়ার পর এই সমস্যা আরও তীব্র হইয়াছে। এই অবস্থায় বাংলা দেশের এবং বাংলায় অবস্থিত ভারত-সরকারের বিভাগগুলিতে অবাঙালী কর্ম্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধি অনুচিত হইতেছে। আশ্রয়-প্রার্থী সমস্যা সমাধানের নামে সম্প্রতি এখানে বহু পঞ্জাবী ও সিন্ধীকে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ইহা অন্যায় কথা। শুল্ক বিভাগ মাদ্রাজীর দ্বারা ভর্ত্তি করা হইতেছে। দামোদর স্কীমে বিহারী ঢুকাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। বাঙালীর প্রতি এই সব অন্যায়ের প্রতিকারের দায়িত্ব কাহার? আসামে রেলের বাঙালী কর্ম্মচারীরা আসামীদের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের উপর নানাবিধ আক্রমণ, গৃহে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি চলিতেছে। ইহাদিগকে বাংলায় ফিরাইয়া আনিয়া গৌহাটিতে পঞ্জাবী, সিন্ধী ও মাদ্রাজী পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।

নূতন পরিভাষা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কার্য্যে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দগুলির একটি বাংলা পরিভাষা সঙ্কলন করিয়াছেন। উহা সহজবোধ্য হয় নাই, অনাবশ্যক কষ্ট করিয়া দুর্ব্বোধ্য করিয়া তোলা হইয়াছে বলিয়াই যেন মনে হয়। প্রত্যেকটি সংবাদ-পত্র এই সঙ্কলনের নিন্দা করিয়াছে। পরিভাষার প্রধান উদ্দেশ্য উহা সহজবোধ্য হওয়া চাই। সঙ্কলয়িতারা এই দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং সংস্কৃত অভিধান মন্থন করিয়া কতকগুলি অতিশয় দুরূহ এবং অপরিচিত শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন। আরবী, ফারসী ও ইংরেজী বহু শব্দ বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে বাংলা ভাষার কোন ক্ষতি হয় নাই। পরিভাষা-রচয়িতারা উহা বাদ দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। ইঞ্জিন পেশকার প্রভৃতি শব্দ তাঁহাদের রাখিতে হইয়াছে। বাংলা ভাষায় তদ্ভব সমস্ত শব্দ বাদ দিয়া নিছক তৎসম শব্দের সাহায্যে অভিধান প্রণয়ন আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমরা মনে করি না। সঙ্কলয়িতারা যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের শ্রম ব্যর্থ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা নিতান্তই প্রয়োজন।

জনমতের নিকট নতি স্বীকারে কাহারও লজ্জিত হইবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। পরিভাষা-সংসদের সঙ্কলনটিকে খসড়া হিসাবে গ্রহণ করিয়া জনমতের অনুকূলে উহা পুনর্ব্বিবেচনা করিলে ভাল হইবে। পরিভাষা-সংসদের সদস্য মনোনয়নে একটি বড় ত্রুটি এই গোলযোগের মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। বাংলা শব্দ চয়নে ও প্রস্তুত-করণে বাংলা সংবাদপত্রসমূহের দান অসামান্য, অথচ তাঁহাদের কোন প্রতিনিধি সংসদে গ্রহণ করা হয় নাই। আনন্দবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব বার্ত্তা-সম্পাদক এবং ভারত-এর বর্ত্তমান বার্ত্তাসম্পাদক শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেনের কৃতিত্ব এ বিষয়ে সর্ব্বজনবিদিত। পরিভাষা-সংসদে ইঁহাকে মনোনীত করিয়া বর্ত্তমান ত্রুটি সংশোধন করিলে ভাল হয়। বাংলা ভাষায় চিরস্থায়ী ভাবে যে সব নূতন শব্দ প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহা তিন চার বার পরীক্ষিত হওয়া এবং সর্ব্বজনগ্রাহ্য হওয়া উচিত।

হায়দরাবাদ সমস্যা

গত মাসের "প্রবাসী" পত্রিকায় হায়দরাবাদ রাজ্যের নিজাম বাহাদুর ও তাঁহার শাসক শ্রেণীর মতিগতির একটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যখন এক মুঘল কর্ম্মচারী দাক্ষিণাত্যে নিজের জন্য একটি রাজ্য স্থাপন করেন, তখন তিনি বা তাঁহার সাহায্যকারিগণ কেহই বোধ হয় কল্পনা করেন নাই যে এই রাজ্যে মুসলমানদের রাজনীতিক প্রাধান্য ("traditional political superiority of Muslims") রাষ্ট্রপরিচালনার একটি নীতি হইয়া দাঁড়াইবে। এ কথা তাঁহাদের পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না। কারণ পুনার মারাঠা প্রাধান্য তখনও দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর ভারতে অটুট ছিল এবং কেবল ইংরেজের সাহায্যেই নিজাম বাহাদুরের রাজ্য মারাঠা কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল। গত ১৫০ শত বৎসর কেবল ইংরেজের প্রসাদেই হায়দরাবাদ রাজ্য টিকিয়া আছে এবং আজ যখন ভারতবর্ষে গণরাজের জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, তখন নিজাম রাজ্যের সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা টিকিতে পারে না। এই কথাটা নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁ বুঝিতে পারেন নাই তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গণরাজের প্রতিষ্ঠা হইলে তাঁহার বংশের স্বার্থ সঙ্কুচিত হইবে—এবং এই বিধান গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ নয়। সেইজন্য তিনি বহু দিন হইতে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-প্রাধান্যের জিগির উঠাইয়া, নিজের নিরঙ্কুশ অধিকার দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে অনেক সময়েই তাঁহাকে "মুল্কের"—হায়দরাবাদের—বাহিরের লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। উত্তর-ভারতের মুসলমান ভাগ্যান্বেষীগণ এই কাজে তাঁর দক্ষিণহস্তের স্থান অধিকার করিয়া আছে। হুসেন বিলগ্রামী হইতে কাসিম রাজভী—এই পর্য্যায়ের লোক; বিগত ৭০ বৎসর ইহাদের পরামর্শেই হায়দরাবাদ রাজ্য চলিয়াছে। ইংরেজ তার নিজের স্বার্থের হানি না করিয়া নিজাম বাহাদুরকে প্রশ্রয় দিয়াছে, ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান বলিয়া তাঁর অহমিকার ইন্ধন জোগাইয়াছে এবং ভারতবর্ষের মুসলমান প্রধানগণ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়াই আজ কাসিম রাজভীর মতন লোকে চীৎকার করিতে সাহস পায় যে নিজাম বাহাদুর "মুসলিম-প্রাধান্যের প্রতীক" মাত্র; রাজ্যের আসল শাসনকর্ত্তারা হইল ২৫-৩০ লক্ষ মুসলমান।

অবশ্য নিজাম বাহাদুরের প্রশ্রয় পাইয়াই কাসিম রাজভী এত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, এবং এমন কথাও শুনিতে পাইতেছি যে রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা কাসিম রাজভীর হাতে চলিয়া গিয়াছে; মীর ওসমান আলী খাঁ তার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তিনি এমন উগ্র সাম্প্রদায়িক দলদ্বারা পরিবেষ্টিত যে, যদি ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি করেন তবে তাহারা তাঁহাকে খুন করিতে পারে ("Who would probably murder him.")। এই কথাটাই লণ্ডনের "নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশন" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কিংস্‌লি মার্টিন দুনিয়াকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কয়েক দিন হায়দরাবাদ রাজ্যে ঘুরিয়া এবং সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া, কাসিম রাজভীর নিজের বাড়ীতে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া তিনি বুঝিয়া-

ছেন যে, ইত্তেহাদ্-উল-মুসলেমিন প্রতিষ্ঠানই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ("It is the unofficial *Ettehad* rather than the comparatively small and ill-armed Hyderabad army, which is in control of the situation")। হায়দরাবাদ রাজ্যের ক্ষুদ্র ও অস্ত্রশস্ত্রে অ-সজ্জিত সৈনিক-দল ইত্তেহাদের অঙ্গুলীনির্দ্দেশে চালিত হয়। এই কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের চোখের সামনে দেখিয়াছি, দেখিয়াছি জনাব হুসেন সহিদ্ সোরাওয়ার্দ্দির আমলে কি করিয়া মুসলমান জনতা কলিকাতার উপর ১৯৪৬ সনের ১৬ই আগষ্ট তাণ্ডব 'নৃত্য' করিয়াছিল; কি করিয়া নোয়াখালি ত্রিপুরায় অত্যাচার চালাইয়াছিল এবং ১৯৪৬ সনের ১৫ই আগষ্টের পর কি করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে মুসলীম ন্যাশন্যাল গার্ড খাজা নাজিমুদ্দিনের পক্ষে শাসনকার্য্য চালাইয়াছিল। হায়দরাবাদের ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিন বাংলাদেশের মুসলমান "জনতা" হইতে বেশী সংগঠিত। এই প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকরা সংখ্যায় ২ লক্ষ; তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর; এবং তারা রাজ্যে মুসলমান প্রাধান্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ("A body of some 2,00,000 able-bodied Muslims... armed and ready to fight with any who threaten their power in Hyderabad.")।

এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য। তৎসম্বন্ধে এই ইংরেজ সাংবাদিক আকারে ইঙ্গিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন না যে কূটনীতি সকলকাম হইবে ("diplomacy can succeed")। ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারেরা আজ পর্য্যন্ত সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। তারও একটা শেষ আছে। এই শেষের কথাই মিঃ কিংসলি মার্টিনের প্রবন্ধে পাওয়া যায়। একজন বাস্তববাদী বলিবে যে হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তর ও বাহির হইতে যে চাপ পড়িতেছে—হায়দরাবাদের ষ্টেট কংগ্রেস হইতে, সমাজতন্ত্রবাদী ও কম্যুনিষ্ট দল হইতে—সেই দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে বা তার প্রশ্রয় দিলে নিজাম বাহাদুরের সাধের সাজানো বাগান ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে। ("A realist might urge that instead of discouraging pressure from the Communist-Socialist elements and the State Congress, Delhi should turn a blind, if not a favourable eye upon all such activities, legal and illegal.")। এখানে বলা দরকার যে কম্যুনিষ্টদল এতদিন নামে বিরোধ করিয়া এখন প্রকাশ্যে রাজভীর দলেই আসিয়াছে। আগামী দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই দেখা যাইবে বাতাস কোন্ দিকে বহিবে। বর্ত্তমানে ভারত-রাষ্ট্র হইতে যে কথার তুবড়ি উড়িতেছে, তাহা বন্ধ হইলেই প্রকৃত কাজ আরম্ভ হইবে। কথায় বড়ই শক্তিক্ষয় হইতেছে। অস্ত্রের ঝনঝনা না শুনাইয়াও কেবল মাত্র অর্থনীতিক চাপেই ("economic pressure") হয়ত নিজাম বাহাদুরের কূট চাল ব্যর্থ করা যাইতে পারে। তবে আর বেশী দিন সময় দিলে তাহা সম্ভব হইবে না। তখন ভারত-সরকারকে বিপরীত অবস্থার মধ্যে অস্ত্র গ্রহণই করিতে হইবে।

ইউরোপ মহাদেশের সমস্যা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও বিজয়ী দেশসমূহ ইউরোপ মহাদেশে শান্তি আনিতে পারিতেছেন না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধের সময়ে যেরূপ একজোট ছিলেন, যুদ্ধজয়ের পরে সে মনোভাব উবিয়া গিয়াছে। এক দিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন অন্য দিকে এই ত্রি-শক্তি 'যুদ্ধং দেহি' রবে পাঁয়তারা কষিতেছেন। দুই পক্ষই এখন পরাজিত জার্ম্মানীকে লইয়া টানা-হেঁচড়া করিতেছেন; জার্ম্মানীর মনোভাব মোলায়েম করিয়া নিজ নিজ দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই অবস্থায় ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে জার্ম্মানী ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলে, বর্ত্তমানে যে লাথি-ঝাঁটা তাহার উপর পড়িতেছে তাহা সহ্য করিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে সে সুখের মুখ দেখিতে পাইবে। ইউরোপের কেন্দ্র-স্থলে সে অবস্থিত; বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ কতদূর শক্তিধর হইতে পারে, জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। দুই পক্ষেই এখন তাঁদের আদর বাড়িয়াছে; দুই পক্ষই তাঁহাদের জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র। এইরূপ পট-ভূমিকায় ইউরোপের অবস্থার বিচার করিলে আমাদের বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, যে পক্ষ জার্ম্মানীর সাহায্য লাভ করিতে পারিবে, সে-ই বর্ত্তমান রাজনীতিক প্রতি-যোগিতায় জয়লাভ করিতে পারিবে। এইরূপ প্রতিযোগিতার একটা রূপান্তর দেখিতেছি পশ্চিম ইউরোপে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হলাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গ একটা দল বাঁধিয়াছে; অর্থনীতিক ও সামরিক ব্যাপারে পরস্পর সাহায্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। প্রায় ৬৪০ কোটি টাকার সাহায্য প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে ইউরোপের ১৬টি দেশ মার্শাল-পরিকল্পনা অনুসারে। এই টাকা দিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যদি এই ১৬টি দেশকে নিজের পক্ষে টানিতে পারে, তবে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। অপর দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশসমূহ পূর্ব্ব-জার্ম্মানী হইতে আরম্ভ করিয়া রুমেনিয়া পর্য্যন্ত একজোট হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদেরও আর্থিক উন্নতির একটা পরিকল্পনা আছে, এবং সেই পরিকল্পনায় ৪... কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হইতেছে। এই দুই বিরোধী রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্য্যকলাপ বুঝিবার পক্ষে নিরপেক্ষ বিবরণ আমরা

পাইতেছি না। সম্প্রতি হলাণ্ডের হেগ নগরে মিঃ চার্চ্চিলের নেতৃত্বে যে সভার অধিবেশন হইয়াছে তাহার ফলাফল না জানিয়াও ইহা বলা যায় যে ইহা বিরোধী পক্ষের তর্কবিতর্কের অবসান ঘটাইবে না। একটি "ইউরোপীয় পরামর্শ সমিতি" গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের সনদ অনুসারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে "গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইউরোপের সকল জাতির সমান অধিকার থাকিবে।" এই "গণতান্ত্রিক" শব্দের সংজ্ঞা লইয়াই যত বিরোধ। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তাহার সহায়ক দেশসমূহ গণতান্ত্রিক উপায়ে শাসিত হইতেছে; এই কথা কি মিঃ চার্চ্চিল স্বীকার করিবেন? পাল্টা উত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়ন বলিবে যে পশ্চিম-ইউরোপ ও আমেরিকা ত সাম্রাজ্যবাদী ভাবের পোষক, এবং সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে পরিপুষ্ট। এই অভিযোগের প্রমাণ হেগ নগরীর একটা সিদ্ধান্তের মধ্যেই পাওয়া যায়। "অধীন বা সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র দেশগুলির অর্থনৈতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উন্নতিবিধানের জন্য যে সম্মিলিত ইউরোপ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে, তাহার মধ্যে জার্ম্মানীরও স্থান থাকিবে।" এই প্রস্তাবের মধ্যে "অধীন" কথাটাই আমাদের মনে সন্দেহ জাগাইয়াছে। জার্ম্মানী আজ "অধীন" দেশ; তাহার স্থান ব্রিটেন বা ফ্রান্সের সমান হইবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই অসাম্য অন্যান্য "ক্ষুদ্র" দেশসমূহকেও পীড়িত করিবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের অধীনে জার্ম্মানীর যে অংশ আছে, তাহা এই সম্মিলিত ইউরোপের মধ্যে স্থান পাইবে কি? বস্তুতঃ হেগ নগরীর সভার ফলে ইউরোপ মহাদেশের বিভাগ অটল হইয়া রহিল বলিয়া মনে হয়।

প্যালেষ্টাইন

পৃথিবীর নবতম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইল। দুই হাজার বৎসরের স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা "ইজরাইল" রাষ্ট্রের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ছয়টি আরব রাষ্ট্র—মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, ট্রান্স-জর্ডনিয়া ও সৌদি আরব—এই নব-জাত রাষ্ট্রের গলা টিপিয়া মারিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে; তাহারা পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক হইতে "ইজরাইলে"র উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। প্যালেষ্টাইনের আরব অধিবাসীরা এখনও কোন ঘোষণা করে নাই; মনে হয় তাহারা সমস্ত দেশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করিতেছে। এই যুদ্ধ প্যালেষ্টাইনের ৬ লক্ষ ইহুদির বিরুদ্ধে ১৪ লক্ষ আরবের নহে। বিশ্বের দেড় কোটি ইহুদির বিরুদ্ধে সাত কোটি আরবের ইহা সংগ্রাম। কিন্তু এই অসামান্য যুদ্ধের ইহাই শেষ নয়। বিশ্বের মুসলমানগণ ইহাতে যোগদান করিতে পারে। তখন ব্যাপার কি দাঁড়ায়, তাহা এখন কল্পনা করা কঠিন। সম্মিলিত জাতির যে প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অবসানে গড়িয়া তোলা হইতেছে, তাহা প্যালেষ্টাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। ব্রিটেন তাহার শাসনসময়েও প্যালেষ্টাইনের আরব ও ইহুদির মধ্যে সম্প্রীতি আনিতে পারে নাই—যে কারণে পারে নাই ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে। আজ সে কথা ভাবিয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু আশঙ্কার কারণ আছে। মহাভারতে "অষ্ট বজ্র মিলন" বলিয়া একটা উপাখ্যান আছে। বিংশ শতাব্দীতে আবার সেই উপাখ্যানের পুনরুক্তি না হয়। ক্ষুদ্র প্যালেষ্টাইনকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া আবার বিশ্ব-সংগ্রামের রণ-দামামা বাজিয়া উঠিতে পারে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

"সব চেয়ে দুর্গম সে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।"

২৫শে বৈশাখ এই কথাই বারে বারে মনে হইয়াছে। যে জ্যোতিষ্মান্, "অন্তরময়" পুরুষ ৮৮ বৎসর পূর্ব্বে ২৫শে বৈশাখ কলিকাতা নগরীর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ৮০ বৎসর নানাভাবে পৃথিবীর জীবন সুন্দর ও মহীয়ান্ করিবার জন্য সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরের সঙ্গে মিশিয়া কি আমরা তাঁহার অন্তরের পরিচয় পাইয়াছিলাম? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে তাঁহার জন্মোৎসবের সার্থকতা, তাহার জন্য সভাসমিতি করিয়া তাঁহার প্রশস্তি-গীতির আমাদের আয়োজন-উদ্যোগ। জানি মানুষ ব্রত-উপবাস করে কোন মহান্ আদর্শের প্রতি অনুরক্তি অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিবার জন্য; সেই মানুষই আবার ব্রত-উপবাসের আয়োজন-উদ্যোগের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে; মুখ্য যাহা ছিল তাহা হইয়া পড়ে গৌণ, বাহির অন্তরকে কোণঠাসা করিয়া ফেলে। আদর্শের ও অনুভূতির এই বিবর্ত্তন মানব-সমাজে স্বাভাবিক হইতে পারে। এইরূপ উৎসবের প্রয়োজন আছে; একদিনের জন্য, কয়েক ঘণ্টার জন্য, ক্ষণিকের জন্যও অন্তর্লোকের পরিচয় পাওয়ার সার্থকতা আছে। এই ক্ষণিকের দেখাই মানব-জীবনকে সহজ, সরল ও সরস করিবার চেষ্টা করে। আমাদের বর্ত্তমান জীবনের সহস্র ব্যর্থতার মধ্যে সেইজন্য ২৫শে বৈশাখ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ২৫শে বৈশাখের জন্য শিক্ষিত বাঙালীর মন জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ অপেক্ষা করে সারা বৎসর ধরিয়া নিজের মনের নানা উচ্ছ্বাস, নানা ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য। সমাজ-জীবনের স্বাস্থ্যের জন্য এইরূপ মুক্তির প্রয়োজন আছে।

৮০ বৎসর রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীকে ভালবাসিয়া ইহাকে অন্তর্লোকের ভাবসুষমায় মণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য যেখানে ক্ষুদ্রতা, যেখানে ক্লেদ দেখিয়াছেন, সে স্থানকেই

মহীয়ান ও পরিশুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। রাষ্ট্রের জীবনে, সমাজের জীবনে, জাতির জীবনে, বিশ্ব-মানবের জীবনে এই ক্ষুদ্রতার উপর তিনি হানিয়াছেন তাঁহার বজ্র; সমস্ত সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া তিনি শিবম্, শান্তম্, সুন্দরম্—আমাদের জীবনে, বর্ত্তমান যুগের স্ত্রী-পুরুষের জীবনে এই ত্রি-মূর্ত্তির আবির্ভাবের জন্য অক্লান্ত সাধনা করিয়াছেন। এই সাধনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের রহস্য খুঁজিতে হইবে। তাঁহাকে "ভৃত্য-তন্ত্রের" আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সদ্গুণে এই জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি তাঁহার মনকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই। রাজা রামমোহন রায়ের "ব্রাদার" তাঁহার পিতা; এই বিরাট পুরুষের জীবনাদর্শ সেই যুগের সকলের জীবন নানাভাবে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে যে নব-জাগরণের সূচনা হয়, সেই যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের পূর্ব্বজগণের কেহই তাহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই; শত্রু ভাবেই হউক, মিত্র ভাবেই হউক, সকলেই সেই উচ্ছ্বাসে অবগাহন করিয়া বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা দীক্ষার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি "ইয়ং বেঙ্গল" "ইয়ং বোম্বাই"এর উন্মাদনার কথা- যখন গরু খাওয়া ও হিন্দু ধর্ম্মের রীতিনীতির প্রতি গরুর হাড় নিক্ষেপ করাই ছিল ইংরেজী শিক্ষিত মনে সর্ব্বাধিক সহজ পরিচয়। কিন্তু "ইয়ং বেঙ্গল" "ইয়ং বোম্বাই"কে দিয়া সেই যুগকে বিচার করিলে চলিবে না। সে যুগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন, "বিদ্যাসাগর" ছিলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন—যেমন ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এবং সেই যুগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই নরশ্রেষ্ঠরা।

সেই যুগের প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁহার জীবনস্মৃতিতে আমরা দেখিতে পাই ভারতীয় সমাজে এক আত্মবিশ্বাস ও সম্ভ্রমবোধের প্রত্যাবর্ত্তন যাহা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের রাষ্ট্রে করিয়াছে আত্মপ্রতিষ্ঠা, যাহা ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মোপলব্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সেই পরিচয় দিতে গিয়া তাঁহার মত অগ্রণীদের তপস্যা করিতে হইয়াছে। এই পরিচয়ের রেখা তাঁহার লেখায়, তাঁহার গানে, তাঁহার "শান্তিনিকেতন", তাঁহার বিশ্ব-ভারতীতে দেদীপ্যমান হইয়া আছে। সেই পরিচয়ে জাতির মনকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক সময় "একলা" চলিতে হইয়াছে; তাঁহার ভাবের ভাবুকদের মধ্যে অনেকেই বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালাইয়া সংস্কারাবদ্ধ দেশবাসীকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। নবযুগের প্রবর্ত্তকবৃন্দের ইহাই গতি। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের "একলা চলরে" গানটি গান্ধীজীর এত প্রিয় ছিল, এবং সেই যুগের "একলা" চলার দলের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল বাল্যাবধি। রাজনারায়ণ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র ইঁহাদের দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতিতে" নব ভাবের ধারকরূপে, নব ভাবের কবিরূপে, নব ভাবের ব্যাখ্যাতারূপে, কর্ম্মে ও রীতিতে এই ভাবকে রূপ দিবার কর্ম্মীরূপে। এই জাগরণের পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্য, কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছিল; সেইজন্য তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল স্বদেশের "দীক্ষা" গ্রহণ করা, স্বদেশ-সেবার ব্রত গ্রহণ করা।

> "বুঝিতে পারিনু এ জগৎ মাঝে
> আমারো রয়েছে কাজ।
> স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
> করিলাম জোড়করে
> এই লহ, মাতঃ, এ চির-জীবন
> সঁপিনু তোমার তরে।"

১৮৮৮ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, রবীন্দ্রনাথের "বন্ধু"র উদ্দেশে লিখিত এক কবিতায় এই ব্রতের কথা শুনিতে পাই। তারপর ৫৩ বৎসর তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত্ত দেশের উন্নতির চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল।

ইহাই তাঁহার এক রূপ। আর এক রূপ কবির, দার্শনিকের, সৌন্দর্য্যের উপাসকের, সৌন্দর্য্যের স্রষ্টার। সেই রূপ দেশ কাল পাত্রের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করিয়া পরিব্যাপ্ত। সে রূপের আকর্ষণে দূর নিকটে আসিয়াছিল, পর আপনার হইয়াছিল। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে একজন ভারতীয় সাধক মৈত্রেয়ীর বাণী উচ্চারণ করিয়া দেশ-বিদেশের জিজ্ঞাসুদের ভারতীয় বিদ্যাপীঠে আহ্বান করিয়াছিলেন। তারপর ভারতবর্ষের ও বিশ্বের মধ্যস্থলের পড়িল এক যবনিকার অন্তরাল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ আপনার মহিমায় সেই অন্তরাল দূর করিলেন। বিশ্বের লোক প্রাচ্যের ঋষি সত্যদ্রষ্টার আবার দর্শন পাইল। ১৮৩২ ও ১৮৯৩ সনে যে পরিচয় তাঁহারা পাইয়াছিলেন সে পরিচয়ের রূপ দেখিলেন এক কবির মধ্যে তাঁহার গানে কবিতায় জীবনদর্শনে। ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ।

কামাক্ষী নটরাজন

বোম্বাই নগরীর "ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফরমার" নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদক কামাক্ষী নটরাজন ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় মাদ্রাজের "হিন্দু" ও "স্বদেশমিত্রম" পত্রিকার সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক পি. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের অধীনে। তাঁহার অনুপ্রাণনায় তিনি দেশের সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৯০ সনে "ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফরমার" পত্রিকার সংশ্রবে

আসিয়া তিনি আমাদের সমাজের নানা অনাচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করেন, এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত এই ব্রত নৈষ্ঠিকভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। আজ এই বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ সমাজসেবকের তিরোধানে আমাদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে তাঁহারা কি চাহিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, এবং কোথায় ব্যর্থ হইয়া বর্ত্তমান যুগের সমাজ সেবকদের হাতে তাঁহাদের অসম্পূর্ণ কাজ রাখিয়া গিয়াছেন। যখন জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠা হয়, তখন একটা ভাব আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনকে আলোড়িত করিতেছিল যে যত দিন আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা না হইবে, যত দিন আমাদের সমাজের নানা অনাচার ও অসাম্যের প্রতিবিধান না হইবে তত দিন আমাদের রাজনীতিক স্বাধীনতার আশা নাই, এবং ইংরেজের সাহায্যেই আমাদের এই সব দুর্ব্বলতার কারণকে সমাজ-জীবন হইতে দূর করিতে হইবে। এই ভাবের মধ্যে একটা পর-নির্ভরতার ইঙ্গিত ছিল যাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অংশকে ক্ষুব্ধ করিয়া গতানুগতিক সমাজ সংস্কার ও রাজনীতিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে উগ্র করিয়া তোলে। লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক ও আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে এই বিদ্রোহের প্রতীক বলিয়া স্বীকার করা যায়। সেইজন্য দেখিতে পাই বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র দেশে দুই পক্ষের তুমুল তর্ক-বিতর্ক। এই সময়েই কামাক্ষী নটরাজন তাঁহার সংবাদপত্রখানি লইয়া বোম্বাই নগরীতে চলিয়া আসেন, এবং নারায়ণ গণেশ চন্দভারকর প্রভৃতি নেতৃবর্গের সাহায্যে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে তখন "সমাজ-সংস্কারক"-গণের নেতা ছিলেন ; বোম্বাই হাইকোর্টের জজ হইয়াও তিনি কংগ্রেসের পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কামাক্ষী নটরাজন তাঁহার জীবনের বিশেষ ব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজনীতিক আন্দোলন ও জাতীয় জীবনের সক্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে "সমাজ-সংস্কারকেরা" তাল রাখিয়া চলিতে পারিলেন না, এবং গান্ধীজী যখন কংগ্রেসের কর্ত্তব্যের মধ্যে "সমাজ-সংস্কারের" নীতি ও প্রচেষ্টা ঢুকাইয়া দিলেন তখনও তাঁহাদের মনের বিরূপ ভাব দূর হইল না ; তাঁহারা গান্ধী-আন্দোলনের সঙ্গে মনে-প্রাণে সহযোগিতা করিতে পারিলেন না। কামাক্ষী নটরাজন এই সম্পর্কে একটা বিশিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব অনুকূল না হইলেও তিনি তাঁহার বিরুদ্ধতার মধ্যেও একটা সংযত মনোভাবের পরিচয় দিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীদের উগ্রতার উপর শান্তি-বারি সিঞ্চন করেন। এইজন্য তিনি বিরোধী হইয়াও রাজনীতিকবর্গের শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি হারান নাই। তাঁহার তিরোধানে বোম্বাইয়ের শিক্ষিত সমাজ একজন বিশিষ্ট নেতা হারাইল।

বীরেশ-লিঙ্গম পাণ্টালু

অন্ধ্র দেশে একজন লোক-নেতা ও সমাজসেবকের জন্মতিথির শত-বার্ষিকী উৎসব চলিতেছে, যাহাকে অনেক সময় অন্ধ্র দেশের "বিদ্যাসাগর" বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। তাঁহার নাম বীরেশ-লিঙ্গম। এক শত বৎসর পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি সামান্য বিদ্যালাভ করেন এবং রাজমহেন্দ্রী শহরের কোন বিদ্যালয়ে "পণ্ডিতের" পদ যোগাড় করিতে পারেন। কিন্তু এই "পণ্ডিতের" মধ্যে এমন একটা সহজ মন ছিল যাহাতে তিনি সমাজের অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারিলেন এবং এমন একটা প্রাণ ছিল যাহার প্রেরণায় তিনি নিজের সামান্য বিদ্যা ও সঙ্গতি লইয়া হিন্দু সমাজের গতানুগতিক আচারব্যবহারের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম করিয়া গেলেন। বাংলার "বিদ্যাসাগরের" মত তিনি বালবিধবার প্রতি যে অবিচার চলিতেছিল তাহার প্রতিরোধকল্পে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন ; তাঁহাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিলেন ; তাঁহাদের বিবাহের আয়োজন করিলেন। অন্ধ্র দেশের ব্রাহ্মণ সমাজ এইজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। জাতিচ্যুত করিয়া বীরেশ-লিঙ্গমকে দমাইতে পারিলেন না। কারণ তিনি যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া অচ্ছুৎদের মধ্যে দাঁড়াইলেন ; তাহাদের মানুষ করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। এই সব সংস্কারের জন্য তিনি তেলুগু ভাষার এক নূতন রূপ দিলেন ; তেলুগু সাহিত্যে নবশক্তির সঞ্চার করিলেন। অন্ধ্রদেশে সমাজসংস্কারক রূপে ও সাহিত্যিক রূপে আজও তিনি পূজিত হইতেছেন ; তাঁহার বিপক্ষীয়দের বংশধরগণ আজ তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অগ্রণী হইয়া আসিয়াছেন। ইতিহাসের এই প্রতিশোধ যুগে যুগে মানবসমাজকে সঞ্জীবিত করে। অন্যায় ও অসাম্যের শাসন আপনার ভারে আপনি ভাঙিয়া পড়ে। তাই একজন সামান্য তেলুগু "পণ্ডিতের" জীবনকথা আজ অন্ধ্র দেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইতেছে এবং তাঁহার স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে "বিদ্যাসাগর", শিবনাথ শাস্ত্রীর সমপংক্তিতে। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর রামলিঙ্গম রেড্ডি মহাশয় বলিয়াছেন যে যদিও বীরেশ-লিঙ্গম ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতেন, তবু তাঁহার সংস্কার-চেষ্টার মধ্যে ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা ছিল না ; যুক্তিবাদ ও সহজ, স্বাভাবিক মানবধর্ম্ম, অত্যাচারিতের প্রতি সমবেদনা, তাঁহাকে সংস্কারের দুর্গম পথে পরিচালিত করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয় দশকে আমাদের জাতীয় গৌরববোধ যখন জাগ্রত হইয়া উঠিল, তখন এই যুক্তিবাদ আমাদের মধ্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সেই মোহ কাটিয়াছে ; যুক্তিবাদের প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে বীরেশ-লিঙ্গমের সমধর্ম্মীর জন্মোৎসব আমাদের জীবনে একটি নূতন সাম্য আনিতে পারে।

প্রেততত্ত্ব

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গ্রীক্ দার্শনিক সোক্রেতিসকে লক্ষ্য করিয়া সাধারণ ভাবে দর্শনের গবেষণাকে উপহাস করিবার জন্য তদানীন্তন এক জন নাট্যকার একখানা নাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকটী প্রকাশ্যে অভিনীত হইয়াছিল এবং বলা বাহুল্য সাধারণ দর্শকেরা উহা উপভোগও করিয়াছিল। সোক্রেতিস অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন কি না, জানা নাই; তবে কথাটা নিশ্চয়ই তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছিল। ইহাতে তিনি মনে একটু আঘাতও পাইয়াছিলেন মনে হয়। কারণ, পরে যখন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি মৃত্যুদায়ী বিষপানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং আত্মীয় ও বন্ধুরা তাঁহার শেষ বাণী শুনিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল, তখন তিনি মৃত্যুর পরে আত্মার গতির কথা অবতারণা করেন এবং বলেন, 'এখন যদি এ সব বিষয়ের আলোচনা করি, তাহা হইলে আশা করি কেহ আমাকে উপহাস করিবে না।'

নিশ্চিত মৃত্যুর আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া সোক্রেতিস উহার কথা ভাবিয়াছিলেন, ইহাতে উপহাসের কিছু ত নাই-ই, বরং না ভাবিলেই বিস্ময়ের বিষয় হইত। আর, এ কথাও ত ঠিক যে, মানুষের স্বাভাবিক জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরের কথা ভাবা দোষের ত নয়-ই, বরং উচিত। যাহা অতিক্রম করার কোন উপায় নাই, যাহা নিশ্চিত আসিবে, আসিবার সময় নিকট হইলে তাহার কথা না ভাবিলে চিন্তার দৈন্য ও পঙ্গুতাই বুঝায়। কালের রেখায় আমরাও সেই বিন্দুতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যেখান হইতে মৃত্যু আর খুব বেশী দূরে নয়। সুতরাং আমরাও সোক্রেতিসের যুক্তি অনুসারে কথাটা তুলিতে পারি। যাঁহারা কোন ক্রমেই মৃত্যুর ছায়াও অনুভব করেন নাই অথবা যাঁহারা মৃত্যুর নামে ভয় অথবা লজ্জা অনুভব করেন, তাঁহারা এই আলোচনা বর্জ্জন করিতে পারেন; কিন্তু রুষ্ট হইবার অথবা উপহাস করিবার অধিকার কাহারও নাই।

সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য জানি না; নানা কারণে কিছু কাল যাবৎ একাধিক প্রেত-তত্ত্বের গ্রন্থ আমাদিগকে পড়িতে হইয়াছে। সেইজন্য বিষয়টার একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রেততত্ত্ব যাহাকে বলি, তাহা মৃত্যুর পর মৃতের কি গতি হয় এই প্রশ্নের একটা উত্তর। একটা উত্তর বলিতেছি এইজন্য যে, এই প্রশ্নের আরও উত্তর আছে। সরল ভাষায় প্রশ্নটা এই: দেহের যখন মৃত্যু হয় তখন দেহের মধ্যে যে আত্মা আছে তাহার কি হয়? এই প্রশ্নে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, আত্মা দেহ হইতে পৃথক একটা সত্তা। জীবনে দেহের সঙ্গে তাহার একটা সম্পর্ক দেখা যায়; কিন্তু দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও বিলয় হয় না; ইহার পরও তাহার একটা ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু এই ধরিয়া লওয়া জিনিসটি কি সত্য?

এইখানে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, সত্যই কি আত্মা দেহ হইতে পৃথক? দৈহিক মৃত্যুর পর আত্মার আর কোন ভবিষ্যৎ নাই, ইহ কি কল্পনা করা যায় না? জলে বুদ্বুদ হয়, মিছরি দানা বাঁধে, তেল ও সলিতার সহযোগে আলো জ্বলে; কিন্তু বুদ্বুদ ত আবার জলে মিশিয়া যায়; মিছরির দানাও জল পাইয়া গলিয়া যায়; আর তৈল বা বর্ত্তিকা নিঃশেষ হইয়া গেলে আলোও নিবিয়া যায়। সেইরূপ দেহে যে সব রাসায়নিক পদার্থ আছে তাহাদের সমবেত ক্রিয়ার ফলে জলে ঢেউ কিংবা বুদ্বুদের মত দেহে আত্মার আবির্ভাব হয়। আলো দেখিয়া যেমন দীপের অস্তিত্ব আমরা জানি, তেমনই চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি দেখিয়া আত্মার অস্তিত্বও আমরা বুঝিয়া লই। আবার ঢেউ যেমন জলেই মিশিয়া যায় এবং জল ছাড়া যেমন ঢেউয়ের অস্তিত্ব নাই, তেমনই দেহের রাসায়নিক পদার্থসমূহের মিলনের বাহিরে আত্মার কোন সত্তা নাই; আর মৃত্যু নামক ঘটনা ঘটিলে সেই সব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যেই আত্মা বিলীন হয়—জলে যেমন ঢেউ ঠিক তেমনই।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে কিন্তু আর প্রেততত্ত্ব থাকে না। সুতরাং আস্থাবান্ যাঁহারা তাঁহারা দেহ হইতে পৃথক আত্মা এবং দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্ব এই উভয়ই মানিয়া লন। কিন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কিনা ইহাও একটা বিচার্য বিষয়। অধিকন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে ইহা প্রমাণিত হইলেই কিংবা বিশ্বাস করিলেই প্রেততত্ত্ব নামক বিদ্যায় যাহা বলা হয় তাহা সমস্তই সত্য হয় না। আত্মার অস্তিত্বের প্রশ্ন এখানে তুলিতে চাই না; কারণ তাহাতে আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং জটিল হইয়া পড়িবে। আমরা বরং সাধারণ দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ধরিয়া লইতে প্রস্তুত যে আত্মা আছে। কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেই প্রেততত্ত্বের সকল সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় না। প্রেততাত্ত্বিকেরা সাধারণত যাহা সত্য বলিয়া

বিশ্বাস করেন সেগুলি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইলেই প্রেততত্ত্ব অ-তত্ত্ব হইয়া পড়ে। ইহার উপর আত্মার অস্তিত্বেও যদি সন্দেহ দেখা দেয়, তবে প্রেততত্ত্বের আর কিছুই থাকে না। বিচারে অগ্রসর হওয়ার আগে এই কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত। আত্মার অস্তিত্ব সাধারণত বিশ্বাসিত হইলেও সংশয়ের অতীত নয়। কিন্তু আত্মা সত্য, ইহা ধরিয়া লইয়াই আমরা দেখিতে চাই, প্রেততত্ত্বের সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় কিনা।

প্রেততত্ত্বের তত্ত্বসমূহ লইয়া এক বিরাট সাহিত্য রচিত হইয়াছে; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল ভাষায়ই প্রায় উহার সাক্ষাৎ মিলিবে এবং যে-কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক সহজেই সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন। সেইজন্য কোন গ্রন্থ-বিশেষের উল্লেখ আমরা এখানে নিষ্প্রয়োজন বোধ করি। এই তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলিকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি:—১। প্রেত-আত্মা, ২। প্রেতের দেহ, এবং ৩। প্রেত-লোক।

১। প্রেত-আত্মা সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে উহা প্রেত হইয়াও নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে; অর্থাৎ রামকমল মরিয়াও—তাহার আত্মা দেহবিমুক্ত হইলেও—রামকমলই থাকিয়া যায়। তাহার পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক পূর্ব্বের মতই থাকিয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দেহান্তর প্রাপ্তি অস্বীকৃত হয়। রামকমলের আত্মা যদি প্রেত হইয়া আবার নূতন দেহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে আর আগের সব সম্পর্ক মনে রাখিবে কি করিয়া? তাহার নূতন দেহ মনুষ্য-দেহ না-ও হইতে পারে; গাছ কিংবা শামুকের দেহ হইলে বিষয়টি আরও জটিল হইয়া যায়।

দেহান্তরপ্রাপ্তি সকলেই মানেন এমন নয়, যাঁরা মানেন তাঁরা অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অমরত্বও মানিতে বাধ্য। সেটি প্রেততাত্ত্বিকেরাও মানেন। কিন্তু আত্মার অবিনাশিত্ব স্বীকার করা আর প্রেততত্ত্বের সব সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া এক বস্তু নয়। অমর আত্মার দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ পাতঞ্জল দর্শন ইত্যাদি যে ভাবে বুঝিয়াছে তাহাতে ইচ্ছামত কোন প্রেতকে ডাকিয়া আনা কঠিন। কারণ রামকমলের আত্মা যদি একটি কচ্ছপের দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে মণ্ডলীতে উপবিষ্ট প্রেততাত্ত্বিকেরা যখন রামকমলকে আহ্বান করিবেন তখন তাহার সেখানে উপস্থিত হওয়া খুবই সহজ—আদৌ সম্ভব—এরূপ মনে করিতে পারি না।

দেহান্তরপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতিস্মরত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি আত্মা রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু যে-কোন দেহে অবস্থিত আত্মা যে-কোন জন্মের বৃত্তান্ত মনে করিতে পারে, এমন নয়। জাতিস্মরত্বের ভাল দৃষ্টান্ত পাই বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থে; আর ইহার দার্শনিক আলোচনা মিলে যোগ-দর্শনে। সাধারণ ভাবে ইহাতে এই বুঝায় যে, অনুকূল প্রতিবেশ পাইলে আত্মা তাহার অতীত মনে করিতে পারে। কিন্তু এ সমস্তই মানুষের দেহে অবস্থিত আত্মার পক্ষেই বেশী সম্ভব। মানুষ-আত্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের—মানুষ এবং অমানুষ জন্মের—অভিজ্ঞতা কম-বেশী স্মরণ করিতে পারে। অবশ্যই কাজটা এত সহজ নয় যে, যে কেহ তাহা পারে। আমি এবং আমার পাঠকগণ তাহা পারেন বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহার জন্য চেষ্টা ও সাধনা দরকার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির একটা স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা সম্ভব হয় না। কিন্তু আত্মা যখন যে দেহে থাকে, তখন সে দেহের উপযুক্ত সংস্কার তাহার দেখা যায়; এগুলি আসে অনুরূপ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি হইতে। অর্থাৎ কচ্ছপের দেহে জন্ম গ্রহণ করিয়াই আত্মা পূর্ব্বের কচ্ছপ-দেহের স্মৃতিজনিত সংস্কারগুলি আবার ফিরিয়া পায় এবং কচ্ছপের মত আচরণ করে। মনুষ্য-দেহে গেলেও আবার ঠিক তেমনই মানুষের মত ব্যবহার করিবে। এখানে ধরিয়া লওয়া হইতেছে আত্মার 'সংসার' অর্থাৎ দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ অনাদি, অনেকবার বিভিন্ন দেহ সে ঘুরিয়া আসিয়াছে, সুতরাং সকলপ্রকার দেহেরই একটা স্মৃতি বা সংস্কার তাহার আছে। কোন একটা দেহে প্রবেশ করিলে সেই প্রকার দেহের উপযোগী সংস্কারগুলি তখন জাগ্রত হয়। কিন্তু মনুষ্য-দেহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বের কচ্ছপ, হস্তী ইত্যাদি জন্মের কথাও চেষ্টা করিয়া মনে করা যায়। এই শক্তিটারই সাধারণ নাম জাতিস্মরত্ব। নিম্নস্তরের দেহে অবস্থিত আত্মার পক্ষে জাতিস্মর হওয়া সম্ভব নয়। কচ্ছপ-দেহে বাস করিয়া পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ইত্যাদি জন্মের কিংবা গাধা, ঘোড়া জন্মের বৃত্তান্ত মনে করার শক্তি পাওয়া যায় না।

এই আলোচনায় আর অগ্রসর হইব না। শুধু এইমাত্র বলিব যে, জাতিস্মরত্ব এবং দেহান্তরপ্রাপ্তি—এই দুইটি প্রাচীন মতই আধুনিক প্রেততত্ত্বের বিরোধী। জাতি-স্মরত্ব সত্য হইলে দেহান্তরপ্রাপ্তিও সত্য হয় এবং তাহা হইলে প্রেততত্ত্ব অসত্য হইয়া দাঁড়ায়। কারণ রামকমলের আত্মা যদি দেহ হইতে দেহান্তরে ঘুরিতে থাকে তবে তাহাকে ডাকিয়া আনা কঠিন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কি এখন আর পাওয়া যাইবে? তিনি যদি হেলিসিঙ্কিতে এক জন কম্যুনিষ্ট নেতারূপে জন্ম লইয়া থাকেন, তবে আর কি করিয়া আসিবেন? আর আসিলেও কোন্ জীবনের অভিজ্ঞতা বলিবেন?

আরও একটি প্রাচীন মত আধুনিক প্রেততত্ত্বের বিরোধী; সেটি আত্মার মুক্তির ধারণা। বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে যে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে, আত্মা যদি তাহা লাভ করে তবে সে ত পৃথক আত্মা থাকে না, ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। তখন আর তাহাকে ডাকিয়া আনা সম্ভব হয় কিরূপে? জলে ঢেউ মিলাইয়া গেলে আবার কি তাহাকে পাওয়া যায়? অথচ এক জন উগ্র প্রেত-তাত্ত্বিক সেদিন লিখিয়াছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রেত-লোকে কি একটা বড় কাজ করিতেছেন—রেড ক্রশ ইত্যাদি ধরণের। তাই যদি হয় তবে মুক্তি হয় কাহাদের?

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক প্রেততত্ত্ব 'সংসার' এবং 'মুক্তি' এই দুইটি প্রাচীন সিদ্ধান্তই অস্বীকার করে। সেমিটিক জাতিদের মধ্যে যে তিনটি ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছে—ইহুদী খ্রীষ্টান ও ইস্‌লাম—ইহাদের মতে আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি নাই। মৃত্যু ঠিক স্থানান্তর গমনের মত। সেই নূতন জায়গায় আত্মারা শাস্তি অথবা পুরস্কারের প্রতীক্ষায় থাকে। বৈদান্তিক মুক্তিও তাহাদের নাই। সুতরাং তাহারা আহ্বানের সাড়া পাইলে এই জগতের আকর্ষণে আবার এদিকে আসিতে পারে। আধুনিক প্রেততত্ত্ব এই মতের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা শুধু আত্মার অবিনাশিত্বই স্বীকার করে; মুক্তি এবং পুনর্জ্জন্ম স্বীকার সে করিতে পারে না।

প্রেততত্ত্বে আত্মার ধারণায় আরও একটি লক্ষ্য করার বস্তু এই যে, প্রেত-আত্মার স্মৃতির ক্ষয় হয় না। জীবনে আমরা অনেক জিনিষই ভুলিয়া যাই। কাহার নিকট প্রথম বর্ণ-পরিচয় লাভ হইয়াছিল, আমরা সকলেই বলিতে পারি কি? স্কুলে যেটুকু জ্যামিতি শিখিয়াছিলাম, তার সবটুকু এখন মনে নাই। সুতরাং জীবিতকালে আমাদের স্মৃতির হ্রাস হয়, ইহা অবিশ্বাস করার উপায় নাই। কিন্তু তাত্ত্বিকেরা প্রেত-আত্মার স্মৃতিটাকে অক্ষয় মনে করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলে এখনও আসিয়া বলিতে পারেন, মধুসূদনকে তিনি কত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। দেহ হইতে বিচ্যুত হইলেই আত্মার সমস্ত শক্তির ক্ষয় রুদ্ধ হইয়া যায়, এই সিদ্ধান্তের পথে কি যুক্তি আছে? অথচ প্রেত-তাত্ত্বিকেরা কিন্তু তাহাই ভাবেন।

হয়ত শুনিব, হ্রাস-বৃদ্ধি হয় দেহের এবং দেহের সঙ্গে যত দিন সম্পৃক্ত থাকে ততদিন আত্মারও শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি উপলব্ধ হয়; কিন্তু দেহ-বিমুক্ত হইলেই আত্মার শক্তির আর ক্ষয়-বৃদ্ধি দেখা যায় না; তখন উহা তাহার সনাতন শক্তিতে বিকশিত থাকে। কথাটা আমরা উড়াইয়া দিতে চাই না। প্রাচীনকালে অনেকে উহা বিশ্বাস করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে যুক্তিও দেখাইয়াছেন। কিন্তু আত্মার সনাতনত্ব বলিতে কি তাহার এ জীবনের সমস্ত সম্পর্কের স্মৃতি বুঝায়? এখানকার পুত্রত্ব, পিতৃত্ব, দোকান-কর্ম্মচারিত্ব, সবই কি সনাতন স্মৃতি? আর সনাতন প্রেতাত্মারা কি শুধু স্মৃতিই রক্ষা করে, নূতন জ্ঞান কিছু অর্জ্জন করে না? প্রেত-তাত্ত্বিকদের প্রেত-আত্মা সম্বন্ধে এই সব ধারণা ও আলোচনা এত অস্পষ্ট এবং এত উচ্ছ্বাস-পরিপ্লুত যে উহা হইতে কোন বৈজ্ঞানিক সরল সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করা কঠিন। প্রাচীন একাধিক মতের বিরোধী বলিয়াই একথা বলিতেছি না। নূতন মত হিসাবেও প্রেততত্ত্বের আত্মার ধারণা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

(২) প্রেত-দেহ।—দেহস্থ আত্মা দেহ হইতে বিচ্যুত হইলেই প্রেত হয়। দেহটি মাটিতে পচে অথবা ভস্মে পরিণত হয়, আত্মার সহগামী হয় না, ইহা স্পষ্ট। সুতরাং সাধারণ প্রেত-তাত্ত্বিকেরা আত্মার কথাই বলা-কওয়া করেন, তাহার দেহের কথা নয়। এমন কি, প্রেত-আত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিবার সময়ও জীবিত কাহারও দেহকে অবশ করিয়া উহার সাহায্য লওয়ার কথাই সাধারণত শুনি; কারণ প্রেত-আত্মার নিজস্ব কোন দেহ নাই। প্রেত-আত্মা যখন লেখে কিংবা কথা কয় তখন ঐরূপ একটি অবশীকৃত দেহের হাত কিংবা মুখের সাহায্য লয়; ইহাই সাধারণ সিদ্ধান্ত।

কিন্তু ইদানী আমরা এক জন উগ্র প্রেত-তাত্ত্বিকের লেখা পড়িতেছিলাম, যিনি প্রেতের দেহেরও বর্ণনা করিয়াছেন; এমন কি তাহার ওজনের কথাও বলিয়াছেন; প্রেতের চোখ, দাঁত, মাথার খুলি ইত্যাদির বিবরণও বিস্তৃত ভাবেই দিয়াছেন। শুধু তাই নয়; প্রেতদের বস্ত্র-পরিধান এবং পরিধেয় বস্ত্রের উপাদান ইত্যাদির কথাও বাদ পড়ে নাই। প্রেতের আহারে রুচি অরুচি এবং দুধ চা পেঁয়াজ ইত্যাদি খাওয়ার কথাও বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দেহ-তাত্ত্বিকের মতই তিনি আমাদিগকে প্রেত-দেহের তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত যে, প্রেতদের আহার করিবার মত মুখ আছে বটে, কিন্তু সে মুখে কথা কয় না, অন্তত আমরা এ পারের লোকেরা শুনিতে পারি এরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না। এদিকের লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয় অন্য উপায়ে। যথা, টেবিল চালন, স্বৈর লিখন ইত্যাদি।

এই প্রেতদেহ আহার করে, বস্ত্র পরিধান করে, গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং গৃহে বাস করে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু ইহার গতি অমানুষিক, অতি ক্ষিপ্র; এক

সেকেণ্ডে ব্যারাকপুর হইতে দেশপ্রিয় পার্কে জবাহরলালের বক্তৃতা শুনিতে আসিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তাহার কোন যানবাহনের প্রয়োজন হয় না। কেন না তাহার দেহের ওজন অতি সামান্য।

(৩) প্রেত-লোক।—প্রেতেরা যেখানে থাকে তাহার বর্ণনা এতকাল কম-বেশী অস্পষ্টই ছিল। কিন্তু জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এই প্রেত-লোকেরও এত প্রস্ফুট বিবরণ দিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন পরিব্রাজকই তাঁহার দৃষ্ট কোন নূতন দেশের এমন মনোরম বর্ণনা দিতে পারিবেন না। এই প্রেত-লোক এক দিকে নানা রকমের বাসগৃহ, খেলার মাঠ, সিনেমা ইত্যাদি যেমন রহিয়াছে, অপর দিকে তেমনই নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনার জন্য গবেষণাগারও রহিয়াছে। সভাসমিতিও সেখানে হয় এবং সমাজ-সেবার জন্য বিবিধ প্রতিষ্ঠানও রহিয়াছে। এক কথায়, এ পৃথিবীর প্রায় সব কিছুই 'প্রেত' হইয়া 'প্রেত' পুরুষদের সঙ্গে সেখানে যায়।

আর একটি রহস্য এখানে অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়া গিয়াছে ; এই মনোরম প্রেত-ভুবনটি কোথায় ? মঙ্গল কিংবা বৃহস্পতি গ্রহে নয়, কেন না প্রেতেরা সে সব জায়গায় বেড়াইতে যায় ; সেই একই কারণে চন্দ্রেও নয়, সূর্য্যেও নয়। তবে কোথায় ? এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর এখনও পাই নাই। হয়ত এই পৃথিবীরই কোন ছোট শহরের বড় গলিতে অথবা বড় শহরের ছোট গলিতে হইবে।

প্রেত, প্রেত দেহ এবং প্রেতলোক সম্বন্ধে এত সব চিত্তাকর্ষক তথ্য যে সব পুস্তকে পাওয়া যায়, তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না দুই কারণে ; প্রথমত ইহাদের বহুল প্রচার হোক, সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য তাহা আমরা কামনা করি না ; দ্বিতীয়ত, গ্রন্থকারদিগকে ত খুব প্রশংসা করিতেছি না ; সুতরাং নাম প্রকাশ করিয়া দিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন হইতে চাই না ;—কোন জীবিত আত্মা অথবা প্রেতাত্মা আসিয়া স্কন্ধে চাপুক, ইহাও ইচ্ছা করি না।

প্রেত সম্বন্ধে এই সব বিপুল তত্ত্ব কি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে ? অথবা করা সম্ভব ? যাহা বলা হইয়াছে তাহার পর প্রশ্নটা না তুলিলেও হইত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, স্যর অলিভর লজের মত বৈজ্ঞানিকও প্রেততত্ত্বে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধার সহিত আমরা এইটুকু মাত্র নিবেদন করিতে চাই যে, বৈজ্ঞানিক সব সময়ই বৈজ্ঞানিক থাকেন না ; চা-পানের সময় অথবা স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করার সময় মাধ্যাকর্ষণ অথবা তাপ-বিকিরণ অথবা পরমাণু-বিস্ফোরণের সব নিয়ম তিনি মনে রাখিয়া চলেন এরূপ মনে করা কঠিন। তারপর বৈজ্ঞানিকও ত মানুষ ; তাঁহারও সুখ-দুঃখ আছে, ভ্রান্তি-বিভ্রম সম্ভব ; ভুলিয়া যাওয়া, ভুল দেখা প্রভৃতি তাঁহার পক্ষেও অসম্ভব নয়। কোন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন বলিয়াই কোন-কিছু স্বীকার করিয়া লওয়া বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাপদ্ধতি নয়। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, উহা দর্শন ও বিজ্ঞানের অনেক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী ; এবং সেইজন্যই উহা এখনও বিজ্ঞানের পরিধির বাহিরে।

বিজ্ঞান কি সবই জানে ? চক্ষু বুজিয়া উত্তর দিব—'না'। অতএব প্রেততত্ত্ব সত্য বলিলেও রীতিমত আপত্তি করিব। সুতরাং উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের মীমাংসার একমাত্র পথ—প্রমাণ। শুধু তর্ক দ্বারা তৈল পাত্রে থাকে না পাত্র তৈলে, এ প্রশ্নের মীমাংসাও কঠিন ; পরীক্ষা দ্বারা সহজেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। তেমনই প্রেত আছে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসায়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্য লওয়া চলে। প্রেত দেখিতে এবং দেখাইতে পারিলে দর্শন-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বদলাইয়া হইলেও এই সত্যটি গ্রহণ করিতে হয়। প্রেত-তাত্ত্বিকেরাও ইহাই দাবি করেন যে, প্রেত প্রত্যক্ষ করা যায়। তারপর তার মাথার খুলি, পরিধেয় বস্ত্র, বাস-ভবন, খেলার মাঠ ইত্যাদির সংবাদ প্রত্যক্ষীকৃত প্রেতের কাছ হইতেই সংগ্রহ করা চলে। এই সমস্ত প্রমাণিত হইয়া গেলে পর, বিজ্ঞানের কিংবা দর্শনের সঙ্গে প্রেততত্ত্বের যেখানে বিরোধ সেখানে দর্শন-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তেরই পুনর্ব্বিচার প্রয়োজন। সুতরাং প্রেতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আছে কি না এবং কি প্রমাণ, তাহাই এখন আমাদিগকে ভাবিতে হয়।

প্রেতের আবির্ভাবই তাহার অস্তিত্বের বড় প্রমাণ। কোন কোন প্রেত কখনও কখনও এখানকার লোকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা এবং ভাব-বিনিময় হয়। ইহা সত্য হইলে প্রেতের অস্তিত্বে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই প্রকার প্রেত-প্রত্যক্ষ ঘটাইবার চেষ্টা হয় একাধিক প্রকারে।

(১) ব্যক্তি-বিশেষকে, বিশেষতঃ নারী-বিশেষকে অবশ করিয়া আহূত প্রেত দ্বারা তাহার দেহ আশ্রয় করান হয়। তারপর প্রেত ঐ অবশীকৃত দেহের মুখের সাহায্যে কথা বলে, প্রশ্নের উত্তর দেয়, নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় ও প্রমাণ দেয়, প্রাচীন ঘটনা মনে করিয়া বলে, ইত্যাদি ; অথবা ঐ দেহের হস্তদ্বারা লিখিয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেয়। এই এক উপায় যাহা দ্বারা প্রেতের অস্তিত্ব অনেক সময় প্রমাণ করা হয়। এইখানে কিন্তু প্রেতের নিজস্ব দেহের কথাটা চাপা পড়িয়াছে।

(২) অনেক সময় অন্ধকার ঘরে কয়েকজন মণ্ডলী করিয়া বসিয়া অনবরত প্রেত-বিশেষের চিন্তা করিতে থাকেন। তারপর তাহার আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় কোন আকস্মিক শব্দে বা আলোক-ছটায় অথবা টেবিল বা চেয়ারের কম্পনে। তখন প্রেতাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া নানা রকম প্রশ্ন করা হয়; 'আপনি যদি অমুক হন, তবে টেবিলটা দুই বার ঠক্ করিয়া শব্দ করুক'; শব্দ করিল এবং প্রেতটি কে বুঝা গেল। এই ভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে আগত প্রেত যে কে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গেল। প্রেতের আবির্ভাব এই এক প্রকারেও ঘটান হইয়া থাকে; এবং ইহাও তাহার অস্তিত্বের একটা প্রমাণ।

(৩) স্বৈর-লিখন বলিয়া আর একটি উপায় অনেকে প্রয়োগ করেন। কোন এক ব্যক্তি—বর্ত্তমান লেখকই মন্দ কি—হাতে কাগজ কলম লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে কোন এক জন প্রেতকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ হয়ত হাত কাঁপিয়া উঠিবে এবং কাগজে দাগ পড়িতে থাকিবে। তখন হাতে প্রেত আশ্রয় করিয়াছে বুঝিতে হইবে এবং হাতের উপর কর্ত্তৃত্ব একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। হাত তখন আপনি লিখিয়া যাইবে। মনে যে সব প্রশ্ন জাগিবে সে সবের উত্তর কাগজে আপনি লিখিত হইয়া যাইবে। আমি যখন লিখিতেছি না, তখন নিশ্চয়ই আমার হাত দিয়া অন্যে লিখিয়া যাইতেছে। প্রেত-লোকের অনেক সংবাদ এই ভাবেও সংগৃহীত হইয়াছে।

(৪) সাধারণ লোকে যাকে 'ভূত দেখা' বলে, প্রেতের অস্তিত্বের ইহাও একটা প্রমাণ মনে করা হয়। হত্যাকারী নিহতের অথবা বিরহী প্রিয়জনের ছায়ামূর্ত্তি অনেক সময় দেখে। সুতরাং যে মৃত সে একেবারে লুপ্ত হয় নাই; কোথাও কোনও প্রকারে আছে। ভূত যে শিশু, বৃদ্ধ অনেকেই দেখে তাহা অস্বীকার করিব না; তবে, উহা প্রেতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে কি না সে বিচার পৃথক।

এখানে একটা ভাবিবার বিষয় এই যে, নানা ভাবে যে প্রেতের আবির্ভাবের কথা আমরা শুনি, তাহা কিন্তু সকলের কাছেই হয় না। ভূতও সকলেই দেখে না। গুপ্তঘাতক হত্যাস্থানে নিহতের ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পায়, এরূপ ঘটনা দুর্লভ নয়। কিন্তু মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মানুষ মারে যুদ্ধে; অথচ যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকেরা নিহত শত্রুর প্রেত দেখে, এমনটি বড় বেশী শোনা যায় না। তাহা হইলে যুদ্ধই সম্ভব হইত না। প্রেত-ভয়ে ভীত সৈনিক লড়াইয়ের অযোগ্য। গুপ্তঘাতক ও সৈনিকের মধ্যে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া প্রভেদ অনেক। গুপ্তঘাতক হিংসা করে, কিন্তু ইহাও জানে যে সে অন্যায় করিতেছে; ধরা পড়িলে ইহলোকেই শাস্তি পাইবে; না হইলে পরলোকে পাইবেই। এই ভয় তাহার মনকে দুর্ব্বল করে। কিন্তু যুদ্ধে সৈনিকেরা জানে, তাহাদের কাজ প্রশংসনীয়; তাহাদের সাহসের অর্দ্ধেকের উৎস সেইখানে। সুতরাং তাহারা নির্ভয়ে লোক মারিয়া যায় এবং সেই জন্যে ভূতও দেখে না।

সাম্প্রদায়িক হত্যার কথাটাও এখানে মনে করা যাইতে পারে। এরূপ কলহে যখন এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করে, তখন নিহতের মনে কি কোন প্রতিহিংসা কিম্বা জিঘাংসা জাগে না? অথচ কখনও তাহাকে ভূত হইয়া ঘাতককে ভয় দেখাইতে শুনি নাই। এই সেদিন কলিকাতার বুকে হাজার হাজার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল; হত্যাকারীরা আরও মারিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইল; কিন্তু কখনও ভূত দেখিয়া কেহ সরিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ত শুনি নাই। ইহার কারণ, ঘাতকেরা নির্ভয়ে মারিয়াছে; সামান্য একটু পুলিশের ভয় ছাড়া, পাপবোধ তাহাদের ছিল না; বরং বেহেশতের অথবা স্বর্গের কল্পনা করিয়া অনেকে এই হত্যায় গর্ব্ববোধ করিয়াছে, নিজের সমাজের অথবা সম্প্রদায়ের হিত করিতেছে মনে করিয়া আনন্দও পাইয়াছে। কাজেই ভূত দেখে নাই।

এই কথাটা ভ্রান্ত মনে করিবার কোন কারণ নাই। কাজেই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, প্রেত-দর্শন দ্রষ্টার মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শুধু 'ভূত দেখা' নয়, সকল প্রকার প্রেত-দর্শনই ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব এবং সহজ, সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। শোক-সন্তপ্ত পিতা প্রিয় পুত্রের ছায়ামূর্ত্তি দেখে, পতি পত্নীর কিংবা পত্নী পতির প্রেতাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, ইহাই সাধারণতঃ দেখা যায়। স্বপ্নে মৃত প্রিয়জনকে এমন কি পরিচিত জনকে প্রায় সকলেই হয় ত দেখে। যাহাদের মন অত্যন্ত অভিভূত, অত্যন্ত শোকাবিষ্ট, তাহারা জাগ্রত অবস্থায় ও নিরালায় এইরূপ প্রেত দর্শন করিতে পারে এবং অনেক সময় করেও। এই দেখাটা একটু অভ্যস্ত হইলেই—মনের আবেশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেই, পরে অপরিচিত লোকের—হিট্‌লার, মুসোলিনী কিংবা বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণের—প্রেতাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনও সম্ভব হইয়া উঠে।

প্রেত-দর্শন দ্রষ্টার মানসিক অবস্থা বা গঠনের উপর নির্ভর করে, এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি এই যে প্রেত সকলে দেখে না এবং সকলকে দেখানও যায় না। হিমালয় পর্ব্বত সকলেই দেখিতে পারে; পরমাণুর অস্তিত্ব কিংবা জ্যামিতির তত্ত্ব সকলেরই অধিগম্য। এই সব জ্ঞানের বেলায় এক বুদ্ধির অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন বিশেষ মানসিক আবেশের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে সে কথা বলা

চলে না। ইহা এক বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ শ্রেণীর লোকের জ্ঞান।

ভূত দেখা কিংবা প্রেতলোকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কাহারও কাহারও বেলায় এই সব ঘটে। কিন্তু দেখা, আর দৃষ্ট বস্তুর সত্যতা এক নয়। তাহা হইলে ভুল বলিয়া আর কিছু থাকিত না। প্রেতের সত্যতা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রেততত্ত্ব যাহা বলে তাহা মানিয়া লওয়া কঠিন। আর প্রেত-দেহ এবং প্রেত-লোকের যে সব বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাকে উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলিলে যথেষ্ট সম্মান করা হয়। প্রেতের ব্যক্তিত্বের আলোচনা দর্শনের ধারায়ই হওয়া উচিত। প্রেত-তাত্ত্বিকদের মনে রাখা উচিত যে, ব্যক্তিত্বের সনাতনত্ব প্রমাণ করা খুব সহজ নয়। জড়-জগতে জড়পিণ্ড সমস্তই অসনাতন। কোন বৃক্ষদেহ বা ইমারত চিরস্থায়ী পদার্থ নয়। জড়-জগতে সনাতন পদার্থ পরমাণু—এখন পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ইলেকট্রন। আধ্যাত্মিক জগতেও বেদান্ত ইত্যাদি দর্শনের মতে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য; ব্যক্তিত্ব উপাধি মাত্র; সুতরাং রামকমল কিংবা রামহরি কেহই চিরস্থায়ী ব্যক্তি নন। অবশ্য বেদান্তের মত-ই সকলে গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করি না। তথাপি কোন ব্যক্তি ইহজীবনের সকল সম্পর্ক সঙ্গে লইয়া গিয়া পরলোকেও অনন্তকাল সেই ব্যক্তিই থাকিয়া যায়, ইহা ভাবাও সহজ নয়।

প্রেতে বিশ্বাস করিয়া অনেকে শোকে সান্ত্বনা পায়, সে কথা জানি। কিন্তু সান্ত্বনা দেয় বলিয়াই উহা সত্য, ইহা যুক্তিসিদ্ধ কথা নয়। সত্য বড় নিষ্ঠুর, বড় কঠোর। মায়ের বুক ফাটিয়া গেলেও মৃত সন্তান মৃতই থাকে। সে সন্তান কোথাও আছে ভাবিয়া মা যদি সান্ত্বনা পান তবে তাহা পাওয়ার অধিকার তাঁহার আছে। কিন্তু উহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া প্রচার করার অধিকার মায়েরও নাই, অন্যেরও নাই।

জৈনদের 'স্যাদ্‌বাদ' প্রভৃতিতে একটা দার্শনিক মতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাহা সনাতন সত্য বলিয়া কিছু স্বীকারই করে না। এই মত অনুসারে সব পদার্থ সম্বন্ধেই 'আছে' এবং 'নাই' এই উভয় উক্তিই বিভিন্ন অবস্থায় এবং বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা চলে। যে যাহা বিশ্বাস করিয়া জীবনযাত্রায় সুবিধা পায়, অন্যের পক্ষে না হইলেও তাহার পক্ষে উহা সত্য; অন্ততঃ সে উহা সত্য মনে করিয়া চলিতে পারে। ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বাগানের ফুলের কুঁড়িটি পর্য্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের পক্ষেই এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। এই মত অনুসারে অবশ্যই প্রেততত্ত্ব 'সত্য হইতে পারে', এরূপ মনে করা চলে।

আমরা কোন প্রকার অবিনয় প্রকাশ করিতে চাই না; শুধু বলিতে চাই যে, প্রেততত্ত্ব ঠিক বিজ্ঞান নয়। ব্যবহারিক মূল্য ইহার যাহাই হউক না কেন, দর্শন-বিজ্ঞানের প্রমাণিত সিদ্ধান্তের মত সত্য ইহা নয়। এই কথা বলিয়া একবার এক জন তাত্ত্বিকের কাছে যথেষ্ট বকুনি খাইয়াছিলাম। তথাপি অসত্যকে সত্য মনে করিতে প্রস্তুত নই। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয়, প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া যাঁরা শান্তি পান তাঁদের সেই শান্তি-প্রাপ্তির আমি বিঘ্ন ঘটাইতে চাই। অনেক অর্দ্ধ সত্য, অনেক কাল্পনিক সত্য, অনেক অপ্রমাণিত বিশ্বাস লইয়া মানুষের জীবন চলে। ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, পুর, পরী, বেহেশ্‌ত প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া মানব-জাতির আদিম নিবাস, সভ্যতার ভবিষ্যৎ প্রভৃতি অনেক বস্তুই ত আমরা কিছু জানি, কিছু জানি না। এক দিকে বিজ্ঞানের কঠোর সিদ্ধান্ত, অপর দিকে ফলিত জ্যোতিষের মঘা, অশ্লেষার অপকারিতা এবং স্বস্ত্যয়ন ও গ্রহ-যাগের উপকারিতা প্রভৃতি অনেক মীমাংসিত এবং অমীমাংসিত সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস লইয়াই ত আমরা জীবন চালাইয়া যাই। সুতরাং প্রেততত্ত্বকেও এই সব বহু লৌকিক বিশ্বাসের একটি করিয়া লইতে আপত্তি করিব না।

কিন্তু যেখানে সত্যের প্রশ্ন উঠিবে, সেইখানেই মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য প্রাপ্তির একটা পদ্ধতি, মানুষ পাইয়াছে। সাধ্য-সাধক, হেতু উদাহরণ ইত্যাদির সাহায্যে মানুষ বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে পৌছে। এই চিন্তা পদ্ধতিকে বাদ দিয়া কোন আবিষ্কার হইতে পারে না। প্রেত সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

> "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
> অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।...
> দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
> ন হি সুবিজ্ঞেয়ং অণুরেষো ধর্ম্মঃ। কঠোপনিষৎ।

'প্রেতে বিচিকিৎসা'—প্রেত জানিবার আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু জিনিসটি খুব সহজে বিজ্ঞেয় নয়। এই সব সূক্ষ্ম বিষয় জানিবার পদ্ধতি প্রেত-তাত্ত্বিকেরা অধিগত করিয়াছেন, এ কথা বলিতে সাহস পাই না। সে পদ্ধতি জানিতেন বাদরায়ণ, বুদ্ধ অথবা সোক্রেতিস, প্লেতো। সেই পদ্ধতি বর্জ্জন করিয়া নূতন আবিষ্কারের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া প্রেত-তাত্ত্বিকেরা যাহা প্রচার করেন, তাহা দুর্ব্বল মনের উপজীব্য হইতে পারে; তাহার বেশী কিছু নয়। এইখানে আমরা আত্মার অমরত্ব, পরলোক ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতেছি না; শুধু প্রেততত্ত্ব যে অপ্রতিষ্ঠিত তাহাই বলিতেছি।

গৃহহারা

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ

বাসুদেবপুর গ্রামে তিরিশ ঘর ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস এবং এই হিন্দুপল্লী ঘিরিয়া অহিন্দুপল্লী। অহিন্দুরা চাষী, চাষ-আবাদ করিয়া তাহাদের এবং তাঁহাদের মনিব-মহাজনের পোষণ করিতেছে—শুধু আজ নয় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা নৈকট্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এমন বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল যে হিন্দু কেহ প্রবাসী হইলে বাড়ীর স্ত্রী ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িত অহিন্দুর উপর।

অকস্মাৎ কলিকাতা ও নোয়াখালির অগ্নিতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত এই বিশ্বাস ও নৈকট্য মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

পূজার পরে বাসুদেবপুরে একটা আতঙ্ক দেখা গেল—

পাড়ার হরিখুড়ো সংবাদ আনিয়াছেন পল্লীতে পল্লীতে রাত্রিযোগে লাঠি-সড়কি খেলা হইতেছে এবং যে-কোন দিন যে-কোন সময়ে তাহারা প্রতিপক্ষের পাড়ায় পড়িয়া "নোয়াখালি" করিয়া দিবে। আরও কয়েকজন এ সংবাদ সমর্থন করিল। অতএব আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া উপায় কি?

গ্রামে সবলদেহ পুরুষমানুষ মাত্র পনর জন, তাহারা সারাজীবন কলম চালাইয়াছে; লাঠি ধরিতে শেখে নাই। বেশীর ভাগ লোক বিদেশে থাকিয়া কিছু কিছু পাঠান, সেই অর্থ ও খামার জমির ফসলে এই লোকগুলির দিন চলে—তাই বিধবা, বধূ, বালক-বালিকাই গ্রামের বাসিন্দা। যাহারা উপার্জ্জনক্ষম তাহারা বিদেশে। এই অরক্ষিত গ্রামকে কি করিয়া রক্ষা করা যায়!

চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর বৈঠকখানায় নিত্য বৈকালে আড্ডা বসিত; আজকালও বসে, কিন্তু জমে না। সেদিন কয়েকজন বসিয়া ছিলেন এমন সময় হরিখুড়ো লণ্ঠন হাতে করিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেশবাবু শিক্ষিত লোক, গ্রামে জমি-জায়গা দেখেন এবং ইস্কুলে মাষ্টারী করেন, দীর্ঘ শীর্ণ চেহারা। স্পষ্টবাদী বলিয়া একটা অখ্যাতি আছে এবং তেজস্বী বলিয়া সুখ্যাতিও আছে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে কেবল তিনিই থাকেন।

হরিখুড়ো কহিলেন—দেখ সুরেশ, সবই ত শুনছ, এখন কি করা যায়। মান ইজ্জত নেই-ই, ওরা ত মুখের উপরই যা-তা বলছে, এখন প্রাণটা বাঁচানোর উপায় কি?

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—দেখ! রমেশ, কি হয়েছে। যারা মুখ তুলে কথা কয় নি, তারা আমারই ঘাটে চান করতে করতে গ্রামের মেয়ে-বৌদের কে কাকে নেবে সেই আলোচনা করে। আস্তে নয়, শুনিয়ে শুনিয়ে বলে আর হাসে—

বোস মশায় বলিলেন—তোমাদের বালামটাও কারা নেবে এই নিয়ে ত শেখদের দক্ষিণ পাড়ার দু'দলে মারামারির জোগাড়। শুনছি দু'চার দিনের মাঝেই আক্রমণ হবে—পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর পথ কি?

রমেশবাবু বলিলেন—কোথায় যাবেন? জমিজমা বেচে যা পাবেন তা দিয়ে না হয় দু'বছর গেল তারপর যে না খেয়েই মরবেন!

হরিখুড়ো বলিলেন—সেই ত ভাবনা—

না খেয়ে যদি মরতেই হয় তবে এখানেই মরুন না কেন? যতক্ষণ পারেন লড়বেন, মরতে মরতে মেয়েরা খড়ের রান্নাঘরে আগুন দিয়ে লাফিয়ে পড়বে। আমি সেই বুদ্ধি করে রেখেছি, আর আপনারা যদি দাঁড়ান—

গাঙ্গুলী মশায় বলিলেন—ক্ষমতার মধ্যে ত কলম ছুঁড়ে মারা, বড়জোর ডিক্সনারী ফেলে মারতে হবে, তা নিয়ে হাজার হাজার লোককে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা—

বাধা দেওয়া ত নয়, মরা—কিন্তু ভয়ে নয়; লড়ে মরা—

এমনি আলোচনা মাঝে মাঝেই হয় সদরে এবং অন্দরে, কিন্তু কি করণীয় তাহা স্থির হয় না, কেবল দুর্ভাবনা ও আতঙ্কই বাড়িয়া চলে। রাত্রে কোথাও একটু শব্দ হইলে সকলে কান খাড়া করিয়া উঠিয়া বসে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও দিন যায়।

ছেলেপুলের মুখে হাসি নাই, গৃহবধূগণ শ্রীহীন; সকলে যেন নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া আছে এমনি একটা করুণ নিস্তব্ধতায় গ্রামখানি ছাইয়া গিয়াছে।

রমেশবাবু হাটে যাইতেছিলেন—

জটু সর্দ্দার প্রশ্ন করিল—মাষ্টারবাবু আপনারা নাকি মারামারির জন্যে নমঃশূদ্র আনাচ্ছেন? সেটা কি ভাল হবে?

রমেশবাবু কহিলেন—তা নয়, আমরাই প্রস্তুত হচ্ছি। নমঃশূদ্ররা ত বলেছে যে, যে হিন্দুরা আমাদের জলস্পর্শ করে না, তাদের জন্যে আমরা চাষীভাইদের সঙ্গে বিবাদ করব না।

সর্দ্দার হাসিয়া কহিল—আপনারা আর কি প্রস্তুত হবেন?

রমেশবাবু সংক্ষেপে কহিলেন—"মরবার জন্যে" এবং বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি জানেন যাঁহারা তাঁহারই বৈঠকখানায় বসিয়া পরামর্শ করেন তাঁহারাই নি[illegible] পল্লবিত করিয়া সমস্ত কথা অপর পক্ষকে জানাইয়া দেন। তাঁহারা প্রত্যেকে ভাবেন, এইরূপে সম্প্রীতি রক্ষা করিলে

অন্তের যাহাই হোক অন্ততঃ তিনি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবেন কিন্তু জানেন না দুধের পুকুর জলেই ভরিয়া গিয়াছে।

রাত্রে শুইতে গেলে পত্নী রমেশবাবুকে কহিলেন—শুনছ গো, কি সব বলাবলি হচ্ছে!

শুনছি।

আমার কথাই কি সব বলছে—

জানি। তোমার চেহারাটা একটু ভাল তাই ত আলোচনা হচ্ছে।

কিন্তু যদি এমন তেমন হয় তবে কি করব।

তেমন অবস্থা দেখলে রান্নাঘরে আগুন লাগিয়ে ঘরে খিল দেবে। খড়ের ঘরে আগুন দিলে আর তোমার নাগাল কেউ পাবে না—

পত্নী বলিলেন—মরতে ভয় নেই কিন্তু খুকী।

খুকীকে অসহায় পৃথিবীতে না ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে রাখাই যে ভাল।

পত্নী কেবল কহিলেন—ভিটে-বাড়ীর প্রজা তারাই যখন এই সব কথা উচ্চারণ করে!

—সময় এসেছে তাই করে। আর তোমার হিন্দুরাও ত সে আলোচনায় যোগ দিয়ে হাসে। জগৎ উল্টে গেছে, আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাই—

কয়েক দিন পরে সন্ধ্যার সময়ে জনৈক স্ত্রীলোক সংবাদ আনিল যে আজ রাত্রেই শুভকার্য্য আরম্ভ হইবে এবং প্রথম গাঙ্গুলীবাড়ী থেকেই সুরু হইবে। পাঁচ-ছ শ' লোক উত্তর পাড়ায় জমা হইয়াছে।

ত্রাস-ক্ষুব্ধ গ্রামখানির মাঝে সহসা একটা বিহ্বল চাঞ্চল্য দেখা দিল। সকলে রমেশবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া নিম্ন-কণ্ঠে পরামর্শ করিলেন। রমেশবাবু বলিলেন, মেয়েছেলেদের মুখুজ্যেবাড়ীর দোতলায় রেখে নিজেরা দরজায় দাঁড়ান, হাতে দা নিয়ে। যদি অবস্থা খারাপ হয় তবে কেরোসিন কাপড়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে।

নিরুপায় অবস্থায় তাহাই ঠিক হইল। কয়েকজন লোক গ্রামের প্রবেশ-পথে পাহারায় রহিল। তাহারা সঙ্কেত করিলেই সকলে প্রস্তুত হইয়া নিজ নিজ স্থানে রামদা হাতে দাঁড়াইয়া যাইবেন।

রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। সকলে নির্ব্বাক্ আগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছে, দ্বিতলের ঘরে শিশুদের ক্রন্দনও থামিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে উত্তর পাড়া হইতে লাঠি-খেলার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ ধ্বনি শোনা যাইতেছে।

অকস্মাৎ একটা হৈ হৈ শব্দ,—মনে হয় অনেকগুলি লোক যেন চীৎকার করিয়া এই দিকেই আসিতেছে—কিন্তু দূরে।

সকলে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন এবং এক জনকে অন্ধকারে পাঠানো হইল সংবাদ লইতে। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাকুল প্রতীক্ষিত আধঘণ্টা সময় চলিয়া গেল—বার্ত্তাবহ সংবাদ আনিল,—কাহার গরু মাঠের পুকুরের কাদায় পড়িয়াছে, তাহাকেই উঠাইতে এই কলরব।

এমনি করিয়া সমগ্র রাত্রি চলিয়া গেল—সূর্য্যোদয়ে দেখা গেল ভীতিব্যাকুল চাহনি লইয়া রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত লোক-গুলি গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে। গত রাত্রি যদিও কাটিয়াছে কিন্তু সম্মুখের রাত্রি কাটিবে এমন ভরসা নাই, কাজেই দৈনন্দিন সংসারযাত্রা যেন নিরর্থক হইয়া গিয়াছে।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ছেলেরা আসিয়া বলিল—হাটের উপর লাঠিখেলা হইতেছিল সেখানে নাকি জোয়ান ছোকরারা গ্রামের দুইটি বয়স্থা কুমারীর নাম করিয়াই বলিয়াছে যে আজ রাত্রে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তাহারা বিবাহ করিবে।

সে রাত্রিও একই ভাবে কাটিয়া গেল। সকালে রমেশ বাবু বলিলেন, এমনি ভাবে ক'দিন বাঁচবেন আপনারা, তার চেয়ে তাদের শুভকার্য্য শিগ্গীর করতে বলে আসাই ভাল।

কিছুক্ষণ বাদেই এসব কথা অহিন্দু পল্লীতে প্রচারিত হইয়া গেল। রমেশবাবু ভিটাবাড়ীর প্রজার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, হ্যাঁ, যত শীঘ্র হয় ততই ভাল, শুধু শুধু আর দগ্ধে কি হবে!

প্রজারা মনে করিল,—রমেশবাবু তাহাদিগকে উপহাস করিয়াছেন।

এমনি করিয়া প্রায় ছ'মাস চলিয়া গেল—

জীবনযাত্রা চলিয়াছে মৃতের মত,—রাত্রির নীরবতায় কাহারও ঘুম নাই, দিনের আলোয় কাহারও স্বস্তি নাই। আজ কুমারী কন্যা কাঁদিয়া মাকে জানায় যে কে একজন ঘাটের পথে তাহাকে গোপনে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে,—কাল বধূ আসিয়া স্বামীকে জানায়, তাহাকে দেখিয়া উহারা হাসিয়া কি বলাবলি করিয়াছে।

ধীরে ধীরে জীবনে গ্লানি অপমান ও অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার গৃহে, বাস্তুভিটায় প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। অথচ তাহার প্রতিকার নাই, নালিশ করিবার স্থান নাই।

গ্রামে জটলা আরম্ভ হইল—রমেশবাবু সমস্ত জমিজমা ঘর-বাড়ী বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। গাঙ্গুলী মশায় হাসিয়া বলিলেন, দেখ ভয়ে বাস্তুভিটা ছাড়লে। আমার অত ভয় নেই, করুক দেখি কি করে! বলা শক্ত কিন্তু করাটা সোজা নয়, বুঝলে হে—

আর এক জন বলিলেন—ভেবেছিলাম রমেশের মধ্যে কিছু

আছে, কিন্তু এখন দেখছি কাঁঠালের ভুতি, ভয়ে একেবারে ছাজে গোবরে করে ফেলে দিলে। ছিঃ —

জমিজমা কিছু বিক্রয় হইবার পরই প্রচার চলিল, ওসব এমনিই পাওয়া যাইবে, অতএব টাকা দিয়া আর কিনিবার প্রয়োজন নাই। জমি বিক্রয় হইল না—তখন অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। টিনের ঘরও বিক্রয় হইয়া গেল—

সংবাদ শুনিয়া হরিখুড়ো আসিয়া বলিলেন, রমেশ, কাজটা কি ভাল করলে বাবা। এমন কিছু ত হয় নি।

—না খুড়ো,—কিছু হয় নি, মরি নি একথাও সত্যি কিন্তু বেঁচেও নেই। মরাটাই বড় কথা নয় – মরার মত বাঁচা তার চেয়েও ঘেন্নার। আজ তিলে তিলে মরছি এইটাই দুঃখ—জীবনে অপমান, লাঞ্ছনা, গ্লানি স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে—তাই বাঁচার মত বাঁচতে চাই—

—কোথায় যাবে ?

—গিয়েছিলাম জায়গা কিনতে, তারা হাসে। সেখানেও কোন সমবেদনা নেই, সহানুভূতি নেই—আমাদের এ দুঃখ তারা বোঝে না—হাসে, ব্যঙ্গ করে।

—তবুও যাবে।

—হ্যাঁ। আমি ভেসেছি খুড়ো, এদিকের বাঁধন ছিঁড়েছি, যদি ওদিকে কূল পাই ভাল, না হয় ভরা ডুববে। যারা মুখ তুলে কথা কইতে সাহস পায় নি, তারা আজ পদে পদে অপমান করে জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছে। তারা দয়া করে বাঁচিয়ে রেখেছে তাই আছি—কারও দয়ায় বেঁচে থাকা বাঁচার মত বাঁচা নয়, তাই বিদেশে ভিক্ষে করেও পারি ত বাঁচবো, এখানে আর নয়। স্বজাতি যদি আশ্রয় না দেয় তবে পঞ্চাশের মন্বন্তরের লোকের মত না খেয়ে রাস্তায় মরব, কিন্তু দয়ার উপর বেঁচে থাকতে চাই নে—

—তুমি সত্যিই যাবে ?

—হ্যাঁ।

—তুমি লেখাপড়া জান, না হয় কিছু করে খাবে, কিন্তু আমরা।

—আপনারা কি করবেন সে পরামর্শ আমি কি দিতে পারি। তবে কেউ শুধু বেঁচে থেকেই খুশী, কেউ হয়ত তাকে মৃত্যুর চেয়েও দুঃখময় মনে করে। আমি এ বাঁচাকে মরাই মনে করি,—তাই বাঁচতে চাই—হরিখুড়ো চিন্তান্বিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে রাষ্ট্র হইয়া গেল রমেশবাবু নেহাত ভীরু, তাই পলাইয়া যাইতেছেন। স্কুল হইতে কেহ কেহ অনুরোধ করিল থাকিতে,—আপনি চলে গেলে স্কুল ভেঙে যাবে।

রমেশবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, থাকলে আমিই ভেঙে যাব। ভেবেছিলাম লেখাপড়াই মহৎ কাজ, তাই বাল্যাবধি শিখেছি, কিন্তু আজ দেখছি তা বাঁচবার সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

তথাপি তাঁহার মনে কালোমেঘ সঞ্চিত হইয়া উঠিল।

প্রত্যেকটি গাছ, পুকুর, গৃহ কত যত্নে কত শ্রমে তিনি তৈরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। নারিকেল গাছে সবে ফল ধরিয়াছে, পুকুরের মাছগুলি বড় হইয়াছে, গাভী শীঘ্রই দুগ্ধবতী হইবে—এ সমস্ত ফেলিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া মনটা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। ইহাদের প্রতি পত্রে, গ্রামের প্রতি ধূলিকণায় বাল্য-কৈশোর-যৌবনের কত স্মৃতি শিশিরের মত টলমল করিতেছে।

ভাবিয়া ভাবিয়া রমেশবাবুর চোখ জলে ভরিয়া আসে।

পুকুরপাড়ে নূতন দুইটি নারিকেল গাছ হইতেছিল—বাড়ীর গরুটি তাহার কচিপাতা খাইতেছিল। রমেশবাবুর মাতা পৈতৃক দালানের বারান্দায় বসিয়া দেখিতেছিলেন। রমেশবাবু চিরদিনের অভ্যাসমত গরুটিকে তাড়াইয়া দিলেন। মা কহিলেন, তাড়াস্ নি রমেশ, গাছে আর কি হবে, ওই খাক্।

রমেশবাবু একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন; গরুটি নির্বিকার ভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। রমেশবাবু জানিতেন মায়ের এই কথা কয়েকটির মাঝে কি গভীর বেদনা রহিয়াছে। নারিকেল গাছ দুটিকে সযত্নে ধানের চিটা দিয়া তিনিই ঢাকিয়া দিয়াছিলেন।

মা মাঝে মাঝে বলেন—সত্যি চলে যেতে হবে রে রমেশ।

কথাটার অর্থ এই, যাহা কিছু প্রিয়, জীবনের সঞ্চিত ধন, স্মৃতির ভাণ্ডার সবকিছু পিছনে ফেলিয়া চলিয়াই যাইতে হইবে? রমেশবাবু বলেন—হ্যাঁ মা যেতেই হবে। এমনি ক'রে ত থাকা যায় না। এর চেয়ে মরাও ত ভাল।

সেদিন রাত্রে বাড়ীর চাকর একটি লোক ধরিয়া আনিল, লোকটি গোপনে বড়শী ফেলিয়া সের চারেক একটি রুই মাছ ধরিয়াছে। অবশ্য এত দিন পরে কেন আজ সে লোকটি মাছ ধরিয়াছে তাহা রমেশবাবু জানিতেন তবুও প্রশ্ন করিলেন,—মাছ ধরলে কেন ?

—ইচ্ছে হ'ল তাই, যা করতে হয় করুন। তবে একটা কথা আজকাল দিন ভাল নয়,—কিসে কি হয় বলা যায় না।

অর্থ সুপরিষ্কার—জোর করিয়াই আমরা খাইব, আপত্তি করিলে হাঙ্গামা হইবে। রমেশবাবু অন্য সময় হইলে, অনেক কিছু করিতেন, আজ শুধু বলিলেন—আমি চলে যাচ্ছি তা বোধ হয় শুনেছ, পুকুর বাগান সবই তোমরা খাবে, দিন কখন

এসেছে। তবে এত দিন একসঙ্গে বাস করেছি তাই বলি যে ক'দিন আছি সে ক'দিন না হয় একটু ধৈর্য্য ধরে থাকো।

হরিখুড়ো পরামর্শ দিলেন থানায় পাঠাইতে, কিন্তু রমেশবাবু কহিলেন—থানায় কার কাছে পাঠাব খুড়ো? উল্টে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে—

আম জাম কাঁঠাল নারিকেল সবই পুকুরের মাছের মত ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতে লাগিল, গ্রামস্থ সকলে শুধু পরামর্শই করেন, প্রতিকারের উপায় নাই।

গ্রামে বর্ষা আসিয়াছে।

রমেশবাবুর ঘরগুলি ও অস্থাবর খাট পালঙ্ক প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তিনিও যাইবার দিন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। ক্রেতার সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, তাঁহার প্রস্থানের পরে তাহারা ঘর ভাঙিয়া লইয়া যাইবে।

কিন্তু রমেশবাবু বিদায়ের কয়েক দিন পূর্ব্বে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অস্বাভাবিক জ্বর ৪১৫ ডিগ্রী, বিরাম হয় না। তবুও তিনি লোক মারফত নৌকা স্থির করিয়া যাত্রা করিবেন ঠিক হইল।

বিদায়ের পূর্ব্ব দিনে সকালে রমেশবাবু জ্বরের উত্তাপে প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন—মাতা শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছেন। ক্রেতার নিযুক্ত লোক আসিয়া টিনের ঘরের চাল খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে—হাতুড়ির আঘাতে টিনগুলি নির্ম্মম শব্দ করিতেছে—রুগ্ন রমেশবাবুর প্রবল মাথার যন্ত্রণা, তাহাতে অতি নিকটে এই আওয়াজ তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তিনি বলিলেন—কিসের শব্দ মা?

—টিনের ঘর ভাঙছে—

—আজই! উঃ আজ না ভাঙলেই কি নয়? এ ত সহ্য হয় না আর!

মাতার চোখে দশ বৎসর পূর্ব্বের দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। এই ঘর তুলিবার সময় রমেশ কি পরিশ্রমই না করিয়াছে! ঘর ঘিরিবার সমস্ত সরঞ্জাম প্রায় নিজের হাতেই তৈয়ার করিয়াছে, আগাগোড়া মিস্ত্রীর সঙ্গে থাকিয়া শেষে অসুস্থ হইয়া পড়ে। কাঠের বেড়ায় সে নিজে ছবি আঁকিয়াছিল। মাতা নীরবে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চাহিয়া দেখিলেন, এক একখানা করিয়া টিন খুলিয়া পড়িতেছে—আর তাঁহার হৃদয় শূন্যতায় ভরিয়া উঠিতেছে।

অদূরে একঘেয়ে শব্দ হইতেছে ঠন্ ঠন্ ঝন্ ঝন্—

রমেশবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—উঃ মাথা গেল, ডাক ওদের, ডাক মা—একটা দিন কি ওরা মার্জ্জনা করবে না?

মাতা তাহাদের ডাকাইলেন। ক্রেতা বারান্দায় দাঁড়াইলে রমেশবাবু কহিলেন—আমার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে ভাই, তার উপর এই শব্দ ত আর সহ্য হয় না। তোমরা কাল ঘর ভেঙে নিয়ো—আজ থাক্—

—মিস্ত্রী ত রোজ রোজ মেলে না। তাদের পেয়েছি, কাজে লাগিয়ে বন্ধ করে রোজ মজুরী দেব, এ কেমন কথা। তারপর ঘর কেনাই ত ঠকা।

—জানি, মিস্ত্রির দাম না হয় আমি দেব, আজ ক্ষমা কর—একটা দিন।

—এই হয়ে গেল—একটু সহ্য করে থাকুন না।

রমেশবাবু বিড়বিড় করিয়া কহিলেন, ওরে মূঢ় হৃদয়হীন, কেমন করে জানবি তোরা আমার পাঁজরা খুলে নিয়ে যাচ্ছিস—সে অনুভূতি কি তোদের আছে!

রমেশবাবু চোখ বুজিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কহিলেন, মা তুমি কেঁদো না। আর নয়—আর দুঃখ নেই—

মাতা অশ্রু মুছিয়া রমেশবাবুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে শুধু কহিলেন, ঠাকুর মঙ্গল কর,—এত দিনের পুজো কি মিথ্যা হ'ল?

বিদায়ের দিন আসিয়া পড়িল, কিন্তু রমেশবাবুর জ্বর কমিল না।

পাড়ার লোকের সহায়তায় জিনিষপত্র নৌকায় ভর্ত্তি হইল। নৌকা ছাড়িবার সময় আগতপ্রায়, কিন্তু তখনও উত্তাপ কমাইবার জন্য রমেশবাবুর মাথায় জল ঢালা চলিতেছে। তিনি আপাততঃ আট মাইল দূরে শহরের আত্মীয়-ভবনে উঠিবেন, পরে সুস্থ হইয়া গন্তব্যস্থলে যাইবেন—পশ্চিমবঙ্গে কোন শহরে বাসা লইয়াছেন।

রমেশবাবুকে ধরিয়া সকলে নৌকায় তুলিয়া দিল। তিনি পাড়ার সকলকে সম্ভাষণ করিয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ নৌকায় উঠিলেন, মাতা উঠিয়া রমেশবাবুর মাথায় জল ঢালিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী নরনারী অশ্রুচোখে দাঁড়াইয়া আছে। সঙ্কীর্ণ খালের ঘাটটি বিদায়ের মৌন বেদনায় স্তিমিত। হরিখুড়ো সহসা আর্ত্তকণ্ঠে কহিলেন, বাবা রমেশ সত্যিই চললে?—আমরা কি করব? কেমন করে থাকব? কেমন করেই বা যাব? সব ফেলে—সুখের ঘর ভেঙে দিয়ে—

অর্দ্ধচৈতন্য রমেশবাবু জবাব দিলেন না, কিন্তু সমবেত নারীগণ কথাটায় যেন সহসা আহত হইয়া চোখে আঁচল চাপিয়া দিলেন। এই রমেশ, গ্রামের চিরপরিচিত রমেশ চিরদিনের মতন চলিয়া যাইতেছে! আর আসিবে না, আর দেখা হইবে না—

মাঝি কহিল, বাবু, নৌকা ছাড়ব?

রমেশবাবু জ্বরের ঘোরে বলিলেন—এঁ্যা!—মাঝি তাহার প্রশ্ন পুনরায় জানাইল।

রমেশবাবু কহিলেন, আমাকে একটু তুলে ধরো ত মা,

আমি দেখব, শেষবারের মত একবার দেখব। মা ও স্ত্রীর স্কন্ধে ভর দিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন— বেদনাবিহ্বল অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন চিরপরিচিত, চিরপ্রিয়, একান্ত আপনার গৃহের প্রতি, যার আকর্ষণে দূর-দূরান্তর হইতে অহরহ ছুটিয়া আসিয়াছেন।

রমেশবাবুর চোখে পড়িল রিক্ত বাড়ীখানি। ঘর ভাঙিয়া লইয়া গিয়াছে, শূন্য ভিটা কয়েকটি সাহারার মত খাঁ খাঁ করিতেছে বুকফাটা বেদনায়। ভিটার উপরে এখনও একক দু-একটি খুঁটি দাঁড়াইয়া আছে পরিত্যক্ত স্মৃতিচিহ্নের মত। পৈতৃক ভবনের দরজায় যে তালা দিয়াছিলেন তাহা খররৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছে।

রমেশবাবু 'উঃ' ! বলিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার চোখের উৎসারিত অশ্রুতে উপাধান নিষিক্ত করিয়া দিল।

মাতা চোখে আঁচল চাপিয়া কহিলেন, এ গ্রামে কি আর আসব না রমেশ ?

—মা মা, আর আসব না। এ লাঞ্ছনার শেষ হয়েছে, এখন সামনে আরও কত আছে তাই দেখতে চলেছি।

রমেশবাবু অসহ্য যাতনায় সহসা ফুকারিয়া উঠিলেন— ছাড়, ছাড়, নৌকা ছাড় মাঝি—আর দেখতে চাই নে—

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল—সংকীর্ণ খালের তীব্র স্রোত মুহূর্তে নৌকাখানিকে দিগন্তবিস্তৃত জলধারার মধ্যে আনিয়া ফেলিল।

আহ্বান

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

স্বাধীনতা এল দুয়ার-প্রান্তে, শুধাইছে শোন দেশানুরাগ।
সভয়ে হেরিনু—বিদেশী কুঠারে জননীরে মোর করিল ভাগ!
নয়নে আমার অশ্রু ঝরিছে, এমন ঘটনা দেখে নি কেহ,
দেশপ্রীতির যুক্তি বিনায়ে বিচার করিল মাতার স্নেহ!
এ যূপকাষ্ঠে লাখে লাখে লোক স্বদেশে বনিল বিদেশী ওই ;
লাখে লাখে লোক ভিটে-মাটি-হারা কিছু নয় তারা
ভিখারী বই ;
লক্ষ লক্ষ শিশু ও বৃদ্ধ তরুণ এবং তরুণী কত
বলি দেয় প্রাণ, বলি দেয় মান, তবুও মূঢ়তা অসংযত।
তবুও এখনো ফেরে নি চেতনা, অহমিকা-ভরা নৃত্য চলে,
হে কবি, তোমার বিকাইবে গান ইহার ঘৃণিত চরণ-তলে ?

ভ্রান্ত পথের পান্থ তোমায় ভুলাইতে চায় তোমার পথ,
জেনো জেনো তাহা দুস্তরতর ; লঙ্ঘিলে তুমি যে পর্ব্বত,
পার হয়ে এলে যে বাধা-বিঘ্ন, তুচ্ছ তাহারা
ইহার কাছে,
নিশাচর যত বিভীষিকা সম অবিরত তব মরণ যাচে।
অমর পথের যাত্রী তুমি যে, জননী তোমার শরণ লয়,
নয়নে তোমার স্নিগ্ধ শান্তি, কণ্ঠের বাণী অসংশয় ;
বক্ষে তোমার দুর্জয় বল নির্ভীক আর অকুণ্ঠিত,
ভাস্বর চির সত্য জ্যোতিতে, বিঘ্ন-বিপদে অকম্পিত ;
আন সাথে তব বরাভয় আর আন সখা আন মহাপ্রাণ,
কবির বীণায় বাজুক আবার নূতন দিনের সে আহ্বান।

হে বীর-যাত্রী, যাত্রা-পথের হয় নি এখনো হয় নি শেষ,
কুজ্ঝটিকায় ঘিরে আছে দিশি, শত ফণা মেলি ফুঁসিছে দ্বেষ।
তোমার আশায় পথ-পানে চায় নূতন দিনের নবীন ঊষা ;
তোমার ত্যাগের গরিমায় রচ জননী-দেহের পরম-ভূষা ;
তোমার বুকের রক্ত-অনলে সুরু কর পুন যজ্ঞ-যাগ,
দেউলে দেউলে জন্ম লভুক নূতন দিনের দেশানুরাগ ;
তির্য্যক যাহা, ঘৃণ্য ক্লিন্ন, মালিন্য-ভরা যা-কিছু সব
পুড়ে হোক ছাই, গ'ড়ে তোল ভাই ভ্রাতৃ-মিলন মহোৎসব।
হে বীর সারথি, হোক আরম্ভ নূতন দিনের সে অভিযান,
কবির বীণার তন্ত্রীতে তবে ধ্বনিতে থাকুক সে আহ্বান।

জাগ দুর্দম দুর্মদ তেজে, এস হে নবীন দুর্নিবার,
মাতার কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরাতে হবে যে পুনর্ব্বার।
দুর্গতি আজো হয় নাই দূর, দুর্গম আজো রয়েছে পথ,
অভ্র ভেদিয়া আঁধারে ঘেরিয়া রয়েছে পড়িয়া ভবিষ্যৎ।
তোমার বজ্র-গতি দিয়ে আজ বিদূরিত কর বিপদ যত ;
দুঃসাহসিক বীরত্ব দিয়ে উন্নত কর হৃদয় নত ;
তিমির নাশ গো বিঘ্ন-দহন অগ্নিতে দহি' এ মলিনতা,
মানুষে আবার মানুষ করিতে চূর্ণিত কর পাশবিকতা ;
তোমাদেরি বুকে ভগবান জাগি' দুর্গতে করে পরিত্রাণ,
তাই ত কবির রুদ্রবীণায় ধ্বনিয়া ওঠে সে আহ্বান।

শিল্প-স্বরাজের সপক্ষে ও বিপক্ষে

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

"আর্ট ফর আর্টস সেক" মতবাদটি পুরাতন। এর বিরুদ্ধে এ যুগে প্রতিবাদ এসেছে নানা মুনির কণ্ঠ থেকে—বিশেষত, সমাজ-সচেতন লেখকদের তরফ থেকে। এঁদের বিচারে শিল্পের পক্ষে স্বরাজ থাকা সম্ভব নয়। শিল্প হ'ল সমাজের প্রতিফলন—মানুষের মনের দুয়ারে সামাজিক চিন্তাধারা বহন করে নিয়ে যাওয়ার বাহন। সামাজিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত মানসলোকে বিচিত্র আলোড়নের সৃষ্টি করে। সেই আলোড়িত হৃদয়াবেগের প্রকাশই হ'ল শিল্প ও সাহিত্য। যুগের শিল্পে ও সাহিত্যেই যুগের মর্মবাণী সব থেকে বেশী কল্লোলিত হয়ে থাকে। শিল্প ও সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে তাই সুস্পষ্টভাবে সমাজের সঠিক প্রকৃতি জানা যায়। সমাজকে অবলম্বন করেই মানুষের শিল্প; কাজেই শিল্পের স্বরাজ বা স্বাধীনতা থাকা সম্ভব নয়। "আর্ট ফর আর্টস সেক" তাই ভ্রান্ত; সত্য হ'ল "Art for something's sake."। এই মতবাদের প্রতিনিধি হিসাবে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে চিহ্নিত করা চলতে পারে। কিছুদিন হ'ল তাঁর "সাহিত্যে প্রগতি" নামক বইখানি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ থেকে প্রচুর নজির তুলে তিনি এ বইয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, "শিল্পের জন্য শিল্প" মতবাদটি ভ্রমাত্মক ও অবৈজ্ঞানিক। তিনি শিল্পের সামাজিক ব্যাখ্যার সমর্থক। সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যে "সমাজ ও সাহিত্য"-প্রণেতা বিমল সিংহ, "সংস্কৃতির রূপান্তর"-লেখক গোপাল হালদার এবং "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" রচয়িতা বিনয় ঘোষকেও এই গোত্রান্তর্গত করা চলে। এঁরা সকলেই সমাজ-সচেতন লেখক ও শিল্পের সামাজিক ব্যাখ্যার সমর্থক।* এ কালের অন্যান্য লেখক-মহলেও এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বিপুল সাড়া ও সমর্থন পেয়েছে। সমস্ত বিষয়টি স্বভাবতই নূতন করে আলোচনার যোগ্য।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, নূতন মানেই সত্য আর পুরাতন মানেই মিথ্যা—এ কথা কোনো মতেই ঠিক নয়। লেখকের বিচারে 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বটি পুরাতন হলেও সত্য; তাই স্বীকার্য। শিল্প-স্বরাজের মতবাদ প্রচার করলেই শিল্পে সামাজিক প্রভাবকে অস্বীকার করা হবে এমন কোন কথা নেই। সামাজিক প্রভাব শিল্পে নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু সে প্রভাব থাকা সত্ত্বেও শিল্প স্বরাজপন্থী। "শিল্পের জন্য শিল্প" তত্ত্বের বিরুদ্ধপন্থীরা প্রথমেই ধরে নেন যে, এ তত্ত্বটি বুঝি সামাজিক প্রভাবকে অস্বীকার করে; তাই চলে এর বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রমণ ও সমালোচনা। কিন্তু সমালোচনাটা অনেকখানিই অপ্রাসঙ্গিক, যদিও এর মধ্যে জ্ঞাতব্য বস্তু আছে যথেষ্ট। সমালোচনাটি সার্থক বলে স্বীকৃত হবে কেবলমাত্র যদি প্রমাণ করা যায় যে, "শিল্প-স্বরাজের" তত্ত্বটি সামাজিক প্রভাব বা বাণী-প্রচারের অংশকে অস্বীকার করে থাকে। অভিযোগটাই যেখানে সত্য নয়, সমালোচনাটা সেখানে কোন মতেই সার্থক হতে পারে না। বস্তুত, "শিল্প-স্বরাজে"র তত্ত্বটি সামাজিক প্রভাব বা বাণী-প্রচারের কোনটাই অস্বীকার করে না। তার মূল বক্তব্য আলাদা। এ কেবল বলে যে, সামাজিক প্রভাব শিল্পে আছে, বাণী-প্রচারও শিল্পে আছে, তবে সেগুলিই শিল্পের প্রাণ নয়। এই আলোকে "শিল্প-স্বরাজে"র বিরুদ্ধপন্থীদের নবপ্রচারিত "Art for something's sake" তত্ত্বটি অনেকখানি সত্য হয়েও সমালোচনা হিসাবে অপ্রাসঙ্গিক ও বিভ্রান্তিকর।

এ কথা সত্য, শিল্প সমাজকে অবলম্বন করেই রচিত। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদিই শিল্পের আলোচ্য বিষয়-বস্তু। সমাজের প্রতিচ্ছবি বা প্রভাব শিল্পে ও সাহিত্যে থাকা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নয়—বরং খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ কথা স্মরণ রেখেও বলা চলে যে, শিল্পের একটা আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বা স্বরাজ থাকা সম্ভব, আর তা আছেও। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, "শিল্প-স্বরাজে"র মতবাদটি এবং "Art for something's sake" তত্ত্বটি আসলে পরস্পর-বিরোধী নয়। বাণী-প্রচার ও আদর্শ-প্রচার শিল্পে ও সাহিত্যে আছেই, তবে সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিকের বাণী-প্রচার ও আদর্শ-প্রচার থেকে এ বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানুষ, রাষ্ট্র, সমাজ, পৃথিবী, মন, চেতনা, বুদ্ধি, বোধি, আত্মা, ঈশ্বর, ইহলোক, পরলোক, ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ ইত্যাদির যে-কোনটাই হতে পারে শিল্পীর আলোচ্য বস্তু, দার্শনিকেরও আলোচ্য বস্তু। তবে এক ধরণের আলোচনা-প্রণালীতে গড়ে উঠে দর্শনশাস্ত্র, আর এক ধরণের আলোচনায় সৃষ্ট হয় শিল্প ও সাহিত্য। দার্শনিক সৃষ্টি করেন "বুদ্ধি"র (intellect) প্রেরণায়; শিল্পী সৃষ্টি করেন "বোধি"র (intuition) অনুপ্রেরণায়। এক জনের রচনার আবেদন থাকে মূলত বুদ্ধির কাছে, আর এক জনের মুখ্য আবেদন হৃদয়ের কাছে। এক জনের বাণী প্রচারিত হয় প্রত্যক্ষ ভাবে, আর এক জনের বাণী প্রচারিত হয় পরোক্ষ ভাবে। গান্ধী রচনা করেন "নন্-ভায়োলেন্স ইন্ ওয়ার এণ্ড পিস্", আর রলাঁ্যা সৃষ্টি করেন "জঁ্যা ক্রিস্তফ"। বাণী-প্রচার

* বিনয় সরকারের বৈঠকে [দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃঃ ১৫-২০]

আছে দু'জনেরই রচনায়—দার্শনিকেরও, শিল্পীরও। তফাৎ শুধু প্রকাশভঙ্গীতে বা রচনকৌশলে। দার্শনিকের নিকট প্রধান হ'ল আরোহ-পদ্ধতিতে আলোচনা ও অবরোহ-প্রণালীতে সিদ্ধান্ত প্রকাশ, আর শিল্পীর কাছে মুখ্য বস্তু হ'ল অবস্থা, ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি। বাণীপ্রচার বা দর্শন শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যেও থাকে, তবে তা সর্বদাই প্রচ্ছন্ন ও গৌণ। বিশ্ব-মৈত্রী ও মানুষের মুক্তির বাণী প্রচার করে' এক জন রচনা করেন দর্শন, সেখানে রলাঁ সৃষ্টি করেন "জ্যাঁ ক্রিস্তফ" জাতীয় উপন্যাস বা গল্প। শিল্পীর রচনায় বাণীটা অপ্রধান, প্রধান হ'ল অবস্থা, ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি। সৃষ্টির অংশের চেয়ে বাণী-প্রচারের অংশটা বড় হয়ে উঠলে রসের ব্যাঘাত ঘটে, শিল্পের ইজ্জৎও যায় ক্ষুণ্ণ হয়ে। একারণেই "আনন্দমঠে"র বঙ্কিমের চেয়ে "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র বঙ্কিম বা "পথের দাবী"র শরৎ চন্দ্রের অপেক্ষা "চরিত্রহীনে"র শরৎচন্দ্র শিল্পজগতে অনেক উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনাপ্রসঙ্গে অনেক দিন আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "আমি সেখানেই আনন্দ পাই এবং সেখানেই আমি বঙ্কিমের কাছে ঋণী যেখানে মেসেজ দেন্ নি, যেখানে উনি আপনার সৃষ্টি করবার আনন্দকে রূপদান করেছেন। আনন্দময় সাহিত্য ভাষাকে প্রাণময় জগৎ করে তোলে, মেসেজের সে শক্তি নেই। এইজন্য সাহিত্য-সংসারে আমরা তাঁদেরই নমস্কার করি যাঁরা তাঁদের প্রতিভা থেকে সাহিত্যের ভিতর প্রাণের চিরন্তন সুর ঢেলে দিয়ে থাকেন।"* অর্থাৎ কবির দৃষ্টিতে শিল্পের যথার্থ ঐশ্বর্য 'মেসেজে' বা দর্শনে নয়, প্রকাশ-ভঙ্গীতে। শিল্পের ঐশ্বর্য রসোদ্বোধনে বা রসসৃষ্টিতে। রসোত্তীর্ণ না হলে বাস্তব ঘটনার কোনও প্রতিফলনই শিল্পের আসরে জাতে ওঠে না। শিল্পের সামাজিক ব্যাখ্যার সমর্থক ও প্রচারকেরা এই মূল সত্যটি উপেক্ষা করেই যত গণ্ডগোল ও বিভ্রাট সৃষ্টি করেছেন। সমাজ-সংস্কারের জন্য আদর্শ প্রচারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু সে কাজ ততটা শিল্পীর নয় যতটা সমাজ-সংস্কারকের। শিল্পীর কাজ আর সমাজ-সংস্কারকের কাজ অনেকখানি আলাদা। এক জনের কাজ সমস্যা উত্থাপন করা, আর এক জনের কাজ সমাধান করা। অতিমাত্রায় সমাজ-সচেতন হয়েও শরৎ চন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ও গল্পে এই পার্থক্যটুকু কোন দিনই সজ্ঞানে বড় একটা লঙ্ঘন করতে চান নি। "শেষপ্রশ্নে" তিনি নরনারীর জীবনের অন্তহীন ব্যথা-বেদনার কথা তুলেছেন, তাতে সমস্যাও আছে বিপুলভাবে, কিন্তু সমাধানের কোন প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত সেখানে নেই। সে কাজ যে অপরের তা তিনি চিরদিনই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছেন, আর সে মাত্রাবোধটুকু তাঁর সাহিত্যে রক্ষাও করেছেন যথেষ্ট†। সমাজকে আশ্রয় করেই যখন মানুষের জীবন, তখন সমাজের ভাল-মন্দের সঙ্গে শিল্পীরও যে কিছু-না-কিছু সংযোগ থাকবে তা তো স্বাভাবিক। সমাজের মঙ্গল-কামনাও সমাজ-সংস্কারকের মত শিল্পীরও অন্তরে থাকে, তবুও মোটের উপর দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। এক জনের দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ normative, আর এক জনের দৃষ্টিভঙ্গী Positive। এ কোন বিরোধ নয়, শুধু পার্থক্য। মোটের উপর এ কথা কোনমতেই অস্বীকার করবার জো নেই যে শিল্প স্বরাজহীন বা আত্মস্বাতন্ত্র্যহীন।

শিল্পের স্বরাজ বা স্বাতন্ত্র্য তবে কি বা কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে শিল্পসৃষ্টির মূল রহস্যটুকু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধেভরা নিখিল জগৎ সব সময়েই আমাদের চেতনার দুয়ারে করাঘাত করে। তার সংস্পর্শে আমাদের মনে জাগে বিচিত্র আবেগের সাড়া। আমরা কখনও হাসি, কখনও কাঁদি, আবার কখনও বিস্ময়ে অভিভূত হই। বহির্জগতের নানা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের মধ্যে আমরা সাধারণ মুহূর্তে জীবনযাপন করি অনেকটা "প্রবাসী"র মত। আমাদের "হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প, এবং বিস্তৃতিতেও সংকীর্ণ।" বিশ্বের চিরচঞ্চল প্রবাহের অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়। পৃথিবীর আহ্বানে আমাদের মন সাড়া দেয় বড় কম। শিল্পীর দৃষ্টি বিশাল ও চেতনা ব্যাপক। নিখিলের বিচিত্র সুর, তার হাসি-অশ্রু, বিস্ময়-বেদনা অনুরণিত হয়ে ওঠে তার বাঁশিতে। আমরা বহির্জগতের আমন্ত্রণে সাড়া দিই হৃদয়ের একটি অংশ থেকে, শিল্পী সাড়া দেয় সমস্ত অন্তর থেকে। আমাদের অনুভূতি তাই ক্ষীণ ও দুর্বল; শিল্পীর উপলব্ধি সবল ও প্রাণের স্পর্শে উদ্দীপ্ত। এমন মুহূর্ত আমাদের জীবনে সুদুর্লভ যখন সমস্ত সত্তা দিয়ে আমরা হৃদয়ের অনুভূতিকে উপলব্ধি করি, কিন্তু শিল্পীর জীবনে এই অনুপম মুহূর্তগুলি আসে ঘন ঘন। আমরা উপলব্ধি করেও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারিনে, শিল্পীর প্রতিভাকে আশ্রয় করে সে পায় আনন্দময় প্রকাশ। আলোড়িত হৃদয়ের অনুভূতি থেকেই সৃষ্ট হয় যাবতীয় উঁচুদরের শিল্প। অবশ্য এ কথা সত্য নয় যে, কেবলমাত্র অনুভূতির তীব্রতা থাকলেই শিল্পের জন্ম হবে। প্রকাশ ছাড়া শিল্প নেই। 'নীরব কবি' বা 'mute Milton'

---

* প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রণীত রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪৫।

† "আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোন দিন কোন স্থলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত জোর করে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তি-বিশেষের জীবন-সমস্যায় আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছি—এইখানেই আমার সাহিত্য-রচনার সীমারেখা। জ্ঞানতঃ কোথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি, সেইজন্যেই লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই। প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্মীর, সাহিত্যিকের নয়"—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—"তরুণের বিদ্রোহ", পৃ ২।

শিল্প-জগৎ জানে না। এ হ'ল পরস্পরবিরোধী শব্দমাত্র। অস্‌কার ওয়াইল্ড্‌ ঠিকই লিখেছেন, "To the artist expression is the only mode under which he can conceive life at all. To him what is dumb is dead"* অস্‌কার ওয়াইল্ডের এটুকুই এখানে মূল প্রতিপাদ্য যে, প্রকাশই হ'ল শিল্প। রবীন্দ্রনাথও "সাহিত্যের সামগ্রী" প্রবন্ধে এই মত সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন, "নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোন কোনও মহলে চলিত আছে। যে-কাঠ জ্বলে নাই, তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে-মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশের মতই নীরব হইয়া থাকে, তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কি আছে বা না আছে, তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"†

হৃদয়ের অনুভূতি যে পর্যন্ত না শব্দে বা সুরে বা তুলিতে আত্মপ্রকাশ করে, সে পর্যন্ত শিল্পসৃষ্টি হয় না। তাই বলে আবার একথাও একেবারেই সত্য নয় যে, অনুভূতির প্রকাশ-মাত্রই শিল্প। রোরুদ্যমান মাতার পুত্রশোকের যে বিলাপ-ধ্বনি, তার অনুভূতিও যেমন আন্তরিক, প্রকাশও তেমনই তীব্র, কিন্তু তবুও তো সে বস্তু শিল্পের পর্যায়ভুক্ত হয় না। বাস্তব ঘটনার নিছক প্রতিফলন বা ফটোগ্রাফ যেমন শিল্প বলে গ্রাহ্য হয় না, তেমনই অনুভূতির যাথার্থ্যটুকু অক্ষুন্ন রাখলেই প্রকাশটা শিল্পপদবাচ্য হয় না। প্রকৃতির বা সমাজের, ব্যক্তির বা সমষ্টির হুবহু প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করাতে ফটোগ্রাফি হতে পারে, কিন্তু ছবি হয় না। খবরের কাগজে দিনের পর দিন কত রোমহর্ষণ নিষ্ঠুর সত্য প্রকাশিত হয় কিন্তু সে কি শিল্প বা সাহিত্য? এ প্রশ্নের উত্তর শরৎ চন্দ্র অতি চমৎকার ভাবে "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" প্রবন্ধে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "সাহিত্য-সৃষ্টি অনুকরণের মধ্যে নাই। ভালরও না, মন্দেরও না। হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। বৃদ্ধ কবির গীতাঞ্জলিও যত বড় কাব্যগ্রন্থ তাঁহার যৌবনের চিত্রাঙ্গদাও ঠিক তত বড়ই কাব্যসৃষ্টি, লাঞ্ছনার আঘাত ও গৌরবের মালা যেমন করিয়াই তাহার শিরে বর্ষিত হউক না। অথচ অনুভূতিহীন বাক্য যত অলঙ্কৃতই হউক ব্যর্থ। পতিতার অনুকরণও ব্যর্থ, গীতাঞ্জলির অনুকরণও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। দেশের সাহিত্যসম্পদ ইহাতে কণামাত্রও বর্দ্ধিত হয় না"‡ শরৎ চন্দ্র এখানে এটুকুই বলতে চেয়েছেন যে, অনুকরণের মধ্যে শিল্প নেই। শিল্প মাত্রই নূতন সৃষ্টি। এই সৃষ্টির জন্য বাস্তব ঘটনা উপলক্ষ্য বা উপাদান মাত্র। রসোদ্বোধনই এর প্রাণ। প্রাণের গভীরতা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়ে মনের আবেগগুলি রসঘন মূর্তি গ্রহণ করে। এতে যতি আছে, ছন্দ আছে। যতি আনে গতির ভেতর প্রয়োজন-মত বিরাম। ছন্দ দেয় ভাবকে অর্থের বন্ধন থেকে মুক্তি। এতে বাস্তব-অবাস্তবের সংমিশ্রণ আছে, ঘটনাপরম্পরার বিন্যাসও আছে, কিন্তু সবকিছুর পশ্চাতে সক্রিয় রয়েছে শিল্পীর সৃজনীশক্তি। এই সৃজনীশক্তির উপরেই চরম-বিশ্লেষণে শিল্পের ঐশ্বর্য নির্ভরশীল। বাস্তব ঘটনা মানসলোকে সাড়া বা চাঞ্চল্য জাগাতে পারে, কিন্তু তাকে আশ্রয় করে অবস্থা, ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করতে না পারলে, কোন প্রকাশ—যতই অলঙ্কৃত হোক না,—কখনও শিল্পের গোত্রান্তর্গত হয় না। বাস্তব ঘটনা ও সমাজের আবেষ্টনী থেকে শিল্পী প্রাণরস,—আনন্দ, বেদনা ও বিস্ময়—গ্রহণ করে সত্য, তবে হুবহু প্রকাশ করার নাম শিল্প নয়। শিল্প অনুকরণের সামগ্রী নয়, এ বস্তু সৃষ্টি। মানুষের সৃজনীশক্তিকে বাস্তব ঘটনার দ্বারা পুরাপুরি বিশ্লেষণের প্রয়াস যতখানি ব্যর্থ, শিল্পের সামাজিক ব্যাখ্যাও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। মাটির রস না পেলে গাছ জন্মায় না সত্য, কিন্তু তাই বলে একথা আদৌ সত্য নয় যে, মাটির রস পেলেই বীজ মহীরুহে বিকশিত হবে। বীজের মধ্যে থাকা চাই প্রাণ, আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা। এ বস্তুর অভাব থাকলে মাটি, আলো, বাতাস, জলের সকল উপাদানই হবে ব্যর্থ। শিল্প-সৃষ্টি সম্বন্ধেও এ কথাই প্রযোজ্য। মাটি থাকলেই যেমন বীজ গাছ হয়ে ওঠে না, তেমনি বাস্তব ঘটনার সংস্পর্শ থাকলেই শিল্প-সৃষ্টি হয় না। আবেষ্টনীর বিশ্লেষণ আর সেই আবেষ্টনীতে জাত বা সৃষ্ট ঐশ্বর্যগুলির জীবন-রহস্য-উদ্ঘাটন এক বস্তু নয়। দ্বিতীয়টির মর্মকথা বা স্বরূপ উদ্ঘাটনের পথে প্রথমটি সহায়ক হলেও যথেষ্ট নয়। মানুষের সৃজনীশক্তিকে এক মাত্র বহির্জগতের ঘটনাপরম্পরা দিয়ে বিশ্লেষণের প্রয়াস একান্ত ভাবেই ব্যর্থ। সমাজকে অবলম্বন করে মানুষের মন ও তার সৃজনীশক্তি বিকশিত হলেও তার জয়যাত্রার সবটুকুই সামাজিক আবেষ্টনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।* মানুষের সৃষ্টিধর্মী মনই শিল্প ও সাহিত্যের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি বা উপাদান ('determining factor')।† মানুষের সৃজনীশক্তির যেমন একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি তার সৃষ্ট শিল্পেরও এক ধরণের স্বরাজ রয়েছে। অনেকে বলবেন, এ স্বরাজ আপেক্ষিক। আমরা বলব, চিরচঞ্চল জগতে তো সবকিছুই আপেক্ষিক। আপেক্ষিক হয়েও শিল্প স্বরাজপন্থী,—একথা অনস্বীকার্য সত্য।

* *De Profundis*, p. 88

† সাহিত্য, পৃ. ১১

‡ স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ১০৭

* লেখকের "ঐতিহাসিক আলোচনায় নূতন দৃষ্টি" (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৫৩) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

† S. Radhakrishnan: *An Idealist View of Life* (London, 1932, p. 183).

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

১৮৬৩—১৯২৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বংশ-পরিচয় ; জন্ম : ১২৬৯ সালের বিষুব-সংক্রান্তির দিন* (১২ এপ্রিল ১৮৬৩) ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি। ইঁহারা খড়দহের বিখ্যাত গুরুবংশ ; উপাধি—বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষা : ১৮৮১ সনে ক্ষীরোদপ্রসাদ বারাকপুর গবর্মেণ্ট স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষাদানকালে তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর ছিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে ইহার উল্লেখ আছে। ১৮৮৩ সনে তিনি জেনারেল এসেমব্লীজ ইনষ্টিটিউশন হইতে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৮৮ সনে ক্ষীরোদপ্রসাদ মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে বি.এ. পরীক্ষা দিয়া পদার্থ ও রসায়ন-বিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে, এবং পর-বৎসর (ইং ১৮৮৯) প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষা দিয়া রসায়ন-বিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

অধ্যাপনা : বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ জেনারেল এসেমব্লীজ ইনষ্টিটিউশনে রসায়ন-বিদ্যার (Physical Science and Chemistry-র) অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যকাল ১৮৯২-১৯০৩ সন। অতঃপর তাঁহার জীবনের গতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়।

সাহিত্য-ব্রত : পঠদ্দশা হইতেই বাংলা-সাহিত্যের প্রতি ক্ষীরোদপ্রসাদের অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় ; বি. এ. পরীক্ষাদানের তিন বৎসর পূর্ব্বে (ইং ১৮৮৫) তিনি "রাজনৈতিক সন্ন্যাসী" নামে একটি আখ্যায়িকা খণ্ডশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি বাংলা নাট্য-সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহার প্রথম নাট্যগ্রন্থ 'ফুলশয্যা' (মে ১৮৯৪) এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়। 'জন্মভূমি' লিখিয়াছিলেন, "এরূপ উচ্চ কবিত্বপূর্ণ বাঙ্গলা-নাটকের অভিনয় জাতীয় রঙ্গমঞ্চে অনেক দিন হয় নাই।" শেষ-পর্য্যন্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ কলেজের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্য-সেবা—বিশেষতঃ নাট্য-সাহিত্যের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত নাট্যগ্রন্থ—'আলিবাবা,' 'প্রতাপ-আদিত্য,' 'চাঁদবিবি,' 'কিন্নরী,' 'নর-নারায়ণ' প্রভৃতি বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়া অগণিত নর-নারীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞানে বি. এ.—এম. এ. পাস এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিলেও তাঁহার অদ্ভুত কাব্যানুরাগ ছিল। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা ১৩১১ সালের 'জাহ্নবী' হইতে তাঁহার "দধীচির অস্থিদান" কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১)

পার হ'য়ে গেল সূর্য্য পশ্চিম আকাশ,
জাহ্নবী কাঁদিল মৃদুস্বরে ;
ভাঙ্গে ব্রত, বৃদ্ধ ঋষি হইল নিরাশ—
অতিথি এল না বুঝি ঘরে !

(২)

একটি মেঘের শিশু প্রশান্ত সাগরে
মাথা তুলি স্থিরনেত্রে চায়,
"এ দরিদ্রে ঋষিরাজ দেখ দয়া করে
ক্ষুধানলে বুক জ্বলে যায়।"

(৩)

"আয় বাপ কি চাহিবি, তোরে দিব দান,"
ডাকে ঋষি বাহু প্রসারিয়া ;
বেদমন্ত্রে করে তার আবাহন গান
ধ্যানে বসে নয়ন মুদিয়া।

(৪)

পলকে প্রলয় এল যুগ এল পলে !
কে কাঁদে রে সকরুণ স্বরে ?
"স্থান দাও হে ব্রাহ্মণ চরণকমলে
অতিথি দাঁড়ায়ে তব দ্বারে।"

(৫)

চেয়ে দেখে ঋষিরাজ অস্থিচর্ম্মসার
উপবাসী মূর্ত্তি তপস্যার—
কে অতিথি নতজানু দেবতা আকার
সহস্র লোচনে বহে ধার ?

(৬)

"অসুরের পদভরে কাঁপে জন্মভূমি
পলায়িত দেবতাবাহিনী।
ভিক্ষা আশে তব দ্বারে আসিয়াছি আমি
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও মুনি।"

(৭)

"হে পুণ্য অতিথি এস, পাতহ অঞ্জলি
ব্রত আজ করি উদ্‌যাপন।

---

* "বাঙ্গলা ভাষার লেখক" : 'জন্মভূমি,' আষাঢ় ১৩০৩, পৃ. ২১৩।

বুক ছিঁড়ি হে ভিখারী লহ অস্থি তুলি
ক্ষুধা তৃষ্ণা কর নিবারণ।"
(৮)
ক্ষুদ্র সে জলদশিশু হইল বিপুল
গগনে ছুটিয়া গেল ঝড় ;
নিমেষে দানবশক্তি হইল নির্ম্মূল
আকাশ করিল কড় কড়।
(৯)
ক্ষীর নীর মাতৃবক্ষে ঢালে জলধর,
জননীর তৃষ্ণা গেল দূরে ;
দধীচির জয়গান গাহিল অমর
এ কি ভিক্ষা দিলে জননীরে।

কথাশিল্পী হিসাবেও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু নাট্যকার বলিয়াই তিনি দেশবাসীর নিকট সমধিক প্রসিদ্ধ।

গ্রন্থাবলী : অক্লান্তকর্মী ক্ষীরোদপ্রসাদের সাহিত্য-সাধনা বিপুল এবং বহুধাবিস্তৃত। আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত :—

১। রাজনৈতিক সন্ন্যাসী (গল্প) :
১ম খণ্ড। (১ জুন ১৮৮৫)। পৃ. ৩২
২য় খণ্ড। (১৫ জুলাই ১৮৮৫)। পৃ. ৩২।

২। ফুল-শয্যা (দৃশ্যকাব্য)। ইং ১৮৯৪ (২ মে)। পৃ. ১৮৯।

৩। প্রেমাঞ্জলি (পৌরাণিক নাটক)। ইং ১৮৯৬ (১৮ জুলাই) : পৃ. ১৫৭

৪। কবি-কাননিকা (রঙ্গন্যাস)। ১৩০৩ সাল (ইং ১৮৯৬)। পৃ. ১৯৬

৫। আলিবাবা (রঙ্গনাট্য)। ১৩০৪ সাল (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ১১০

৬। প্রমোদরঞ্জন (রঙ্গনাট্য)। ১৩০৫ সাল (১৯ অক্টোবর ১৮৯৮)। পৃ. ১০২

৭। কুমারী (নাট্যকাব্য)। ১৩০৫ সাল (ইং ১৮৯৯)। পৃ. ৮০

৮। জুলিয়া (গীতিনাট্য)। ১৩০৬ সাল (২৪ জানুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ১৫২

৯। বভ্রুবাহন (নাট্যকাব্য)। ১৩০৬ সাল (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ১১৯

১০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। (২৪ এপ্রিল ১৯০০)। পৃ. ৯২

১১। সাবিত্রী (পৌরাণিক নাটক)। ১৩০৯ সাল (৪ অক্টোবর ১৯০২)। পৃ. ১৩৪

১২। সপ্তম প্রতিমা (নাটক)। ১৩০৯ সাল (১৩ ডিসেম্বর ১৯০২)। পৃ. ১৫১

১৩। বেদোরা (গীতিনাট্য)। ইং ১৯০৩ (১৩ জানুয়ারি)। পৃ. ১৪০

১৪। বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য (ঐতিহাসিক নাটক)। ভাদ্র ১৩১০ (২৯ আগষ্ট ১৯০৩)। পৃ. ১৪০

১৫। রঘুবীর (নাটক)। ১৩১০ সাল (১৮ ডিসেম্বর ১৯০৩)। পৃ. ১৫৪

১৬। বৃন্দাবন-বিলাস (গীতিনাট্য)। ২২ পৌষ ১৩১০ (৩১ জানুয়ারি ১৯০৪)। পৃ. ৮৪

১৭। রঞ্জাবতী (নাটক)। ১৩১১ সাল (৪ অক্টোবর ১৯০৪)। পৃ. ১৮৬

১৮। নারায়ণী (উপন্যাস)। অগ্রহায়ণ ১৩১১ (ইং ১৯০৪)। পৃ. ৩৪৬

১৯। উলুপী (নাটক)। ১৩১৩ সাল (১৫ জুলাই ১৯০৬)। পৃ. ১৪০

২০। পদ্মিনী (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৩ সাল (১৫ নবেম্বর ১৯০৬)। পৃ. ২০১+১

২১। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৩ সাল (৫ জানুয়ারি ১৯০৭)। পৃ. ২১৭

২২। রক্ষঃ ও রমণী (নাটক)। ১৩১৩ সাল (১০ জানুয়ারি ১৯০৭)। পৃ. ৭৮

২৩। চাঁদবিবি (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৪ আগষ্ট ১৯০৭)। পৃ. ১৮৮

২৪। নন্দকুমার (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৪ সাল (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)। পৃ. ১৭৬

২৫। দাদা ও দিদি (রঙ্গনাট্য)। ১৩১৪ সাল (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)। পৃ. ৫৫

২৬। অশোক (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৫ জুন ১৯০৮)। পৃ. ১৬৪

২৭। বাসন্তী (গীতিনাট্য)। ১৩১৫ সাল (৫ জুলাই ১৯০৮)। পৃ. ৪৮

২৮। বরুণা (গীতিনাট্য)। ১৩১৫ সাল (১০ জুলাই ১৯০৮)। পৃ. ১২৭

২৯। ভূতের বেগার (রঙ্গনাট্য)। ১০ পৌষ ১৩১৫ (২৮ ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ৫৫

৩০। দৌলতে দুনিয়া (নাটক)। ১৩১৫ সাল (১৫ জানুয়ারি ১৯০৯)। পৃ. ১৩৫

৩১। বিরামকুঞ্জ (গল্প-লহরী)। ? (২০ আগষ্ট ১৯০৯)। পৃ. ১২৬

সূচী :—কর্ম্মফল, নির্ব্বাসিত, চিত্রদর্শন, "পো'দাদা," প্রায়শ্চিত্ত।

৩২। দুর্গা (পৌরাণিক আখ্যান)। ১৫ আশ্বিন ১৩১৬ (৮ অক্টোবর ১৯০৯)। পৃ. ১২৮

৩৩। বাঙ্গালার মসনদ (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৭ সাল (১৬ জুলাই ১৯১০) পৃ. ১৫২

৩৪। পলিন (গীতিনাট্য)। ১৩১৭ সাল (২ মার্চ ১৯১১)। পৃ. ১০৭

৩৫। মিডিয়া (কল্পনামূলক নাটক)। ১৩১৯ সাল (১৪ জুলাই ১৯১২)। পৃ ১১৭

৩৬। খাঁজাহান (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৯ সাল (২৫ জুলাই ১৯১২)। পৃ. ১৪০

৩৭। পুনরাগমন (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩১৯ সাল (.৮ অক্টোবর ১৯১২)। পৃ ৩৫৫

৩৮। ভীষ্ম (পৌরাণিক নাটক)। ১৩২০ সাল (১৫ জুন ১৯১৩)। পৃ. ২৩২

৩৯। রূপের ডালি (রঙ্গনাট্য)। ? (২৩ অক্টোবর ১৯১৩)। পৃ. ১৩১

৪০। নিয়তি (নাটিকা)। ১৩২০ সাল (৯ এপ্রিল ১৯১৪)। পৃ. ১১৫

৪১। আহেরিয়া (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩২১ সাল (২০ জানুয়ারি ১৯১৫)। পৃ. ১৭১

৪২। বাদশাজাদী (কল্পনামূলক নাটক)। ১৩২২ সাল (৩১ ডিসেম্বর ১৯১৫)। পৃ. ১৫৬

৪৩। রামানুজ (ধর্ম্মমূলক নাটক)। ১৩২৩ সাল (৩০ জুলাই ১৯১৬)। পৃ. ২০৮

৪৪। বঙ্গে রাঠোর (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৭)। পৃ. ১৮৮

৪৫। কিন্নরী (গীতি-নাট্য)। ? (১৭ আগষ্ট ১৯১৮)। পৃ. ১৩৯

৪৬। নিবেদিতা (উপন্যাস)। ১১ মাঘ ১৩২৫ (৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯)। পৃ. ৪৩১

৪৭। গুহামুখে (উপন্যাস)। পৌষ ১৩২৬ (১২ জানুয়ারি ১৯২০)। পৃ. ২৪৬

৪৮। মন্দাকিনী (পৌরাণিক নাটক)। ১৩২৮ সাল (১৪ এপ্রিল ১৯২১)। পৃ. ১০০

৪৯। আলমগীর (ঐতিহাসিক নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩২৮ (৯ ডিসেম্বর ১৯২১)। পৃ. ২৬০

৫০। রত্নেশ্বরের মন্দিরে (নাটক)। ? (২৮ ডিসেম্বর ১৯২২)। পৃ. ১১২

৫১। বিদূরথ (ঐতিহাসিক নাটক)। ফাল্গুন ১৩২৯ (১০ মার্চ ১৯২৩)। পৃ. ১৫৭

৫২। গুহামধ্যে (উপন্যাস)। শ্রাবণ ১৩৩০ (২৯ জুলাই ১৯২৩)। পৃ. ১০৯

৫৩। পতিতার সিদ্ধি (উপন্যাস)। মাঘ ১৩৩০ (২০ মার্চ ১৯২৪)। পৃ. ৩২২

৫৪। চাঁদের আলো (উপন্যাস)। ? (ইং ১৯২৪ ?)। পৃ. ১৯১

৫৫। গোলকুণ্ডা (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। পৃ. ১৫৬

৫৬। জয়শ্রী (নাটক)। ? (২০ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ১৫১

৫৭। রাধা-কৃষ্ণ (গীতিনাট্য)। ? (ইং ১৯২৬ ?)। পৃ. ৪৮

৫৮। নর-নারায়ণ (পৌরাণিক নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (ইং ১৯২৬)। পৃ. ২০১

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা ঃ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ক্ষীরোদপ্রসাদের অনেক রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই শ্রেণীর কয়েকটি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

১৩০০ :	১ম-৩য় সংখ্যা	...	'চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ'	...	ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব
১৩০১ :	শ্রাবণ	...	'জন্মভূমি'	...	মিনতি (কবিতা)
	ভাদ্র	...	"	...	জন্মভূমি (কবিতা)
১৩০২ :	বৈশাখ-আষাঢ়	...	'চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ'	...	শম্ভু সংবাদ
	ভাদ্র	...	'জন্মভূমি'	...	নাটক
১৩১১ :	কার্ত্তিক	...	'জাহ্নবী'	...	দধীচির অস্থিদান (কবিতা)
১৩১২ :	আশ্বিন	...	'ভারতী'	...	নির্ব্বাসিত (গল্প)
১৩১৩ :	বৈশাখ-ফাল্গুন	...	"	...	শিরী-ফরীদ (নাটিকা)
১৩১৪ :	আশ্বিন	...	'ছাত্র-সখা'	...	উৎকলের গল্প
১৩১৫ :	জ্যৈষ্ঠ	...	'জাহ্নবী'	...	মিলন (কবিতা)
১৩১৭ :	শ্রাবণ	...	'নাট্য-মন্দির'	...	রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি
১৩২০ :	কার্ত্তিক	...	'ভারতবর্ষ'	...	আমি ও তুমি (কবিতা)
১৩২৯ :	আশ্বিন	...	'মাসিক বসুমতী'	...	নিশীথের কথা—জামাপাখী (স্বপ্ন)
১৩৩২ :	শারদীয়া	...	'বার্ষিক বসুমতী'	...	শক্তিপূজা (কবিতা)
১৩৩৩ :	"	...	"	...	এক রাত্রি (উপন্যাস)
১৩৩৪ :	"	...	"	...	কুলী (গল্প)
	শ্রাবণ-ভাদ্র	...	'উদ্বোধন'	...	অভিরামের গীতি (কবিতা)

মাসিকপত্র সম্পাদন : ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'অলৌকিক রহস্য' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার অনেক রচনা

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

স্থান পাইয়াছিল। পত্রিকাখানি অনিয়মিত ভাবে ছয় বৎসর চলিয়াছিল। আমরা ইহার ৬ষ্ঠ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা (ভাদ্র ১৩২২) পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা : পরিষদের জন্মাবধি ক্ষীরোদপ্রসাদ ইহার সভ্য ছিলেন। ১৩১১-১৯ সালে তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-পরিচালনায় সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। পরিষদের কোন কোন মাসিক অধিবেশনে তিনি প্রবন্ধাদিও পাঠ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৩০২ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের মাসিক অধিবেশনে তাঁহার লিখিত "নাটকের ইতিবৃত্ত" প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল; ইহা পরবর্ত্তী ভাদ্র মাসের 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত হয়। ১৩২৫ ও ১৩৩০ সালে পরিষৎ তাঁহাকে অন্যতম সহকারী সভাপতি পদে বরণ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

মৃত্যু : ক্ষীরোদপ্রসাদ শেষ-জীবনে বাঁকুড়া সহরের সন্নিকটে বিক্না গ্রামে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তথায় মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন-বাস করিতেন। মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে অসুস্থ শরীর লইয়া তিনি বাঁকুড়ার পল্লী-কুটীরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় ১৯২৭ সনের ৪ঠা জুলাই (১৩৩৪, ১৮ আষাঢ়, রাত্রি ১৷৷টা), ৬৫ বৎসর বয়সে, তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও বাংলা-সাহিত্য : ক্ষীরোদপ্রসাদ রসায়ন-বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের সেবা তাঁহার ভাল লাগে নাই, তিনি সাহিত্যকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একটি মকদ্দমায় এজেহার দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, আমি ইংরেজী জানি না; এক সময় শিখিয়াছিলাম বটে কিন্তু অব্যবহারে ভুলিয়া গিয়াছি। বস্তুতঃ তিনি যেভাবে বঙ্গ-ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার অত্যুক্তি না হইতেও পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ক্ষীরোদপ্রসাদ বহু ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নাটকের সাহায্যে বাংলাদেশের রসিক সমাজকে শুধু নয়, জনসাধারণকেও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের তিনিই রচয়িতা। তাঁহার শেষ রচনা 'নরনারায়ণ' নাটক সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে বিশিষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছে; ইহা বাংলা কাব্যসাহিত্যের গৌরবরূপে আজিও গণ্য হয়। তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি 'আলিবাবা' রঙ্গনাট্য। তিনি যদি আর কিছু না রচনা করিতেন, এই রঙ্গনাট্যটিই তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিত। 'আলিবাবা' চিরনূতন ও চির-আনন্দদায়ক হইয়া আজিও এই শ্রেণীর নাট্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ স্থানে বিরাজ করিতেছে। গদ্য-রচনাতেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল; তাঁহার 'নারায়ণী' ও 'গুহামধ্যে' উপন্যাস-রসিকদেরও যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছিল।

মস্কো আর্ট গ্যালারী

শ্রীরঞ্জিত সিংহ

সোভিয়েটের চিত্রকলা আজ এক নব-অরুণোদয়ের উজ্জ্বলতায় মহীয়ান্। পুরাতনকে মুছে ফেলে সোভিয়েট আজ নবীনকে গ্রহণ করেছে। কি চিত্রশিল্পে, কি ভাস্কর্যে, কি কারুকার্যে, চারু ও কারু শিল্পের নানা ক্ষেত্রেই সোভিয়েট শিল্পীরা যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সোভিয়েটের মাটিতে এ প্রতিভার উন্মেষ হতে পেরেছে শুধু এইজন্য যে সে দেশের শিল্পীরা গজদন্ত-প্রাসাদের অগ্রচূড়ায় বসে চিত্রাঙ্কন করেন নি—জনাকীর্ণ পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে আপনভোলা শিল্পী সেজে বসে থাকেন নি। সোভিয়েট শিল্পীদের নিজস্ব একটি ঐতিহ্য আছে—দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে যে ঐতিহ্যের যোগ অবিচ্ছিন্ন। অথচ তাঁরা গতানুগতিকতায় আবদ্ধ নন—তাঁদের শিল্পীমন একই ধারায় অনুবর্ত্তিত নয়। সোভিয়েট শিল্পের বিভিন্ন ধারা আছে এবং তার এই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কারণ সোভিয়েট শিল্পের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সোভিয়েট শিল্পীরা প্রকৃতই জীবনশিল্পী।

এই বিষয়ে কিছুদিন আগে সোভিয়েটের একটি পত্রিকায় (Znamya) একজন লেখক লিখেছিলেন যে, আর্টিষ্ট কখনোই জীবনের কোন একটি বিশেষ গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ থাকতে পারে না। সে হবে মুক্তপক্ষ শিল্পী, কারণ জীবন একই কেন্দ্রে আবদ্ধ নয়—তার নব নব বিচিত্র ধারা আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, সুতরাং শিল্পের উদ্দেশ্য অথবা শিল্পীর সৃষ্টিকে কোন নির্দিষ্ট ছকের ভেতর টেনে আনা যায় না। উক্ত লেখক বলছেন:

"Art is many sided, and both Mayakorsky with his voluntary participation in the world's social destiny and Pasternak with his thrush-like flute are necessary to it."

যে সমাজে চাষী-মজুর বাস করে শিল্পীরাও সেই সমাজের মানুষ। সোভিয়েটের শিল্প সমাজবিচ্ছিন্ন নয়, জনসাধারণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বর্ত্তমান। তাই তার চিত্রশিল্পে, ভাস্কর্যে, চারুশিল্পে সেই জনগণের হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করা যায়।

সম্প্রতি মস্কো আর্ট গ্যালারীতে যে চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ল তার ছবি ও মূর্তিগুলি সোভিয়েট-শিল্পের এই আদর্শের কথাই মনে করিয়ে দেয়। প্রদর্শনীটি পৃথিবীর চিত্রশিল্পের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা বলে সোভিয়েট শিল্পীরা মনে করেন। উক্ত প্রদর্শনীর নাম ছিল "অল ইউনিয়ন এগজিবিশন অব পেন্টিংস স্কালপ চারস এণ্ড গ্রাফিক আর্ট"। এই প্রদর্শনীতে সোভিয়েটের সকল সুখ্যাত শিল্পীদের ছবি ও মূর্তি ইত্যাদির সমাবেশ হয়েছিল। যাঁদের ছবি ও মূর্তি মস্কো আর্ট গ্যালারীর শোভাবর্দ্ধন করেছিল তাঁদের ভেতর Sergeiberasimov, Yuri Pimenor, Vladimir Farorstoy, Ergeni Kibrik, Nikolai Tyrsa, Anna Ostroumova-cebdera

যুদ্ধকালীন সোভিয়েট কারখানায় কর্ম্মরত একটি স্কুলের ছাত্র

প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রদর্শনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস ছিল লোকশিল্পের ছবি-গুলি। বিভিন্ন রকমের চিত্রাঙ্কন কারুশিল্প, পটচিত্র ও তৈলচিত্র প্রভৃতি নানা বর্ণবৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল চিত্রাবলী দেখে দর্শকগণ বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়েছিল—সমগ্র সোভিয়েটে এই প্রদর্শনী বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করে।

মস্কো আর্ট গ্যালারীর আর একটি জিনিস বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সোভিয়েট যুদ্ধচিত্র যে পৃথিবীর যে-কোন দেশের যুদ্ধচিত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার অব্যবহিত পরেই মস্কোর State Tretyakov Art Gallery-তে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। তার নাম "Heroic Front and Rear"। উক্ত প্রদর্শনীতে যেসব যুদ্ধচিত্র ছিল তার ভেতর দিয়ে সোভিয়েটের সমগ্র যুদ্ধ-জীবনটি ফুটে উঠেছিল। লেনিনগ্রাড অবরোধ থেকে সুরু করে জার্মান সৈনিকদের অত্যাচার ও দীর্ঘদিনের যুদ্ধকাহিনী সোভিয়েট শিল্পীরা এঁকেছিলেন সেই সব ছবিতে। তা ছাড়া বিপ্লবের ছবি ও জারের সময়কার বিভিন্ন ধরণের ছবিও ছিল। যুদ্ধচিত্রগুলির ভেতর নিম্নলিখিত কয়েকটি ছবির নাম বিশেষভাবে করা যেতে পারে—"১৯৪২ সালের লেনিনগ্রাড" "যুদ্ধরত কিশোর", "১৯৪৩ সালের আক্রমণ", "লেনিনগ্রাডের রাজপথ" ও "মুক্তি"।

১৯৪২ সালের শীতের লেনিনগ্রাড

মস্কোর এই ট্রেটিয়াকভ গ্যালারী সোভিয়েটের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশালা বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেশের সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় এতে একত্র পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় এর আর একটি বড় দিক আছে। এই সব গ্যালারীর ছবির ভেতর দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পীদের পরিচয় হয় এবং সেই সঙ্গে সাধারণ চাষী-মজুর থেকে সুরু করে সৈনিক পর্যন্ত সকলের মনেই শিল্পানুরাগ জন্মাবার সুযোগ উপস্থিত হয়। মূল্য তার কম নয়। দেশের শিল্পের সঙ্গে যদি জনসাধারণের কোন যোগ না থাকে তা হলে সে শিল্পের সার্থকতা কতটুকু এ প্রশ্ন আজ অনেকের মনে জেগেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'তে এই আর্ট গ্যালারীর উল্লেখ আছে। সেখানে গিয়ে কবির মনে জেগেছিল বিস্ময় এবং ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসার না হওয়ায় তিনি যে বেদনা অনুভব করেছিলেন সেটা তাঁর চিঠি পড়লেই বোঝা যায়:

"মস্কৌ শহরে ট্রেটিয়াকভ গ্যালারি নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে। সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে। যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানো শক্ত হয়ে উঠেছে।... ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যেসব দর্শক এই রকম গ্যালারিতে আসত তারা ধনী মানী জ্ঞানী দলের লোক এবং তারা যাদের এরা বলে bourgeoisie অর্থাৎ পরশ্রমজীবী। এখন আসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল, যথা—রাজমিস্ত্রি, লোহার, মুদি, দর্জি ইত্যাদি। আর

বিজয়ী জার আইভানের লিভোনিয়ায় প্রবেশ

আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র ও চাষী সম্প্রদায়।'

এই বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারা যায় সোভিয়েটের জনসাধারণের সঙ্গে চিত্রকলার কি গভীর সংযোগ। সোভিয়েট রাষ্ট্র এক দিকে যেমন কৃষি ও যন্ত্রশিল্পের উন্নতিসাধন করে চলেছে, অন্য দিকে তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের মনে জাগিয়ে তুলেছে সৌন্দর্য-পিপাসা। শুধু হাতুড়ি ও কাস্তেটাই জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস নয়, নিছক বেঁচে থাকাটাই জীবনের চরম সার্থকতা নয়, এই পরম সত্য সোভিয়েট স্বীকার করে নিয়েছে। তাই দেখতে পাই, সোভিয়েটে চিত্রশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি আশ্চর্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে, সোভিয়েটে শিক্ষার প্রসার আছে বলে, সেখানকার প্রতিটি লোক দেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে ভালবাসে বলে। তারাই এখন আর্টের উপজীব্য এবং চিত্রকলার পটভূমিকায় ফুটে ওঠে তাদেরই জীবন-কাহিনী। এইসব জনসাধারণ—সোভিয়েটের মাটির সঙ্গে যাদের নাড়ীর যোগ—তাদের সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন যে এদের জন্যই সোভিয়েট আর্টের উন্নতি সম্ভব হয়েছে, সেইজন্য সোভিয়েট শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রথম কাজ হবে এদের শিক্ষিত করে তোলা। লেনিন বলেছেন:

"They *'made'* the revolution and defended its cause, shedding rivers of blood and making countless sacrifices. Truly, our workers and peasants deserve something better than circuses. They have earned the right to true and great art. That is why we place primary emphasis on the broadest public education and upbringing. It provides the soul for the growth of culture, providing of course, that the problem of bread has been solved. A truly new, great communist art which will create a form suitable to its content will grow on this soil. Along these lines our 'intellectuals' have to solve noble tasks of vast import."

অমৃত-পিয়াসী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কি যেন বেদনা বহি দিবানিশি বেড়াই কেবল!
গভীর বিষাদ-ক্লুব্ধ হু হু করে দগ্ধ চিত্তল
মরুসম! ভাষাতীত ব্যথা মোর,—স্বরূপ তাহার
ছায়াময়, অর্দ্ধস্ফুট, অনির্দ্দেশ্য সম্মুখে আমার
ঘুরে সদা প্রেতসম। অন্তর্গূঢ়—অবিশ্লেষণীয়
কাব্যরসসম যেন সে যন্ত্রণা অনির্ব্বচনীয়!
জনতার কোলাহলে থাকি তবু মনে হয়—একা,
জীবন-মনের সাথী—কোথা তার নাহি পাই দেখা
ধরাতলে! হাহা রবে কাঁদে সদা অসহায় প্রাণ!
কুসুমপেলব করি' গড়েছিলে যদি ভগবান,—
এ অন্তর—তবে কেন সংসারের অগ্নিশিখামাঝে
দিলে তারে ফেলি'? কেন বুকে মোর বাজে
জীবনের এ লাঞ্ছনা? হায় প্রভু, অমৃতের ক্ষুধা
যে জন বহিয়া বুকে অহর্নিশ ঘুরিছে বসুধা—
গরল তাহারি লাগি'? ঊর্দ্ধতম ভাবলোকে যার
অভ্রচারী শকুন্তের মত চিত্ত করিছে বিহার,
হে নিষ্ঠুর, দুঃখময় বস্তুপুঞ্জমাঝে কেন তারে—
নিশিত শায়ক হানি' আনিতেছ টানি' বারে বারে?

আমি শুধু নাহি পালি জীবধর্ম্ম শাশ্বত প্রথায়;—
দেহের পিঞ্জরে থাকি' দেহাতীতে সমগ্র সত্তায়
করিয়াছি অনুভব। বিনাইয়া ছন্দের আকারে
বলিতে চেয়েছি মোর মর্ম্মবাণী শুধু বারে বারে
মানুষের লাগি। হায়, বেদনাই তার পুরস্কার!
অথবা কি হৃদয়ের অন্তর্লীন এই হাহাকার,
ব্যাকুল বেদনা মোর তৃষিত এ নিঃসঙ্গ আত্মার—
কবিত্বের চিরসাথী? তিলে তিলে
বিতরি' সুরভি
ধূপ যথা মরে দহি' ঐরূপ দহিবে কি কবি?
তার চেয়ে রাজপথে ধাবমান জনতার মত
সংসার-পসরা শিরে, শত দুঃখ সহি' অবিরত
হাস্যমুখে নিশিদিন বাঁচিবার উন্মত্ত উল্লাসে
পারিতাম যদি আমি দিনগুলি দিতে অনায়াসে
কাটাইয়া;—তার পর অনাঘ্রাত বনপুষ্পসম
সহসা পড়িত ঝরি' এক দিন এ জীবন মম—
সেই ছিল ভাল! এ বেদনা ধুইয়া মুছিয়া
সরল সন্তোষে মগ্ন হ'ত যদি ভাব-ক্লিষ্ট হিয়া!

রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বরূপ ও তাহার ভাষ্যকার

শ্রীজীবনময় রায়

বাংলা সাহিত্য যেন পটুয়ার পটশালা হইতে রবীন্দ্রযুগে অকস্মাৎ বিশ্বশিল্পীর আমদরবারের মসনদে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল। লোহারামের লৌহবেষ্টনীতে বাঁধা সাহিত্যসেবকের লেখনী রবীন্দ্রপূর্বযুগে সাহিত্যসৃষ্টির কারখানায় সঙ্কীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ ছিল। পদে পদে তাহাকে সামাজিক আচারের আগুনে পুড়িয়া এবং সমালোচকের হাতুড়ির ঘায়ে তালতোবড়া হইয়া বাহির হইতে হইত। সাহিত্যিকের মানসীকল্পনা হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিত—হয় নিষেধের বোরখা পরিয়া আর না হয় ইতরজনের চিত্তহরণে অৰ্দ্ধ উলঙ্গিনী বারাঙ্গনার অশ্লীল ভঙ্গিমায় রঙ্গিনী সাজিয়া।

রবীন্দ্রসাহিত্য আবির্ভূত হইল—জল-স্থল-অন্তরীক্ষে অবাধ গতি রাজহংসবলাকার মুক্তির আবেগে, অনন্ত অন্তরীক্ষে স্বপ্নামদরসমত্ত বলিষ্ঠ পক্ষ বায়ুতরঙ্গে বিস্তার করিয়া দিয়া,—পরমানন্দময় মুক্তির বিচিত্র ছন্দলীলায় তরঙ্গিত ভঙ্গীতে। অকস্মাৎ এই দুর্দম আবির্ভাবের গতিবেগে চমকিত হইয়া অপ্রস্তুত মানুষের ভ্রান্তচিত্ত গতানুগতিকের শত্রুরূপে নবীন সাহিত্যের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল এবং রবীন্দ্রসাহিত্যকে একটা প্রহেলিকা বলিয়া তাহাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বৈষ্ণব বাউলের বাংলাদেশে প্রহেলিকার মায়া উপেক্ষণীয় হইতে পারে নাই। অন্তরে অন্তরে সেই সুন্দরী-প্রহেলিকা রসগ্রাহী বাঙালী পাঠকের মনোহরণ করিতেছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর লাগিয়াছিল সেই অপ্রস্তুত, অশিক্ষিত, সংস্কারের গণ্ডীতে আবদ্ধ বাঙালী পাঠকের বিমুখ চিত্ত প্রসন্ন হইতে। আর আজ যখন সে হৃদয় দান করিয়া বসিল তখন রসপ্রবাহে তাহার চিত্তের সীমান্ত রেখার আর চিহ্নমাত্র রহিল না। কি বুঝিল এবং কি বুঝিল না তাহা অবান্তর হইয়া গেল—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূজামন্দিরে কাব্য-দেবতার পীঠস্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

পাঠকসাধারণ এবং তাঁহাদের পথপ্রদর্শক সমালোচকবর্গ পূর্বে রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে ছিল বিদ্বেষে বিরূপ, এখন বলিল 'আহা অপরূপ'। এক সময় ছিল মল্লবেশ, এখন আসিল ভাবাবেশ—'ক' বলিতে দশায় পড়ে। কোনটাতেই বুঝিবার বালাই রহিল না। বিদ্বেষ বা শত্রুতা এত সর্বনাশের নয়—রাবণের শত্রুতার পৃষ্ঠভূমিতেই রামের বিরাট স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু ভাবাবেশ বড় সর্বনেশে ব্যাপার। তাহাতে যে দশায় পড়ে তাহারই যে শুধু সমাধি লাভ হয় তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেবতাও সমাধি পান; তাঁহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া বুঝিবার আর প্রয়োজনও থাকে না, অবস্থাও থাকে না। সেই নিরঙ্কুশ সমাধির হাত হইতে রক্ষা করিয়া দেবতাকে তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির সৌন্দর্য্যলোকের মধ্যে 'রসো বৈ সঃ' রূপে তাঁহার বিশ্বরচনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন ঘটে। তখন সেই প্রয়োজনের তাগিদেই প্রয়োজন সাধনের যোগ্য মানুষ জাগিয়া উঠেন। ছোট বড় জাগতিক বা পারমার্থিক সকল ব্যাপারেই এই 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। তাই কালিদাসের কাব্য-সৌন্দর্য্য বুঝিবার তাগিদে মল্লিনাথের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসসৌন্দর্য্য সম্ভোগের আকূতি পাঠকসমাজের অন্তরে অবশ্যই জাগিয়াছে, তাহারই তাগিদে আজ রবীন্দ্র ভাষ্যকারগণের আবির্ভাব হইতেছে।

বিশ্বভারতী এই সকল ভাষ্য ও পরিচয় গ্রন্থ কিছু কিছু প্রকাশিত করিয়া বাংলাপাঠক সাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবেও কেহ কেহ এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া রবীন্দ্রকাব্যরহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্যসেবীগণের কৃতজ্ঞতাভাজন।

কিন্তু একটা কথা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিচ রবীন্দ্রনাথ ষড়ৈশ্বর্য্যগুণে বিশ্বকবি, এবং সংস্কৃতি ও অভিব্যক্তির গৌরবে তিনি একান্তরূপে জাতীয় কবি; কিন্তু তদপেক্ষাও তাঁহার পরিবেশ, তাঁহার পরিবার, তাঁহার শিক্ষা ও প্রকৃতির সংমিশ্রণেই তিনি বিশিষ্ট; সুতরাং এই সকলের প্রত্যক্ষ পরিচয় রবীন্দ্রকাব্য পরিচয় লাভের প্রধান উপজীব্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃত ভাষ্যকার হইতে গেলে তাহার প্রাণলোকে প্রবেশ করা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মবহুল জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী। জীবনের অধিকাংশ কাল তিনি এই শান্তিনিকেতনেই অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার সাধনার ও সৃষ্টির, তাঁহার জীবন ও কর্ম্মের, তাঁহার দেহ মন আত্মার প্রতিটি কণা এই শান্তিনিকেতনের জলস্থল অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া সঞ্চিত হইয়া আছে। বর্ণ-বৈচিত্র্যময় ঋতুপর্য্যায়ের লীলায় মহিমান্বিত এখানকার উদার আকাশ, তরঙ্গায়িত দিগন্তপ্রসারিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নৃত্যচমকিত শালবীথিকা, ছায়াময় আম্রকুঞ্জ, আলোছায়ার ঝালরকাটা লীলায়িত আমলকী-বন, প্রহরীবেষ্টিত তালদীঘি, ছায়ালোক সম্পাতে রহস্যময় খোয়াইয়ের সর্পিল অজস্রতা, জনহীন প্রান্তরের অভিমুখে উধাও হইয়া যাওয়া 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ', সমস্তই রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসমধুসঞ্চারে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওতঃপ্রোত হইয়া আছে। ইহাদের সহিত অচ্ছেদ্য

স্মৃতিতে বিজড়িত সুদীর্ঘ পরিচ্ছদে সমাবৃত সমুন্নত দেহ একক রবীন্দ্রনাথের সঞ্চরমান মূর্ত্তি এই বিচিত্র সমাবেশের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে যেন চকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তপঃপ্রভাবে পূত এই তপোবনক্ষেত্রে, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে, ইহার প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক রস ও রূপের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাঁহারা বাস করেন নাই, রবীন্দ্রকাব্যরসধারার প্রাণলোকের উৎসটির পরিচয় তাঁহাদের নিকট সুলভ নয়। অবশ্য এমনও সম্ভব যে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও ধর্ম্ম, তাঁহার গোষ্ঠী পরিচয়, তাঁহার শিক্ষা, কর্ম্ম ও তাঁহার বিচিত্র রচনার সহিত বহু দিন যাবৎ পরিচিত হইতে হইতে আপন কল্পনা ও অনুপ্রেরণার আলোকে প্রতিভাবান রসগ্রাহী কেহ কেহ রবীন্দ্রকাব্যরসের অমৃত উৎসের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তবু তাঁহাদের চিত্তে শান্তিনিকেতন আশ্রম স্বরূপের সহিত ঘনিষ্ঠতাপ্রসূত রসসম্ভোগের অভাবজনিত অতৃপ্তি রহিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে প্রকৃতি ও পরিবেশের সুধারস পান করিয়া আপনার কাব্য-প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন, রবীন্দ্র-সনাথ সেই প্রকৃতি সম্ভোগের প্রত্যক্ষ অনুভূতি না জন্মিলে, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপকে, তাঁহার ইতিহাস এমন কি কাব্য হইতেও সংগ্রহ করা দুরূহ। হিমালয়কে যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে, অপ্রত্যক্ষ সহস্র পরিচয়েও হিমাচলের মহিমা তাহার নিকট অগোচর থাকিয়া যায়। সন্তানে মায়ের দেহের মধুর স্পর্শ ও মাতৃত্বের মাধুর্য্যরস যেমন করিয়া উপভোগ করিতে পায়, খেলার সাথী, মায়ের সহস্র সমাদর সত্ত্বেও, তেমন করিয়া মাকে পায় না। এই কারণেই শান্তিনিকেতন আশ্রমের গুহ্যরসে-লালিত কাব্যরসিকের রচিত রবীন্দ্রপরিচয়-গ্রন্থ অন্যান্য গ্রন্থ হইতে রসে ও সংবেদনে স্বভাবতই স্বতন্ত্র ও অধিকতর মূল্যবান হওয়ার অধিকার দাবী করিতে পারে। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব কবিতার অন্তরতম মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে রসানুভূতির গভীর লোকে প্রবেশ করিতে হয় এবং বৈষ্ণব সাধনার নিগূঢ় রসতত্ত্বের মধ্যে দুকূলহারা হইয়া না ডুবিলে সে রসানুভূতির চরম উপলব্ধি হইতে পারে না। এত বড় উপমা না দিয়াও সামান্য একটি দৃষ্টান্ত যোগে আমার বক্তব্যটি সুপরিস্ফুট হইবে। অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, গভীর খাদ রেখায় চিত্রিত দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে উধাও হইয়া যাওয়া "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ"-পার্শ্বের অলিন্দে বসিয়া যে সেই পথের প্রেমে মাতে নাই সে শুধু কল্পনার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, গৈরিক বসনমণ্ডিত সেই বাউল পথ কেন যে মন ভুলায়! কোন অজানার আকর্ষণে কবির মন হাত বাড়াইয়া ঐ বিবাগী-পথের ধূলায় যাইয়া লুটাইয়া পড়িতে চায়! কোন সর্ব্বহারা মুক্তির লোভ দেখাইয়া কবিকে সে ভুলাইয়া ঘরের বাহিরে টানিয়া আনে এবং কোন সর্ব্বনাশের নেশায় মাতাল করিয়া তাঁহার প্রাণ কাড়িয়া লইয়া সে "যায় রে কোন্ চুলায় রে!"

এইটুকু গৌরচন্দ্রিকা সাধিবার তাৎপর্য্য এ নয় যে আমি প্রমাণ করিতে বসিয়াছি যে শান্তিনিকেতনবাসী যে কেহই রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে যাহাকিছু লিখিবেন বাহিরের রবীন্দ্র-কাব্যরসিকদিগের ভাষ্য হইতে তাহা অবশ্যই উত্তম হইবে। কেননা যে কয়টি বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা থাকিলে ভাষ্যকার হইবার যোগ্যতা লাভ করা যায়, সে কয়টি গুণ ও ক্ষমতার অভাব যাঁহার মধ্যে আছে, তিনি যদি শান্তিনিকেতনের মাটিতে জন্মিয়া চিরদিন রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে জীবন অতিবাহিত করিয়াও থাকেন তথাপি রবীন্দ্র-ভাষ্যে তাঁহার অধিকার জন্মিতে পারে না। ঐতিহাসিক জগতে, তিনি হয়ত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, বহু দুর্লভ তথ্য বিতরণ করিয়া রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যের অন্দরমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র তিনি পাইতে পারেন না। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যের রসপরিবেশনে সমগুণ ও সমান ক্ষমতা বিশিষ্ট উক্ত দুই জন কাব্যরসিকের মধ্যে আশ্রমলালিত-জনের ভাষ্যকেই আমরা অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিব।

কাব্যসমালোচকের প্রথম ও প্রধান গুণ হইল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্। যে বিষয় প্রকাশ করিতে যাইতেছি তাহার সম্যক্ উপলব্ধি না জন্মিলে তাহাকে পূর্ণরূপে জানা যায় না; এবং সম্পূর্ণ করিয়া না জানিলে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া বলা সম্ভব নয়। সেইরূপ অবস্থায় বলিতে গেলে ব্যাখ্যান অবান্তর বাগাড়ম্বরে পূর্ণ হয় মাত্র। মনে রাখিতে হইবে, এই যে শ্রদ্ধার কথা বলিলাম, ইহা ব্যক্তির প্রতি নয় পরন্তু তাঁহার রচনার প্রতি—স্রষ্টার প্রতি নহে, তাঁহার সৃষ্টির প্রতি। স্রষ্টার মনোভাব যদি রচনার মূল্য নির্ণয়ে নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে সে রচনা স্রষ্টার মূল্যেই বিকাইবে। অস্কার ওয়াইল্ড্ মানুষটার সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা তাহার দ্বারা যদি আমি ডি প্রোফাণ্ডিসের মূল্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে বলিতে হয় "চণ্ডালের হাতে দিয়া পোড়াও পুস্তকে; ভস্মরাশি করি ফেল কর্ম্মনাশা জলে।"

সমালোচকের দ্বিতীয় গুণ, রসগ্রাহিতা অর্থাৎ রসবিচার। এই বিচারে সংযম একটি একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা। রসের সম্যক্ বিচার সম্ভবই হয় না, যদি 'সংযতেন্দ্রিয়ঃ' না হওয়া যায়। সামান্য কারণে যাহারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সে ভাবেই হোক বা অভাবেই হোক—তাহারা রসবিচারের যোগ্য নহে।

তৃতীয় গুণ, ব্যবচ্ছিত্তি ও সূক্ষ্মতা। অর্থাৎ সহজে ও সুন্দররূপে রচনার মধ্যে প্রবেশের ক্ষমতা— কবি বা লেখকের চিত্তে যে

চিত্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার ইঙ্গিতমাত্রেই তাহাকে আপন মানসে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি।

চতুর্থ গুণ, মূল্য বোধ। যে দেশে মানুষকে ঈশ্বরের আসনে বসানো হয় বা গান্ধীকে হত্যা করা হয় সে দেশে ইহার চর্চা অত্যাবশ্যক। অনুত্তেজিত বিচারশক্তি ও মানসিক সংযম (discipline) ইহার প্রধান সহায়।

পঞ্চম গুণ, প্রকাশ ক্ষমতা। যাহা বুঝিলাম তাহা অন্যের মনে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করাইবার শক্তি। অর্থাৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি-শূন্য চৌকস ওকালতীর ক্ষমতা যাহাকে বলা যায়। ইহার তিনটি অঙ্গ। এক, দ্বিধাহীন লক্ষ্যাভিমুখী বলিষ্ঠ ভাষা; যে ভাষা সোজা পাঠকের চিত্তে গিয়া প্রবেশ করে। যুক্তির অকাট্যতা অথচ পাঠকের মন সহজেই যাহা মানিয়া লয় এমন যুক্তি। অর্থাৎ অস্বস্তিজনক 'এণ্ডোতর্কে'র দ্বারা বাজিমাৎ করিবার অপচেষ্টা না-করা। তিন, অকপটতা বা সাধুতা sincerity। অর্থাৎ যাহা বুঝিব তাহা দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিবার সৎ বুদ্ধি ও সৎ সাহস। ষষ্ঠগুণ, যাঁহার সমালোচনা করিতে হইবে তাঁহার সমধর্ম্মী মন। অন্যথা কখনই তাঁহাকে ভাষ্যকার ঠিকমত বুঝিবে না।

কেহ যদি রবীন্দ্রসাহচর্য্য এবং শান্তিনিকেতনের তাবৎ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবিয়াও থাকেন এবং তাঁহার যদি এই সকল গুণ না থাকে, তাহা হইলে তিনি কোনো মতেই রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা হইতে পারেন না। এই সকল গুণ যিনি যে পরিমাণে অর্জ্জন করিয়াছেন তিনি সেই পরিমাণেই কোনো মহান্ সাহিত্যিকের কাব্য ও জীবনের পরিচয় প্রকাশে সফলকাম হইবেন।

অবশ্য এই সকল গুণ যাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান তিনি আবার যদি কবির জীবন ও কর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকেন তবে তিনিই হইবেন কবির কাব্য ও জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী উক্ত উভয় ঐশ্বর্য্যেরই অধিকারী ছিলেন। এই হেতু তাঁহার "রবীন্দ্রনাথ" ও "কাব্যপরিক্রমা" রবীন্দ্রকাব্যরসামৃত পরিবেশনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন এবং রবীন্দ্রকাব্য পরিচয়ের যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন বাংলা সমালোচনসাহিত্যে তখনকার যুগে তাহা অভিনব। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূলসূত্র-গুলি আবিষ্কার করিয়া তাহারই আলোকে রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত প্রহেলিকার আবরণ উন্মোচন ও পাঠক সমাজে তাহার ভাস্বর রূপ প্রকাশ করিয়া ধরা ছিল এই পদ্ধতির স্বরূপ।

রবীন্দ্র-পরিচয় সাধনে অজিতকুমারই এই তত্ত্বপ্রকাশাত্মক সমালোচন-পদ্ধতির পথপ্রদর্শক এবং আপন অজ্ঞাতসারেই বাঙালীর রসগ্রাহী সমালোচক চিত্ত আজ সহজেই এই পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার "রবীন্দ্রনাথ" ও "কাব্য-পরিক্রমা" হইতে অল্প কিছু চয়ন করিয়া দেখাইলে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে।

কিন্তু যে যুগে, "চমৎকার" বা "অতি মন্দ,"—তৌল দণ্ডে কেবল এই দুইটি মাত্র বাটখারা চাপাইয়া সাহিত্য বিচারের মাতব্বরী করিবার রেওয়াজ ছিল, সেই যুগে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, রসতত্ত্ব ও রসবোধে পরিপূর্ণ এ জাতীয় বিচার এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে।

"রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে অজিতকুমার বলিয়াছেন যে, বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে; সেই সূত্র তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়। তাহাই কবির কাব্য জীবনের মূল সুর। সেই মূল সুরটির প্রকাশের ব্যাকুলতায় কাব্যের সৃষ্টি। "যে জীবনকে পাওয়া যাইতেছে না অথচ দূর হইতে যাহার পরিচয় পাইতেছি" তাহারই অভিসারে কবির চিত্ত বাহির হইয়াছে এই অপরিচিত অথচ চিরপরিচিত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে এই বিশ্বঅভিসারযাত্রার ভ্রমণের ইতিহাস দেখিতে পাই। এমনি চলিতে চলিতে কবি ভারতবর্ষের ধর্ম্মসাধনার পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সে পথ সত্যের পথ, দেশাচারের দ্বারা তাহা সংকীর্ণ নয়। এইজন্য সকল দেশের সকল মানুষের অন্তরতম সত্যের সহিত তাঁহার নিবিড় আত্মীয়তা। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনা কোনো বাহিরের সংস্কারকে অবলম্বন করে নাই, তাহা সমস্ত জীবন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জীবনের সকল বিচিত্রতাকে পরিপূর্ণ একের মধ্যে পাইবার আকাঙ্ক্ষাই কবির কাব্যের প্রাণ। প্রবৃত্তির পথকে তিনি রুদ্ধ করেন নাই; বিশ্ব-সংসারকে জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভোগে সর্ব্বত্র স্বীকার করিয়া তাঁহার জীবন ও কাব্য চরিতার্থ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা বার বার দেখিব যে তাঁহার প্রকৃতি প্রবৃত্তির ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যে সমগ্রের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক অবস্থায় কাব্যের মধ্যে বিশ্বযাত্রার এই ব্যাকুল ক্রন্দন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সুরটি হইল সর্ব্বানুভূতি। সর্বমেবা-বিশন্তি—সকলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধনা—সমস্ত জলস্থল আকাশকে সমস্ত মনুষ্য সমাজকে আপনার চৈতন্যে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিবার নামই হইল সর্ব্বানুভূতি। রবীন্দ্রনাথ পরে তাহার নাম দিয়াছিলেন বিশ্ববোধ।

সন্ধ্যাসঙ্গীতেই কবি সর্ব্বপ্রথমে নিজের সুর আবিষ্কার করিবার আনন্দ অনুভব করেন। হৃদয়ের অনুভূতির সহিত জীবনের অভিজ্ঞতার যখন সামঞ্জস্য সাধিত হয় নাই তখন নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার যে অধীরতা তাহাই সন্ধ্যাসঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রভাতসঙ্গীতে তাঁহার সমগ্র কাব্যজীবনের

ভাবটির ভূমিকা নিহিত হইয়া আছে। সীমার মধ্যে অসীমকে নিবিড়রূপে উপলব্ধি করিবার সাধনা জাগিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি—হৃদয়াবেগকে সুরের অনির্ব্বচনীয় ভাষায় ব্যক্ত করাই তাঁহার চিরজীবনের কাজ। সমস্ত বিশ্ব-স্পন্দনকে সমস্ত বস্তুজগৎকে সুরে রূপান্তরিত একটি অপরূপ সঙ্গীতের মত করিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। অনভ্যস্ত পাঠকের নিকট রবীন্দ্রনাথের কবিতার অস্পষ্টতা এই সুরের আবেগের জন্যই।

ভোগের সমস্ত ক্ষণিকতা ও ব্যর্থতাকে অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্য্যের যে একটি অসীম মুক্ত রূপ আছে, মানবদেহে যে একটি প্রাণময় মনোময় অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের প্রকাশ আছে, তাহারই লোকাতীত রহস্যময় পরমবিস্ময়কর সুরটি "চিত্রাঙ্গদা"য় ফুটিয়াছে, বাহ্যিকরূপ এবং অন্তরের মানুষ এ দুয়ের দ্বন্দের রূপে। চিত্রাঙ্গদা কাব্যখানি সৌন্দর্য্যকে বাহিরের দিক হইতে ভোগের একটা মস্ত প্রতিবাদ। বাহ্য সৌন্দর্য্য কবির নিকট "একসীমাহীন অপূর্ণতা অনন্ত মহৎ।"

সৌন্দর্য্যের যে সম্পদ জীবনের নানা শুভ মুহূর্ত্তে একটি চিরপরিচিত অথচ অজানা সত্তার স্পর্শের ভিতর দিয়া ক্রমাগতই জীবনের ভিতরে সঞ্চিত হইয়াছে তাহাকে নিজের ভোগের গণ্ডি দিয়া রাখিতে গেলেই সে পলায়ন করে—সে যে বিশ্বের, সে যে সকলের। "সোনার তরী", "পরশ পাথর", "বৈষ্ণব কবিতা" এ সকলের মধ্যেই সেই একই তত্ত্বের প্রকাশ। অংশের মধ্যেই সম্পূর্ণতার তত্ত্ব নিহিত হইয়া আছে। শারীরিক সৌন্দর্য্য সেইজন্য অনির্ব্বচনীয়, মানবপ্রেম অনির্ব্বচনীয়, কোথাও বিস্ময়ের অন্ত নাই; কবির নিকট সমস্তই সেই রহস্য-ময়ের পূজা।

"জীবন দেবতা"র স্বরূপই হইতেছে বিশ্ববোধ। সমস্ত ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া জীবনকে তিনি একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যের মধ্যে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছেন। তিনিই আমাদের উপস্থিতকে চিরন্তনের সঙ্গে, ব্যক্তিগত জিনিষকে বিশ্বের সঙ্গে, খণ্ডকে সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলিত করিয়া পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। জীবনকে ক্রমাগত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া জীবনের তাৎপর্য্যকে বিপুলতর করিতেছেন।

"উর্ব্বশী" এবং "বিজয়িনী"তে সৌন্দর্য্যকে কবি সমস্ত মানবসম্বন্ধের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে, তাহার বিশুদ্ধতায়, তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য সমস্ত প্রয়োজনের বাহিরে আপনাতে আপনি বিকশিত একটি সম্পূর্ণ সত্তা। "উর্ব্বসী" সমস্ত রূপের মধ্যে অপরূপের দৃষ্টি।

সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালীর এই মাধুর্য্য-রসপূর্ণ জীবনের সঙ্গে, কথা, কল্পনা, ক্ষণিকা প্রভৃতির পরবর্ত্তী কাব্যের জীবনের যে বিচ্ছেদ তাহা এমন গুরুতর যে দুইটাকে দুই জন স্বতন্ত্র লোকের জীবন বলিলেও অন্যায় হয় না। সোনার তরী ও চিত্রার জীবন হইতে বিদায় লইবার প্রধান কারণ এই যে, কেবলমাত্র শিল্পময় জীবনের অসম্পূর্ণতা কবিকে ভিতরে ভিতরে বেদনা দিতেছিল। একটা বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র, যে ক্ষেত্র কোন স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ নয়, যাহার নিকটে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া মানুষ মঙ্গলের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তেমনি একটি কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহার জীবনে একান্ত প্রয়োজন ছিল। সেই রকম একটি কর্ম্মক্ষেত্র, একটি তপস্যার ক্ষেত্র তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইল। তাহারই উদার আমন্ত্রণে সমস্ত বিতর্ক-বিচার, সমস্ত বন্ধন ক্রন্দন, সমস্ত খিন্ন জীবনের ধিক্কার লাঞ্ছনাকে একেবারে দূরে অপ-সারিত করিয়া প্রাণ ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। শক্তির সেই লীলাক্ষেত্রে মানুষের বিরাট মূর্ত্তিকে দেখিবার জন্য কবির চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

অজিতকুমারের "রবীন্দ্রনাথ" হইতে কতকটা বিস্তৃতভাবে উপরোক্ত কথাগুলি চয়ন করিয়া তাঁহার গভীর প্রবেশ ও বলিষ্ঠ প্রকাশ ক্ষমতার সামান্য পরিচয় দিলাম। আজ যে আদর্শে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আমাদের পক্ষে সহজ হইয়াছে অজিতকুমারই সর্ব্বাগ্রে সেই আদর্শে ও সেই পদ্ধতিতে রবীন্দ্রকাব্য বিচার করিয়া তাহার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টিকে তাঁহার সমস্ত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ করিয়া দেখাই সত্য করিয়া দেখা এবং সে দেখা অজিতকুমার প্রমুখ কয়েকজন যেমন করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন এমন আর কেহই নাই। সেই কারণেই অজিতকুমারের রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থ "রবীন্দ্রনাথ" ও "কাব্যপরিক্রমা" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভের যোগ্য এবং রবীন্দ্রকাব্যরসিকজনের পক্ষে অপরিহার্য্য। কবিবর স্বয়ং তাঁহার নূতন সংস্করণের কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা-স্বরূপ অজিতকুমারের এই লেখাটিকে গ্রহণ করিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। ইহাতেও এই সমালোচনার মূল্য বড় অল্প গৌরব লাভ করে নাই।

কাব্যপরিক্রমায়—জীবন দেবতা, রাজা, ডাকঘর, জীবন-স্মৃতি, ছিন্নপত্র, ধর্ম্মসঙ্গীত, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য অবলম্বন করিয়া লেখক যে গভীর তত্ত্ব ও গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দান করিয়াছেন তাহা অনন্য।

জীবনদেবতা নিবন্ধে গ্রন্থকার কবিতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিতেছেন, "সে ভাবকে চায় না, অভাবনীয়কে চায়; নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বকে চায় না, অনির্ব্বচনীয়কে চায়।" রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চেতনার ইহাই প্রকৃত স্বরূপ। তাহাই বলিতে গিয়া এম্ব্রায়োলজি হইতে সুরু করিয়া একসপেরিমেণ্টাল সাইকলজি এবং ডারউইন হইতে ফেক্‌নার পর্য্যন্ত সকলকেই তিনি সাক্ষী-রূপে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছেন। "জীবনদেবতার তত্ত্ব সম্যক্

বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া অনেকে উহা নিতান্ত অলস কল্পনা-মাত্র মনে করেন।" এই কথা মনে হইবামাত্র লেখক বোধ করি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ব্যাপারটা যে অসঙ্গত ও অশোভন হইয়াছে অজিতকুমারের কাব্যরসিক অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত তাহা অনুভব করিয়াই ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "রসাত্মক কাব্যের রসপ্রসঙ্গে এরূপ জটিল তত্ত্বের কচকচি অনেকের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। আশা করি তাঁহারা আমাকে দয়া করিয়া সহ্য করিবেন।" কিন্তু "সহ্য করিবার" এখন আর আবশ্যক হইবে না। এ বিষয় অজিতকুমার স্বর্গে বসিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। ছাত্রেরা এখন জীবনদেবতার হাড়মজ্জা পর্য্যন্ত চিবাইয়া গলাধঃকরণ করিবে; কেননা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত। অজিতকুমারের গ্রন্থ দুইখানি এতই উপাদেয় এবং রবীন্দ্রকাব্যরস-পরিচয়-সাধনে তাঁহার চিন্তা ও বাচনভঙ্গী এত অভিনব যে "তত্ত্বের কচকচি" তাহার মধ্যে সত্যই খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়। তাই সেটুকু উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

গীতাঞ্জলির সমালোচনার প্রতি আমি বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কেননা এইটিতে অজিত বাবুর বিশ্লেষণ ভঙ্গী পরিস্ফুট হইয়াছে। গীতাঞ্জলির মধ্যেই সাধক রবীন্দ্রনাথের সাধনার ধারার প্রথম পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই সাধনারই তিনটি উপধারার ত্রিবেণীসঙ্গম এই গীতাঞ্জলি। সে তিনটি ধারা এই—

(১) এই দুঃখ-আঘাতই তো সেই জীবনদেবতার স্পর্শ। (২) সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবাইয়া দিয়া তাঁহার চরণধূলির তলে মাথা নত না করা পর্য্যন্ত আমাদের শান্তি নাই। (৩) "সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে" তাঁহাকে প্রণাম না করিলে, প্রণাম সার্থক হইবে না। কেননা

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারোমাস।

তিনি বলিতেছেন, "গীতাঞ্জলির এই সাধনার কবিতাগুলি কবিতাহিসাবে নিকৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে কবির সমস্ত স্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে এই কাব্যের মধ্যে ধরা দিয়াছে। তিনি এই কাব্যে আপনাকে সম্পূর্ণ দান করিয়াছেন। এইখানেই গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব। এই কারণেই এই কাব্যে মানুষের জীবনের মধ্যে কবির সাধনা গিয়া আঘাত করিতেছে।"

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে থাকিয়াও রবীন্দ্রনাথের তখনকার দিনের লোকপ্রিয়-তম কবিতাগুচ্ছকে "নিকৃষ্ট" বলার মত সৎসাহস ও সাধুতা অজিত কুমারের ছিল। তাঁহার মত ও বিশ্লেষণ তিনি সুস্পষ্ট ঋজু ভাষায় তাঁহার স্বাভাবিক সাধুবুদ্ধিতে অনায়াসেই ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সমালোচক হিসাবে এইখানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা জাজ্বল্যমান।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়া রবীন্দ্রকাব্য-তীর্থ পরিক্রমণে গ্রন্থকারের ভক্তিরস পরিস্রুত তত্ত্বজ্ঞানী অনুসন্ধিৎসু চিত্তের যে পরিচয়টি দিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থের সার্থক পরিচয়।

বিশ্বভারতী এই গ্রন্থদ্বয় পুনঃপ্রকাশিত করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য পিপাসুজনের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন; কেননা গ্রন্থ দুইখানি রবীন্দ্র-সাহিত্য স্বর্গোদ্যানের সুবর্ণকুঞ্চিকা বিশেষ।

অনুরাগীর দেশ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিষয়বুদ্ধি যাদের প্রখর, যারা খুব সকর্ম্মী
বাখানি তাদিকে—কিন্তু দূরেতে রহি;
নিকষ পাষাণ পর্ব্বতভূমি নিঝরের ধারা নাই,
বন্য হরিণ ত্যাগ করি সেই ঠাঁই।
সরোবর যার তলা ও বাঁধানো চারি পাশ ঘেরা শানে
ভীত মন মীন চাহিতে তাহার পানে।
কার্য্য যাদের ঘড়ি-ধরা ঠিক—হিসাবেই সব চলে
অহিসাবী নাহি যাই সে কঠিন স্থলে।
ছোট প্রজাপতি সুরভি-বিভোর তবু মন করে মানা
ঢুকিতে কিন্তু আতরের কারখানা।
মানুষ কেমনে নির্ভুল হবে করি সদা চিন্তন
বেসাতি করি যে কড়ি নয়, লয়ে মন।

যাহা উদ্বেল, যাহা উচ্ছল, নিত্য-উচ্ছ্বসিত
তাহাতেই মোর অন্তর হয় প্রীত।
বেহিসাবী যাহা, অকুণ্ঠিত যা, সতত বর্দ্ধমান
আমি চাই সেই মহালক্ষ্মীর দান।
সংখ্যায় যাহা ধরা পড়ে নাক', কথা চেয়ে বেশী সুর
মোর কাছে শুধু তাই লাগে সুমধুর।
অল্পে আমার তৃপ্তি নাহিক যদিও চাতক-ভাই
পিপাসা মিটাতে গোটা মেঘখানা চাই।
অপরিমিতের ইঙ্গিত যাতে তাই যে আমারে ডাকে
অফুরন্তের আভাস যাহাতে থাকে,
আমি পিনাকীর তৃতীয় আঁখির স্নেহের দৃষ্টি চাই
সাধারণ যাহা তাতে অভিরুচি নাই।

শ্রেষ্ঠ সামরিক রসদ

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

বিস্ফোরক দ্রব্য সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে অনেক কথা মনে হয়। জিনিষগুলি কিসের তৈয়ারী? কে বা কাহারা এ ভীতিপ্রদ পদার্থের উদ্ভাবক? আজ অবশ্য বিস্ফোরক-প্রস্তুতি, চালনা ব্যবহার—সবই নির্বিঘ্নে সংসাধিত হইতেছে। রাসায়নিক সুস্থিরমত এগুলি তৈয়ার করিতেছেন, কারখানার কর্মিগণ নির্ভয়ে ইহাদিগকে সাজাইয়া যথারীতি সর্বত্র প্রেরণ করিতেছেন। কেবলমাত্র কার্যাক্ষেত্রে এইগুলি বিস্ফোরণ সৃষ্টি করিতেছে।

বিস্ফোরকগুলি সব সমান নয়। কোন কোনটি সামান্য সঞ্চালনে ভীষণ বিঘ্ন উৎপাদন করে। নাইট্রোজেন আয়োডাইড নামক বিস্ফোরকটি সামান্য একটি পালকের আঘাতে দারুণ বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে। এ জাতীয় জিনিষ ঘাঁটাঘাঁটি করা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ইহাদের ব্যবহার কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণ বিস্ফোরক ও সমর-বিস্ফোরক সামান্য ব্যতিক্রমে উদ্বেলিত হয় না, এবং ইহাদের অন্যান্য কতকগুলি গুণও থাকে। নাইট্রো গ্লিসারিন একটি কমার্সিয়াল বা বাণিজ্যিক বিস্ফোরক। কিন্তু ইহা আশুবিদারণশীল ও অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। কমার্সিয়াল বিস্ফোরকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় ডিনামাইট্। ডিনামাইটের নাম আমরা সদা সর্বদা শুনিতে পাই। ইহা অনেক প্রকার। ৭৫ বৎসর পূর্বে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড নোবেল জিনিষটি আবিষ্কার করেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে নাইট্রো গ্লিসারিন। ইহার ব্যবহারে পার্থক্য শুধু এই যে কিসেলগার নামক একপ্রকার বালুজাতীয় পদার্থের মধ্যে এই তরল পদার্থটিকে আবদ্ধ রাখা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে সামান্য নাড়াচাড়াজনিত বিস্ফোরণের ভয় তিরোহিত হইয়াছে। নাইট্রো গ্লিসারিন ও এমোনিয়া নাইট্রেটের সমাবেশকে এমোনিয়া ডিনামাইট বলে। তৃতীয় প্রকার ডিনামাইটের নাম ব্লাষ্টিং জিলাটিন। ইহা নাইট্রো গ্লিসারিনের মধ্যে নাইট্রো সেলুলজের দ্রবণ। ইহাও নোবেলের আবিষ্কার। ইহার দুইটি উপাদানই বিস্ফোরক-গুণসম্পন্ন হওয়ায় ব্লাষ্টিং জিলাটিন অত্যন্ত তীব্র বিস্ফোরক দ্রব্য।

বিস্ফোরকের শক্তি পরীক্ষা হয় বিস্ফোরণের মাত্রাদ্বারা। বিস্ফোরণ সৃষ্টির জন্য সাধারণ ক্ষেত্রে অতি নিম্নস্তরের ডিনামাইট ব্যবহৃত হয়। কয়লা উত্তোলনে যে ডিনামাইট ব্যবহৃত হয় তাহার কাজ ধীরে ধীরে বিস্ফোরণ সৃষ্টি করা, যাহাতে ক্রমশঃ কয়লাগুলি অসংলগ্ন হইয়া আসে এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া না যায়। এমোনিয়া ডিনামাইটের বিস্ফোরণ-তেজ নির্ভর করে এমোনিয়া নাইট্রেট-দানার আকারের উপর। দানা যত ছোট হইবে বিস্ফোরণ তত জোরাল হইবে।

ডিনামাইট হঠাৎ সামান্য কারণে ফাটে না। যথাযথ উপায়ে ব্যবহৃত হইলে ইহা অত্যন্ত নিরাপদ। প্রতি বৎসর গাড়ীভর্তি ২০০,০০০ টন ডিনামাইট সর্বত্র আনাগোনা করে। ইহাতে এ পর্য্যন্ত কোন বিপদ ঘটে নাই। উহাদের বিস্ফোরণ ঘটাইবার জন্য তীব্র বারুদপূর্ণ আধারের (নাম ডিটোনেটার অথবা ব্লাষ্টিং ক্যাপ) সাহায্য দরকার হয়। ডিটোনেটারকে প্রজ্বলিত করিতে বিদ্যুৎই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান।

কমার্সিয়াল বিস্ফোরক ও সামরিক বিস্ফোরকের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সামরিক বিস্ফোরককে বলে নির্ভুল বিস্ফোরক। কার্যাক্ষেত্রে সর্বত্রই ইহাদের বিস্ফোরণ ঠিকমত হইয়া থাকে। এগুলি তৈয়ারীও হয় নৈপুণ্যের সহিত। যাহার সামান্য ব্যতিক্রমে যুদ্ধের গতি বদলাইয়া যাইতে পারে তাহা কিরূপ ত্রুটিশূন্য রাসায়নিক পদার্থ হওয়া উচিত—সকলেই ধারণা করিতে পারিবেন। এ সমস্ত সামরিক বিস্ফোরক সম্পূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ, মিশ্রিত পদার্থ নহে। রসায়নী অতিশয় নিপুণতার সহিত এগুলি তৈয়ার করেন। টি. এন. টি এরূপ একটি জিনিষ। ইহা আলকাতরা হইতে সঞ্জাত—নাম ট্রাইনাইট্রোটলুইন। সামরিক বিস্ফোরকের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। ইহাদিগকে যে-কোন ভাবের নাড়াচাড়া সহ্য করিতে হইবে। যুদ্ধের প্রচণ্ডতার সময় নিয়মকানুন ও সতর্কতার দিকে দৃষ্টি রাখা কঠিন, কাজেই যদি সামান্য কারণে উহারা বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে তবে শত্রুর চেয়ে সপক্ষেরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এজন্য টি. এন. টি ও এ জাতীয় অন্যান্য বিস্ফোরক অত্যন্ত বিকারহীন। ইহাদিগকে সক্রিয় করিতে হইলে অন্যান্য বিস্ফোরকের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। মার্কারী ফুলমিনেট, লেডএজাইড প্রভৃতি মধ্যবর্তীর কাজ করিয়া থাকে।

সামরিক বিস্ফোরক আবার দ্বিবিধ। এক প্রকার বারুদ গোলাগুলীকে ধাক্কা দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়—ইহাদিগকে প্রচালক বা প্রপেলেণ্ট বলে। অপর প্রকার বিস্ফোরকের নাম উচ্চ বিস্ফোরক বা বিদারণশীল বিস্ফোরক। ইহারা ভীষণ বিস্ফোরণ উৎপাদন করে। কমার্সিয়াল বিস্ফোরককেও বিদারনশীল বিস্ফোরক বলা যায়। এই দ্বিতীয় প্রকার পদার্থের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে বড় বড় সেতু ও কঠিন গাঁথুনীকে ধ্বংস করা হয়। সাধারণতঃ গোলাগুলী উচ্চ বিস্ফোরকে পূর্ণ থাকে। প্রপেলেণ্ট ও উচ্চ বিস্ফোরকের মধ্যে প্রভেদ নির্ভর

করে উহাদের বিদারিত হওয়ার গতিবেগের উপর। বিদারণশীল বিস্ফোরকগুলি প্রচণ্ড গতিতে ভগ্ন হইয়া যায় এবং সেকেণ্ডে প্রায় ৭০০০ মিটার গতিবেগ পাইয়া থাকে। ধাক্কা প্রদানকারী বিস্ফোরকগুলি ধীরে ধীরে ভগ্ন হয়—ইহারা যদি ক্রমশঃ সক্রিয় না হইত তবে কামান, বন্দুক প্রভৃতির শরীর প্রতি আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত। যত বড় গোলাগুলী তত ধীর আঘাত প্রয়োজন। এই ক্রমিক পর্য্যায় আবার প্রপেলেন্ট বিস্ফোরকের কণাগুলির আকারের উপর নির্ভর করে। কাজেই দরকারমত আকারের অদলবদল নিতান্ত প্রয়োজন। ছোট ছোট বন্দুকে ভাল চূর্ণ ব্যবহার করিতে হয় এবং ১৬ ইঞ্চি কামানে বেশ একটু বড় টুকরা ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

গান-পাউডার আমাদের বহু-পরিচিত প্রপেলেন্ট। বর্ত্তমান কালে যুদ্ধে ইহার ব্যবহার কম। অধুনা ধূমহীন চূর্ণের প্রচলন বেশী। গান-পাউডারের প্রধান দোষ ইহাতে ভীষণ ধূম্রজাল উৎপন্ন হয়, যাহাতে শত্রুগণ অনায়াসে বিপক্ষের সন্ধান পাইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইহাদ্বারা বন্দুকের নল অতি সত্বর নষ্ট হয়। নাইট্রোসেলুলুজ বিশুদ্ধ ভাবে তৈয়ার হইলে ইহাকে ধূমহীন চূর্ণ বলে। ইহার অপর নাম গানকটন। চাপদ্বারা ইহাদিগকে ক্ষুদ্রায়তন করিয়া সাবমেরিণ মাইন ও টারপেডো প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়।

কামানের গোলার মধ্যে যে উচ্চ বিস্ফোরক দেওয়া হয় তাহা অত্যধিক আশুবিদারণশীল না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বেশী বিদারণশীল হইলে উহারা কামানের মধ্যেই ফাটিয়া যাইবে, লক্ষ্য বস্তুকে ঘায়েল করার ক্ষমতা ইহার থাকিবে না। এই জাতীয় উচ্চ বিস্ফোরকগুলি প্রায়ই আলকাতরা হইতে সমুৎপন্ন। ইহাদের অপর একটির নাম পিক্‌রিক্ এসিড। শুনা যায়, গত মহাযুদ্ধে গোলাবারুদ হিসাবে ইহার খুব কদর ছিল। কিন্তু অনেক সময় ইহা গোলার ধাতবপদার্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়া মহা বিভ্রাট ঘটাইত। এই বিপদ হইতে টি. এন. টি. সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছে।

রাষ্ট্রভাষা

শ্রীরেণু দাশগুপ্তা, এম-এ

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা লইয়া পূর্ব্বেও বহু বিতর্কমূলক সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, এখনও বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিবার জন্য বহু বৎসর যাবৎ প্রচেষ্টা চলিয়াছে। সমৃদ্ধি, বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার দিক দিয়া বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য বাংলাদেশে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি মত প্রকাশ করিয়াছেন। যে-কোন একটি প্রাদেশিক ভাষা, তাহা যত সমৃদ্ধিশালীই হোক, কিংবা যতদূর বিস্তৃতিসম্পন্নই হোক, রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হইলে সমালোচনার সৃষ্টি হইবেই। প্রভিন্সিয়ালিজম বা প্রাদেশিকতা মূলক মনোবৃত্তি যুক্তিতর্কের উপরে উঠিয়া কোন একটি প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দান করিতে চাহিলে সমালোচনা, প্রতিবাদ এমন কি বিক্ষোভ প্রদর্শনে জনসাধারণ বিরত হইবে এমন মনে করিবার কারণ নাই। সম্ভবতঃ এই কারণেই ডক্টর কৈলাস নাথ কাট্‌জু সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃত এই তিনটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকিলেও, তিনটির যে-কোনটিরই রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে। অন্ততঃ বর্ত্তমান ভারতে অদূর ভবিষ্যতে এই তিনটি ভাষার একটিরও রাষ্ট্রভাষা হওয়া সম্ভব নয়।

প্রথমতঃ হিন্দীই ধরা যাক। হিন্দী এবং হিন্দুস্থানী ভাষার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে শুনিয়াছি। সে পার্থক্য কি এবং কত দূর তাহা আমাদের জানিবার কথা নহে। তবে হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইবার পক্ষে যতগুলি যুক্তি রহিয়াছে তাহার মধ্যে ইহাই প্রধান এবং একমাত্র যুক্তি এই যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের লোকই হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী ভাষা অল্পবিস্তর বুঝিতে পারে ও উক্ত ভাষায় কথোপকথন করিতে পারে। কেবলমাত্র এই কারণেই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার বিপক্ষেও যুক্তির অভাব নাই। ডাঃ বি এস্ মুঞ্জের মতে,

"হিন্দুস্থানী ভাষায় সাধারণ কথাবার্ত্তা বা হাটবাজারের কাজ চলিতে পারে। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক, শিক্ষাসংক্রান্ত, ও বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে হিন্দুস্থানী ভাষার ভাণ্ডারে যথাযথ শব্দের একান্ত অভাব।" (হিন্দুস্থান—১২ই পৌষ ১৩৫৪)

প্রত্যেক দেশেই অভিজাত, সংস্কৃতিসম্পন্ন ও শিক্ষিত শ্রেণীর একটি নিজস্ব ভাষা আছে। এই ভাষাও এই শিক্ষিত শ্রেণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে ভাষাতে পণ্ডিতজনেরা, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা কাজকর্ম্ম পরিচালনা করেন, যে ভাষায় ইঁহারা কথোপকথন ও ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকেন সেই

ভাষায় এমন একটি আভিজাত্যের সৃষ্টি হয়, যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা সেই ভাষাতেই উৎসারিত হইয়া থাকে। ইহাকে যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করা যায় না। আভিজাত্য, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা মানব-চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা। আমাদের দেশেও, কারণ যাহাই হোক, উচ্চ-শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ও পণ্ডিতজনের নিত্যব্যবহার্য্য একটি ভাষা প্রচলিত হইয়াছে। যে সুশ্রদ্ধ অনুরাগ এই ভাষার প্রতি আমাদের রহিয়াছে, সেই দিক হইতে বিচার করিলে সত্যকে স্বীকার করিয়া বলিতেই হইবে হিন্দি ভাষার প্রতি আমাদের সেই আভিজাত্যবোধজনিত শ্রদ্ধা নাই—যাহা রহিয়াছে ঐ বিদেশী ভাষা ইংরেজীর প্রতি। প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজ শাসনের ফলে যে অখণ্ড ভারত সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ স্থাপন এবং ভাবের আদান-প্রদানের ভাষারূপে ইংরেজী ভাষার অবদানের সুফল আমাদের জাতীয় জীবনে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং কয়েকটি মাত্র যুক্তি প্রদর্শনে ইংরেজী ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া সেই স্থলে হিন্দি ভাষাকে গ্রহণ করিতে অনেকেরই বাধিবে। যদি হিন্দিই রাষ্ট্রভাষা হয়, যদি হিন্দিকেই ইংরেজীর স্থলাভিষিক্ত করিতে হয় এবং আন্তঃপ্রাদেশিক কথোপকথনের বাহনরূপে ধরিয়া লওয়া যায়, তবে এক প্রদেশের উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে অন্য প্রদেশের অনুরূপ ব্যক্তির সহিত পত্রাদি বিনিময় অথবা আলাপাদি হিন্দিতে চালাইতে হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, একজন বাঙালী আই-সি-এস অথবা অধ্যাপক অথবা তদনুরূপ পদস্থ ব্যক্তিকে একটি মান্দ্রাজী সমতুল্য, সমপদস্থ ব্যক্তির সহিত অতঃপর সযত্নে ইংরেজী পরিহার করিয়া হিন্দিতে অনর্গল কথোপকথন ইত্যাদি চালাইতে হইবে। কিন্তু বাস্তবতার দিক হইতে ইহা সম্ভব নয়। বহু বৎসর পর্য্যন্তও ইহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। যত বড় উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিই হউন না কেন, বাঙালী বাঙালীর সহিত বাংলাতেই কথা বলিবেন, হিন্দুস্থানী হিন্দিতেই বলিবেন, মান্দ্রাজী নিজ ভাষাতেই বলিবেন। কিন্তু ভিন্ন প্রদেশের লোকের সহিত ঐরূপ ব্যক্তিগণ কথা বলিবার কালে দূর ভবিষ্যতেও হিন্দি ব্যবহার করিতে সম্মত হইবেন এইরূপ মনে হয় না। এই বাংলাদেশেই এখনও অনেক ক্ষেত্রে লোককে হিন্দির সাহায্যে কথা বলিতে দেখা যায় কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহারা হিন্দিতে কথা বলেন না। শুনিয়াছি এককালে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে বাংলাকে সযত্নে পরিহার করিয়া দেশীয় ভাষারূপে ছেলেমেয়েদিগকে হিন্দি শিখান হইত। কিন্তু আভিজাত্যসূচক ভাষারূপে সে সমাজে চলিত ইংরেজী। এই সমাজের অস্তিত্ব আজও লোপ পায় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও পাইবে বলিয়া মনে হয় না। ইঁহারা কাহারা তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক করে না। আজও ইঁহারা ইংরেজী বর্জ্জন করিবেন কিনা তাহাই বিবেচ্য।

অতঃপর বাংলা। বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার পক্ষে যত যোগ্যতাই থাকুক না কেন, বাংলা কদাপি রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হইতে পারিবে না—ইহা আমারা নিশ্চিতরূপে জানি। বাংলা এবং বাঙালীকে বাংলার বাহিরে যে কেহ আমল দেয় না ইহা সুবিদিত ঘটনা। কারণ যাহাই থাক বাঙালী আজ সর্ব্বভারতীয় ব্যাপারে স্থান হারাইতে বসিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বাঙালীর প্রতি প্রতিবেশী প্রদেশ আসামের আচরণের কথাই ধরা যাক। কেবলমাত্র বাঙালী বলিয়া শ্রীহট্ট এবারে গণভোটের সময় আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যথোচিত সহায়তা লাভ করে নাই এমন কথাও শুনা গিয়াছে। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে লিখিত এক-খানা ব্যক্তিগত পত্র হইতে এই সম্বন্ধে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"I also told you about the position of Sylhet. A very snoby treatment was meted to this district. The Congress Ministry was there. They did nothing and saw the fun. There had always been a grudge. Things would have been different had Mr. Bardolai interested himself."

ইহা ভিন্ন আসাম হইতে বাংলা ভাষাকে দূর করিবার প্রচেষ্টার অভাব নাই ইহাও সংবাদপত্রের খবর। অসমীয়ারা অনেকেই বাংলা জানেন, বহু শিক্ষিত অসমীয়া বাংলায় আসিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন বলিয়া উত্তমরূপে বাংলা ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন। বাংলা ও অসমীয়া ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্ত্তমান, বৈসাদৃশ্য অধিক নহে। তথাপি বাংলা ঐ প্রতিবেশী প্রদেশেই অচল। আর আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র দেশে বাংলাকে কেহ গ্রহণ করিবে ইহা অবাস্তব কল্পনা। অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের—যাঁহারা বাংলা কিছুমাত্র জানেন না বাংলা ভাষার সহিত যাঁহাদের ভাষার কোন সাদৃশ্য নাই, তাঁহাদিগকে বাংলা শিক্ষা করিতে ও রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা অসম্ভব তথা অসঙ্গত। সুতরাং বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা থাকিলেও বাংলা সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারিবে না।

ইহার পর সংস্কৃত। হিন্দি অথবা বাংলা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী অনেক বেশী। ইহার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই সহজে উঠিতে পারে না। ইহা ভারতের প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষার জননী। প্রাচীনত্ব, সমৃদ্ধি, আভিজাত্য ও সম্পদে এই ভাষা পৃথিবীতে অতুলনীয়। ডাঃ বি, এস, মুঞ্জের মতে,

"স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষার স্থান গ্রহণ করিতে পারে, এমন একটি মাতৃভাষা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত।"

ইহা ভিন্ন সংস্কৃত যদি রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হয় তবে

আপত্তি করিবার মত যুক্তি কোন প্রদেশই বিশেষ কিছু প্রদর্শন করিতে পারিবে না। সংস্কৃতের মর্য্যাদা ও মূল্য সার আশুতোষ বহু পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। একথা দেশবাসীর স্মরণ থাকিতে পারে সার আশুতোষ এক সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক বিষয়গুলিকে অবশ্যপাঠ্য তালিকা হইতে বাদ দিয়াছিলেন বলিয়া সমালোচনার পাত্র হইয়াছিলেন। দেশে যে-কোন উপায়ে অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার তাঁহার কাম্য ছিল বলিয়া শিক্ষার পথকে সকলের নিকট তিনি সুগম ও সহজ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাস, ভূগোলের ন্যায় অত্যাবশ্যক বিষয় বাদ দিলেও তাঁহার আমলে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল। তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না প্রবেশিকা বা বি-এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত পড়িলেও তথাকথিত মৃত ভাষা বলিয়াই হোক কিংবা ইহাকে দৈনন্দিন জীবনে এত অব্যবহার্য্য করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়াই হোক, কাজকর্ম্ম চালাইবার মত করিয়া সকলকে ইহাতে শিক্ষা দিয়া রাষ্ট্রভাষা রূপে চালানো শিক্ষা সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় না।

ইহা সকলেই জানেন আজও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংগ্রহের জন্য সংস্কৃত হইতেই শব্দ সংগ্রহ করা হয়। ইহা দ্বারা সকল সময়ে না হইলেও সময় সময় দুরূহ শব্দসমূহ সংগৃহীত হয় বলিয়া বাংলা ভাষার জটিলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়—"সেক্রেটারিয়েট" শব্দটির অনুবাদ করিয়া "সরকারী মহাকরণ" নামকরণ হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ। এই স্থলে বহুপ্রচলিত "সেক্রেটারিয়েট" শব্দটির রূপ-প্রকাশের জন্য ফারসি কিংবা আরবী এবং সংস্কৃত এই দুইটি ভাষার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই ভাবে বহু ইংরেজী শব্দকে, যাহা বাংলার ন্যায়ই আমরা গ্রহণ করিয়া লইয়াছি, যাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে আমাদের কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় না ও আমাদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত, তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী শব্দগুলিকেই গ্রহণ করিলে ভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে পারে। বিদেশী আরবী ফারসি শব্দও এইভাবে আমাদের ভাষায় মিশ্রিত হইয়াছে এবং ঐগুলিকে বর্জ্জন করিবার জন্য সংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ করা হয় নাই—উহার কল্পনাও কেহ কখনও করেন নাই। ইংরেজী বর্জ্জনের জন্য সংস্কৃতের সহিত আরবী ফারসির সহায়তা লইয়া এবং সেই সঙ্গে দেশীয় ভাষা জুড়িয়া এক "মডার্ণ উর্দ্দু" ভাষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন কি?

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজী ভাষার জটিলতা অন্তর্হিত হইয়াছে। অখণ্ড ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হিসাবে এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায়তা দ্বারা এই সমৃদ্ধিশালী বিদেশী ভাষা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া পারে নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও প্রবেশিকাতে বাংলাদেশে ইংরেজীই শিক্ষার বাহন ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন হইতে বাদ দেওয়ায় আমাদের দেশের ছাত্রগণের মেধা কিংবা কৃতিত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় বাংলা ও বাঙালী যত দিন ইংরেজী ভাষার সহায়তায় শিক্ষালাভ করিয়াছিল সমগ্র ভারতের প্রতিযোগিতায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে সময় বাংলা ও বাঙালী অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। যে শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজী সেই শিক্ষাই বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, রামানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইবার পর সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, দর্শনে, সাংবাদিকতায়, রাজনীতিতে আর এইরূপ বিদগ্ধ কৃতী সন্তানের উৎপত্তি বাংলায় শীঘ্র হইবার সম্ভাবনার সূত্রপাত এখন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই।

বিদেশী শাসকের ভাষা হিসাবে যাঁহারা ইংরেজী ভাষাকে বর্জ্জন করিতে চাহেন তাঁহাদের যুক্তি সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ইহা কেবলমাত্র বিদেশী শাসকেরই ভাষা ছিল কিনা তাহাই বিবেচ্য। বিদেশী শাসককুল ইংরেজী ভাষার সহায়তায় আমাদের দিয়া সাম্রাজ্য পরিচালনায় সম্পূর্ণ সহায়তা লাভ করিয়াছে ইহা নিতান্তই সত্য। শাসকের ইচ্ছায়ই হোক কিংবা অনিচ্ছায়ই হোক আমরা যে ইংরেজী শিক্ষার সহায়তায় প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইয়াছি সে বিষয়ে মতবিরোধ থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"However wrongly English language made its way in our life, the fact remains that it has influenced our mental and educational outlook for the past 150 years. This state of affairs though harmful in some ways has also benefited us in many ways. We have to acknowledge it without reservation. The English language has been responsible for creating a bond of mental fellowship in all the educated Indians from Kashmir to Cape Comorin. It is connecting link between all the provincial governments, universities, legislative assemblies, public platforms and national organisations. Through English, India cultivated direct-intellectual relationship with Europe and America. Her voice reached the outer world without any intermediary. I do not feel slightest hesitation in saying that India's position and recognition in the international world are greatly due to our having recourse to English languages, written and spoken."

(অমৃতবাজার পত্রিকা—২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৭)। অন্যত্র তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করা গেল :—

"By Indian nationalism it is not meant that we should forget the English language and literature and that we should have nothing to do with Milton or Shakespeare."

(অমৃতবাজার পত্রিকা—২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৭)

ইংরেজী ভাষা সম্পূর্ণরূপে অথবা অংশতঃও বর্জ্জন করিলে আমাদের দেশে একটি নূতন "ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর" উদ্ভব হইবে। কারণ কেবল বাংলায় নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে এইরূপ এক-শ্রেণীর অভিভাবক আছেন যাঁহারা তাঁহাদের সন্তানসন্ততি-গণকে ইংরেজী ভাষা এমন কি ইংরেজী কায়দাও সর্ব্বান্তঃকরণে শিক্ষা দিবেন। ইংরেজী ভাষার আভিজাত্য, ইহার আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা এবং প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রেও বিদেশী শিক্ষা গ্রহণে ইহার উপযোগিতা ইত্যাদি কারণে ঐ সকল সম্পন্ন অভিভাবক শ্রেণী কেবলমাত্র নিজ মাতৃভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দি ইত্যাদি সন্তানদিগকে শিক্ষা দিয়াই বিরত ও সন্তুষ্ট থাকিবেন না। এইরূপ অভিভাবকের সংখ্যা এদেশে নগণ্য নহে, এমন কি নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তিও এইরূপ অভি-ভাবকের শ্রেণীতেই পড়িবেন। আজও ইংরেজ পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে ভর্ত্তির জন্য বহু অভিভাবক পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত "ওয়েটিং-লিষ্টে" ছেলেমেয়েদের নাম রাখিয়া অপেক্ষা করেন বলিয়া শুনিয়াছি। এইরূপ একটি শ্রেণী থাকার দরুন দেশীয় ভাষার সহায়তায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা ইংরেজী ভাষার সহায়তায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বি-তার ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ লাভ করিবে; বিশেষতঃ আজ পৃথিবী ছোট হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঘরে রাখিয়া, ঘরে বসাইয়া "মানুষ" না করিয়া "বাঙালী" করিয়া রাখিতে এবং থাকিতে অনেকেই চাহিবে না। এক শ্রেণীর লোক বহির্জগতের কাজ, বড় কাজ, আন্তঃপ্রাদেশিক কাজ যখন একচেটিয়া করিয়া লইবে, অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অবস্থার লোকেরা সুযোগের অভাবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও কেবলমাত্র দেশীয় রাষ্ট্রভাষায় শিক্ষিত হইয়া কাজকর্ম্ম পরিচালনা করিতে অভ্যস্ত হওয়ায়, অলক্ষ্যে জাতীয় জীবনে ঐ নূতন "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের" সৃষ্টি হইবে। সমাজগত অথবা শিক্ষাগত কোন ক্ষেত্রেই আর "ব্রাহ্মণ্যের" প্রয়োজন নাই।

একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইংরেজী ভাষাকে আমরা পরিহার করিতে চাই বিদেশী শাসকের, তথা বিদেশী ভাষা বলিয়া। ইংরেজী ভাষাকে বিদেশী ভাষা বলার মধ্যে ভুল রহিয়াছে। ইংরেজী সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা। ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাগোষ্ঠীকে সাতটি গ্রুপ অথবা বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ জর্মান পণ্ডিতগণ সে গ্রুপকে ইণ্ডো-জার্ম্মান গ্রুপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; উহা ব্যাপক নহে মনে করিয়া অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এই গ্রুপকে ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান (Indo-European) গ্রুপ আখ্যা দিতে চাহিয়াছেন। Inflected language অথবা বিভক্তিযুক্ত ভাষা হিসাবে ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান গ্রুপের ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের আদি জননী যে সংস্কৃত তাহা এক ভাষা হইতে ভাষার রূপান্তর প্রদর্শন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পণ্ডিতগণ প্রমাণিত করিয়াছেন। এই হিসাবে ইংরেজী ভাষা সুদূর অতীতে সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন একটি ভাষা; সুতরাং ইহা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ভাষা নহে। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত যে-কোন দেশীয় ভাষা যে-কোন যুক্তির বলে যদি রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে, তবে দুই শত বৎসর ব্যাপী জাতীয় জীবনে অঙ্গাঙ্গি ভাবে বিজড়িত, বিবিধ উন্নতির উৎস, সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত ইংরেজী ভাষার রাষ্ট্রভাষা থাকিতে আপত্তি কি? ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা ভাষাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। ইংরেজী সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত নীচে দেওয়া গেল :—

. . . "At the same time," Dr. Mookerjee continued, "the place of English in our system of education must also be carefully decided. The decision must be taken, not from any political standpoint but purely in relation to needs of India's national development and her international contacts. In fact, our universities must provide fuller facilities to our students for learning the *great language of the world* so that they may readily gather the highest treasure of thought in the dominion of letters and sciences." (*Italics mine*).

(অমৃতবাজার পত্রিকা—২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪৭)

আমরা বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। হুজুগ আমাদের প্রিয় সামগ্রী। এই হুজুগে একবার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কেও "গোলামখানা" বলিয়া বয়কট করিয়াছিলাম। সেদিন উপলব্ধি না করিলেও পরে লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয় বর্জ্জন করিবার বস্তু নহে। এক দিন লোকে ইহাও বুঝিবে ইংরেজী ভাষা পরিবর্জ্জনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। মৌলানা আজাদের মতে "Instead of small cooked up nationalism the world wants to build super-nationalism." নর্ম্মান বিজয়ের পর বহুশত বৎসর পর্য্যন্ত ফরাসী ভাষা ও সভ্যতা ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে ওত-প্রোত ভাবে বিজড়িত ছিল। শতবর্ষের যুদ্ধের ফলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপে ফরাসী সভ্যতা ও ভাষা ইংরেজ জাতীয় জীবন হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। দূর ভবিষ্যতে হয়ত যুদ্ধ ছাড়াও এই-রূপ প্রয়োজনের তাগিদ উপস্থিত হইবে তখন যাহা কিছু বিদেশী তাহা সমস্তই স্বতঃই বিদায় গ্রহণ করিবে। জবরদস্তি করিয়া, সংকীর্ণ জাতীয়তার দোহাই দিয়া, হুজুগে মাতিয়া এখনই ইংরেজী বর্জ্জনের সময় আসে নাই। কারণ nationalism অপেক্ষা super-nationalismই আজ আমা-দের তথা সমগ্র জগতের কাম্য।*

* লেখিকা এখানে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে যে-সব যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, কোন বিদেশী ভাষা বা মৃত ভাষা স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না। দেশের কোন চলতি ভাষা—যে ভাষা অধিকাংশ লোকের নিকট সহজবোধ্য, রাষ্ট্র-ভাষা হইবার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, বর্ত্তমানে যে ইংরেজী বর্জ্জনের ধুয়া উঠিয়াছে তাহাও অসমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি।

—প্রবাসীর সম্পাদক।

ভারতীয় চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথের স্থান

শ্রীঅনিলকুমার আচার্য

সাহিত্য ও শিল্পকলার আমরা প্রত্যেকেই এক এক জন বড় সমঝদার, যেমন সমঝদার আমরা অভিনয়কলার ও রাজনীতির। আমরা আমাদের নিজস্ব মতবাদকেই প্রামাণ্য মনে করে অন্তের মতামতকে চাই উড়িয়ে দিতে; আর তার ফলেই সৃষ্টি হয় যত বাদানুবাদের।

কিন্তু সাহিত্য বা চিত্রশিল্পের—শুধু সাহিত্য বা চিত্রশিল্প কেন—যে-কোন শিল্পেরই বিচারে এরূপ স্বৈরাচার চলে না। আমাদের অন্যান্য মানসিক বৃত্তিসমূহের মত রুচির উৎকর্যও শিক্ষা আর অনুশীলন সাপেক্ষ। রুচি শিক্ষিত ও মার্জিত না হলে কলাশিল্পের বহুমুখী প্রকাশ ও আবেদন সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা প্রায় অসম্ভব।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতি আজও প্রধানতঃ পরীক্ষা পাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাশীকৃত পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করে কোন রকমে একবার পরীক্ষাগৃহে উদ্গীরণ করতে পারলেই হ'ল, কিন্তু জীবনের সঙ্গে আমাদের এই শিক্ষার সংযোগ কোথায়? কোথায় মানুষের সুকুমার বৃত্তি ও রুচিসমূহের বিকাশের ব্যবস্থা? প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি অবজ্ঞা-পরায়ণ মেকলে-প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষা থেকে আমরা অনেক কিছু লাভ করেছি সন্দেহ নেই; কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, ঐ শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজের বাণিজ্য-বিস্তার ও সাম্রাজ্য-পরিচালনার প্রয়োজনে। প্রকৃত শিক্ষার তাগিদ তার মধ্যে খুব কমই ছিল। পরিণামে আমরা যে পরিমাণে শিক্ষালাভ করলাম সে পরিমাণে বিদ্যা বা জ্ঞানলাভ আমাদের হ'ল না এবং যা-কিছু ভারতীয় তার প্রতি আমরা উপেক্ষা-পরায়ণ হয়ে উঠলাম।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নব জাতীয়তা-বোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আত্মোপলব্ধির এক ক্ষীণ প্রবাহ জাতির জীবনে দেখা দিলে এবং কালক্রমে বঙ্গভঙ্গ ও অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রগতির সঙ্গে তা বর্তমানে বিরাট্ পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু আত্মোপলব্ধির এই ধারা শুধু জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও ভাস্কর্যের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধাবান করে তুলেছিল।

অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয়তা-বোধ যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছিল সত্য; কিন্তু চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে আমরা পরমুখাপেক্ষীই ছিলাম। বিজাতীয় শিক্ষার কুফল আমাদের চিত্রশিল্পের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে আমাদের দেশের চিত্রশিল্পীদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, ভারতবর্ষে কোনকালে সভ্যসমাজোচিত শিল্পমান ছিল না—ইউরোপই হ'ল চিত্রশিল্পের প্রকৃত বিকাশভূমি, আর গ্রীসীয় ও ইতালীয় চিত্রশিল্পই হ'ল কলানৈপুণ্যে ও শিল্পমানে প্রকৃত রসোত্তীর্ণ। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের চিত্র-কলাবিদ্‌গণ ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের আদর্শে ও পদ্ধতিতে চিত্ররচনায় মনোনিবেশ করলেন। জাতীয় জীবনের সহিত সংযোগবিহীন এই অনুকারিতার ফল সহজেই অনুমেয়।

ইউরোপীয় চিত্রের ব্যর্থ অনুকৃতি যখন দেশের রুচিকে এভাবে বিকৃত ও পঙ্গু করে তুলছিল সেই যুগসন্ধিক্ষণে অবনীন্দ্র-নাথের আবির্ভাব। নূতন মতবাদ, নূতন আদর্শ, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী ও চিত্রের অভিনব উপজীব্য নিয়ে শিল্পীদের আসরে তিনি অবতীর্ণ হলেন। অতীতের গৌরবময় যুগে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের মধ্য দিয়েও ভারতের বিশিষ্ট বাণীটি আত্মপ্রকাশ করেছিল—অল্প কথায় এটাই হ'ল অবনীন্দ্রনাথের মত।

তিনি প্রথমতঃ পামার ও গিলহার্ডির নিকট থেকে ইউ-রোপীয়, বিশেষ করে ইতালীয়, চিত্রবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু এক দিন ঠাকুরবাড়ীর বিরাট্ গ্রন্থাগারে পুরনো এক ইন্দো-পার্শিয়ান পাণ্ডুলিপির চমৎকার বর্ণ-সমারোহ তাঁর সমস্ত হৃদয়কে এক মুহূর্তে জয় করে নিলে; তিনি যেন এক নূতন শিল্পরাজ্যের সন্ধান পেলেন। সেটা উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকের ঘটনা। তারপর থেকে অবনীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির উন্নতিবিধানে স্বকীয় প্রতিভা নিয়োজিত করলেন। প্রথম প্রথম হয়ত প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত অবনীন্দ্র-নাথের চিত্রগুলো অনুকরণের দোষমুক্ত হয় নি; কিন্তু দেশের নাড়ীর সহিত সংযোগবিহীন ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রভাব থেকে মুক্ত করে তাকে আমাদের জাতীয় জীবনের গঙ্গোত্রীর পুণ্য প্রবাহের সহিত মিলিত করার এই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সৌভাগ্যক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ই বি হ্যাভেলের (তিনি তখন গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন) সাহচর্যে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনে অসামান্য সফলতা লাভ করলেন। আজ অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভা জগদ্-বিখ্যাত; শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। চিত্রকলায় জাতীয় ভাব-অভ্যুদয়ের যে পরীক্ষা ও আন্দোলন তিনি আরম্ভ করেছিলেন, তা সামান্য বীজ থেকে তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়ে আজ বিরাট্ মহীরুহে পরিণত। শিল্পীর এই নব ভাবদ্যোতনায় অনুপ্রাণিত

প্যালেষ্টাইন সীমান্তের দৃশ্য
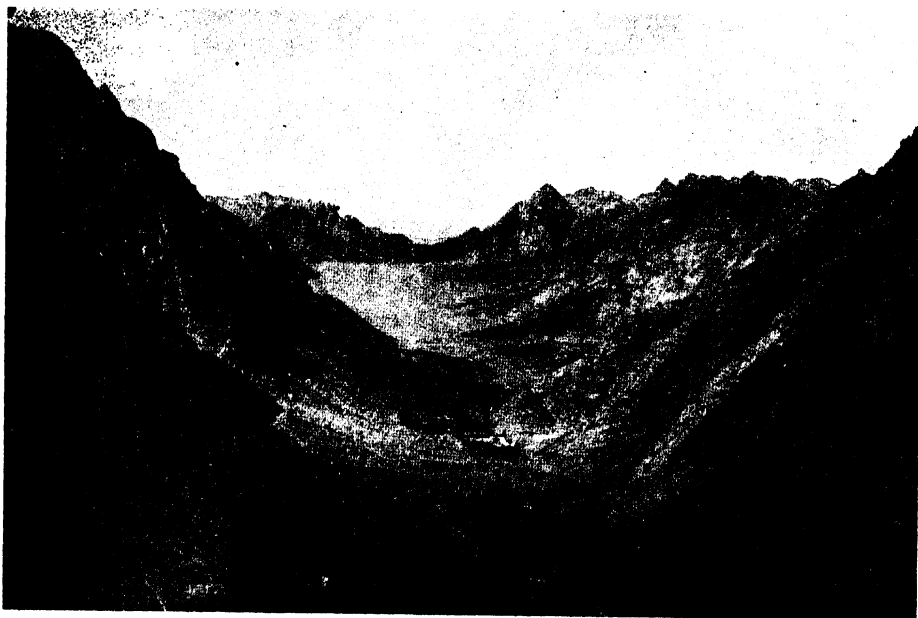
ওয়াডি এও ডেইর নামক পার্ব্বত্য অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় মঠ—কনভেণ্ট অব সেণ্ট ক্যাথারিন

মাউণ্ট সিনাইয়ের উপর প্রাকারবেষ্টিত কনভেণ্ট অব সেণ্ট ক্যাথারিন

নিউইয়র্ক টাউন হলে আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিপূজা
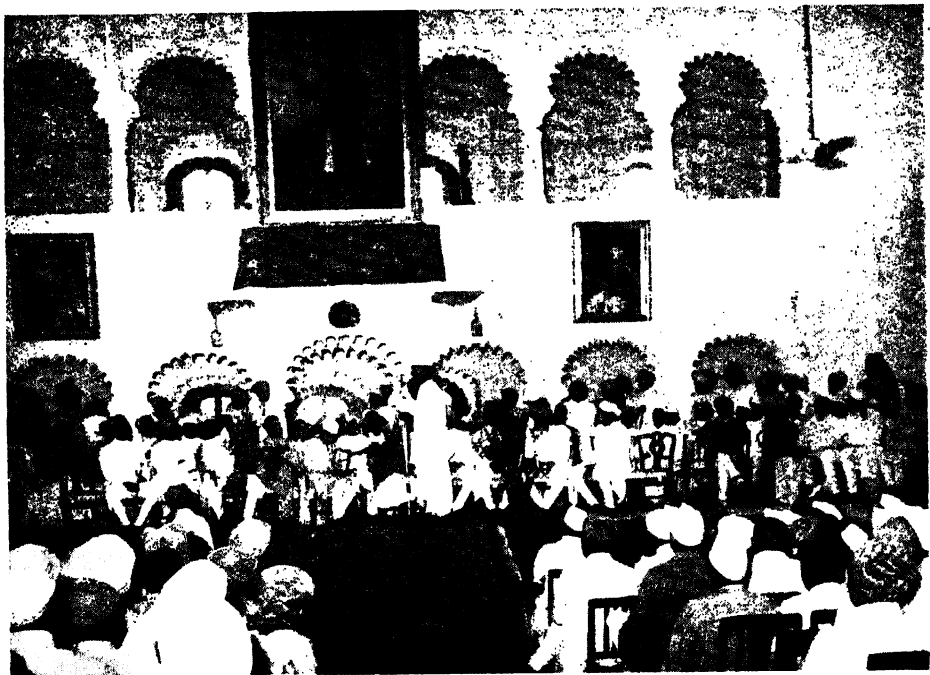
পুনর্গঠিত রাজস্থান ইউনিয়নের সভায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর উপস্থিতিতে উক্ত ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন

হয়ে নন্দলাল প্রমুখ কতিপয় শিল্পপ্রতিভাসম্পন্ন যুবক এগিয়ে এলেন অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে; আজ সমগ্র ভারতে শিষ্যপরম্পরায় তিনি পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত। ভারতের যে-কোন অংশে যে-কোন আর্ট স্কুলে আজও অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী এবং তাদের সে পদাধিকার নিছক শিল্পপ্রতিভারই বলে।

অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত চিত্রগুলো আমাদের জাতীয় সম্পদ। তাঁর 'শাহজাহানের দেহত্যাগ,' 'অশোক-মহিষী', 'শাহজাহানের তাজ নির্ম্মাণের স্বপ্ন', 'কচ ও দেবযানী,' 'ভারতমাতা,' 'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'অভিসারিকা,' 'পূজারিণী,' 'নির্ব্বাসিত যক্ষ,' 'দেবদাসী,' 'ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত,' 'আলমগীর', 'মহাপ্রস্থান' প্রভৃতি চিত্রগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রসমূহের সমতুল্য। আজ দেশ স্বাধীন; আশা করা যায়, আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট জাতীয় মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রনিচয়কে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাবলী চিরকাল শিল্প ও সাহিত্যানুরাগীদের অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হয়ে থাকবে।

অবনীন্দ্রনাথের এক শিষ্য বলেছিলেন,

"This orientation in the life of Abanindranath has effected what the Renaissance did for Europe. Abanindranath's works created an awakening to a new understanding of Art reflecting itself in all branches of national progress; in sculpture, architecture and literature as well."

এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনমনের মোড় ফিরিয়েছেন স্বদেশের প্রতি, আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের প্রতি; আর অবনীন্দ্রনাথ দেশমানসকে ফিরিয়েছেন বিদেশী সংস্কৃতির অনুকারিতা হতে দেশের অতীত গৌরবময় সংস্কৃতির সচেতনতা লাভের মধ্য দিয়ে দেশের শিল্প-সাধনার প্রতি, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতি। অথচ অবনীন্দ্র-নাথের শিল্পসাধনা শুধু পুরাতনের জয়গানই নয়; জীবনের সহিত, দেশমানসের সহিত এর সংযোগ অবিচ্ছেদ্য।

অরণ্য

শ্রীপার্থপ্রতিম দে

হে অরণ্য—আজো কেন নির্বাক্ নিশ্চল!
কেন আজো পর্বতের অন্তরের ভাষা,
তার চিরবিরহের রুদ্ধ অশ্রুজল
জীবনের অবরুদ্ধ আশা,
ভাঙ্গিয়া টানিয়া আনি' বাহির-আলোকে
মুক্ত করিছ না;
কেন এই বিশ্ব হতে সহস্র বেদনারাশি,
পলে পলে তিলে তিলে অবিশ্রান্ত শোকে
আমাদের আত্মামাঝে উঠিছে উদ্ভাসি
জাগিছে না গীতি মূরছনা!

কেন এই অপমান-জর্জরিত ভারত-জীবন
মুহুর্মুহু উঠিছে কাঁদিয়া;
বারে বারে, কেন তারে তুমি
অক্ষত আশার মাঝে
রাখ নি বাঁধিয়া;
জীর্ণতর করিতেছ দুরন্ত স্বপন,—
কলঙ্কিত করিতেছ তার জন্মভূমি;
টানিয়া নিতেছ নাকো শ্রেষ্ঠতম কাজে!
একটি আত্মার মাঝে যদিও বা হায়,
কোনো দিন কোনো ভুলে,
ব্যাকুল বাঁশরী তব দিয়েছিলে তুলে,
না জানাতে জগৎ-জনায়,
না জাগাতে সুর,
তুমি তারে নিয়েছ কাড়িয়া নিঠুর!

তোমার যে ভাষা আছে সে কি নয়
জীবনের চিরন্তু বিশ্বাস;
সে কি নয় মানুষের মৃত্তিকার পূর্ণ পরিচয়!
সে কি শুধু ব্যর্থতায় পবনে পবনে
ছড়াইবে শুধু পরিহাস,
সে কি এই নীলোজ্জ্বল গগনে গগনে
উড়াবে না সোনার অঞ্চল,
মোছাবে না আমাদের দুঃখ-আঁখিজল!
ভাঙ্গ তুমি—ভাঙ্গ ভারতের
পর্বতের গোপন 'ভিলাষ,
ভাঙ্গ তুমি জরা-জীর্ণ যৌবনের
পরম বিলাস।
শাখা তব ছুঁড়ে ফেলে দাও—জীর্ণপত্র ভাসাও ভেলায়;
চলে যাক্, মুছে যাক্—ভুলে যেতে দাও
জীবনের শেষ-হওয়া রিক্ত সাধনায়।

আপনারে পূর্ণ করে নাও।
বসন্তে নূতন হয়ে জাগো তুমি
কথা কও অনাদি বিস্ময় নিয়ে বুকে,
অনন্ত তমিস্রা হতে মোর জন্মভূমি
অখণ্ড আলোর কক্ষে জাগুক উৎসুকে।

প্যালেষ্টাইনের সমস্যা

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আরবের উত্তর-পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের উত্তর-পূর্ব্ব তটে প্যালেষ্টাইন অবস্থিত। এই প্যালেষ্টাইনের প্রধান শহর জেরুজালেম। জেরুজালেমের নিকটে বেথেলহাম নামক গ্রামে যীশুখ্রীষ্ট
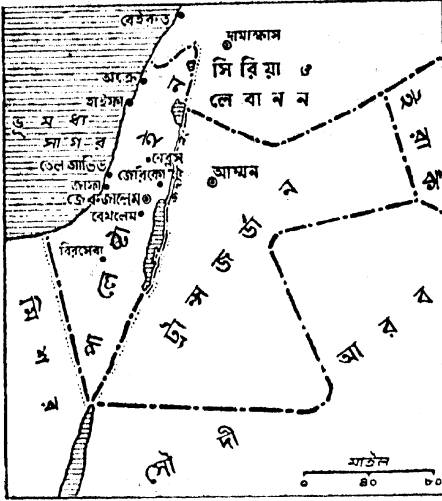
জন্মগ্রহণ করেন। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহুদীদের পূর্ব্বপুরুষরাই ছিল এই ভূমিখণ্ডের অধিবাসী ও অধিপতি। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তারা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাহারা তাহাদের প্রাচীন জন্মভূমির স্মৃতি ভুলিতে পারে নাই। তাহাদের এই আবাসভূমিতে তাহারা ফিরিয়া আসিবে এ আশা তাহারা কোন দিন ছাড়িতে পারে নাই। উয়েজম্যান নামে একজন ইহুদী বৈজ্ঞানিক গত প্রথম মহাযুদ্ধে একটি আসন্ন অভাব মিটাইতে ব্রিটেনকে সাহায্য করেন। তাহারই পুরস্কারস্বরূপ তিনি প্যালেষ্টাইনে 'ইহুদীস্থান' গঠন করিবার দাবি করেন। ১৯১৭ সালে ব্রিটেন এই দাবি স্বীকার করিয়া লন। সেই সময় হইতেই আরবদের সহিত ইহুদীদের বিরোধের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় মহাসমরের প্রারম্ভে হিটলার যখন ইহুদীদলন আরম্ভ করেন তখন তাহারা জার্ম্মানী হইতে পলাইয়া প্রধানত এই প্যালেষ্টাইনেই আসে। গত বিশ বৎসরে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা আশী হাজার হইতে ছয় লক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইউরোপ হইতে আরও পাঁচ লক্ষ ইহুদী প্যালেষ্টাইনে চলিয়া আসিতে চায়।

এই প্যালেষ্টাইনের মরুভূমিতে তাহারা বহু শস্যশ্যামল কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। এই দুই হাজার বৎসরে আরবেরা কিছুই করিতে পারে নাই।

প্রথম ইউরোপীয় মহাসমরের পর প্যালেষ্টাইন ব্রিটিশের রক্ষণাবেক্ষণে আসে অর্থাৎ ব্রিটিশের mandated territory হয়। ব্রিটিশ বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া সে দেশ শাসন ও শোষণ করিয়া আসিতেছে।

সুইজারল্যাণ্ডের বাজ্‌ল (Basle) শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইহুদী-কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর উয়েজম্যান তাঁহার অভিভাষণে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের দাবী করিয়াছেন। তিনি হার্ব্বার্ট মরিসনের প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসিত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্যালেষ্টাইনের উপর ম্যাণ্ডেটরী ক্ষমতা পরিত্যাগের পূর্ব্বে ইহুদীদের জাতীয় আবাসকে জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া দেওয়া ব্রিটেনের কর্ত্তব্য, ইহাই তাঁহার দাবী। ব্রিটেন এমন কি ব্রিটেন-আমেরিকা উভয়ে মিলিয়াও তাঁহার এই দাবী নির্ব্বিরোধে পূরণ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হইতেছে না। হিটলারের পতন হইলেও তাঁহার প্রচারিত ইহুদী-বিদ্বেষ
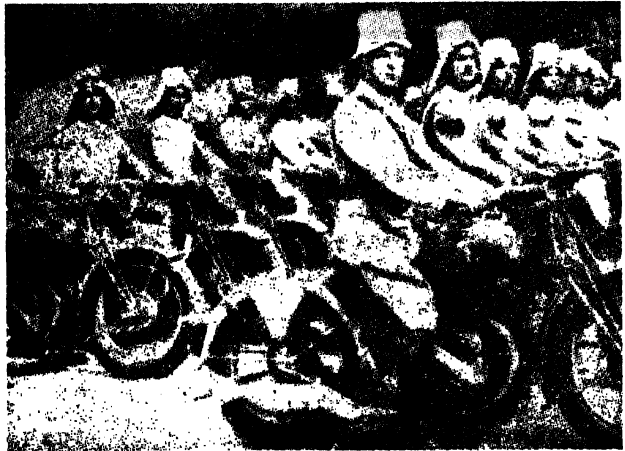
মোটরসাইকেল আরোহী মিশরীয় সৈন্যদলের প্যালেষ্টাইন আক্রমণের তোড়জোড়

মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে পূর্ণ মাত্রায়ই বর্ত্তমান আছে। প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে তদন্তের জন্ত গঠিত ইঙ্গ-মার্কিন কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে স্বীকার করিয়াছিলেন যে উদ্বাস্ত ইহুদীরা তাহাদের সম্পত্তি পুনরায় পাইবার চেষ্টা করিবার ফলে বিদ্বেষ সৃষ্টি হইতেছে এবং মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে ইহুদী-বিদ্বেষ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থার জন্ত ইহুদীরা বিশ্ববাসী সকলের সহানুভূতি পাইবার যোগ্য। কিন্তু প্যালেষ্টাইন জনবিরল দেশ নয়। ইহুদীদের এখানে অধিকতর সংখ্যায় বসবাসে আরবদের সমূহ ক্ষতি ও অসুবিধার সম্ভাবনা।

পরে প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীদের বাসভূমিতে পরিণত করিবার প্রসঙ্গ লইয়া নিউইয়র্কে জাতিসঙ্ঘে আলোচনা আরম্ভ হয়। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সাতটি শক্তির প্রতিনিধি লইয়া একটি তথ্য সংগ্রহ কমিটি গঠন করা হয়। তাহাতে গত সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে এই কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হয়। ইঙ্গ-মার্কিন দল প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিয়া সেখানে পরোক্ষে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা জাতিসঙ্ঘের সেই অধিবেশনে তিনটি চাল চালিয়াছিলেন। প্রথম, প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত আলোচনা সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা হঠাৎ আরবদের জন্ত দরদী হইয়া উঠেন এবং ইহুদীদের বক্তব্য শুনিতে আপত্তি করেন। কোনরূপে একটি কমিটি খাড়া করিয়া নিজেদের মনোমত রিপোর্ট গ্রহণ করা এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্যালেষ্টাইন বিভাগ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ আসফ আলি এবং সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ গ্রোমিকো এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া সফল হন। এইরূপে ইঙ্গ-মার্কিনের প্রথম চাল ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, তথ্যসংগ্রহ কমিটির আলোচ্য বিষয়ে প্যালেষ্টাইনে

আরবদিগকে যুদ্ধে আহ্বান

লেবাননের নিকটে অশ্বারোহী সিরিয়ান সৈন্যদল
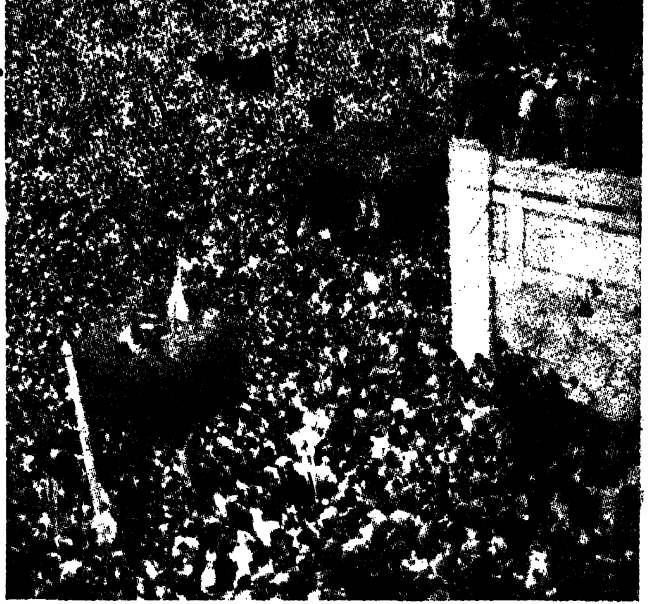
স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রশ্নটি বাদ দিবার জন্ত ইঙ্গ-মার্কিন দল জিদ করেন। মিঃ আসফ আলি ও মঃ গ্রোমিকোর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ভোটের জোরে ইঙ্গ-মার্কিন দলের এই চাল সফল হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, ইঙ্গ-মার্কিন দল প্যালেষ্টাইনের ব্যাপার হইতে সোভিয়েট রাশিয়াকে দূরে রাখিবার জন্ত প্রস্তাব করেন যে,তথ্য সংগ্রহ কমিটিতে বৃহৎ পাঁচটি শক্তির কোন প্রতিনিধি থাকিবে না। রাশিয়াকে বাদ দিয়া তাহাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মধ্য হইতে সাতটি রাষ্ট্র লইয়া কমিটি গঠন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রিটিশ ও মার্কিন প্রতিনিধি কমিটিতে না থাকিলেও এই তাঁবেদাররা যে তাঁহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিবে তাহা নিশ্চিত। দুঃখের বিষয়, মিঃ আসফ আলি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শেষ পর্য্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন দলের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাতটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লইয়াই কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির অধিকাংশ সদস্য প্যালেষ্টাইনকে ইহুদী রাষ্ট্র ও আরব রাষ্ট্রে বিভাগের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এই কমিটিতে সংখ্যালঘিষ্ঠগণ প্যালেষ্টাইনকে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার সুপারিশ করে। ইহুদীরা এই তদন্ত
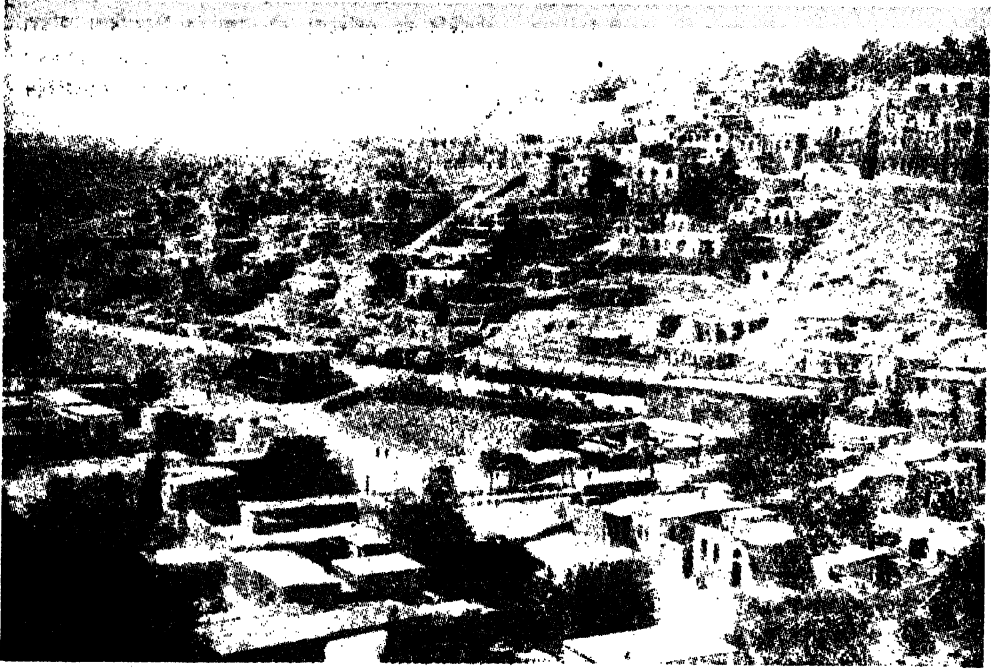
রাজা আব্দুল্লার রাজধানী আম্মন

কমিটির সংখ্যালঘিষ্ঠ রিপোর্ট কিছু সংশোধন করা হইলে মানিয়া লইতে রাজী আছেন—একথা জানাইয়া দেন। কিন্তু আরবরা জানান যে তাহারা প্যালেষ্টাইন বিভাগ কিছুতেই মানিয়া লইবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করেন যে, জাতিসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত আরব ও ইহুদী উভয়পক্ষ মিলিয়া মানিয়া না লইলে ব্রিটেন ম্যাণ্ডেট পরিত্যাগ করিবে এবং প্যালেষ্টাইন হইতে ব্রিটিশ সৈন্য সরাইয়া লইবে। ব্রিটিশ সৈন্য সরাইয়া লইলেই পার্শ্ববর্ত্তী আরব রাষ্ট্রসমূহ হইতে প্যালেষ্টাইনে যাহাতে অভিযান চলে তাহার আয়োজন হয়। প্যালেষ্টাইন রক্ষার জন্য দামাস্কাসের উপকণ্ঠে পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। ব্রিটিশ সৈন্য প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ করিলে অনেক ব্রিটিশ অফিসার স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে প্যালেষ্টাইনে থাকিয়া আরবদিগকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১ই অক্টোবর এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া প্যালেষ্টাইন কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী প্যালেষ্টাইনকে আরব ও ইহুদী রাষ্ট্রে বিভক্ত করার এবং প্যালেষ্টাইনে ইহুদী গমনের পরিকল্পনার সমর্থন করেন। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিবার জন্য আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী গঠনেরও প্রস্তাব করেন।

প্যালেষ্টাইনের এই আসন্ন বিপ্লবের জন্য দায়ী ব্রিটিশ। তাঁহারাই সেখানে লক্ষ লক্ষ ইহুদী আমদানী করিয়াছেন। আরব ও ইহুদী উভয় পক্ষকে বিবদমান করিয়া তুলিয়া ব্রিটিশ প্যালেষ্টাইন হইতে সরিয়া আসিতে চাহিতেছেন। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানে প্রবল বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বিবদমান করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষকে ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্থানে বিভাগ করিয়া ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ভান করিয়াছে কে তাহা আমরা অবগত আছি। একই নীতি কি উভয় দেশেই প্রযুক্ত হয় নাই ?

জাতিসঙ্ঘের পক্ষ হইতে এখন কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্ট অনুযায়ী প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জেরুজালেম স্বাধীন নগরী হইবে। সোভিয়েট রাশিয়াও প্যালেষ্টাইনকে বিভাগ করিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন। রুশ প্রতিনিধি কমিটিতে বলেন যে, ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইনে তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্র গড়িয়া তোলার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। তাহার কারণ হয়ত ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটের অধীনস্থ এই দেশে সোনা ফলে। সোনা ফলায় আরবেরা, তার রসদ জোগায় এক শ্রেণীর ইহুদী মারফত আমেরিকা, সেই সোনা পরিবেশিত হয় অন্য অন্য দেশের বাজারে। আরবেরা চাষের মালিক হইলেও শস্যের মালিক নয়। ব্রিটিশ

প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রতিবাদে কায়রো অপেরা হাউসের সম্মুখে সমবেত জনতা

এই প্যালেষ্টাইন লইয়া বহু খেলা খেলিয়াছে। তাহারা একবার আরবদের ভরসা দিয়াছে, একবার ইহুদীদের আশ্বাস দিয়াছে। এই ভাবে এই দুই জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও বিবাদ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। প্যালেষ্টাইনে এই বিবাদে এক দিকে আরব ও ইহুদী এবং অন্যদিকে ব্রিটেন ও আমেরিকা। ব্রিটেন ও আমেরিকা ছাড়া রাশিয়ার কোন স্বার্থ নাই। যে সোভিয়েট রাশিয়া প্রত্যেক জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়াছে, সেই জাতিগুলিকে নিজ নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছে, তাহার পক্ষে এক জাতির ধ্বংস সমর্থন করা বা এক জাতির উপর আর এক জাতির অবাধ প্রভুত্ব স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাই তাহারা প্যালেষ্টাইনে যেমন আরবদের অধিকার স্বীকার করিয়াছে, তেমনি ইহুদীদেরও অধিকার স্বীকার করিয়াছে। তবে সোভিয়েটের চেষ্টায় ব্যবস্থা হইয়াছে যে এই বিভাগ করিবার কাজ জাতিসঙ্ঘ সম্পন্ন করিবে; অন্তর্বর্ত্তীকালে প্যালেষ্টাইনে কর্ত্তৃত্বও থাকিবে জাতিসঙ্ঘের, ব্রিটেনের নহে। ইহুদী ও আরব রাষ্ট্র যাহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়, সেজন্যও সোভিয়েট রাশিয়া সুস্পষ্ট দাবি করিয়াছে। ব্রিটেন প্যালেষ্টাইনে তাহার ম্যানডেট ত্যাগ করিবে; অক্টোবর মাসের মধ্যে তাহার সমস্ত সৈন্য অপসারিত হইবে। কিন্তু আমেরিকা প্রস্তাব করিয়াছিল ১লা যে তারিখে উভয় রাষ্ট্রকেই স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। অথবা প্রয়োজন হইলে জাতিসঙ্ঘ কমিশন স্বাধীনতার জন্য অন্য কোন তারিখ ধার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু এই তারিখ ১লা মের পূর্ব্বে অথবা ১লা জুলাই-এর পর ধার্য্য হইতে পারিবে না। কিন্তু প্রধান সমস্যা রহিয়াছে প্যালেষ্টাইন বিভাগ কার্য্যকরী করার ভার নিরাপত্তা পরিষদের উপর অর্পণ সম্বন্ধে। এরূপ ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি। এদিকে প্যালেষ্টাইন হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত হইবার পরই প্যালেষ্টাইন আক্রমণের জন্য সিরিয়া, লেবানন, মিশর এবং ট্রান্সজর্ডনের সৈন্যবাহিনী প্যালেষ্টাইন সীমান্তে সমবেত হইয়াছে বলিয়া আরব লীগের সেক্রেটারী-জেনারেল আবদুল রহমান আজম্ সংবাদ দিয়াছেন। ইরাক ও সৌদী আরবের সৈন্যবাহিনীও ইহাদের সহিত যোগদান করিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্যালেষ্টাইন রক্ষার ভার গ্রহণ না করে, তবে প্যালেষ্টাইনে এক বিপুল রক্তক্ষয়কারী সংঘর্ষ ঘটিবে। ইহুদী এজেন্সির একটি সৈন্য-বাহিনী আছে। উহা হাগানা নামে পরিচিত। ইরগুন্, জুউই লিউমি নামে ইহুদীদের আর একটি প্রতিষ্ঠান আছে। প্যালেষ্টাইনের বর্ত্তমান বিদ্রোহে ইহারাই গরিলা যুদ্ধ করিতেছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব-উপকূলে একটি যুগ পরিবর্ত্তনের সূচনা হইতেছে।

সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্যালেষ্টাইন কমিটির বৈঠকে পাকিস্থানের প্রতিনিধি দলের নেতা সর মহম্মদ জাফরুল্লা খান্ ১১৫ মিনিট কাল ধরিয়া প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার মূলকথা ছিল যে প্রস্তাবিত প্যালেষ্টাইন বিভাগ পরিকল্পনা বাস্তব ও ভৌগোলিক দিক দিয়া অসম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, প্যালেষ্টাইন বিভাগের ফলে দুইটি
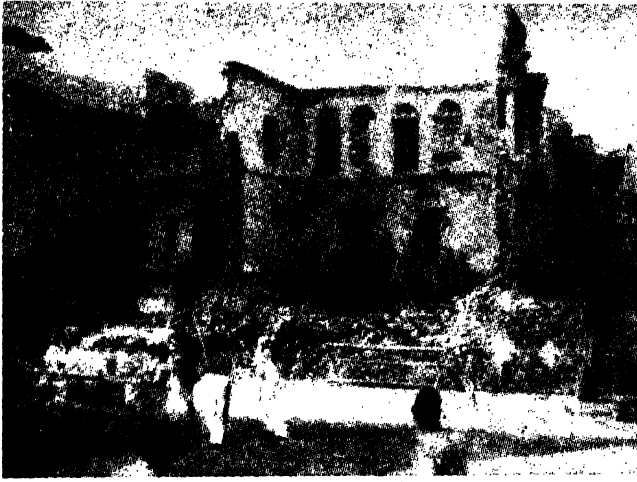
প্যালেষ্টাইনে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা-দিবসে ধ্বংসলীলার একটি দৃশ্য

এক সংবাদে প্রকাশ যে, দুই সহস্র আরব সৈন্য প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করিয়াছে। ব্রিটিশ ও ইহুদী সৈন্য তাহাদের বাধা দিতে সক্ষম হয় নাই। লেবাননের দিক হইতে ৮ই জানুয়ারী রাত্রে এক সহস্র আরব স্বেচ্ছাসৈনিক এই আক্রমণের সূত্রপাত করে। সাফাদ ও তাইবেরিয়াস জেলায় যে বার হাজার ইহুদী বসবাস করিতেছে তাহাদের ধ্বংস করা এই আক্রমণের উদ্দেশ্য। ব্রিটিশ সৈন্য প্যালেষ্টাইন হইতে অপসারিত হইলে আরবেরা কিরূপ কৃতকার্য্য হইবে তাহা পরীক্ষা করাই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য।

স্বস্তি-পরিষদে পুনরায় প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং সংঘর্ষ বন্ধ না হইয়া বরং বাড়িয়াই যাইবে। ভারত বিভাগের একজন মুখপাত্র হিসাবে সর মহম্মদ জাফরুল্লা খানের মুখে ইহা শোভা পায় কি?

গত ২৯শে নবেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন ৩৩টি রাষ্ট্র, বিপক্ষে ছিলেন ১৩টি। ১০টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিলেন এবং ১টি রাষ্ট্র অনুপস্থিত ছিলেন। ভারত, পাকিস্থান এবং আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই ভোট গ্রহণের পর একত্রে সভাগৃহ পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে বলেন যে তাঁহারা এই মত মানিয়া লইবেন না এবং তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী কর্ত্তব্য করিতে পারিবেন।

ব্রিটেন এই প্রস্তাবে ভোট দেন নাই।

আরবের সাতটি রাষ্ট্র লইয়া একটি যুদ্ধ-সংসদ গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা কায়রোতে দশ দিন গোপন আলোচনার পর ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা এই প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরুদ্ধে যথাশক্তি উপায় অবলম্বন করিবেন। এই প্যালেষ্টাইন বিভাগ তাঁহারা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের সমবেত রাষ্ট্রসমূহ প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা অর্জ্জনে ও একত্র থাকিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। এক দল আরব কর্ম্মচারী ভারতবর্ষে আরববাসীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে আসিয়াছেন এবং আর এক দল আরব এই উদ্দেশ্যে ইউরোপ রওনা হইয়াছেন।

এই বিভাগ-প্রস্তাবের পর হইতেই প্যালেষ্টাইনে খণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। জেরুজালেম হইতে ৯ই জানুয়ারী তারিখের

হয়। এবার তাঁহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল প্যালেষ্টাইন সমস্যা বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক কিনা। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংসদ কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্যালেষ্টাইন কমিশন প্যালেষ্টাইন পরিদর্শনে গেলেন। এদিকে প্যালেষ্টাইনের ম্যাণ্ডেটধারী ইংলণ্ড বলিল যে সরকারী ভাবে সে

প্যালেষ্টাইনে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা-দিবসে এডেনে অগ্নিকাণ্ড

প্যালেষ্টাইন কমিটির অধিবেশনে যোগ দিবে না। বৃহৎ পঞ্চ শক্তির মধ্যে চীন প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরোধী এবং ফ্রান্সেরও

সম্পূর্ণ উৎসাহ নাই। সুতরাং প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পড়িল আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার ওপর। ব্রিটিশের এই নির্ব্বিকার ভাবের জন্ত ইহুদীরা ব্রিটিশবিরোধী হইয়া উঠিল। ১৫ই মে ব্রিটিশ শাসনভার ত্যাগ করার পর যাহাতে প্যালেষ্টাইনে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হয় সেইজন্য প্যালেষ্টাইন কমিশন এক স্থানীয় বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিটেন বলে, আনুষ্ঠানিক ভাবে প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ করার পুর্ব্বে সে সেখানে কোন বাহিনী গড়িয়া তোলার অধিকার দিতে পারে না।

তরুণ ইহুদীগণ পতাকা উত্তোলন পূর্ব্বক স্বস্তি পরিষদ কর্ত্তৃক প্যালেষ্টাইন বিভাগের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করিতেছে

প্যালেষ্টাইন সমস্যা যেমন স্বস্তি-পরিষদকে বিভ্রান্ত ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে আরব ও ইহুদী উভয় পক্ষে তেমনি চলিয়াছে পূর্ণ রণসজ্জা। ১৫ই মে ব্রিটিশ শাসনভার পরিত্যাগ করিলে পরস্পর পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করিবার সম্পূর্ণ আয়োজন হইতেছে। জেরুজালেমের পথে হত্যা ও লড়াই প্রত্যহই চলিতেছে। ইহুদীদের গোপন সৈন্যদল ব্রিটিশ বাহিনীকেও আক্রমণ করিতেছে। তেল আভিভের ম্যান্‌সিয়া নামক স্থানে বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে অস্ত্রচালনায় সুশিক্ষিত ইহুদী যুবক

যুদ্ধে যোগদানকারী ইহুদী যুবক-যুবতীগণ

এবং যুবতীরাও এই আক্রমণে যোগ দিতেছে। এদিকে আরব সৈন্যদের অধিনায়কত্ব করিবার জন্ত তাদের প্রধান সেনাপতি ফৌজি এল কৌকজি প্যালেষ্টাইনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আরব সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নাই এবং সমস্ত আরব-রাষ্ট্রই তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। এদিকে সমগ্র ইহুদী প্রতিষ্ঠান তেল আভিভে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে যে তাহারা একনেতৃত্বে যুদ্ধ চালাইবে। শুনা যায়, তাহাদের প্রধান দল হাগানার নেতৃত্বে ৮০,০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য আছে। এদিকে ঈজিপ্ট, সৌদি আরব, ইরাক, ট্রান্সজর্ডন এবং সিরিয়া প্যালেষ্টাইনের আরবগণকে সাহায্য করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। তাদের সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা ২০০,০০০। কিন্তু তারা তেমন সুশিক্ষিত নয়। আরব লীগের সাতটি রাষ্ট্রের মধ্যে সপ্তম রাষ্ট্র ইয়েমেনে এখন গৃহযুদ্ধ চলিতেছে এবং তাহার সৈন্যসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য নয়। সেইজন্য তাহারা প্যালেষ্টাইনের এই আরব-ইহুদী যুদ্ধে সহায়তা করিতে পারিতেছে না।

গত ২৬শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, জাতিপুঞ্জসংসদের রাজনীতিক কমিটিতে উচ্চতর আরব পরিষদের প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে, অছিগিরি সম্বন্ধে একটি সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে ম্যাণ্ডেট শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আরবরা প্যালেষ্টাইনকে একটি অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিবে।

ইতিমধ্যে ট্রান্সজর্ডন-সরকার ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং তাহার সৈন্যদল জেরুজালেমের পথর

মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ও প্যালেষ্টাইন সীমান্ত হইতে পাঁচ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত জেরিকো দখল করিয়াছে। ট্রান্সজর্ডনের রাজধানী আম্মন, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডন ও ইরাকের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ১লা মের মধ্যে প্যালেষ্টাইনকে তিন দিক হইতে আক্রমণ সুরু করিবার জন্য চল্লিশ হাজার সৈন্য প্রেরিত হইবে স্থির হয়। ট্রান্সজর্ডনের ৬৫ বৎসর বয়স্ক রাজা আবদুল্লা ইবন হুসেন আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তিনি বলিয়াছেন, ইহুদীরা যদি তাঁহার উপদেশ গ্রহণ না করে এবং আরব রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বসবাস করিতে সম্মত না হয় তবে তিনি প্যালেষ্টাইন উদ্ধারের গৌরব অর্জ্জন করিবেন।

১৫ই মে ব্রিটেন প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ করার পর আরবরা যেন প্যালেষ্টাইনের উপর সার্ব্বভৌম ক্ষমতা পায় এই দাবি জানাইয়া রাজা আবদুল্লা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে জেরুজালেম, নাজারেথ ও বেথেলহেম পবিত্রস্থান বলিয়া তিনি ঐ সকল স্থানের উপর কর্তৃত্ব চাহেন; অবশ্য ইহুদীদের জন্য একটি পিতৃভূমির ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস দিয়াছেন। জাতিপুঞ্জসংসদ প্যালেষ্টাইনে শান্তি স্থাপন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হইতেছে না।

যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ১৯০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর এই রাজ্য পরিত্যাগ কালে পাকিস্থান সৃষ্টি করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ-বহ্নি সৃষ্টি করেন, তাঁহারা প্যালেষ্টাইনেও পাকিস্থানের সৃষ্টি করিয়া আরব ও ইহুদীদের মধ্যে ভীষণ সমরাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছেন।

সংযুক্ত প্রদেশের প্রান্তিক অঞ্চলের লোকসঙ্গীত

শ্রীমায়া গুপ্ত

পুত্রের বিবাহে যে বিশেষ ধরণের সঙ্গীত প্রচলিত আছে তার কিছু পরিচয় ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে দেওয়া হয়েছে, এবার কন্যার বিবাহ-সঙ্গীতের কিছু নমুনা দেওয়া হবে। গানগুলির ভাষাগত পার্থক্য যাই থাক, পুত্রের বিবাহের প্রচলিত লোক-সঙ্গীতগুলির সঙ্গে এগুলি তুলনীয়। এগুলির মধ্যে ভাবগত ঐক্য ও সাদৃশ্য এত অধিক যে এগুলোকে প্রায় একই স্তরের গান বলা চলে। যে সামাজিক পরিবেশের পটভূমিকার উপর গানগুলি রচিত তা ভারতের সমস্ত প্রদেশেই এক।

এখানে প্রথমে একটি গানের পরিচয় দেওয়া হ'ল। জননী ফরমাস দিচ্ছেন কেমন ঘর-বর চাই কন্যার জন্য।

লাড়ো কী অম্মা অরজ করে,
হো মেরা লায়ক সা
সমধী ঢুঁড়িয়ো, কুলকী মেরী সমধিন ঢুঁড়িয়ো।
চন্দ্রবদন সে লড়কা ঢুঁড়ো মেরে কান্‌হা কে উনহার।
জো তুম ঢুঁড়ো ভোঁড়ী সুরত কে
বুরৈলী সুরত কে,
মরুঙ্গী জহর বিষ খায়।
মরুঙ্গী আধ ধতুরা খায়, তোরী সেঁজো ন ছুঙ্গী পায়র।

কন্যার মা স্বামীকে বলছেন যে বৈবাহিক যেন সৎলোক হন এবং বৈবাহিকা কুলবতী হন। চাঁদের মতন মুখ দেখে যেন জামাই খোঁজা হয়, দেখতে কৃষ্ণের মত হওয়া চাই। যদি তা না ক'রে তিনি কুশ্রী জামাই খোঁজেন তবে কন্যার মাতা কদাপি আর কন্যার পিতার শয্যায় চরণ রাখবেন না— বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন।

শাস্তিবিধান গুরুতর সন্দেহ নেই, কেবল বিষপানে আত্মহত্যাই নয়, তার আগে স্বামীর শয্যার সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগও বটে!

নিম্নোক্ত গানটিতে আছে, কেমন বর চাই সে বিষয়ে কন্যার ফরমাস :—

পাঁচ পাণ্ডা বোল বাবুল উন ঘর কন্যা না ওঁতরৈঁ
এক নির্ধনি হ জিন দেউ বাবুল, রহন দেউ কুআঁরী।
নিধনী জব তড়প বোলৈ অসুখ মেরে জিয়া কো সহৈ।
এক হরজোতিয়া জিন দেউ বাবুল রহন দেউ কুআঁরী
হরজোতিয়া হর জোত আয়েঁ, মাঁগে নও দস রোটিয়াঁ।
ভরকে কঠৌতা ছাঁছ মাঁগে, অসুখ মেরে জিয় কো সহৈ।
এক জুআরিহি জিন দেউ বাবুল, রহন দেউ কুআঁরী
ইত্র হারে, দ্রব্য হারে কবহুঁ কী বেরা হমে হারে,
লাজ তুমহেঁ আয় হৈ।
এক পঢ়ে পণ্ডিত দেউ বাবুল জাসেঁ মহা সুখ পায়হৈঁ
হাথ ধোতী বগল পোথী দেখি জগ সীস্ নবায় হৈ।

হে পিতা, পঞ্চপাণ্ডবকে স্মরণ কর, তাঁদের গৃহে কন্যা জন্মায় নি। (তাঁদের কৃপা ভিক্ষা কর, কারণ কন্যার জন্মদ্বারা পিতার দুঃখ বাড়ে)।

হে পিতা, নির্ধনের গৃহে আমার বিবাহ দিও না, তার চেয়ে কুমারী থাকাই ভাল। নির্ধন যখন কটুভাষায় কথা বলবে তখন তা কে সহ্য করতে পারে?

হলচালনা করে যে চাষা তার গৃহেও বিয়ে দিও না, তার চেয়ে আমি কুমারী থাকবো। যে হল চালনা করে ঘরে ফিরে নয়-দশখান রুটি চাইবে, এক গামলা ভরা মাঠা (মাখন তোলা ঘোল) চাইবে—এমনি অশিষ্ট! তার কটু কথা কে সহ্য করবে?

জুয়াখেলায় আসক্তকেও কন্যা দিও না। সে এটা ওটা সবই হারবে—এমন কি আমাকেও হয়ত বাজী রেখে হেরে আসবে, তাতে তোমায় লজ্জার কারণ হবে।

পণ্ডিত দেখে আমায় দান কর, যেন খুব সুখে থাকতে পাই। পণ্ডিত বরের এক হাতে ধুতী, বগলে বই—যাকে দেখে সমস্ত জগৎ শির অবনত করবে।

দরিদ্র স্বামীর উপর কন্যার মন যে বিরূপ এ গানটিতে তাই প্রকাশ পেয়েছে। গানটির অন্তর্নিহিত অর্থ গভীর। নির্ধন অপেক্ষা মূর্খ তাঁর নিকট অধিকতর দরিদ্র বলে গণ্য। দরিদ্র স্বামীর উপর অবজ্ঞা প্রকাশ তিনি করেছেন বটে, কিন্তু তিনি গুণীর কদর বোঝেন। পণ্ডিত স্বামী ধনবান হতে হবে এমন দাবি তো কন্যা করেন নি।

কন্যার বিবাহে যে আনন্দ ও দুঃখের দুটি চিত্র পাশাপাশি থাকে তারই প্রকাশ হয়েছে নিম্নোক্ত গানটিতে।' গানটিতে কন্যার পিতামাতার সাংসারিক ক্ষতিরই বর্ণনা আছে। কন্যা-বিদায়ের করুণ চিত্র নয়—কন্যার বিবাহে নিঃস্ব হয়ে পড়ার চিত্র। প্রথমে তো গৃহিণী জামাইয়ের নীল ঘোড়া দেখে, বরযাত্রীর সঙ্গে হাতীর বহর দেখে পুলকিত হয়ে উঠেছেন এবং ভাবছেন একটির স্থলে দশটি কন্যার জন্ম হোক তাঁর গৃহে। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাঁর ভুল ভাঙছে, যখন ঘর হতে সর্ব্বস্ব বার করে বৈবাহিককে দিয়ে দিতে হচ্ছে। পণ-প্রথার শোচনীয় কুফল ভারতের সকল প্রদেশের কন্যাদের জীবনকেই অনেক ক্ষেত্রে অভিশপ্ত করে তোলে।

নীল নীল ঘোড়ওয়া কুঁঅর অসোয়ার রে
কুরখেতে উঠ গৈলী ধূর রে।
চন্দ্র ঝরোখাওন ঠাঢ়ী রে মাতা নীহারেলী
ধীয়া দশ আওর হোয় রে।
হথিয়া তো আবেলে অনতী সে গনতী রে,
ঘোড়বা জে অয়ে সৌ সাঠি
মারে বরতিয়া কে কসমস রহীও ন সুঝৈ
পাবন খেহ উধীরায় রে।
হোত বিহান পরল সোরী সেন্দুর ;
নও লাখ দাহেজ থোর রে
ভীতরী কৈ গেড়ুঁয়া বহর দৈ ভরলী
সতরু কে ধীয়া জনী হোই হো।
সমধী জে বৈঠলে লালী পালঙ্গিয়া হো
আপ প্রভু সথরী বিছাই রে,
সমধী জে ছাঁটে লৈ লমী লমী বাতীয়া রে
আপ প্রভু সীর নওয়াই রে।
ঈ ধীঅয়া মোরী অয়েরনী বয়েরনী
ঈ ধীঅয়া সত্রু হমারি রে
ঈ ধীঅয়া মোর নগর লুটায়লী
অওরী হরলী মোর গেয়ান রে।

নীল ঘোড়ায় চড়ে বর আসছেন, ঘোড়ার খুরের ধূলি দেখে মনে হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমি হয়ত এমনি অশ্বক্ষুরের ধূলিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল। চন্দ্রাকৃতি বাতায়নে দণ্ডায়মান হয়ে কন্যার জননী বরযাত্রী দেখছেন, প্রসন্ন হয়ে বলছেন আরো দশটি কন্যার জন্ম হোক আমার গৃহে।

অগণিত হাতী, ষষ্টি শত ঘোড়া, বরযাত্রীর সংখ্যা এত যে তাদের পদক্ষেপে যে পরিমাণ ধূলি উড়ছে তাতে পথই দেখা যায় না।

ভোর হতে না হতেই কন্যার সীমন্তে সিন্দুর লেপন করা হ'ল। এবার সুরু হ'ল দানের পালা—নয় লক্ষ মুদ্রা দানও যথেষ্ট বলে বিবেচিত হ'ল না। কন্যার জননী ঘটি-বাটিও বার করে দিলেন, তাঁর মুখ থেকে সখেদে বার হল 'শত্রুরও যেন কন্যা না হয়।'

বৈবাহিক বসেছেন লাল রঙের পালঙ্কে এবং কন্যার পিতা বসেছেন চাটাই বিছিয়ে। বৈবাহিক লম্বা চওড়া কথা বলছেন এবং কন্যার পিতা মাথা নীচু করে বসে আছেন।

পুনরায় ক্ষোভে জ্বলে পুড়ে জননী বলছেন, 'এ কন্যা আমার শত্রু, এ কন্যাই আমার পুরী লুণ্ঠন করে নিলে, আমার আনন্দ ও শুভবুদ্ধিকেও হরণ করে নিলে।'

এ গানটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও পণপ্রথার পীড়ন বাংলাদেশেরই অনুরূপ। এর ফলে কন্যার পিতৃগৃহ শূন্য হয়ে যায়, কন্যা দুঃখ পায় ও অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

পুত্রবধূর ভরণ-পোষণের ভারগ্রহণের পূর্ব্বাহ্ণে পুত্রের পিতা বৈবাহিকের নিকট থেকে যথাসম্ভব ধন আহরণ করে নিয়ে যান, কন্যাপণের মূলে নিহিত এই মনোবৃত্তি ভারতের সকল প্রদেশেরই কন্যাদের অপমানের কারণ হয়ে আছে। পিতা-মাতার দুলালী পরগৃহে যাবার সময় পিতাকে নিঃস্ব করে চলে যেতে বাধ্য হয়। যে কন্যার পিতার নিকট থেকে আশানুরূপ অর্থ আদায় করা সম্ভবপর হয় না, শ্বশুরগৃহে সে কন্যার অদৃষ্টে জোটে অনাদর—অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস বটে!

কন্যার প্রাণ চায় না পরগৃহে যাত্রা করতে, তিনি পিতার নিকট একটির পর একটি করুণ প্রার্থনা করে চলেছেন—

বাবল তেরা সীকোঁ কা ঘরওয়া রে, বাবল চিড়িয়া তোড় গঈ
বেটি অউর ছওয়ায় লুঙ্গ রী, লাডো ঘর যাও আপনে।
বাবল তেরা চৌকা জো সুনা রে, বাবল তেরী ধীয়া বিনা
বেটি বামনী লগায় লুঙ্গা রী, লাডো ঘর যাও আপনে।
বাবল তেরা পানী জো ভিনকৈ রে, বাবল তেরী ধীয়া বিনা
বেটি কাহারিন লগা লুঙ্গা রী, লাডো ঘর যাও আপনে।
বাবল মেরা ডোলী জো খটকা রে, বাবল তেরে মহল মেঁ
বেটি দো ইঁট খিঁচায় দঙ্গা রী, লাডো ঘর যাও আপনে।
বাবল মেরী গুড়িয়া জো সুনী রে, পিতাজী তুমরী বেটি বিনা
বেটি মেরী পোতী জো খেলেঁরী, লাডো ঘর যাও আপনে।

বিদায়কালে চিন্তিতা কন্যা বলছেন: "হে পিতা, তোমার গৃহের ছাদ পাখীতে নষ্ট করে দিয়েছে"—পিতা বলছেন, "তার জন্য তুমি চিন্তা করো না মা, আবার ঘর ছাইয়ে নেব, তুমি তোমার নিজ গৃহে যাও।" কন্যা বলছেন, "আমি চলে

গেলে তোমার রন্ধনশালা শূন্য হয়ে যাবে—" পিতা উত্তর দিচ্ছেন, "তার জন্য চিন্তা করো না, বামনী রেখে দেবো, সে রন্ধন করবে, তুমি তোমার নিজের গৃহে যাও।" কন্যা আবার বলছেন, "হে পিতা, তোমার কন্যার অনুপস্থিতিতে স্নানের ঘর পরিষ্কৃত হবে না—ভেজাই থাকবে।"—উত্তর হ'ল, "কাহারিন রেখে দেওয়া হবে, সে-ই কাজ করবে।" এবার কন্যা বলছেন, "আমার ডুলী তোমার বাড়ীতে আটকে যাচ্ছে, কেমন করে যাই।" পিতা বলছেন, "হে কন্যা, দুখানা ইঁট খসিয়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার নিজের ঘরে যাও।"

কন্যা বলছেন, "হে পিতা, তোমার কন্যা পরগৃহে গেলে তার খেলাঘর যে শূন্য হয়ে যাবে।" পিতা উত্তরে বলছেন, "হে কন্যা, তার জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না, আমার পৌত্রী খেলাঘরে খেলা করবে, তুমি তোমার নিজের ঘরে যাও।"

শ্বশুরগৃহে যাত্রাকালীন কন্যার শঙ্কিত হৃদয়ের একটি চিত্র নিম্নোক্ত গানটিতে আছে।

পুরব পছোহাঁ মোরে বাবা কে বখরিয়া
পড় গৈ ইমলিয়া কে ছাঁহ
তেহী পর মোরে বাবা সোনওয়া সম্বন্ধে
গঢ়ে লাগে সুঘর সোন্নার।
গঢ়ৌ সোনরা অঙ্গন গঢ়ৌ সোনরা কঙ্গন
টীকা গঢ়ৌ ভরি মাথ রে।
ইতনা পহিরি বেটি চৌক জো বৈঠী
বেটি কৈ মন দলগীর।
কী তেরো বেটি সোনা খরাব ভএ
কাহে তেরী মন দলগীর
কী তেরো বেটি রে দান দাহেজ থোর
কীরে সুঘর বর ছোট।
নাহী মোর বাবারে দান দাহেজ থোর
নাহী সুঘর বর ছোট।
সুনত হৌঁ মোর বাবা সাস দারুনিয়া
এহী সে মন দলগীর।
চার দিনা বেটি রাজাকে রজই, চার দিনা ফৌজদারী
চার দিনা বেটি সাস হৈ দারুণ, আখির রাজ তুম্হারী।

আমার পিতার গৃহের পশ্চাতে পূর্ব্ব দিকে তেঁতুল গাছের ছায়ায় বসে সুনিপুণ স্বর্ণকার গহনা গড়ছে, পিতা সোনা দিচ্ছেন। হে স্বর্ণকার গড়, সারা মাথা ঢাকা পড়ে এমন টিকলী, সিঁথী গড়।

এগুলি পরেই কন্যা গিয়ে বসলেন—তাঁর মন উদাস। পিতা জিজ্ঞাসা করছেন, 'হে কন্যা, বর কি তোমার পছন্দ হয় নি, তোমায় যে যৌতুক দিচ্ছি তা কি যথেষ্ট নয়, তোমার অলঙ্কারের সোনা কি খারাপ? তুমি এমন নিরানন্দ কেন?

কন্যা উত্তর দিচ্ছেন, "হে পিতা, দানসামগ্রী অল্প নয়, বরও সাধারণ নয়, কিন্তু শুনতে পাই শাশুড়ী নাকি বড়ই কঠোর প্রকৃতি, সেইজন্যই মন উদাস হয়েছে।"

পিতা উত্তর দিচ্ছেন "হে পুত্রী, রাজার রাজ্য চার দিনের, ফৌজদারীও চারদিনের, কঠোরপ্রকৃতি শাশুড়ীও চার দিনেরই—তারপরে তো তোমারই রাজ্য।"

এখানে সম্ভবতঃ ফৌজদারী মামলার কথা বলা হচ্ছে। ফৌজদারী মোকদ্দমা অবশ্য দেওয়ানী মোকদ্দমার মত দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তবে রাজার রাজ্য যে খুব স্বল্পকালস্থায়ী হবেই এমন কোন কথা নেই। সুতরাং এই অসংলগ্ন উপমাগুলি কন্যার হৃদয়ে কতখানি সান্ত্বনা বা আশার সঞ্চার করে তা বলা কঠিন। এই উক্তিতে কন্যার মনের উপর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার বর্ণনা কবি দেন নি।

নিম্নে শাশুড়ীর বধূনির্যাতনের একটি চিত্র দেওয়া হ'ল :—

এক হী ঘরওয়া কে বত্তীস দুআর হো
বত্তীসোঁ দুঅরওয়া পর মরিচ কে গাছ।
সের ভর মরিচ হো সাসু সিলোটি ধরী দেই হো
মরিচ পিসতে হো সাসু ধুপে আঠো অঙ্গ হো।
জেহু তোরা বহুআ রে ধুপল আঠো অঙ্গ হো
অপনা বাবা ঘরসে চেরিয়া বোলাউ।
হমরা বাবাজীকে কা করবু জোর হো
নাচেলা নচনিয়া রে, ভইয়া বকসলে ঘোড়।
মোরা পিছু অরওয়া কহঁরওয়া হিত ভাইয়া হো
অইসনী লোলারী বহুআ নইহর পহুঁচাও।
ঝরেরে ঝরোখা চঢ়ী অম্মা নিরখে হো
কস দেখে বেটিকে ডণ্ডীয়া ঝলক আয়ে হো।
কিয়া বেটি চোরিণী রে, কিয়া বেটি চটনী হো
কিয়া বেটি দীহলু হো সাসুকে জবাব।
নাহিঁ বেটি চোরণী হো নাহিঁ বেটি চটনী হো
ইন বেটি দীহলী হো সাসুকে জবাব।
এক ভর অইলু হো বেটি দুই ভর জাহু হো
টঁকলে ওহারল বেটি সাসুর জাহু।

একটি বাড়ীর বত্রিশটি দ্বার এবং বত্রিশটি দ্বারেই লঙ্কার গাছ। এক সের লঙ্কা বাটতে বসে বধূর আট অঙ্গ অবশ হয়ে যায়—বধূ সেকথা শাশুড়ীকে বলছেন। শাশুড়ী জবাব দিচ্ছেন, "তা হলে তোমার বাপের বাড়ী থেকে দাসী আন নি কেন?"

বধূ রাগ করে বলছেন, "আমার পিতাকে কিছু বলেন নি কেন? তাঁর ঘরে নাচওয়ালী নাচে এবং আমার ভাই তাকে ঘোড়া বকশিস দেন।"

মুখরা বধূকে পিতৃধনের গর্ব্ব করতে দেখে শাশুড়ী তাকে কাহার (পাল্কীবাহক) ডেকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

কন্যার মাতা কন্যাকে দেখামাত্র জিজ্ঞাসা করছেন—'কি করেছ, চুরি কিংবা খাবার জিনিষে লোভ না শাশুড়ীর মুখের উপর কথা বলেছ?' কন্যা সত্য কথাই স্বীকার করলেন। তখন কন্যার জননী বলছেন, 'যত শীঘ্র এসেছ তার চেয়েও দ্রুত শ্বশুরের ঘরে ফিরে যাও, কাপড়চোপড় বদলাবার আগেই ফিরে যাও।'

মাতাকর্ত্তৃক তিরস্কৃতা, উভয়সঙ্কটে পতিতা কন্যার অবস্থা অবর্ণনীয়।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ঘুমের মতই আবেশ—শিথিল বৃত্তির বৃন্তটিকে দোলা দিচ্ছে। বিপরীতমুখী বাতাস—রক্তের উষ্ণতাকে শীতল করে আনছে, তবু মাথার যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। একে উপেক্ষা বলবে—না অনুরাগহীন অভিনয় বলবে? যে প্রশ্ন ইঙ্গিতে আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠল—তাকে অবসর-মুহূর্তের বিলাস বলে উড়িয়ে দিলে শুভা। ভালবাসাটি হ'ল বিলাস। দুঃখভোগের মুহূর্তে দেহগত দাবিকে অস্বীকার করা স্বভাবকে অতিক্রম করার দুশ্চেষ্টা ছাড়া আর কি। পৃথিবীতে লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে একটি মানুষ বিশেষ করে যখন আর একটি মানুষের সঙ্গ কামনা করে পরস্পর এক হয়ে অপার আনন্দ লাভ করে—জগতের যাবতীয় বস্তু ব্যক্তি বৃত্তি নীতি হিসাব পরিণাম সব কিছুকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেরা করে নিরুদ্দেশ যাত্রা—তখন সে জিনিসকে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি দিয়ে কিছু না বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে কি? হোক সে বিলাস—কি ভালবাসা কিংবা দেহগত আকর্ষণ কিংবা মহৎ অসৎ বাস্তব কল্পনা যে-কোন বৃত্তিরই প্রকাশ তাকে অস্বীকার করা মানেই নিজেকে অস্বীকার করা। একটি মানুষ বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তে একটি মানুষকেই চাইবে। বিস্তীর্ণ পৃথিবীর চিন্তা—খণ্ডিত এক গৃহকোণে আবদ্ধ হয় বলেই নয়—সোনালী ফসলে পৃথিবী দিনেরাতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে; অথচ মিলতে এসেও কত বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাইরের বাধা—ভিতরের বাধা, আইনের—অন্তরের কর্মের কত না বাধা। হু হু করে দুরন্ত হাওয়া চলন্ত মোটরে আছাড় খেয়ে পড়ছে—আকাশ তারা-সমেত ছুটে পালাচ্ছে দু' পাশ দিয়ে। মাঠে নেমেছে অন্ধকার—দিক হয়েছে নিশ্চিহ্ন। এই দ্রুত ধাবমান পারিপার্শ্বিকে হৃদয়গত দৌর্ব্বল্যই শুধু নিঃশেষে মুছে যাচ্ছে না। যে মুখ ফিরিয়েছে—তার দিকেই টানছে প্রবল বৃত্তি—কামনা কিংবা ভালবাসা। না—এ শুধু দুর্ব্বলতা। একটি পথ আর একটি পথকে ছুঁয়েছে কিন্তু মেশে নি তার মধ্যে। দুটি সরল রেখা পাশাপাশিই তো চলে—বহুদূর চলেও তারা মেশার সুযোগ পায় না। তাদের পাশে সবুজ ঘাস মাথা তোলে—বিচিত্র বর্ণের ফুল শোভা বিস্তার করে—পাখীর কাকলিতে উতলা হয় পথের ধুলো তবু তারা এক হবার সুযোগ পায় না। একটি মানুষের মোহ—তত প্রবল হবেই বা কেন। হওয়া উচিত তো নয়।

গাড়ীবারান্দার কোলে মোটর থামল। বেয়ারা ছুটে এসে সেলাম জানালে—মিত্তির সাহেব ঠারতা হ্যায়।

ড্রয়িং-রুমে আলো জ্বলছে—পাখাও চলছে মনে হ'ল। মৃদু কথার আওয়াজে বুঝলে—মিত্র একা আসেন নি।

নমস্কার বিনিময়ের পর মিত্রই পরিচয় করিয়ে দিলেন অপর ব্যক্তিটির সঙ্গে, আমার ভাইঝি মালতী মিত্র—এইবার বি-এ দিচ্ছে।

প্রশান্ত প্রীতি-সম্ভ্রমপূর্ণ হাসি ফুটিয়ে মেয়েটিকে অভ্যর্থনা করলে। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল দুই চোখে ওর হ্রীর প্রকাশ অপরূপ মনে হ'ল। বিদ্যাপ্রকাশের ব্যাকুলতা অবিনয়ের নামান্তর—এ তো বহুক্ষেত্রে তাকে পীড়া দিয়েছে! শূন্যগর্ভ কলসীতে যে ফাঁকা আওয়াজ হয় তারই মত বাক্ আর রীতি-সর্ব্বস্ব নয় মালতী। অন্তত প্রথম দর্শনে তাই মনে হ'ল।

মিত্র বললেন, এ ক'দিনে অনেক কিছু ঘটেছে। যে সর্ত্ত দিয়ে শ্রমিকদের অসন্তোষ দূর করেছিলাম—তাও ওরা মানছে না। আমি তখনই বলেছিলাম যে, 'মোর দে গেট—মোর দে ওয়াণ্ট।'

কেন এমনটা হ'ল।

ওটাই যে স্বভাব ওদের। দেখেন নি—ষ্টেশনের কোন কুলিকে ন্যায্য পাওনার বেশী দিলেও আরো কিছু পাওয়ার দাবি সে করবেই। এও তেমনি। আজকাল নাকি ওদের ফেডারেশন না বড় ইউনিয়ন সারা ভারতের ছোট ছোট ইউনিয়নগুলিকে এক করে রেখেছে। তারা যা নির্দ্দেশ দেবে এরা তাই মানবে। দেশটিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন বানাতে চায়!—ব্যঙ্গপূর্ণ হাসিতে কথাটা শেষ করলেন মিত্র।

মালতী নম্রকণ্ঠে বললে, আলাদা আলাদা না থেকে এক হওয়াই কি ভাল নয়? এই তো আপনারাও এক রয়েছেন।

মিত্র বললেন, এক হওয়া ভাল নয় কে বলছে। কিন্তু যুক্তিহীন দাবি চাপিয়ে নিজেদের একতাকে প্রমাণ করার নাম শক্তি প্রকাশ নয়।

মালতী হাসলে—বললে, এক হ'লেই যে শক্তি প্রকাশ পায়—এটা প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন কাকা।

মিত্র রাগ করে বললেন, তোমার ছেলেমানুষিপনা ঘুচল না মালতী। কবে কি বলেছিলাম—তাই ধরে বসে আছ।

মালতী হাসতে হাসতে বললে, কিন্তু ওরাও তো বলতে পারে দাবি আমাদের যুক্তিহীন নয়—আপনাদের যুক্তিটাই হ'ল অন্যায় জিদ।

প্রশান্ত বললে, তা বলতে পারে না—যেহেতু অন্যান্য জায়গার তুলনায়—ওরা ভালই মাইনে পায়। দু' দু'বার ওদের দাবি মিটিয়েছি আমরা।

মালতী বললে, বেশ তো আর এক বার মিটিয়ে দিন দাবি। জিনিসের দাম দিন দিন বাড়ছেই তো।

মিত্র ধৈর্যচ্যুত হয়ে বললেন, তারপর আমরা ঘোড়ার ঘাস কাটব, না? তোমার মত বুদ্ধি হলেই ফ্যাক্টরী চলবে?

মালতী হাসি দমন করে প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললে, এত হাঙ্গামার মধ্যে মানুষের না যাওয়াই ভাল নয় কি?

ওর এই ছেলেমানুষি মন্তব্যে প্রশান্ত হাসলে। তারপর ট্রেতে করে বেয়ারা চা নিয়ে এল, সেই সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক। শ্রমিক-প্রসঙ্গ ছেড়ে ওরা হাল্‌কা আলাপে নেমে এল। কোথায় চালের দর চড়ছে, কোথায় তেলের ব্লাক মার্কেট ফেঁপে উঠছে, কোথায় প্রধান মন্ত্রীর ফতোয়া জারির ফলে প্রদেশে প্রদেশে, দেশীয় রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার আয়োজন চলছে —এসব আলোচনাও ক্রমশঃ এসে পড়ল। আজকালকার যে-কোন সভাতে—মজলিসে—উৎসব-ক্ষেত্রে পাঁচ জন এক হবার সুযোগ ঘটলেই অন্তর্বর্ত্তী সরকার—লীগ ও কংগ্রেসের নীতি—রেশন আর ব্লাক মার্কেট—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার কথা এ সব নাকি উঠবেই।

আহারাদি সেরে তিন জনেই গাত্রোত্থান করলে। মিত্র চললেন আগে আগে—পিছনে গল্প করতে করতে চলল প্রশান্ত আর মালতী।

অন্যান্য কথার পর মালতী বললে, এই ধরণের জীবন আপনার কেমন লাগে?

প্রশান্ত প্রশ্ন-উন্মুখ চোখে ওর পানে চেয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলে, আপনার কি মনে হয়?

মালতী মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, মন্দ কি! মুখে তার মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

প্রশান্ত বললে, আপনি হাসলেন যে।

এমনি—হাসিটা আমার রোগ।

প্রশান্ত বললে, আমি জানি—এ ধরণের জীবন আপনার মনোমত নয়।

কারণ?

কারণ—একটু আগে আপনিই তো বললেন—

মালতী শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, ও হরি—আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি শ্রমিক হিতাকাঙ্ক্ষিণী। ওদের কথা নিয়ে বড্ড ভাবি? না—না—না—মোটেই তা নয়—ওদের কথা এত কম জানি বলেই তো ওদের কোন দাবিই আমার কাছে অন্যায্য বলে বোধ হয় না।

আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্য! কেন? কেন?

মিত্র পিছন ফিরে বললেন, দশটা বাজে—কাল আলোচনা করো মালতী।

মালতী এগিয়ে এসে বললে, আচ্ছা কাকা—শ্রমিকদের ব্যাপার আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন?

মিত্র হেসে বললেন, তার দরকার কি—ওদের যে-কোন দাবি তুমি সমর্থন কর—এই তো তুমি ওদের সম্বন্ধে পাকা ওয়াকিফহাল।

মালতী ঘাড় ফিরিয়ে প্রশান্তর পানে চেয়ে হেসে বললে, কাল এসে তর্ক করব কিন্তু। নমস্কার।

ভাঙ্গা চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রশান্ত ভাবলে—একটা পথ আর একটা পথকে বার বার ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করে—এইটেই কি পথের চরমতম ইঙ্গিত। চলবে—অথচ মিলবে না—মুগ্ধ হবে অথচ থামবে না—এই ইঙ্গিত দিয়ে মানুষ রচনা করেছে পথকে—না পথ নির্দ্দেশ দিচ্ছে মানুষকে?

•

সকালেই মালতী এল। সবেমাত্র প্রশান্ত বিছানা ছেড়ে হাতমুখ ধুয়েছে—প্রাতঃকালীন অনেকগুলি কাজ তার বাকি। মালতী বৈঠকখানায় ঢুকেই কলিং-বেলে ঘা দিয়ে পিয়ানোর সামনে টুলটায় গিয়ে বসলে। তার পর ডালা তুলেই টুং টাং সুরু করে দিলে। বিলাতী একটা গানের সুর ওর কণ্ঠ ছাড়িয়ে অল্প ধ্বনিতরঙ্গে যন্ত্রস্বরের মধ্যে আত্ম-বিসর্জ্জন করলে। বেশ প্রসন্ন প্রাতঃকাল—মালতী অকারণে খুশী হয়ে উঠল।

অগত্যা সব কাজ না সেরেই প্রশান্তকে নেমে আসতে হ'ল। যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে ও হাসলে, আশা করি নি—এত সকালে—

মালতী বাম হাতের মণিবন্ধ ঈষৎ আন্দোলন করে বললে, বাংলা সময়টা সব চেয়ে আগিয়ে চলে—মানুষদের পিছিয়ে পড়লে দুর্নাম রটে। অবশ্য সময়ের আগে চলার অপবাদ ও সাধুবাদ কোনটিরই ভাগী হতে চাই না।

অপবাদ?

নয়? যে সময়ের আগে চলে—তাকে বুঝতে পারে খুব কম লোকে।

প্রশান্ত বললে, অবশ্য তাঁরা যদি বুঝবার সুযোগ দেন সাধারণকে—

মাথা নেড়ে হেসে উঠল মালতী। কি কথাই যে বলেন? সময়ের আগে চলেন যাঁরা তাঁরা মোটেই সাধারণ নন তো সাধারণে বুঝবে কি করে। এর একটা সহজ পথ আছে —সে হচ্ছে অসাধারণ হওয়া।

প্রশান্ত বললে, বিধাতা সকলের বুদ্ধিবৃত্তিকে সমান করেন নি—প্রতিভাও দুর্লভ বস্তু। যাই হোক চা চলবে?

চলবে—কিন্তু কালকের তর্ক চলবে না।

কেন—আপনিই তো আশ্বাস দিয়ে গেলেন—

পরে ভাবলাম—তাতে লাভই বা কি? আপনার জীবন-যাপন-প্রণালী ভাল লাগে কি মন্দ লাগে—তা জেনে কারই বা লাভ-ক্ষতি।

তবে কাল জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

কৌতূহল।...কাকার মুখে শুনলাম এখানকার কথা। এইসব শ্রমিক—এদের দাবি—ধর্ম্মঘট—অশান্তি—আপনাদের ক্ষমতা—জিদ—

কোন্‌টা অন্যায় মনে হ'ল?

কি জানি—ঘোরপ্যাঁচ অত বুঝি না। শুধু বুঝি আমরা যদি পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি—এরাও তা পারবে না কেন? ওরা কেন চাপ দেয়—কেন ভয় দেখায় ধর্ম্মঘট করবার—কেন স্লোগান আউড়ে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করে—তা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন।

জানি। কিন্তু দাবির একটা সীমা আছে। যে হাঁস সোনার ডিম দেয়—তাকে খুন করলেই অনেকগুলো ডিম এক সঙ্গে মেলে না—এ তো জানেন?

মালতী বললে, জানি বৈকি—। তবে কথা হচ্ছে—সোনা জিনিষটাই মারাত্মক বলেই—লোভের সীমা নির্দ্দেশ করে দেওয়া খুব কঠিন। আচ্ছা সোনা জিনিষটাকে খুব সস্তা করে দিয়ে পৃথিবীর সমস্যা সহজ করা যায় না?

প্রশান্ত বললে, সোনার বদলে যে জিনিষই দিন—লোভ তাতে কমবে না।...বিনিময়-প্রথা এককালে ছিল—তাতেও সামাজিক সমস্যা মেটে নি।

মালতী বললে, ও সব তর্ক থাক—চলুন খানিক বেড়িয়ে আসি।

কোথায় যাবেন? এই কলোনিটা পেরুলেই তো বাঁশবাগান।

মন্দ কি—লাল আর হলদে রঙের একই টাইপের বাড়ি দেখে দেখে এত পুরনো লাগছে।—মালতী উঠে বারন্দায় এল।

নতুন তৈরী শহরের আভিজাত্য নেই—একথা মনে মনে, স্বীকার করলে প্রশান্ত। সেই সঙ্গে তর্ক জমল মনে—আভিজাত্য না থাকলেই বা ক্ষতি কি। ইতিহাস বলে, পরস্বাপহরণ—সম্পদসৃষ্টির মূল সূত্রে নিহিত। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিতে সংস্কৃতির পিপাসা রয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নিজেকে সব দিক দিয়ে সুন্দর করে তোলবার মাঝে পরকে পীড়ন করার অভিযোগ আসবেই বা কেন। মানুষ তো মুদ্রা নয় যে—যে ছাপ তার দু-পিঠে ফুটে রয়েছে—তারই মূল্যে প্রত্যেকের গোত্র হবে তুল্যমূল্য। অসাধারণ বুদ্ধি—কর্ম্মক্ষমতা—প্রতিভা—এসবের গোত্র সর্ব্বসাধারণ হতে অনেকখানি উঁচুতে। বাগানের বেড়ায় ছাঁটাই-করা গাছ—সে প্রকৃতির অলঙ্কার নয়—পৃথিবীর বিবর্ত্তনবাদের সাক্ষ্যও নয়। যে সবার চেয়ে প্রাণশক্তিতে সতেজ, তার মূল্যও সাধারণের চেয়ে চড়া। কিন্তু সংস্কৃতির পিছনে সম্পদ সৃষ্টির তাগিদ থাকলেও—অপহরণের দুষ্কৃতি নেই। এক একটা শহরের আভিজাত্য আছে বৈকি—যেমন দিল্লী, যেমন কাশী। বিবেকানন্দ একদিন বলেছিলেন, ইউরোপের শিক্ষা রাজনীতি—এশিয়ার শিক্ষা অধ্যাত্মবাদ। পৌরাণিক যুগের কাশী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তে এই শেষের কথাটাকেই প্রমাণ করছে।

চলতে চলতে দু'জনের মধ্যে এমনি আলাপই চলল। মালতী হয়ত তর্কপটু নয়—সব কথাতেই অল্প যুক্তির ভারে ও বশ্যতা স্বীকার করে। তাই বলে ও যে কিছুই জানে না এ কথাও সত্য নয়। নগরসৃষ্টির কথা থেকে ইতিহাসের অনেক নজির উদ্ধৃত করলে—ভাল মন্দ দুটি দিকের বিচারেই ওর দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। তবে উগ্র মতবাদ নিয়ে অপরকে আক্রমণ করার নেশা ওর নেই। প্রশান্তর ভালই লাগল। যে মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে—তাকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করা যায়—কিন্তু যে মূর্ত্তিকে সুসম্পূর্ণ করবার অবকাশ যথেষ্ট—তাকে নিজের কামনা অনুযায়ী সার্থক করে তোলা সহজ।

—ফিরবার মুখে প্রশান্ত বললে, বিকেল বেলা আসবেন এদিকে?

মালতী বললে, আপনার কাজের ক্ষতি হবে না?

না।—ভারি আনন্দ পাব তা হলে।

বৈকালেও দু'জনে বহুক্ষণ ধরে গল্প করলে। এ শহরে দেখবার কিছু নেই—পড়বার মত ভাল বই নেই, লাইব্রেরি, তাও নেই—। একঘেয়ে কাজ এক ধরণের কথাবার্ত্তা। তাই মালতীর সঙ্গ প্রশান্তর মনকে সুস্থ করে তুললে। আশ্চর্য্যের কথা—সারাদিনটা গুণ্ডার কথা ওর একবারও মনে হয় নি। অথচ কাল সন্ধ্যাবেলায় মোটরে করে যখন ও ফিরছিল...

মালতী বিদায় নিয়ে চলে গেলে প্রশান্ত ওর কথাগুলি আর একবার ভাবতে বসল। ভাবতে ভাবতে দেখলে কোন মতবাদের ভার চাপিয়ে মালতী ওর চিন্তাকে বহুপথগামী করে নি। একটা স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হবার সুযোগও দেয় নি সে—অথচ মালতী যে বহু বিন্দু-প্রতিষ্ঠিত একটি নদীর মত লীলামাধুর্য্যে মন হরণ করে নিয়েছে তাও নয়। তার শিক্ষা—শ্রী অল্প তর্কেচ্ছা এইগুলিই কি আনন্দের কারণ? হবে। আজকের দিনটি তো আনন্দেই কাটল—আর সেজন্য ধন্যবাদ মালতীকে।

২৬

কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনন্ত দোবের বৈঠকখানায় জরুরি পরামর্শ চলছে। লক্ষ্মী গ্লাস ওয়ার্ক—এনামেল ফ্যাক্টরী আর দুটো কটন মিলের শ্রমিক সবাই একসঙ্গে ধর্ম্মঘটের নোটিশ দিয়েছে। যুদ্ধোত্তর যুগে জীবন-

যাপনের মান অসম্ভব রকম উঁচু হয়েছে—নিত্য প্রয়োজনীয় অর্দ্ধেক জিনিষ তো পাওয়াই যাচ্ছে না। রোগে চিরকালই মানুষ মরে—আজও মরছে, তবে মৃত্যুর হারটা বেশী। কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব—আর খাদ্যে ভেজাল তো আছেই। রোগের ওপর আছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যাদের কাছে জীবনধারণই সব চেয়ে বড় ও কঠিন সমস্যা—তারা কি করে রাজনীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হ'ল—, কিন্তু রাজনীতি তাদের বহু দূরে ও গভীরে টেনে নিয়ে গেছে। ধর্ম্মের খোলসটিকে বাঁচাবার জন্য তারা জীবন বিসর্জ্জন দিচ্ছে—মানুষ হাসছে দূরে দাঁড়িয়ে। যাই হোক, রাজনীতি বা ধর্ম্ম কোনটাই তাদের জীবন বিসর্জ্জনের হেতু নয়—আসলে ঈর্ষা-ক্ষুব্ধ দুর্ব্বল মনে আদিম বৃত্তিকে জাগিয়ে দিয়ে সাবধানীর দল নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেবার জন্য এই খেলা খেলছে।

সর্ব্বেশ্বর রায় বললেন, এ-ও তাদের খেলা। আমি বাজী রেখে বলতে পারি ওই দলকে মোটা রকম কিছু দিলে ধর্ম্মঘটের নোটিশ তুলে নেবে।

কমল মিত্র বললেন, টাকার দরকার হলে—আবার নোটিশ দেবে ওরা। ওদের হাতের খেলনা হয়ে যদি ফ্যাক্টরী চালাতে হয়—তার চেয়ে ফ্যাক্টরী তুলে দেওয়া ভাল।

অনন্ত দোবে বললেন, বিজনেসম্যান কখনও বিজনেস তুলে দেবার কথা বলে না। কি লাভ রইল না রইল, এই দেখা আমাদের ডিউটি।

সর্ব্বেশ্বর বললেন, ডিউটি তো—কিন্তু ওদের চোখ রাঙানি সইতে পারবেন কি?

প্রশান্ত বললে, কতকগুলি সর্ত্ত আমরা ঠিক করে ফেলি—ওদের ফেডারেশন যদি সেগুলি মেনে নেয়—

সবগুলি যদি ওরা না মানে—

আমরাও বিবেচনা করে দেখব ওদের সব সর্ত্ত মেনে নেওয়া যায় কিনা। কিছু কাটছাঁট দু'পক্ষকেই করতে হবে।

আপোষ-মনোভাব ওদের নেই। দেখেন নি—কলকাতা থেকে মেয়ে পুরুষ লীডার এসে মিটিং করে তাতিয়ে দিয়ে গেল কেমন। চলছে না—। আরে আমাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিঙের সঙ্গে তোদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং এক করলে হয় কখনও। যে রকম দাবির বহর কোন দিন বলে বসবে—একখানা মোটর না হলে আমাদের ভারি কষ্ট হচ্ছে! সর্ব্বেশ্বর শ্লেষের ভঙ্গিতে কথাগুলি তীক্ষ্ণ গলায় উদ্গীরণ করলেন।

সবাই হাসলেন—কিন্তু কথা না বাড়িয়ে দু'পক্ষের সর্ত্তগুলিকে কাটছাঁট করে মোটামুটি আপোষের একটা ভিৎ খাড়া করলেন।

কমল মিত্র বললেন, এতেও মিটবে না—হাতে ছাড়বার মত ও ছাড়াবার মত দু'একটা বিষয় ঠিক করে নিন।

যথা!

ওই ক্যাজুয়েল লিভটা উঠিয়ে—মোট কুড়ি দিন ছুটি বছরে দেওয়া যেতে পারে। ডাক্তারী সার্টিফিকেটে ধরুন এক মাস। হাফ পে'র কোশ্চেন রাখবেন না। আর জরুরি অবস্থা না হলে মাইনের হার দশ বছরের মধ্যে বাড়ানো চলবে না।

সর্ব্বেশ্বর বললেন, বোনাসটা কি একদম বাদ দেওয়া যায় না?

প্রশান্ত বললে, না—পূজোর সময় একটি বোনাস দিতেই হবে—অতিরিক্ত লাভ হলে আর একটা—

না—না—না—মশায় আর আস্কারা দেবেন না। সর্ব্বেশ্বর চীৎকার করে উঠলেন।

সভার শেষে পথ দিয়ে ভাবতে ভাবতে চলেছিল প্রশান্ত। এই দরকষাকষি ব্যাপারটা তার ভালই লাগে নি। এই দেওয়ার মধ্যে প্রীতির প্রকাশ কই? দাবি মিটলে যারা কাজে আসবে তারাই কি নিরহঙ্কৃত মনে মনিবগোষ্ঠীকে শ্রদ্ধা দেখাতে পারবে কিংবা কাজে দিতে পারবে পূর্ণ মনোযোগ? এক পক্ষ আদায় করে নিয়ে উদ্ধত হবে—অন্য পক্ষও সেই অনুপাতে তাদের পীড়ক বলে ঘৃণা করবে। মানুষের মন সাধারণ অবস্থাকে অতিক্রম করে জয়পরাজয়কে মনে স্থান না দিয়ে নির্ব্বিকার হতে পারে কি! শ্রমিকরা সর্ত্ত যা দিয়েছে তাও যথেষ্ট বাড়ানো—মালিকরা যা মেনে নিচ্ছেন তাও ন্যায্য অংশের চেয়ে ন্যূন তো বটেই। কারও মধ্যে আন্তরিকতা নেই। একে আপোষ বলার চেয়ে ভাবী যুদ্ধের প্রস্তুতি বলাই ঠিক।

মোড় ফিরতেই মালতী এসে মিলল ওর সঙ্গে।

ইস্—খুব ভাবতে ভাবতে চলেছেন দেখি? ব্যাপার কি?

নাঃ—এদিকে কোথায় গিছলেন?

মালতী বললে, কোথাও না। বাঃ রে, বাড়ীর দিকে চললেন যে—বেড়াতে যাবেন না?

আজ থাক।

উঁহু—আজ একটা আশ্চর্য্য জিনিস দেখাব আপনাকে।

উইচিবিটা আছে—প্রশান্তর হাত ধরে ও বিপরীত দিকে আকর্ষণ করলে।

অগত্যা মালতীর সঙ্গ নিতে হ'ল।

মালতী বললেন, আর কি—এবার তো ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল। উনিশ শো আটচল্লিশের তিরিশে জুন ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যাবে। শোনেন নি আজ এটলির ঘোষণা রেডিওতে?

তাই নাকি?—ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টে লীগকে নিয়ে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে—তাই পণ্ডিত নেহেরু ব্যাপারটি বিলেতে

জানিয়েছিলেন। এ অবস্থা থাকলে তাঁরা লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়বেন এই ভয় দেখিয়েছিলেন।

তারই ফলে লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করা হ'ল। উনি নাকি শেষ ভাইসরয়।

প্রশান্ত বললে, খোশ খবরের বুটোও ভাল।

বুটো? এমনি ঢাকঢোল পিটিয়ে মিথ্যা প্রচার করতে পারে কেউ? মালতী অকৃত্রিম বিস্ময়ে চেয়ে রইল প্রশান্তর পানে।

প্রশান্ত হাসলে। বললে, রাজনীতি আমরা বুঝি না—এটা যেমন ঠিক—ইংরেজী ভাষার ভাষ্যগুলিও তেমনি নানান জাতের। কোথায় ওঁর ফাঁক রইল—সে কি তুমি আমি পারব ধরতে।

মালতী বললে, এত সোজা কথার মধ্যেও—

প্রশান্ত বললে, স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয় একথা মান তো। বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা আসে—ইতিহাসে এ নজির মেলে না—অথচ আমরা পেয়ে যাচ্ছি—

মালতী বললে, জগতে দুটো ব্লক তৈরি হচ্ছে তারই সুযোগে আমরা—

আমার এখনও সন্দেহ আছে। ভারত ছাড়ব বললেই ভারত ছাড়া যায় না। সেদিন যেন পডছিলাম কে একজন লিখেছেন—সিঙ্গাপুরকে মালয় ষ্টেট থেকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে। ওখানে ব্রিটিশ নৌঘাঁটি কায়েম তো রইলই। আন্দামান নিকোবর দ্বীপগুলি থেকে সিলোন পর্য্যন্ত ওরা নিরাপত্তার একটা লম্বা লাইন টানছে—যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপে মার্কিনী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা চলছে। ঈজিপ্ট হয়ে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত ব্রিটিশ এই লম্বা লাইন দৃঢ় করে রাখবে। ভারত ছেড়েও ভারতকে ছোরা দেখিয়ে বশে রাখবার ব্যবস্থা। তা ছাড়া ভেবে দেখ—দেশীয় রাজ্যগুলি এখনও গণপরিষদে যোগ দিতে ভরসা পাচ্ছে না—ওরা নিজেরা স্বতন্ত্র থাকতে চায়—আর ব্রিটিশ সে সুযোগ ছাড়বে বলে বোধ হয় না।

মালতী বললে, হাঁ—ঘোষণায় এ কথাও বলা হয়েছে—ভারতের অনিচ্ছুক প্রদেশ বা অংশকে জোর করে প্রধান অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে না। ব্রিটিশ যে-কোন প্রধান দলের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাবে—ভিন্ন ভিন্ন দলকেও ক্ষমতা দেওয়া আশ্চর্য্য নয়।

প্রশান্ত বললে, ভাষ্য রচনার মস্ত বড় একটি ফাঁক ঐখানেই রয়েছে।

মালতী বললে, সত্যিকারের ক্ষমতা যদি নাই দেবে—তো এসব ঘোষণার মূল্য কি?

প্রশান্ত বললে, সততা আর রাজনীতিতে অহি-নকুল সম্বন্ধ। ওর মূল্য আমরা বুঝতে পারব না।

মালতী বললে, সত্যি—এ সব কচকচি ভাল লাগে না। আসুন একটু বসা যাক।

দু'জনে ঘাসের উপর বসলে। পিছনে বাঁশবন—বাতাসে নুয়ে-পড়া বাঁশ থেকে কট্ কট্ শব্দ হচ্ছে, একটি ঘুঘু পাখী কোথায় আত্মগোপন করে মাঝে মাঝে সেই শব্দে সুর সাধছে। সামনে ধু-ধু করছে মাঠ। কুঠারের আঘাতে বহু গুল্ম ও বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়েছে। শহর এগিয়ে আসছে। এখনও আকাশ রয়েছে নীল। মোটা চিমনির ধোঁয়া এদিককার আকাশকে ঢেকে দিতে পারে নি এখনও।

কালই আমি চলে যাচ্ছি। আকাশের পানে চোখ তুলে মালতী বললে।

কালই! কথাটি ধীর বিলম্বিত স্বরে উচ্চারণ করলে প্রশান্ত।

হাঁ—তবে মাসখানেকের মধ্যেই হয়ত ফিরে আসব। আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে মালতী বললে।

প্রশান্ত উদাস দৃষ্টিকে প্রান্তরের পার থেকে টেনে আনলে না। সংক্ষেপে বললে, ভাল।

জায়গাটা আমার ভালই লেগেছে। কাল বলছিলাম না—সব শহরের বনেদিয়ানা থাকে না—আর বনেদিয়ানা না থাকলে মানুষকে টানতেও পারে না সে জায়গা!

হাঁ—আমি বলেছিলাম নাই বা থাকল বনেদিয়ানা। নতুন ভাবে সৃষ্টি করার মধ্যেই রয়েছে ভাল লাগার বস্তু।

আপনার কথাগুলি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম কাল। ভাবতে ভাবতে দেখলাম—এ জিনিস আমারও তো ভাল লাগা উচিত। অন্য যুগকে যদি ভালবাসতে পারি ত নিজের যুগকে অবহেলা করব কেন?

কিন্তু ভালবাসা—আর ভাল লাগা উচিত ত এক নয় মালতী।

একই দৃষ্টিভঙ্গির একটুখানি তফাৎ শুধু। যেই মনে হ'ল উচিত অমনি—

হেসে উঠল প্রশান্ত, অমনি ভালবাসার ডিগ্রীতে হু-হু করে তাপ উঠে গেল!

মালতীও হেসে বললে, গেলই তো।

তারপর দু'জনেই বহুক্ষণ ধরে বিলম্বিত হাসির তালে তাল দিয়ে চলল। প্রশান্ত দেখলে—আকাশ অত্যন্ত নীল হয়ে উঠছে—মালতী দেখলে—পায়ের তলাকার ঘাসগুলি গাঢ় সবুজে রূপান্তরিত হ'ল।

প্রশান্ত আবেগভরে মালতীর একখানি হাত তুলে নিয়ে ডাকলে, মালতী!

এই ভাষা এই আবেগকম্পিত সম্বোধন সৃষ্টি-চৈতন্যের উন্মেষ হতে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন নারীর কানে একটি ছাড়া অন্য কোন অর্থে প্রতিধ্বনিত হয় নি। এ সম্বোধন নয়—সম্পদ।

মালতী ডুব দিলে সেই সম্পদসাগরে।

২৭

নতুন শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল অত্যন্ত দ্রুত। প্রশান্তর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—মিত্র আপত্তির হেতু খুঁজে পেলেন না। এ এক পক্ষে ভালই হ'ল। উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি ধরে যাঁরা উচ্চ রাজপদের সামীপ্যে বিচরণ করেন তেমন বর অবশ্য সকলকারই কাম্য। কিন্তু যশ-সম্মানের অধিকারী হলেই সম্পদটা যথাপ্রাপ্য হিসাবে লাভ করা যায় না। ওখানে উদ্যম কথাটির মূল্য দিয়েও ভাগ্য জিনিসটাকে নস্যাৎ করা কঠিন। কমল মিত্র যখনই মুখে উদ্যোগী পুরুষসিংহের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন, মনে মনে বলেন—ভাগ্যও সম্পদসৃষ্টির আর একটি স্তম্ভবিশেষ। মানুষের মত সম্পদেরও দুটি চরণ—আর তাতেই তার সম্পূর্ণতা। মালতীর ভবিষ্যৎ এই মিলনে উজ্জ্বল বোধ হ'ল—এবং প্রসন্ন মনে তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নতুন শহরের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের সর্ত্ত মেলে নি ; দু'পক্ষের অনমনীয় ইচ্ছা মনোমালিন্যকে সুদৃঢ় করে তুলছে। হাতে-রাখা সর্ত্তগুলির কিছু ছেড়েও মিলনের উপকূলে পৌঁছানো অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

মিত্র মত প্রকাশ করেছেন, না হয় দু'মাস বন্ধ রাখব ফ্যাক্টরী—ওদের অন্যায় জিদ তবু মানব না।

সর্ব্বেশ্বর বলেছেন, আর কেন—বানপ্রস্থের সময় তো হ'ল—এবার খানকতক কোম্পানীর কাগজ কিনে কাশীবাস করব ভাবছি।

অনন্ত দোবে কোন মন্তব্য করেন নি। ব্যবসাদারের শিরায় মজ্জায় ব্যবসার রক্ত বহমান—কোন রকমে লাখ-কতক নিয়ে মুখ ফিরানো তাঁর রীতি নয় বলেই শেষ পর্য্যন্ত হাল তিনি ছাড়েন নি।

প্রশান্তর অভিমত—ব্যবসা শুধু অর্থসঞ্চয়ের যন্ত্রবিশেষ নয়। সমাজ-ব্যবস্থাকে সুস্থ ও সবল করে রাখবার এ একটি অতি আবশ্যক প্রথা। সেইজন্যই আপোষ-মীমাংসার পক্ষপাতী সে।

কিন্তু শ্রমিক-সঙ্ঘ আপোষ-মীমাংসায় রাজী হয় নি।

ব্যাপারটা সালিশীতে দেওয়ার কথা উঠেছে। মালিকরা সকলেই অবশ্য এ বিষয়ে একমত নন। তাঁদের অনেকের ধারণা এতে তাঁরা দুর্ব্বল হয়ে পড়বেন—তাঁদের মান-প্রতিপত্তির লাঘব হবে—মর্য্যাদার সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না শ্রমিকদের সামনে। তবে প্রশান্তর যুক্তিতে যত না হোক, কালধর্ম্মের প্রভাবটা তাঁরা অন্তরে অন্তরে স্বীকার করে সালিশী রফায় সম্মতি জানিয়েছেন। বাকি আছেন প্রশান্তর নিয়োগকর্ত্তা চৌধুরী সাহেব। তাঁর অনুমতি নেবার জন্য প্রশান্ত আজ বৈকালেই কলকাতা রওনা হবে।

—মালতী এসে দাঁড়াল মোটরের সামনে। বললে, আমাকে পৌঁছে দেবেন শ্যামবাজারে ?

—প্রশান্ত দুয়ার খুলে বললে, এস।

দু'জনে পাশাপাশি বসলে। প্রসাধিতা মালতীর মৃদু দেহ-সৌরভে গাড়ীটা ভরে গেল—। গতির সঙ্গে দু' পাশের দিগন্ত-লীন নীল আকাশ সরে সরে যাচ্ছে—নিস্তব্ধ একটি অবসর দু'জনকে ঘিরে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে—তবু ওরা দু'জনে যেন দুই জগতের প্রাণী।

প্রশান্ত চিন্তার গভীরে ডুবে গেলেও মাঝে মাঝে অসঙ্গত নিস্তব্ধ মুহূর্ত্তগুলি ওর চৈতন্যকে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু বলা দরকার মালতীকে—অথচ সে কথাটি কি এই মুহূর্ত্তে তা স্মরণে আসছে না।

অবশেষে মালতীই কথা বললে, কি যেন ভাবছেন ? ষ্ট্রাইকের কথা না কি ?

হাঁ। মাথা নেড়ে স্বীকার করলে প্রশান্ত।

মালতী বললে, তা এতে ভাববার কি আছে, ওদের দাবি মিটিয়ে দিন না।

প্রশান্ত হাসলে—কোন কথা বললে না।

মালতী ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, সত্যি—এত সব অশান্তি কেন যে সাধ করে পোয়ায় মানুষ !

প্রশান্ত বললে, অনিচ্ছাতেও অশান্তি আসে—

মালতী সোজা হয়ে বসে বললে, না—সম্পূর্ণ ইচ্ছাতেই বলব। এই যে হাঙ্গামা—

প্রশান্ত বললে, এমনি ধারাতেই জগৎ চলছে। হাঙ্গামা কোথায় নেই। তুমি ইচ্ছা করলেও যেমন অনেক হাঙ্গামা থেকে আলাদা থাকতে পার না তেমনি—

মালতী বললে, প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ বুঝত—

ঠিক বলেছ। এমন কতকগুলি ঘটনা আছে—যা স্বার্থের সঙ্গে কায়েমীভাবে জড়ানো—এমন কতকগুলি বৃত্তি রয়েছে—যা তথাকথিত মান-সম্মানের দাবিতে বেশ উগ্র—এই সবই খোলা চোখ আর খোলা মন নিয়ে বিচার করতে দেয় না মানুষকে।

কেন—ওদের যদি চিনতেই পারি আমরা—

চিনতে পারি না বলেই তো মুশকিল। প্রশান্ত হাসলে।

মালতী কোন কথা কইলে না। বাইরের দৃশ্য মোটরের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত—মনকে সেই তালে ছুটিয়ে দিলে হয়ত নিস্কৃতি পাওয়া যায়—কিন্তু মন রয়েছে অগুত্র। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। অবশেষে ও বললে, কখন ফিরবেন ?

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই। তারপর কেউই কথা বলবার চেষ্টা মাত্র করলে না।

প্রশান্তর কি জানি কেন মনে হচ্ছে মালতী সঙ্গে না এলেই ভাল হ'ত। একলা একলা যাবার মুখে আসন্ন সমস্যাগুলিকে ভাল করে ভেবে দেখবার অবকাশ পাওয়া যেত। মালতী

যে ধরণের তর্ক করে তাতে তর্কই করা যায়—মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। কি লাভ ওই ধরণের কথা কাটাকাটি করে। শুধু কথার কৌশলে মানবীয় বৃত্তিগুলিকে ব্যাখ্যা করলেও তার দোষ-ভাগ বর্জ্জন করা যাবে না। তর্কের মধ্যে লড়াইয়ের মনোভাব—বিপরীত মত-সংঘাত মুহূর্তে ভেসে যায়, যদি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে তা ধ্বনিত না হয়।—সহসা মনে হ'ল, মালতীর বদলে শুভা যদি তার সঙ্গে আসত? শুভা?—আজ সে শুভার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় নি কি?…শ্রমিকদের দাবির পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ যে শক্তি রয়েছে শুভারও অংশ রয়েছে তার পরিচালনায়। শুভা এই নূতন শহরের…মালিকদের নিশ্চয় জানে। তার…ওদের দাবি পূরণের অস্বীকৃতিতে স্বৈরাচারের নমুনা দেখে মনে মনে নিশ্চয় হাসছে। মনের মধ্যে হু হু করে উঠল।

প্রান্তর পার হয়ে শহরে প্রবেশ করল মোটর।

মালতী বললে, মোড়ের মাথায় বাঁধবেন—নামব।

কেন—বাড়ীতে পৌঁছে দিই না?

দোকানে দরকার রয়েছে—তা ছাড়া দু'এক জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যাব।

মোটর থেকে নেমে মালতী বললে, ঘণ্টাতিনেক পরে যখন ফিরবেন—আমাকে তুলে নেবেন কিন্তু।

আজই ফিরবেন?

ইচ্ছা'তো আছে। নমস্কার। হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে মালতী এগিয়ে চলল।

আজকাল অন্তরঙ্গতার সুযোগে ওদের সামাজিক রীতি-নীতি যথেষ্ট শিথিল হয়েছে। এতখানি একসঙ্গে এসে মাত্র তিন ঘণ্টার ব্যবধানে এই ভদ্রতাবোধ জাগল কেন তা বিস্ময়ের বিষয়। এ কি শহরের সনাতন বৃত্তি? বাড়ী আর মানুষের বেড়া চোখের সঙ্গে মনকেও আড়াল করে রাখে? একাকী মানুষ অত্যন্ত সহজ; কিন্তু বহু মানুষ এক হলেও একাকী হতে পারে না, আর সেই কারণেই সভ্য আচার-ব্যবহারের বহু অলঙ্কার তার গায়ে চাপানো।

চৌধুরী হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, কি খবর প্রশান্ত? বস—আগে এক কাপ চা খেয়ে তাজা হও—তার পর তোমার অভিযোগ শুনব। প্রশান্ত চায়ের কাপ টেনে নিয়ে বললে, আমি যে অভিযোগ করতে এসেছি—এ আপনি জানলেন কি করে?

চৌধুরী হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, যারা—লক্ষ্মীর সাধনায় পৃথিবীতে দাবার ছক পেতে বসে—তাদের কানকে সজাগ আর দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ রাখতেই হয়। এই দেখ—বলে মরক্কো চামড়া বাঁধানো একখানা ফাইল তুলে নিলেন বাঁ দিকের ট্রে থেকে। ফাইলের লাল ফিতে খুলতে খুলতে বললেন, এই ফিতে দেখে যেন মনে করো না—এটা সরকারী দপ্তরখানার মতই মেজাজদার।

প্রশান্ত ঈষৎ হাস্য করে বললে, না—তা মনে করব না। জরুরি ব্যাপারে—

চৌধুরী বললেন, হাঁ—কোটি কোটি টাকার ব্যাপারে তা মনে করা অন্যায় হ'ত না—কিন্তু—এই দেখ। একখানা নীল রঙের পুরু লেফাফা তুলে নিয়ে প্রশান্তর দিকে এগিয়ে দিলেন।

প্রশান্ত চিঠিটা বার করে পড়বার উদ্যোগ করতেই তিনি বললেন, চিঠি পড়বার আগে তোমার ব্যক্তিগত মতামতটা আজ জানতে চাই। চিঠি লিখেছেন সর্ব্বেশ্বর—আর সকলের জবানীতে। ওঁরা জানাচ্ছেন—আয়ব্যয়ের হিসাব করে দেখা যায় শ্রমিকদের দাবি মেটাতে গেলে লাভের অঙ্কটা নাকি চুপসে যাবে। যা থাকবে তা ভূতের ব্যাগার খাটা মাত্র। তোমার মতটা নাকি দাবি মেটানোর দিকে—অবশ্য ন্যায্য দাবি। কিন্তু আমি জানতে চাই কাকে ন্যায্য দাবি বলবে তুমি?

প্রশান্ত বললে, বেশী মুনাফার লোভ না রেখে যথাসম্ভব ওদের দাবি মেটানো যায় যদি—

এই নিয়ে কবার মেটানো হবে ওদের দাবি?

তা বার তিনেক বোধ হয়।

কতটুকু সময়ের মধ্যে?

বছরখানেক।

প্রত্যেক ছ'মাস অন্তর ওরা যদি দাবি জানায়—তাকে ন্যায্য বলা যায়?

কিন্তু—

কিন্তু থাক। যুদ্ধের আগেকার জিনিসপত্রের দাম আজকের তুলনায় হয় তো পাঁচ ছ'গুণ কম। সেই অনুপাতে যদি মজুরি দেওয়া যায়—ফ্যাক্টরীকে চালু রাখা সম্ভব হয় কি?

হয় না স্বীকার করি। তবু যতটুকু সম্ভব—

সেই যতটুকু কে ঠিক করে দেবে প্রশান্ত। আমি মালিক আমি পারব—না তুমি মজুর তুমি পারবে? তোমরা প্রস্তাব করেছ কোন নিরপেক্ষ সালিশ নিযুক্ত হোক—সেখানে শ্রমিক আর মালিক প্রতিনিধি থাক—বেশ ভাল কথা। কিন্তু তার আগে একটা কথা দু'পক্ষ থেকে ঠিক করে মেনে নেওয়া উচিত নয় কি?

কি কথা বলুন।

ধর—আর দু'বার যে মজুরি বাড়িয়ে দিয়েছিলে—তাতে উৎপাদন কিছু বেড়েছিল?

না—বরং—

বরং উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ—কিছু হাতে পেয়ে আরও কিছু পাবার আশায় ওরা মন দিয়ে কাজ

করে নি। সেটা ওদের দিক থেকে সর্ত্ত ভঙ্গ বলা যায় কি না?

যায়। কিন্তু…

কিন্তু নয়—ওরা সর্ত্ত ভঙ্গ করেছে। অভাবগ্রস্ত দেশে কম মাল উৎপন্ন করাটা—আইন থাকলে আর দেশ স্বাধীন হলে শাস্তিভোগের কোঠায় পড়ত কিনা! আচ্ছা এসব না হয় ছেড়ে দিলাম। মালিকী মনোবৃত্তি নিয়ে নয়—সোজা জিজ্ঞাসা করছি ওদের দিক দেখে যতটা সুবিধা দেওয়া সম্ভব আমরা দেব—তার বিনিময়ে ওরা সন্তুষ্ট মনে কাজ করবে তো? জানতো—যে হাঁস রোজ একটি সোনার ডিম দিতে পারে—তাকে হত্যা করলে একসঙ্গে সে ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম দিয়ে যায় না।

প্রশান্ত সোজা হয়ে বসল। বললে, আপনার কথা আমি বুঝেছি। এ প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছে।

এটা আমার প্রশ্ন নয়—যে দেশে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট আছে—যাঁদের শক্তিশালী ইউনিয়ন আছে, তাঁদের কথা। তারা যেমন ন্যায্য দাবি করে তেমনি ন্যায্য শ্রম দেয়। ন্যায্য শ্রম দিতে পারে না যে শ্রমিক সে ইউনিয়নের সভ্য হতে পারে না। তাকে শাস্তি দেয় ইউনিয়ন।

আমাদের দেশে তেমন—

তেমন নীতি নেই কারণ সঙ্ঘ-নেতারা দুর্ব্বল। তাঁরা নেতাই থাকতে চান—শ্রমিকদের লোভের যোগান দিয়ে। ওদের লোভকে ন্যায্য পথে চালাতে শেখেন নি।

প্রশান্ত চুপ করে রইল—কি বলতে চান চৌধুরী? দাবি মেটানোর অনুকূলে ওর মত হয়ত—

চৌধুরী বললেন, ঘাবড়ে যেয়ো না হে। আমিও মানুষ—মানুষের দুঃখকষ্ট বুঝি। ওদের দাবি মেটানোর সপক্ষে মত দেব—তবে তথাকথিত শ্রমিক-নেতার হুমকিতে নয়। নিরপেক্ষ সালিশ বসুক—বার বার নয়, একবারেই ঠিক হোক চুক্তি। ন্যায্য দাম—ন্যায্য শ্রম। নিক্তির এদিক ওদিক হেললেই দায়িত্ব বহন করতে হবে।

প্রশান্ত বললে, নিক্তি নিয়ে বসলে সোনার ওজন ঠিক হতে পারে—মানুষের অভাব—

পাকাপাকি কিছু করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। দ্রব্য-মূল্যের মান কমলে শ্রমমূল্য যে কমবে না এ কুযুক্তি অবশ্য মানব না—আবার দ্রব্যমূল্য আরও চড়ে যদি—

হাঁ—সেটা আমরা ঠিক করে নেব।

চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, ঠিক হবে না হে—ঠিক হবে না। শ্রমিকের নেই মাথা—শ্রমিক-নেতার নেই দূরদৃষ্টি বা সাধুতা।

সকলকে একথা বলবেন না।

সকলকে বলব এ স্পর্দ্ধা আমার নেই—কিন্তু যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি—প্রমাণ অবশ্য দেব। বলে একটা হলদে চিরকুট বার করে দুটি আঙুলে তুলে ধরে হাসলেন। এটা হ'ল যুদ্ধ-বিরতি পত্র। দশটি হাজার টাকা ঢাললে আপাতত এই বিরোধ মিটবে।

প্রশান্ত আরক্ত মুখে বললে এ নিশ্চয় খাঁটি শ্রমিক-নেতার প্রস্তাব নয়—কোন জালিয়াত—

হাঁ—জালিয়াত। এরাই তো খুঁটি গেড়ে বসেছে জনগণের মাথায়। বড় অস্ত্র এদের হাতে ধর্ম্মঘট—। এই অস্ত্র না থাকলে এদের প্রভুত্ব থাকত কোথায় প্রশান্ত।

প্রশান্ত বললে, যাই হোক—এদের কুকীর্ত্তির কথা এদের সঙ্ঘে জানানো উচিত।

প্রমাণ কই।—এ কাগজে স্বাক্ষর নেই—হাতের লেখা সনাক্ত করা কঠিন—তবু এ মিথ্যা নয়।

আপনি নিশ্চয় এই টাকা দেবেন না।

কেন দেব না—? অধিকাংশ মালিকই কিন্তু এই ঘুষ দিতে রাজী হয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন আমাকে, যাতে আমি অরাজী না হই।

প্রশান্ত মাথা নামিয়ে বললে, আমি ঘুণাক্ষরেও যদি জানতাম—

চৌধুরী বললেন, টাকার অঙ্কটা শুনতে ভারী, কিন্তু দমে ভারী নয়। অর্থাৎ এ দিয়ে যদি বছরখানেক ঠেকিয়ে রাখতে পারা যায় আন্দোলনকে তো যথেষ্ট লাভ। এইবার চিঠিখানা পড়—লাভের হিসাব নিকাশ তাও ওতে আছে—দেখ। আমি আসছি। পাইপ ধরিয়ে চৌধুরী কক্ষান্তরে গেলেন।

ঘরের একশো ওয়াটের বিদ্যুৎ বাতিটা যেন নিবু নিবু হয়ে এল। পৃথিবী—পরিবর্ত্তিত হচ্ছে এটা সত্য—কিন্তু অভাবনীয় এই দ্রুত পরিবর্ত্তনে যা সরে যাচ্ছে পায়ের তলা থেকে—যা মিলিয়ে যাচ্ছে সামনে থেকে, তাকে মেনে নেওয়ার ফুরসৎটুকুও যে পাওয়া যাচ্ছে না। কে অসাধু? শ্রমিক-নেতা, না মালিক? না—যুদ্ধোত্তর এই পৃথিবী?

চৌধুরী ফিরে এসে বসলেন চেয়ারে। নতুন চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে সস্মিত মুখে তিনি প্রশান্তর পানে চাইলেন।

প্রশান্ত পাংশু মুখ তুলে বললে, না-না আপনি এতে রাজী হবেন না। রাজী হবেন না—

চৌধুরী ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—না, রাজী হই নি। তুমি শ্রমিক-নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে পার। সৎ ভাবে যা করা সম্ভব—শেষ পর্য্যন্ত আমার সমর্থন পাবে তুমি।

প্রশান্তর মুখে হাসি ফুটল।

ক্রমশঃ

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

মধ্য-পশ্চিম

পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার। সকাল আটটায় তাপ খুব নামিয়া গেল। তখন তাপ শূন্যের ২২ ডিগ্রী নীচে। ১৯১৭ সনের পর নাকি এদেশে তাপ এত নীচে আর নামে নাই। তীব্র শীতের নানারূপ প্রতিক্রিয়ার কথা খবরের কাগজে পড়িলাম। শিশু অতিরিক্ত আবরণের চাপে দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গিয়াছে। রেলগাড়ীর চাকা অতিরিক্ত শীতে ফাটিয়া গিয়াছে। ট্রেন চলাচল অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। টেলিফোন লাইন অকেজো হইয়া গিয়াছে। লোক ঠাণ্ডায় জমিয়া মরিয়া গিয়াছে। শীতের চোটে সতী পতি ছাড়িয়া আদালতে ডাইভোর্স-কেস আনিয়াছে। এক পত্নী নালিশ করিয়াছেন যে তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জমিয়া যাওয়া পর্যন্তও তিনি পতির সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু পরে আর থাকিতে পারিলেন না। পতিরও উষ্ণতর গৃহের ব্যবস্থা করিবার মত আর্থিক সংস্থান নাই। কাজেই বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করিতে হইতেছে।

বেলা ৯টার পর বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন তাপ শূন্যের ১৮° ডিগ্রী নীচে। ক্রমশঃ বেলা একটায় শূন্যের ১° ডিগ্রী নীচে গিয়া আরো নামিতে সুরু করিল।

সেদিন ক্যাপিটল ভবনে বহু সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হইল। এক দিনের মধ্যে অনেক কাজ শেষ করিতে হইল। সকলেরই ব্যবহার অমায়িক। আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। আর্লবার্গ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু আলাপ করিলেন। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। আমার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ভারতবর্ষে বম্বেতে ডাক্তারী করিতেন। তাঁহার খবরও অনেক দিন পাই না।

আমি—তাঁহার নাম একল্যাণ্ড। তিনি এখন রেনোতে ডাক্তারী করেন।

বার্গ (সবিস্ময়ে)—আপনি কি করিয়া জানিলেন!

আমি—তাঁহার সঙ্গে আমার শিকাগোর এক হোটেলে সাক্ষাৎ হইয়াছে।

আচ্ছা, ইঙ্গ-ভারতীয় সমস্যার আসল স্বরূপটি কি?

আমি—এক কথায় সমস্যাটি হইল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সমস্যা। উভয় পক্ষ এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত পোষণ করেন।

বার্গ—ইংরেজ বোধ হয় আপনাদের সঙ্গে সামাজিকতার ক্ষেত্রেও খারাপ ব্যবহার করে। ব্রেজিলের একটি ভদ্রলোক কিছুদিন পূর্বে আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন। যাইবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন যে, আপনারা আমার সঙ্গে যেরূপ সহৃদয় ব্যবহার করিলেন ব্রেজিলের আমেরিকানগণ যদি স্থানীয় অধিবাসিগণের সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে ব্রেজিল আমেরিকার প্রতি অন্তরূপ ধারণা পোষণ করিত।

আমি—অবশ্য কথায় বলে সুয়েজের পূর্বে গেলে ইংরেজের রূপান্তর হয়। কিন্তু সেটি মূল সমস্যা নয়, মূল সমস্যার অন্যতম বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র।

বার্গ—আপনাদের দেশে তো নানা মত, নানা রুচি।

আমি—ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, প্রায় যুক্তরাষ্ট্রেরই মত। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও বিভিন্নতা কম নয়। পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে রুচি, আচার, মত ও স্বার্থ বিভিন্ন। তথাপি এই আঞ্চলিক পার্থক্য এব্রাহাম লিঙ্কনের পর আর আপনাদের জাতীয় ঐক্যের বা স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই।

বার্গ—আপনি ঠিক বলিয়াছেন।...দেখুন আমি জার্মান, কাল হেষ্টভেড আসিয়াছিল, সে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান। বহু দেশের লোক আসিয়া এখানে এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছে। বাহ্যিক পার্থক্য লইয়া কেহ এখানে কলহ করে না।

আমি—পার্থক্য শক্তিবৃদ্ধিরই কারণ হইয়া থাকে যদি না রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি তাহাকে অন্য কার্যে নিয়োগ করে। বিশেষত বহু দিনের পরাধীনতার ফলে এই সব পার্থক্যকে আশ্রয় করিয়া এক-একটি কায়েমী স্বার্থ শিকড় গাড়িয়া বসে। পরাধীনতা ও এই কায়েমী স্বার্থগুলিকে আমাদের যুগপৎ উৎপাটিত করিতে হইবে। অথচ সময়ও বেশী নাই। কাজেই বুঝিতেছেন আমাদের সমস্যা কি কঠিন। জর্জ ওয়াশিংটন ও এব্রাহাম লিঙ্কন যুগপৎ এই উভয় মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করাই আমাদের প্রয়োজন। সমস্যা যত কঠিনই হোক, আপনাদের ও সারা দুনিয়ার যখন শুভেচ্ছা রহিয়াছে তখন আমরা তাহার সমাধান করিবই।

ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইনি গান্ধীভক্ত। গান্ধীজীর অহিংসাবাদ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিলেন। ম্যাক্ ক্র ইঞ্জিনীয়ার। এখানকার খনিজ লৌহের নমুনা দেখাইলেন। বলিলেন, "আপনাদের দেশের খনিতে অনেক বেশী লোহা আছে এবং আপনাদের দেশে লোহা, কয়লা ও চুনাপাথর খুব কাছাকাছি পাওয়া যায়।"

আমি যে রাষ্ট্রের অধিবাসী তাহার লোকসংখ্যা সম্বন্ধে কথা উঠিতে আমি বলিলাম—"উহা শুনিতে চাহিবেন না। শুনিলে হয়ত আপনাদের মাথা ঘুরিয়া যাইবে। বঙ্গদেশের

লোকসংখ্যা ছয় কোটি অর্থাৎ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যার অর্দ্ধেক।"

আর মি পাওয়ার্স এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার অব্ ট্যাক্সেশন। জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর সেদেশের ট্যাক্স আদায়ের বিভাগগুলিকে পুনর্গঠন পূর্ব্বক সক্রিয় করিয়া তুলিবার ভার দিয়া ইঁহাকে জার্মানীতে পাঠানো হইয়াছিল। সেখান হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিলেন—"জার্মানীতে দেখিয়াছি এক একটি জায়গায় এত লোক বাস করে যে আমরা ধারণা করিতে পারি না। আমি তো দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি।"

আর এক হ্যাটফিল্ড সদ্য জাপান হইতে ফিরিয়াছেন। জাপানের আত্মসমর্পণের পর তাঁহাকে জাপানের রাজ-পরিবারের বাজেট ডিরেক্টর করিয়া পাঠানো হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, আপনি কাল চলিয়া যাইবেন। এই আবহাওয়ায় আপনাকে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলে শুধু কষ্টই দেওয়া হইবে। কারণ আমার বাড়ী শহরের বাহিরে। অদ্য রাত্রিতে নববর্ষ-উৎসব উপলক্ষে আমি সেণ্টপল হোটেলের ক্যাসিনোতে একটি টেবিল রিজার্ভ করিয়াছি। সেণ্টপল হোটেলের দূরত্ব আপনার হোটেল হইতে এক শত গজের অনধিক। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন কি?

আমি—কতক্ষণ আপনাদের উৎসব চলিবে?

হ্যাট্‌ফিল্ড—নয়টায় সুরু হইয়া ভোর দুইটা-তিনটা পর্য্যন্ত চলিবে।

আমি—আমি বড় ঘুমকাতুরে। ঘণ্টাখানেক থাকিয়া চলিয়া আসিলে যদি দোষ না হয় তবে অবশ্যই যাইব।

হ্যাট্‌ফিল্ড—আপনি যেরূপ সুবিধা মনে করেন তাহাতে কোনই আপত্তি হইবে না।

হোটেলে ফিরিবার মুখে বার্গের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম। বার্গ বলিলেন, "আজ নববর্ষ-উৎসব, আমাদের উচিত আপনাকে নিমন্ত্রণ করা।"

আমি—হ্যাট্‌ফিল্ড সেণ্টপল হোটেলে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

বার্গ—বেশ হইয়াছে। আমেরিকাবাসিগণ কিন্তু নববর্ষ উৎসবে প্রচুর মদ্য পান করে। আপনি কিছু মনে করিবেন না।

আমি—আমি যে মোটেই মদ্য পান করি না তাহাতে অন্যান্য সকলের অসুবিধা হইবে না তো?

বার্গ—কিছু না। আপনি কিন্তু আমাদিগকে মাতাল মনে করিবেন না। এক দিনের জন্য সকলেই এখানে একটু ছেলেমানুষী করে।

নৈশ ভোজন সমাপনান্তে রাত্রি নয়টায় সেণ্টপল হোটেল অভিমুখে চলিলাম। হোটেলটি আমার হোটেলের খুব কাছে। হাঁটিয়া যাইতে দুই-তিন মিনিট মাত্র লাগিল। দারুণ শীতে সব জমিয়া যাইতেছে। সর্বত্র স্তূপাকার বরফ। ভিতরে ঢুকিয়া ঈষত্তপ্ত বায়ু-সংস্পর্শে আরাম বোধ করিলাম। গলা-বন্ধ, কান-ঢাকনী ও ওভারকোট রক্ষীর হেফাজতে রাখিয়া ক্যাসিনো-গৃহে প্রবেশ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিতে হ্যাট্‌ফিল্ডের টেবিলটি দেখাইয়া দিল। তখনও হ্যাটফিল্ড-দম্পতি আসেন নাই। আমি একাকী বসিয়া কক্ষটির সজ্জা দেখিতেছি। প্রত্যেক চেয়ারের সঙ্গে একটি করিয়া বেলুন বাঁধা। বেলুনগুলি নানা রঙের। পত পত করিয়া উড়িতেছে। প্রত্যেক টেবিলে যতগুলি চেয়ার ততগুলি বার্ণিশ করা কাগজের টোপর। টোপরগুলিও নানা রঙের। ক্রমশঃ নরনারীর সমাগম হইতে লাগিল। প্রত্যেকের পকেটে একটি করিয়া ছেলেদের খেলনা হারমোনিয়াম বাঁশী। সবাই আসিয়া টোপর মাথায় দিয়া বসিয়া পড়িতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া ছেলেদের মত সোৎসাহে বাঁশী বাজাইতেছেন। আর মাঝে মাঝে পানীয় পরিবেশকের নিকট পানীয় চাহিয়া লইয়া পান করিতেছেন। মনে হইল সবাই যেন বাল্যকালে ফিরিয়া গিয়াছেন।

কক্ষটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। পার্শ্বে মঞ্চের উপর বাদকসম্প্রদায় বাদ্যযন্ত্রসমূহ লইয়া প্রস্তুত। সামনে নৃত্য-প্রাঙ্গণ।

কিছুক্ষণ পরে হ্যাট্‌ফিল্ড-দম্পতি প্রবেশ করিলেন। প্রাথমিক আলাপের পর হ্যাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী পানীয় ফরমায়েস করিলেন। আমি বলিলাম, "আমার পানীয় চাই না।" তিনি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আজকার দিনে একটু?" আমি তখন কমলালেবুর রস চাহিলাম। আমি ছাড়া ইঁহাদের আরও দুই জন অতিথি ছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকটি হ্যাট্‌ফিল্ডের সঙ্গে গত বৎসর জাপানে ছিলেন। সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী। ইঁহাদের সকলেরই বয়স চল্লিশের কম। মহিলাদ্বয়ের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। ক্রমে আলাপ জমিয়া উঠিল, হ্যাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী বলিলেন—আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াছি। গান্ধী ও নেহেরুর কথাও কিছু কিছু পড়িয়াছি।

আমি—তবে তো আপনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন।

হ্যাট্‌ফিল্ড গৃহিণী—আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যসত্যই কিছু জানি না।

আমি—আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ততোধিক। বর্ত্তমানে অবশ্য এদেশের কথা জানিবার ইচ্ছাটা খুব বাড়িতেছে। পূর্ব্বে ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের নাম ভিন্ন বিশেষ কিছু জানিতাম না।

হ্যাট্‌ফিল্ড—এঁদের সম্বন্ধে আপনাদের কিরূপ ধারণা।

আমি—ইঁহাদের নিকট আমরা প্রেরণা লাভ করিয়াছি।

ওয়াশিংটন এদেশকে স্বাধীন করিয়াছেন। লিঙ্কন এ দেশকে একতাবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা ছেলেবেলায় লিঙ্কনের একটি জীবনী পড়ি, বইখানির নাম 'কাষ্ঠকুটীর হইতে সাদাবাড়ী', আমি এবার সে কাষ্ঠকুটীর এবং 'সাদাবাড়ী' উভয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

গান্ধীজী জওহরলাল ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথা উঠিল। হ্যাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী বলিলেন যে, একটি ইংরেজী কবিতা-সংগ্রহে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা পড়িয়াছেন। হ্যাটফিল্ড বলিলেন—নেহেরুকে আমরা সহজে বুঝিতে পারি, কিন্তু বর্তমান যুগে গান্ধীনীতি আমরা বুঝি না। এ যুগে কি অহিংসা বা কুটীর-শিল্প চলিতে পারে?

সহসা হ্যাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী বলিলেন—আচ্ছা, আপনি বলিয়াছেন যে আপনি স্বদেশেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ইংরেজী শিখিলেন কোথায়? আপনি শুধু দ্রুত এবং শুদ্ধ ইংরেজীই বলেন না, সমস্ত ইডিয়ম অতি সহজ ভাবে বলিয়া যান তাহা ইংরেজী ভাষার সহিত নিবিড় পরিচয় ভিন্ন সম্ভব নয়। তারপর আমরা উত্তুরে লোক, খুব দ্রুত কথা বলি। আমাদের দেশের দক্ষিণী লোকেরা বলে, আমরা এত দ্রুত কথা বলি যে তাহারা সব সময় ধরিতে পারে না। কিন্তু আপনার ত কোন অসুবিধা হইতেছে না।

আমি—বিলাত ও আমেরিকার বাহিরে যে এরূপ ইংরেজী শেখা যায় তাহা শুনিয়া আপনি অবাক হইতেছেন। কিন্তু আমরা একটা বিদেশী ভাষা শিখিবার জন্য কি পরিমাণ সময় ও শক্তি নষ্ট করি তাহা দেখিলে আপনি এর চেয়ে অনেক বেশী অবাক্ হইতেন। হ্যাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী তাঁহাদের বন্ধুপত্নীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—ইনি খুব ধর্মশাস্ত্র চর্চা করেন।

বন্ধুপত্নী—আপনাদের দেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি কিরূপ ধারণা।

আমি—আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের কাছে যাইবার পথ অসংখ্য। যে যে পথেই চলুক না কেন সে ঈশ্বরের নিকটেই পৌঁছিবে। কাজেই অন্য পথাবলম্বীর সঙ্গে আমাদের কোন দ্বন্দ্ব তো নাইই, পরন্তু আমরা অন্য পথকে আমাদের নিজেদের পথের মতই শ্রদ্ধা ও মান্য করি।

হ্যাট্‌ফিল্ড—আচ্ছা, বৌদ্ধধর্মের সার কথা কি?

আমি—আমি এসব বিষয়ে বড়ই অজ্ঞ। তবে যতদূর জানি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা কর্মফলে বিশ্বাসী। বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের বা ঈশ্বর-কৃপার উপর জোর দেন না। তাঁহাদের মতে মানুষের স্বীয় কর্মফলই তার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করে।

হ্যাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী—আপনার কথা শুনিয়া আত্মনির্ভরশীল বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল।

জাপানের কথা উঠিল। আমি হ্যাট্‌ফিল্ডকে জিজ্ঞাসা করিলাম—জাপানে ভাষার জন্য বা সেখানকার কর্মপদ্ধতির নূতনত্বের জন্য আপনার কোন অসুবিধা হয় নাই?

হ্যাট্‌ফিল্ড—বিশেষ কিছু নয়। রাজ-পরিবারে সবাই ইংরেজী জানিতেন। আর আমাকে জাপানে পাঠাইবার পূর্বে দু'মাস ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছিল।

এখানে দেখিতেছি নূতন কাজে হাত দিবার পূর্বে সকলেই ট্রেনিং নেয়, আর সমস্ত বিষয়েই গবেষণার ব্যবস্থা আছে।

আমরা যখন এইরূপ আলাপ করিতেছি তখন নৃত্যবাদ্য ও হারমোনিয়াম বাঁশীর উচ্চ ধ্বনিতে কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কলরব ক্রমে কোলাহলে পরিণত হইতেছে। বন্ধু-পত্নীটি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি একবার কক্ষটির সর্বত্র ঘুরিয়া আসিলেন।

হ্যাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী—আপনাকে আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে অনেক বিষয়ে আলাপ করা যাইত। আপনি কি কালই চলিয়া যাইবেন?

আমি—হাঁ।

তখন কক্ষমধ্যে নরনারীর সম্মিলিত বলনৃত্যের ধুম পড়িয়াছে। তালে তালে সুমধুর বাদ্য চলিতেছে। যাঁহারা নাচিতেছেন না তাঁহারা মাঝে মাঝে হারমোনিয়াম বাঁশী উচ্চৈস্বরে বাজাইয়া এবং কখনও করতালির দ্বারা গৃহটিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন। নানা রঙের বেলুন উড়িতেছে। নরনারীর মাথায় নানা রঙের টোপর। তখন রাত্রি ১১টা হইয়াছে। নববর্ষকে নাচিয়া গাহিয়া আনন্দ-কোলাহলের দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে হইবে। আমি দম্পতিদ্বয়ের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহাদিগকে এই আনন্দোন্মত্ত জনতার মধ্যে নিজেদের বিলাইয়া দিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়া চলিয়া আসিলাম। বাহিরে তখন তাপ শূন্যের ১২ ডিগ্রী নীচে। হিম-শীতল বায়ু বহিতেছে। চারিদিকে শুধু শুভ্র বরফ।

দু'দিন পরে সংবাদপত্রে লণ্ডনের একটি ঘটনার এইরূপ বিবরণ পড়িলাম। একটি ভদ্রলোক নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে লণ্ডনের কোন হোটেলে একটি টেবিল রিজার্ভ করিবার জন্য বহু প্রকারে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন। প্রত্যেক বারই জবাব পাইলেন যে, সমস্ত টেবিল রিজার্ভ হইয়া গিয়াছে—'হাউস্ ফুল'। শেষে ভদ্রলোকটি একটি চাল চালিলেন। টেলিফোনযোগে হোটেলের কর্তৃপক্ষকে বলিলেন, "আমি পেশোয়ারের মহারাজের সেক্রেটারী। নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে মহারাজের জন্য আপনার হোটেলে চারিটী আসনযুক্ত একটি টেবিল রিজার্ভ করিতে পারেন কি?" সঙ্গে সঙ্গে টেবিল রিজার্ভ হইয়া গেল। ভদ্রলোক নিজে পেশোয়ারের মহারাজ এই পরিচয় দিয়া বন্ধুবান্ধব লইয়া সেই হোটেলের নববর্ষ উৎসবে যোগদান করিলেন। হোটেলের কর্তৃপক্ষ জানিলেন না যে, পেশোয়ারের মহারাজা বলিয়া কোন মহারাজা নাই।

মিউইয়র্ক

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে হোটেল ত্যাগ করিয়া সেণ্টপল মিনিয়া-পলিসের বিমান-ঘাঁটিতে পৌঁছিলাম। দেখিলাম এখানে পূর্ব এবং প্রাচ্য কথা দুইটি দ্বারা দুটি বিপরীত দিক সূচিত হইতেছে। প্রাচ্যদেশগামী বিমান পশ্চিমাভিমুখে রওনা হইয়া উত্তর মেরুর উপর দিয়া উড়িয়া জাপানে পৌঁছিবে। এ লাইনটি নূতন খুলিয়াছে। পূর্ব-দেশগামী বিমান পূর্বাভিমুখেই গিয়া নিউইয়র্ক পৌঁছিবে। বিমান সাধারণ লোকের শুধু কালজ্ঞানেই বিভ্রাট ঘটায় নাই; দিক-জ্ঞানেও বিভ্রাট সৃষ্টি করিতেছে।

সেণ্টপল হইতে নিউইয়র্ক বিমানপথে ১০৪৬ মাইল। সকালে বিমান নিউইয়র্ক ছাড়িয়া কোথাও না থামিয়া সেণ্ট-পল পৌঁছিবে। সেই বিমানই আবার বৈকালে সেণ্টপল ছাড়িয়া সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক পৌঁছিবে। বিমানটি বড় কনষ্টিলেশন শ্রেণীর। ১০৪৬ মাইল পথ ৪ ঘণ্টায় যায়।

বিমানটি সেণ্টপল ছাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী হইয়া মিল-ওয়াকীর উপর দিয়া উড়িয়া মিশিগ্যান হ্রদ পাড়ি দেয়। তারপর মিশিগ্যান, হুরণ ও ইরী হ্রদ দ্বারা তিন দিকে পরি-বেষ্টিত ভূমিখণ্ড অতিক্রম করিয়া ডেট্রয়েটের নিকট ইরী হ্রদ পাড়ি দিতে সুরু করে। মিল ওয়াকী হইতে ডেট্রয়েট সিধা পূর্ব দিকে। ডেট্রয়েটের নিকট হ্রদটি খুব সরু। ওপারেই ক্যানাডা এবং অদূরে টরোণ্টো নগরী। বিমানটি ডেট্রয়েট হইতে একটু দক্ষিণে বাঁকিয়া ক্লিভল্যাণ্ডের নিকট ইরী হ্রদ অতিক্রম করে। সেখান হইতে নিউইয়র্ক সোজা পূর্বে। ক্লিভল্যাণ্ড ছাড়াইবার কিছু পরেই বাম দিকে অর্থাৎ উত্তরে নায়াগ্রা জলপ্রপাত। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে বিমানে বসিয়া সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রপাতটি দেখা যায়।

সেদিন নিউইয়র্ক হইতে আসিতে বিমানটির প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হইল। তিনটায় সেণ্টপল ত্যাগ করিল। স্তিমিত দিবা-লোকে মিলওয়াকী অতিক্রম করিয়া মিশিগ্যান হ্রদের উপর দিয়া উড়িতেছি। নীচে সমুদ্রোপম হ্রদের শুভ্র-মেঘ-খচিত নীলাম্বুরাশি নির্বাণপ্রায় দিবালোকে অপূর্ব দেখাইতেছিল। ক্রমশঃ দশদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। স্থির বিমানে বসিয়া তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে জানি না। সহসা তন্দ্রাভঙ্গ হইল। দেখি সামনে লেখা পড়িয়াছে "আসন-বন্ধ আঁটিয়া দিন। ধূমপান করিবেন না।" ঘড়িতে দেখিলাম তখনও সাতটা বাজে নাই। দ্রুত চলিয়া চার ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই নিউইয়র্ক পৌঁছিতেছি ভাবিয়া প্রফুল্লতা বোধ করিলাম। বিমান নামিতে সুরু করিল। সহসা ষ্টুয়ার্ডেস্ আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে, আমরা মিলওয়াকীতে অবতরণ করিতেছি। ক্যাপ্টেন আসিয়া বলিলেন, "আমরা ডেট্রয়েট পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। নিউইয়র্কে খুব বরফ পড়িতেছে। হাওয়া আপিস কোন বিমানকেই সেদিকে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত দিতেছে না। ডেট্রয়েটে অবতরণ করিবার অনুমতিও পাই নাই। কাজেই মিলওয়াকীকে ফিরিতে হইয়াছে। আপনাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম বিমান-ঘাঁটিতে জানিতে পারিবেন।"

মিলওয়াকীতে নামিয়া কিছুক্ষণ ভাবী প্রোগ্রামের কোন আভাস মিলিল না। যাত্রীদল চঞ্চল। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে ঘোষণা করা হইল, "যাঁহারা আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকিতে চান তাঁহাদের জন্য শহরে হোটেলের ব্যবস্থা করা হইবে। আর যাঁহারা শিকাগো যাইতে চান তাঁহাদের বাসে করিয়া এক্ষুণি শিকাগো পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। সেখান হইতে কোম্পানীর স্থানীয় কর্মচারিগণ ট্রেনে বা অন্য প্লেনে যাত্রীদের নিউইয়র্ক পৌঁছিবার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিবেন।"

ওয়েবষ্টার ও আমি অন্য ২০।২২ জন যাত্রীসহ বাসে গিয়া উঠিলাম। মিশিগ্যান হ্রদের তীর দিয়া বাস দ্রুতবেগে সিধা দক্ষিণে চলিতেছে। সুন্দর মসৃণ রাস্তা, সর্বত্র উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। দুই ঘণ্টায় প্রায় ১০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটে কোম্পানীর শিকাগো আপিসে পৌঁছিলাম। সেখানে যাহা খবর পাইলাম তাহা এইরূপ: আগামী কল্য দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সমস্ত বিমানের নিউইয়র্ক গমন বা নিউইয়র্ক ত্যাগ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিউইয়র্কের আকাশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই বিরতি-কাল আরও বাড়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। যাত্রী-গণের মধ্যে যাঁহারা বিমানেই বাকী পথটুকু যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের জন্য লাইন না খোলা পর্যন্ত হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইবে। রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিটে নিউইয়র্ক-গামী একটি ট্রেন শিকাগো ত্যাগ করিবে। ট্রেনটি ১৯ ঘণ্টায় অর্থাৎ পরদিন সন্ধ্যা ছ'টায় নিউইয়র্ক পৌঁছিবে। শিকাগো হইতে ট্রেনে নিউইয়র্কের দূরত্ব প্রায় ১০০০ মাইল। সেই ট্রেনে কিরূপ স্থান আছে তাহার খবর লওয়া হইতেছে। যদি স্থান থাকে তবে যাঁহারা ট্রেনে যাইতে চান তাঁহাদিগকে টিকেট দিয়া ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।"

কেহ কেহ অনির্দিষ্ট কালের জন্য শিকাগোতেই থাকিয়া গেলেন। আমি ট্রেন ভ্রমণ পছন্দ করিলাম। সময় খুব কম। তাড়াতাড়ি কোম্পানীর একটি গাড়ী ধরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন ট্রেন ছাড়িবার পাঁচ মিনিট বাকী। বিমান কোম্পানী-প্রদত্ত চিঠির বদলে ষ্টেশনে টিকিট মিলিবার কথা। দেখি কাউণ্টারে উহা লইয়া টিকিট বিক্রেতার সঙ্গে ওয়েবষ্টারের বচসা উপস্থিত। আমি আগাইয়া গিয়া মধ্যস্থতা করিয়া টিকিট সংগ্রহপূর্বক ব্যাগ কাঁধে করিয়া দ্রুত ট্রেনের দিকে ছুটিলাম। দু' এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠিক প্লাটফর্মে প্রবেশ করিয়া

লম্বা ট্রেনের শেষ কামরায় উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনে কেন্দ্রীয় তাপ-ব্যবস্থা আছে। ভিতর দিয়া এক গাড়ী হইতে অন্য গাড়ীতে যাইবার বন্দোবস্ত আছে। এখানে রেল কোম্পানী ও পুলম্যান কোম্পানী স্বতন্ত্র। রেল কোম্পানী কোচ অথবা পুলম্যানের টিকিট দেয়। কোচের টিকিটে আসন মিলে। কিন্তু পুলম্যানের টিকিটে কোন বার্থ বা আসন মিলে না। পুলম্যান কোম্পানীকে অতিরিক্ত মাশুল দিয়া বার্থ বা বেড্‌রুম সংগ্রহ করিতে হয়। ওয়েবৃষ্টার ও আমি ব্যাগ বহন করিয়া আগাইয়া যাইতেছি। পথে পুলম্যান কোম্পানীর কর্মচারীর সাক্ষাৎ পাইলাম। কোন বার্থ খালি নাই। একটি বেড্‌রুম বা শয়নকক্ষের ঠিকানা দিয়া আমাদিগকে সেখানে যাইতে বলিলেন। কোম্পানীর লোক তখন আমাদের ব্যাগ লইয়া সেই কক্ষে পৌছাইয়া দিয়া বিছানা প্রভৃতি পাতিয়া দিল। শয়নকক্ষে দুইটি বার্থ। একটি উপরে, একটি নীচে। আমি নীচে রহিলাম। ওয়েবৃষ্টার উপরেরটি দখল করিলেন। বিমান কোম্পানী আমাদের শুধু পুলম্যানের মাশুল ফেরত দিয়াছিলেন। শয়নকক্ষের অতিরিক্ত ভাড়া আমাকেই দিতে হইল। শয়নকক্ষের নীচের বার্থকে দিনের বেলায় আরামদায়ক কৌচরূপে ব্যবহার করা যায়।

রাতে ভালই ঘুম হইল। দিনে দ্রুতগামী ট্রেনে বসিয়া হিমার্ত্তা পৃথিবীর অপূর্ব রূপ দেখিতেছি। আকাশে তখনও ঝড়ের আভাস। রোদ ওঠে নাই। প্রবল বায়ু বহিতেছে। মানুষ বাধ্য হইয়া ঘরের মধ্যে আটকা পড়িয়াছে। প্রকৃতি তাঁর সমস্ত শোভা গুটাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার রিক্ত নিরাভরণ অঙ্গের উপর হিমরাশি স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে সন্ধ্যা সাতটায় ট্রেন নিউইয়র্ক পৌছিল। শহর তখনও বরফে ঢাকা।

নিউইয়র্ক শহর ছয়টি 'বরোতে' বিভক্ত। ম্যানহ্যাটন, ব্রুক্লিন, ব্রঙ্কস্, কুইন্স ও রিচমণ্ড। এই পাঁচটি 'বরোর' মোট লোকসংখ্যা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে ছিল ৭৭,৫৬,৬১১ জন। উপকণ্ঠে আরও ৫০ লক্ষ লোক বাস করে।

উপরোক্ত 'বরো'গুলির মধ্যে ম্যানহ্যাটন 'বরোটি' সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি সরু লম্বা একটা ফালির মত। দক্ষিণাংশ ক্রমশীর্ণায়মান হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে একটি সুক্ষাগ্র শীর্ষে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমে হাড্‌সন নদী, পূর্বে ইষ্ট নদী এবং উত্তর-পূর্বে হার্লেম নদী হাডসন ও ইষ্ট নদীদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া ম্যানহ্যাটনকে একটি সম্পূর্ণ দ্বীপের আকৃতি প্রদান করিয়াছে। ইষ্ট ও হার্লেম নদীর ওপারেও নিউইয়র্ক শহর। হাডসনের ওপারে নিউ জার্সি শহর। তিনটি নদীরই উপরে সেতু ও নীচে সুড়ঙ্গপথ। ম্যানহ্যাটন দৈর্ঘ্যে সাড়ে বারো মাইল। ইহার প্রশস্ততা যেখানে সব চেয়ে বেশী সেখানে আড়াই মাইল।

ম্যানহ্যাটন 'বরো'টি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ১৪টি সমান্তরাল এভিনিউ এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ২২০টি সমান্তরাল রাস্তা দ্বারা বিভক্ত। হাডসন নদীতীরে রুজভেল্ট মোটর-রাস্তা। তারপর ১ম, ২য় করিয়া ইষ্ট নদীতীরস্থ ১২তম এভিনিউ পর্যন্ত সংখ্যা ১২টি এভিনিউ। ৩য় ও ৪র্থ এভিনিউর মধ্যে লেক্সিংটন এভিনিউ এবং ৪র্থ ও ৫ম এভিনিউর মধ্যে ম্যাডিসন এভিনিউ অবস্থিত। ৪র্থ এভিনিউর অপর নাম পার্ক এভিনিউ। সেইরূপ ৬ষ্ঠ এভিনিউর অপর নাম এভিনিউ অব দি আমেরিকাস্। ইহা ছাড়া ব্রডওয়ে নামক উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি রাস্তা একটু বাঁকিয়া ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম এভিনিউকে কাটিয়া গিয়াছে। ষ্ট্রীটগুলির নামকরণ দক্ষিণ হইতে আরম্ভ হইয়া ১ম, ২য় করিয়া পর পর উত্তর দিকে চলিয়াছে। শহরের মধ্যস্থলে কেন্দ্রীয় পার্ক। পার্কটি আয়তনে ৮৪০ একর; পূর্ব-পশ্চিমে ৫ম হইতে ৮ম এভিনিউ পর্যন্ত এবং উত্তর-দক্ষিণে ৫৯তম হইতে ১১০তম ষ্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত।

শহরের নিম্নাংশে অর্থাৎ দক্ষিণাংশে টাকার বাজার। সারা দুনিয়ার বিরাট টাকার বাজার আজ এই স্থানে। বিশ্ব-বিখ্যাত ওয়াল ষ্ট্রীট এই অংশে অবস্থিত। অদূরে সিটি হল ও সিটি পার্ক। এই অংশটি আট্‌লান্টিক উপকূল হইতে ২২তম ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

২৩তম ষ্ট্রীট হইতে কেন্দ্রীয় পার্ক বা ৫৯তম ষ্ট্রীট পর্যন্ত মধ্য ম্যানহ্যাটন। এখানে বহু বড় বড় হোটেল; ব্যবসাকেন্দ্র এবং দোকান অবস্থিত। এখানকার রক্‌ফেলার কেন্দ্রটি একটি স্বতন্ত্র নগরবিশেষ। এই অঞ্চলে পঞ্চম এভিনিউর 'মেসি', 'সাক্‌স' প্রভৃতি দোকানগুলিতে সুচ হইতে এরোপ্লেন পর্যন্ত যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকে। প্রসিদ্ধ ওয়ালডর্ফ এষ্টোরিয়া হোটেল; পৃথিবীর উচ্চতম বাড়ী এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং, রঙ্গালয়বহুল টাইমস্ স্কোয়ার, ক্রীড়া-ভূমিযুক্ত ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন প্রভৃতি এই অঞ্চলে অবস্থিত।

উত্তর ম্যানহ্যাটন লোকবসতি-প্রধান। কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় এই অঞ্চলে অবস্থিত। ইষ্ট নদীর তীর দিয়া এখানকার সৌখীন লোকদের বসতি। এই অঞ্চলে পূর্ব ৯৪তম ষ্ট্রীটে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতির আশ্রম।

হাডসন ও ইষ্ট নদীতে জাহাজ নোঙ্গর করিবার বহু পায়ার বা ঘাট। বড় জাহাজগুলি হাডসন নদীতেই প্রবেশ করে।

আটলান্টিক হইতে হাডসন নদীর প্রবেশপথে পৃথিবীর বৃহত্তম মূর্তি অবস্থিত। ইহা 'স্বাধীনতার মূর্তি' নামে পরিচিত। উর্দ্ধ-বাহু স্বাধীনতা-দেবী আকাশে স্বাধীনতার মশাল সর্বদা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। মঞ্চের ভূমি হইতে মশালের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মূর্তিটির উচ্চতা ৩০৫ ফুট। ইহার দক্ষিণ তর্জনীর দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ও পরিধি ৫ ফুট। ফ্রান্স ও আমেরিকার বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ উভয় জাতির যুক্তদানে

মূর্তিটি নির্মিত হইয়াছিল। সেদিন ফ্রান্সের দানই ছিল সমধিক। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করা হয়।

আমি যে হোটেলে উঠিলাম তাহার নাম হেন্‌রী হাডসন হোটেল। ২৪ তলা হোটেলের ১৬ তলায় আমার ঘর। মধ্য-ম্যানহাটানে ৮ম ও ৯ম এভিনিউর মধ্যবর্ত্তী অংশে পশ্চিম ৫৭তম ষ্ট্রীটে হোটেলটি অবস্থিত। ষ্ট্রীটগুলির ৫ম এভিনিউর পূর্বাংশ পূর্ব বলিয়া এবং পশ্চিমাংশ পশ্চিম বলিয়া অভিহিত হয়।

২রা জানুয়ারী সন্ধ্যায় আমি নিউইয়র্ক পৌঁছাই। ৮ই জানুয়ারী বুধবার প্রাতঃকালে আমাকে অটোয়া অভিমুখে রওনা হইতে হইবে। এর মধ্যে শনি ও রবিবার ছুটি। আপিস খোলা থাকিবে মাত্র তিন দিন; শুক্র, সোম ও মঙ্গলবার। এর মধ্যে অনেক কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।

আমার নিউইয়র্কে অবস্থান কালে তাপ ২২° হইতে ৩৫° ডিগ্রী পর্য্যন্ত ওঠানামা করিতেছিল, ফলে এখানে বরফ পড়িলে তাহা গলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে চলাফেরার অসুবিধাই হয়। তবে এরা খুব দ্রুত বরফ সাফ করিয়া ফেলে। এই শহরের বরফ ফেলিবার খরচ বৎসরে দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা। বুধবার ও বৃহস্পতিবার যে বরফ পড়িয়াছিল শুক্রবারের মধ্যেই তাহা সাফ করিয়া ফেলা হইল। পরবর্তী দিনগুলি ভালই কাটিল।

৩রা জানুয়ারী শুক্রবার সকালে ট্যাক্সি লইয়া সিটি আপিসের দিকে চলিলাম। ট্যাক্সিওয়ালা আলাপ সুরু করিল। বলিল, "আমার ভাই যুদ্ধে গিয়াছিল। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে ছিল। ভারতবর্ষ বেশ ভাল দেশ। আমার ভাই সেখানে পরম আরামে ছিল। তার দুই-তিনটা বেয়ারা ছিল, ডাকিলেই 'হুজুর' বলিয়া হাজির হইত।"

'হুজুর' কথাটা হিন্দুস্থানীতে উচ্চারণ করিল। এদেশের লোক ব্যক্তিগত চাকর রাখিতে অভ্যস্ত নয়। কাজেই ব্যক্তিগত চাকরের কথায় এরা বেশ আমোদ অনুভব করে। আমি বলিলাম, "তুমি আমাদের ভাষায় একটু আধটু কথা কহিতে শিখিলে কিরূপে?"

"ভাইয়ের নিকট শুনিয়া শিখিয়াছি। আমি হিন্দুস্থানী ভাষার আরও কিছু কিছু কথা জানি। 'যাও', 'বকশিশ'। কেমন, ঠিক বলি নাই? আমার ভাই বেশ হিন্দুস্থানী বলিতে পারে। তুমি যাইবে আমার বাড়ী? যে রাস্তায় আমরা সিটি হলে যাইব সেখান থেকে একটু বাঁকিলেই আমাদের বাড়ী। আমার ভাই তোমার সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে কথা বলিয়া খুবই খুশী হইবে।"

আমি বলিলাম, "আমিও খুশী হইতাম। কিন্তু সিটি আপিসে ঠিক এগারটায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিবার কথা। আর তো সময় নাই।"

ট্যাক্সিওয়ালা দুঃখিত হইল। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার কথা বলিবার উৎসাহ কমে না। বলিল, "তোমার দেশের ট্যাক্সিওয়ালারা বক্‌শিশের জন্য বড় বিরক্ত করে, না? আমার ভাই একবার অল্পদূর গিয়া এক টাকা বক্‌শিশ দিল। কিন্তু তোমার দেশের ট্যাক্সিওয়ালা আরও চায়। তখন আমার ভাই বলিল; আচ্ছা টাকাটা ফেরত দাও। টাকাটা ফেরত নিয়া বলিল, 'যাও'। ট্যাক্সিওয়ালা বেকুব বনিয়া চলিয়া গেল।" 'যাও' কথাটি সোৎসাহে হিন্দুস্থানীতে উচ্চারণ করিল। ইহাতে তাহার পরম পরিতোষ।

সিটি আপিসে নামিয়া ভাড়ার অতিরিক্ত বক্‌শিশ বাবদ ৫০ সেণ্ট দিবার মানসে একটি ডলার বাহির করিয়া উহাকে দিলাম। সে বলিল, "তোমার দেশের ট্যাক্সিওয়ালা কিন্তু কিছুই ফেরত দিত না। আমার কাছে কত ফেরত চাও?" আমি বলিলাম, "তুমি গোটা ডলারটিই লও।" আমি আপিসের দিকে চলিয়া গেলাম। সেও প্রফুল্ল চিত্তে অন্তর্হিত হইল।

সিটি আপিসে কণ্ট্রোলার লেজারাস জোসেফ ও সেক্রেটারী এডোয়ার্ড আর এক্কার মহাশয়দ্বয়ের সহিত নগরীর বাজেট, কর-সংগ্রহ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলাপ করিয়া সোম ও মঙ্গলবারের প্রোগ্রাম স্থির করিয়া নগর-শাসন সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক ও কাগজপত্রাদি সঙ্গে লইয়া হোটেলে ফিরিলাম।

বৈকালে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অখিলানন্দের সহিত দেখা করিতে বার্কমায়ার হোটেলে গেলাম। অপ্রত্যাশিত রূপেই স্বামীজীর দর্শন মিলিয়াছিল। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার আমাকে স্বামীজীর নিকট একখানি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। স্বামীজীর আশ্রম প্রভিডেন্সে। আমেরিকার সফর তালিকার মধ্যে প্রভিডেন্সের স্থান ছিল না। কাজেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না ভবিয়াছিলাম। শিকাগোয় স্বামী বিশ্বানন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন যে স্বামীজী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বষ্টনে বেদান্তের ক্লাস করিতে আসিবেন এবং তাঁহার বষ্টনের টেলিফোন নম্বরও আমাকে দিয়াছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বষ্টনে টেলিফোনযোগে স্বামীজীকে পাইতেই তিনি বলিলেন যে শুক্রবার কয়েক ঘণ্টার জন্য জনৈক মার্কিন শিষ্যার সহিত তিনি নিউইয়র্ক আসিতেছেন। এদেশের টেলিফোনের ক্ষিপ্রতা আমার বিস্ময় উৎপাদন করিত। ট্রাঙ্ক লাইনে দূরস্থিত বষ্টনের সংযোগ মুহূর্ত্তের মধ্যে পাইয়া গেলাম। কলিকাতায় ভবানীপুর হইতে আলিপুরের সংযোগ পাইতেও তদপেক্ষা বেশী সময় লাগে। স্বামীজী ও তাঁহার বর্ষীয়সী মার্কিন শিষ্যার সহিত আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত বোধ করিলাম। বেলুড় মঠের মর্মরমন্দির ইঁহারই শিষ্যাগণের দানে সম্ভব হইয়াছে।

রুটী

মন্মথকুমার চৌধুরী

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে কল্যাণী যখন শক্ত মুঠিতে ভ্যানিটি ব্যাগটা ধরে বাস থেকে নামলেন তখন তাঁর মাথা বনবন্ করে ঘুরছে। ঘুণ্টায় গ্যাসের আলো জলবার আর বেশী দেরি নেই। আপিস-ফেরতারা জলযোগ সেরে ততক্ষণে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। কল্যাণীর কিন্তু সবেমাত্র বাড়ী ফেরবার ফুরসং হ'ল। তাদের ছুটি হয় সকলের শেষে। একটা মারোয়াড়ী স্কুলে গান শেখান কল্যাণী। আসলে কিন্তু তাঁকে সপ্তাহের ছ'দিনই গান, ইংরেজী, অঙ্ক সকল বিষয়ই কিছু কিছু পড়াতে হয়। স্কুলটা প্রাইভেট, তাই এদের নিয়মকানুনও আলাদা—সেক্রেটারীর খেয়ালই এখানে নিয়ম। খুশি হয় কাজ কর—মর্জিতে না মেলে, সদর দরজাও একদিনই সবাইকে দেখিয়ে রেখেছেন—স্কুলের ভুঁড়িওয়ালা মালিক রায়সুরালা। ঘরের দশ পাঁচটা কাজ সেরে তবে যে বাঙালী মেয়েদের স্কুলের কাজে বেরুতে হয়। ঝুনঝুনিওয়ালা আগরওয়ালারা টাকার গদীতে বসে সে অসুবিধেটুকু বুঝতে চান না।

কল্যাণীর পা যেন আর চলতে চায় না। গণেশচন্দ্র এভিন্যুর অনেকটা পথ হেঁটে তবে তাঁদের গলি। বাড়ী ত নয় একটি অন্ধ খুপরি।

পাশেই গরম ফুলুরি ভাজা হচ্ছিল। আনা দুয়েকের কিনবেন কিনা তাই ভাবছিলেন কল্যাণী। টাকার অভাবে আজও রেশন আনা হয় নি, আটা ময়দার স্বাদ পর্য্যন্ত ভুলে যেতে বসেছেন। জলখাবারের জন্য রোজ দু-পয়সার মুড়ি বরাদ্দ। এর বেশী খরচ করলে আয়-ব্যয়ের পার্থক্যটা একেবারেই সীমার বাইরে চলে যায়। তবু কেন জানি না—কল্যাণীর আজ একটু বেহিসেবী হতে ইচ্ছে হ'ল। তিনি দু-আনার ফুলুরি আর এক আনার গরম মুড়ি কিনলেন। ছোট ছেলে ঘুটু এটা ওটা খাবার জন্যে দুরন্তপনা করে বেড়ায়। অথচ এতগুলো প্রাণীর রোজ দু-বেলা জলখাবারের ব্যবস্থা সব সময় করে উঠতে পারেন না কল্যাণী। অন্য কোন দিন হলে এই কয়েক আনা পয়সা অতিরিক্ত খরচের জন্য কল্যাণীর মেজাজ সারা দিনেও শান্ত হ'ত না। কিন্তু আজ খাবার হাতে নিয়ে যেন তিনি গভীর স্বস্তি পেলেন—একটা দিন বৈ ত নয়।...কলকাতার বুকে অকস্মাৎ হানাহানি বন্ধ হয়ে মিলনের উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে—রাস্তায় হিন্দু-মুসলমান জনতার অবিরাম স্রোত ...মোড়ে মোড়ে, বাড়ীতে বাড়ীতে আসন্ন উৎসবের প্রস্তুতি... একটা দারুণ বিপর্য্যয়ের পর আকাশে বাতাসে আগত শুভ-সূচনার সঙ্কেত।...কল্যাণী ক্লান্ত ভঙ্গীতে সামনের দিকে পা বাড়ালেন। পর-মুহূর্ত্তেই মুখ ঘুরিয়ে এক আশ্চর্য্য ক্লান্ত করলেন তিনি। পাশের দোকানে বেশ বড় বড় 'গ্রেট ইষ্টার্ণের' রুটী বিনা কুপনে একটু বেশী দামে বিক্রী হচ্ছিল। প্রায় ছোঁ মেরেই, নিজের অবস্থার কথাকে নিজের মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ না দিয়ে—দশ আনায় দু-টুকরা রুটী কিনলেন কল্যাণী।

ততক্ষণে বাড়ীর সামনে এসে পড়েছেন কল্যাণী। তাঁর বুকটা মুহূর্ত্তের জন্য দোলা দিয়ে উঠল—আনন্দে, প্রত্যাশায়। বীরেশ্বর হয়তো এসে পড়েছেন—স্বাধীনতা-উৎসবের আগে তাঁরা নিশ্চয়ই ছাড়া পাবেন। প্রথম কি বলে অভ্যর্থনা করবেন কল্যাণী। না, তিনি মুখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারবেন না। বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বীরেশ্বর জেলে গিয়েছিলেন—আজ দেশ স্বাধীন হতে চলেছে, বিদেশী সরকার দেশবাসীর দাবি মেনে নিয়েছে—আজ সে ব্রত সার্থক হয়েছে—এই বিপুল সার্থকতাকে তিনি চটুল ভাবাবেগ দিয়ে খাটো করে দিতে পারবেন না। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবছিলেন কল্যাণী। তিনি প্রথমেই নত হয়ে প্রণাম করে স্বামীর পায়ের ধুলো নেবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সংসারকে তিনি অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আগলে রেখেছেন—এইটুকুই স্বামীর কাছে নিবেদন করবার মত তাঁর একমাত্র সম্বল। স্বামীর কঠিন ব্রতকে কল্যাণী জেলের বাইরে থেকেও এমনি ভাবে সার্থকতার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন এইটুকুই তাঁর বড় সান্ত্বনা।

বীথি সবেমাত্র প্রসাধন শেষ করে বাইরে যাচ্ছিল। মাকে আসতে দেখে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল।

কল্যাণী বললেন, কোন চিঠিপত্র আসে নি?

বীথি জানত—বাবার মুক্তির জন্যে মা কয়েক দিন যাবৎ খুব উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বললে—না, এরপর আর কোন খবর দেন নি। তবে খুব সম্ভব আজকেই বাবা ছাড়া পেয়েছেন। বাড়ী খুঁজে বার করাও ত খুব সোজা কথা নয়।

ঘুটু কোথায়? ছবি?

ঘুটু ছবি ওরা সব নিশান নিয়ে ছাদে উঠেছে। আমি কিন্তু একবার কলেজে যাচ্ছি মা। ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

মায়ের মেজাজ যাতে বিগড়ে না যায় সেজন্যে যথাসম্ভব মোলায়েম গলায় বললে বীথি।

সারাদিন লাফালাফি করেও সখ মিটলো না? আবার যাবে কেন?

একটা দিন বৈ ত নয়? কাল যে স্বাধীনতা-উৎসব।

আজ তারই মহড়া। তোমার কিছু ভাবতে হবে না মা, অরুণদা আমাকে গাড়ী করে পৌছে দিয়ে যাবে।

এই বলে অনুমতির অপেক্ষা না করেই বীথি দ্রুতপদে অদৃশ্য হ'ল।

ক্লান্তিতে কল্যাণীর চোখ জড়িয়ে আসছিল। বাইরে কোলাহল আর উৎসব—ঘর শূন্য ও নির্জন—নিজের অন্তরেও একটা অন্তহীন শূন্যতাবোধের হাহাকার অনুভব করলেন কল্যাণী।

চিরকালই এমন অবস্থা তাদের ছিল না। মধ্যবিত্ত পরিবারের ঠাট-ঠমক বজায় রাখবার মত আর্থিক সংস্থান যাদের আছে তেমন পরিবারেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। বীরেশ্বর মফস্বলের শহরে মাষ্টারী করতেন—তা ছাড়া বাড়ীতে জমিজমার আয়ও মন্দ ছিল না। বি-এল পাস করেও ওকালতী না করে মাষ্টারীর মত এমন নিরীহ পেশা গ্রহণ করার জন্যে আত্মীয়স্বজনরা বীরেশ্বরকে শ্লেষভরে বলতেন 'মুখচোরা'। বীরেশ্বর এ সব ঠাট্টা-বিদ্রূপকে আমল দিতেন না। জীবনে যে আদর্শকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন—তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার মত মনের জোর তাঁর ছিল।

মাঝে মাঝে কল্যাণী বলতেন, "লোকে বলে—ওকালতীতে হাত মেললেই টাকা। মুখ বেচেই যখন রোজগার করতে হবে, তখন মফস্বল স্কুলের মাষ্টারীর চেয়ে আদালতে পসার জমানোই ত ঢের ভাল।"

লোকের কথা নীরব হাসিতে উপেক্ষা করলেও কল্যাণীর এই মৃদু তিরস্কার ও অভিমানের চাপা সুরে বীরেশ্বরের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠত, বলতেন, "টাকার লোভ এড়ানো শক্ত জানি। কিন্তু টাকা রোজগারই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ত তা হলে এক কাঁড়ি টাকা খরচা করে লেখাপড়া না শিখলেও চলত। ভাল জিনিষ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে দুনিয়ায় অন্ততঃ কয়েক জন স্বার্থভোলা লোক থাকা চাই কল্যাণী।"

কল্যাণীর রুদ্ধ অভিমান উথলে উঠেছে। বললেন, "সবাই বলে এ তোমার নিজের ত্রুটি ঢাকবার বাহানা। আদালতে সওয়াল করতে পারবে না বলেই ছেলেদের কানে মন্ত্র পড়াবার মত নিরাপদ কাজ বেছে নিয়েছ।"

"জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছেলেদের কানে সে মন্ত্রই যেন জোর গলায় উচ্চারণ করে যেতে পারি।" অকস্মাৎ যেন আগুনের ফুলকির মত জ্বলে উঠলেন বীরেশ্বর। একটু থেমে আবার বললেন, "মক্কেল ঠকিয়ে আর আদালতে গলাবাজি করে টাকা রোজগার করার চাইতে মাষ্টারীটা কোন অংশেই সহজ নয়। মাইনে এতে কম—কিন্তু কাজটা ছোট নয়।"

কল্যাণী নীরবে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। আদর্শের গরিমায় বীরেশ্বর যেন আরও দীপ্ত, আরও সমুন্নত হয়ে উঠেছেন। এ মূর্ত্তি দেখলে বোঝা যায় না যে বীরেশ্বর একটি সাধারণ স্কুলের সামান্য বেতনের সেকেণ্ড মাষ্টার।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে বীরেশ্বর আপন অত্যুচ্চ আদর্শকে যথাসম্ভব বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করতেন। বিলাতী কাপড় সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করেই তিনি কর্ত্তব্য শেষ করেন নি —অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও যাতে যথাসম্ভব দেশী হয় সে দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার প্রায়ই বচসা বাধত। বীরেশ্বর ডাক্তার চিনি বাড়ীতে আনতে নিষেধ করে দিলেন—তার বদলে এল দিশী লাল চিনি। পোর্সিলেনের কাপের বদলে এল দিশী গোদা গোদা পেয়ালা। কিন্তু বীরেশ্বরের আদর্শনিষ্ঠা চরমে উঠল—যখন তিনি কেরোসিনের বদলে রেড়ীর তেলে আলো জ্বালাবার বায়না ধরলেন। কল্যাণী বহু দিন ধরে স্বামীর সব খেয়ালই নীরবে সহ্য করছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন।

"এতই যদি স্বদেশীয়ানার সখ—তবে আর আইন বাঁচিয়ে দু'বেলা স্কুলে আনাগোনা কেন?" বীরেশ্বরের একটা মস্ত গুণ—তিনি সহজে চটেন না, শান্ত কণ্ঠে বললেন, "ভয় ত জেলের জন্যে নয় কল্যাণী। যুদ্ধের সময় একদল হাতিয়ার নিয়ে লড়তে যায় আর একদল পেছনে থেকে রসদ জোগায়—মালমশলা তৈরি করে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এও আমাদের অহিংস যুদ্ধ। এখানেও একদল আইন অমান্য করে সরকারকে অচল করে দেবে, আর একদল নীরবে গঠনমূলক কাজ করে জাতকে গড়ে তুলবে। এ দু'দলের লক্ষ্যে কোন প্রভেদ নেই।"

কল্যাণী এত বড় লক্ষ্য আর আদর্শের কথা বুঝতে চান না, বলেন, "লাল চিনি খেয়ে আর রেড়ীর তেলে আলো জ্বাললেই ইংরেজ কাবু হয়ে রাজ্য তোমাদের হাতে তুলে দেবে—এত বড় বেকুব তারা নয়। সঙীনের জোরেই এ দেশ তারা দখলে রাখবে। কেন শুধু শুধু এই হয়রানি বল ত? তোমার খুশি হয় তুমি পরো—ঐ কোমর-কাটা মোটা খদ্দর —আমি আর গায়ে তুলতে পারব না।"

বীরেশ্বর চুপ করে থাকেন। তর্ক করে কোন লাভ নেই। বহু দিনের অভ্যস্ত জীবনযাপনের ধারাকে মানুষ শুধু বক্তৃতা শুনেই বদলাতে পারে না। এটা কল্যাণীর দোষ নয়।

* * *

বীরেশ্বর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারলেন না। মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ভারতব্যাপী হরতাল ঘোষণা করা হ'ল। ছেলেরা স্কুল-গেটের রাস্তায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। মাষ্টারদের অবশ্য বাধা দেওয়া হ'ল না। হেড-মাষ্টার ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির। ছেলেদের এত জেদ তাঁর সহ্য হ'ল না। প্রথমে তিনি মাষ্টারদের নির্দ্দেশ দিলেন—তাঁরা যেন

স্কুলে আসতে ইচ্ছুক ছেলেদের ভিতরে আসতে সাহায্য করেন। বীরেশ্বর এ অন্যায় আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

"স্কুলে আমরা ছেলে পড়াতে এসেছি···জবরদস্তি করে ছেলেদের স্কুলে ডেকে আনার দায়িত্ব আমাদের নয়।"

অন্যান্য মাষ্টাররা অবশ্য হেডমাষ্টারের মনস্তুষ্টির জন্যে ছেলে ভাঙিয়ে আনতে গেটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরে জনতা তাদের দেখে টিটকারী দিলে···মাথা হেঁট করে মাষ্টাররা দাঁড়িয়ে রইলেন। হেডমাষ্টারের আদেশ অমান্য করার জন্যে বীরেশ্বরকে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলা হ'ল। কিন্তু অন্যায়ের কাছে নতিস্বীকার করবার পাত্র বীরেশ্বর নন।

কল্যাণীও এ ব্যাপারে বীরেশ্বরকে সমর্থন করলেন।

"মান-সম্ভ্রম খুইয়ে অমন চাকরীতে আমার কাজ নেই। কিন্তু চাকরী করতে গেছে বলে কি লোকগুলোর লজ্জাও নেই? ছেলেদের শিক্ষার ভার হাতে নিয়ে পুলিসের কাজ করতেও ওদের আপত্তি নেই। ছি, ছি।"

বেদনা-গম্ভীর গলায় বীরেশ্বর জবাব দেন, "গোলামী মানুষকে অমানুষ করে তোলে বলেই ত এদের কোন কিছুতেই লজ্জা নেই।"

'ডিসিপলিন' ভঙ্গ এবং আদেশ অমান্যের অপরাধে বীরেশ্বর কর্ম্মচ্যুত হলেন।

* * *

বীরেশ্বর গ্রামে ফিরে গেলেন। দিন কয়েক প্রবল উৎসাহে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চলল। তিনি নিজেই শিক্ষার ভার নিলেন। স্কুলের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য মাথা-পিছু চাঁদা ধার্য্য করা হ'ল। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই সকলের উৎসাহের স্রোত ক্ষীণ হয়ে এল। ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে সুরু হ'ল। চাঁদার খাতায় আদায়ের কোঠায় শূন্যই রয়ে গেল। বীরেশ্বর অক্লান্ত ধৈর্য্যে তবু স্কুল চালু রাখলেন। ছেলেদের বৃত্তির বন্দোবস্ত করে, কখনও বা অভিভাবকদের সাহায্য করে তিনি ছেলেদের স্কুলে রাখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই সুড় সুড় করে গোলামখানায় নাম লিখিয়ে ভবিষ্যতে চাকুরীর পথ খোলা রাখলে। এদিকে স্কুলের খরচ চালাতে বীরেশ্বরকে পৈতৃক সম্পত্তির মোটা অংশ বিক্রী করতে হ'ল। কল্যাণী এতদিন চুপ করে ছিলেন। কিন্তু আর তিনি সইতে পারলেন না, বললেন, "পরের ছেলেদের মানুষ করতে গিয়ে ত নিজের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ ডোবাতে বসেছ। এবার অন্ততঃ এদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা কর।"

"এখানে কি ওদের লেখাপড়া হচ্ছে না কল্যাণী?"

"যা হচ্ছে—তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তোমার টাকা তুমি যেমন খুশি ফুঁকে দাও, আমি বাধা দিতে যাব না। শুধু দোহাই তোমায়, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ এ ভাবে মাটি কোরো না।"

এর জবাবে উত্তেজিত হয়ে কোন কটূক্তি করলেন না বীরেশ্বর। এতবড় অনুযোগও তিনি শান্ত মনে গ্রহণ করলেন। শুধু তাঁর মুখে সংশয় ও বেদনার বঙ্কিম রেখা ফুটে উঠল। তবে কি তাঁর আদর্শ মিথ্যা, তাঁর সাধনার পথ ভ্রান্ত। না, বীরেশ্বর ভুল করেন নি। একটা বিরাট অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে এমনি বহু অনুযোগ আর গঞ্জনাকে বুক পেতে গ্রহণ করতে হবে।···

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বীরেশ্বর বললেন, "পরের ছেলেকে গোলামখানা ছাড়তে বলে—এখন নিজের ছেলেকে আমি সরকারী স্কুলে পাঠাতে পারব না। হুজুগে মেতে সখ করে যারা দু'দিনের জন্যে দেশ উদ্ধার করে বাহবা কুড়োতে চায়—আমি সে দলের নই।" এই বলে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন বীরেশ্বর। হঠাৎ পেছন ফিরে বললেন, "চাকরী করবার বেলা খুব যে বলতে—আমি শুধু আড়াল থেকে ছেলেদের উসকে দিচ্ছি—এখন দেখলে ত—উত্তেজনার মুখে জেলে যাওয়া যত সোজা—তিল তিল করে একটা আদর্শকে নিজের জীবনে সত্য করে তোলা ঠিক তত সহজ নয়।"

কল্যাণী চুপ করে রইলেন। বীরেশ্বরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। তবে বীরেশ্বরের কর্ম্মে ও আদর্শে কোথাও কোন ফাঁকি ছিল না, তাই চমক ও চাঞ্চল্যহীন তাঁর এই অনাড়ম্বর কর্ম্মসাধনা আর দশ জনের মত তাঁরও মনে সাড়া জাগাত না। উত্তেজনার যথেষ্ট খোরাক না পেয়ে বীরেশ্বরের স্কুলের ছাত্র-সংখ্যাও শেষ পর্য্যন্ত একটিতে অর্থাৎ কেবলমাত্র তাঁর ছোট ছেলে নুটুতে এসে ঠেক্‌ল। স্কুল উঠে গেল। এদিকে বাড়ীর জমিজমাও প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল। সংসারের খরচ কুলোবার জন্যেই বাধ্য হয়ে বীরেশ্বরকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হ'ল।

কল্যাণী নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে কালীঘাটে পুজো মানত করলেন।

* * *

সরকারী চাকুরী পাওয়া আর বীরেশ্বরের পক্ষে সম্ভব ছিল না, আর সে ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। তাই কলকাতা এসে ভুলে-যাওয়া ওকালতি-বিদ্যাকেই ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন বীরেশ্বর। কিন্তু ওকালতিতে তাঁর পসার জমল না। আর ওকালতি করবার মন নিয়েও বীরেশ্বর কলকাতায় আসেন নি। মিথ্যা মামলা দেখলে তিনি মক্কেলদের মুখের 'পর বলে উঠতেন, "কেন বাপু, মিথ্যা মামলা সাজিয়ে আর একজনের সর্ব্বনাশ করবার ফিকিরে আছ। তার চেয়ে আপোষে একটা ফয়সলা করে ফেল। উকীল মোক্তারের হা হাঙরের মত—দু'হাতে ঢেলেও কূল পাবে না।"

এ ধরণের মন্তব্য শোনার পর মক্কেল আর তাঁর কাছে

ঘেঁষতেও সাহস পেত না। বীরেশ্বরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দিন দু'টাকা পেয়ে কোন রকম সংসারের খরচটা চুকিয়ে গেলেই তিনি খুশী।...

কল্যাণী দেখলেন—স্বামীকে সংসারী করা কঠিন। এই ক'বছরে তাঁদের সংসার যে বেড়েছে সেদিকে লক্ষ্য ছিল না বীরেশ্বরের। বীথি ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছে, ঝুটুও বড় হয়েছে, কোলের মেয়ে ছবিও হাঁটতে শিখেছে—এদের মানুষ করার দায়িত্ব ও তার আনুষঙ্গিক খরচাও অনেক বেড়েছে। বীরেশ্বর নির্বিকার। বরং সন্ধ্যার পর তিনি নথিপত্র দেখা একদম ছেড়েই দিয়েছেন। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত রাজনীতি-চর্চ্চাতেই কাটে। ইউরোপে যুদ্ধের অবস্থা এক গুরুত্ব-পূর্ণ পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্তিকে চূড়ান্ত আঘাত হান্‌বার এই ত শ্রেষ্ঠ সুযোগ—ভারতে বামপন্থী দলগুলিকে সংহত করে কংগ্রেসকে নিশ্চিত সংগ্রামের পথে টেনে নিয়ে যেতে হবে—তারই কর্ম্মপদ্ধতি ও রাজনৈতিক পটভূমি-রচনা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা চলে বীরেশ্বরের বৈঠকখানায়। কোনো কোনো দিন আলোচনায় মত্ত হয়ে রাত্রে আর ভিতর-বাড়ীতে যান না বীরেশ্বর।

কল্যাণী বেশ বুঝতে পারেন—বীরেশ্বর কর্ম্মে ও চিন্তায় সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন কল্যাণী। অনিবার্য্যের হাতে নিঃসংশয়ে আত্মসমর্পণের জন্যে মনে মনে নিজকে তিনি তৈরি করে নিচ্ছেন। এই বলে মনকে তিনি প্রবোধ দিয়েছেন আর যাই হোক—স্বামী ত আর আড্ডা ইয়ার্কিতে সময় নষ্ট করছেন না বা কোন বদখেয়ালে জমিজমা ও সম্পত্তি যা ছিল—তা নষ্ট করেন নি।

অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কল্যাণী সংসার কোন রকম চালিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ কোথা থেকে এল দুর্দ্দান্ত ঝড়—সব ওলটপালট হয়ে গেল। সে রাত্রির কথা মনে হলে আজও রোমাঞ্চে শিউরে ওঠেন কল্যাণী...

রাত গভীর হয়ে এসেছে। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। কল্যাণী খাবার ঢাকা দিয়ে একখানা সস্তা গোয়েন্দা কাহিনীর পাতা ওলটাচ্ছেন। বীরেশ্বর আজকাল প্রায়ই অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরেন। তাঁর গতিবিধি, কথাবার্ত্তায় যেন একটা অনাগত ঝড়ের আভাস ফুটে উঠেছে। কল্যাণী তার সবটুকু বুঝতে পারেন না—জিজ্ঞেস করলে বীরেশ্বর অবান্তর প্রসঙ্গ তুলে তা চাপা দিতে চান।

কল্যাণীর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। দরজা খোলার শব্দ শুনে তিনি চমকে উঠলেন।

"কে ?" কল্যাণী সভয়ে প্রশ্ন করলেন।

"শিগ্‌গীর খাবার যা আছে দাও। আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে। হয়ত আমাদের এই শেষ দেখা কল্যাণী।"

স্বামীর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন কল্যাণী। তিনি কি এখনো দুঃস্বপ্ন দেখছেন? উস্ক-খুস্ক চুল, অবিন্যস্ত বসন—বীরেশ্বরের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

"কোথায় যাবে তুমি ?" চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন কল্যাণী। তিনি কি জেগে আছেন ?

বীরেশ্বর এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে দেয়ালে টাঙানো শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোর পেছনের ঝুলঝুলী থেকে একটি পুঁটলী বের করলেন। ফটোর পেছনে যে গোপনীয় কিছু লুকানো আছে—তা এই প্রথম দেখলেন কল্যাণী। একটা ভয়ঙ্করের সঙ্কেত তিনি আগেই পেয়েছিলেন...আজ তার সূচনা দেখে কল্যাণীর মন অনিশ্চিত আশঙ্কায় মোচড় দিয়ে উঠল।

বীরেশ্বর পুঁটলীর ভেতর থেকে একটা রিভলবার বার করলেন।

"রিভলবার ?" আতঙ্কে কল্যাণীর জিজ্ঞাসা প্রায় আর্ত্ত-নাদের মত শুনালো।

"চুপ। রাত্তিরে দেয়ালেরও কান গজায়।"

"পুলিস যদি জানতে পারে ?"

"জানতে পারে নয়—সন্ধান ওরা পেয়েছে। আজ শেষ রাত্রেই হয় ত বাড়ী ঘেরাও করবে। তার আগেই আমাকে পালাতে হবে।"

"কিন্তু বীথি, ঝুটু, ছবি—এরা ? তুমি চলে গেলে এদের কি হবে ?"

"এদের দেখবার জন্যে রইলে তুমি আর উপরে রইলেন ভগবান। এখন নিজেদের কথা ভাববার সময় নয় কল্যাণী। —ব্রিটিশ শাসনকে আঘাত হানবার এই ত চরম সুযোগ—এমন সুযোগ হয়ত এক শতাব্দীতেও একটা জাতির জীবনে একাধিক বার আসে না। ভগবান আমাদের সহায়—আমরা সে সুযোগ পেয়েছি। জাপান আর জার্ম্মানীর বোমা থেকে আমাদের আসল বিপদ নয়—আমাদের আসল শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্তি..."

এই বলে চুপ করলেন বীরেশ্বর। শেষে বললেন—"আর দেরি নয়, রাত একটার মধ্যে আমাদের সবাইকে মিলতে হবে। দাও খাবার যা আছে..."

কল্যাণীর হাত চলছিল না। বিপদ যে এমন আকস্মিক ভাবে আসবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি, কিন্তু স্বামীকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা বৃথা জেনে চুপ করে রইলেন। খদ্দর-পরা স্কুলমাষ্টার, নীরব কর্ম্মী বীরেশ্বরের সঙ্গে রিভল-বার হাতে আগষ্ট বিপ্লবী বীরেশ্বরের কোন সাদৃশ্যই আজ যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সত্য-সাধক আজ সত্যের নগ্ন রূপ দেখতে পেয়েছেন, তাই তিনি নির্ম্মম—তাঁর চোখে আজ মোহ নেই, স্বপ্ন নেই—রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুর আঘাতে

সব অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ করবার জন্ত আজ তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। স্তব্ধ পাহাড়ের বুকে যে এমনি ধূমায়িত আগ্নেয়-গিরি লুকিয়েছিল—তা কে জানতো ?

খাওয়া-দাওয়া সেরে বীরেশ্বর ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

"তুমি থাকতে আমার অভাব ওরা ভুলে যাবে কল্যাণী। আর বীথির পড়াশুনোয় যেন বাধা না পড়ে। তোমার ঘাড়ে সংসারের দায়িত্ব চাপিয়ে যেতে আমার কিছুমাত্র ভাবনা হচ্ছে না। আমার ভার ত তোমারই ওপর ছিল। আর এ জন্তে দুঃখের ভার যদি একটু বাড়ে তাতে আক্ষেপের কিছু নেই। সকলের জন্তে দুঃখ পাবার সুযোগ ক'জনের জী।নেই বা ঘটে ?"

বীরেশ্বরের চলে যাবার সময় একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না কল্যাণী। আকস্মিক বিপর্য্যয়ে তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল না।

* * *

বীরেশ্বরের চোখে যে আগুন দেখেছিলেন কল্যাণী সে আগুন জ্বলে উঠল সারা দেশের চোখে। জনতা ক্ষেপে উঠেছে—তাদের চোখে অগ্নিজ্বালা। সে আগুনে জ্বলছে ট্রাম, মিলিটারী লরী—জ্বলছে সরকারী আপিস আর থানা। গোটা দেশটা জুড়ে চলছে মুক্তিপাগল জনতার মরণপণ সংগ্রাম।

দিনকয়েক পরেই কল্যাণী খবর পেলেন—থানা পুড়িয়ে দেবার অপরাধে বীরেশ্বরের ওপর সাত বৎসরের জন্ত কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ল তার ওপর। বাড়ীতে এমন সম্পত্তি নেই যা বিক্রী করে সংসার চলে। অথচ বীথি ও মুটুর পড়ার খরচ চালাতে হবে। যে বিশ্বাস বীরেশ্বর তাঁর ওপর গুস্ত করে গিয়েছেন তার অমর্য্যাদা হতে দেবেন না কল্যাণী। শেষ পর্য্যন্ত একটা মারোয়াড়ী স্কুলে গানের শিক্ষয়িত্রীর পদ জুটে গেল তাঁর। মাইনে ষাট টাকা। অন্ততঃ কলকাতায় থেকে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনাটা অব্যাহত থাকবে ভেবে কল্যাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যুদ্ধের চাপে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। চাউল দুর্মূল্য, কয়লা দুষ্প্রাপ্য। কাপড় নেই, চিনি নেই—কল্যাণী দু'চোখে অন্ধকার দেখলেন। দেশে ফিরে যেতে পারেন—কিন্তু খাবেন কি ? এখানে তবু ত মাসান্তে ষাট টাকা হাতে আসছে। বাধ্য হয়ে সকাল বিকাল দুটো টিউশনী নিলেন কল্যাণী।

আরও সস্তায় অপরিসর গলির একখানি ছোট ঘরে উঠে এলেন। সুরু হ'ল তীব্র জীবন-সংগ্রাম। বীরেশ্বরের কারাবরণ পরিবারের আর্থিক দুর্দ্দশার কারণ হলেও একটা মহৎ আদর্শের জন্তে তিনি দুঃখের পথ বেছে নিয়েছেন—সেখানে কোন গলদ নেই, আত্মপ্রবঞ্চনা নেই—এই স্থির বিশ্বাসে বুক বেঁধে নিয়ে সংসারের বোঝা একাই বহন করতে লাগলেন কল্যাণী। "দেশের জন্তে দুঃখ পাওয়ার সৌভাগ্য ত সকলের ভাগ্যে ঘটে না"—স্বামীর এই উক্তি স্মরণ করে কল্যাণী তাঁর ফটোর নীচে মাথা নোয়ালেন।

* * *

সকাল-সন্ধ্যা টিউশনী করে বাড়ীর দিকে নজর দেবার মোটেই সময় পান না কল্যাণী। এতে টাকার দিক থেকে খুব যে সচ্ছলতা এসেছে—তা নয়। তবু টায়টোয় মাসের খরচটা কুলিয়ে যায়। কল্যাণী ছেলেমেয়েদের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন না বলে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ক্রমশঃ বেড়ে চলে। বীথি আজ সিনেমায় যাচ্ছে, কাল মিটিঙে যাচ্ছে, পরশু হয়ত রিলিফের চাঁদা তুলতে বেরিয়েছে—কল্যাণী চুপ করে শুধু দেখেই যান। তিনি প্রতিবাদ করা এক রকম ছেড়েই দিয়েছেন। মুটুর দুর্দ্দান্তপনা সীমা অতিক্রম করেছে। খাতাপত্র নিয়ে ঠিক সময়ে স্কুলে যাবার ছুতায় সে মাসের পনেরো দিনই পার্কে পার্কে ঘুরে বেড়ায়। অপরিণত বয়সে শাসনের লাগাম ঢিলে দিলে যা হয়, মুটুর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। স্বাভাবিক নিয়মে বাজে খরচের জন্ত পয়সা না পেয়ে মুটু মার বাক্স ভেঙে পয়সা চুরি করতে সুরু করলে। কল্যাণীর চোখে এবার সত্যিই জল আসে। বীরেশ্বরের ফটোর নীচে মাথা নুইয়ে তিনি বলেন, "আমার ওপর বিশ্বাস করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার ভার তুমি দিয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু একা আমি ক'দিক সামলাই বল ? আমারই চোখের সামনে ওরা এমনি ভাবে নষ্ট হচ্ছে—এর জন্তে তুমি আমার অপরাধ নিও না।"

কিন্তু দোষ কি শুধু মুটুর আর বীথির ? না, তাদের অভাবের সংসারও এর জন্তে অনেকটা দায়ী।

কল্যাণী নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য না করে প্রাণপণে খেটে যাচ্ছেন। কিন্তু এর বেশী রোজগার করা তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়। মেয়ের বিয়ে দিলে যদি কিছু সুরাহা হয়—তা বীথির যে রকম মতিগতি। আর ভাবতে চান না কল্যাণী। কাল তাঁদের স্কুলে স্বাধীনতা-উৎসব। ক'দিন থেকে তিনি খুবই যত্ন নিয়ে 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' গানটি মেয়েদের শেখাচ্ছেন। এ ক'বছরে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যুদ্ধ, ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব—কত বিপর্য্যয় ঘটে গেল। দুর্য্যোগের অমানিশার পর বহুপ্রার্থিত অরুণোদয়কে স্বাগত জানাবার জন্তে সবাই সাধ্যমত উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত। সে আনন্দের কলস্রোতে কল্যাণীও নিজের দৈন্যদশার কথা ভুলে গেলেন।

মুটু সকাল থেকে বায়না ধরেছে একটা সিল্কের জাতীয়

পতাকা কিনতে হবে। কল্যাণী তার হাতে চারটে পয়সা দিয়ে কাগজের নিশান কিনতে পাঠালেন। গরীবকে গরীবের মতই চলতে হবে। স্বাধীনতালাভের উচ্ছ্বাসে খুশী হয়ে যে দুটো পয়সা বেশী খরচ করবে তেমন আর্থিক সঙ্গতিটুকুও তাদের নেই।…

হঠাৎ স্টুটুর কলরবে ঘুম ভাঙলো কল্যাণীর।

"মা, বাবা এসেছেন—ওঠ…"

কল্যাণী স্কুল থেকে ফিরে যেই বিছানায় একটুখানি গা এলিয়ে দিয়েছিলেন অমনি ক্লান্তিতে তাঁর শরীর অবশ হয়ে এসেছিল—স্বামীর উপস্থিতিতে তিনি সচকিত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ তখনো বিছানায় ছড়ানো—স্কুলের কাপড় তখনো ছাড়েন নি। ছি ছি…বীরেশ্বর কি ভাববেন।·বীরেশ্বর বললেন, "কি অন্ধকার গলি তোমাদের। এক হাত দূরের লোক দেখা যায় না। নম্বর খুঁজে বের করতেই আমার আধ ঘণ্টা লাগল। বড্ড নোংরা বস্তী ত?"

বীরেশ্বর একটু থেমে আবার বললেন, "বীথিকে দেখছি নে যে—বীথি কোথায়?"

"বীথি কলেজে গেছে। কালকের উৎসবের কাজে সবাই ব্যস্ত। এক্ষুনি হয়তো ফিরবে।"

কল্যাণী যেন কথা কইতে খুব জোর পাচ্ছেন না।

স্টুটু বললে, "বাবা দেখবে এস, ছাদে আমরা কত বড় নিশান তুলেছি।"

"তুমি পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছাদে বসগে—আমরা পরে আসছি।"

স্টুটু লাফাতে লাফাতে ছাদে উঠে গেল।

কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, "শরীর কেমন আছে?"

বীরেশ্বর হেসে জবাব দিলেন, "জেলের ভাত খেয়ে বরং মোটাই হয়েছি। কি বল?"

কল্যাণী সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বীরেশ্বরের পায়ের ধুলো নিলেন। এ সংস্কারটুকু তিনি আজও ছাড়তে পারেন নি।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বীরেশ্বর পতাকা অভিবাদন করে স্বাধীনতার রূপ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করলেন। কল্যাণী তার কতক বুঝলেন—কতক বা বুঝলেন না। তাঁর মনে 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' গানের সুরটা বার বার গুঞ্জরিত হয়ে উঠছিল।

* * *

স্কুলে যাবার জন্যে খুব ভোরে উঠলেন কল্যাণী। বীরেশ্বর তখনও ঘুমিয়ে। খদ্দরের একখানা নীল পাড়ের শাড়ী বের করে পরলেন কল্যাণী, বহু দিনের পুরণো শাড়ীখানা তিনি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। এই একখানা ছাড়া আর সবই ত তাঁর কণ্ট্রোলের শাড়ী। ভাগ্যিস্ এখানা ছিল—তাই মুখরক্ষা হবে। একটা শতাব্দীর পাপচক্র থেকে অব্যাহতি পেয়ে জাতি আজ মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। এক ঝলক কচি রোদ এসে তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের সব কালো ঘুচিয়ে দিয়েছে।

কল্যাণীর কাছে এই সূর্য্যের আলো আজ নতুন আশ্বাস বহন করে আনল। ষ্টোভে জল চাপিয়ে কল্যাণী চায়ের সরঞ্জাম বার করলেন।

কালকের কেনা রুটি দুখানাই তাদের স্বাধীনতা-দিবসের জলখাবার। সাধারণত সকালে চা আর মুড়ি খেয়েই টিউশনীতে বেরিয়ে যান কল্যাণী। আজকের প্রাতরাশ একটু ভালই হবে। কিন্তু টিনের মুখ খুলে তিনি বেকুব বনে গেলেন। দু-দুখানা রুটিই বেবাক লোপাট হয়েছে—টিন শূন্য। কাজটা যে কার তা বুঝতেও দেরি হ'ল না কল্যাণীর।

কল্যাণী সকালের প্রসন্নতা ভুলে গিয়ে 'স্টুটু' বলে চীৎকার করে উঠলেন।

স্টুটু ছাদ থেকে নেমে এল।

"রুটী কে খেয়েছে? এক টুকরো রুটী কারো মুখে উঠে নি—এমন রাক্ষুসে ক্ষুধা কার?"

স্টুটু মাথা নত করে নিজের অপরাধের মৌন স্বীকৃতি জানালে।

অন্য দিন হলে কষ্টার্জ্জিত অর্থের এই অপব্যয়ের দরুন স্টুটুর পিঠের চামড়া অক্ষত থাকত না। সেদিন কল্যাণী আর কথা বাড়ালেন না। ছেলেগুলো এমনি ভাতে মরা—না হয় একদিন পেট ভরে রুটীই খেয়েছে। তার ত জোটে না—ছেলেদের তৃপ্তিতেই তার আনন্দ। শাপে বর হ'ল স্টুটুর। লিভার খারাপ হবে বলে স্টুটুকে চা খেতে দেন না কল্যাণী। আজ এক কাপ চা দিয়ে বললেন, আর কোন দিন না জিজ্ঞেস করে খাবার জিনিষে হাত দেবে না। খাবার ত তোমাদের জন্যেই। লক্ষী ছেলে—এমনটি আর কখ্খনো করো না।"

কল্যাণীর দেরী হয়ে যাচ্ছে। রোজ তিনি 'বাসেই যান। এত সকালে 'বাস পাবেন না বলে আজ তিনি রিক্সাতেই যাবেন। এর জন্যে বাড়তি আট আনা খরচ হবে। তাদের টানাটানির সংসার—রিক্সা চড়ার নবাবী পোষায় না। কিন্তু আজ বাধ্য হয়েই তাকে রিক্সায় যেতে হবে।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কল্যাণী মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। মাত্র দু-আনা পয়সা ব্যাগে পড়ে আছে। ওদিকে ঘরে আর পয়সা নেই যে আজকের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পারলে সেক্রেটারী ভাঙা বাংলায় বাপান্ত করে ছাড়বে। তিনি না গেলে উৎসবই আরম্ভ হবে না। তাঁরই নির্দ্দেশে ত মেয়েরা 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' গানটি গাইবে। পয়সা নিশ্চয় স্টুটুই সরিয়েছে। স্টুটুর চুরির

দোষ আজ নূতন নয়—কিন্তু এমন ভাবে যে সব পণ্ড করবে তা কে জানত? ছেলেকে খুন করলেও আজকের এই জ্বালা বুঝি জুড়াবে না কল্যাণীর।...

"পয়সা কে নিয়েছে? শীগ্‌গির বের কর্—নইলে মেরে খুন করে ফেলব।"

স্বটুর হাতে চায়ের কাপ কেঁপে উঠল। মায়ের রুদ্র মূর্তি দেখে দোষ স্বীকারের সাহস তার রইল না।

কাঁদো কাঁদো সুরে বললে—আমি নিই নি মা।—দুম করে পিঠে কষে এক কিল মারলেন কল্যাণী। তবে কি পয়সা হাওয়ায় উবে গেছে? বজ্জাত ছেলে, শিগ্‌গীর পয়সা বার কর বলছি—নইলে হাড় একটিও আস্ত থাকবে না।'

স্বটু কেঁদে ফেলল, বললে—আমাদের কাগজের নিশান রেলিঙে লেগে ছিঁড়ে গেল। তাই ত আর একখানা সিল্কের নিশান কিনে এনেছি।

তোমার শুষ্টীর পিণ্ডি এনেছ। হতভাগা ছেলে, এখন তোর জন্যে সব পণ্ড হ'ল?

একটু বাদে কল্যাণীর সম্বিৎ ফিরে এল। ছেলের সঙ্গে পয়সা নিয়ে রাগারাগি করে সময় নষ্ট করলে, স্কুলে আজ কি আর তার মুখ থাকবে। এখনো সময় আছে খুব জোরে পা চালালে তিনি হয়ত সাতটার আগে স্কুলে পৌঁছাতে পারবেন।

কিছু স্থির করতে না পেরে তিনি সিঁড়ির পথেই থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন।...

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলেন বীরেশ্বর, পাশের ঘরে থেকে কল্যাণীর সব কথাই তিনি শুনছিলেন। এই কয়টি কথায় পরিবারের দারিদ্র্যের নগ্নচিত্র তাঁর কাছে পরিপূর্ণ ভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। দীর্ঘকাল পরে গৃহ-প্রত্যাগমনের পুলকোচ্ছ্বাস, নবলব্ধ স্বাধীনতার আনন্দ—সবকিছুই যেন তাঁর কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল। এ কথাটাই শুধু তিনি ভাবতে লাগলেন—দেশে স্বাধীনতা এল বটে, কিন্তু দেশের প্রতি কর্ত্তব্য করতে গিয়ে যে কয়টি প্রাণীর প্রতি তিনি নিদারুণ অবিচার করেছেন, যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তিনি তাদের অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘ কারাবাস বরণ করেছিলেন, তাদের রুটীর সংস্থান আজও হ'ল না। তিনি দেখলেন, স্বাধীনতার দিনেও আনন্দ করবার অধিকার নেই কল্যাণীর—রুটী আর তেরঙা নিশান দুটোই একসঙ্গে কেনবার মত সামর্থ্য নেই তার—রুটী কিনতেই তাঁর সব পয়সা ফুরিয়ে যায়।

আপনা থেকেই বীরেশ্বরের হাত জামার পকেটে ঢুকল, কিন্তু পকেট একেবারে খালি। সিঁড়ির উপর স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। দীর্ঘকাল পরে একে অপরকে যেন নূতন ভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ কি মনে করে কল্যাণী ব্যাগের বাকী দু' আনা পয়সা রুটির শূন্য টিনের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর নির্ব্বাক্যে দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে গট্‌গট্ করে নীচে নামতে লাগলেন।

বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের কার্যাবলী

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বঙ্গদেশস্থ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীসমূহের তত্ত্বাবধান ও সংস্কৃত পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতি বাংলা-সরকার কর্তৃক স্থাপিত হয়। পূর্বে এ সমিতি কলিকাতা সংস্কৃত-সমিতি নামে পরিচিত ছিল। নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও এই সমিতি স্বীয় লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বিশেষভাবে, ১৯৪৭ সালে কলিকাতার সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবতা ও তৎপরে ভারত ও বঙ্গ-বিভাগের ফলে সমিতিকে অভূতপূর্ব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৪৭ সালে সমিতির কার্যাবলীর সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর যোগসূত্র

পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে যোগসূত্র এতদিন অক্ষুণ্ণ ছিল, রাষ্ট্রীয়বিভাগের ফলে তা' অল্পবিস্তর শিথিল হতে বাধ্য। অবশ্য বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমাদের পক্ষ থেকে পূর্ব সম্বন্ধ যত দূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়ে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হবে না। সভা-সমিতি, সামাজিক অনুষ্ঠান, পরীক্ষাপ্রভৃতি ব্যপদেশে তাঁদের সঙ্গে আমাদের পূর্ব মধুর সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকবে। যত দিন পর্যন্ত না পূর্ববঙ্গে পৃথক্ সরকারী পরীক্ষাসমিতি গঠিত হয়, তত দিন এ বৎসরের মত আমরা পূর্ব-পাকিস্থানে পরীক্ষা নিতে পারব—এ আশা করা যায়; এবং পাকিস্থানের পণ্ডিত মহাশয়েরা এ পরীক্ষার ফলে যা বৃত্তি পেতেন—যাতে পূর্ববঙ্গের সরকার সে বৃত্তি দিতে থাকেন—তারও বন্দোবস্ত আমরা করতে পারব, তারও আশা রাখি। পূর্ববঙ্গে সরকারী পরীক্ষা-সমিতি স্থাপিত হলেও যদি পাকিস্থাননিবাসী পণ্ডিতবর্গ আমাদের পরীক্ষার কেন্দ্র পাকিস্থানেও রাখতে চান—তা হলে পূর্ববঙ্গীয়

সরকারকে তদ্বিষয়ে অনুমতিপ্রদানে প্রোবুদ্ধ করাও হয়ত অসম্ভব হবে না। অবশ্য সে ক্ষেত্রে পণ্ডিতমণ্ডলী আমাদের পরীক্ষার উপরে নির্ভর করে স্বস্তিলাভে সমর্থ হবেন, মনে হয় না। যাই হোক্—পূর্ব-পাকিস্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে এই নিবেদন করছি যে—বঙ্গীয়-সংস্কৃত-সমিতি তাদের সর্ববিধ বিষয়ে যথাসম্ভব সহায়তাদানে কদাপি কুণ্ঠিত হবে না। ঈদৃশ দীর্ঘকালের সংযোগচ্ছেদ ত্রুটি বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়; কাজেই বাহ্যিক পরিস্থিতি যাহাই হউক, আন্তরিকতার তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটবে না। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের পূজারী পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী চিরকাল অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন। দেশবিভাগের ফলে সরকারীভাবে ও সাহায্যে পূর্ববৎ সুদৃঢ় সংযোগ সংরক্ষণ সম্ভবপর না হলেও বে-সরকারী সহৃদয় ব্যক্তিবৃন্দের সহায়তায় এ সংযোগ অব্যাহত রাখবার সর্ববিধ উপায় আমরা অবলম্বন করব।

বঙ্গ বিভাগের ফলে সমিতির ছাত্রসংখ্যা হ্রাস ও তৎপ্রতিকার

আমাদের ছাত্রসংখ্যা বঙ্গ বিভাগের ফলে যাতে হ্রাস না পায়, তার সর্ববিধ উপায় আমরা অবলম্বন করব। পূর্বেই বলেছি যে, পূর্ববঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী যাতে পূর্ববঙ্গেই আমাদের পরীক্ষা পূর্ববৎ চালিয়ে নিতে পারেন, তজ্জন্য আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি থাকবে না। যদি পূর্ববঙ্গের সরকার পূর্ববঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতিদানে কুণ্ঠিত হন, তা হলে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সীমান্তপ্রদেশে পশ্চিম-বঙ্গভুক্ত মহকুমা শহর ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ স্থলে আমরা পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করব। যাতে পূর্ববঙ্গের ছাত্রগণ অনায়াসে সে সকল কেন্দ্রে এসে পরীক্ষা দিতে পারেন। দূরবর্তী স্থানবাসী ছাত্রবৃন্দও যাতে পশ্চিমবঙ্গের নিকটতম স্থানে এবং প্রয়োজন হলে কলিকাতাতেও এসে পরীক্ষা দিতে পারেন—তজ্জন্য প্রয়োজনমত আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতেও আমরা সচেষ্ট থাকব।

সমিতির নূতন নূতন পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন

অন্যদিকে—ভারতের সর্বত্র আমাদের পরীক্ষা যাতে গৃহীত হয় তজ্জন্য সর্ববিধ উপায়াবলম্বনে আমরা ব্রতী হয়েছি। ভারতের বহুস্থান থেকে ইতোমধ্যেই আমরা যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি। এই বৎসর (১৯৪৮) দিল্লীতে নূতন পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, বিকানীর, মহীশূর, কোচিন, ত্রিবেন্দ্রাম, পাতিয়ালা, সিমলা প্রভৃতি স্থানেও আমাদের পরীক্ষাকেন্দ্র অচিরে স্থাপিত হবে, আশা করি। বৃন্দাবন, বারাণসী ও অন্যান্য যে সব স্থলে তত্তৎস্থলের কর্তৃপক্ষ আমাদের পরীক্ষাগ্রহণের সুযোগপ্রদানে কুণ্ঠিত ছিলেন, তাঁদেরও অনুমতি লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বাধীন-ভারতে পূর্ণোদ্যমে সংস্কৃতসেবার সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করতে হবে। (এবং আমাদের বঙ্গদেশকে এ বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে।) বঙ্গদেশের নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, কোটালিপাড়ার মাধ্যমিকতায় সংস্কৃতশিক্ষার পসরা ভারতের প্রত্যেক নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করতে হবে—পূর্বের মত বঙ্গদেশকে সংস্কৃতজ্ঞান-কুশলতায় অগ্রণী এবং সংস্কৃতজ্ঞান সংপ্রসারণের প্রচেষ্টাতেও জীবন পণ করতে হবে।

বিপন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তা-প্রচেষ্টা

দুঃস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তার নিমিত্ত আমরা যে বেসরকারী সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপিত করার মনস্থ করেছি—তার থেকে অচিরেই সাহায্য প্রদানের চেষ্টা আমরা করব। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গত্যাগী পশ্চিমবঙ্গে—আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন পণ্ডিতবর্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য দুঃস্থ পণ্ডিতবৃন্দ সাহায্যের জন্য আমাদের নিকট আবেদন করলে আমরা এ সাহায্য-ভাণ্ডার থেকে যথা-সাধ্য সাহায্য প্রদান করব। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার থেকে তজ্জন্য কত সাহায্য আমরা পাব, তা অনিশ্চিত। ভারত-সরকারের বিপন্নত্রাণ ও পুনর্বসতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের সহিত সম্প্রতি আমরা দিল্লীতে সাক্ষাৎপূর্বক এ বিষয়ে বিশেষ প্রার্থনা জানিয়েছি এবং অবিলম্বে দুঃস্থ ও সাহায্যপ্রার্থী পণ্ডিতবর্গের নাম, ঠিকানা, গুণাবলী প্রভৃতি সংবলিত একটি বিস্তৃত বিবরণী তাঁর নিকট প্রেরণ করা হবে। প্রাদেশিক সরকারের নিকটও এ বিষয়ে সনির্বন্ধ আবেদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। ভরসা করি, আমরা ব্যর্থমনোরথ হব না।

সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রসারের নিমিত্ত সমিতির প্রচেষ্টা

বিগত ১৭ই অক্টোবর (১৯৪৭) তারিখে আমাদের সমিতির তত্ত্বাবধানে সমিতির সম্পাদকের সভাপতিত্বে এই সমিতির উন্নতিকল্পে সমিতির পণ্ডিতমণ্ডলী ও অন্যান্য পণ্ডিতদের এক মহতী সভা হয়। এ সভায় সংস্কৃতসাহিত্যের প্রসারের পরিকল্পনার নিমিত্ত একটি সমিতি গঠিত হয়, এবং সর্বসম্মতি-ক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়—

১। দুঃস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তার নিমিত্ত একটি সহায়তা-ভাণ্ডার স্থাপন এবং মহানুভব ব্যক্তিবৃন্দের নিকট সাহায্যতার নিমিত্ত আবেদন প্রেরণ

২। এ সমিতির পরীক্ষার উন্নতিবিধানের নিমিত্ত ··

(ক) প্রধান পরীক্ষকের পদসৃষ্টি, (খ) পুনর্বার উত্তরপত্র পরীক্ষার নিমিত্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ, (গ) উত্তরপত্র পরীক্ষার নিমিত্ত পারিশ্রমিকের হারবৃদ্ধি, (ঘ) সমিতির কেরাণী-পদবৃদ্ধি,

(ঙ) সমিতির পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণাপুস্তকাদি মুদ্রণের নিমিত্ত একটি মুদ্রণালয় স্থাপন এবং একটি গ্রন্থন বিভাগ সৃষ্টি।

সমিতির কার্য্যনির্বাহক সভায় বিভিন্ন বিষয়ক প্রচেষ্টা

বিগত জুন মাস হইতে জানুয়ারী পর্যন্ত আমাদের সভাপতি মাননীয় ডক্টর শ্রীযুত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমিতির কার্যকরী সভার তিন বার অধিবেশন হয়। সমিতির উন্নতিকল্পে বহুবিধ প্রস্তাব গৃহীত এবং সরকারের অনুমোদনের নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়েছে। আমরা আশা করি, আমাদের সহৃদয় জাতীয় সরকার অবিলম্বে আমাদের প্রস্তাবাবলী অনুমোদন ক'রে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করবেন।

আমাদের মূল লক্ষ্য ও বর্তমান প্রয়োজনাবলী

আমাদের মূল লক্ষ্য আমাদের সংস্কৃতসমিতি এবং সংস্কৃত-কলেজের সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন। বর্তমানে আমরা পরীক্ষাগ্রহণ সমিতি মাত্র; কিন্তু আমরা চাই—সংস্কৃত-সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুযায়ী ও তুলনা-মূলক প্রাচ্যগবেষণাগার, সর্বসুযোগসংবলিত গবেষণাবিভাগ, সর্বভারতীয় পরীক্ষাগ্রহণবিভাগ, গ্রন্থপ্রকাশবিভাগ প্রভৃতি সমন্বিত একটি পূর্ণায়তন বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু স্বল্প সময়ে এ লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয় বলে আমরা সম্প্রতি নিম্নলিখিত বিষয়ে যত্নবান হয়েছি,—

বর্তমান সংস্কৃত কলেজের বহুল উন্নতি সাধন। টোল-বিভাগের অধ্যাপকদের অধ্যাপনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ, অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিমিত্ত একটি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রাবাস-স্থাপন, ছাত্রদের বৃত্তির হারবৃদ্ধি, গবেষণাবিভাগ স্থাপন, গ্রন্থ-প্রকাশবিভাগ স্থাপন, কাব্য, জ্যোতিষ, পাণিনিব্যতিরিক্ত ব্যাকরণ, বেদ, মীমাংসা প্রভৃতি বিষয়ের জন্য নূতন অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি, আয়ুর্বেদের নূতন অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি, পালি ও প্রাকৃতের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা, পুঁথির লেখনকারী পণ্ডিতদের স্থায়ী পদ সৃষ্টি, অনুবাদবিভাগ সৃষ্টি, ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে পুঁথি সংগ্রহ, সংস্কৃত ও বাংলা পত্রিকা পরিচালনা-বিভাগ; সর্বোপরি সমিতির নিজস্ব মুদ্রণালয় স্থাপন, আয়ুর্বেদ ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি, সামরিকবিজ্ঞান, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়েও পঠনপাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণের সুব্যবস্থা প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃতবিতর্কসভা স্থাপন, সংস্কৃত-নাটকা-ভিনয়ের দ্বারা সংস্কৃতের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। পুনরায় যাতে অন্ততঃ ২০০ শত ছাত্র প্রয়োজনমত বৃত্তিলাভপূর্বক সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করতে পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থাবলম্বন করা কর্তব্য। এতদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ সাধারণ শিক্ষক-দের শিক্ষণপ্রণালী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেরূপ সংস্কৃতশিক্ষণ-প্রণালী শিক্ষার জন্যও একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রয়োজন।

এই সকল কার্য প্রভূত শ্রম ও প্রচুর অর্থসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা শ্রমবিমুখ নই, পরন্তু সংস্কৃতসাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের নিমিত্ত জীবন পণ করতেও সম্পূর্ণ উন্মুখ। অপর দিকে, দেশবাসী ও জাতীয় সরকার ও ভারতের শাশ্বত কৃষ্টির ধারক ও বাহক দেবভাষা সংস্কৃতের জন্য অর্থব্যয়ে পরাঙ্মুখ হবেন না বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব আমাদের আরব্ধ কার্য সাফল্যমণ্ডিত হবে নিঃসন্দেহ—"চরৈবেতি চরৈবেতি।"

সমিতির উন্নয়নকল্পে প্রারব্ধ কার্য্যাবলী

১। পণ্ডিতমণ্ডলীর নাম, ঠিকানা, গুণাবলী, রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধ, বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রভৃতি সংবলিত নামের বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন। পণ্ডিতমণ্ডলীর সর্ববিধ সহায়তাবিধান এবং গুণানুসারে যথাযথ কর্মলাভে সহায়তাপ্রদান প্রভৃতি নামের তালিকা প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য।

২। পণ্ডিতমণ্ডলীর লিখিত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। ঈদৃশ দুঃখদৈন্যে প্রপীড়িত হয়েও পণ্ডিতমণ্ডলী যে অদ্যাপি তাঁদের জ্ঞানের প্রজ্বলিত দীপশিখা অনির্বাপিত রাখতে সমর্থ হয়েছেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলী। আমা-দের কর্তব্য—তাঁদের সমস্ত গ্রন্থপ্রকাশে সম্যক্ সহায়তা প্রদান। এ অবশ্যকর্তব্যে সমিতি নিশ্চয় মনোনিবেশ প্রদান করবে। ইতোমধ্যে যে সব গ্রন্থ বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলী রচনা করেছেন, তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন প্রণীত জৈন ও হিন্দু, হরিদাস দাসের বৈষ্ণবসাহিত্যের ইতিহাস, গৌরসুন্দর ভাগবতদর্শনাচার্য-প্রণীত পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত মিবার-প্রতাপ নাটক, রামশঙ্কর ভট্টা-চার্য্য প্রণীত বেদবিভাগতত্ত্ব ও ব্রাহ্মণ, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তি-কৃত ব্রহ্মদর্শন —১৯৪৭ সালে বা অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গীয় পণ্ডিত-গণ কর্তৃক রচিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শতাবধি গ্রন্থ আমরা গত জুন থেকে ডিসেম্বর এই ছয় মাসে সংগ্রহ করেছি। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থই সার-বহুল এবং উপাদেয়। উপযুক্ত প্রচারের অভাবে এসব গ্রন্থের অধিকাংশেরই সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থান হয় না। সুতরাং ঈদৃশ গ্রন্থের প্রকাশ, প্রচার, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ভার সমিতির গ্রহণ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। দুঃখদৈন্যের নিষ্পীড়নে ওষ্ঠাগতপ্রাণ পণ্ডিতমণ্ডলীর ঈদৃশ বিদ্যাবত্তা প্রকাশ যদি অদ্যাপি সম্ভবপর হয়, তা হলে সুযত্ন-পরিরক্ষিত পণ্ডিতসমাজ থেকে কত অজস্ররত্নাবলী আমরা প্রত্যাশা করতে পারি, তা চিন্তা করতেও হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে।

৩। সমিতির সংস্কৃত বাংলা পত্রিকা প্রকাশ। সমিতির তত্ত্বাবধানে পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৪। বেসরকারী সাহায্যভাণ্ডার স্থাপন। এ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্ব্বেই আমাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের দানের বিষয়ে উল্লেখ করেছি। আমাদের সমিতির কার্যকরী সভার সভ্য কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়ও ছাত্রমণ্ডলীর উৎসাহবর্ধনের নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা দান করেছেন। এতদ্ভিন্ন আমরা কয়েক সহস্র টাকার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি এবং শীঘ্রই তা সংগৃহীত হবে।

এ প্রসঙ্গে যাঁরা আমাদের অর্থসাহায্য করেছেন বা অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন; যাঁরা অন্যান্য বহুবিধ বিষয়ে আমাদের অকাতরে সহায়তা প্রদানে অগ্রণী হয়েছেন; যাঁরা আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও কল্যাণ কামনার অকৃপণ ধারায় নিরন্তর সিঞ্চিত করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের প্রাণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সকল শুভানুধ্যায়ীর মর্ম্মোত্থ শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্ব্বাদ নিরন্তর অজস্রধারায় আমাদের উপর বর্ষিত হোক ইহাই আমাদের চিরন্তনী কামনা।

উপসংহার

গৌড়দেশ চিরকাল সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রধান দেশ। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন কবিসম্রাট্ রাজশেখর আমাদের সম্বন্ধে বলেছিলেন,—"গৌড়াদ্যাঃ সংস্কৃতস্থাঃ পরিচিতরুচয়ঃ"। বঙ্গ-বাসীর সম্বন্ধে রাজশেখরের প্রশস্তি অদ্যাবধি অভ্রান্ত সত্য। অদ্যাপি বঙ্গদেশে চতুষ্পাঠী ও পণ্ডিতসংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ থেকে সমধিক। এককালে এ বঙ্গদেশের ভারতমুকুটমণি মনীষীরা ভারতের সর্ব্বত্র জ্ঞান বিতরণ করতেন এবং সমগ্র ভারতের অশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। সেই হৃতগৌরব পুনঃ অর্জনের জন্য শুধু নয়, ভারতীয় কৃষ্টির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনের নিমিত্ত আজ বঙ্গবাসী আমাদের প্রত্যেককে বদ্ধ-পরিকর হতে হবে। প্রয়োজন হলে আত্মাহুতি প্রদানেও পশ্চাৎপদ হলে চলবে না। স্বাধীন-ভারতের সন্তানদের ভারতীয় সভ্যতার গৌরব অব্যাহত, অক্ষুন্ন রাখবার জন্য জীবন পণ করে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হতে হবে। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"—এই আমাদের মূলমন্ত্র। সংস্কৃতই আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের কৃষ্টির আধার, এবং তদ্বিষয়ক পূর্ণজ্ঞান সংস্কৃতের প্রকৃষ্ট জ্ঞানসাপেক্ষ। ভারতীয়দের ভারতীয়ত্বই যদি জাতীয় সাধনার মৌলিক বস্তু হয়, তা হলে সংস্কৃতবিষয়ক জ্ঞানই সর্বাগ্রে অর্জন করা প্রয়োজন। ভারত-বর্ষ ও সংস্কৃত প্রায় সমার্থক। তাই সংস্কৃতসেবীমাত্রেই নিরন্তর দেশমাতৃকাপদসেবী। তজ্জন্য আজ ভারতীয় স্বাধীনতার কনকায়মান শারদ প্রভাতে আমরা সংস্কৃতের বিজয়যাত্রা ঘোষণা করি, দেশমাতৃকার চরণকমলে আমাদের ভক্তি-কমলার্ঘ্য প্রদান করি। ভগবান্ আমাদের অভীষ্ট লাভের সহায়ক হউন, সংস্কৃতের বিজয়গাথায় বিশ্বের দিগ্ দিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠুক, আমাদের ভারত-জননী পূর্বের ন্যায় পুনরায় জ্ঞানের মুকুটমণি পরিহিতা হয়ে বিশ্বসভা আলোকিত করুন। ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অক্ষয়কীর্তি জগতে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, ভারতের জ্ঞানসুধাপানে জগদ্বাসী পুনরায় অমরত্বের সন্ধান প্রাপ্ত হোন, বিশ্বপতির মহামহিম দ্যুতি ভারতীয় জ্ঞানের অনন্ত জলধিতে প্রতিফলিত হয়ে বিভায় বিভায় জগতের দিগ্ দিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে তুলুক।

আমরাও অতন্দ্রিত হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে ধ্রুব লক্ষ্যপথে অগ্রসর হই।

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
পশ্য সূর্য্যস্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥
চরৈবেতি চরৈবেতি॥

যে চলিতে থাকে সে-ই অমৃতত্ব লাভ করে, সে-ই স্বাদু ফল আস্বাদন করে। চাহিয়া দেখ, সূর্যের কি আলোকসম্পদ—কারণ চলিতে চলিতে সে কদাপি তন্দ্রাবিষ্ট হয় না। অতএব চলিতেই থাক, চলিতেই থাক।"*

* বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের ১৯৪৭ সালের বার্ষিক সমাবর্তনোৎসবে সম্পাদক-কর্তৃক প্রদত্ত সংস্কৃত বক্তৃতার সারাংশ।

হাঙ্গেরিতে কৃষি-বিপ্লব

অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যভাগে হাঙ্গেরিতে ভূমিব্যবস্থা-সংক্রান্ত আইন পাস হয় এবং তখন থেকেই হাঙ্গেরিতে আরম্ভ হয় কৃষি-বিপ্লব। যুগ যুগ ধরে হাঙ্গেরিতে বড়লোক, জমিদার শ্রেণী ও ধর্ম্মযাজকগোষ্ঠী যে বিরাট্ ভূখণ্ড দখল ও ভোগ করেছিলেন, তাকে শত শত খণ্ডে বিভক্ত করা হয়; বিষয়টি খুবই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই ভূমি-সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা হয়। আঠার মাসের মধ্যে ইউরোপের মধ্যযুগীয় সামন্ত-ব্যবস্থার একটা বিরাট্ দুর্গকে ভেঙে দেওয়া হয়। জমিদারী প্রথার অবসান হ'ল। ৪০ লক্ষ কৃষি শ্রমিক নূতন দিনের নব জীবনের স্বাদ পেল; যুগসঞ্চিত অত্যাচার ও অবিচারের হাত হতে মুক্তি পেল হাঙ্গেরির লক্ষ লক্ষ কৃষক।

হাঙ্গেরিতে কৃষি-অর্থনীতির ভিত্তিভূমির আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হ'ল। দেশে চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ প্রায় ১৩,১৯৩,০০০ একর। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগেই ৪,৬৩৩,০০০ একরের বেশী, অর্থাৎ চাষের

উপযোগী জমির ⅓ পুনর্বণ্টন করা হয়। তা ছাড়া ৩,৩০০,০০০ একর জমি; এর বেশীর ভাগই হচ্ছে বন ও অনাবাদী জমি—হাঙ্গেরির ফ্যাসিষ্টদের হাতে থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রকর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ জমির বেশীর ভাগ রাষ্ট্রের হাতে চলে আসে বা জনসাধারণের কাজে ব্যবহার করার জন্ত রেখে দেওয়া হয়।

ভূমিব্যবস্থা সংস্কারের প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে ৬,৪২,০০০ কৃষক, কৃষিশ্রমিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয়। এর পূর্ব্বে এদের কোন জমি ছিল না বললেই হয়। হাঙ্গেরিতে প্রতি কৃষক পরিবারে মোটামুটি ভাবে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে রয়েছে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে ৪০ লক্ষ কৃষকের জীবনে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এসেছে। হাঙ্গেরির লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী এই ব্যবস্থার আওতায় পড়ে। যুগ যুগ ধরে সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছারিতায় উৎপীড়িত লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক আজ খানিকটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে, তাদের স্বপ্নসাধ বাস্তবে রূপায়িত করার অবকাশ হয়েছে। বড় বড় জমিদারের অত্যাচার থেকে তারা রেহাই পেয়েছে।

স্বভাবতঃ মনে জাগে, ভূমিব্যবস্থার এই বিরাট বিপ্লবের কারণ কি? এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। এমন কি হাঙ্গেরির বহুলোক, বড় বড় জমিদারদের মধ্যে অনেকে স্বীকার করেন যে এই ধরণের আমূল পরিবর্ত্তন ও পুনর্বণ্টনের প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব থেকে অনেক বড় বড় ভূস্বামী ভূমি-সংস্কারের প্রতিটি প্রচেষ্টায় তুমুল বাধা দেন, কিছুতেই ভূমির উপর নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছাড়বেন না, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার ১৯৪৫ সালে যে নীতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হয়, তার কোন সমালোচনা না ক'রে যে পদ্ধতিতে এ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তার তীব্র সমালোচনা করেন। আবার অনেক জমিদার সব দিক দিয়ে এই ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে হাঙ্গেরির মোট ভূমির মালিকদের মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগের বেশী লোকের ১·৪৭ একর থেকে ৭ একর মাত্র জমি ছিল, এর অর্থ হচ্ছে যে হাঙ্গেরির ১,৩৫৮,০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের হাতে ছিল ৫½ একর হতে ১১ একর জমি। এই পরিমাণ জমি জীবন ধারণের পক্ষে কিছুই নয়। তদুপরি রয়েছে লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক। তাদের মধ্যে অনেকেই বৎসরের অর্দ্ধেক সময় বা তারও কম সময়ের জন্ত কাজ পেত। ১৮৯৮ সালে ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপারে এক আইন পাস করা হয়, কিন্তু ভূমিহীন কৃষকের উপর এত সব বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছিল যে এই আইন দেশে দাসত্ব আইন বলে পরিচিত হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্রমবর্দ্ধমান বিক্ষোভ দেখা দেয়। হাঙ্গেরিতে অনেক ধর্মঘট হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশে বিরাট গণ-আন্দোলন ও গণজাগরণ হয়। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে হাঙ্গেরিতে যে বিপ্লব হয় তার মূলে রয়েছে উৎপীড়িত কৃষকদের বিরাট গণঅভ্যুত্থান।

কৃষকদের প্রধান দাবি ছিল জমিদারীর উৎখাত ও জমির পুনর্বণ্টন। কবিন্ট মাইকেল ক্যারোলি কর্তৃক পরিচালিত সরকার কৃষকদের এই ন্যায্য দাবির প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি এক আদেশ জারি করলেন যে ২৮৪ একরের বেশী জমি কেউ দখলে রাখতে পারবে না। বাকী জমি সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। ক্যারোলি নিজেই তাঁর একটা বিরাট জমিদারী ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ক্যারোলি সরকারের পথে ছিল অনেক বাধাবিপত্তি। তার সরকার সে সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে পারেন নি। ক্যারোলি সরকারের অবসানের পর ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে হাঙ্গেরির বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা বেথাকুন রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। বেথাকুন সরকারও কৃষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন নি। কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন না করে বেথাকুন সরকার সমস্ত জমি ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে জাতীয়করণের এবং বলপ্রয়োগে সাম্যবাদ স্থাপনের চেষ্টা করেন। সাম্যবাদের মূলনীতি জাতীয়করণ, সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিকার্য্য চালাবার প্রয়োজনীয়তা কৃষক-দিগকে না বুঝিয়ে, সাম্যবাদ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন বলে বেথাকুন অকৃতকার্য্য হলেন।

ক্রমে ক্রমে হাঙ্গেরির কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা এসেছে এবং সেই চেতনাকে কার্য্যকরী করার ক্ষমতাও তারা অর্জ্জন করেছে। ক্রমাগত গণ-আন্দোলনের ফলে তারা পেল ১৯২০ সালের কৃষি ও ভূমিব্যবস্থা-সংক্রান্ত আইন। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় এই আইন তেমন কিছু নয়। এই আইনে ছিল বহুবিধ ত্রুটি ও বাধানিষেধ। তাহার ফলে আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এই আইন প্রবর্ত্তনের ফলে যদিও প্রায় ৪ লক্ষের মত ভূমিহীন কৃষক ২½ একর জমি পেয়েছিল (জীবনধারণের পক্ষে হাঙ্গেরিও কমপক্ষে ১২½ একর জমির আবশ্যক), বড় বড় জমিদারের আসন তাতে একটুও টলে নি। হর্থী ও বেথলামের নেতৃত্বে বড় বড় জমিদার ও ভূস্বামী সব দিক দিয়ে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। ১৯৪০ সালে হাঙ্গেরির সরকারী মুখপত্রে এ সম্বন্ধে মাইকেল ক্যারিক এক বিরাট প্রবন্ধ লেখেন; তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে ১৯৩০ সালে ৪৫ লক্ষ কৃষকের মধ্যে ৩৫ লক্ষ কৃষকের কারও কারও ৭ একর, বা তার চেয়ে কম বা কারও জমিই ছিল না। দেশে প্রায় ৬ লক্ষ কৃষি কার্য্য ছিল, ১০ লক্ষ শ্রমিকের কোন জমিই ছিল না; এবং তা'দিকে কোন জমিই দেওয়া হয় নি,

২,৫০,০০০ দিন মজুরের জনপ্রতি ১'৪৭ একরেরও কম জমি ছিল, ১০ লক্ষ ছোট ছোট কৃষক পরিবারের ছিল মাত্র ১'৪৭ একর হতে ৭ একর পর্য্যন্ত। মাইকেল ক্যারিক আরো দেখিয়েছেন যে সমগ্র কৃষকের মধ্যে ½ অংশকে ভাড়াটে মজুর হিসেবে খাটানো হ'ত এবং আর ⅙ অংশ সম্পূর্ণরূপে ভূমিহীন কৃষক। এক কথায় ১৯২০ সালের আইনে শতকরা ৬৬ জন কৃষকের কোন উপকারই হয় নি।

হাঙ্গেরির সমগ্র ভূখণ্ডের ½ অংশের উপর ছিল বড় বড় জমিদার ও ধর্ম্মযাজকদের একচেটিয়া আধিপত্য। এই প্রকার জমিদারীর সংখ্যা ছিল ৪ হাজার এবং তাদের দখলে ছিল ২,৫০০ একর জমি থেকে আরম্ভ করে আরো বেশী—হাঙ্গেরির বড় বড় জমিদারীর মধ্যে ২৫টি জমিদারীর উপর সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত মালিকানা। এদের সব চেয়ে বড় জমিদার হলেন হাঙ্গেরীর যুবরাজ পল এট্‌ক্লার হেজী এবং তাঁর দখলে ছিল ২,৯৮,০০০ একর জমি, আর হাঙ্গেরির ক্যাথলিক কালচার ফাণ্ডের দখলে ছিল ৪৫,০০০ একর জমি, এই ২৫টি বড় বড় জমিদারীর মধ্যে ১৬ টির মালিক ছিলেন হাঙ্গেরির বড় লোকেরা এবং বাকী ৯টি ধর্ম্মশালা ও ধর্ম্মযাজকদের কবলে। এই হ'ল একদিকের ছবি, আর অন্য দিকে রয়েছে গৃহহীন, বস্ত্রহীন, ভূমিহীন লক্ষ লক্ষ কৃষিমজুর।

হাঙ্গেরির কৃষকদের অবস্থা ছিল আমাদের দেশের কৃষকদের মত। অন্ন-বস্ত্র-গৃহ-শিক্ষা বিবর্জ্জিত কৃষক সর্ব্বত্রই রয়েছে সমাজের নীচের তলায়। বৎসরে কৃষকরা যখন কাজ পায়, তখন তাদের দৈনিক আয় হয় মাত্র বিশ সেণ্ট। হাঙ্গেরির অর্দ্ধেকের বেশী লোকের এই অবস্থা। স্পেনের অন্নহীন, অর্দ্ধ-বুভুক্ষু ও সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত কৃষকদের মত হাঙ্গেরির কৃষকশ্রেণীও মুক্তির জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিল; কিন্তু তাদের কথা কেউ কানে তোলে নি। ১৯৪৪ সালে লালফৌজের প্রচেষ্টায় হাঙ্গেরিতে আসে সমাজ-বিপ্লব। সঙ্গে সঙ্গে রচিত হ'ল সামন্ততন্ত্রের সমাধি, হাঙ্গেরির ৮৫ লক্ষ জনগণের কেউ আজ উৎখাত অত্যাচারী জমিদারের কথা স্মরণ করে না।

১৯৪৫ সালে ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে যে আইন প্রণীত হয়, তাতে রয়েছে: (ক) গড়পড়তা প্রতি কারমে ১৪২ একরের বেশী জমি রাখা যাবে না, (খ) নাগরিকদের যারা কৃষিকার্য্য করে এবং জমির সঙ্গে যাদের যোগাযোগ রয়েছে, তাঁ'দিকে ২৮৪ একর জমি দেওয়া হবে, (গ) নাৎসীদের বিরুদ্ধে যে সব নাগরিক সংগ্রাম করেছে, বা মুক্তি আন্দোলনে যারা বিশেষ কাজ করেছে, তাদের মধ্যে জমিবণ্টনের ভার একটা বিশেষ কমিটির হাতে থাকবে এবং কমিটির রায় অনুযায়ী তাঁ'দিকে ৪২৬ একর জমি দেওয়া হবে, (ঘ) যে সব জমিদারীতে ১,৪২০ একরের বেশী জমি রয়েছে, সে সব জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং পুরাতন মালিকদের ১৪২ একরের বেশী জমি দেওয়া হবে না, এই আইনের ফলে বড় বড় জমিদারী উৎখাত করা হয়। এইভাবে জমির উপর একচেটিয়া মালিকানা বজায় রেখে যাঁরা নানা প্রকারে সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করেছিলেন, তাঁরা তার থেকে বঞ্চিত হলেন। বিপ্লবের ফলে বড় বড় জমিদার ও ধর্ম্মযাজকেরা তাদের জমিদারী থেকে উৎখাত হলেন, সরকার প্রায় ১,৯০৫টি বড় বড় অট্টালিকা দখল করে এবং প্রায় ১১,০০০ ব্যক্তিগত পার্কও সরকারের দখলে আসে। এই সব বড় বড় অট্টালিকা আজ স্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যনিবাস ও সর্ব্বহারাদের জন্য বিশ্রামাগারে পরিণত হয়েছে।

ভূমি-সংস্কার আইনে ক্ষতিপূরণের কথা রয়েছে, কিন্তু ক্ষতিপূরণের হার কত হবে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলা হয় নি। ক্ষতিপূরণের জন্য একটা বিশেষ ভাণ্ডার খোলা হবে, নূতন কৃষক মালিকদিগকে ১০ বৎসর ধরে এই ক্ষতিপূরণ ভাণ্ডারে কিস্তি করে টাকা দিতে হবে। কিন্তু প্রথম তিন বৎসর কোন টাকা দিতে হবে না, তবে ব্যবস্থা দেখে মনে হয় ক্ষতিপূরণের হার বেশী হবে না।

এই বিরাট বিপ্লবের ফলে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ পরিবর্ত্তন এসেছে, ভূমিহীন কৃষকের মুক্তি-সংগ্রামের এই অপূর্ব্ব সাফল্য বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ। ক্ষতি যে কিছু হয় নি, তা নয়। জমিদারদের যে সব যন্ত্রপাতি ছিল, তার অধিকাংশ নষ্ট হয়, দেশের প্রায় অর্দ্ধেকেরও বেশী গরু ঘোড়া নষ্ট হয়, হাঙ্গেরির কৃষক নরনারী আজ নিজের হাতে চাষের কাজ আরম্ভ করেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমিতে চাষ করা হ'ত, ১৯৪৬ সালে তার শতকরা ৭০ ভাগ জমিতে চাষ করা হয়, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে প্রধান প্রধান শস্যের উৎপাদনের হার যুদ্ধ-পূর্ব্ব হার হতে অর্দ্ধেক কমে যায়, অনেক ক্ষেত্রে আইন কার্য্যকরী হওয়ার আগে চাষীরা বিস্তর জমি জোর করে দখল করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে চাষীরা আইন ভঙ্গ করে এবং সরকারকে বাধ্য হয়ে আইন সংশোধন করতে হয়।

সরকারী হিসাব মতে ধর্ম্মশালা ও ধর্ম্মযাজকদের দখলে ছিল মোট ১,৪২২,০০০ একর জমি, ভূমি-সংস্কার আইনের ফলে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদের হাত থেকে সরকার ১,১০৮,৭০০০ জমি বাজেয়াপ্ত করেন। এই জমির অর্দ্ধেকের বেশী ছিল বন, আর বাকী অংশ চাষের উপযোগী। চার্চ্চের অধীনে অনেক কয়লার খনিও ছিল। ফলের বাগান, আঙ্গুরের বাগান, এই সবই ছিল চার্চ্চের আয়ের পথ এবং ভূমি-সংস্কার আইনের ফলে সরকারের দখলে এই সব আসে। হাঙ্গেরির বড় বড় জমিদারেরা চার্চ্চের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেছিলেন, চার্চ্চের অধীনে অনেক স্কুল, কলেজ ও

বিদ্যালয় ছিল, এতে লেখাপড়ার মোটামুটি বন্দোবস্ত ছিল। ক্যাথলিক চার্চ্চ কর্ত্তৃপক্ষ অনেক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করিতেন।

অভূতপূর্ব্ব কৃষি বিপ্লবের ফলে যদিও লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক জমি পায়, যদিও জমিদারী প্রথার অবসান হয়, তবুও হাঙ্গেরিতে আজ হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ভাড়াটে কৃষকের দল, কৃষি-শ্রমিক ও ছোট ছোট কৃষি খামারের মালিক। শেষোক্ত কৃষক শ্রেণীর জমি এত কম যে, এতে তাদের জীবন যাপন করা সম্ভবপর নয়, ভূমি-সংস্কার আইনের পর প্রায় ৭,৫০,০০০ জন কৃষক রয়েছে এবং এই আইনে তাদের ভাগ্য বদ্‌লায় নি, সরকারও একথা স্বীকার করেন। জমি যথেষ্ট নাই বলে সকলকে সমান ভাবে জমি দেওয়া হয় নি।

কৃষি অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে প্রতি কৃষক পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য ১২½ একর জমির আবশ্যক। যদিও জমিদারী ও সামন্ততন্ত্র উৎখাতের ফলে সরকারের হাতে যথেষ্ট জমি এসেছে, সে জমিই হাঙ্গেরির দরিদ্রতা দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়। জমি বন্টনের ফলে যারা জমি পেয়েছে, তারাও প্রতি পরিবার পিছু ১২½ একর জমি পায় নি এবং জমি নাই বলে তা সম্ভব হয় নি। ১,০৯,০০০ কৃষক পরিবার গড়পড়তা ১১০৯ একর জমি পায়। ২,৬১,০০০ জন ভূমিহীন কৃষক মোটামুটিভাবে ৬·৯ একর জমির মালিক হয়, ২,১৩,০০০ ছোট ছোট কৃষক পরিবারের গড়পড়তা ৫·৫ একর জমি বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাতেও ১২½ একর হয় না, এখনও প্রায় এক লক্ষ কৃষকের পক্ষে জমিতে কাজ করার কোন সম্ভাবনা নাই।

বিরাট কৃষিবিপ্লব হয়ে গেল, জমিদারী প্রথা, সামন্ত-তান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা, চার্চ্চের অত্যাচার ও শোষণের সমাধি হ'ল, কৃষকদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন করা হ'ল, তবুও হাজার হাজার কৃষক জমি পায় নি, যারা পেয়েছে তারা উপযুক্ত পরিমাণে জমি পায় নি, এর মূল কারণ হচ্ছে জমির অভাব। এই সমস্যা কি ভাবে সমাধান করা যায়, তাহাই বুদাপেষ্ট কমিউনিষ্ট প্রভাবান্বিত সরকারের প্রধান সমস্যা। দেশের কৃষিব্যবস্থা সেকেলে ধরণের। ট্রাক্টর নেই, ফার্টিলাইজার নেই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক কোন যন্ত্রপাতি হাঙ্গেরির কৃষকের হাতে নেই। জমিদারশ্রেণী কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিক ধরণের করার কোন চেষ্টাই করেন নি। তা ছাড়া হাঙ্গেরির কৃষক-শ্রেণী সমবায় ও যৌথপ্রথা অনুযায়ী কৃষিকার্য্য চালানোর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্যক বুঝে উঠতে পারে নি। সরকার যৌথ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করবেন কি না সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেন নি। বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা ম্যালিয়স রেকোশি এই ব্যাপারে এখনও নীরব। তবে সরকার যৌথ ও সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি-ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার বিষয় চিন্তা করছেন এবং তাতে এই সমস্যার সমাধান অনেকটা এগিয়ে যাবে।

স্বাধীনতার পরে

শ্রীনীলরতন দাশ

দুঃশাসনের নাগপাশ হ'তে মুক্তি লভিল দেশ,
এলো স্বাধীনতা বহুবাঞ্ছিতা, পরাধীনতার শেষ।
ব্যাকুল হৃদয়ে বসেছিনু মোরা আশায় বাঁধিয়া বুক,—
স্বর্ণযুগের আগমনে সবে লভিব স্বর্গসুখ।

কিন্তু দেখি যে পিশাচেরা আজো হাসিছে অট্টহাস,
নাগ-নাগিনীরা গোপনে ফেলিছে বিষাক্ত নিশ্বাস।
শান্তির নীড় পল্লীকুটীর ভাঙিছে গুণ্ডারাজ,
বাস্তহারারা দলে দলে দেখি পথে পথে কাঁদে আজ।

এখনো যে দেখি নগর শহর আর্ত্ত অশোক বন,
বন্দিনী সীতা লাঞ্ছিতা হয়ে কাঁদে সেথা অনুখন।
রাজপথে চলে অর্দ্ধনগ্ন বুভুক্ষিতের দল,
ভিক্ষাপাত্র হাতে লয়ে তারা করে আজো কোলাহল।

স্বর্ণযুগের নিঃস্বেরা আজো স্বর্ণরেণু না পায়,
ধনিকে বণিকে কাঞ্চন লুটে, বঞ্চিত ওরা হায়!
সবহারাদের হাহাকার ধ্বনি এখনো যে শুনি আমি,
দুর্গতিমাঝে দুর্ভাগাদল কাঁদিছে দিবসযামী।

দেবতার তরে স্বর্গে এখনো মজুত হতেছে সুধা,
মর্ত্ত্য-মানুষ কণিকা তাহার পায় না মিটাতে ক্ষুধা।
চিরবঞ্চিত নাহি পায় যদি মানুষের অধিকার,—
বৃথা তবে এত উৎসব, মিছে স্বাধীনতা-চীৎকার!

পৃথিবীর বয়স

শ্রীদীলিপকুমার চক্রবর্ত্তী

বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করার চেষ্টার বহু পূর্ব্বেই প্রাচীন যুগের মনীষিগণ পৃথিবীর বয়স বের করার প্রণালী উদ্ভাবন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় পুরাকালের হিন্দুদের। তাঁদের গণনানুযায়ী পৃথিবীর জন্ম থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ১৯৭,২৯,৪৯,০৪৮ বৎসর কেটে গিয়েছে। এই গণনা আশ্চর্য্যরকম ভাবে সঠিক। বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ ভূতত্ত্ববিদের মতে পৃথিবীর বয়স ন্যূনাধিক দুই শত কোটি বৎসর। যদি হিন্দু মনীষিগণ তাঁদের এই মতবাদ এবং গণনা ভূতাত্ত্বিক প্রমাণের উপর নির্ণয় করতেন তা হলে হয়ত পরের যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এত মতভেদ ও তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হ'ত না।

কিন্তু অষ্টাবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ বিষয়ে পশ্চিমের জনসাধারণের মন সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। তারা বিশ্বাস করত মোজেস্-বর্ণিত "ওল্ড টেষ্টামেন্টে" লেখা পৃথিবীর জন্ম-কাহিনীতে। আর্কবিশপ উশারের মতানুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল ৪০০৪ খ্রীঃ পূঃ। তখনকার নবীন ভূতত্ত্ববিদগণ এই ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলে তাদের ধর্ম্মদ্বেষী বলে বিদ্রূপ করা এবং ভয় দেখান হ'ত। এই ধর্ম্ম সংস্কার তাদের মনে সময় সম্বন্ধে কিরূপ ক্ষুদ্র ও অনুদার মতের সৃষ্টি করেছিল তা বোঝা যায় নীচের দৃষ্টান্ত থেকে। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ এডমাণ্ড হ্যালি বুঝেছিলেন যে সমুদ্রের লবণত্ব (salinity) ক্রমেই বাড়ছে। তিনি ভেবেছিলেন যে যদি দু' হাজার বৎসর পূর্ব্বের রোমানদের সময়ে সমুদ্রের লবণত্বের পরিমাপ জানা থাকত, তা হলে বর্ত্তমান লবণত্বের সঙ্গে তুলনা করে সমুদ্রের বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হ'ত। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, হ্যালি যদি পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি বৎসর বলে অনুমান করে থাকতেন তাহা হলে বুঝতে পারতেন যে দু' হাজার বছরে সমুদ্রের লবণত্ব এত সামান্য বেড়েছে যে তা মাপা সম্ভব নয়। অবশ্য তিনি একবার সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে "হয়ত পৃথিবীর বয়স আমরা যা অনুমান করছি তার চেয়ে অনেক বেশী।" ভূতাত্ত্বিক সময়ের বিশালতা ও সম্পূর্ণ অর্থ প্রথম অনুধাবন করেছিলেন আধুনিক ভূতত্ত্বের জন্মদাতা জেমস হাটন।

এখন আমরা জানি যে পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে অন্ততঃ দশটি বিরাট্ পরিবর্ত্তনের যুগ কেটে গিয়েছে। প্রত্যেক যুগের পরিবর্ত্তন তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) প্রথমত ভূপৃষ্ঠের নিম্নের স্তরে (belt) ঘনীভূত হয়েছে তলানি (sediment) এবং আগ্নেয় শিলারাজী (volcanic rocks)। (২) তারপর সেই স্তরে পড়েছে ভীষণ চাপ। ফলে দেখা দিয়েছে ভাঁজ ও সংকোচন। এরই সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর হয়েছে গভীর নিম্নস্তরের শিলায় এবং জন্ম নিয়েছে বিরাট্ গ্রানাইটের স্তূপ। (৩) তৃতীয় অবস্থায় সেই স্তর ক্রমে ক্রমে উঁচুতে উঠেছে এবং আবরণমুক্তির (penudation) জন্য সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে তার ক্ষয়। আল্পস ও হিমালয় পর্ব্বত এখন এই পরিবর্ত্তনের শেষ অবস্থায়। কর্নওয়াল ও ডেভনের পর্ব্বতরাজী এখন দ্বিতীয় অবস্থায়। স্কটল্যাণ্ড, ওয়েল্স ও নরওয়ের পর্ব্বতশ্রেণী প্রথম অবস্থার উদাহরণ। এভাবে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের চিহ্নগুলি পরীক্ষা করতে করতে যত দূরই আমরা অগ্রসর হই না কেন তবুও জেমস্ হাটনের ন্যায়, "আরম্ভের কোন নিদর্শনই পাই না"।

হাটন কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে পৃথিবীর বয়স অনুমান করার কোন চেষ্টাই করেন নাই। ডারউইন কেন্টের চুনাপাথরের ক্ষয়ের মাত্রা থেকে নিম্নস্তরের আবরণমুক্তির জন্য কত বৎসর লেগেছে তার একটা মোটামুটি হিসাব করেছিলেন। তাঁর অনুমান ছিল প্রায় ৩০ কোটি বৎসর। আজ আমরা জানি যে এই অনুমান প্রকৃত সময়ের চেয়ে অন্ততঃ পাঁচ গুণ বেশী। ভূপদার্থবিদ্যার পথপ্রদর্শক কেল্ভিন পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের জন্য এক নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন। তাঁর মতে যখন পৃথিবী সূর্য্য থেকে জন্ম নেয় তখন তা ছিল একটি প্রকাণ্ড অগ্নিগোলক। সেই বাষ্পীয় অগ্নি-পিণ্ড ক্রমে ক্রমে জমাট বেঁধেছে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে তাপের প্রবাহ নির্ভর করে নিম্ন স্তরে উত্তাপের আধিক্য এবং শিলার তাপ পরিবহন ক্ষমতার উপর। তিনি বলেন যে বর্ত্তমান "তাপক্রম" (temperature gradient) এর চেয়ে কম হ'ত যদি ভূপৃষ্ঠ ৪০ কোটি বৎসরেরও আগে ঘনীভূত হ'ত এবং এর চেয়ে বেশী হ'ত যদি ২ কোটি বৎসরের কম সময়ে ঘনীভূত হ'ত। অনেকেই কেলভিনের মতের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। তবুও তিনি শেষ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বয়স ২ থেকে ৪ কোটি বৎসরের মধ্যে ধার্য্য করেন। কিন্তু আর্চিবল্ড ও জেমস্ গিকি দেখান যে কেলভিনের মতবাদ ভুল। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে দশ কোটি বৎসর ধরে ঠাণ্ডা হবার ফলেও কেবলমাত্র উপরস্থ এক পাতলা ভূস্তরই ঘনীভূত হবে। সেক্ষেত্রে আল্পস বা হিমালয়ের মত বিরাট পর্ব্বতসমূহের অস্তিত্ব সম্ভব হ'ত না। কাজেই কেলভিনের পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ভুল আছে। পেরি মনে করেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তর-

ভাগের তাপপরিবহনক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী—এ থেকে পৃথিবীর বয়স ৪০০ কোটি বৎসর বলে অনুমান করা যায়।

তবুও গত শতাব্দীর শেষভাগে অধিকাংশ ভূতত্ত্ববিদের মতে পৃথিবীর বয়স ছিল ১০ কোটি বৎসরের কম। কেল্‌ভিনের মতবাদে যা আসল ভুল তা ধরা পড়ে আরও কিছুদিন পর। লর্ড র‍্যালে দেখান যে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত শিলাতেই রেডিয়াম আছে। কাজেই পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ ছাড়াও শিলাসমূহ তেজস্ক্রিয় (Radioactive) পদার্থ হতে তাপ লাভ করছে। সেজন্য পৃথিবীর ঠাণ্ডা হতে যত সময় লাগত তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগছে। যদি ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়ে তাপপ্রবাহের দশ ভাগের নয় ভাগ তেজস্ক্রিয় পদার্থের জন্য হয়ে থাকে তা হলে কেলভিনের দু থেকে চার কোটি হয়ে দাঁড়ায় ২০০ থেকে ৪০০ কোটি বৎসর।

এই সময় জলি প্রমুখ কয়েকজন ভূতত্ত্ববিদ্ হ্যালির পদ্ধতি অনুসরণ করে সমুদ্রের বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তারা ধরে নেন যে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত গড়ে প্রতিবৎসরে একই পরিমাণ লবণ ভূখণ্ড থেকে সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত হয়েছে। এ থেকে তাঁরা হিসাব করেন যে পৃথিবীর বয়স হবে ৮ থেকে ১৫ কোটি বৎসরের মধ্যে। বর্তমানে নির্ভরযোগ্য ভূরাসায়নিক (Geochemical) তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে বৎসরে সমুদ্রে লবণের পরিমাণ বাড়ছে—৬×১০^{৭} টন করে। সমুদ্রে লবণের বর্তমান পরিমাণ হ'ল ১৫×১০^{১৫} টন। এখন যদি আমরা ধরে নিই যে সমুদ্রে লবণ পূর্বেও এই পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে তবে পৃথিবীর বয়স হবে ২৫ কোটি বৎসর। কিন্তু আমরা জানি বর্তমান কালের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা প্রাচীন কাল হতে একেবারেই পৃথক। কাজেই বৎসরে যে পরিমাণ লবণ দ্রবীভূত হ'ত তারও নিশ্চয় পরিবর্তন ঘটেছে। এজন্য সমুদ্রের লবণত্বের পরিমাণ থেকে কখনই পৃথিবীর সঠিক বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যত বৎসর কেটে গিয়েছে —এই মহাসময়ের পরিমাপ যদি আমরা করতে চাই তা হলে আমাদের এমন একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে যা পৃথিবীর জন্ম থেকে আরম্ভ হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার নিয়মগুলিও আমাদের জানা থাকা দরকার। তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনই (disintegration) একমাত্র প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা অনাদিকাল হতে অপরিবর্তিত ভাবে চলছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে স্বতঃ বিস্ফোরণের ফলে (spontaneous disintegration) আল্‌ফা-কণা বা বিটা-কণা ও গামা-রশ্মি নির্গত হয়। এই ভাঙনের শেষ ফল সীসা। সম্পূর্ণ পরিমাণ সীসাই শিলায় জমা থাকে। যদি প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে পিচ ব্লেণ্ড, ইউরেনাইট্ ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থগুলির কোন পরিবর্তন না ঘটে থাকে তা হলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে উদ্ভূত সীসার পরিমাণ নির্ভর করে ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামের বর্তমান পরিমাণ এবং খনিজ পদার্থটির বয়সের উপর। তেজস্ক্রিয় পদার্থ-উদ্ভূত সীসা হতে সাধারণ সীসা পৃথক করা যায়। ইউরেনিয়ামে ইউরেনিয়াম ২৩৮ এবং ইউরেনিয়াম ২৩৫ নামক দুটি আইসোটোপ (Isotope অর্থাৎ একই রাসায়নিক প্রকৃতিবিশিষ্ট অথচ বিভিন্ন আণবিক ভরযুক্ত) আছে। ১৪০ ভাগ ইউরেনিয়ামে ১ ভাগ ইউরেনিয়াম ২৩৫ থাকে। কিন্তু ইউরেনিয়াম ২৩৫ ইউরেনিয়াম ২৩৮ এর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ভাঙে। কাজেই অতীতে এই দুই প্রকার ইউরেনিয়ামের অনুপাত বর্তমান অপেক্ষা বেশী ছিল। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি এরূপভাবে ভাঙে :—

$$\text{ইউরেনিয়াম}^{২৩৮} \text{—সীসা}^{২০৬} + ৮ \text{ হিলিয়াম}$$

$$\text{ইউরেনিয়াম}^{২৩৫} \text{—সীসা}^{২০৭} + ৭ \text{ হিলিয়াম}$$

$$\text{থোরিয়াম}^{২৩২} \text{—সীসা}^{২০৮} + ৬ \text{ হিলিয়াম}$$

দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন আইসোটোপের উদ্ভব হয়। সাধারণ সীসা এই তিনটি আইসোটোপ এবং সীসা ২০৪ নামক আরও একটি আইসোটোপের সংমিশ্রণ। এই চতুর্থ আইসোটোপটি কোনও প্রকার তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনের ফলে পাওয়া যায় না। কাজেই সীসাকে যদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলাদা করে "ভর-বর্ণালী যন্ত্রের" (mass spectograph) সাহায্যে আইসোটোপীয় বিশ্লেষণ করে সীসা ২০৪ পাওয়া যায় তা হলে শেষোক্ত পদার্থটির অনুপাত হতে প্রথমে কতখানি সাধারণ সীসা ছিল তা বের করা সম্ভব।

বর্তমানে তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে সীসা উৎপাদনের হার সঠিক ভাবে জানা আছে। কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে এই হার অতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত স্থির আছে কি? অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনের প্রাকৃতিক স্থিরাঙ্ক (Physical constant) অপরিবর্তিত রয়েছে কি? এর উত্তর আমরা পাই প্লিওকোরিক্ জ্যোতির্বৃত্ত (haloes) থেকে। অনেক গ্রানাইট পাথরে বাদামী অভ্রের চূর্ণ পাওয়া যায়। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দিয়ে এই অভ্রচূর্ণ পরীক্ষা করে কতকগুলো কালো কালো বৃত্ত দেখা গিয়েছে। কালো ফুটকীগুলোর চারদিকে অনেকগুলো সুন্দর ঐককেন্দ্রিক বৃত্ত দেখা যায়। এই বৃত্তগুলোকে প্লিওকরিক জ্যোতির্বৃত্ত বলা হয়। প্রত্যেক জ্যোতির্বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের একটি ক্ষুদ্র স্ফটিক। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে হিলিয়াম অণু বা আলফা-কণা নির্গত হয় তারাই ঐ কালো বৃত্তগুলো গঠন করে। প্রত্যেক বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ নির্ভর করে আলফা-কণার দূরত্ব ও গতিবেগের উপর। ১৯৪৩ সালে হেণ্ডারসন দেখিয়েছেন যে ১০০ কোটি বৎসরের পুরোনো প্রাগ-কেম্ব্রিয় যুগের জ্যোতির্বৃত্ত এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক জ্যোতির্বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ ও গতিবেগ

সমান। এই ব্যাপারটি নির্ভর করে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনের হারের উপর। কাজেই এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনের স্থিরাঙ্ক অন্ততঃ ১০০ কোটি বৎসর যাবৎ স্থির আছে।

যে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে সীসার কোন একটি আইসোটোপের উদ্ভবের হার নির্ভর করে ভাঙনের স্থিরাঙ্ক এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থটির বর্ত্তমান পরিমাণের উপর। কাজেই যদি সীসা ২০৬ ও ইউরেনিয়াম ২৩৮, সীসা ২০৭ ও ইউরেনিয়াম ২৩৫ এবং সীসা ২০৮ ও থোরিয়ামের অনুপাত জানা থাকে তা হলে সহজেই সেই তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থটির বয়স নির্ণয় করা যায়। এই অনুপাত থেকে নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে বয়স নির্ণয় করা হয়।

প্রথম অনুপাত থেকে খনিজের বয়স $= ১৫{\cdot}১৫ \times ১০^{৯}\ \text{লগ}_{১০}\ ১ + ১{\cdot}১৫৮\,\dfrac{\text{সীসা ২০৬}}{\text{ইউরেনিয়াম ২৩৮}}$ বৎসর।

দ্বিতীয় অনুপাত থেকে খনিজের বয়স $= ২{\cdot}৩৭ \times ১০^{৯}\ \text{লগ}_{১০}\ ১ + ১৫৯{\cdot}৬\,\dfrac{\text{সীসা ২০৭}}{\text{ইউরেনিয়াম ২৩৫}}$ বৎসর।

তৃতীয় অনুপাত থেকে খনিজের বয়স $= ৪৬{\cdot}২০ \times ১০^{৯}\ \text{লগ}_{১০}\ ১ + ১{\cdot}১১৬\,\dfrac{\text{সীসা ২০৮}}{\text{থোরিয়াম ২৩২}}$ বৎসর।

এ ছাড়া সীসা ২০৭ ও সীসা ২০৬ এর অনুপাত থেকেও বয়স বের করা সম্ভব। যদি খনিজ পদার্থটির কোন পরিবর্ত্তন না ঘটে থাকে তা হলে সবকয়টি অনুপাত থেকে একই উত্তর পাব। কিন্তু সাধারণতঃ তা পাওয়া যায় না। যদি চারটি অনুপাত হতে বিভিন্ন উত্তর পাওয়া যায় তা হলেও তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তা থেকে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা সম্ভব। এই সম্বন্ধ অতি সহজেই তাদের লেখ (graph) থেকে পাওয়া যায়।

প্রফেসর এ. ও. নীয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া কতকগুলি তেজস্ক্রিয় খনিজের আইসোটোপীয় বিশ্লেষণ করেছেন। কয়েকটি বিশ্লেষণের ফল দেওয়া হ'ল।

ম্যানিটোবার ইউরেনাইটের বয়স ১৯৪·৫ কোটি বৎসর।
গ্রেগ মাটাইট মোনাজাইটের বয়স ১৯৫·০ " "
গ্রেগ মাটাইট ইউরেনাইটের বয়স ১৯৯ " "

এই বিশ্লেষণের ফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে খনিজ পদার্থগুলি ন্যূনাধিক ২০০ কোটি বৎসরের পুরনো। পৃথিবীর বয়স নিশ্চয় এর চেয়ে বেশী। কাজেই পৃথিবীর ন্যূনতম বয়স ২০০ কোটি বৎসর বলে ধরা যায়।

পৃথিবীর বয়সের সর্ব্বাধিক অনুমান বার করতে হলে আমাদের মনে করতে হবে যে যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল তখন এতে বিন্দুমাত্রও সীসা ২০৭ ছিল না। এখন যে পরিমাণ সীসা ২০৭ আছে তার সমস্তটাই হয়েছে ইউরেনিয়াম ২৩৫ থেকে। গ্রানাইট পাথরে গড়ে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে ২০ ভাগ সীসা এবং ৩·৫ ভাগ ইউরেনিয়াম আছে। এই সীসার বিশ্লেষণ থেকে উপরোক্ত সমীকরণের সাহায্যে পৃথিবীর বয়স ৫৪০ কোটি বৎসর বার হয়েছে।

আর্থার হোমস্ (১৯৪৬)এর মতে পৃথিবীর বয়স আরও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। সীসার বিশ্লেষণের ফলের লেখ অঙ্কন করে সীসার তিনটি আইসোটোপের মধ্যকার সম্বন্ধ জানা গিয়েছে। ২·৫ থেকে ১৩৩ কোটি বৎসরের পুরোনো তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ থেকে পৃথিবীর আদিম সীসায় সীসা ২০৭ ও সীসা ২০৬ এর আপেক্ষিক অনুপাত জানা গেছে। আরও জানা গেছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ-উদ্ভূত সীসা সাধারণ সীসায় মিশ্রণের পূর্ব্বে কত সময় কেটেছে। এই সব ফলের লেখ অঙ্কন করে পৃথিবীর বয়সের অনেকগুলো উত্তর পাওয়া গেছে। এই সমস্ত উত্তরের গড় ৩৩৫ কোটি বৎসর। কাজেই বর্ত্তমানে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সঠিক নির্ণয় অনুসারে "ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"র সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে ৩৩৫ কোটি বৎসর পূর্ব্বে।*

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় আর্থার হোমস্ এর লেখা প্রবন্ধ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

পুস্তক-পরিচয়

বাংলার ভাস্কর্য্য—শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। আশুতোষ চিত্রশালা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪৭। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ৪৪+।০+১৮ খানি ছবি।

আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় অবস্থিত মূর্তিগুলিকে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থকার সমগ্র বাংলার ভাস্কর্য্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। কল্যাণবাবু বিভিন্ন শিল্পধারার পরিচয় দিয়া অথবা চিত্রিত মূর্তিগুলির ভাবসৌষ্ঠব বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; বাংলার রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের উত্থানপতনের সহিত শিল্পের কি সম্বন্ধ ছিল তাহাও সংক্ষেপে নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

লেখার সম্পর্কে একটি কথা মাত্র বলিবার আছে। স্বল্পপরিসর পুস্তিকায় বহু বিষয় একত্র পরিবেশনের ফলে স্থানে স্থানে বিশ্লেষণ অথবা ইঙ্গিত সাধারণ পাঠকের উপযোগী না হইয়া কেবলমাত্র অনুভবী রসজ্ঞ পাঠকের উপযুক্ত হইয়াছে। আরও লঘুপাক খাদ্য রচনা করিলে সাধারণ পাঠক, অথবা বিশেষ করিয়া স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের বেশী উপকার হইত বলিয়া মনে হয়।

বইখানির ছবি ও ছাপা ভাল; কিন্তু মূল্য কিঞ্চিৎ বেশী মনে হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিনা লাভে, অথবা কিছু লোকসান দিয়াও, এরূপ শিক্ষাপ্রদ পুস্তিকার বহুল প্রচারের আয়োজন করা কর্তব্য।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

দিনান্ত—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্বাশা লিমিটেড। পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনু্য, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৩৷০ টাকা।

পিতৃকেন্দ্রিক (Patriarchal) একটি সংসারের ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়া লেখক কতকগুলি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা উত্থাপন করিয়া নিজের ধারণা অনুযায়ী সেগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বলিবার মোদ্দা কথাটা এইরূপ মনে হইল যে, এরূপ সংসারে একজনের কর্তৃত্বের চাপে আর সবারই জীবন পঙ্গু হইয়া পড়ে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগে থিয়েরীটার একটা মোহ আছে, হয়ত অবস্থাভেদে খানিকটা সত্যও; কিন্তু লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্যটি ঠিক ভাবে সপ্রমাণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গৃহস্বামী অবনীবাবু বৃহৎ এক কারখানার মালিক, নিজের চেষ্টাতেই তিনি এটি

গড়িয়া তুলিয়াছেন; স্বভাবত তিনি একজন দৃঢ়চিত্ত "পুরুষ-সিংহ"ই। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মধ্যে সেই অত্যাচারী 'টাইরেণ্ট'কে পাওয়া গেল না যাহার দ্বারা অন্যের জীবনের উপর একটা অস্বাস্থ্যকর প্রভাব না পড়িয়াই পারে না। এইজন্য যে 'চরিত্রগুলির জীবনে লেখক ব্যর্থতার ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, মনে হয় সেগুলি প্রধানত নিজের নিজের দুর্ব্বলতায় বা অবস্থা-বিপর্য্যয়েই ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং লেখকের প্রতিপাদ্যও এই পরিমাণে হইয়াছে ব্যর্থ, শুধু অযথাই যৌথ পরিবারের উপর তাঁহার একটা আক্রোশের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

থিয়েরীর এই অংশটুকু বাদ দিলে বইখানি সুখপাঠ্যই। লেখক ক্ষমতাবান, সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত, তবে ক্ষমতার মাঝে মাঝে অপচয় ঘটিয়াছে—সংলাপ এক এক স্থানে একটু দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর হইয়া পড়িয়াছে।

বইখানির বাহ্যসৌষ্ঠব ভালই, ছাপার ভুল কিন্তু স্থানে স্থানে মারাত্মক।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অপরাধ বিজ্ঞান—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল, এম্-এস্‌-সি। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

অপরাধ বিজ্ঞান প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ এবং জ্ঞান দুই-ই লাভ করিয়াছিলাম। আলোচ্য খণ্ডে নানারূপ অপরাধের পদ্ধতিসমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কয়েকটি অপরাধ, যেমন পকেটমারা, থীড গ্যামব্লিং প্রভৃতি কি উপায়ে সংঘটিত হয় সে সম্বন্ধে সাধারণের কিছু জানা থাকিবার কথা নহে। কি প্রকার সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক এবং কিরূপ সংঘবদ্ধভাবে এই সব অপরাধ সংঘটিত হয় গ্রন্থকার তাহা আমাদের স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বলিবার ভঙ্গী বড়ই মনোরম। বর্ণনাগুলি তাই মনে একটি স্থায়ী ছবি আঁকিয়া দেয়।

মনোবিদ্যার দিক হইতে অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই অপরাধসংক্রান্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন। গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তথ্যগুলি সংকলন করিয়াছেন। মনোবিদ্‌দের নিকট তাই এই পুস্তকখানির যথেষ্ট দাম আছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সকলেই যদি অপরিচিত লোকের সহিত মেলামেশা করিবার সময় কথঞ্চিৎ সাবধানতা অবলম্বন করেন তাহা হইলে বহুবিধ অযথা ক্ষতির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

নির্জ্ঞান মন—ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—সংস্কৃতি বৈঠক, বালিগঞ্জ। মূল্য ২৸০ টাকা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মানসিক রোগ-চিকিৎসায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন এবং আলোচ্য পুস্তকখানিতে সে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। জটিল মানসিক ঘটনাসমূহ এবং কয়েকটি মানসিক রোগের কারণ, নিদান প্রভৃতি সম্বন্ধে সহজবোধ্য সরল ভাষায় তিনি সুন্দরভাবে পুস্তকখানিতে আলোচনা করিয়াছেন। মানসিক ব্যাধি বিষয়ে এই ধরণের পুস্তক বাংলাভাষায় আর নাই বলিলেও চলে। পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ লোক সকলেই উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে করি। সহজভাবে লিখিত বলিয়া পুস্তকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কোথাও ব্যাহত হয় নাই। দাম্পত্যজীবন, মৃত্যু প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সকলের মনেই চিন্তার খোরাক যোগাইবে। আমাদের দেশে মনঃ-সমীক্ষণের প্রথম পথপ্রদর্শক শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

"নির্জ্ঞান মনের" বহুল প্রচার, বিশেষভাবে মনোবিদ্যা অধ্যয়নকারী ছাত্রদের মধ্যে হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

আনন্দ ও অস্পৃশ্যা
শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তি
পার্শ্বে—ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ
১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৫৫ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রাদেশিকতা

ইংরেজীতে প্রবাদবাক্য আছে, "charity begins at home" অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্য ঘরেই আরম্ভ করা উচিত। আমাদের এই ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই এই প্রবাদবাক্যের সার্থকতা সকলেই বুঝিয়াছে, কেবল বুঝে নাই বাঙালী। অন্য প্রদেশে বাঙালী ক্রমেই উচ্ছেদ হইতে চলিয়াছে, সম্প্রতি তাহার উপর পশুবলের প্রয়োগও আরম্ভ হইয়াছে, অথচ বাঙালী যদি তাহার স্বার্থরক্ষার কোনও চেষ্টা করে তখনই চতুর্দ্দিকে চীৎকার শুনা যায় "প্রাদেশিকতা মহাপাপ, বাঙালী পাপের পথে চলেছে।" পণ্ডিত নেহরু হইতে আমাদের বিদায়প্রার্থী প্রদেশপাল শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী পর্য্যন্ত সকলেই ঐ একই উপদেশ দিয়া আমাদের বাধিত করিতেছেন, কিন্তু কাহারও কোন মাথাব্যথা দেখা যায় না যখন ভিন্ন প্রদেশের লোকে নিজের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হয় বা যখন তাহারা বাঙালীর স্বার্থনাশে উদ্যত হয়। সুতরাং ঐরূপ সকল উপদেশই বাঙালীধ্বংসের আয়োজনের অঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করা প্রয়োজন। পণ্ডিত নেহরু উচ্চপদের কাজ যাহা কিছু তাঁহার হাতে ছিল তাহার অধিকাংশই স্বজাতীয়দিগের হাতে দিয়া দিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর দেশের লোকে নিজের স্বার্থ কতটা বুঝে তাহাও কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাঁহাদের উপদেশ নিজের নিজের ঘরেই দিলে ভাল হইত বোধ হয়। বাঙালীর এখন একথা বুঝা নিতান্তই প্রয়োজন যে, তাহার স্বার্থরক্ষা সে নিজে না করিলে তাহার সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত। আত্মীয়স্বজন বা সন্তানসন্ততির স্বার্থরক্ষা যদি প্রাদেশিকতা হয় তবে প্রাদেশিকতা মহাপুণ্য, স্তোকবাক্যে ভুলিয়া এ পুণ্যকার্য্যে অবহেলা যেন বাঙালী আর না করে।

এই সেদিন যে অর্থপিশাচের দল প্রায় ৬০ লক্ষ বাঙালী নরনারীকে অনাহারে বধ করিল, তাহাদের শতকরা ৯০ জন অবাঙালী বা অবাঙালীর দাস। আজ যে তস্করের দল দেশের অবশিষ্ট সম্পত্তির সবটুকু চোরাকারবারের পথে লুট করিতেছে তাঁহাদেরও দলপতি প্রায় সকলেই অবাঙালী। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযানও কি প্রাদেশিকতারূপ মহাপাপ?

[illegible], সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণায় বিহারীর দল বাঙালীর ভিটামাটি উচ্ছেদ করিয়া, তাহার মাতৃভাষা পর্য্যন্ত লোপ করাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহাতে বিহারীদের প্রাদেশিকতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা তাহারা কংগ্রেস নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রদেশের লোক। রাজেন্দ্র বাবু চিত্রগুপ্তের স্বজাতি, হয়ত সেই কারণেই তিনি "দোষ লিখেছেন বাঙালীর বেলা, আর বিহারীর বেলা লীলাখেলা।" ব্রিটিশ শাসকের জুয়াচুরিতে বাংলার মাটির যে অংশ অন্যায়ভাবে বিহারের হাতে দেওয়া হইয়াছিল, যে অঞ্চলের মাটির সঙ্গে বাঙালীর রক্তমাংসের সম্পর্ক হাজার বৎসরেরও অধিক, সেই মাটি ফিরিয়া চাওয়া, সেই আত্মীয়-কুটুম্বের "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হওয়ার শেষ চাওয়া, ইহাই হইল ঘোর অন্যায়। বলিহারি বিচার, বলিহারি ধর্ম্মজ্ঞান!

আবার একদল রব তুলিয়াছেন যে ভারতের পুণ্যভূমিতে সকল ভারতীয়েরই সমান অধিকার, সুতরাং প্রাদেশিক অংশ লইয়া বাদবিসম্বাদের প্রয়োজন কি? সমান অধিকার যে কতটা সে ত বাঙালী আজ বিহারে, আসামে ও উড়িষ্যায় হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। সুতরাং ঐ যুক্তি যে কতটা অসার সে কথা কি আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে? নিজের ভিটাতেই বাঙালী দাসত্বে ডুবিতে বসিয়াছে, অন্য প্রদেশের ত কথাই নাই। অন্য প্রদেশের লোককে বাংলায় স্থান দেওয়ায়, কাজ দেওয়ায় বাঙালী এত দিন যাবৎ কখনও আপত্তি করে নাই, এখন অন্য প্রদেশের লোকের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহাকে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

বিদেশীর অত্যাচার ও দমননীতি হইতে আজ ভারতবর্ষ উদ্ধার হইয়াছে। কিন্তু ঐ অত্যাচার ও অনাচারের প্রকোপ কোন্ প্রদেশের উপর সকলের চেয়ে অধিক পড়িয়াছিল? কোন্ প্রদেশের লোক বিদেশীর হাতে নিদারুণ পীড়ন সহ্য করিয়াও অদম্য উৎসাহে অক্লান্ত ভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইয়াছিল? বিদেশীর মাৎসন্যায় ও দমননীতির ফলে সর্ব্বাপেক্ষা নির্যাতিত হইয়াছে কোন্ প্রদেশ? এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এক বাংলা ও বাঙালী এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের

চল্লিশ বৎসরে যে ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, সমগ্র ভারতের অন্য সকল প্রদেশ একত্র করিলেও তাহার তুলনা হয় না। বাংলার মাটিতেই এই সংগ্রামের আরম্ভ এবং এই মাটিতেই তাহার পূর্ণতম বিকাশ এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? অথচ আংশিক ক্ষতিপূরণের কথা তুলিলেই আজ সেই বাঙালীকেই শুনিতে হইবে দেশপ্রেমের বিষয়ে উপদেশ ও প্রাদেশিকতা সম্পর্কে অনুযোগ।

বাঙালী কোন দিনই বিদেশী বা ভিন্ন প্রদেশীর প্রতি বিরূপ ছিল না এবং কোন দিন হইবেও না। কিন্তু ভিন্ন প্রদেশীয় শত্রুর সাহায্যে এবং শত্রুর ইঙ্গিতে যাহারা বাঙালীর ধনমান-প্রাণ নাশ করিতে উৎসাহ দেখাইয়াছে এবং আজও যাহারা অসৎ উপায়ে বাংলার সম্পদ বাংলায় ফিরাইয়া আনিবার পথে বাধা দিতেছে তাহাদিগকে বাঙালী আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবে বা নির্ব্বিবাদে অপহৃত সম্পত্তি ভোগদখল করিতে দিবে এ কিরূপ বিচার?

ইহা সত্য যে আজ ভারতভূমির চতুর্দ্দিকে শত্রু এবং ভিতরে প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে শত্রুর দল চক্রান্ত চালাইতেছে। এরূপ অবস্থায় গৃহবিবাদ যুক্তিযুক্ত নহে ইহাও সত্য। কিন্তু এই গৃহবিবাদ ও আত্মকলহের পথ যাহারা সকলের আগে ধরিয়াছে, যাহারা অকারণে বাঙালীকে নির্যাতন ও বাংলার সমৃদ্ধির পথ চিরদিনের মত কণ্টকিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাদিগকে কিছু বলা হয় না কেন? অন্য প্রদেশ মাতৃভাষার হিসাবে বিভাগ হইলে কোনও দোষ হয় না, যত দোষ এই অভাগা বাংলাদেশের।

বাঙালীকে এখন অবহিত হইয়া ভাবিতে হইবে আত্মরক্ষার কথা। দেশের শক্তি যাহাতে ক্রমেই গঠিত ও বর্দ্ধিত হয় সে বিষয়ে শুধু মন্ত্রীসভাকে অনুরোধ-উপরোধ বা অভিযোগ-অনুযোগ করিলেই চলিবে না। দেশে রাষ্ট্রশক্তির পুনর্জ্জাগরণ নিতান্তই প্রয়োজন। বাংলার কংগ্রেস নেতৃদল যে পথে এত দিন চলিয়াছিলেন তাহারই ফলে দেশের এই অসহায় অবস্থা এবং বাংলার কংগ্রেসের এই অবনতি। ভিন্ন প্রদেশীয় নেতৃবর্গের আজ্ঞাপালন এবং দেশের লোকের নিকট দেশপ্রেম ও ত্যাগের অজুহাতে স্বার্থসিদ্ধির দাবী ভিন্ন অন্য কিছুর চিহ্ন তাঁহাদের মধ্যে এতদিনেও বিশেষ দেখা যাইতেছে না। দেশকে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন কংগ্রেসকে সংস্কৃত ও অনাচার মুক্ত করা। দেশের লোকের উচিত এখন যাচাই করিয়া দেখা যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের আদর্শ বর্ত্তমান কংগ্রেসের দলে কতটা আছে। কংগ্রেসের ছাপের দৌলতে এত মেকী দেশে চলিয়াছে যে সাচ্চা চেনা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। দেশের প্রয়োজন খাঁটি জাতীয়তাবাদ ও বিশুদ্ধ গণতন্ত্রবাদ, তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে দেশবাসীকে সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতি বদলাইতে হইবে। চোরাকারবারীর জুয়াচুরির ফলে হাজার টাকার নোটও অচল হইয়া গিয়াছে। আজিকার পরিস্থিতিতে ভাবিবার সময় আসিয়াছে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কি করা উচিত।

পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ সচিবের অসহায়তা

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নানা স্থানে তাঁহার নিজের অসহায়তার কথা প্রচার করিতেছেন। এই প্রচারের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝা সহজ নয়। সহজ বুদ্ধির লোক মনে করিবে যদি অভিজ্ঞতার ফলে সেন মহাশয় বুঝিতে পারিয়া থাকেন যে তাঁহার কিছু করিবার নাই, তবে মন্ত্রিত্ব পদটি ছাড়িয়া দিলেই ত পারেন। তাহা না করিয়া এইরূপে পরাজিতের মনোভাব দিকে দিকে বিস্তার করিবার সার্থকতা কি? পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের কিছু ক্ষমতা আছে; সেই ক্ষমতার অংশীদার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। এই ক্ষমতার একটা রুদ্ররূপ আছে। তিনি কেন এই রুদ্ররূপে প্রকট হইতেছেন না? মেদিনীপুর হইতে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রেরিত এক সংবাদে দেখা যায় যে তিনি বলিতেছেন—

> "পশ্চিম বঙ্গ খাদ্যের সমস্ত দ্রব্যে ঘাটতি প্রদেশ হওয়ায়, ক্ষুধিত জনসাধারণের আহার দিবার যে গুরু দায়িত্ব তাঁহার উপর পড়িয়াছে সেই কর্ত্তব্য পালনে তিনি অসমর্থ হইয়াছেন, এবং একান্ত অসহায় বোধ করিতেছেন।"

এই অসহায় বোধের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কোন সঙ্গতি নাই; সেখানে তিনি দেশের লোককে গালাগালি দিয়া নিজের অক্ষমতার জ্বালার উপর প্রলেপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

> "দেশে শতকরা যদি একজন চোরাকারবারী থাকে, তা হলে তাকে ধরা যায়। কিন্তু শতকরা পঞ্চাশ জনই যদি চোরাকারবারী হয়, তা হলে তা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কোন সরকারের নেই।"

সেন মহাশয়ের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও, একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। রাষ্ট্র কেন "শতকরা পঞ্চাশ জন" চোরাকারবারীকে দমন করিবার জন্য আর পঞ্চাশ জনকে উদ্বোধিত করিতে পারে না? সমস্ত দেশের লোককে চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বলিলে তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের বিপদ আছে হয়ত। দেশের শতকরা পাঁচ জনের বেশী চোরাকারবারী হইতে পারে না ইহা সকলেই জানে, কেননা উহার অধিক ব্যবসায়ীই দেশে নাই। তবে মন্ত্রী মহাশয়ের পার্শ্বচররূপে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের শতকরা পঞ্চাশ জন কেন শতকরা পঁচাত্তর জন ঐ পথের পথিক বলিয়াই হয়ত তিনি চতুর্দ্দিকে চোরাকারবারী দেখিতেছেন।

চোরাকারবার অর্ডিনান্স

জনসাধারণের পক্ষ হইতে বহু আন্দোলন এবং গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে বহু গড়িমসির পর শেষ পর্য্যন্ত চোরাকারবার অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে। গত ১লা জানুয়ারী হইতে

অর্ডিনান্সের মেয়াদ আরম্ভ হইয়াছে। উহা জারী হইয়াছে ভারতশাসন আইনের ৮৮ ধারা অনুসারে, সুতরাং লোকে উহা ১৭ দিনের অর্ডিনান্স বলিয়া যাহা আশঙ্কা করিতেছিল তাহা হইবে না, ৩০শে জুন অর্ডিনান্সের মেয়াদ শেষ হইবে না। ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনের প্রথম ছয় সপ্তাহ পর পর্য্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে, এই ছয় সপ্তাহের মধ্যে অর্ডিনান্সটিকে আইনে পরিণত করিতে হইবে, মূল বিলটি পাস হইয়াই আছে, উহার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া বিলটিকে পাকা আইনে পরিণত করিতে ছয় সপ্তাহ সময়ই যথেষ্ট।

ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রধান অভিযোগ দুর্নীতি ও চোরাকারবার নিরোধে উঁহার অক্ষমতা। তাঁহাদের এই অক্ষমতা অথবা দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ চোরাকারবারীরা এবং দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীরা গ্রহণ করিতেছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে ছোট-বড় বহুসংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ এবং দেশদ্রোহী কর্ম্মচারী তদ্বিরের জোরে নানা স্থলে নিয়োজিত হইয়াছেন, ফলে সৎ ও দক্ষ কর্ম্মচারীদের মনোবল ভাঙিয়া গিয়াছে এবং সরকারের প্রত্যেক বিভাগে দুর্নীতির স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। ডাঃ ঘোষ এই জিনিষটির পত্তন করিয়া গিয়াছেন, ডাঃ বিধান রায় ও শ্রীকিরণশঙ্কর রায় এখনও উহার সংস্কার করিতে বিশেষ সক্ষম হন নাই। সরকারী কর্ম্মচারীদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয়বিধ সহায়তা ব্যতীত চোরাকারবার কিছুতেই চলিতে পারে না, কারণ সমস্ত চোরাকারবারটা নানাবিধ পারমিট প্রদানকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। পারমিট সংগ্রহে প্রকৃত ব্যবসায়ীর অক্ষমতা এবং অব্যবসায়ীর নিকট উহার সহজলভ্যতা চোরাকারবারের মূল কারণ। এইজন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে যতক্ষণ এই ধারণা না জন্মিতেছে যে চোরের সহিত যোগাযোগ রাখিলে একদিন না একদিন ধরা পড়িবই এবং সেদিন কিছুতেই রক্ষা পাইব না—ততদিন সহস্র অর্ডিনান্সেও চোরাকারবার বন্ধ হইবার উপায় নাই। মন্ত্রীরা ত অর্ডিনান্স জারী করিয়া ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু যে পুলিস উহা কার্য্যে পরিণত করিবে তাহার শীর্ষদেশে যদি বর্ত্তমান কমিশনার এবং হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনারের ন্যায় লোক অধিষ্ঠিত থাকেন তবে ফলের আশা লোকে কিরূপে করিবে? এক্ষেত্রেও হয়ত দেখা যাইবে এই কঠোর অর্ডিনান্স সত্ত্বেও পূর্ব্ববৎ পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, চাউলওয়ালী প্রভৃতিই দণ্ডিত হইতেছে, রাঘব বোয়াল প্রভৃতি নির্ব্বিবাদে পার পাইয়া যাইতেছে। অর্ডিনান্সের একটি ধারা আমাদের নিকট খুব অসঙ্গত ঠেকিল; ১০ নং ধারায় চোরাকারবারকে পুলিসগ্রাহ্য এবং জামীন নামঞ্জুর অপরাধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু ৩ (২) নং ধারায় বলা হইয়াছে যে এই অর্ডিনান্স অনুসারে কাহাকেও মামলা সোপর্দ্দ করিতে হইলে প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি লইতে হইবে। এত বিচার-বিবেচনা ও গবেষণার পর যে অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে তাহার মধ্যে এত বড় গলদ লোকে সামান্য ত্রুটি বলিয়া মনে করিতে পারিবে না; রাঘব বোয়াল পার করিবার জন্য জালের মধ্যে এই ছিদ্রটা রাখা হইয়াছে বলিয়াই লোকে ধরিয়া লইবে। গত বৎসর সর্দ্দার প্যাটেল সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি নিবারণকল্পে যে দুর্নীতিদমন আইন পাস করিয়া দিয়াছিলেন তাহাতেও ঠিক এই ছিদ্রটি রাখা হইয়াছিল এবং তাহারই জন্য এই আইন আজ পর্য্যন্ত দেশের কোন উপকারে আসে নাই। যে অপরাধ পুলিসগ্রাহ্য এবং জামিনের অযোগ্য করা হইতেছে তাহার মামলা চালাইবার জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হইবে কেন?

ডাঃ বিধান রায়ের গবর্ণমেণ্ট এত দিন এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন যে ক্ষমতার অভাবেই তাঁহারা দুর্নীতি ও চোরাকারবার বন্ধ করিতে পারেন নাই। এই ক্ষমতা এখন হাতে আসিয়াছে। চোরাকারবারের মূল কাহারা তাও তাঁহাদের জানা আছে। কাপড়ের কথাই ধরা যাক। বাংলা দেশে কাপড় বিক্রয়ের একমাত্র কর্ত্তা ছিল বি-টি-এ; বিনিয়ন্ত্রণের সময় ইহাদের হাতে প্রায় ৫০,০০০ গাঁইট কাপড় ছিল। চারজন ব্যবসায়ী ইহা ছাড়া আমেদাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে আরও প্রায় ৫০,০০০ গাঁইট কাপড় আমদানী করিয়াছেন। তা ছাড়া বাংলার মিলগুলিতেও প্রায় ৩৫,০০০ গাঁইট কাপড় তৈরি হইয়াছে। এই সমস্ত কাপড় কেবল দশ-বার জন মাত্র লোকের হাত দিয়া বিলি হইয়াছে এবং আমরা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে ইহারা দুই-তিন মাসের মধ্যে এই কাপড়ের উপর প্রায় ১৮।২০ কোটি টাকা দাম ও সাধারণ লাভ বাদে গাঁইট খুলিবার আগেই কেবল অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে। ইহাদের নাম-ঠিকানা সরকারের জানা আছে, কারণ ইহারাই আইনতঃ কাপড় বিক্রয়ের পারমিটধারী। এই লোকগুলিকে অবিলম্বে নূতন আইনের কবলে ফেলিবার সক্রিয় ব্যবস্থা করিলে ও আদালতে লইয়া গেলে বড়বাজারের চোরাকারবারী মহলে হাহাকার উঠিতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগিবে না। ইহাদিগকে জেলে আটক করিয়া আইনের রুদ্রমূর্ত্তি দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে চোরাকারবারের একেবারে গোড়ায় ঘা পড়িবে। চালের ফাটকাবাজী ও মুনাফাখোরির জন্য যাহারা বাংলাদেশের ৬০ লক্ষ লোককে অনাহারে মারিয়া ফেলিয়া লাশ পিছু ২৫০৲ টাকা করিয়া লাভ করিয়াছে, সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের চোরাকারবার ও ভেজাল চালাইয়া আজ যাহারা বাঙালী জাতিকে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে, পুরনারীদের বিবস্ত্র রাখিতেছে সেই সব নরপিশাচের প্রতি একটু কঠোর ব্যবহার হইলে সমাজ তাহাতে আনন্দিতই হইবে এবং

সমাজ হইতে দুর্নীতি ও চোরাকারবারের মহাপাপ দূর করিতে হইলে এই প্রকার কঠোরতা অপরিহার্য্য। স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনে এক জনকে ধরিতে গিয়া এক শত জনকে আটক করা যদি সঙ্গত হইয়া থাকে তবে এখন দশটা চোর ধরিতে গিয়া এক জন সাধুর কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনার আশঙ্কা থাকিলেও তাহাতে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে।

পুলিস বিভাগে অতীতের অসাধুতা এবং বর্ত্তমানে দলাদলি ও অযোগ্য নিয়োগের ফলে যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে উঁহাদের নিকট হইতে কাজ পাওয়া অতিশয় কঠিন হইবে। অসাধু পুলিসকে প্রমোশন দিয়া, গ্রামের ও শহরের পুলিস একাকার করিয়া এবং ভাল কর্ম্মচারীদের সমর্থন না করিয়া পুলিসের সততা ও দক্ষতা একেবারে রসাতলে দেওয়া হইয়াছে। চোরাকারবার অর্ডিনান্সটিকে কাজে লাগাইতে হইলে বাছা বাছা উপযুক্ত ও সৎ লোক লইয়া এনফোর্সমেণ্ট বিভাগটিকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। এরূপ উপযুক্ত লোকসংখ্যা অল্প হইলেও পুলিসে এখনও আছে, ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। তাহা ছাড়া বাহির হইতে উচ্চশিক্ষিত ও সদ্বংশীয় যুবকদের এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করা ও চাকুরি দেওয়া দরকার। আবগারী বিভাগে একটা নিয়ম আছে যে, চোরাই কারবারের সংবাদ যে দেয় সে পুরস্কার পায়। এখানেও এই নিয়ম করা যাইতে পারে যে চোরাকারবারীর মাল ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আমরা বারংবার যে কথা বলিয়া আসিয়াছি এই প্রসঙ্গে আবারও তাহা বলিতে চাই। কাজ করে মানুষে, চেয়ার টেবিল নহে; উপযুক্ত লোকের উপর কাজের ভার না পড়িলে সহস্র অর্ডিনান্স ও আইনেও কোন কাজ হইবে না। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অফিসার সকলপ্রকার দুর্নীতি, আশ্রিতবাৎসল্য, পক্ষপাতিত্ব ও দুর্ব্বলতার অতীত না হইলে বিভাগীয় শৃঙ্খলা ও কর্ম্মদক্ষতা কিছুতেই বজায় থাকিতে পারে না। বাংলা-সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগ, বিশেষতঃ পুলিস বিভাগ, ইহার জলন্ত নিদর্শন। গবর্ণর কেসির অনুরোধে শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় এই সমস্যার আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ করিয়া একটি অতি মূল্যবান রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন, লালদীঘির দপ্তরখানায় আজও উহা বস্তাবন্দী হইয়া রহিয়াছে। ঐ রিপোর্টটি পাঠ করিলে গবর্মেণ্ট দুর্নীতি নিবারণের প্রকৃত পথের সন্ধান পাইবেন।

শেষ কোথায় ?

"গণরাজ" নামক পত্রিকাখানি মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির মুখপাত্র। জনাব রেজাউল করিম তাহার সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি। সুতরাং এই পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য ও সংবাদ সততা ও ধীরতার দিক হইতে অনুকরণীয়। সেই পত্রিকার ১লা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি সংবাদের উপর মন্তব্যের শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে—"শেষ কোথায়" ? আমরাও সেই প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাই "মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় যে পাকিস্থানী হানাদারের জুলুম নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে"—তার শেষ কোথায় ? আমাদের সহযোগী কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এবং তাহার বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে "এই সব ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। 'পূর্ব্ব পাকিস্থান' কর্তৃক অফিসারের পশ্চাতে সুপরিকল্পিত একটি নীতি কার্য্য করিতেছে।" এই নীতি কি তাহা এই প্রবন্ধে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু তাহা বুঝিবার জন্য খুব বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

এ দিকে পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেণ্ট এই সব বিষয়ে অনেকটা অমায়েদ্যা করিয়া চলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এই ধৈর্য্য সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গের লোকের মন কিরূপ বিষিয়া উঠিতেছে, তৎসম্বন্ধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভা সজাগ নয়। "গণ-রাজ" মুর্শিদাবাদের "জনৈক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার" একখানি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাংলাদেশের দুই অংশের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া এই পত্রখানি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই মনে হয়। কেন এরূপ অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, "গণরাজে" বর্ণিত একটি ঘটনায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

> "আত্তর্মিনিয়ন চুক্তি তখনও হয় নাই। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রতিদিন—(২৪ ঘণ্টা) গরু ছাগল, চাউল আটা, তেল ঘি, চিনি লবণ, কাপড় কম্বল প্রভৃতি গুপ্তপথে পাচার হইয়া যায়। সাধারণে দেখে সবই, বলিতে ভয় পায়। অ-সাধারণে দেখিলে চোরাকারবারীর কাছে বিনিময়ে অর্থগুপ্তি লইয়া মাল ছাড়িয়া দেয়। এহেন কাঁচা দু'পয়সা রোজগারের একটি লোভনীয় সুযোগ ভাগ্য ক্রমে খাদ্য ক্রয় বা প্রোকিওরমেণ্ট বিভাগের এক ইনস্‌পেক্টরের জুটিয়া যায়। অভাগা কিছু খাইয়া—পাকিস্থান-গামী মাল ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু তাহার এই খাওয়ার কথা কোনও প্রকারে বড়কর্ত্তা জানিয়া ফেলেন। বড়কর্ত্তা ইন্সপেক্টরকে তলব করিয়া খাওয়ার বিবরণ জানিতে চান। ইন্সপেক্টর অকপটে সব স্বীকার করেন: "হাঁ স্যর, আমি খেয়েছি। তবে আমি কিছু না খেলেও তারা মাল পার ক'রে দিতই। কোন রকমেই আমি তাদের বাধা দিতে পারতাম না। কাজেই, মাল যখন চলে যাবেই, তখন আমার পাওনাটা বাদ যায় কেন ?

আর একটি অভিজ্ঞতা আরও চমৎকার। তাহাতে মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের শতকরা পঞ্চাশ জন চোরাকারবারীর খোঁজ পাওয়া যায়।

> "আমাদের জনৈক মাড়োয়ারী বন্ধু প্রোকিওরমেণ্ট করিতেন এবং সরকারী চাউলের বস্তা শিল্প মাত্র এক সের

গুজম ধরিয়া লইতেন। প্রোকিওরমেন্টে যাঁহারা মুসলমান রাজত্বে কার্য্য করিতেন তাঁহাদের অনেকে এখনও আছেন—তাঁহারা সৎ, অনাহারী (অর্থাৎ যাঁহারা খাইতে জানেন না) এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া, আমাদের বন্ধু পঁচিশ হাজারের পর পঞ্চাশ হাজারে ধরা পড়েন এবং তাঁহার এজেন্সী চলিয়া যায়। অবশ্য নাম বদলাইবার ফলে এজেন্সী তাঁহার হাত ছাড়া হয় নাই। ব্যবসায়ের খাতিরে বিবিধ দুর্নীতির আটঘাট জানা থাকায় তিনি বলেন যে গবর্ণমেন্টের কাজ একবার পাইলে সহজে যাইত না; তদ্বির থাকিলেই চলিত। সে দিন কথাচ্ছলে তিনি বলিয়া ফেলেন যে ১৫ই আগষ্টের পর হইতে তাঁহারা অর্থাৎ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা সর্ব্ববিধ অপকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি সরকারে কি সাধারণে তাঁহাদের দুর্নাম থাকিয়াই যাইতেছে। বন্ধুর ক্ষোভের কারণ বুঝিতে চেষ্টা করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলাম: "এ যে বসন্তের দাগ জন্মে না মিলায়।"

চাউল সংগ্রহে সরকারী ব্যবস্থা

চাউল সংগ্রহে ঘোষ মন্ত্রীসভার সরবরাহ সচিব আশ্রিত পোষণের সুবিধাজনক যে অদ্ভুত পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বুঝা যায় যে উহাতে আর যে কাজ হউক না কেন, চাউল সংগ্রহ হইবে না। ইহার ফলে কলিকাতার রেশন ব্যবস্থাও প্রায় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমায় চাউল সংগ্রহের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মহকুমায় ধান চাউল সংগ্রহকার্য্যে তিনি মূলত: তাঁহার দলভুক্ত কংগ্রেস কর্ম্মীদেরই পারমিট দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মহিলারাও এই অনুগৃহীতের তালিকা হইতে বাদ পড়েন নাই। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ যে এই অনুগৃহীত কংগ্রেস কর্ম্মীদের অনেকেই ছিলেন স্ব স্ব অঞ্চলের স্বনামখ্যাত চোরাকারবারী। অবশিষ্ট অনেকের এত বড় কাজে হাত দিবার উপযুক্ত আর্থিক সংস্থান না থাকায় দরুন নিজেদের নামের পারমিট প্রায়শ:ই দাগী ব্যবসাদারদিগের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া ঘরে বসিয়াই মোটা লাভ করিতেন।

ডা: বিধান রায়ের মন্ত্রীসভার আমলে এই ব্যবস্থা লোপ হইয়াছে কিন্তু তার পরিবর্তে অন্য যে ব্যবস্থা চালু হইয়াছে তাহাও সুবিধাজনক নহে। ভাণ্ডারী মহাশয়ের অনুসৃত পদ্ধতির কতকটা বর্ত্তমান সরবরাহ সচিব মহাশয় পরিবর্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার আমূল সংশোধন তিনিও করেন নাই, অথবা করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ চব্বিশ পরগণা জেলার কথা ধরা যাইতে পারে। ঢাকা হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে তাহাকে কর্ডন লাইন ধরিয়া গোটা ডায়মণ্ডহারবার মহকুমাটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। রাস্তার দক্ষিণ দিকের চাউল উত্তর দিকে যাওয়া বারণ। ফলে রাস্তার দক্ষিণ দিকের চাউলের দর ১৪৲ টাকা, কিন্তু রাস্তার ঠিক অপর পার্শ্বেই সেই চাউল বিক্রয় হইতেছে ২২৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকা দরে। এই অবস্থায় স্বভাবত:ই এপার হইতে ওপারে বে-আইনী ভাবে চাউল চালান দিবার চেষ্টা বেশ ভাল ভাবেই দেখা দিবে। এই চোরাকারবারে বড় বড় রুই কাতলা হইতে চুনাপুঁটি অনেকেই আছে। রুই কাতলার স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের হাত তৈলসিক্ত করিয়া তাহাদের কারবার ঠিক চালাইয়া যাইতেছে। সরকারী রোষের সমস্তটা আসিয়া পড়িতেছে মাথামুটে, গরীব চাষী আর ভূমিহীন দিনমজুরদের উপর।

সুন্দরবনের চাষী

কলিকাতার চল্লিশ মাইলের মধ্যে চব্বিশ-পরগণার সুন্দর-বন এলাকা। রাজধানীর এত নিকটে বাস করিয়াও এখান-কার প্রজারা যে দুর্দ্দশার মধ্যে বাস করে তাহা অবর্ণনীয়। রাস্তাঘাট নাই, পানীয় জল নাই, স্কুল, ডাক্তারখানা নাই, পোষ্ট আপিস নাই—তার উপর আছে কয়েক বৎসর পর পর নোনা জলের বন্যা। সাধারণ বন্যা এবং নোনা জলের বন্যার মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। সাধারণ বন্যার জল সরিয়া গেলে লোকে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, ঘরবাড়ী পরিষ্কার করিয়া আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম্মে মন দিতে পারে। নোনা জলের বন্যায় তাহা হয় না। এই বন্যায় ধানক্ষেতে লবণ পড়িয়া তিন বৎসরের জন্য জমি নষ্ট হইয়া যায়, চাষ হয় না। পুকুরে নোনা জল ঢুকিয়া পানীয় জল নষ্ট হইয়া যায়, মাছগুলিও মরিয়া যায়। গরুবাছুরের পায়ে ও মুখে এক প্রকার ক্ষত দেখা দেয়, ফলে অল্প দিনের মধ্যে গৃহপালিত পশু নষ্ট হইয়া যায়। ঘরবাড়ীতে নোনা ধরিয়া ঐগুলিও মেরামতের অতীত হইয়া পড়ে। সুন্দরবন এবং কাঁথি অঞ্চলে এই সব কারণে নোনা জলের বন্যাকে স্থানীয় লোকেরা ভয়ানক ভয় করে।

নোনা জলের বন্যায় চাষী এবং স্থানীয় গরীব লোকেদের সমূহ ক্ষতি হইলেও এক শ্রেণীর লোকের লাভ আছে। ইহারা স্থানীয় জমিদার ও জোতদার। সুন্দরবন অঞ্চলের প্রজাস্বত্ব আইন এমন যে জমিতে লবণ ধরিয়া তিন বৎসর চাষ না হইলেও খাজনা মকুব হয় না। ঐ খাজনাও প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হয়। যে প্রজা উহা না দিতে পারে তামাদির নালিশ করিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করা হয় এবং

প্রাণের দায়ে সে আবার ঐ জমিই নূতন সেলামী দিয়া নূতন করিয়া ইজারা লইতে বাধ্য হয়। এই কারণে চার-পাঁচ বৎসর পর পর এই এলাকায় বন্যা হওয়া এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে লাভজনক এবং আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক এই ভাবেই বন্যাও হইয়া থাকে।

প্রজাদের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মাথাব্যথা ছিল না কিন্তু কোন কোন ইংরেজ বিবেক বজায় রাখিয়া চাকুরি করিতেন বলিয়া প্রজারা মাঝে মাঝে হিতকারী বন্ধু পাইয়া একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত। সুন্দরবনের সারেঙ্গাবাদ অঞ্চলের দুর্দ্দশা দেখিয়া কালেক্টর ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন যে এখানে বাঁধ না দিলে নোনা জলের প্লাবন কিছুতেই বন্ধ করা যাইবে না। পি-ডাব্লিউ-ডি ইহাতে আপত্তি করে কারণ বাঁধ মেরামত ও উহা ঠিক মত বজায় রাখিবার দায়িত্ব তাহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। গবর্মেণ্টের কোন বিভাগের সহিত কোন বিভাগেরই সহযোগিতা নাই, বরং প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের সম্বন্ধে একটা armed neutrality-র ভাব লইয়া কাজ করে। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের যুক্তির সম্মুখে পি-ডব্লিউ-ডির অন্যায় আপত্তি টিঁকিল না, সারেঙ্গাবাদের বাঁধ দেওয়া হইল। প্রজারা রক্ষা পাইল। বাঁধ রক্ষার ভারপ্রাপ্ত এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বিবেকবান লোক বলিয়া প্রত্যেক বৎসর উহাতে মাটি পড়ে, কাজেই বাঁধটি বজায় থাকে। সম্প্রতি এই ভদ্রলোক বদলী হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে যিনি আসিয়াছেন তিনি দিনগত পাপক্ষয় করিয়া চাকুরি বজায় রাখাই বোধ হয় জীবনের ব্রত মনে করেন। বর্ষার আগে বাঁধে কাঁকড়া প্রভৃতি ঢুকিয়া গর্ত্ত করে এবং ঐ সব গর্ত্ত মাটি দিয়া বুজাইয়া না ফেলিলে উহাতে জল ঢুকিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এটা সব কর্ম্মচারী জানেন, স্থানীয় লোকেরা তো জানেই। এবার সারেঙ্গাবাদের বাঁধে মাটি দিয়া গর্ত্ত বুজাইতে ইঞ্জিনিয়ার অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় না। এই গাফিলতির জন্য শেষ পর্য্যন্ত বাঁধটি ভাঙে। নোনা জলের বন্যায় প্রায় ৬০ হাজার বিঘা জমির সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। ২২শে মে এই ঘটনা ঘটে। প্রায় পক্ষকাল পর "সাহায্য দেওয়া হইতেছে" এই ধরণের কতকগুলি ভাসাভাসা উক্তিতে পূর্ণ একটি প্রেসনোট প্রকাশিত হয় কিন্তু দুর্গতদের সাহায্য করা বা যাহাদের দোষে শত শত লোকের এইরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিল এবং ৬০ হাজার বিঘা জমি বর্ত্তমান ফসলের টানাটানির দিনে তিন বৎসরের জন্য নষ্ট হইয়া গেল তাহার তদন্তেরও কোন ব্যবস্থা হইল না। বাঁধ ভাঙিয়া গেলে লোকের সাহায্যের জন্য কালেক্টরকে অপরিমিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কালেক্টর এখন বাঙালী কিন্তু তিনি তাহা প্রয়োগও করিলেন না, ঘটনাস্থলে গিয়া দুর্গতদের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের দুর্দ্দশা মোচনের কোন চেষ্টামাত্র করিলেন না। সেচমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার, রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এবং সাহায্যমন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জ মাইতি ঘটনাস্থলে গিয়াছেন কিন্তু শ্রীবিমল সিংহ কিছু জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছাড়া আর কেহই কিছুই করেন নাই। এ সম্বন্ধে সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির ব্রহ্মচারী ভোলানাথ যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার কতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ব্যাপারটা লইয়া এখনও কি ভাবে গড়িমসি চলিতেছে উহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির যুগ্মসম্পাদক ব্রহ্মচারী ভোলানাথ জানাইতেছেন—"ক্যানিং ও ভাঙ্গড় অঞ্চলে প্লাবন ও সরকারী সাহায্য ব্যবস্থার সংবাদ বাহির হইয়াছে। সরকারী সাহায্যের সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সরকার পুরাতন আমলাতন্ত্রী মনোভাবের এতটুকু উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। গত ২২শে মে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হইয়াছে, সেচমন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা ২৬শে মে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ২রা ও ৩রা জুন বৈঠক বসিয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি সাহায্যের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই, সরকারী সংবাদে যে সমস্ত বন্দোবস্তের কথা (পানীয় জলদান, নলকূল মেরামত, কুটিরে সাহায্য ইত্যাদি) উল্লিখিত হইয়াছে তাহার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই; শুধু একখানি জলসরবরাহের নৌকা ৭ই জুন হইতে ঐ এলাকায় যাইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, সরকার কোন্ সূত্রে খবর পাইয়া লিখিতেছেন যে 'সাহায্যের ব্যবস্থা হইতেছে' এবং 'সাহায্য দেওয়া হইয়াছে'? আজ এক পক্ষকাল ধরিয়া সরকার যে ভাবে শম্বুক গতিতে অগ্রসর হইতেছেন তাহা স্বাধীন দেশের জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা নয় কি?

"গত ৭ই জুন ক্যানিং-এ মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের উপস্থিতিতে এবং দৈনিক ভারত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণের সভাপতিত্বে একটি "সুন্দরবন সম্মেলন ও প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী" অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সরকারী প্রেসনোটের দিকে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আলোচনা করা হয়। মন্ত্রী মহাশয় ঐ খানেই ১৪খানি পানীয় জলসরবরাহকারী নৌকার ব্যবস্থার জন্য আলিপুরের সদর মহকুমা হাকিমকে নির্দ্দেশ দেন। জানি না এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে আবার কোন্ আমলাতন্ত্রী হিসাব নিকাশের বেড়াজাল সৃষ্টি হইবে। তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের জানান দরকার যে, এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে নৌকা পিছু সরকারকে অন্ততঃ মাসে ১৪০ টাকা (এক জন মাঝি ৫০ ও ২ জন দাঁড়ি ৩০ টাকা হিসাবে ৬০ টাকা এবং নৌকা ভাড়া ৩০ টাকা) খরচ করিতে হইবে।

"আমরা জানি যে, '২৭ নং ট্রেজারী রুল' অনুসারে

প্রত্যেক জেলা কর্ত্তৃপক্ষকে সরকার অসীম ক্ষমতা দান করিয়াছেন এবং এইরূপ ঘটনায় যখন জনসাধারণের ধন ও প্রাণ বিপন্ন হয় তখন তিনি ঐ ক্ষমতাবলে প্রয়োজনমত যত খুশী ইচ্ছা টাকা ট্রেজারী হইতে তুলিতে পারেন। আজ পনেরো-ষোল দিনের মধ্যেও ২৪-পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কি ঐরূপ একটি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করিলেন না? অতিশয়োক্তিপূর্ণ বিভিন্ন বিবৃতি দাখিল করা অপেক্ষা ঐরূপ দ্রুত কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন সাধারণের বেশী উপকারে আসিত।

"আমরা আরও জানাইতে চাই যে, সারেঙ্গাবাদের যে বাঁধ লইয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইতেছে এবং জনসাধারণের আগ্রহ এবং আবেদন সত্ত্বেও প্রেসনোটে সরকার ঘোষণা করিলেন যে, ঐখানে বাঁধ হওয়া সম্ভব নয়, সেই বাঁধ সম্বন্ধে রাজস্বমন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ক্যানিঙে বলিয়া আসিয়াছেন যে, তিনি রাজস্ব বিভাগ হইতে টাকা দিয়া ঐ স্থানে বাঁধ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন এবং এ সম্পর্কে সম্মেলনে উপস্থিত আলিপুরের সদর মহকুমা হাকিমের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং অনতিবিলম্বে যাহাতে লোকজন সংগৃহীত হইয়া বাঁধ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় সেইভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রেসনোটে সরকার কেন ঘোষণা করিতেছেন যে, ঐ স্থানে বাঁধ নির্ম্মাণ অসম্ভব, তাহা আমাদের ধারণার বাহিরে।"

এই বিবৃতি হইতে সন্দেহ হয় পি-ডব্লিউ-ডি এখনও নিজেদের জিদ বজায় রাখিয়া বাঁধ নির্ম্মাণে বাধা দিয়া কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে এবং মন্ত্রীরা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতা এবং শাসনকার্য্যে অজ্ঞতা ও অযোগ্যতার জন্য এই আপত্তি কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইংরেজ আমলেও এই শ্রেণীর ঘটনায় উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে কতখানি কঠোরতা অবলম্বন করিতেন একটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কাঁথিতে বিয়াল্লিশের বন্যার কয়েক বৎসর আগে আর একবার প্রবল বন্যা হয় এবং বহু সহস্র লোক উহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ইংরেজ, বিভাগীয় কমিশনারও ইংরেজ। ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট দেন বন্যা ভয়াবহ রকমের হইয়াছে আশু সাহায্য প্রয়োজন; কমিশনার রিপোর্ট দেন বিশেষ কিছুই হয় নাই। বাংলা-সরকার কমিশনারের রিপোর্ট গ্রাহ্য করিয়া বিষয়টি ধামাচাপা দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ভারত-সরকারের হোম সেক্রেটারীকে পত্রে বিষয়টি সবিস্তারে জ্ঞাপন করেন, ভারত-সরকার গবর্ণরকে তদন্তের জন্য অনুরোধ করেন। তদন্তে প্রকাশ পায় ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবরণই সত্য, বন্যা ভীষণ রকমের হইয়াছে। এই ভুল রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনারকে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার, এসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কাহারও একটা কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত তলব হইল না। মন্ত্রীরাও পরম নির্ব্বিকার।

প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্দ্দশা

মুর্শিদাবাদের প্রাথমিক শিক্ষক সতীশচন্দ্র প্রামাণিক অর্থাভাবে বিব্রত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন—এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেসনোট জারী করিয়া বলেন যে, মানসিক বৈকল্য, পারিবারিক অশান্তি এবং একটি খুনের মামলায় সাক্ষ্যদান এই আত্মহত্যার কারণ। প্রেসনোটে বলা হয়, "বকেয়া বেতন না পাওয়ার জন্য উক্ত প্রাথমিক শিক্ষক আত্মহত্যা করিয়াছেন—শিক্ষা বিভাগ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না।" মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীনির্ম্মাল্য বাগচী সতীশচন্দ্র প্রামাণিকের মৃত্যু সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতেই প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ১৫ টাকা অথবা তাহার খুব কাছাকাছি। এই সামান্য টাকাও যদি নিয়মিত না পাওয়া যায় তবে মানুষের এই বাজারে কি অবস্থা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। সতীশবাবু জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ এবং এপ্রিল এই চারি মাস—অর্থাৎ তাঁহার আত্মহত্যার দিন পর্য্যন্ত বেতন পান নাই। বাগচী মহাশয়ের বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে তাঁহার জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন ২৬শে মে তারিখে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর ১২ দিন পরে এবং মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসের বেতন ২৯শে মে তারিখে অর্থাৎ স্কুল ইন্‌সপেক্টরের উপস্থিতিতে সরকার কর্ত্তৃক মৃত্যুর তদন্তের পরদিন মনি অর্ডারযোগে সতীশবাবুর নামে প্রেরিত হয়। আসল ব্যাপার এই যে, আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ার পর স্কুল-বোর্ড এবং স্কুল-ইন্‌সপেক্টর তাড়াতাড়ি মণি অর্ডারে টাকা পাঠান এবং নিজেদের গাফিলতি চাপা দিবার জন্য মৃত ব্যক্তির নামে টাকা পাঠানো হয়। চারি মাসের টাকা না পাওয়ায় চরম দুর্দ্দশায় পড়িয়া ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়া থাকিলে যাঁহাদের দোষে টাকা যায় নাই তাঁহারা তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সরকারী ইস্তাহারে পরিষ্কার বলা হইয়াছে তাঁহার মানসিক বৈকল্য ঘটিয়াছিল এবং এই কথা বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাগচী মহাশয় দেখাইতেছেন যে, সতীশচন্দ্র ৩রা মে পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে রীতিমত কাজ করিয়াছেন; কোন রূপ মানসিক বৈকল্য বা বিমর্ষতা যদি দেখা দিয়া থাকে তবে তাহা ৪ঠা হইতে ১২ই তারিখের মধ্যে ঘটিয়াছে। ইহা নিশ্চিত যে সতীশচন্দ্র প্রামাণিক একাদিক্রমে চার মাসের বেতন পান নাই এবং তার জন্য তাঁহাকে অনশনে পারিবারিক অশান্তি এবং বিমর্ষতার মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে। এই

অবস্থায় অকস্মাৎ জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া কেহ যদি আত্মহত্যা করিয়া বসে তবে তাহাকে মানসিক বৈকল্যের ফল বলিয়া এড়াইবার চেষ্টা চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অন্যান্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থাও যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে নিম্নলিখিত দুইটি বিবৃতি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। গবর্ন্মেণ্ট এখনও এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকারে অগ্রণী হইবেন কিনা আমরা জানি না। শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল লিখিতেছেন:

"মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের শাসন পরিচালনা যে কি পরিমাণ ত্রুটিপূর্ণ আমি তৎপ্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক শিক্ষক এই দুর্দ্দিনের বাজারে কিরূপ অবস্থায় কাল কাটাইতেছে, তাহা বিচার করিলেই উহা প্রমাণিত হইবে। বরহাটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত মহাশয়ের ৫ মাসের বেতন, সেকেণ্ড পণ্ডিতের ১০ মাসের বেতন ও থার্ড পণ্ডিতের ১৩ মাসের বেতন বাকি পড়িয়াছে। ইহাদের নাম যথাক্রমে শ্রীনীলকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীললিতমোহন চাটুজ্যে ও শ্রীগুরুপদ গোঁসাই।"

বালীর শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন:

"বাংলাদেশের প্রত্যেক পল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জেলা স্কুলবোর্ডের আদেশে ছাত্রদের নিকট হইতে কোন বেতন গ্রহণ না করিতে বলা হইয়াছে এবং শিক্ষকগণের বেতন দিবার দায়িত্ব স্কুলবোর্ড গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার ফলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই অবৈতনিক কিন্তু শিক্ষকগণের মাসিক বেতন যে কত তাহা এ পর্য্যন্ত জানা গেল না। পূর্ব্বে তিন মাস বা ছয় মাস অন্তর তিন মাসের বেতন একত্রে মণিঅর্ডারে আসিত; মণিঅর্ডারে টাকার অঙ্ক দেখিয়া শিক্ষকেরা স্থির করিতেন নিজ নিজ পারিশ্রমিকের পরিমাণ। এই মাসে অর্থাৎ জুন মাসে দেখা গেল শিক্ষকগণের মার্চ মাসের বেতন বাবদ কাহারো ভাগ্যে ১৪৲, কাহারো ১২৲, ১০৲ এমন কি ৮৲ পর্য্যন্ত। আট টাকা বেতন গ্রহণ করিয়া যদি কোন হতভাগ্য শিক্ষকের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং সেইজন্য যদি আত্মহত্যা করে তবে সে দোষ আর যাহার হউক নিশ্চয়ই সরকারী ত্রুটির ফলে নহে। ইহা কি অদৃষ্টের পরিহাস না ধৈর্য্যের পরীক্ষা?"

পশ্চিম বাংলার সামরিক সংগঠন

কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতার বাংলা দৈনিক পত্রিকায় একটা সংবাদ প্রকাশিত হয় যে এখনও ভারতরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীতে বাঙালী সৈনিকেরা স্থান পাইতেছে না; ইংরেজের আমলের ব্যবস্থা এখনও অটুট আছে; বাঙালীকে "অসামরিক জাতি" এই বদনাম দিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে। এ কথা কল্পনা করা যায় যে বর্ত্তমানে যাঁহারা সৈন্যবাহিনীর উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন, সেই বিভাগের সৈন্যাধ্যক্ষদের বাঙালীকে "সামরিক জাতি" করিয়া তুলিবার জন্য তাগিদ বা অবসর নাই; কাশ্মীর রণাঙ্গনে ব্যস্ত আছেন তাঁহারা; হাতের কাছে যে আয়োজন পাইয়াছেন, তাহা দিয়াই কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া যাইতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে, কাশ্মীর রণাঙ্গনে বাঙালী সৈন্যাধ্যক্ষ আছেন কয়েক জন, কিন্তু বাঙালী সৈনিক একজনও নাই। গণপরিষদের সদস্য শ্রী কে. শান্তনম কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই কথা বলেন—কাশ্মীরে বাঙালী সৈন্যাধ্যক্ষ দেখিলাম, বাঙালী সৈন্য দেখিলাম না; তাহার কারণ ইংরেজ আমলে কোন বাঙালী সৈন্যবাহিনী গঠিত হয় নাই। তিনি এই বিষয়ে তৎপর হইবার জন্য গবর্ন্মেণ্টের নিকট আবেদন করেন।

কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের এই বিষয়ে কোন বিশেষ দায়িত্ববোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। সর্দ্দার বলদেব সিংহ যে কাঠামো পাইয়াছেন, তাহার সাহায্যে কাজ চালাইয়া যাইতেছেন; যে সব অঞ্চলে সৈন্যবাহিনীর জন্য লোক সংগ্রহ করা হইত সেইখানেই "রংরুট মেলা" বসাইয়া সেনাদলে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে; যুক্ত প্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, মহারাষ্ট্রে, মাদ্রাজে, আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই বিষয়ে চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া শুনিয়াছি। পশ্চিম বাংলায় কেন হয় নাই, এই বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব জানিতে পারিলে সুবিধা হয়।

তৎপূর্ব্বে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীকে উদ্যোগী হইতে হইবে। তাহাদের প্রচার বিভাগের মারফতে জানিতে পারিয়াছি যে "জাতীয় ক্যাডেট কোর" সংগঠনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এই "ক্যাডেট কোর" সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রেণী গড়িয়া তুলিবার আয়োজনের প্রারম্ভ মাত্র। কিন্তু আমরা যে বাঙালী পণ্টনের কথা বলিতেছি, তাহার ব্যবস্থা ইহার মধ্যে নাই। পশ্চিম বাংলার জাতীয় রক্ষিবাহিনী দল গড়িবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; ইতিমধ্যে কয়েক শত পূর্ব্ব সীমান্তবাসী গ্রামিক লোককে সামরিক অ, আ, ক, খ, গ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে; এই শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের মধ্য হইতে বাঙালী পণ্টনের লোক সংগ্রহ করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না; ইহারা বড়ই "ঘরমুখো", ছাপোষা লোক এরূপ একটা কথা আছে। "টেরিটোরিয়াল ফোর্স" নামে পরিচিত যে সৈন্যবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে তাহার মধ্যে হইতে বাঙালী পণ্টনের জন্য লোক সংগ্রহ করা একমাত্র উপায় বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে, কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের বর্ত্তমান "রংরুট" নীতির কল্যাণে বাঙালীর সামরিক শিক্ষা ব্যাহত হইতে পারে।

এই নীতি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে রংরুট নিবদ্ধ রাখার প্রথা মানিয়া লইয়াছে; পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলে যে সব পার্ব্বত্য জাতি আছে কেবল তাহাদের মধ্য হইতে ১০,০০০ হাজার টেরিটোরিয়াল ফোর্স সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

আর একটা বাধার কথা আমাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন—কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের সামরিক কর্তৃপক্ষের মনে নাকি একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে বাঙালী সামরিক জীবনের সংযম ও নিয়মকানুন মানিয়া লইতে চাহে না; তাহারা এমন আত্ম-স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় যে সামরিক জীবনে বাক্যে ও কার্য্যে যে স্বাধীনতার অভাব অপরিহার্য্য এই বিধান তাহারা মানিতে প্রস্তুত নয়। বাঙালী যাঁহারা নৌ-বিভাগে ও বিমান-বিভাগে যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের মুখে এরূপ ধারণার ইঙ্গিত পাইয়াছি। বাঙালী সমাজের নেতৃবর্গের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া এবং শিক্ষা দীক্ষার ভিতর দিয়া এইরূপ মনোভাবের সংস্কার-সাধন করা উচিত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ভাল কি মন্দ তাহার আলোচনা সামরিক জীবনে অবান্তর। স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে সকল স্ত্রী পুরুষকেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিজ নিজ স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিতে হয়। অন্য কোন পথ কাহারও জানা নাই। গান্ধীজীর অহিংস সমাজ-ব্যবস্থায়ও ব্যষ্টির স্বাধীনতা সঙ্কোচের নিয়ম ছিল।

এই সব কথা ও যুক্তি আলোচনা করিয়া মনে হয় পশ্চিম বঙ্গ গবর্ন্মেণ্টের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের নিকট এরূপ অধিকার পাইবার দাবী করিতে হইবে। বাঙালী "অসামরিক জাতি" এই কলঙ্ক মোচনের জন্য আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা সফলতার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করি। আমরা এই বিষয়ে পশ্চিম বাংলার সকল শ্রেণীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। গবর্ন্মেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের কর্তব্য করিবেন তখনই, যখন জনমত তাঁহাদের উপর চাপ দিয়া কর্তব্যকর্ম্মে বাধ্য করিবে। গণতন্ত্রে আর কোন উপায় নাই।

আসাম সরকারের কার্য্যকলাপ

আসাম সরকারের কার্য্যকলাপে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে একটা জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে। অসমীয়াদের বাঙালী বিদ্বেষ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সঙ্কুচিত করিতেছে—ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের আসাম প্রদেশে বসবাস করিবার অধিকার নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি কোন প্রদেশের আছে কিনা, এই প্রশ্ন তুলিয়া চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার সময় আসিয়াছে। শীঘ্রই গণপরিষদের যে অধিবেশন আরম্ভ হইবে, সেই সময়ে বাঙালী সদস্যবর্গের অগ্রণী হইয়া এই বিষয়ে একটা সুষ্ঠু মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত। কেবল আসাম প্রদেশেই এই সমস্যা দেখা দেয় নাই; বিহারেও তাহার একটা নগ্ন মূর্ত্তি আমাদের জাতীয়বাদকে বিদ্রূপ করিয়া যাইতেছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে গৌহাটিতে যে অসমীয়া উদ্দামতা দেখা দেয়, তাহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বিগত ২৫ বৎসরের ইতিহাস ঘাঁটিতে হয়। সে চেষ্টা না করিয়া যদি এক বৎসরের ঘটনাবলীর বিচার করা যায়, তবে এই উৎকট মনোভাবের একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। আসামের প্রদেশপাল সর আকবর হায়দারী ত আসাম ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়া বসিলেন যে, বাঙালীরা আসামে "বিদেশী" (foreigners)। আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলৈ শ্রীহট্টের গণভোটের সময় তাঁহার প্রদেশে শ্রীহট্টের বাঙালী অধিবাসী সংখ্যা কমাইতে যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার বিষ পূর্ব্ব-ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বহুদিন পর্য্যন্ত বিষাক্ত করিয়া রাখিবে।

আসাম ও শ্রীহট্টের বাঙালী নায়কগণ অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলিতে পারেন; ভারতরাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাঁহারা মুখ বুজিয়া আছেন। এই সংযমের একটা অকল্যাণের দিকও আছে। গোপীনাথ বড়দলৈ, বিষ্ণুরাম মেধি, অম্বিকাগিরি রায়-চৌধুরী যে চিন্তাধারার বাহক তাহার ফল যে যদুবংশের মুষলের মত ভারতরাষ্ট্রের সংহতির পক্ষে মারাত্মক হইবে, এই বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। আমরা মাসের পর মাস ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগোষ্ঠীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এই বিষয়ে আমাদের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করিতেছি। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়া প্রাদেশিকতার নিন্দা করিয়া কর্তব্য শেষ করি-তেছেন; সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দরাজ হাতে বাঙালীকে সম অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট এইরূপ অনাচারের কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না।

এই উপলক্ষে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যত দিন শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আসামের মন্ত্রিমণ্ডলীতে শ্রীহট্টের প্রতিনিধি ছিল, তত দিন অসমীয়া মন্ত্রীমহোদয়গণের একটা চক্ষুলজ্জার সংযম ছিল; গত জুলাই মাসের পর, শ্রীহট্টের গণভোটের পর, সে লজ্জার প্রয়োজন চলিয়া গিয়াছে। সর আকবর হায়দরীর বক্তৃতা তাহার প্রমাণ। আজ আমাদের অসমীয়া প্রতিবেশীবর্গ মনে করিতেছেন যে তাঁহারা দেশের (আসামের) দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছেন, এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা যখন তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে তখন সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানাইবার শক্তিও তাঁহাদের জন্মিয়াছে। কিন্তু এই কথা তাঁহাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না, গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের ক্ষমতার চক্রবৎ পরিবর্ত্তন হয়।

আরও একটা কথা তাঁহাদের মনে রাখিতে বলি। আসামে চৌদ্দ-পনর লক্ষ মুসলমান এখনও আছে; তাহাদের

মধ্যেই অধিক সংখ্যক বাঙালী ; প্রায় দশ লক্ষ বাঙালী হিন্দু আছে। এই পঁচিশ লক্ষ বাঙালীকে বেশী দিন দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে, প্রায় পঁচিশ লক্ষ অসমীয়া ভাষাভাষী লোকসমষ্টির পক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বীয় অধিকারে রাখা কঠিন হইবে। প্রায় কুড়ি লক্ষ পার্ব্বত্য জাতি, তাহাদের বিশিষ্ট ভাষা ও সংস্কার লইয়া অসমীয়াদের দিকে বরাবর ঢলিয়া থাকিবে, এই কথা রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আমরা জানি যে শ্রীযুত রোহিণী চৌধুরীর মত লোক মনে করেন তাঁহাদের সম্পর্ক পীত বর্ণ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর। এইরূপ ভাব মাথায় না খেলিলে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিতে পারিতেন না যে অসমীয়াদের কেন্দ্রীয় শাসনকার্য্যে অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হউক, হয় কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে আরও অধিক সাহায্য আসামের প্রয়োজনে নির্দ্দিষ্ট হউক, না হয় তাঁহাদের (অসমীয়াদের) বর্ম্মীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইবার সুযোগ দেওয়া হউক। এই কথা রোহিণী চৌধুরী মহাশয় অনেকটা ঠাট্টার ভাবে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাট্টাটা অনেক সময় মনোভাবের মুকুর হইতে দেখা যায়।

এই সব ভবিষ্যতের কথা। যে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি, তাহার ফলাফল সম্বন্ধে কেহই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। তবে একথা সত্য যে বাঙালীকে ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আসামে ও বিহারে যে তাণ্ডব চলিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে অগ্রণী হইয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি অ-অসমীয়া ও অ-বেহারী আসামের ও বিহারের সীমান্ত রেখায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার যদি এই দুই প্রদেশের সীমান্তরেখায় গিয়া বাধা পায়, তবে ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের কোন মূল্য নাই। এই সংকীর্ণ মনোভাবই প্রাদেশিকতার প্রকৃত পরিচয়। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ এই বিসদৃশ পরিচয়ের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেছেন না। আবোলতাবোল বক্তৃতা দিয়া তিনি কালক্ষয় করিতেছেন। যে ক্ষিপ্রতা দেশীয় রাজ্যসমূহের সমস্যা-সংকুল অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়াছে, তাহা কেন এই প্রাদেশিকতার সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ হইতেছে না, সে রহস্য কে আমাদের বুঝাইবে ?

সোহরওয়ার্দ্দি পর্ব্ব

হুশেন শহীদ সোহরওয়ার্দির রাজনীতিক জীবনে আর একবার পটভূমিকার পরিবর্তন হইল। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কত রকম ভোল ফিরাইলেন তিনি। পশ্চিম বাংলার স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীকিরণশঙ্কর রায় এই বিষয়ে অনেক কথাই জানেন। জনসাধারণ আমরা যাহা জানি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে চাই। রাজনীতিক জীবনে প্রথম আমরা দেখি জনাব হুশেন সোহরওয়ার্দ্দিকে দেশবন্ধুর সহকর্ম্মীরূপে, কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়ররূপে। দুই বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন ; হগ সাহেবের বাজারে এক জন মৃত ব্যক্তির কবরের ব্যাপারে আমরা তাঁহার "জেহাদী" মূর্ত্তির আভাস পাই। এই ব্যক্তিটি ধর্ম্মে কি ছিল কেহ সঠিক বলিতে পারে না ; কেহ বলে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান ; কেহ বলে তিনি ছিলেন মুসলমান ; তিনি ছিলেন "দেওয়ানা" এবং হগ সাহেবের বাজারের মুসলমান কসাইরা তাঁহাকে পীর বলিয়া সম্মান করিত। তাহাদের আবদারে ডেপুটি মেয়র এই ব্যক্তির কবর দিতে দিলেন প্রকাণ্ড বাজারের মধ্যে। একটা বিশ্রী আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, এবং জনাব সোহরওয়ার্দ্দি অলক্ষিতে কর্পোরেশন হইতে সরিয়া পড়িলেন। তারপর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই "মিনা পেশওয়ারির' রক্ষকরূপে, এই শ্রেণীর লোকের সাহায্যে কলিকাতার শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে একটি দল গড়িয়া তুলিতে তিনি তৎপর হইয়া উঠেন। বর্ত্তমান যুগে কলকারখানার সাহায্যে যে জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে "বস্তি" সকল তাহার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ ; এই বস্তির মধ্যে যে লোকসমষ্টি বাস করে তাহাদের বলা হয় ইংরেজী ভাষায় "denizens of the underworld"—পাতালপুরীর অধিবাসী। আলো ও বাতাস-বঞ্চিত এই লোকে যাহারা বাস করে, তাহারা সমাজের সাধারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অনেক সময়ে অ-মানুষে পরিণত হয়। জনাব সোহরওয়ার্দ্দি এদের লইয়া খেলিতে গিয়া এদের কোন ভাল করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই ; নিজে এদের দলপতি হইয়া শ্রমিক আন্দোলনে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করেন।

তার পর তাঁহাকে দেখিতে পাই "শের-এ বাংলা" আবদুল করিম ফজলুউল্‌হক সাহেবের সহচররূপে। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ তখন সরকারী চাকুরীর স্বাদ পাইয়াছে, "শের-এ-বাংলা" প্রধান মন্ত্রী হইয়া হাতে মাথা কাটিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন ভাবিয়া হিন্দুকে "সাতানা" করিবেন বলিয়া শাসাইতেছেন। হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার মুসলমান রাজনীতিকের ব্যবসায়ের মূলধন—একমাত্র মূলধন হইয়াছে। জনাব সোহরওয়ার্দ্দি এই খেলায় মাতিয়া গেলেন। "শের-এ-বাংলা" মুক্তহস্ত হইয়াও সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিবেন কেন ! গবর্ণর হারবার্ট সাহেবেরও না ; জনাব হুসেন সোহরওয়ার্দ্দির না। সুতরাং তাঁহাকে উজির-এ-আজমের তক্ত ছাড়িতে হইল। জনাব খাজা নাজিম উদ্দিন তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন ; সোহরওয়ার্দ্দি সাহেব হইলেন সরবরাহ মন্ত্রী, অর্থাৎ বাংলাদেশে ছয় সাত কোটি লোকের ভাত কাপড় সরবরাহ করিবার কর্ত্তা। এই পদাধিকারের কল্যাণে দুই তিন বৎসরের

মধ্যে কোটি কোটি টাকা মুসলমান সমাজের হাতে আসিয়া পড়িল। এত বড় কুবেরের ভাণ্ডার যাঁহার হাতে, তাঁহার ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতাকেও ছাড়াইয়া যায়। ফলে ১৯৪৬ সালে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে জনাব হুসেন সোহরওয়ার্দিকে প্রধান মন্ত্রীরূপে। তখন "পাকিস্থানী" উন্মাদনা দেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিতে আরম্ভ করিল; "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান" এই চীৎকারে মুসলমান সমাজের শুভবুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া গেল। এই লড়াই পরদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়; মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানী ছিলেন।

এই "লড়কে লেঙ্গের" গতিপ্রকৃতি প্রকট হইয়া উঠিল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে। অপ্রস্তুত হিন্দু এই অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; তার পর তাঁহার প্রাণ ও সম্মান রক্ষার আয়োজন করিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। ফলে, "লড়কে লেঙ্গের" দল পলাইবার পথ পাইল না। এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে শুভ-বুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে বলিয়া যাঁহারা ভরসা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল নোয়াখালি-ত্রিপুরার বীভৎসতা। কলিকাতা ও তাহার শিল্পাঞ্চল হইতে ব্যর্থ-মানস মুসলমান "জেহাদীরা" এই দুই জেলার হিন্দুর উপর কলিকাতার শোধ তুলিল। জনাব হুসেন সোহরওয়ার্দি বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী; নেতৃবৃন্দ আশা করিয়াছিলেন যে এই পদাধিকারের মারফতে তাঁহার হাতে রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া "কাফেরকে" এমন একটা শিক্ষা দেওয়া যাইবে যে দেশের বুকে মুসলমান প্রভুত্ব অটুট ও অটল হইয়া পড়িবে।

সেই সময় হইতে জনাব হুশেন সোহরওয়ার্দি মুসলীম-লীগের অ-বাঙালী নেতৃবৃন্দের নিকট খেলো হইয়া গেলেন। যত দিন তিনি বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তত দিন একটা লোকদেখানো সম্মানের ঠাঁট তাঁহার বজায় ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর সেই ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজনও রহিল না। কায়দে-আজম (মুমহান নেতা) জিন্না দেখাইয়া দিলেন যে ছিন্ন বস্ত্রের শেষ আধার আস্তাকুড়ে। আর এ-ও হইতে পারে যে সোহরওয়ার্দি বিতাড়ন একটা অভিনয় মাত্র। ভারত-রাষ্ট্রে প্রায় ৪ কোটি মুসলমান রহিয়া গিয়াছে; ইহাদের অধিকাংশের "পাকিস্থানী" মনোভাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এদের স্বার্থরক্ষার জন্য একজন "পাকিস্থানী" নেতা ভারতরাষ্ট্রে রাখিয়া যাওয়া প্রয়োজন যিনি গান্ধীজীর কথা মুখে আওড়াইবেন এবং সেইজন্য "পাকিস্থানীদের" বাহ্য শত্রুতা অর্জন করিবেন। "পাকিস্থানের" শত্রুতা তাঁহাকে ভারতরাষ্ট্রের মিত্রতার মুখোস পরাইয়া দিতে পারে। এই মুখোস ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের অনেককেই বিভ্রান্ত করিবে। এই বিভ্রান্তি "পাকিস্থান" ধুরন্ধরবর্গের আকাঙ্ক্ষিত। নিজের রাষ্ট্রে "শরিয়তের" বিধান; প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় বিধানের ব্যবস্থা। এই পরস্পর বিরুদ্ধভাবের খেলায় স্বভাবতই একটা কুয়াসার সৃষ্টি হইয়াছে। সোহরওয়ার্দি বিতাড়ন অভিনয় এই কুয়াসা গাঢ় করিতে পারে। হইতে পারে এই ভরসায় একটা দাবার চাল দেওয়া হইল সোহরওয়ার্দি-নাজিমুদ্দিনের পুরাতন বৈরতার অজুহাতে।

বাংলার মিউনিসিপালিটি

বাংলাদেশের মিউনিসিপালিটিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের একটি সম্মেলন সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৭১টি মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বলেন, কলিকাতার বাহিরের মিউনিসিপালিটিগুলির আর্থিক সচ্ছলতার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, কারণ ঐ সকল স্থানের নাগরিক জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে না পারিলে কলিকাতার বাসস্থান সমস্যা ও শহর পরিচ্ছন্ন রাখার সমস্যা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। বাংলার বিভিন্ন শহরের অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে চলিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণকে কলিকাতায় অযথা ভীড় না জমাইতে অনুরোধ করিবার পূর্ব্বে ঐ সকল স্থান বাসোপযোগী ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার জন্য পয়ঃপ্রণালী ও জল সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। লোকে যদি মফঃস্বল শহরে পরিবার লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে না পারে তবে তাহারা স্বভাবতঃই ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল কলিকাতার দিকে ছুটিবে। নিশ্চিত ঝড়ঝঞ্ঝা অপেক্ষা অনিশ্চিত অবস্থাকেও শ্রেয়ঃ বলিয়াই লোকে বড় বড় শহরে আসিয়া ভীড় করে। এই সমস্যা সমাধানকল্পে কলিকাতার বাহিরের শহরগুলির আর্থিক সচ্ছলতা এবং বসবাসের সুব্যবস্থা বিধানের উপায় অবিলম্বে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

উপশহর গঠনের প্রতি বেশী ঝোঁক দেওয়া হইতেছে। মিউনিসিপাল শহরগুলিকে গড়িয়া তুলিবার দিকে মনোযোগ দিলে বাংলার বাসস্থান সমস্যার সমাধান অনেক সহজ ও অল্প সময়ে হইতে পারে। ৭১টি মিউনিসিপাল শহর বড় কম nucleus নহে। ১২টি জেলায় ১২টি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠন করিয়া শহরগুলির উন্নতি বিধান করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। ইহাতে সরকারের এক পয়সা লোকসান নাই, অথচ দেশের ও দশের লাভ। শহরের চতুষ্পার্শ্বে জমি লইয়া ট্রাষ্ট সুপরিকল্পিত ভাবে শহর সম্প্রসারণ করিতে পারেন। ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া ট্রাষ্টের কাজের টাকা তোলা যায়। জমি বিক্রয়

আরম্ভ হইলে টাকা উঠিয়া যাইবে। শহরে জল, রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী এবং বিজলী বাতির ব্যবস্থা করিয়া দিলে বাকীটা লোকে আপনিই করিয়া লইবে। বাসস্থান-সমস্যার সমাধানের জন্য এই দিকে অবিলম্বে মনোনিবেশ করা আবশ্যক।

পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্র-তট

স্বাস্থ্যের অন্বেষণে বাঙালী বাংলাদেশের বাহিরে নানা স্থানে ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিয়াছে। উড়িষ্যায় পুরী, বারহামপুর, ওয়াল্টেয়ার ; বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের দুই ধারে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর পর্য্যন্ত এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের দুই ধারে প্রায় প্রয়াগ পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যান্বেষীবর্গের কোঠাবাড়ী বাঙালীর প্রাচুর্য্যের যুগের পরিচয় দিতেছে। অনেক দিন পূর্ব্বে একটা হিসাবে দেখিয়াছিলাম যে বাঙালীর এই সব সম্পত্তির মূল্য চার পাঁচ কোটি টাকার কম হইবে না। প্রাচুর্য্য হইতে এই ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া কোন বাঙালী বাংলাদেশের বাহিরে এই ব্যয় লইয়া মাথা ঘামান নাই। আজ কি হিসাব করিবার দিন আসে নাই? বাংলাদেশে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিশেষ হয় নাই ; স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বাংলাদেশের মধ্যেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলে বাংলার সমুদ্রতটের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মুখপাত্র 'নবসঙ্ঘ' এই বিষয় লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। মেদিনীপুর সমুদ্রতটে দীঘা অঞ্চলে এইরূপ স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মাণের সুবিধা ও সুযোগ আছে। সেখানে স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মাণ সম্বন্ধে মেদিনীপুরের উদ্যোগী লোকেরা অবহিত হইলে ভাল হয়। সমুদ্রে স্নানের কি ব্যবস্থা সেখানে হইতে পারে তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। আর আছে ২৪ পরগণা জেলার কেন্দ্রীয় ফ্রেজারগঞ্জ অঞ্চল। শেষোক্ত স্থান সম্বন্ধে আমাদের সহযোগী বলিতেছেন :

> বৈপ্লবিক প্রয়োজনসিদ্ধির কামনায় ফ্রেজারগঞ্জের সমুদ্রতটে যে জমিখণ্ড খরিদ করা হইয়াছিল তাহা এক্ষণে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অধিকারে। ফ্রেজার সাহেব বাংলায় ছোটলাট পদে যখন সমাসীন ছিলেন, তখন তাঁহারই নির্দ্দেশে জনৈক ইংরেজ ফ্রেজারগঞ্জে নগর নির্ম্মাণ পরিকল্পনা করেন। বহু অর্থ ব্যয় করার পর তিনি এক খুনের দায়ে এই কার্য্য হইতে ইস্তাফা দিয়া বিলাতে প্রস্থান করেন। তার পর ৺মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই বিশাল ফ্রেজারগঞ্জ তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। এই সময় হইতে বাংলার নানা শ্রমিক ও কৃষক এই স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ফ্রেজারগঞ্জের তটপ্রান্তে বঙ্গোপসাগরের ঊর্ম্মিমালা লীলারত।...সমুদ্রতটবর্ত্তী ফ্রেজারগঞ্জটি উত্তম স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইতে পারে। এত প্রশস্ত দীর্ঘ সমুদ্রতট বাংলায় তো নাই-ই—কোন প্রদেশেও আছে বলিয়া মনে হয় না।

"নব-সঙ্ঘ" এই আয়োজনে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। আমরা মনে করি ব্যবসায়বুদ্ধি-সম্পন্ন বাঙালী এই কাজে হাত দিতে পারেন। তবে সর্ব্বপ্রথমে জানা প্রয়োজন যে এখানে সমুদ্র-স্নান নিরাপদ কি না।

দেশভেদে কর্ম্মভেদ

"নির্ণয়" পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম যে বর্ত্তমান গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে হুগলী জেলার কয়েক শত ছাত্র গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য এক দলবদ্ধ অভিযান আরম্ভ করিবার আয়োজন চলিতেছে। সেই কাজ এখনও চলিতেছে নিশ্চয়ই। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের চাষিজীবনের কাদা-মাটির মধ্যে ডাক দিবার কল্পনা করা কঠিন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কলেজ বন্ধের অবকাশে কৃষিকার্য্যে সাহায্য করিয়া, গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিয়া, বাসন ধুইয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন বলিয়া শুনিয়াছি। আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা অন্তলোকে, কল্পলোকে, বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের নিকট বিলাতের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের মত কর্ম্মের আহ্বান আসে না। ছাত্র-আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় হয়ত এরূপ একটা পরিণতি আমরা দেখিতে পাইব।

> "ব্রিটেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ডাকা হয়েছে ক্ষেত খামারে কাজ করে তাদের ছুটি কাটাবার জন্য। আগামী গ্রীষ্মকালে তারা প্রায় পাঁচ লক্ষ ম্যান-আওয়ার ঘণ্টা (Man-hour) চাষের কাজ করে দেবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২৫টি ক্যাম্প স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জাতীয় ছাত্র-সংসদ বলে যে, ঐ সব ক্যাম্পে প্রায় ৫০০০ ছাত্রছাত্রী অবস্থান করবে। তারা ফল ও শস্য সংগ্রহ, শস্য ঝাড়া, বাছাই ইত্যাদি ধরণের কাজ করবে। ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও প্রায় এক হাজার ছাত্র তাহাদের এই কাজে সাহায্য করবে।"

নিজামশাহী নীতির উদ্দেশ্য

ভারতরাষ্ট্র ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্যে মীমাংসার যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। নিজাম বাহাদুর মীর ওস্মান আলী খাঁ এইজন্য কতটা দায়ী ও মজলিসই-ইত্তেহাদুল-মুসলিমিন প্রতিষ্ঠান তাহার জন্য কতটা দায়ী, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমানে কিছু নিশ্চিত করিয়া বলা সম্ভব নয়। গত দুই-তিন মাস হইতে আমরা "প্রবাসী"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই সমস্যার গতি প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই গতি-প্রকৃতির সঙ্গে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে কোন সামঞ্জস্য-বিধান সম্ভবপর নয় বলিয়া আমরা মনে করি, এবং বর্ত্তমানে দিল্লী

ও হায়দরাবাদের সলা-পরামর্শের মধ্যে যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সময়ে আবার নিজামশাহী নীতির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। এই গতি-প্রকৃতির সম্যক্ ধারণা না থাকিলে, এই সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা বুঝা সহজ হইবে না।

মুঘল শাসনের অধঃপতন সময়ে দাক্ষিণাত্যের একজন মুঘল "নবাব" (দেশপাল) নিজের জন্য একটা ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হন ; নামে তিনি মুঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে থাকেন। এই অস্বাধীন "নবাবকে" মারাঠা আক্রমণ হইতে রক্ষা করে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তারপর প্রায় এক শত ত্রিশ বৎসর আসফ্ শাহী বংশ ইংরেজের সার্ব্বভৌম অধিকার (Paramountcy) স্বীকার করিয়া আসিতেছে। সেই সময়েই, গত পঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে, উত্তর-ভারতের মুসলমান ভাগ্যান্বেষীগণ গিয়া হায়দরাবাদ রাজ্যে ভিড় করিতে থাকে ; সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামি হইতে সৈয়দ কাশিম রাজভী এই দলের প্রতিভূ। এই সব মুসলমান বুদ্ধি-জীবী শ্রেণী হায়দরাবাদ রাজ্যের চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারার নিয়ামক হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীই মুসলমান স্বাতন্ত্র্যের স্রষ্টা যার পরিণতি হইয়াছে "পাকিস্থানে"। এই শ্রেণীর পরামর্শেই "নবাব" বংশ এই ঘোষণা করিতে প্রবুদ্ধ হয় যে হায়দরাবাদ রাজ্য মুসলমান রাষ্ট্র। মাঝে মাঝে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দাবিটা শানাইয়া রাখা হইত। আবার ব্রিটিশ কূটনীতির প্রয়োজনে "নবাব"কে ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট করিতে হইত। সেইজন্য নিজাম বাহাদুর ইংরেজের বিধান অনুসারে His Exalted Highness ; অন্যান্য রাজা বা "নবাবরা" কেবলমাত্র Highness, নিজাম বাহাদুরের উপাধি সকলের অপেক্ষা "উচ্চ"। তুর্কির সুলতানের পদ যখন কামাল আতাতুর্ক বাতিল করিয়া দিলেন, তখন অনেক ইংরেজ শাসনকর্ত্তা ও সাংবাদিক প্রস্তাব করেন যে নিজাম বাহাদুরকে মুসলমান জগতের "খলিফা" করা হউক। এইরূপ নানাপ্রকার উৎসাহে ও প্ররোচনায় নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁয়ের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তিনি মুসলমান জগতের মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি। এই অহমিকা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে তুর্কির শেষ "খলিফা" সুলতান মহম্মদের কন্যার বিবাহ দেন, এবং মুসলমান জগতের নানা দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য মুক্ত হস্তে দান-খয়রাৎ করেন। এই প্রসঙ্গে এই কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে মীর ওসমান আলী খাঁ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম।

এই ক্ষুদ্র ইতিহাসটি মনে রাখিলে নিজাম বাহাদুরের কার্য্যকলাপ বুঝিতে কষ্ট হয় না। বংশের গৌরব সকলেই চায়। বর্ত্তমান যুগে, বিশেষতঃ এই গণতন্ত্রের যুগে হায়দরাবাদ মীর-বংশের স্বার্থ-রক্ষার প্রয়োজনে রাজ্যের এক কোটি সত্তর লক্ষ লোকের সুখ-দুঃখ, মান-অপমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। মীর-বংশের দুর্ভাগ্য যে হায়দরাবাদ রাজ্যের লোকসমষ্টির অধিকাংশ লোক হিন্দু ; তাহাদের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষের উপর। সেইজন্য মীর ওসমান আলী খাঁর প্ররোচনায় ও সাহায্যে একটি গোঁড়ার দল গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার নাম গত দশ বৎসরের মধ্যে কু-প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইত্তেহাদ-উল-মুস্‌লিমিন দল গুণ্ডামি করিয়া রাজ্যের শতকরা ৮৫ জন প্রজাকে দাবাইয়া রাখিতে চায় ; অত্যাচার করিয়া বা ভয় দেখাইয়া তাহাদের দেশ-ছাড়া করিতে চায়। গত নবেম্বর মাসে ভারতরাষ্ট্র ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহার ফলে আশা করা গিয়াছিল যে রাজ্যের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং গণতন্ত্রের বিধান-অনুসারে প্রজা-পুঞ্জের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইবে। আজ মীর ওসমান আলী খাঁ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ; তাঁহার ইচ্ছায়ই রাজ্যের আইন-কানুন নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এরূপ দাবী করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় যে রাজ্যের মধ্যে ইত্তেহাদ-উল-মুস্‌লিমিন প্রতিষ্ঠানের অত্যাচারের শেষ করিতে হইবে এবং প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছানুসারে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা চলিবে। এই ব্যবস্থা স্বীকার করিলে নিজামশাহী ক্ষমতার তিরোধান হইবে, এবং মুসলমান সংখ্যা-লঘিষ্ঠের পক্ষ হইতে যে প্রাধান্যের দাবী এত দিন কার্য্যকরী ছিল, তাহার অবসান ঘটিবে।

এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া মীর ওসমান আলী খাঁর পক্ষে বা ইত্তেহাদ-উল-মুস্‌লিমিন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজ নহে। সেইজন্য গত তিন মাসব্যাপী আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শান্তি নিজামশাহী বংশের অহমিকা ও রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের উগ্র স্বার্থবুদ্ধির নিকট বলি পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারবৃন্দ এই অবস্থায় কি করিবেন, তাহা আমরা জানি না। বোধ হয় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না। শক্তির খেলার পরিণতি সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের সাড়ে তিন কোটি মুসলমান জনসমষ্টির মতিগতির কথা ভাবিতে হইবে। "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের প্রধানগণের মনোভাব আমাদের অবিদিত নহে। ব্রিটিশ কূটনীতি এই ঘোলা জল আরও ক্লেদাক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ধুরন্ধরগণ যে খেলায় নামিয়াছেন, তাহার কথাও ভাবিতে হইবে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে নিজাম মীর আলী খাঁ হাতের পাশার শেষ দান ছাড়িয়া দিয়াছেন ; তাঁহার সমর্থক সৈয়দ কাসিম রাজভির দল উন্মাদনায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ভারত-

রাষ্ট্রের কর্তব্যপথ সুস্পষ্টরূপে সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া আছে। আমাদের কর্তব্যও সুপরিস্ফুট। রাষ্ট্রের বিপদে আমাদের মনোভাবের মধ্যে কোন দ্বিধার স্থান নাই।

ইন্দোনেশিয়া

পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মাদুরা, বোর্নিয়ো প্রভৃতি প্রায় দুই হাজার দ্বীপসমষ্টির বেশীর ভাগ ডাচ সাম্রাজ্যবাদের অধীন ছিল। ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে যখন জাপান তাহার বিজয় অভিযানে বহির্গত হয়, তখন হলাণ্ড দেশের পক্ষে এই দ্বীপপুঞ্জের রক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না ; কারণ তাহারা নিজেরাই জার্ম্মানীর কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল। ডাচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে মনোভাব পুঞ্জীভূত হইয়াছিল এই সময়ে এই দ্বীপপুঞ্জের দেশপ্রেমিকেরা তাহা জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন ; গোপন সংগঠন করিয়া জাপানী অধিকার দুর্ব্বল ও সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করেন। ১৯৪৫ সনের আগষ্ট মাসে যখন জাপান পরাজয় স্বীকার করিল, তখন ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবৃন্দ এক স্বাধীন সাধারণতন্ত্রের ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলেই এই স্বাধীন রাষ্ট্রের গতি কিন্তু বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়িল ; তাহারা তাহাদের তাঁবেদার ডাচ শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্ম ভগ্নপ্রবণ ডাচ সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। এই তিন বৎসরের ইতিহাস এই অসমান যুদ্ধের ইতিহাস। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া একটা গোঁজামিলের চেষ্টা হইয়াছে ; লোক দেখানো একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু প্রতি পদে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্র কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছে। এই সেদিন হইতে উতাকামণ্ডে যে এশিয়া মহাদেশের বৈষয়িক সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছে, সেই উপলক্ষেও তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার লইয়া এই কমিশনে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ হইতে একটা স্থান দাবী করা হইয়াছে। ডাচ গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে এই দাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয় এই যুক্তিতে যে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্র সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার উপর কর্ত্তৃত্বের দাবী করিতে পারে না ; ডাচ গবর্ন্মেণ্টের তাঁবেদাররূপে অন্যান্য রাষ্ট্র আছে যাহাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অগ্রাহ্য করা যায় না এবং তাহাদের পক্ষ হইতে ডাচ প্রতিনিধিগণ এই দাবী উপস্থিত করে। সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ জন মাথাই এই সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়া "ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতার" উল্লেখ করেন। এই তর্ক এখনও শেষ হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ার দাবী সমর্থন করিয়া ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,

বিদেশী বাণিজ্য সম্পর্ক বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ান রিপাব্লিক স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করিতেছে। হাভানা সম্মেলনে তাহাকে শুধু যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই, ডাচ গবর্ন্মেণ্টের সঙ্গে সে এই সম্মেলনের চূড়ান্ত বিবরণীতে স্বাক্ষর করিয়াছে। হাভানা সম্মেলনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এক অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, কমিশনে ইন্দোনেশিয়ান রিপাব্লিককে একটি আসন দেওয়া হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কমিশনে সে যদি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে অর্থনৈতিক কমিশনে আসন গ্রহণ করিবার কোন বাধা থাকিতে পারে না।

পাকিস্থান রাষ্ট্র ও এশিয়া মহাদেশের সকল প্রতিনিধি, অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি পর্য্যন্ত এই যুক্তি স্বীকার করিয়া ইন্দোনেশিয়ার দাবীর সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু কাণা গরুর ভিন্ন পথ। ব্রিটিশ প্রতিনিধি সর এণ্ড্রু ক্লো ডাচ পক্ষে ভিড়িয়া পড়িয়াছেন। এই ভিন্ন পথের বিপদ আছে। এশিয়া মহাদেশের সদ্যজাগ্রত জনমত এই বিরুদ্ধতা স্মরণ রাখিবে।

রাষ্ট্রনীতিতে বদান্যতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নানা ভাবে ছত্রভঙ্গ ইউরোপের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। এই সাহায্যদানে বদান্যতা ও ব্যবসায়-বুদ্ধি দুইটি ভাবের খেলা চলিতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নও এইভাবে কিছু কিছু ব্যয় করিতেছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, এই দুই বিরুদ্ধ রাষ্ট্র কেহই ইউরোপের কোন দেশ সম্বন্ধে ব্যবসায়-বুদ্ধির হিসাবের বাহিরে যাইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জার্ম্মানীর কথা উল্লেখ করা যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন জার্ম্মানীর আক্রমণে ধনে প্রাণে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে ; সেই ক্ষতির কোন সীমা-পরিসীমা নাই। সুতরাং ন্যায়তঃ জার্ম্মানীর নিকটে ক্ষতিপূরণের দাবি চলিতে পারে। কিন্তু পটসডাম-চুক্তির কল্যাণে পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে সোভিয়েট ইউনিয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চলিতেছে ; সেই দেশ হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে কোন হিসাব-নিকাশের বালাই আছে বলিয়া মনে হয় না। একটা লোহার কারখানার আসল মূল্য ছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা ; ক্ষতিপূরণ উপলক্ষে ইহা রাশিয়ার ভাগে পড়ে এবং তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় এই পরিমাণ টাকার অর্দ্ধেক। রাশিয়ার পক্ষে যখন ইহার যন্ত্রপাতির পরীক্ষা হয়, তখন তাহার মূল্য কমাইয়া দেওয়া হয় তৃতীয়াংশে। যন্ত্রপাতি সরাইয়া লইবার জন্য সহস্র সহস্র লোকের খাটুনির মূল্য বাবদ ও কাঠের বাক্সের মূল্য বাবদ এই এক-তৃতীয়াংশের তিন ভাগ ব্যয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ জার্ম্মানীর ৩।৪ কোটি টাকার সম্পত্তি ২৫।৩০ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়।

স্বস্থানে রাখিয়া এই কলটি চালাইলে প্রতি বৎসর এই পরিমাণ মূল্যের ইস্পাত প্রস্তুত করিয়া জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণ দিতে পারিত। আজ জার্ম্মানীর ক্ষতি করিয়াও রাশিয়ার কোন লাভ হইল না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অংশে জার্ম্মানীর যে দুই ভাগ পড়িয়াছে, তাহার অবস্থাও ইহা অপেক্ষা ভাল নয়। সেখানে এক হাতে যাহা দেওয়া হয়, তার তিনগুণ তুলিয়া লওয়া হয়। চিকাগো নগরীতে মাংসের দাম যখন হাজার টাকা টন (প্রায় ২৭ মণ) তখন আমেরিকা ও ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত জার্ম্মানীতে তার মূল্য তিন হাজার টাকার উপর। গমের মূল্য যখন আড়াই শত টাকা চিকাগোতে, তখন জার্ম্মানীতে তার মূল্য প্রায় চারি শত টাকা। একটি ডাচ লোহার কারখানা ২৭ লক্ষ মণ কয়লা কিনিতে চায় রুর অঞ্চল হইতে। তাহা দেওয়া হইল না; কয়লা আসিল জাহাজে করিয়া যুক্তরাষ্ট্র হইতে। ৮০।৯০ মাইল দূর হইতে না আসিয়া আসিল সমুদ্রপথে ৩,০০০ মাইল দূর হইতে। জার্ম্মানীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ এই কয়লা কিনিয়া দিতে হইল প্রায় ৮০৲ টাকা দরে প্রতি টনে কিন্তু তার হিসাবে—ক্ষতিপূরণের হিসাবে—উঠিল প্রতি টন ৬৲ টাকা হারে।

এই ভাবেই কি "মার্শাল পরিকল্পনার" ৬১৭ শত কোটি টাকার হিসাব করিয়া জার্ম্মানীর সাহায্য করা হইবে? ডান হাত বাঁ হাতের এরূপ কৌশল দেখিবার জিনিস বটে।

রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণ বসুর জন্মশতবার্ষিকী বাংলাদেশের অনেক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই উপলক্ষে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থানের পুনরুদ্ধার করিয়া তথায় কোন সমাজ-সেবার প্রতিষ্ঠান করিবার কল্পনা চলিতেছে। তদুদ্দেশ্যে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে সভাপতি এবং বোড়াল গ্রামবাসী শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্রকে সম্পাদক করিয়া রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিরক্ষা সংঘ নামে এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি ৫০,০০০ হাজার টাকা তুলিয়া রাজনারায়ণ বসুর পুস্তকাবলী পুনর্মুদ্রিত করিবেন. তাঁহার পৈতৃক ভিটায় একটি বালিকা বিদ্যালয়, একটি চিকিৎসালয় ও একটি প্রসূতিসদন প্রতিষ্ঠা করিবেন।

বর্ত্তমান যুগের বাঙালীর অব্যবহিত পূর্ব্বযুগের বাঙালী প্রধানগণের কর্ম্মধারার সঙ্গে পরিচিত হইবার আগ্রহ নাই, গতানুগতিক রাজনীতিক উন্মাদনার মধ্যে তাঁহাদের জীবন কাটিয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমান রাজনীতিকে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেশের মনে পরাধীনতার জ্বালা জ্বালিয়াছিলেন, আত্মবিস্মৃত জাতির মনে সম্বিৎ আনিয়াছিলেন, ভারতবাসীর মনে স্বাজাত্যাভিমান জাগাইয়াছিলেন, প্রাচীন গৌরবকথা শুনাইয়া ভবিষ্যতের নবভারতের সংগঠনের মন্ত্র আমাদের কানে দিয়াছিলেন—তাঁহাদের কথা জানিতে ও বলিতে বাঙালী কোন উৎসাহ পায় বলিয়া মনে হয় না। খুব বেশী হইলে বৎসরে একবার স্মৃতিবাসরের আয়োজন করিয়া, কোনরূপে "নমো, নমো" করিয়া স্মৃতি-পূজা সমাপন করে। এই অকৃতজ্ঞতা কেবল বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বাঙালী জানে না যে যখন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ভারতবর্ষের রাজনীতিক গগনে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মতই দীপ্যমান হইয়া উঠেন, তখন রাজনারায়ণ বসুর নূতন পরিচয় হয়—নব-জাতীয়তার পিতামহ (Grandfather of Indian Nationalism)। এই কয়টি কথার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিলে শ্রীঅরবিন্দের মাতামহের সম্যক্ পরিচয় লাভ করা যায়। তাঁহার যুগের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, নবগোপাল মিত্র, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আবদুল লতিফ প্রভৃতি বাঙালী প্রধানবর্গের কর্ম্মজীবনের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হয়। সেই চেষ্টা করিলে বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র, মহারাষ্ট্রের বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপুলঙ্কার, অন্ধ্রদেশের বীরেশলিঙ্গম পান্টালু, মালাবারের নারায়ণ স্বামী, আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি সর্ব্বভারতীয় চিন্তানায়ক ও সংস্কারকের কর্ম্মজীবনের পরিচয়লাভ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে গান্ধীজীর আবির্ভাব একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে; তাঁহার জন্য জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি যুগপ্রবর্ত্তকবৃন্দ। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্যে নিহিত আছে প্রায় এক শত বৎসরের আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, স্বপ্ন ও তাহা রূপায়িত করিবার চেষ্টা। রাজনারায়ণ-স্মৃতিরক্ষা-সংঘের যিনি সভাপতি তিনি এই বিষয়ে অনেক কিছু বলিতে পারেন। এই সংঘের চেষ্টায় আমাদের পূর্ব্বজগণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলে, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে দায়িত্ব দেশের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিবে; অতীতকে বুঝিয়া আমরা বর্ত্তমানকে সুষ্ঠু রূপ দিতে পারিব।

রুচিরাম সাহানী

পঞ্জাবের এক জন বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ নেতার তিরোভাব হইল। রুচিরাম যখন জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন তখন পঞ্জাবের হিন্দুসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর দেবসমাজ ও দয়ানন্দের আর্য্যসমাজের কল্যাণে কেরঙ্গভাবের আক্রমণ সহ্য করিবার শক্তি ভারতবাসী অর্জ্জন করিয়াছে। এই সাম্য ও সমন্বয়ের যুগে দেশের চিন্তানায়ক ও কর্ম্মনায়কবৃন্দ যে নব-সংগঠনের কল্পনা করিয়াছিলেন, জাতিধর্ম্মের বিভেদ সত্ত্বেও দেশের জীবনে একপ্রাণতা আসিতে পারে, এই ভরসায় যে কর্ম্মের দ্বারা তাঁহারা দেশের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া-

ছিলেন, তাহা দেশের জীবনের বিভেদের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া গেল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং বর্ত্তমানের ব্যর্থতার মধ্যে তার সন্ধান করিতে পারিলে ভবিষ্যতের সংগঠন সার্থক হইতে পারে। রুচিরাম সাহানী যে পঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে পঞ্জাবের নানা সংস্কার প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন— 'ট্রিবিউন' পত্রিকার অছিরূপে, দয়াল সিংহ কলেজের কর্ম্ম-নির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে—সে পঞ্জাব আর আমরা দেখিতে পাইব না। কিন্তু সে পঞ্জাবের ইতিহাসের নিকট অনেক কিছু শিখিবার আছে। সেই ইতিহাসের কথা কিছু কিছু "ট্রিবিউন" পত্রিকার স্তম্ভে আমরা দেখিয়াছি রুচিরামের প্রবন্ধের ভিতর দিয়া। সেই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল সজাগ মনের খেলা। সেই মন যে যুগে গঠিত হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়াছে; সেই মনের অধিকারীও চলিয়া গেলেন তাঁহার প্রার্থিত লোকে।

নেহরু ও প্যাটেল

বোম্বাইয়ের "ভারত জ্যোতি" সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই দুই লোকনেতার সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য তুলনা করিয়া একটি প্রণিধান-যোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন ডাঃ বালকৃষ্ণ কেশকার, নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক। "গান্ধীজীর তিরোধানের পর এই দুই জনই ভারত রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের স্রষ্টা; দেশের লোক-মনের উপর তাঁহাদের প্রভাব এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আকৃতি-প্রকৃতি, শিক্ষায়-দীক্ষায় বিভিন্ন হইয়াও, গান্ধীজীর প্রতি আনুগত্য দুই জনকে একসূত্রে বাঁধিয়াছে। জবাহরলাল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আওতায় বর্দ্ধিত; বল্লভভাই প্যাটেল হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার সংহত রূপের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত। জবাহরলাল ভাবুক, স্বপ্নবিলাসী, চিন্তাশীল; বল্লভভাই বস্তুতান্ত্রিক লোক-সংগ্রাহক। জবাহরলাল দেশের লোকের গতানুগতিক ভাব ও চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন। বল্লভভাই এই সব সংস্কারের বিরুদ্ধে কখনও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই; হিন্দু সমাজের সংস্কার চেষ্টায় নীরবে গান্ধীজীর অনুসরণ করিয়াছেন। জবাহরলাল নেহরুকে রাজনীতিক জীবনে প্রাধান্যের জন্য চেষ্টা করিতে হয় নাই; গান্ধীজী তাঁহাকে ঠেলিয়া তুলিয়াছেন; জবাহরলাল নেহরু রাজনীতিক ক্ষেত্রে কূটনীতিক খেলা করিতে শিখেন নাই; তাঁহার ঐ ভাবনা গান্ধীজী যথাসম্ভব ভাবিয়াছেন এবং তাহা করিয়া তাঁহাকে নষ্ট (spoilt) করিয়াছেন। বল্লভভাই প্যাটেল রাজনীতিক দলের মোড়লী করিবার শক্তি লইয়া গান্ধীজীর কাছে আসেন (a born manager) এবং তাঁহার সাহায্য ও আনুকূল্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের চালক ও ধারক হইয়া আছেন। গত ২৫ বৎসর গান্ধীজী জবাহরলালকে জনতার মধ্যে নানা ভাবে ঠেলিয়া দিয়াছেন; এই জনতার রিক্ত জীবন ও বিবিধ বিশ্বাসকে ঘৃণা করিয়াও জবাহরলাল নেহরু এই জনতার সাহচর্য্য ভাল-বাসিয়াছেন, তাহাদের শ্রদ্ধা অকুণ্ঠিত মনে গ্রহণ করিয়াছেন। বল্লভভাই এই জনতা হইতে কখনও দূরে ও উচ্চে ছিলেন না; সেইজন্য তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার একটা নির্ব্বিকার ভাব আছে। জবাহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী—রক্তপাতশূন্য সমাজতন্ত্রবাদে; বল্লভভাই প্যাটেল কোন "বাদে" বিশ্বাস করেন কিনা তাহা বলা কঠিন। ধনিকতন্ত্র (capitalism) সমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া তিনি মনে করেন; সেই জন্য সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী তিনি।"

এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের অধিকারী দুই জনের মধ্যে গান্ধীজী লোকহিতৈষণার আদর্শে একটা সমন্বয়ের বিধান করিয়াছিলেন জবাহরলালের ভাবুকতাকে সংযত করিয়া, বল্লভভাইয়ের বস্তুতান্ত্রিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া। তাঁহার তিরোধানে আজ দুই জনকেই তাঁর ভাবসম্পদ ও কর্ম্মসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে নিকটে আনিয়াছে; স্ব-ইচ্ছায় আর তাঁহারা পৃথক হইতে পারিবেন না। ভারতরাষ্ট্রের দায়িত্ব তাঁহারা বাধ্য হইয়া এক পথে চালাইয়া লইবেন, একথা সুনিশ্চিত; দুই জনের বিরুদ্ধ গুণাগুণ একে অন্যের গুণ ও দোষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিবে। এই সব কথা স্বীকার করিয়াও ডাঃ বালকৃষ্ণ কেশকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। তাঁহাদের দুই জনের কেহই দেশের ভবিষ্যতের নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহাদের অনুপস্থিতি বা অবর্ত্তমানে শক্তিশালী লোকনেতৃত্বের এমন কোন কাঠামো তৈয়ার হইতেছে না। তাঁহারা কেহই অমর নহেন; তাঁহাদের পদের দায়িত্ব আস্তে আস্তে ও অলক্ষিতে তাঁহাদের নিজের চিহ্নিত লোকের হাতে দিয়া এইসব লোককে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করিবার কোন চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। গান্ধীজীর অভাবে ভারতরাষ্ট্র অচল হয় নাই, কারণ জবাহরলাল ও বল্লভভাই আছেন। তাঁহার হাতে গড়া জবাহরলাল ও বল্লভভাই। কিন্তু জবাহরলাল ও বল্লভভাই কেন সেরূপ লোক তৈয়ার করিতে পারিতে-ছেন না? লোকের অভাব আছে কি, শক্তির অভাব আছে কি? অদূর ভবিষ্যতে এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর চাহিয়া দেশের ভাগ্যবিধাতা আমাদের নূতন পরীক্ষায় ফেলিতে পারেন। জবাহরলাল বা বল্লভভাই এই বিষয়ে কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; তাঁহাদের জীবনের সাধনা তাঁহাদের নিকট হইতে এই নূতন সংগঠন আদায় করিয়া লইবে।

বাঙ্গলা নবলিপি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

ভূমিকা।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি আমার "বাঙ্গালা ব্যাকরণে" দেখাইয়াছিলাম, বাঙ্গলা ভাষা শেখা সোজা। ইহা অক্লেশে কহিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এখানে আমি সাধুভাষার কথা বলিতেছি। সে ভাষাই প্রামাণিক ও লৈখিক। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গাক্ষর অক্লেশে লিখিতে ও পড়িতে পারা যায় না। এই ভাষায় পঞ্চাশৎ মূলধ্বনি অর্থাৎ বর্ণ আছে। কিন্তু পঞ্চাশৎ আকৃতি অর্থাৎ অক্ষর দ্বারা সকল শব্দ লিখিতে পারা যায় না। লিখিতে বহু সংখ্যক যুক্তাক্ষর আবশ্যক হয়। প্রত্যেক যুক্তাক্ষরই একটি নূতন অক্ষর। ইহা মনে রাখিতে, লিখিতে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পাস ছাত্র দেখিয়াছি যাহারা ঋ, গু, শু, ণ্ড, জ্ঞ, হ্ম ও এইরূপ অপর দুই একটা অক্ষর লিখিতে পারে না।

আমরা পাঠশালায় লিখিতে লিখিতে অক্ষর পড়িতে শিখিতাম। প্রায় দুই বৎসর লাগিত। সমুদয় অক্ষর ছয় ভাগ করা হইত। যথা—

(১) অ আ ইত্যাদি স্বরবর্ণ;

(২) ক খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ;

(৩) ক কা কি ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত করিবার স্বরাক্ষর;

(৪) ক কিঅ (ক্য) অর্থাৎ য র ল ব ম ন ফলা এবং রেফ।

(৫) আঙ্ক। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের পাঁচ বর্গের পাঁচ অনুনাসিক যোগ। য র ল বা দি অবর্গীয় ব্যঞ্জনে অনুস্বার যোগ।

(৬) আঙ্ক। অর্থাৎ ব্যঞ্জনাক্ষরে অপর ব্যঞ্জনাক্ষর যোগ।

এই মূল ভাগের বহু ব্যতিক্রম হইয়াছে। কয়েকটা উদাহরণ দিতেছি।

ক + ু = কু; কিন্তু গু, ত্ত (যেমন ত্তু), শু, ক্রু, দ্রু, ধ্রু, ভ্রু, রু, হু।

ক + ূ = কূ; কিন্তু দ্রূ, ধ্রূ, ভ্রূ, রূ।

ক + ৃ = কৃ; কিন্তু হৃ।

বলিতেছি য-ফলা, কিন্তু 'য' অক্ষরের পূর্ণ আকার নাই। ইহাকেও নূতন শিখিতে হয়।

র-ফলা যোগে গ্র; কিন্তু ক্র, ত্র, ত্ত্র, ভ্র।

ক্‌ষ = ক্ষ; কিন্তু হ্‌ম = হ্ম। হ্‌ন = হ্ন, যেমন চিহ্ন।

ঙ্‌ক = ঙ্ক; ঙ্‌গ = ঙ্গ; ঞ্‌চ = ঞ্চ।

গ্‌ধ = গ্ধ; দ্‌ধ = দ্ধ; ন্‌ধ = ন্ধ; ব্‌ধ = ব্ধ।

ন্‌থ = ন্থ; স্‌থ = স্থ ইত্যাদি।

দেখা যাইবে, এক উকারের পাঁচ রকম আকার আছে। উকার ও ঋকারের দুই, ক-কারের তিন, গ-কারের দুই, ঙ-কারের তিন রকম আকৃতি আছে। এই প্রকারে বাঙ্গলা অক্ষরসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। উকারের পাঁচ রকম আকার বলা ঠিক হইল না; কারণ যে-কোন রূপ যে-কোন ব্যঞ্জনে যোগ করা চলে না।

আমার "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" ও "শব্দ কোশে" সংযুক্ত স্বরাক্ষরের অনাবশ্যক অতিরিক্ত রূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর স্পষ্ট ও পূর্ণ আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। রেফ-যুক্ত অক্ষরের দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে। এইরূপ অক্ষর-সংস্কার দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। অক্ষরের আকার চিরকাল এক ছিল না। অধিক নয়, শত বৎসর পূর্বের লিখিত পুথীর সকল অক্ষর পড়িতে পারা যায় না। সকল স্থানের পুথীর অক্ষরও অবিকল এক ছিল না। আমার প্রদর্শিত প্রণালীতে ১৪টি স্বরাক্ষর ও ৮টি রেফ দ্বিত্ব ব্যঞ্জনাক্ষর কমিয়াছে। ইহা অল্প লাভ নয়। যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে, লিখিবার ও পড়িবার সুবিধা হইয়াছে।

এই ক্রমে "আনন্দবাজার পত্রিকা" মুদ্রিত হইতেছে। প্রত্যহ লক্ষাধিক পাঠক পড়িতেছেন, বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন না। "পত্রিকা" আরও অগ্রসর হইয়াছেন, ি, ু, ূ, ৃ, ্, এই কয়েকটি চিহ্ন ব্যঞ্জনাক্ষরের সহিত না জুড়িয়া পৃথক মুদ্রিত হইতেছে। এই পরিবর্তনে অগণ্য টাইপ কমিয়াছে। কিন্তু র-ফলাটি পৃথক হয় নাই। এ কারণ ১৫।১৬টা টাইপ রাখিতে হইয়াছে। এখন বই ছাপার দিন; ছাপাখানার সুবিধাও দেখিতে হইবে।

অপর যুক্তব্যঞ্জনাক্ষরের একটি ছোট অপরটি বড়, অথবা একটি বড় অপরটি ছোট করিতে হইতেছে। দুইটিই সমান ছোট করিলে অক্ষর অস্পষ্ট হয়। দেখা যায়, প্রত্যেক যুক্তব্যঞ্জনাক্ষর যদিও পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট, একটি নূতন অক্ষর হইয়াছে, চিনিতে শিখিতে হয়। যুক্তব্যঞ্জনাক্ষরের সংখ্যা অল্প নয়। ফলার সংখ্যা রেফ সহ ৮; আঙ্কের ২২; আঙ্কের ৩০; একুনে ৬০ সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর শিখিতে হয়। বস্তুতঃ আরও অধিক। প্রত্যেকের কলেবর নূতন।

এই কারণেই শিশুর বর্ণ- ও অক্ষর-পরিচয় করিতে দুই বৎসর লাগে। ইহার কমে সে অক্ষর পড়িতে শিখিতে পারে, কিন্তু লিখিতে পারে না। কারণ লিখিবার সময় প্রত্যেক অক্ষরের আকার, কোথায় কোণ, কোথায় তরঙ্গ, কোথায় বক্ররেখা, কোথায় ঋজুরেখা আছে, তাহা স্মরণ করিতে হয়। হাতের অভ্যাসও অল্প সময়ে হয় না।

অক্ষর-যোজনার দোষও আছে। সংযুক্ত স্বরাক্ষর-যোগে স্বাভাবিক ক্রম রক্ষিত হয় নাই। ক+া=কা; কিন্তু ক+ি=কি। ক+ী=কী, কিন্তু ক+ে=কে। আমরা বলি, ক্এ=কে; কিন্তু লিখি এ (ে) ক=কে। এই অনিয়ম হেতু সংযুক্ত স্বরাক্ষর ভাঙ্গিয়া লিখিতে পারা যায় না। 'বন্দ' শব্দ 'বন্‌দ' লিখিতে পারি, দোষ হয় না। কিন্তু 'বন্দে' শব্দ যদি 'বনে্দ' লিখি, প্রথমে ন্দ পড়িয়া পরে 'ে' যোগ করিতে হয়; অর্থাৎ শেষাক্ষর পড়িবার পর বামে দৃষ্টি করিতে হয়। ইহা অক্ষর শিক্ষার এক অন্তরায়। আর, হস্ চিহ্নই বা কত দেওয়া যাইবে? হস্ চিহ্ন দিয়া অক্ষর লিখিলে অসুন্দর দেখায়। বিশেষ দোষ, এই চিহ্ন লিখিবার সময় কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়। অতএব দেখা যাইবে, অক্ষর-সংস্কার ও অক্ষর-যোজনার সংস্কার, দুই-ই আবশ্যক।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গরাজ দেশময় লেখাপড়া-বিদ্যাবিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছেন। দেশের সকল বালকবালিকাকে ও বয়স্ককেও লিখন ও পঠন শিখিতে হইবে। আদ্যশিক্ষা কলাশ্রয়ী হউক, আর বিদ্যাশ্রয়ী হউক, উভয় স্থলেই লিখন ও পঠন শিখিতে হইবে। যাহাতে লিখন ও পঠন সহজ হয়, তাহাদের শ্রম লঘু হয়, আমাদিগকে সে বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। লিখন-পঠন-বিদ্যা জ্ঞান-ভাণ্ডারের কুঞ্চিকা। লিখন ও পঠন উপায় মাত্র, উপেয় নহে। জনগণ যত সহজে সে কুঞ্চিকা পাইবে, দেশে বিদ্যা-বিস্তারও তত দ্রুত হইবে। এই কারণে বাঙ্গলা অক্ষর সংস্কার আবার চিন্তনীয় হইয়াছে।

কিন্তু মানুষ অচেতন পুতুল নয়, তাহার রাগ-বিরাগ আছে, ইতিহাস-সংস্কার আছে। আমরা সুবিধা-অসুবিধা ভাবিয়া সকল কাজ করি না। তথাপি আমরা ইদানীং রেল গাড়ীতে চড়িয়া তীর্থ-দর্শনে যাইতেছি, পূর্বের মত পায়ে হাঁটিয়া যাই না। যে সংস্কার দ্বারা অক্ষরের দোষ ও অক্ষর-যোজনার দোষ সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু অক্ষর স্বীয় রূপ হারায় না, অক্ষর-যোজনার বিপর্যয় ঘটে না, সে সংস্কার বাঞ্ছনীয়।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি "ভারতবর্ষে" দেশে জ্ঞান-প্রচারের উপায় চিন্তা করিয়াছিলাম। সাতাইশ বৎসর পূর্বে "প্রবাসী"তে তৎকালের শিক্ষার দোষ-গুণ আলোচনা করিয়া নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন কামনা করিয়াছিলাম। কিন্তু পরাধীন জাতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। এক্ষণে শিক্ষামন্ত্রী সে বিষয় চিন্তা করিতেছেন। যদিও ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, আমার আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হয় নাই। কেবল শিক্ষা-পরিপাটীর যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক মনে করিয়াছি। সম্প্রতি "শিক্ষা-প্রকল্প" নামে আমার প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইতেছে। "বিশ্বভারতী" প্রকাশ করিতেছেন।

এখানে বাঙ্গলা লিপির সংস্কার চিন্তা করিতেছি। বাঙ্গলা স্বরাক্ষর ও ব্যঞ্জনাক্ষর তিন ভাগে লিখিতেছি। (১) প্রচলিত অক্ষর, (২) সংস্কর্তব্য অক্ষর, (৩) উপন্যস্ত অক্ষর। সংস্কর্তব্য ও উপন্যস্ত অক্ষর সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুধীগণ নবলিপির প্রয়োজন, যোগ্যতা ও দোষ-গুণ বিচার করিবেন। ছাপাখানার এই দুই ভাগের অক্ষর নাই। ১, ২, ৩ অঙ্ক-ক্রমে লিখিয়া পরে আকার প্রদর্শিত হইল। নবলিপির আদর্শও প্রদর্শিত হইল। পাঠক সহজে দোষ-গুণ বুঝিতে পারিবেন।

নবলিপি

১। স্বরাক্ষর—অসংযুক্তরূপ।

ক। প্রচলিত—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ঁ ং ঃ। (১৪)

খ। সংস্কর্তব্য—ঈ (১)। দুই হ্রস্ব-ই যোগে দীর্ঘ-ঈ। একটি ই দেখিতে পাওয়া যায়, অপরটি বিকৃত হইয়াছে। অক্ষরের দুইটি 'ই' দেখাইলে সহজে মনে রাখিতে পারা যাইবে।

গ। উপন্যস্ত—এ্য, ওা। ইংরেজী and শব্দের আদ্য-স্বর লিখিবার বাঙ্গলা অক্ষর নাই। আমি এই ধ্বনির নাম বাঁকা-এ রাখিয়াছিলাম। আমি 'বাঁকা-এ' লেখা আবশ্যক বিবেচনা করি না। কারণ, এ, কোথাও আ দ্বারা সে অক্ষরের কাজ চলিতে পারে। একদিন হাইকোর্টের এক প্রসিদ্ধ এড্‌ভোকেট (D.L.) 'এফিডেবিট্' বলিতেছিলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলে তিনি বলিলেন, আমরা বাঙ্গলায় এইরূপ বলি। তথাপি কেহ কেহ অ্যা এ্যা, য়্যা লিখিতেছেন। স্বরবর্ণে য-ফলা কিম্বা অন্য ব্যঞ্জন যোগ অসম্ভব। য়্যা-র ধ্বনি 'ইআ'-ই রহিল; 'বাঁকা-এ' হইল না। 'এ্য,' এই যুক্তস্বর দ্বারা বাঁকা-একারের ধ্বনি প্রায় আসে। স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ যুক্ত হইতে পারে। স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের সন্ধি হইয়া অন্য স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব নূতন নয়। আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণে এ্য উপস্থিত করিয়াছিলাম।

ওা, যেমন পাওা (পাওয়া), পুরাতন পুথীতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত শব্দে 'য়' অক্ষরের উচ্চারণ ঠিক আছে; যেমন, মায়া, বায়ু, প্রয়োগ। কিন্তু বাঙ্গলা শব্দে 'য়' অক্ষর স্বরের বাহন হইয়াছে। 'অন্তঃস্থ-অ' এই নামই বর্ণের আধোগতি প্রকাশ করিতেছে। ইহাকে 'ইঅ' বলাই ঠিক। বাঙ্গলা ভাষায় 'য়' অক্ষরের বাহুল্য ঘটিয়াছে। আমরা 'করিআ' না লিখিয়া 'করিয়া' লিখি; চেআর—চেয়ার। কিন্তু এতদ্দ্বারা বাঙ্গলা শব্দের 'য়' অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ লুপ্ত হইতেছে। ইহারই ফলে প্রাকৃত জনে আউ (আয়ু), বাউ (বায়ু) বলে। 'ওা' এই যুক্তস্বর দ্বারা 'য়া' লেখা হ্রাস হইবে। অসংখ্য বাঙ্গলা শব্দে 'ওা' আছে। যেমন, ফেরীওালা, গাড়ীওালা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এ ওা নূতন অক্ষর নয়।

২। স্বরাক্ষর—সংযুক্তরূপ।

ক। প্রচলিত—া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ। (১০)।

খ। সংস্কর্তব্য—ি(২), ু(৩), ূ(৪), ৃ(৫), ে(৬), ৈ(৭)।

'ি' অক্ষরে একটি ধনুঃ, তাহাতে আর একটি ধনুঃ যোগ করিয়া দীর্ঘ 'ী' হইয়াছে। সেই সাদৃশ্যে ু অক্ষরে আর এক ু জুড়িয়া দীর্ঘ-উ করা হইল। ু ূ ৃ অক্ষরগুলির প্রচলিত রূপ ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র করিবার কোন হেতু নাই। এগুলিকে ব্যঞ্জনাক্ষরের সমান বড় করিলে সুন্দর হইবে। বাঙ্গলা ভাষায় সংযুক্ত দীর্ঘ-ঋ কদাচিৎ আবশ্যক হয়। ইহার নিমিত্ত একটা পৃথক অক্ষর না রাখিয়া দুইটা ৃ পরে পরে লিখিয়া দীর্ঘ জানাইতে পারা যাইবে।

সঙ্কেত—১। যাবতীয় সংযোজ্য স্বরাক্ষর ব্যঞ্জনের পরে বসিবে, পূর্বে নয়। বর্তমানে ১০টি সংযোজ্য স্বরাক্ষরের মধ্যে ৫টি (া, ী, ু, ূ, ৃ) ব্যঞ্জনের পরে বসিতেছে। ৩টি পূর্বে (ি, ে, ৈ) ও ২টি (ো, ৌ) অর্ধেক পূর্বে অর্ধেক পরে বসে। আমরা ব্যঞ্জনের পরে স্বরবর্ণ উচ্চারণ করি। যথা—ক+ু=কু। অতএব পরে লেখাই ঠিক।

গ। উপন্যস্ত—ʼ (ঈষৎ-ই)। মৌখিক ভাষায় শব্দের স্বরসংক্ষেপ ও স্বরলোপ ঘটে। ইদানীং কেহ কেহ মৌখিক ভাষা লিখিতেছেন। কিন্তু ইহার শব্দের শুদ্ধ বানান প্রচলিত হয় নাই। এই কারণে ঈষৎ-ই জ্ঞাপনের চিহ্ন উদ্ভাবিত হয় নাই। 'কলিকাতা' সংক্ষেপে 'কইলকাতা' কিন্তু 'ই' পূর্ণ নয়, ঈষৎ। এইরূপ, সে বকিবে—সে বইকবে, এখানেও ঈষৎ-ই। বহুকাল পূর্ব হইতে আমি এই বর্ণ জানাইবার নিমিত্ত 'ই' অক্ষরের হ্রস্বীকৃত শৃঙ্গ লিখিয়া আসিতেছি। ইহার কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। ছাপায় ইহা সংযুক্ত ৌ অক্ষরের দক্ষিণাংশের শৃঙ্গ। আকারের সহিত যুক্ত হইয়া 'ঈষৎ-ই' অসংখ্য শব্দে শুনিতে পাওয়া যায়। তখন ইহাকে 'আই' বলা যাইতে পারে। ই ও উ স্বর সংক্ষেপে 'ঈষৎ-ই' রূপে উচ্চারিত হয়। যথা, চাউল—চৗল। দালি—দৗল বা ডৗল। ধাতু—ধৗত। মারি ধরি—মৗর ধ'র। রামশালি—রামশৗল। এইরূপ, পূর্ববঙ্গের ইন্দ্রশৗল ধান। গ্রামের নাম শ্রীকালী—শ্রীকৗল, টাঙ্গালি—টাঙ্গৗল ইত্যাদি। অক্ষর অভাবে পূর্ববঙ্গে পূর্ণ-ই লিখিত হইতেছে এবং পশ্চিম বঙ্গে উচ্চারণে 'ঈষৎ-ই' থাকিলেও বানানে লুপ্ত হইতেছে। যে ধ্বনি আছে, তাহা বানানে প্রদর্শিত না হইলে সে বানান অশুদ্ধ।

কেহ কেহ ঈষৎ 'ই' জ্ঞাপনের নিমিত্ত ঊর্ধ্বকমা দিয়া থাকেন। ইংরেজীর অনুকরণে ঊর্ধ্বকমা আসিয়াছে। ইংরেজীতে শব্দের অক্ষর ও ধ্বনি লুপ্ত হইলে সে স্থানে ঊর্ধ্বকমা বসে। যেমন can't। কিন্তু বাঙ্গলায় ধ্বনি আছে। অতএব তুল্য হইল না। 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত পদের মৌখিকরূপে অন্ত্য য়-ফলা (ইঅ) প্রায় লুপ্ত হয়। যথা, চলিয়া—চল্যা—চল্যে, অন্ত্য য়-ফলা (ইঅ) লুপ্ত হইলে থাকে চলে'। এখানে ল পরে ঊর্ধ্বকমা লিখিয়া গ্রস্ত য়-ফলা জ্ঞাপিত হইতে পারে। কেহ কেহ "চ'লে" লেখেন। কিন্তু চ-এর পরে কোন অক্ষর বা ধ্বনি লুপ্ত হয় নাই। অতএব পদের অন্তে ঊর্ধ্বকমা লেখাই যুক্তিসঙ্গত। ঊর্ধ্বকমা না বলিয়া উৎকলা বলা যাইবে।

৩। ব্যঞ্জনাক্ষর

ক। প্রচলিত রূপ—ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ। য় ড় ঢ়। (৩৬)

খ। সংস্কর্তব্য,—ত(৮), ভ(৯), য(১০), র(১১), য়(১৩), ড়(১৪), ঢ়(১৫)।

যে যে অক্ষর দ্বারা একটি শব্দ লিখিত হয়, সে সে অক্ষরের মাথায় রেখা অর্থাৎ মাত্রা দ্বারা পরবর্তী শব্দ পৃথক করিতে হয়। যেমন 'রাম বনবাসে গেলেন', তিনটি পৃথক মাত্রা দ্বারা তিনটি পৃথক শব্দ বুঝা-যাইতেছে। কিন্তু বর্তমান ছাপার ত ও ভ বৃন্তহীন; মাত্রার নীচে নিরলম্ব থাকে। পূর্বে হাতে লেখা পুথীতে এরূপ ছিল না। অদ্যাপি কেহ কেহ সবৃন্ত ত ও ভ লেখেন। তাহাই ঠিক। অতএব ত-স্থানে সবৃন্ত ত এবং ভ-স্থানে সবৃন্ত ভ হইলে যুক্তিসঙ্গত হয়। এই দুই অক্ষরের সহিত অন্য অক্ষর যুক্ত করিতে হইলে মাত্রার সহিত যুক্ত হইবে। যেমন, তা, ভা। এ কারণেও ত ও ভ সবৃন্ত করা যুক্তিসঙ্গত।

যে 'য' হইতে য-ফলা (্য) আসিয়াছে, সে 'য' বর্তমান 'য' নয়। দুইটি অক্ষর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বর্তমান 'য'তে চারিটি ঋজুরেখা আছে। পূর্বকালের 'য'তে প্রথম দুই ঋজুরেখার স্থলে একটি তরঙ্গ থাকিত। ফলার 'য'তে এবং নাগরীতে সেইরূপ আছে। নবলিপিতে য-ফলা একটি নূতন অক্ষর থাকিবে না। 'য়' অক্ষর দ্বারাই য-ফলা বুঝিতে পারা যাইবে। এইজন্য 'য' অক্ষরের আকার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক হইল।

র। পূর্বকালে ব-এ শূন্য র ছিল না, পেটকাটা র ছিল। সে র অক্ষরও ব-এর মত ছিল না, নাগরী र-এর মত ছিল। বোধহয় সে অক্ষরে পেটকাটা সহজে দেখিতে পাওয়া যাইত না, বিন্দুর আকার ধরিয়াছিল। সে বিন্দু এখন ব-এর তলে আসিয়াছে। ব ও র উচ্চারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন; আকারেও এই দুই যত ভিন্ন হয়, ততই ভাল। র-স্থানে নাগরী र অপর বাঙ্গলা অক্ষরের সহিত মিশিতে পারে। এই কারণে আমি র-স্থানে নাগরী र গ্রহণ করিতে বলি। বিন্দু দিতে গেলেই কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়; এই দোষও সংশোধিত হইবে। এই দোষ য় ড় ঢ় এই তিন অক্ষরেও আছে। ইহাদের নীচের বিন্দু অক্লেশে ইহাদের অবয়বে জুড়িয়া দিতে পারা যায়। ড় ঢ় উচ্চারণ করিতে অসংখ্য নরনারী কষ্টবোধ করে। কালে ড় ঢ় উঠিয়া গেলে কোন ক্ষতি হইবে না। বস্তুতঃ, য়, ড়, ঢ় শত বৎসর পূর্বে ছিল না।

গ। উপন্যস্ত,—অন্তঃস্থ-ব (১২)। বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব আকারে ও উচ্চারণে এক হইয়া গিয়াছে। একটি কাটিয়া দিলে ভাষায় অভাব ঘটে না। কিন্তু ব-ফলার উচ্চারণ বিকৃত হইলেও ব চাই। অন্তঃস্থ-ব-এর উচ্চারণ পুনরুদ্ধার করা কঠিন। কিন্তু নবলিপিতে অন্তঃস্থ-ব আনিতে হইতেছে। নচেৎ ফলার ব পাওয়া যায় না। 'উদ্‌বাহু' স্বচ্ছন্দে পড়িতে ও বুঝিতে পারি; কিন্তু 'গৃহদ্‌বার' লিখিলে পড়িতে ও বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কৃত, হিন্দী, আসামী ও ইংরেজী শব্দ লিখিতে অন্তঃস্থ-ব আবশ্যক হয়। আসামীতে অন্তঃ-ব বর্গীয়-ব এর তলে রেখা দিয়া ৱ লেখা হয়। কিন্তু এই ৱ লিখিতে গেলে কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয় ও রেখা দিতে গেলেই অক্ষরটি কিছু ছোট হয়। নাগরী অন্তঃস্থ-व বৃত্তাকার; ইহাতে বাঙ্গলা অক্ষরের কোণ নাই; সে व অন্য অক্ষরের সহিত মিশিতে পারে না। নাগরী অন্তঃস্থ-ব ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া বাঙ্গলায় সকোণ ব করিতে পারা যায়।

২। যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর

ক্ষ (ক্খিঅ), জ্ঞ (গ্যঁ), ঞ্চ (ঞ্চ)। (৩)

বাঙ্গলা ভাষায় এই তিন অক্ষরের উচ্চারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এই তিনটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর রাখিতে হইতেছে।

সঙ্কেত ২। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-মূলক ভাষায় একটি চমৎকার সঙ্কেত চলিয়া আসিতেছে; ব্যঞ্জনাক্ষর নিয়ত অকারান্ত। কিন্তু অন্য স্বরাক্ষর কিম্বা কোন ব্যঞ্জনাক্ষর যুক্ত হইলে সে অক্ষর হসন্ত হয়। যেমন, ক অকারান্ত, কিন্তু ক যুক্ত উ সন্ধি না হইয়া কু। ক যুক্ত ত কৃত। নবলিপিতে এই সঙ্কেত অবশ্যপালনীয়। মনে রাখিতে হইবে যাবতীয় সংযুক্তব্যঞ্জন স্বরান্ত। 'চন্‌দ্র' 'চন্দ্র' পড়িতে হইবে, 'চন্দর্‌' নয়। এই কারণে ইংরেজী park 'পার্‌ক্‌' লেখা উচিত, পার্ক বানান ভুল।

সঙ্কেত ৩। উক্ত তিন সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর ব্যতীত অন্য যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর লিখিবার সময় প্রথমাক্ষরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপরে একটি তির্যক্‌ যোগ-রেখা দিতে হইবে, যেন নীচের হস্‌ চিহ্ন উপরে বসিয়াছে। যেমন ভক্‌ত। এই যোগ-চিহ্নকে 'পাতী' বলা যাইবে, কারণ রেখাটি অক্ষরের মাথা হইতে নীচের দিকে আসে। ঙ, ছ, জ, ঞ, ত, ভ কয়েকটি অক্ষর ব্যতীত অন্য অক্ষর লিখিবার সময় কলমের এক টানে 'পাতী' আসিবে। কিন্তু ছাপায় একটি টাইপ পৃথক রাখিতে হইবে। পাতী নূতন নয়; সংযুক্ত 'া' দেখুন।

নবলিপিতে 'ফলা' নাম নিরর্থক ও অনাবশ্যক 'য়-ফলা' না বলিয়া 'ইঅ' বলাই ঠিক। 'তথ্য' বানান করিতে হইলে ত, থ, যুক্ত য় (ইঅ) বলিতে হইবে। এইরূপ ত, ক যুক্ত র—তক্र; ত, র যুক্ত ক—ত্रক, ইত্যাদি। বাঙ্গলায় কয়েকটি ফলার উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে। ব্যঞ্জন ও ফলা সমান বড় লিখিলে উচ্চারণ-দোষ সংশোধিত হইতে পারিবে। ইহা অল্প লাভ নয়। য়-ফলা সর্বত্র নষ্ট হয় নাই। দামিন্যা গ্রামে কবিকঙ্কণের নিবাস ছিল। তদ্দেশবাসী অদ্যাপি 'দামিন্যা' বলে, দামিন্না বলে না। বাঁকুড়া জেলায় নিরক্ষর জনেও য়-ফলা স্পষ্ট উচ্চারণ করে। এই কারণে অদ্যাপি বাঁকুড়ায় কেহ কেহ 'করিআ' লেখেন। উচ্চারণ শুদ্ধ হইলে শব্দের বানান সহজ হইয়া পড়ে।

কোন কোন শব্দে হস্‌ চিহ্ন আবশ্যক হইতে পারে, যেমন 'দৈবাত্‌'। ইহার বিপরীত, কোন কোন শব্দের শেষাক্ষর অকারান্ত লিখিত হইলেও হসন্ত পড়িবার আশঙ্কা থাকে। এই আশঙ্কা নিবারণ নিমিত্ত সে অক্ষরের নীচে দক্ষিণ কোণে একটি বিন্দু বসিবে। যেমন স্বস্তিক.। ইহা 'স্বস্তিক্‌' নয়। এইরূপ কোন কোন বাঙ্গলা শব্দেও বিন্দু আবশ্যক হয়। যেমন, কট.মট. চোখ। বিন্দুর অন্য প্রয়োজনও আছে। অনুস্বারের নীচে হস্‌ চিহ্ন অনাবশ্যক, যেমন কং।

এইরূপে ৬৩টি অক্ষর পাইলাম। ইহাদের সহিত শৃঙ্গ, উংকলা, পাতী, হস্‌চিহ্ন, বিন্দু, এই ৫টি চিহ্ন পাইলে লৈখিক ও মৌখিক ভাষার যাবতীয় শব্দ লিখিতে পারা যাইবে। ফলে অক্ষর-সংখ্যা প্রায় তিন ভাগের এক ভাগে দাঁড়াইবে।

এক্ষণে এই নবলিপির দোষগুণ আলোচনা করি। প্রথম দোষ, প্রথম প্রথম নবলিপি পড়িবার সময় বর্তমান লিপিতে অভ্যস্ত পাঠকের বাধ. বাধ. ঠেকিবে। পাঁচটি সংযোজ্য স্বরাক্ষরের (ি, ে, ৈ, ো, ৌ) স্থান পরিবর্তনই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু একবার সঙ্কেতটি জানিলে আর সে বাধা থাকিবে না। দ্বিতীয় দোষ, যদি কোন বালক নবলিপিতে অভ্যস্ত হয়, সে প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত বই পড়িতে পারিবে কি ? যে অগণ্য বাঙ্গলা বই ছাপা হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে অমূল্য সাহিত্য আছে, সে সব এই বালকের অনধিগম্য হইবে না কি ? এই আশঙ্কা গুরুতর নয়। কারণ প্রচলিত ৬৩টি অক্ষরের মধ্যে ৭৮টি ব্যতীত অপর সমুদয় অক্ষর তাহার পরিচিত। সে অনেক শব্দও শিখিয়াছে। প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত শব্দের দুই-একটি অক্ষর পড়িলেই সে অপর অজ্ঞাত অক্ষরও অনুমান করিয়া লইতে পারিবে। এই ক্রমে আমরা পুরাতন পুথী পড়িয়া থাকি। তাহার সাহায্যের নিমিত্ত তাহার পাঠ্যপুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ক কা কি, ক কিঅ, আঙ্ক ও আস্ক, এই চারি শ্রেণীর অক্ষর ছাপিলে সে অক্লেশে উভয় লিপির ঐক্য করিতে পারিবে। এই নিমিত্ত কেহ কেহ ঈ, ৃ, য, ও র এই চারি অক্ষরের আকার-পরিবর্তন চাহিবেন না। কিন্তু তদ্দ্বারা অধিক সুবিধা হইবে না। সংস্কার করিতে গেলে প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হইবেই।

ইতিমধ্যে পাঠক নবলিপির গুণ বুঝিতে পারিয়াছেন। যে শিশু দুই বৎসরের কমে প্রচলিত লিপি পড়িতে ও লিখিতে পারে না, সে নবলিপি তিন মাসে পড়িতে পারিবে। আর তিন মাসে হাত বশ করিতে পারিবে। শিক্ষক উপযুক্ত হইলে তাহাকে অসংখ্য শব্দের বানান মুখস্থ করিতে হইবে না। ('শিক্ষক' শব্দ দ্বারা শিক্ষিকাও বুঝিতে হইবে।) তিনি শিশুকে বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ শিখাইবেন। জ য, ণ ন মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু অন্য বর্ণ শুদ্ধ উচ্চারণ অল্প চেষ্টাতেই হইবে। তিনি য়-অক্ষরের নাম 'ইঅ' শিখাইবেন। শিশু 'এক' শুনিবে, 'এক' লিখিবে, 'এ্যাক' বলিবে না ; 'সত্য' শুনিবে, 'সত্য' লিখিবে, 'সোত্ত' বলিবে না। 'পদ্ম' শুনিবে', 'পদ্‌ম' লিখিবে ইত্যাদি। সে বড় হইয়া শব্দের বিকৃত উচ্চারণ শুনিবে, কিন্তু প্রথম সংস্কার নিশ্চয় স্থায়ী হইবে। সে মৌখিক ভাষা শিখিবে না ; কারণ মৌখিক ভাষার স্থিরতা নাই। স্থানভেদে, নরনারীভেদে, শিক্ষাভেদে, বৃত্তিভেদে মৌখিক শব্দের রূপান্তর হয়। যেমন,—চিঁড়ে, পিঠে, হিসেব-নিকেশ, ভেতর-ওপর, গোণাগুণতি, চার(৪), বোঁচকা-বুঁচকী, নতুন, বাঙলা, বাঙালী, রাত্তির, চন্দর ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ ছিনু, ছিলুম, ছিলেম, ছিল্যম, ছিলাম ইত্যাদি ক্রিয়াপদে প্রভেদ আছে। শিশু, 'সমী', 'সস্থ', 'অতীৎ', 'অমৃৎ', 'তৃণ্' ইত্যাদি ভাষা-দোষ পরিত্যাগ করিবে।

আদ্যশিক্ষা অবশ্যক করিতে হইলে পূর্বকালের পাঠশালা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। শিশু ঘরের মেঝেয় তালচাটিতে বসিবে। কঞ্চির বা শরের কলম পাঁচ আঙ্গুলে মুঠা করিয়া ধরিবে, মসীতে তাল পাতায় লিখিবে। ছয় মাস পরে, কেহ বা এক বৎসর পরে কাগজ ধরিবে। তখন পাঠশালা হইতে শিশু একখানি পাতলা কাঠের মসৃণ পাটা পাইবে। পাটার উপরে কাগজ রাখিয়া পাটা কোলে ধরিয়া লিখিবে। অ আ লিখিবে, অ আ পড়িবে। প্রথম তিন মাস তাহার বই নাই ; বর্ণ ও অক্ষর পরিচয়ের পরে ছাপা বই পাইবে। সে বইএ বড় ও মোটা অক্ষরে পুরু কাগজে নবলিপির অক্ষরমালা ও ছোট ছোট শব্দ থাকিবে। বলা বাহুল্য আদ্যশিক্ষার সমুদয় পুস্তক এই লিপিতে ছাপিতে হইবে। আমার "শিক্ষাপ্রকল্পে" আদ্যশিক্ষার কাল ৭ বৎসর।

নবলিপি প্রবর্তিত হইলে ছাপাখানার অভূতপূর্ব উন্নতি হইতে পারিবে। ছাপাখানায় ৬৩টি অক্ষর ও ৫টি চিহ্নের (শৃঙ্গ, পাতী, উংকলা, বিন্দু, হস্ চিহ্ন) জন্য মোট ৬৮টি টাইপ রাখিলেই লৈখিক ও মৌখিক ভাষার যাবতীয় শব্দ ছাপিতে পারা যাইবে। শুনিলাম বর্তমানে ছোট প্রেসেও ১৬৮ অক্ষরের টাইপ রাখিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি বিরামাদি চিহ্ন রাখিতে হইবে। সে সকল চিহ্নের ইংরেজী নামের পরিবর্তে বাঙ্গলা নাম রাখিয়া ভাষার অন্তর্গত করিতে হইবে। এখানে নাম উপন্যস্ত করিলাম। যথা—

,—কলা। (কলা অর্থে চন্দ্রকলা, আর কলা অর্থে অংশ। এই বিরাম চিহ্নের আকার চন্দ্রকলার তুল্য। এতদ্দ্বারা বাক্যের ক্ষুদ্রাংশ পৃথক করা হয়)।

;—কলা বিন্দু।

'—উংকলা অর্থাৎ উর্ধ্ব কলা।

'—ব্যুংকলা (একট্যো বা দুট্যো)। ইহার দক্ষিণেরটি ' উংকলা।

।—দাঁড়ি।

নূতন অক্ষর

(১) ঈ — ঈ। (২) ি — ী। (৩) ৎ — ৎ। (৪) ৭ — ৭। (৫) ‹ — ২। (৬) ে — ে। (৭) ৈ — ৈ। ো — ো। ৌ — ৌ। (৮) ত — ত। (৯) ভ — ভ। (১০) য — য। (১১) র — র। (১২) অন্তঃস্থ ব — ব। (১৩) য় — য়। (১৪) ড় — ড়। (১৫) ঢ় — ঢ়। শূন্য — ˢ। পাতী — ˋ।

নবলিপির আদর্শ

(১)

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্॥
শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥

(২) গরজিত অবনী উথলে সিন্ধু গরজে কাঁপে সীমা।
গণ্ডুষে তুলে কমণ্ডলু কত তাণ্ডব ভঙ্গীমা ভীমা॥
এড়ী ফুল-শর সমর মদমত্ত লম্ফে, কম্পে ধরা।
জাগী উঠে তায় সমর-নিস্তুদন লোচন দহন-ভরা॥

মৌখিক ভাষা,—

বছর সাত আট আগে এক আশ্চর্য কাণ্ড হয়েছীল। সেদীন ভারী গরম, বেলা ১টা, বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছীল। হঠাৎ নীকটের মাঠ হ'তে মড-মড শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কত লোক ছুটে দেখতে গেল। আমী ৪টার সময় গেলাম। তখনও ১০/১২ জন লোক দাঁড়ীয়ে। তাদের মধ্যে একজন আধবুড়ো ছীল। তার নাম ঈশ্বর পাত্র, ঘর অনেক দূরে। সে বল্লে এ আর নূতন কী? যীনী এই বৃক্ষ আশ্রয় করেছীলেন তীনী চলে গেলেন, জানীয়ে গেলেন। তা নইলে ঠীক ১টার সময়, ১২টা নয়, ২টা নয়, ১টার সময়; সবার নীচের ডাল, উপরের নয়, মাঝের নয়; অশ্বত্থ গাছের কাঁচা ডাল, এই বৈশাখ মাসে আজ ভাঙবে কেন?

—×—

॥—দু-দাঁড়ি।
?—খড়্গ।
!—তিলক।
— রেখ।
(-)—লিক (বা' লিকি, স' লিক্ষা)।

বেষ্টনীর চিহ্ন—
( )—চাপ
{ }—দীর্ঘ চাপ
[ ]—বাহু
*—তারা। এইরূপ দ্বিতারা, ত্রিতারা।
গণিতের ১, ২, ৩...দশ অঙ্ক; /০, ৵০, ৶০, ।০, ॥০, ৸০ ইত্যাদি চিহ্ন।

গণিত কর্ম্মের চিহ্ন—
+—বজ্র (বজ্র ও হীরা একই অর্থ)।
×—হীরা (ইহা হইতে বা' ঢেরা; যেমন ঢেরা সই)।
/—বিপাতী (ভাজন চিহ্ন)।
=—দ্বিরেখ।

চিহ্ন সংখ্যা মোট ৩৪। অক্ষর ও চিহ্ন মিলিয়া মোট ১০২টি টাইপ থাকিলেই প্রেস চলিতে পারিবে। আর, ছোট, বড়, মোটা, গোদা নানা প্রমাণের অক্ষর রাখা স্বল্প-ব্যয় হইবে। একটা গোদা টাইপের অভাব পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়াছি। নাগরীতে মানুষের নামের ও গ্রন্থের নামের অদ্যক্ষর গোদা টাইপে ছাপা হইতে পারে। এক্ষণে সেরূপ টাইপ অক্লেশে পাওয়া যাইবে।

এখন 'টাইপার' নির্ম্মাণ সুসাধ্য ও স্বল্পব্যয় হইবে। অচিরে অসংখ্য ইংরেজী 'টাইপার' অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে। সে সকল যন্ত্রের ইংরেজী টাইপ তুলিয়া বাঙ্গলা টাইপ বসাইতে পারা যায় কিনা, কারিকর চিন্তা করিবেন। সাধারণ টাইপারে ৮২টি টাইপ থাকে। বোধ হয় ৮২টি টাইপ দ্বারাই আবশ্যক অক্ষর ও চিহ্ন পাওয়া যাইবে।

কীর্ত্তনানন্দ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দস্যু জগাই কি জানি কেন যে হঠাৎ হইল মন—
পরিহাস-হাসি হাসিছে শুনিছে তবু সংকীর্ত্তন।
নাচে ভক্তেরা তা থেই, তা থেই, বাজে খঞ্জনী খোল,
শ্রোতৃবৃন্দ মহা আনন্দে বলে হরি হরি বোল।
জগাই ভাবিছে ভক্ত ওদের দুরাধিরোহিণী আশা
নাচিয়া গাহিয়া স্বর্গে যাইবে পন্থা পেয়েছে খাসা!
শ্রমে বীতরাগ অলসের দল নাচে দিয়া করতালি—
ক্ষুধা বাড়াইয়া শূন্য করিতে ভরা অন্নের থালি।

এটা খাঁটি কথা নয় কপটতা—কেঁদে কেঁদে পথ চাওয়া—
বলে মোর মন হৃদয়ের ধন ওপথেই যায় পাওয়া।
ভিতরে তুফান, চোখে ডাকে বান—বাধা যে মানে না আর
চাঁদের উদয়ে উতল চকোর, উথলিছে পারাবার।
একি কীর্ত্তন পুরুষে কাঁদায়ে রমণীর মত করে,
কোথা ছিল হেন রমণীর রূপ হৃদয়ের অন্দরে?
বুক কেন মোর ফাঁকা ফাঁকা লাগে? বুঝিতে পারিনে কি যে—
এই কি বিরহ? পাথারে পড়িনু পরিহাস করি নিজে।

নয়নে নিয়ত অশ্রু ঝরিছে—এইটা নূতন ঠেকে?
সকলেই কিছু আসেনি এখানে চক্ষে মরিচ মেখে।
কে ডাকে কাহারে? কোথায় ইহারা? ভগবান আছে কোথা?
করুণ ও সুরে অন্তরপুরে তবু যে জাগয়ে ব্যথা।
ওকি কাতরতা, ওকি ব্যাকুলতা! ওতো নয় অভিনয়,—
বেদনার ডাক, গাঢ় অনুরাগ বুক দেয় পরিচয়।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি এতে কি হইবে ভাল?
অজানার লাগি কি মধু যাতনা, আঁধারে এত কি আলো!

কালিন্দী জল বহিল উজান চিত উৎকণ্ঠিত
কদম্বে হ'ল কোরকোদ্গম, তমাল মুঞ্জরিত।
কোথা সে আমার কঠোর হৃদয় দেখে শুধু হাসি পায়
নামাইতে গিয়া আপনি উঠিয়া বসিনু হিন্দোলায়?
নব অনুরাগ বীজাণু পশেছে—হায় রে কপাল ভাঙা
ফাগ খেলা দেখে বিদ্রূপ করি নিজে হয়ে এনু রাঙা;
কাঁদায়, নাচায় পুলকানন্দে—খেলা করে নিয়ে মন
মনে ও বৃন্দাবনে মেশামিশি একি সংকীর্ত্তন?

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২৮

কোথা থেকে চালাবে আলাপ-আলোচনা এই হ'ল প্রশান্তর চিন্তা। ট্রেড ইউনিয়নের আপিসে যাবে কি? কিন্তু সেখানে তথাকথিত বহু নেতা আছেন—যাঁরা সঙ্ঘকে ক্ষমতাশালী করবার জন্য বাঁকা পথটিই হয়ত বেছে নিয়েছেন। হলদে চিরকুটখানা যে অঙ্ক দাবি করেছে তা একের কল্পনাপ্রসূত বলে বিশ্বাস হয় না। শুভার কাছে যাবে? সে-ও সঙ্ঘের একজন প্রভাবশালী সভ্য। বাঁকা পথের এই খবর সে হয়ত জানে না—হয়ত সমর্থন করে না এই অন্যায় নীতি। নীতির একটি অর্থই তার কাছে পরিস্ফুট। সে হ'ল সত্য। মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশার সুযোগ নিয়ে মানুষ যে স্ফীত হয়ে উঠবে এই কল্পনা তার কাছে অসহ্য। বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখলে চিরকুটখানা যথাস্থানে আছে কিনা। স্বাক্ষরহীন কাগজের দ্বারা হয়ত প্রমাণকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, তবু সঙ্ঘের নীতি যে নিষ্কলুষ নয় এটি তার সর্ব্বোত্তম নিদর্শন। প্রয়োজন হলে এটা কাজে লাগানো যাবে।

মোটর চৌধুরীর গ্যারাজে তুলে দিয়ে পায়ে হেঁটে চলল প্রশান্ত। সমান ভিত্তিতে চলুক আলাপ। মোটরে চেপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাড়ীর দুয়ারে আসার অসঙ্গতি ইতিপূর্ব্বে তাকে যথেষ্ট পীড়িত করেছে। শুভা তার সান্নিধ্য থেকে খানিকটা সরে গেছে। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল। ওর সঙ্গী বহু—আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিভিন্ন—পদমর্য্যাদার শাল-আলোয়ান গায়ে চাপিয়ে সে বৃত্তে প্রবেশ করা সুকঠিন। ওদের মনে হয়—কম সীরিয়াস—নীতি-শিথিল—পরিমিত-ভাষী তার্কিক; আর দেশের মাটিতে পা দিয়েও চেয়ে থাকে দূর বিদেশের বর্ণময় আকাশে। সে আকাশের যে ভাষা ইথার-তরঙ্গে এ আকাশের গায়ে আখর ফোটাতে পারে স্পষ্ট দ্যুতিময় অক্ষরে—নিখিলের দুঃখ-দুর্দ্দশার ভাষা তবু···

আপাতত সে শুভার বাসায় পৌঁছে গেল। সেই নড়বড়ে সিঁড়ি—সেই আলো-বায়ুবঞ্চিত বন্দী-নিবাস। মন বিমুখ করা পরিবেশ। বুকের মাঝখানে হৃৎপিণ্ডটা অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠবার পরিশ্রম, না বহুদিন পরে আসার সঙ্কোচ, না অবাধ্য রক্তের মধ্যে একান্ত আত্মীয়-তার স্বাদলোলুপতা—বাস্তব-স্বপ্নে-মেশানো অদ্ভুত মনোময় আবেগে খানিকটা দুর্ব্বল আর খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়ল প্রশান্ত। মাঝপথে এক মুহূর্ত্ত সে থামলে—শুধু মুহূর্ত্তমাত্র—তারপর সবলে বৃত্তির গতিপথ ফিরিয়ে বাকি ক'টা ধাপ অনায়াসে অতিক্রম করলে।

ঘর থেকে বেরুচ্ছিলেন শুভার মা—তাঁর সঙ্গেই মুখোমুখি দেখা।

শুভার মা আনন্দ-মেশানো দুঃখ প্রকাশ করলেন, আর আস না কেন প্রশান্ত! তোমার কথা প্রায়ই মনে হয় আমাদের।

একটু হেসে কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিটাকে সে সহজ করে নিলে। বাহ্যত এটা ত্রুটিস্বীকার।

শুভার মা বললেন, বস। শুভা এইমাত্র বেরিয়ে গেল। না না, তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকারী কথা আছে যে। তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য এইমাত্র আমি প্রার্থনা করছিলাম। ভগবান আমার কথা শুনেছেন।

অগত্যা বসতে হ'ল। শুভার মা ভূমিকা বাড়ালেন না। বললেন, শ' দুই টাকার বিশেষ দরকার যে বাবা। শোন নি বোধ হয় মাসখানেক হ'ল শাশুড়ী ঠাকরুণ গত হয়েছেন। তাঁর শ্রাদ্ধের দরুন আর ছেলেমেয়ে দুটোর আট মাসের মাইনেতে বেশ কিছু অভাব বোধ হচ্ছে। আর জানই তো সংসারের খরচ আজকালকার দিনে—যে চালায় সে-ই জানে এর মর্ম্ম।

বুকপকেটে হাত দিয়ে নোটের বাণ্ডিলটা সে অনুভব করলে—কিন্তু এঁদের অভাবগ্রস্ত সংসারের দায় মিটানোর গরজ কি তার! যে সম্বন্ধ মধুর হতে পারত—অন্তরের সূত্রে অভিন্ন হতে পারত—তা ঘটনার স্রোতে হ'ল ভিন্নমুখী। এ আকাশ একদিন তারই ছিল অথচ এখানে স্বপ্ন-বিহার করার দুর্ব্বলতা আজ তার নাই। আশ্চর্য্য—হাত গুটিয়ে না নিয়ে নোটের বাণ্ডিলটা নিঃশব্দে সে টেনে নিলে। গুনলে না কত টাকা আছে—তেমনি নিঃশব্দে শুভার মায়ের দিকে হাত-খানি বাড়িয়ে বললে, নিন—

শুভার মা-র কোটরগত চক্ষু উজ্জ্বল বোধ হ'ল। অশ্রুতে চকচকে—প্রাপ্তির আনন্দে চকচকে—দায়মুক্তির আশ্বাসে চকচকে। বললেন, তাই তো বলি ভগবান আছেন। নইলে আমাদের অভাব বুঝে তোমাকেই বা পাঠাবেন কেন আজ—আর ঠিক দু'শো টাকা—

দু'শো নয়—আরও বেশি আছে।

আরও বেশি! কিন্তু আর বেশি তো আমার দরকার নেই বাবা।

রেখে দিন—কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না।

শুভার মা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, হায়রে—হতভাগী তবু তুই ঘুরছিস টো টো করে! তোর বন্ধুবান্ধব—তোর সভা,

বক্তৃতা তোকে কি স্বর্গে নিয়ে যাবে। শোন বাবা—তুমি ওর কোন কথা শুনো না—ওকে জোর করে এ সব ছাড়িয়ে দাও।

আমার কথা শুনবেন কেন উনি!

না, শুনবেন না। শুভার মা উত্তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন। একশো বা'র শুনবে। তুমি ওকে যথেষ্ট ভালবাস আমি জানি। আর ও তোমাকে ভালবাসে। যথার্থ ভালবাসে। না হলে—

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। রক্ত আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে—হৃৎপিণ্ড আঘাত হানছে বুকে। ধ্বক্-ধ্বক্-ধ্বক্। এই বর্ণলেশহীন আকাশ—এই আকাশেই স্বপ্নের ফুল ফুটতে সুরু হ'ল বুঝি!

হালো—কমরেড—রেসের ঘোড়ার মত চলেছ কোথায়? চল—চল—

উঠে এসে বসতে হ'ল ঘরে। অন্ধকার ঘর, মনের ভাব-তরঙ্গ মুখের আয়নাকে কোন চিহ্ন ফুটিয়ে তুলবার ফুরসত পায় না। বেশ নিরঙ্কুশ কণ্ঠেই আলাপ চালানো যায়।

তোমার কাছেই নালিশ আছে আমার—প্রশান্ত সহজ কণ্ঠে বললে।

শুভা খিল খিল করে হেসে বললে, রক্ষে কর কমরেড—সারা পৃথিবীটাই নালিশে ভরে রয়েছে—কোনটা রেখে কোনটা শুনব। আর নিজেকে যোগ্য মনে করি না—নালিশ শোনবার যোগ্যতা থাকা চাই তো।

ঠাট্টা নয়—সত্যি আমার কিছু বলবার আছে।—প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে।

শুভা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, বেশ বল—কিন্তু সংক্ষেপে।

জানি, তোমার সময়ের দাম আছে। প্রশান্তর কণ্ঠে পরিহাসের প্রচ্ছন্ন আভাস।

শুভা বললে, আমি ক্লান্ত। এইমাত্র একজনের সঙ্গে তর্ক করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

ক্লান্ত? আচ্ছা সংক্ষেপেই বলছি।

সমস্ত শুনে শুভা বললে, আমি কি করতে পারি।

তুমি কিংবা তোমরা যেই হোক—ওদের বুঝিয়ে—

পেট কাঁদলে, না ধর্ম্ম না যুক্তি কিছুতেই কেউ বোঝে কি কমরেড।

তবু দাবি ন্যায্য কি অন্যায্য—

সবটাই ন্যায্য যাদের পরনে নেই কাপড়—পেটে নেই অন্ন।

তর্ক করে লাভ নেই—দাবির যতখানি মেটানো যায় সেই চেষ্টা করতে হবে আমাদের।

আলোচনা মীমাংসার পথে গেল না। প্রশান্ত উষ্ণ হয়ে বললে, সত্যি বলতে কি—এ তোমরা ওদের কথা বলছ না—তোমাদের জিদ বজায় রাখছ।

তাতে আমাদের লাভ?

লাভ? লাভ এই—মাস মুভমেন্ট জাগিয়ে তোমরা নেতা-গিরি করতে চাও। এই হচ্ছে তোমাদের সঙ্ঘের পা'বলিসিটি

রেগে উঠছ কেন প্রশান্ত, গাল দিলেই কিছু যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করা যায় না।

শুভার নিরুত্তাপ কণ্ঠে প্রশান্ত বেশি মাত্রায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বলল, তোমরা যে সাধু নও—তার প্রমাণ আমার কাছেই আছে। এই দেখ—

হলদে চিরকুটখানা সে শুভার কোলে ছুড়ে দিয়ে বললে, আশা করি এ লেখা সনাক্ত করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে না।

শুভা বললে, আচ্ছা বস—আলোটা জ্বালি।

না—বসব না। কাল সকালে আমি আসব

মা কিন্তু দুঃখ করবেন।

প্রশান্ত প্রত্যুত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিকটা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে গোলদীঘিতে এসে বসল। দুপুরে লোক চলাচল কম থাকে—তবু শহর স্ফীত হয়েছে আগেকার চেয়ে। ট্রামের ফুটবোর্ডে লোক ঝুলছে—বাসের সর্ব্বাঙ্গে মানুষ। রাজপথে সশস্ত্র পাহারার ঘটা বিশেষ করে চোখে পড়ল। সিনেট হলে কোন সভা আছে? কোথাও কি উত্তেজনার কারণ ঘটেছে? আশ্চর্য্য কিছু নয়। যুদ্ধের উষ্ণতা হ্রাস হলেও—উত্তাপ বেড়ে উঠেছে পৃথিবীতে। দু'হাতে সঞ্চয় করে যারা উপরে উঠল—তারা নাগালের বাইরে—যারা নীচেয় রইল তারা মানুষের শ্রেণী থেকে নেমে পড়েছে—মাঝখানে কিছু নেই। প্রাসাদ-তোরণে নিপতিত ক্ষুধা-নিষ্পিষ্ট ভারবাহীর প্রাণহীন দেহ—প্রাসাদ-অলিন্দ-বিহারীর মনে একটুও তুফান তুলছে না। তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ মানুষকে এমনি উদাসীন করেছে—তার অন্তর থেকে লোপ করে দিয়েছে কোমল অংশ।

হঠাৎ জনস্রোত সুরু হ'ল—ঝড়ের আগেকার আকাশ নিঃশেষে টেনে নিল বায়ুকে। দূরে বহু কণ্ঠের চীৎকার মিছিল আসছে—ক্ষুধা মিছিল।

এ জিনিস নূতন নয়—অভাবনীয় নয়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এ রকমের বহু প্রাতিদিনের ঘটনা সাধারণ জীবনযাত্রার যানের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে গেছে।

সারি দিয়ে লোক চলেছে—নানা জাতি—নানা ধর্ম্মের লোক—গোটা ভারতবর্ষ মিশেছে কলকাতার রাজপথে। হাতে হাত মিলিয়ে যেতে যেতে চেঁচাচ্ছে অপরিমিত। ধ্বংস হোক—ধ্বংস হোক পুরাতন সব কিছু। কায়েমি স্বার্থের প্রাচীর-ঘেরা পৃথিবী জীর্ণ হয়ে এসেছে—জীর্ণ হয়েছে তার

আচারগত মানবীয় বৃত্তি—সুপ্রাচীন আর্য্যামির গৌরবভার বহন করতে পারছে না তথাকথিত সভ্যতা। ধ্বংস হোক—সব কিছু ধ্বংস হোক। মুছে যাক শ্লেটের পুরাতন লেখা—আভিজাত্য সংস্কৃতি হোক লুপ্ত—বর্ণাভিমান যাক মুছে—কমলা আবার ফিরে যান সিন্ধুপুরীর মণিময় হর্ম্ম্যে।

প্রশান্ত মুখ ফিরিয়ে নিলে। বড় বেশি উদ্ধত—বড় বেশি প্রগল্‌ভ মনে হ'ল। সৃষ্টিকে নস্যাৎ করে দেবার দুঃসাহসে বড় বেশি আত্মপ্রত্যয়শীল। সৃষ্টি কিছু শৃঙ্খলিত হয়ে পৃথিবী আশ্রয় করে নি—ক্রমবিকাশে গড়ে উঠেছে বিরাট সভ্যতা। একক মানবগোষ্ঠী আনুগত্য মেনে নিয়েছে—একনায়কত্ব—পশুহনন বৃত্তি থেকে উন্নীত হয়েছে কৃষিধর্ম্মে—গুহা থেকে এসেছে কুটীরে—বর্ব্বরবৃত্তিকে শৃঙ্খলিত করে দীক্ষা নিয়েছে মানবীয় ধর্ম্মে। এ তার এক দিনের খেয়াল নয়—এক যুগের সাধনা নয়—এক শতাব্দীর সঞ্চয়ও নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খাদ বার হয়েছে—সংস্কার হয়েছে বার বার—রাজা রাজা—রাজসিংহাসন নিয়ে কত না পরীক্ষা হয়েছে বারংবার। কেউ কি শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলবার দুঃসাহস করেছে বিশাল মহীরুহকে। তা হয় না। কাণ্ডে নসে মূলে কুঠারাঘাত করা—আর—

দ্রুম্—দ্রুম্—দ্রুম্। দেবদারুর ডালে ডালে অসংখ্য কাক কা কা শব্দে ডানা ঝাপটে উঠল। বন্দুকের শব্দে ওরা এমনি কোলাহল করে। পথেও কোলাহল তীব্র হয়ে উঠল। দু'ধারের জনতা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। অগ্রগামী মিছিল থেকে চীৎকার উঠছে—ধ্বংস হোক—ধ্বংস হোক। ব্যাপার কি? একশ চুয়াল্লিশ ধারা বলবৎ, ওরা নিয়ম ভঙ্গ করেছে। ওদের সাবধান করা সত্ত্বেও নিষেধ মানে নি—অতএব আইন রক্ষার ভার নিয়েছেন সরকার।

লোক ছুটছে মিছিলের বিপরীত দিকে—মিছিলের অভিমুখে। বন্দুকের শব্দ—শোভাযাত্রীদের বিক্ষোভকে তীব্র করে তুলছে—অসহায় ক্রোধ মুহুর্মুহু চীৎকারে শাসনতন্ত্রকে ধিক্কার দিচ্ছে—সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুকামনা করছে।

আরও কয়েকটা বোমা ফাটল। প্রচুর ধোঁয়া আর দম-আটকানো একটা তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বায়ুস্তরে। নাক মুখ চোখ জ্বালা করতে লাগল।

সরে আসুন—সরে আসুন—কাঁদানে গ্যাস ছেড়েছে—সরে আসুন।

এখানে বসবেন না—এখনই সান্ধ্য আইন জারী হবে। বাড়ী যান। আরে মশাই ধর্ম্মতলার ব্যাপারটা ভুলে গেলেন! রামেশ্বর বাঁড়ুজ্যে কেন মরেছিল জানেন?

পিছু হটতে হটতে প্রশান্ত কখন গোলদীঘির বাইরে এসেছে। এধারের রাস্তাটি নির্জ্জন। বৌদ্ধ বিহারের গা দিয়ে একটা বাঁকা গলি বেরিয়েছে। সেটার মধ্য দিয়ে ওপারে হ্যারিসন রোড বা এধারে ঘুরে মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পড়া যায়। তার পুরাতন মেসে যাবার পথ ওটা। বহুদিন এ পথে আসে নি। মেসে দুই একজন পরিচিত আছে—তাদের সঙ্গে আলাপ করে যাবার আগ্রহ হ'ল প্রশান্তর। আইন থেকে সাময়িক ভাবে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা কিনা কে জানে।

হ্যালো—কি খবর?

বলছি।

সুশীলের বিছানার ওপর বসে পড়ে প্রশান্ত বললে, এক গ্লাস জল খাওয়া দেখি।

শুধু জল। অস্ফুটে উচ্চারণ করে সুশীল বললে, তা ছাড়া আর কিই বা আছে। দোকানপাট এতক্ষণে হয়ত বন্ধ হয়ে গেল।

জলপান করে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, এত শীঘ্র যে আপিসের ছুটি হ'ল?

আপিস! সুশীল হাসলে, যোলই আগষ্টের পর থেকে নিয়মকানুন ঢিলে হয়েছে। এক শ চুয়াল্লিশ ধারার ওপর কারফিউ অর্ডার—এ তো লেগেই আছে; সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত্রি সব সময়ে। যাই হোক—অনেক দিন পরে দেখা—প্রাণভরে গল্প করা যাবে'খন।

আমাকে এখনই যেতে হবে।

সুশীল হাসলে, যাবে? রাস্তার এপিঠ ওপিঠ দু'পিঠে আঠার ঘণ্টা কারফিউ। কাল বেলা এগারটা পর্য্যন্ত এই জেলখানাতেই—হাসিটা ওর উচ্চ হয়ে উঠল।

প্রশান্ত পাংশুমুখে বললে, আমার যে ফিরতেই হবে। বিশেষ জরুরি কাজ—

গল্পের চেয়ে জরুরি কাজ আপাতত নেই। বস ভাল হয়ে।

...গল্পের স্রোতে চিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল। সুশীল প্রধানমন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণার কথা তুললে। লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ তার প্রতিশ্রুতির আন্তরিকতা প্রমাণ করে নি কি? কিন্তু এই ঘোষণায় ভারত-সমস্যায় আর একটি যেন গ্রন্থি পড়ল। কার হাতে ক্ষমতা দিয়ে ভারত ত্যাগ করবে ওরা? অগ্রগামী একটি দল—অনুমান করা যায় কংগ্রেস—তারাই ক্ষমতা পাবে। সম্পূর্ণ ক্ষমতা অবশ্য নয়। লীগ-শাসিত প্রদেশ আছে—তাদের অনিচ্ছায় মূল অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে না। আছেন ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ। তাঁরা প্রতিশ্রুতি পালনের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত হয়ত প্রতীক্ষা করবেন। তাঁরা স্ব-স্ব স্বার্থ অনুযায়ী যদি অনিচ্ছুক হন—কেউ তাঁদের বাধ্য করতে পারবে না প্রধান অংশের অঙ্গীভূত হতে। এই সব গ্রন্থি ক্রমাগতই পড়ছে। সম্প্রতি পঞ্জাবে খিজির মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে—তিরানব্বুই ধারায় শাসন চলছে। উনিশ শ আটচল্লিশের আগে যাতে পুরোপুরি

পাকিস্থানী সাম্রাজ্যভুক্ত হতে পারে পঞ্জাব, তারই আয়োজন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সারা পঞ্জাবে আগুন জ্বলছে। সীমান্ত প্রদেশ আর আসামেও আগুন জ্বালাবার ইন্ধন সংগৃহীত হচ্ছে। সিন্ধু তো ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র লীগশাসিত প্রদেশ বলে উনিশ শ আটচল্লিশের জুলাই থেকে স্বাধীনতালাভ করবে এই আশা ব্যক্ত করেছে। বাংলা দু'ভাগে বিভক্ত হবার জন্য রব তুলেছে। ফেব্রুয়ারির ঘোষণার ক্রিয়া সুদূরপ্রসারী বলেই মনে হচ্ছে। অছিগিরির চেষ্টা না থাকলেও—ভারতের মাটিতে অনেকখানি আশ্রয় যেন এই সব প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেই কায়েম হবার আশা রাখে। ভারতের মহাসাগরে—আর ভারতের মাটিতে—দু-একটি শক্ত শিকড় নামিয়ে ওরা কি আমেরিকা ও সোভিয়েট প্রতিদ্বন্দ্বিতার পূর্ণ পরিণতির দিন গুণবে না? ইতিমধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন আসছেন। ঘোষিত হয়েছে তিনি ভারতের শেষ বড়লাট। ক্ষমতা যাতে শৃঙ্খলায় হস্তান্তরিত হয় তারই চেষ্টা তিনি করবেন। তবু একথা স্বীকার করতে হবেই—ক্ষমতালাভের আশাতেই হোক কিম্বা ভারতের দুর্ভাগ্য বলেই হোক—শৃঙ্খলা আজ কোথাও নেই। হিমালয়ের শীর্ষ থেকে কন্যাকুমারিকার অগ্রবিন্দু পর্যান্ত বিপ্লবের বজ্রঝঙ্কারে মুহুর্মুহু কাঁপছে।

২৯

সুশীল খেয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে।

প্রশান্ত বললে, আচ্ছা ঘুরে এখানেই আসব। কাজটা মিটিয়ে নিই—যে তোমাদের শহর, কখন কি আইন জারি হয়!

শুভাদের বাসায় এসে শুভার দেখা পেলে না—উলটে নূতন দুর্ভাবনা মাথায় চাপল। ওর মা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কাল নাকি শহরে ভারি হাঙ্গাম গেছে বাবা—শুভা সেই যে তোমার সঙ্গে বেরুল আর ফেরে নি? সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারি নি। বুড়ো বয়সে আর কত সহ্য হয় বল ত। উনি কেঁদে ফেললেন।

কি সান্ত্বনা দেবে—প্রশান্ত চুপ করে রইল। মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে নেন্টু আর খুকী। সেই রুগ্ন ছেলেটি আর সজীব মেয়েটি। মেয়েটির মুখখানি অত্যন্ত ম্লান। চোখে মুখে ওর পর্য্যাপ্ত প্রাণশক্তির আভাস—একটু আশ্বাসে—সামান্য স্নেহে আদরে আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ঝড়ের রাত্রি—পরে প্রভাত এলেও সূর্য্যোদয় হয় নি—শাখা-চ্যুত লতা মাটিতে লুটিয়ে আছে আধশুকনো পাতার ভারে। প্রশান্ত তাকেই ডাকলে কাছে—মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর জানালে। বললে—কি খুকী—একটু জল খাওয়াবে?

আশ্বাস নয়, অথচ এই কথাতেই মেয়েটি উৎফুল্ল হয়ে ঘাড় নেড়ে হেসে উঠল···আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে গেল।

শুভার মা বললেন—বস বাবা।

প্রশান্ত বললে—আমি একবার খোঁজ করে দেখি—

একটু বোস—আমি আসছি···

ঘরের কোণে একটা হারিকেন জ্বলছিল। হারিকেনের সামনে বইখাতা ছড়ান দেখে মনে হয়—ছেলেরা লেখাপড়া করছিল। মা চলে যেতে ছেলেটি সেখানে দাঁড়ায় নি। যেমন দুর্ব্বল ওর দেহ—তেমনি মনটিও হয়ত ভীরু—অপরিচিতের সান্নিধ্য এই ধরণের লাজুক ছেলেরা সহ্য করতে পারে না।

অন্যমনস্কে একখানা খাতা সে টেনে নিলে। খাতার ভিতর থেকে মনিঅর্ডার কুপনের চিলতে কাগজটুকু ওর কোলের উপর খসে পড়ল। মনে কৌতূহল না জাগলেও চোখের ধর্ম্ম পালন করলে চোখ। বেশ গোটা হরপে স্পষ্ট লেখা দু'লাইন সে অনায়াসে পড়ে ফেললে।

পঞ্চাশ টাকা পাঠালাম। পৌঁছান সংবাদ দিও। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। ইতি—

অবন্তী

মীরাট থেকে টাকা পাঠিয়েছে অবন্তী। নূতন চাকরী—মাইনে এমন বেশি কিছু নয়—আর সংসারে তার পোষ্য-সংখ্যাও কম নয়। তবু ওঁদের অভাব না মিটিয়ে—কোন্ সুবাদে শুভাকে সে টাকা পাঠালে। কোন্ সুবাদে! মন আলোড়িত হয়ে উঠল। ঝড় কিংবা মনোজগতের বিপ্লব বলা যায় একে। জ্ঞানের ক্ষেত্রটি ভূমিকম্পে ধরিত্রীর মত টলমল করছে—বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে মস্তিষ্কক্ষেত্রে ঘনিয়ে এল কুয়াশা। ঈর্ষা অথবা অভিমান—অথবা দুঃখ ক্ষোভ মেশানো অস্বস্তি—কানের ডগা আর গণ্ডদেশ লেহন করছে মৃদু আগুনের শিখা। অন্ধকার পথে চলতে চলতে হঠাৎ দূরে দেখা গেল প্রদীপ। চোখে তার আলোয় জাগছে বিভ্রম—তবু স্পষ্ট হ'ল অনেক রহস্য।

আনমনে সে অন্য বইগুলি ঘাটতে লাগল। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে—উচিত-অনুচিত বোধ থাকে না—মনও থাকে না সজাগ, নইলে লণ্ঠনের আলোয় সে দেখতে পেত, ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে শুভা মৃদু মৃদু হাসছে।

শুভা অবশেষে বললে—আর কিছু পাবে না কমরেড, মিথ্যে বইখাতা ঘাঁটছ।

চমকে সে মুখ তুললে। মুখ তার পাংশু হয়ে গেল। বিবেক তার ভদ্রতার ত্রুটিতে চোখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে উঠল। মাথা নামিয়ে সে অন্যদিকে চাইলে অপরাধীর মত।

শুভা সরে এসে বললে—না না, অন্যায় কিছু কর নি। যে জিনিসে স্বত্ব তোমার স্থির করেই নিয়েছ—সে তো একান্ত করে তোমারই।

প্রশান্ত সবেগে মুখ ফিরিয়ে বললে, তার মানে?

মানে আমি জানি না—মা জানেন। হাসতে হাসতে জবাব দিলে শুভা।

প্রশান্ত বললে, তুমিও জান—কেবল স্বীকার করতে ভয় পাও।

ভয়—তা হবে। শুভা এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে। ওসব কথা, কাটাকাটি এখন থাক কমরেড—তোমাদের সর্ত-গুলি আমি পড়েছি—পড়ে ভেবেছিও।

সর্তের কথা পরে হবে—

আমার ধারণা ছিল—তোমার মিলের ব্যাপার নিয়ে তুমি অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করছ।

হাঁ—অনেক রকমের অশান্তি আমার—অস্বীকার করব না—কিন্তু তোমাকে যা বলবার—

শুভা বসে পড়ল তার পাশে। মৃদু শান্ত গলায় বললে—তোমার কথা আমি জানি। কোন অনাত্মীয় পুরুষ যখন কোন অনাত্মীয় মেয়ের কাছে একান্ত করে তার অন্তরের কিছু বলতে চায়—তখন তার অর্থ অতি নির্বোধ মেয়েরাও অনায়াসে বুঝতে পারে।

শুভা, তোমার মন বলে কোন বস্তু কি নেই? প্রশান্তর কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হ'ল।

শুভা হেসে বললে, মনের বালাই না থাকাই ভাল। একটা মাত্র মন—অবজ্ঞা টিকা পাঠিয়ে—তুমি অর্থসাহায্য করে—দশ প্রাণ বাঁচানোর দায়িত্বটা বহন করে তার প্রতি বেশি করে কৃতজ্ঞ হব বল।

প্রশান্ত কি বলতে যাচ্ছিল—হাত উঠিয়ে শুভা তাকে নিরস্ত করলে। কাছে এসে এইটুকু কি বোঝ নি—মতে আমরা ভিন্ন—পথও আমাদের এক নয়। তুমি চাও দাক্ষিণ্য বন্টন করতে—টাকা দিয়ে হোক, মিষ্টি কথা বা ব্যবহার দিয়ে হোক কিংবা জীবনপাত করেও দুর্গতদের ভাল করতে চাও। এ দুঃখ খানিকটা ওপরে ওঠার ব্যাপার। আর আমরা চাই—যারা কাদায় পড়ে লুটুচ্ছে তাদের হাত ধরে কাদা মেখে তাদের দুর্গতির অংশ নিতে। তোমার আমার মিলবার সাঁকো কোথায় কমরেড?

না শুভা—

চুপ—অসম্মান যথেষ্ট করেছ তাও সয়েছি অসম্মানকে অস্বীকার করার জোরে—কিন্তু অসত্যকে মানব না বলছি।

আমি তোমায় অসম্মান করেছি!

কর নি? কেন দু'শ টাকার বদলে মাকে বেশি টাকা দিয়েছ। আমার দুঃখ দূর করতে তোমার এত আগ্রহ কেন? পৃথিবীতে দুঃখী মানুষ আর তোমার চোখে পড়ল না।

শুভার কণ্ঠস্বর শুষ্ক—দৃঢ়। ও কি রুদ্ধ হ'ল! প্রশান্তর কি দোষ—মন যেখানে আত্মীয়তার সূত্রজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে—সেখানকার তুচ্ছ দুঃখকষ্টে বিচলিত হয়ে পড়া কি এমনই অস্বাভাবিক? পৃথিবীতে দুঃখী যথেষ্ট আছে—মনের সঙ্গে তাদের দুঃখ যুক্ত নয় বলেই তো নরম হবার অবকাশ আসে না। বড় পৃথিবীতে মানুষ অত্যন্ত ছোট—যে পৃথিবী বাইরের। কিন্তু কতকগুলি স্নেহ মমতা দিয়ে সেই ছোট মানুষ যে দুনিয়া তৈরি করে তাও কি খণ্ডিত নয়—ক্ষুদ্র নয় অথচ সে মানুষ নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তখন তো আর ছোট থাকে না। সে হয় বৃহৎ—সে তখন অদ্বিতীয়।

শুভা বলতে লাগল, দেখ, তোমার ভিত্তি না প্রশান্ত—জগৎটাই এমনি ভাবে তৈরি। বহুকাল থেকে যা দেখে আসছি, যা শিখে আসছি—সংস্কারের দাস, কি সংস্কৃতির আলো—স্বর্গ কিংবা ঈশ্বর—ভালবাসা আর পরদুঃখমোচনের চেষ্টা এ সব যে সৃষ্টিগত উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে দৃষ্টিকে আর মনকে অমনি করেই তৈরি করেছে। সবাই বলে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে কিন্তু মানুষ মিলতে পারছে না তবু। ছোট বড় নতুন কোলাহল করলে আমরা সৃষ্টি থেকে কি মুছে যাব না আমরাও।

প্রশান্ত একদৃষ্টে সামনে চেয়েছিল। শুভার সব কথা ওর শ্রুতিস্পর্শ না করলেও তার আবেগ-গাঢ় স্বর ওর মনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সে যেন বলছে—বাইরেটা জগতের সব নয়। মানুষের তো নয়ই। এই বিশ্বসংসারের ভার তোমার আমার সকলের। সংস্কার করতে বিলম্ব হয়—রচনা কর নূতন করে। চিরাচরিত প্রথায়, নীতিতে, বিশ্বাসে, মিথ্যাশ্রিত সত্যে আঘাত লাগবে। প্রচণ্ড আঘাত। তবু এগিয়ে চল। এগিয়ে চল।

অবশ্য এ ধ্বনি ক্ষীণ, আর অবিরাম নয়। মাঝে মাঝে মনের পর্দায় বাতাসের বেগে বেজে উঠছে। গভীর নয় বলেই কেন্দ্র-লগ্ন হতে পারছে না।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন মানসে ও বললে, আমার সর্ত সব পড়েছ আর ভেবেছ বললে। সত্যিই কি সেগুলি স্বীকার কর না?

শুভা ওর মনোভাব বুঝলে। সহজ কণ্ঠে বললে, সব-গুলোর কথা নিয়ে আলোচনা করব আর একদিন—আজ একটি কথা শুধু তুলব। তুমি বলেছ—আমাদের দেশে শ্রমিকদের সততা কম। তারা মজুরি বাড়িয়ে নেয় কিন্তু কাজে ফাঁকি দিতে কসুর করে না। এই ধীরপন্থা নীতিতে নাকি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—মানুষের দুঃখ ঘুচছে না।

অস্বীকার কর এ কথা? প্রশান্ত উদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

না, বরং স্বীকার করে নিচ্ছি তোমার অভিযোগ। কিন্তু প্রতিবাদ আমার এইখানেই যে, দোষ একলা শ্রমিকদের নয়।

মানে ধর্মঘট না হলে—

একে একে তোমার কথার জবাব দেব প্রশান্ত। শিল্প উৎপাদন কমানোর জন্যে দায়ী একলা শ্রমিক নয়—মালিকও।

কিসে।

কেন—জিনিসের বাজারদর যাতে চড়া থাকে, মুনাফা যাতে বাড়ে তেমন কৌশলের কথা কোন দিন কোথাও পড় নি—কি তোমার মনে হয় নি? বেশি দিনের কথা নয়, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে বাংলায় যখন লক্ষ লক্ষ লোক মরছিল—যুদ্ধরত ইউরোপের যখন নাভিশ্বাস উঠেছিল—তখন আমেরিকা কত লক্ষ মণ খাদ্য-শস্য নষ্ট করে ফেলেছিল বাজারদর চড়া রাখতে—সে খবর নিশ্চয় রাখ। শোন—শিল্পের ক্ষেত্রেও এমন অসাধুতার দৃষ্টান্ত বহু আছে। ধনিকের ধারাই হ'ল—নিজেদের পুষ্টিসাধন।

কিন্তু—

ধর্মঘট করে দুঃখী মানুষের লাভ কতটুকু প্রশান্ত! একান্ত নিরুপায় হয়েই শেষ অস্ত্র হিসাবে—

না—ওদের ক্ষেপিয়ে যখন ধর্মঘট ঘোষণা করা একজাতীয় নেতাদের পেশা। তাতেই তাদের নেতাগিরি টিকে আছে।

বেশ ত সেই নেতাগিরিতে আঘাত দাও না। ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিলে সমাজ সুস্থ থাকে না।

আঘাত দেব কি করে—তারা যে বর্ণচোরা। যাদের ক্ষেপানো হয়, তাদের হিংসাকে, তাদের ধর্মমতকে, এমন কি তাদের সব রকমের দুর্বলতাকে অস্ত্রের মত ব্যবহার করতে এরা যে পটু!—কাল যে চিরকুটখানা তোমায় দিয়েছি—

ওটা যে তোমাদেরই সৃষ্টি নয়—

হাতের লেখাটা সনাক্ত করা শক্ত নয়। আর সেটা তুমি চেষ্টা করলেই পারবে।

চেষ্টা করব কমরেড। শুভা হাসল।

তার আগে ধর্মঘটের যে গুজব শোনা যাচ্ছে।

গুজবে বিশ্বাস করো না। যারা দুর্বল তারা মুখে একটুও আস্ফালন করবে না এ কেমন করে আশা কর কমরেড।

প্রশান্ত উঠবার ভঙ্গি করে বললে, কাল আসব কি?

সুবিধে হয় আসবে—না হয় চিঠি লিখে জানাব।

সিঁড়িতে নামবার মুখে শুভা বললে, একটা ত্রুটি স্বীকার করে রাখি কমরেড। তোমার টাকাটা আপাতত ফিরিয়ে দিতে পারছি না। তুমি হয়ত বলবে—যদি আত্মসম্মানে বাধল তো ও জিনিষ নেওয়া কেন! আমার উত্তর—অবস্থার চাপ। ওটা আত্মসাৎ করব না—ফিরিয়ে দেব—তবে বিনা সুদে।

প্রশান্ত আরক্ত মুখে বললে, তোমার এ আঘাতও স্বীকার করে নিলাম শুভা।

আর কোন কথা না বলে সে সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে নেমে গেল। ক্রমশঃ

বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বর

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

লৌকিক স্বর দেশী স্বর হিসাবেই পরিচিত। দেশী-সঙ্গীতকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ্‌রা 'folk song' বলেছেন। ডাঃ পারি (C. Hubert H. Parry) বলেছেন: 'Folk-tunes are the first essays made by man in distributing his notes so as to express his feelings in terms of design. * * Folk-music supplies an epitome of the principles upon which musical art is founded; * *'[১] রাশিয়ান সঙ্গীতবিৎ ক্যাল্‌ভোকোরেশী (M. D. Calvocoressi)-ও স্বীকার করেছেন, রাশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত বেশীর ভাগ তখনকার সময়ে প্রচলিত দেশী আর গ্রীস, রোম, আরব সঙ্গীতের কাছ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করেছিল: 'Russian national music owes much to the influence of native folk music, and also of Eastern music.'[২] রাণী এলিজাবেথের সময়ে (১৭৪১-১৭৫১ খ্রীঃ) ইউরোপের দেশী-সঙ্গীতের পাশে ইতালীয় দেশী সঙ্গীতও বিকাশলাভ করেছিল। এডোয়ার্ড ম্যাক্‌ডাওয়েল (E. Macdowell) বলেছেন: মধ্যযুগীয় গির্জায় প্রার্থনা-সঙ্গীতের সময় দেশী-সঙ্গীতই সর্বদা গাওয়া হ'ত।[৩] ক্রোয়েষ্ট (F. J. Crowest) ও পার্সি বাক্ (Percy C. Back) দেশী সঙ্গীতের আগে বাদ্যের তথা বাদ্যযুগের ('drum age') প্রচলনের কথা বলেছেন।[৪] কিন্তু আমাদের মনে হয়, কণ্ঠ ও বাদ্য তথা যন্ত্রসঙ্গীতের ভেতর কোন্‌টা প্রথমে বিকাশলাভ করেছিল তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন; কেননা প্রাচীন যন্ত্র ও বাদ্য যেমন শঙ্খ, বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, ভেরী, দুন্দুভি, শততন্ত্রী, সহস্রতন্ত্রী এসবের উপযোগিতা তখনি আসে যখনি স্বর ও সুরের সমবেত রূপ কণ্ঠে প্রকাশিত না হলেও মানুষের মনে সূক্ষ্ম আকারে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কাজেই উন্নত বিধিবদ্ধ রুচিকর মার্গ-সঙ্গীতের উৎপত্তি গোড়াকার দিকে না হলেও দেশীর আওতায় সাধারণতঃ সঙ্গীতই ছিল কণ্ঠ, যন্ত্র ও বাদ্যের সংমিশ্রণ রূপ।[৫]

১। *The Art of Music* (1923), পৃঃ ৮০ ৮১ দ্রঃ

২। *A Survey of Russian Music* (1944), পৃঃ ১১ দ্রঃ

৩। *Critical and Historical Essays*, পৃঃ ১৬ দ্রঃ

৪। Crowest: *The Story of Music*, পৃঃ ১৩; Back: *A History of Music*, পৃঃ ১৫ দ্রঃ

৫। মিঃ ক্রোয়েষ্ট আবার বলেছেন: 'Instrumental music

সামিক যুগের গানকে সাধারণতঃ আমরা 'সামগান' বলি। একটি মাত্র স্বর দিয়ে যে সময়ে গান গাওয়ার রীতি ছিল তখনকার নাম আর্চিক যুগ। আর্চিকের পর গাথিক যুগ। সে সময়ে দু'স্বরের গান গাওয়া হ'ত। সামিকে তিন স্বর দিয়ে গান গাওয়ার রীতি ছিল। সামিক অথবা সামগানে তিনটি স্বরের প্রচলন থাকলেও তিনটির বেশী স্বরও যে ব্যবহার হত তার প্রমাণ আমরা সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পসূত্রে ও নারদীশিক্ষায় পেয়ে থাকি। পুষ্পসূত্রকার পুষ্পর্ষি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন : শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন সামগানের প্রচলন বৈদিক সমাজে ছিল ও সেই সব গানে তিন, চার, পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরের ব্যবহার ছিল। কাজেই শ্রেণী বা পঙ্‌ক্তি হিসাবে সামিক গান ও সামগানকে আমাদের আলাদা ভাবেই দেখা উচিত ; কেননা ওড়ব (পাঁচ) ষাড়ব (ছয়) ও সংপূর্ণ (সাত) স্বরের সঙ্গীত যখন সমাজের সর্বত্র প্রচলিত ছিল তখনও সাম-গানকে বৈদিক ও মাঙ্গলিক যে কোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে গাওয়া হ'ত।

বৈদিক সঙ্গীত সামগানে সাত স্বরের নাম ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, ও অতিস্বার্য। সায়ণাচার্য সামবিধান-ব্রাহ্মণ ও সামবেদের ভাষ্যভূমিকায় এদের আবার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বর বলেও উল্লেখ করেছেন। বৈদিক সামগানের পাশাপাশি দেশী ও মার্গ-সঙ্গীতের ষড়্জাদি সাত স্বরের প্রচলনও ছিল। আর্ষেয়, সামবিধান প্রভৃতি ব্রাহ্মণে অরণ্যেগেয়গান ও গ্রামেগেয়-গানের উল্লেখ থাকায় বোঝা যায়—অরণ্যেগেয়গানই ছিল বৈদিক তথা সামগান, আর গ্রামেগেয়গান ছিল উন্নত আকারে মার্গ ও গান্ধর্ব আর সাধারণভাবে দেশী-সঙ্গীত। অথবা বলা যায়, অরণ্যেগেয় থেকেই সামগান তথা নিছক বৈদিক সঙ্গীত আর গ্রামেগেয় থেকে মার্গ ও দেশী-সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছিল। ঋগ্বেদের মন্ত্র বা ছন্দের ওপর স্বরবিন্যাস করে গাওয়াতেই সাম বা সামগানের সার্থকতা। সামগান প্রধানতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদীর পাশে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণেরা গান করতেন।

সঙ্গীত-শাস্ত্রকারেরা সঙ্গীতকে দেশী ও মার্গ এই দু'ভাগে প্রধানত ভাগ করেছেন। মার্গ-সঙ্গীত বলতে তাঁরা বলেছেন : ব্রহ্মা চার বেদ থেকে অন্বেষণ করে যা ভরতাদি শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন ও পরে ভরত প্রভৃতি কলাবিদেরা আবার শিবের কাছে সাধারণ সমাজের কল্যাণের জন্যে যা প্রচার করেছিলেন তাই মার্গ—'মার্গঃ স যো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ অন্বিষ্টো ভরতাদ্যৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তোঽর্চ্য'। এই ব্রহ্মা চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা কিনা আজ পর্যন্ত তার কোন নির্ধারণ হয় নি। তবে মার্গ-সঙ্গীতের প্রচারক ব্রহ্মা যে একজন সঙ্গীত-শাস্ত্রবিৎ কৃতবিদ্য কলাকুশলী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ব্রহ্মার কাছেই, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, দত্তিল, তুম্বুরু প্রভৃতি সঙ্গীত-নায়কেরা মার্গ তথা গান্ধর্ববিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মোট কথা শিল্পাচার্য ব্রহ্মা সাম প্রভৃতি চারবেদ থেকে তন্ন তন্ন অন্বেষণ করে যে সঙ্গীত সৃষ্টি করে-ছিলেন তার নাম 'মার্গ', আর দেশে দেশে বাধানিষেধের বালাই না রেখে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে লোকে যে গান গাইত তার নাম 'দেশী'। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত সামগানের খুঁটিনাটির পরিচয় না দিলেও গান্ধর্বগানের কথা উল্লেখ করেছেন।

অনেকে মনে করেন বৈদিক সঙ্গীতের স্বরের সঙ্গে মার্গ অথবা দেশী-গানের স্বরের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তা ঠিক নয়। নারদী-শিক্ষায় নারদ 'যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ' শ্লোকগুলির নজিরে বৈদিক ও মার্গসঙ্গীতের স্বরগুলির ভেতর একটা সম্পর্ক দেখিয়েছেন। এ ধরণের কৃতিত্ব বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যেরও প্রাপ্য, যদিও তাঁর পদ্ধতি ও ইঙ্গিত নারদ থেকে একেবারে আলাদা বা উল্টোই বলা যায়। যেমন নারদ বলেছেন : 'যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ। যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধারস্তৃতীয়স্ত্বৃষভঃ স্মৃতঃ। চতুর্থঃ ষড়্জ ইত্যাহুঃ পঞ্চমো ধৈবতো ভবেৎ। ষষ্ঠো নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ ॥" কিন্তু সায়ণাচার্য বলেছেন, 'লৌকিকে যে নিষাদাদয়ঃ সপ্তস্বরাঃ প্রসিদ্ধাঃ ত এব সাম্নি ক্রুষ্টাদয়ঃ সপ্ত স্বরাঃ ভবন্তি তদ্ যথা, যো নিষাদঃ স ক্রুষ্টঃ, ধৈবতঃ প্রথমঃ, পঞ্চমঃ দ্বিতীয়ঃ, মধ্যমস্তৃতীয়ঃ, গান্ধারশ্চতুর্থঃ, ঋষভো মন্দ্রঃ, ষড়্জোঽতিস্বার্য ইতি।' অর্থাৎ সামস্বরের আর নারদ ও সায়ণাচার্যের স্বরগুলির পরিচয় পাশা-পাশি দেখালে দেখা যায়,

সামস্বর	নারদ	সায়ণ
(৭) ক্রুষ্ট	পঞ্চম	নিষাদ
(১) প্রথম	মধ্যম	ধৈবত
(২) দ্বিতীয়	গান্ধার	পঞ্চম
(৩) তৃতীয়	ঋষভ	মধ্যম
(৪) চতুর্থ	ষড়্জ	গান্ধার
(৫) মন্দ্র	ধৈবত	ঋষভ
(৬) অতিস্বার্য	নিষাদ	ষড়্জ

as we know it, is of comparatively modern date—little more than two hundred years old.'—*The Story of Music*, পৃঃ ১৫২।

কিন্তু আমাদের অভিমতে ফ্রোয়েষ্টের অনুমান ঠিক নয়, কেননা প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপ থেকেও বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র পাওয়া গেছে যা বেশ উন্নত। মহেঞ্জোদড়োর বয়স পাঁচ হাজারেরও বেশী। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের যুগে শততন্ত্রী বীণারও উল্লেখ আছে।

এই সাতস্বরের বিকাশের কিন্তু একটা ইতিহাস আছে, ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ীই তারা সমাজে বিকাশ লাভ করেছিল। স্বরগুলির বিকাশের রীতি মোটামুটি বর্ণনা করতে গেলে বলা যায়, আর্চিকের যুগে প্রথম স্বরই মাত্র ছিল; গাথিকের যুগে প্রথম ও দ্বিতীয়, সামিকের যুগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, স্বরান্তরের যুগে প্রথম থেকে চতুর্থ, ওড়বের যুগে প্রথম থেকে পঞ্চম বা মন্দ্র পর্যন্ত, ষাড়বের যুগে প্রথম থেকে অতিস্বার্য পর্যন্ত আর সংপুর্ণের যুগে প্রথম থেকে ক্রুষ্ট পর্যন্ত স্বরের বিকাশ হয়েছিল। ঠিক এই ধরণের বিকাশের ধারা সকলে আবার স্বীকার করেন না। প্রথম স্বরকে কেউ কেউ বলতে চান পঞ্চম, কারো মতে নিষাদ অথবা ষড়্জ। কিন্তু সায়ণাচার্যের স্বরগুলি নিয়ে আলোচনা করলে ধৈবত-স্বরই হয় প্রথম। কিন্তু সায়ণাচার্যের আরোহণগতির বা upward movement-এর ক্রমবিকাশকে মেনে নিতে আমরা ঠিক রাজী নই, কেননা বৈদিক যুগে স্বরগুলির গতিই ছিল অবরোহণ গতিতে অর্থাৎ downward movement-এ। কাজেই বৈদিক যুগের অবরোহণগতি অনুযায়ী স্বরগুলির বিকাশ স্বীকার করলে বিকাশভঙ্গী হয় এরকম,—

মন্দ্র			মধ্য			
প	ধ	নি	সা	রে	গা	মা—দেশী স্বর
ক্রুষ্ট	অতিস্বার্য	মন্দ্র	চতুর্থ	তৃতীয়	দ্বিতীয়	প্রথম—বৈদিক স্বর
৭	৬	৫	৪	৩	২	১

কিন্তু এ সব বিকাশের ইতিহাস ও সঙ্গীতের খুঁটিনাটি শিল্পীরা আগেও বেশী আলোচনা করেন নি, এখনও নয়। এখন আমরা এসব উপপত্তিকের (theoretical) আলোচনার স্থান দিই ততটুকু যতটুকু সঙ্গীতের কার্যকর (practical) সাধনার পক্ষে একান্ত দরকার, তাও আধুনিক বিকাশের ওপরই বেশী জোর দিয়ে। যেমন কানড়া বা কানাড়া রাগিণীর শ্রেণী কত রকম, তাদের পরস্পরের রূপভেদ কি, তাদের বাদী সংবাদী ও ঠাটের স্বরূপ কি—এই সব নিয়েই আলোচনা আমাদের বেশী, অবশ্য খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জানা সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই উচিত; কিন্তু আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, কানাড়াকুঞ্জের উৎপত্তির পেছনে অভিব্যক্তি কেন এল, কি প্রয়োজনের তাগিদে তাগিদে সঙ্গীতসমাজ একটি কানাড়া থেকে আরো সতেরটি কানাড়ার রূপভেদের সৃষ্টি করল, আর সে করার পিছনে যুক্তি ও যথার্থ বিজ্ঞানই বা কি—এ সব বিষয়ে আলোচনা অথবা গবেষণাকে আমরা মোটেই স্থান দিই নি। বরং যুক্তি ও বিজ্ঞানের বালাই না রেখে পৌরাণিকী গল্পের দোহাই দিয়েই আমরা এক রকম সন্তুষ্ট হতে চাই। যেমন কানাড়া রাগ অথবা রাগিণীটির নামের সার্থকতা দেখাতে গিয়ে আমরা বলে থাকি কাহ্নু, কানাই বা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী থেকে এই রাগ, রাগিণী বা সুরের জন্ম হয়েছিল আর এজন্যে এর নাম কানড়া, কানাড়া অথবা কাহ্নড়া। কথাটি উচ্চশিক্ষিত সঙ্গীতসমাজ থেকে এখনও মুছে যায় নি। অথচ কর্ণাট দেশ থেকে যে এর উৎপত্তি হয়েছে এ ঐতিহাসিক নজির দেখাতে আমরা রাজী নই। সে রকম সাত স্বরের জন্মকথা সম্বন্ধেও বলা যায়। প্রকৃতি-দেবী জীবজগৎ সকলকেই প্রসব করেছেন বলে পশুপক্ষীর ডাক তথা অন্তিম স্বর থেকে ষড়্জাদি সাত স্বরের উৎপত্তি হয়েছিল এ কথাই আমরা বেদবাক্য বলে আজ পর্যন্তও বিশ্বাস করি যদিও বীণা স্বর-সংস্থানের দূরত্ব দেখিয়ে কেউ কেউ যুক্তির নজির দেখাবার চেষ্টা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ঠিক এ ধরণের প্রমাণ একটা দেবার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরাও ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এর কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। কিন্তু তা হলেও দেশ ও সমাজের ধারা সকল দিক দিয়ে এগিয়েই চলেছে, পেছন হাঁটার ইঙ্গিত মোটেই তাদের মধ্যে দেখা যায় না। বিশেষতঃ এখন যে যুগে আমরা বাস করি সে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগ। সকল জিনিষকে বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করার এখন সময় এসেছে। সঙ্গীতের পূজারী আমাদেরও তাই উচিত—সঙ্গীতের সবকিছুকেই পুরোপুরি যুক্তির আলোক দিয়ে বিশ্লেষণ করা। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের প্রমাণগুলিকে আমাদের এখন থেকে বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষণে যাচাই করে দেখা উচিত। তাতে সঙ্গীতের গুপ্ত ও আসল অনেক রহস্য বরং প্রকাশিত হবে। বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বরসম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় আমরা সকলেই জানি, কিন্তু বৈদিকের পাশে মার্গ তথা গান্ধর্বের স্বরগুলির বিকাশ কেমন করে হয়েছিল তার সত্যিকার রহস্য ও ইতিহাস আমরা ঠিক ঠিক ক'জন জানি বলা সত্যিই দুষ্কর। বৈদিক, মার্গ ও দেশী সঙ্গীত নিয়েও সত্যি-কার আলোচনা এখনো পর্যন্ত হয় নি। মার্গকে কেউ কেউ ক্লাসিকালের পর্যায়েও ফেলে থাকেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। মার্গ-সঙ্গীতকে অনেকে আবার পুরোপুরি বৈদিক সঙ্গীতও বলতে চান যেটা নিতান্তই ভুল। তা ছাড়া দেশীর সঙ্গে মার্গ তথা গান্ধর্ব আর বর্তমানে মুসলমান যুগের আমদানি করা ক্লাসিকাল সঙ্গীতের মিল ও অমিল অথবা সম্পর্ক কতটুকু তাই বা আমরা ক'জনে জানি? কাজেই এ "বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বর" প্রবন্ধের অবতারণায় আমরা বলতে চাই যে, সঙ্গীত-সাধনার উপযোগিতা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের ক্রিয়াংশ ও উপপত্তিকের সবকিছুকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং বিজ্ঞান ও যুক্তির মাপকাঠিতে আমাদের গ্রহণ করা দরকার। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আলোচনা প্রবর্তন করে ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিক এভাবেই গড়ে তুলতে হবে, আর তা হলেই মনে হয় সঙ্গীতের বিকাশ ও আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হবে; দেশের জনসাধারণের ভেতরও সঙ্গীতের ওপর আগ্রহ ও শ্রদ্ধার ভাব ক্রমশঃ বাড়বে।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগ

শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশমত এবার আমি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত কয়েকখানি সুপ্রাচীন বাংলা উপন্যাস দেখিয়া গ্রীষ্মাবকাশের সদ্ব্যবহার করিয়াছি। এগুলির কোন-কোনটি সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ আছে বলিয়া মনে করি।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৯ শক বা ১২৬৪ সাল, অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহের সময়, বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বৎসর তিনখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়; উহা— ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস,' কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ,' ও টেকচাঁদ ঠাকুরের (ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের) 'আলালের ঘরের দুলাল'।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' : ভূদেবের এই গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ একান্ত দুষ্প্রাপ্য; এই কারণে ইহার প্রকাশকাল লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এমন কি, অধুনা-প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থের ২য় সংস্করণে "প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস" প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাবের তারিখ অনিশ্চিত।" ব্রিটিশ মিউজিয়মে আমি যে কয়েকখানি প্রাচীন উপন্যাস দেখিয়াছি, 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র ১ম সংস্করণ তাহাদের অন্যতম। উহার আখ্যা-পত্রটি হুবহু উদ্ধৃত করিতেছি :—

Historical Tales
in Bengali
By
Bhoodeb Mookerjea

—

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

—

শ্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক
প্রণীত।
কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে
শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা, বাহির
মৃজাপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত
শকাব্দাঃ ১৭৭৯।

ইহা হইতে 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র প্রথম প্রকাশকাল যে "১৭৭৯ শক" তাহা জানা যাইতেছে। কিন্তু শকাব্দার সহিত মাস-তারিখের উল্লেখ না থাকায় ইহা ইংরেজী ১৮৫৭ কি ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত তাহা জোর করিয়া বলা কঠিন। মনে রাখিতে হইবে, "১৭৭৯ শক" ইংরেজী ১২ এপ্রিল ১৮৫৭ হইতে ১২ এপ্রিল ১৮৫৮ পর্য্যন্ত সূচনা করে।

'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' : 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র সমসময়ে আচার্য্য কৃষ্ণকমলের এই উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। ইহা পাঠ করিয়া মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' (আষাঢ় ১৭৮০ শক) লিখিয়াছিলেন :—

"এতদ্দেশীয় উপন্যাস সকলেরই এক ধারা; সকলেই 'এক রাজা ছিলেন তাঁহার সো দো দুই রাণী' এই রূপ বাক্য ধরণে আরম্ভ হইয়া থাকে; এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে, এবং গল্পটীও তাদৃশ নিন্দনীয় নহে।"

ইহার ভাব ভাষা ও গল্প সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে মুগ্ধ করিয়াছিল (২ নং সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য' দ্রষ্টব্য)। শ্রীকুমার বাবুর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র উল্লেখ আছে, অথচ একই সময়ে প্রকাশিত এবং একই ইংরেজী গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে লিখিত কৃষ্ণকমলের বইখানির নাম কেন যে হিসাবে বাদ পড়িল বুঝিয়া উঠা কঠিন; হয়ত তিনি ইহার সন্ধান রাখেন না। কিন্তু "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"য় পুনর্মুদ্রিত করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ত ইহার দুষ্প্রাপ্যতা ঘুচাইয়াছেন!

'বিজয় বসন্ত' : উপরি-উক্ত উপন্যাসগুলির অব্যবহিত পরেই হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) প্রণীত 'বিজয় বসন্ত' প্রকাশিত হয়; উহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

> বিজয় বসন্ত। / নীতিগর্ভ অপূর্ব্ব উপাখ্যান, / কুমারখালী নিবাসী / শ্রী হরিনাথ মজুমদার কর্তৃক / প্রণীত / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে / শ্রী লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির / মৃজাপুর চাষাধোবা পাড়ায়, ১৩ সংখ্যক ভবনে / মুদ্রিত হইল, / ১৭৮১ শক ১০ই পৌষ / মূল্য ।০ আট আনা মাত্র।

'বিজয় বসন্ত' সেকালের একখানি বহুল-প্রচারিত নীতিগর্ভ উপাখ্যান। শ্রীকুমার বাবুর গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিলে সুখী হইতাম।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' : ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। ইহার লেখিকা—বিবি মুলেন্স। পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

The history / of / Phulmani and Karuna / a book for / Native Christian Women / ফুলম'

ও করুণার বিবরণ / স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত / Calcutta. / Printed for the Calcutta Christian Tract and / Book Society, B. J Baptist, at Bishops / College Press / 1st ed, 1852 [3000 copies /]

এই বইখানিকে কেহ কেহ মহিলা-রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস বলিতে চাহিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে উপন্যাস বলা চলে না। ইহাতে কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি দ্বারা গল্পচ্ছলে স্ত্রীলোকদের মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এবং কি উপায়ে তাহা দূর করা যায়,—খ্রীষ্টিয়ান সমাজ ও তদ্বর্গই বা ঐ বিষয়ে কি করিতে পারেন, তাহাও আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের সূচনায় Calcutta Christian Tract and Book Society-সম্পাদককে Mrs. Mullens পুস্তকের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষের একটি অধ্যায়ে খ্রীষ্টিয়ানেরা যে হিন্দুদের অনুকরণে হিন্দু দেব-দেবীর নামানুসারে শিব কৃষ্ণ হরি প্রভৃতি নাম রাখেন তাহাতে আক্ষেপোক্তি আছে।

সমুদ্র ও মহাদেশের উদ্ভব

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত

পৃথিবীতে শতকরা ৭১ ভাগ জল ও ২৯ ভাগ স্থল। জল ও স্থলের উৎপত্তিবিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক মতবাদও দেখিতে পাওয়া যায়। আদিতে পৃথিবী জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ডরূপে সূর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করে। মহাশূন্যে বিচরণকালে তাপবিকীরণ হেতু উহা ক্রমেই শীতল হইতে আরম্ভ হয়। পৃথিবী প্রথমে তরল ও পরে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থান্তরের ফলে পৃথিবী আয়তনে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সঙ্কোচনের ফলে উহার উপরিভাগে তরঙ্গাকারে ভাঁজের সৃষ্টি হইতে থাকে। পৃথিবী জলধারণের উপযোগী শীতল হইলে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে ভাঁজের নিম্নাংশে সঞ্চিত হওয়ায় সমুদ্রের সৃষ্টি হইল। উচ্চাংশ স্থলভাগরূপে উত্থিত হইয়া বিরাজমান রহিল।

পৃথিবীর জন্মের পর হইতেই জলাশয় ও স্থলভাগের সৃষ্টি-কার্য্য স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন হইতেছিল—ইহাই কতিপয় বৈজ্ঞানিকের অভিমত। পদার্থবিদ্ কেলভিন বলেন যে, পৃথিবীর গ্যাসীয় অবস্থা হইতেই স্থলভাগ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল। সোলাসের মতে বায়ু-মণ্ডলের অসমান চাপের জন্যই পৃথিবীর তরল অবস্থাতেই ভূপৃষ্ঠ অসমতল হইয়া স্থলভাগ ও জলাধারের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার গ্রহাণুবাদ মতের (Planetesimal Hypothesis) উদ্ভাবক চেম্বারলেনের মতে কঠিন গ্রহাণুগুলি পরস্পরের আকর্ষণে ও সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত তাপদ্বারা জমাট বাঁধিয়া যায়। এইরূপে সৃষ্ট ভূতল অসমতল ও গহ্বরযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। এই গহ্বরগুলিই পরে সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। উচ্চাংশ স্থলভাগের সৃষ্টি করিয়াছে।

যেরূপেই সৃষ্ট হোক না কেন, পরবর্ত্তীকালে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলভাগ একত্রে জমাট বাঁধিয়া এক বিরাট্ মহাদেশের সৃষ্টি করিল। তাহাকে ঘিরিয়া রহিল এক বিশাল মহাসমুদ্র। এই মহাদেশটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্যানজিয়া (Pangaea) এবং মহাসমুদ্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্যান্থালাসা (Panthalassa)। বর্ত্তমানের মহাদেশগুলির বস্তবিন্যাস (stratification) ও তন্মধ্যস্থ প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ হইতে এইরূপে একটি মহাদেশের অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে। এই মহাদেশটিই পরবর্ত্তীকালে ভাঙিয়া চুরিয়া বর্ত্তমানের মহাদেশগুলির সৃষ্টি করিয়াছে আর প্যানথালাসার জল ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

প্যানজিয়ার ভাঙন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকমহলে কয়েকটি বিরুদ্ধ মতবাদের প্রচলন দেখা যায়। একদল বলেন যে, শীতল হইবার জন্য সঙ্কোচের ফলে পৃথিবীতে যে ভাঁজের সৃষ্টি হয় তাহারই জন্য প্যানজিয়ার ভাঙন সুরু হয়। এইরূপে সৃষ্ট ফাটলে সমুদ্রের জল প্রবেশ করিয়া অন্তর্বর্ত্তী সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

পৃথিবীতে কোন কোন জলপূর্ণ অবনমিত স্থানে পলি সঞ্চয় হইয়া থাকে। সঞ্চিত পলির চাপে ভূপৃষ্ঠের ঐ সকল অবনমিত অংশ আরও বসিয়া যায়। ফলে উহার উভয় পার্শ্বস্থ স্থলভাগ পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসে। এইরূপে সঙ্কোচনের দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি ও তাহাতে পলিসঞ্চয়ের দরুন উভয় পার্শ্বস্থ অংশের সঞ্চরণের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। একই প্রকারে প্যানজিয়া ভাঙিয়া সমুদ্র ও মহাদেশের সৃষ্টি করিয়া থাকিবে—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অপর মতে পৃথিবীপৃষ্ঠের অংশ-বিশেষের সঞ্চরণের ফলে প্যানজিয়ার ভাঙন ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। সঞ্চরণ মত-
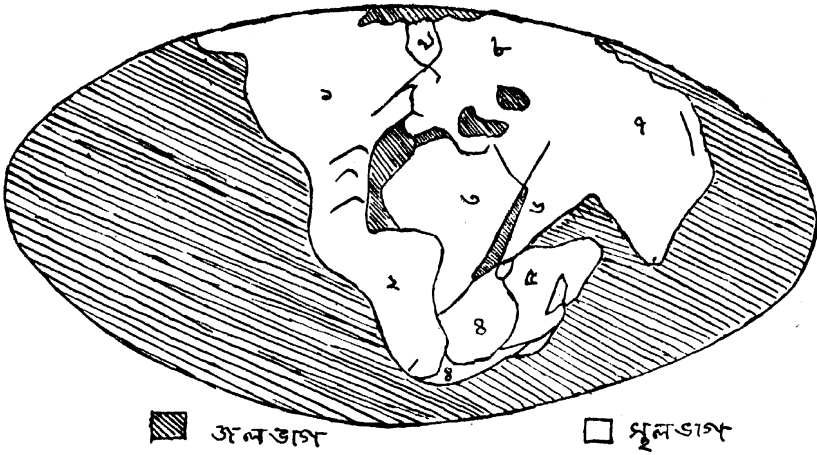
২০০,০০০,০০০ বছর আগে "প্যানজিয়া" (Pangea) ও "পান্থালাসা" (Panthalassa)—Wegener মতে।
১। উত্তর আমেরিকা, ২। দক্ষিণ আমেরিকা, ৩। আফ্রিকা, ৪। এণ্টারক্‌টিকা, ৫। অষ্ট্রেলিয়া, ৬। ভারতবর্ষ, ৭। উত্তর এশিয়া, ৮। ইউরোপ, ৯। গ্রীনল্যাণ্ড

বাদকে একটি সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করান সর্ব্বপ্রথম আলফ্রেড ভেগনার। ড্যালি ও টেলর নিজ নিজ ব্যাখ্যার দ্বারা এই মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। ভেগনার একজন জার্ম্মান আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ্। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়া নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, পৃথিবীতে এমন সব স্থান আছে যেখানে পূর্ব্বের আবহাওয়ার সহিত বর্ত্তমানের আবহাওয়ার কোন সাদৃশ্যই নাই। পূর্ব্বে যেস্থানে হিমশীতল আবহাওয়া ছিল সেখানে হয়ত বর্ত্তমানে উষ্ণ আবহাওয়া বিদ্যমান। ইহা সাধারণতঃ দুইটি কারণে ঘটিতে পারে। হয়ত সেখানে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—নচেৎ সে স্থান পূর্ব্বের জায়গায় আর নাই। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন কল্পনা করিতে গেলে বহু প্রকৃতিগত বিষয়ের পরিবর্ত্তন করাইতে হয়। সুতরাং উহা গৃহীত হয় নাই। অতএব কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠের অংশবিশেষের সঞ্চরণ-মতবাদ দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের উভয় পার্শ্বের স্থলভাগের বহুবিন্যাস, জীবাশ্ম (fossil) পর্ব্বতাদির অবস্থানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ভেগনার ভূপৃষ্ঠের অংশবিশেষের সঞ্চরণ স্বীকার করিয়া লন। ভেগনারের মতে একটি পশ্চিমমুখী ও অপর একটি বিষুবরেখামুখী শক্তির প্রভাবে প্রায় ২০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে প্যানজিয়ার ভাঙন সুরু হয়। এশিয়া বিষুবরেখার দিকে সঞ্চরণ করার ফলে ভারত মহাসাগরের ও আমেরিকা পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইবার ফলে আটলাণ্টিক মহাসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের সম্বন্ধে ভেগনার কিছু না বলিলেও এ বিষয়ে ফিশারের মত চিত্তাকর্ষক। ফিশার বলেন, চন্দ্রের উৎপত্তির জন্য প্রকাণ্ড মহাসাগরের গহ্বর সৃষ্টি হইয়াছে। ফিশারের এই মত বৈজ্ঞানিক মহলে গৃহীত হয় নাই। তাহার কারণ চন্দ্রের আয়তন প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন অপেক্ষা অনেক বড়।

আর একটি দিক হইতে এই বিষয়টির সমাধান করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ভূত্বকের উপরি অংশে কতকগুলি তেজস্ক্রিয় (radio-active) পদার্থ বিদ্যমান আছে। ঐ পদার্থগুলির ধর্ম্ম এই যে, উহারা স্বতঃই অপর মৌলিক পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে বহুল পরিমাণে তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই তাপ স্থলভাগের নিম্নে সঞ্চিত হইতে থাকে। তাপের ধর্ম্ম পদার্থমাত্রকেই আয়তনে বর্দ্ধিত করা। একই পরিমাণ পদার্থ বর্দ্ধিত-আয়তন হইলে উহার ঘনত্ব কমিয়া যায়। ঠিক একইরূপ স্থলভাগের নিম্নের চাপ-প্রভাবে উহার উপরিস্থিত অংশ লঘুতর হইয়া অধোগমন করিবে। উহাতে নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের জল স্থলভাগের উপর আসিয়া পড়ায় একটি বৃহত্তর সমুদ্রের সৃষ্টি হইবে।

সমুদ্র ও মহাদেশের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে অপর মতবাদে বলা হয় যে, প্যানজিয়ার অংশগুলি একটি বিরাট্ ভূভাগদ্বারা সংযোজিত ছিল। কি প্রকারে এই সকল সেতুর অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল তাহা বলা কঠিন। তবে ভূপৃষ্ঠে সঙ্কোচন, শিলার রূপান্তর ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিবর্ত্তনের দ্বারা সঞ্চিত তাপ এই সকল প্রক্রিয়ায় সাহায্য করিয়া থাকিবে।

সাঁইত্রিশ রাগিণী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালে উঠিয়া দেখিলাম নায়েগ্রার প্রপাতের মুখের উপর বিরাট গম্ভীর এক পাহাড় খাড়া হইয়াছে। প্রপাতের উদ্দাম উচ্ছ্বাসের শব্দে কান ঝালাপালা হইয়াছিল, তাই বলিলাম - যাক্ বাঁচা গেছে।

পাহাড়ের গর্ভ হইতে হঠাৎ আগুন বাহির হইল, গা বাহিয়া গলিত লাভার সোনালি আভা আকাশটা ঝলসাইয়া দিল। এ দৃশ্য সর্ব্বদা দেখা ভাগ্যে জোটে না, তাই আবার বলিলাম—দিনটা আজ ভালই যাবে দেখছি।

গৃহিণী নীলা চায়ের কেটলি হাতে লইয়া আসিয়া আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—সকালে উঠেই আবার ওর পেছনে লেগেছ।

'ও' মানে আমার ছোট বোন সুমিতা, কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যাকে দেখিলে নায়েগ্রাকেই মনে পড়িত এবং আজ সকাল হইতে যার মুখে পাহাড়িয়া গাম্ভীর্য।

চোখ দিয়া আর এক ঝলক আগুন ঠিকরাইয়া সুমিতা তার বৌদিকে আক্রমণ করিয়া বলিল—থাক, তোমাকে আর সাওখুরি করতে হবে না।

চা ঢালিতে ঢালিতে নীলা বলিল—বা রে, আমি আবার কি করলাম?

সুমিতার গাম্ভীর্যে একটু চিড় লাগিল; মাথা ও কানের বুলন্ত ঝাড় লণ্ঠন দুটা এপাশ ওপাশ দোলাইয়া বলিল—তুমি না তো দাদাকে ভালমানুষ বানিয়েছে কে শুনি?

নীলা বলিল—দাদার বদলে তুই নিজেও তো দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে গায়ের জ্বালাটা ঠাণ্ডা করতে পারতিস।

চা খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি?

নেহাত পাথরের পাহাড়, তাই বেলুনের মত ফট করিয়া না ফাটিয়া শুধু ভূমিকম্পের আলোড়ন তুলিয়া সুমিতা বলিল—আহা জানো না যেন কিছু! লোকটা বাড়ী বয়ে এসে যা-তা বলে গেল, আর তুমি চুপ করে বসে রইলে।

বুঝিলাম এরা এখনও গত কল্যের ঘটনা লইয়া ঘণ্ট পাকাইতেছে।

বলিলাম—যা-তা বলে গেছে তা কি করে বুঝব?

নীলা বলিল—হাত পা ছুঁড়ে বাজখাঁই গলায় কত কি বললে…

নীলার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—তাই বলে তাকে ধরে মারতে হবে না কি?

সুমিতা বলিল—না, পুজো করতে হবে।

আমি বলিলাম—তোরা ঘরের পয়সা খরচ করে থিয়েটারে গিয়ে যখন দেখিস ষ্টেজের ওপর হাত পা ছুঁড়ে বাজখাঁই গলায় কেউ কিছু বলছে তখন সীটে বসে মিঠে মিঠে মন্তব্য না করে সোজা ষ্টেজে উঠে বক্তাকে তক্তাপেটা করিস নে কেন?

তাজ্জব বনিবার মত এমন কিছু বলি নাই যাতে ননদ বৌদি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারে। তাই তাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম—গত কল্যের বক্তা যাই বলিয়া যান না কেন, তাঁর কোন কথারই যখন অর্থ করিতে পারি নাই তখন অনর্থক চটিয়া নিজেদের মাথা খারাপ করিলে লাভ কিছু হইত না।

নীলা বলিল—ওদের কথা আমরা বুঝতে পারি, আর তুমি বোঝ না বললেই হ'ল কি না…

আমি বলিলাম—তোমরা তো কাকপক্ষী নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজীবের কথাই বুঝিতে পার, রামানুজনের মুখে মাদ্রাজী ভাষা তো তার কাছে জলের মত সোজা।

নীলা বলিল—তোমার কথা শুনলে গা জ্বালা করে। তুমি নিজে তো কোন দায়িত্ব নিলে না; আমরা খেটে খুটে যেটা তৈরী করবার চেষ্টা করছি বাইরের লোকের কথায় সেটা যে বন্ধ করে দেবো, তা ভেবো না।

বলিলাম—পাগল! তা ভাবব কেন? বরং তোমাদের রিহের্শালের জন্তে আর এক জায়গায় ঘরের বন্দোবস্ত করে দেব।

নীলা বলিল—না না, আমরা এই বাড়িতেই রিহের্শাল দেবো…দেখবো রামানুজন কি করতে পারে।

সুমিতা তাকে সমর্থন করিয়া বলিল—নিশ্চয়; আমাদের বাড়ীতে আমরা যা খুশি করবো।

এদের যা খুশির বহরটা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, মুখে বলিলাম—আচ্ছা বেশ।

নমিতা তবু ছাড়িল না, বলিল—মুখে "আচ্ছা বেশ" বললেই হবে না, কাল যে সব মেয়ে আর আসবে না বলে গেছে, ছোড়দাকে বল তাদের খবর দিতে। ছোড়দা বলেছে যে তুমি না বললে এ ব্যাপারে আর হাত দেবে না।

নীলা বলিল—আর তোমার বন্ধুদের কাছে কতকগুলো টিকিট বিক্রি করতে হবে, মনে থাকে যেন।

'আচ্ছা বেশ' বলিলে এরা সন্তুষ্ট হয় না দেখিয়া সংস্কৃত করিয়া বলিলাম—তথাস্তু।

গম্ভীর পাহাড়টা ধ্বসিয়া গেল; নায়েগ্রায় ঢাকা রূপ আবার খুলিয়া গেল সুমিতার খিল খিল হাসিতে।

নিজের ঘরে আসিয়া তখনকার মত বাঁচিলাম।

এ বাড়িতে সুমিতার গম্ভীর মুখ কারও পছন্দ হয় না; নীলাও যা জেদ ধরে সহজে তা ঢিলা হয় না। তাই আমারই যে ত্রুটির জন্ত এদের এত বড় আমোদটা টুটিয়া যাইতে বসিয়াছে, অন্ত উপায়ে সেটা অচিরে সংশোধন না করিলে পিসীমা এখনি ছুটিয়া আসিয়া রোদন করিতে বসিবেন এবং আমি না কি মুখচোরা নিজের মান নিজে রাখিতে জানি না ইত্যাদি বলিয়া সব ঝালটা আমারই উপর ঝাড়িবেন। ঝাড়িবেনই বা না কেন? পয়লা তারিখে কতকগুলা ময়লা নোট সংসারের জন্ত ফেলিয়া দিয়া সারা মাস গা ছাড়িয়া যে বসিয়া থাকে, বাহিরের কেহ উপর-চড়াও হইয়া দু'কথা শুনাইয়া গেলে পরুষ কণ্ঠে যে জবাব দিতে জানে না, সে আবার পুরুষ নাকি? আর নীলা সুমিতারা মেয়েমানুষ হইয়া যে আমোদের আয়োজনটা করিয়াছে আমি তাতে কোন সাহায্য তো করি নাই, বরং বাহিরের লোকের বাগড়া দিবার আগড়গুলা খুলিয়া দিয়া আড়াল থেকে মজা দেখি।

আসল কাহিনীটা খুলিয়া বলি। আমাদের বাড়ির লোকগুলা স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে একটু আমোদপ্রিয়; তবে আমোদের বিশেষ ধারাটা বহিয়া থাকে সঙ্গীতের তরঙ্গে ভর করিয়া।

পিসীমার মুখে বাউলকীর্ত্তনের সাঙ্গীতিক নর্ত্তন ছেলেবেলা থেকে অনেক উপভোগ করিয়াছি। তারপর যেদিন তাঁর নিরামিষ ঘরে বসিয়া গুনগুন করিয়া ভজন সুরু করিলেন, তার আসল ওজন বুঝিলাম খাইতে বসিয়া তাঁর মাথা সাঁতরাগাছির পদার্থবিশেষ গলাধঃকরণ করিয়া আমার নিজের গলার সুড়সুড়িতে। আরও বুঝিলাম যে ভজন গাহিতে হইলে গলা পরিষ্কার করিবার জন্ত এর মত অমোঘ ঔষধ আর নাই।

কিন্তু আমার অ-সুরকণ্ঠে কোন সুরই দানা বাঁধিল না দেখিয়া আমাকে ছাড়িয়া পিসীমা আমার ছোটভাই সুখেন্দুকে লইয়া পড়িলেন।

সুকণ্ঠ সুখেন্দুকে ইন্দ্রসভাতেই মানাইত ভাল, কিন্তু সে ইন্দ্রও নাই, তাঁর সভাও নাই। তাই স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সুখেন্দু যখন দরাজ সুরে গানের গলা ছাড়িয়া দিত পিসীমা তখন একটা কাঠি দিয়া কাসুন্দি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হয়তো ভাইপোর কণ্ঠমাধুর্য্যে পুলকিত হইয়া উঠিতেন।

সুমিতা যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তখন তার খুদে অঙ্গ দেখিয়া মনে হইত, আকারে তারই মত ছোট একটা সারেঙ্গ বাজনা জাফরানি রঙে রাঙাইয়া কে যেন বিছানার উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছে। বালিকা বয়সে সারেঙ্গীটি গোঙানি ছাড়িয়া খরখরে ঝরঝরে এস্রাজে পরিণত হইল। কিশোরী সুমিতা সেতারে পৌঁছাইল কথায় ও কাজে প্রিং প্রিং রব তুলিয়া, আর সে যখন তিড়িং তিড়িং করিয়া লাফাইত তখন তার পিঠের উপরকার ঝুলন্ত বিনুনি দুটার একটা দিয়া রামকেলি ও আর একটাতে মালকোষ কোঁস কোঁস করিয়া ফণা তুলিয়া দুরন্ত লয়ে নামিয়া পড়িত। সেতার কিন্তু বেতার হইল রামকেলি ও মালকোষে আপোষ হইল না বলিয়া—তাই রফা করিবার জন্ত বিনুনি দুটা একত্র করিয়া তালের মত ভারী একটা খোঁপা বাঁধিয়া যেদিন সে বাহার ধরিল, সুখেন্দু জানাইল সুমিতা সুর-বাহারে প্রমোশন পাইয়াছে। সঙ্গীত-শাস্ত্রের জটিল তথ্য না বুঝিলেও সেদিন থেকে আমি সুমিতাকে সুরবাহার বলিয়া আদর করি। সুমিতা তাতে চটিয়া যায় এবং মনে মনে হাম্বীর ভাঁজিতে ভাঁজিতে ফাঁকা ঘরে গিয়া সম ফাঁক তাক করিয়া তার পোষা বিড়ালটাকে চাপড়াইতে থাকে।

এ বাড়ীতে নীলা যেদিন পদার্পণ করিল সুমিতা অনুনয় করিয়া বলিল—হ্যাঁ নীলু বৌদি, গান গাইলে না যে? ফিক করিয়া হাসিয়া নীলু পিলু সুরের গান ধরিল। নিমন্ত্রিত জনকে ভালমন্দ পরিবেশন করিতে করিতে সুখেন্দু তখন চাপা গলায় হিন্দোল ভাঁজিতেছিল; নীলুর মুখে পিলু শুনিয়া সে ছুটিয়া আসিয়া হাতের মাছের বালতিটা আলতো করিয়া তুলিয়া সে গান শুনিতে লাগিল।

ব্যস, তার পরের দিন থেকে শুধু রোয়াকে নয়, বাড়ীর সর্ব্বত্রই গানের বন্যা বহিতেছে। নীলা সুমিতা সুখেন্দু—অর্থাৎ গঙ্গাযমুনা ব্রহ্মপুত্রের ত্রিধারা সুরের উত্তাল তরঙ্গের মাঝখানে অ-সুর আমি নিরেট কাঁপা বয়ার মত ভাসিতেছিলাম।

ভাসিতেছিলাম, তবে অকূলে নয়; শক্ত লোহার শিকলে বাঁধা ভারী একটা নোঙরে তলাকার মাটি আঁকড়াইয়া ছিলাম। কিন্তু শিকলটা বুঝি এবার ছিঁড়িয়া যায়, প্রতিবেশী রামানুজন বনাম আমাদের বাড়ীর বাসিন্দাদের সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বে।

রামানুজনের মত সজ্জন লোক এ পাড়ায় আর নাই। যে-কোন একটা ছুতা করিয়া চাঁদার জন্ত রামানুজনের ছোট ভাই রামাশেষণকে একবার বলিলেই ইংরেজীতে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে রামানুজনের নাম-সই-করা একখানা চেক আসিয়া যাইবে, তাই এত বড় একজন মহাশয় ব্যক্তিকে আমরা দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছি ভাবিয়া তিনি যদি দু'কথা শুনাইয়া যান তাহা হইলে আর কি করিতে পারি। তবে তাঁর গরম মেজাজে হয়তো কিছু শীতল জল ঢালিতে পারিতাম, যে দু'কথা কাল শুনাইয়াছেন তার একটারও যদি অর্থ করা আমার সাধ্য হইত।

গোড়ার কথা কিছু বলিয়া রাখি। দক্ষিণ ভারতের কুটীর-শিল্পের উৎকর্ষের নিদর্শনগুলি নামমাত্র দামে বিতরণ করিয়া রামানুজন এ অঞ্চলে কিঞ্চিৎ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন এবং আমাদের বাড়ীর পাশের খালি জমিটার উপর বৃহৎ একটি অট্টালিকা তুলিয়া প্রতিবেশীরূপে আমাদের

ধস্ত করিয়াছেন। তবে বহুদিন ধরিয়া বড়বাজার ও রাধাবাজারে ঘোরাফেরা করার জন্ত তাঁর কথ্য ভাষার অসঙ্গতিটা পূরণ করেন এ পাড়া ও অন্ত পাড়ার অভিজাত নাগরিকমহলে ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্কের আভিজাত্য দেখাইয়া এবং সেই আভিজাত্যের জোরেই প্রৌঢ় বয়সে একটি অষ্টাদশীকে বিবাহ করিয়াছেন।

লোকে বলে, অবিমিশ্র মাদ্রাজী ভাষার মত কাঠিন্য-বর্জ্জিত সুললিত ভাষা একটা অ-মাদ্রাজী বালকেও বুঝিতে পারে—বিশেষতঃ আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলে, যেখানকার বালকের দল সেবার কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রোডে সার্ব্বজনীন পূজায় ঢাক-ঢোলের বদলে মাদ্রাজী কথকতায় কোরাস শোনাইয়া সর্ব্বজনের তুষ্টি বিধান করিয়াছিল। তবে রাধাবাজারের ধোপ ও কৃষ্ণবাজারের ইস্ত্রির পর রামানুজনের মুখে এ হেন একটি ভাষা কি দশায় যে পড়িয়াছে তা বাজার-অনভিজ্ঞ আমিই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি।

তাই ভাবি, আমাদের বাড়ীর বাসিন্দাদের বিশুদ্ধ আমোদ-প্রিয়তা কেন এই প্রমাদ ডাকিয়া আনিল?

প্রমাদের ভূমিকাটা বলি। নীলা সুমিতাদের হর্ষবাহিকা সমিতি পাঁচ মাস আগে স্থির করিয়াছিল বর্ষামঙ্গল গীতাভিনয় করিবে; সেজন্য আয়োজনের ত্রুটিও রাখে নাই—পাড়ার ও স্কুল কলেজের কতকগুলি মেয়ে জুটাইয়া দিনের পর দিন মহল্লা দিয়া পাড়া সরগরম করিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ একদিন রামানুজনের ছোট ভাই রামাশেষণ আসিয়া বলিল—মহল্লার হল্লা বন্ধ করিতে হইবে; কারণ রামানুজন-জায়ার মাথার অসুখ সুরু হইয়াছে। কর্ণেল মাথাইকে 'কল' দেওয়া হইয়াছিল। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে রামানুজন-পত্নীর মাথার অসুখের জন্ত এখান থেকে চৌমাথা পর্য্যন্ত সকল বাড়ীর বাসিন্দাদের নিরানন্দে থাকিতে হইবে। এর সোজা মানেটা এই যে, আমোদের নাম করিয়া যে সোরগোল করা হয় সেটা যে প্রচণ্ড গণ্ডগোল, কর্ণেল মাথাই তা একদিন শুনিয়াই বুঝিয়াছেন।

সুমিতা কথাটা শুনিয়া বলিল—রামাশেষণকে বল যে আমাদের রিহের্শাল বন্ধ করবার চেষ্টা না করে সে তার বেহালা বাজানো আগে বন্ধ করুক।

তাই তো, ওদের বাড়ীর বেহালার কথা তো মনে ছিল না। তবু সুমিতাকে বলিলাম—রামাশেষণের বেহালাতে এমন আর কি গোলমাল হয়?

পিছন থেকে নীলা বলিল—বিশেষ কিছু না, তবে সুস্থ মানুষের মাথায় গোলমাল হয়।

পিসীমা বলিলেন—বেয়ালা ত বাপু অনেক শুনেছি, কিন্তু উৎকট সুরে পেত্নীর কান্নার মত বেয়ালা বাজানো বাপের জন্মে শুনি নি। আর রাতে যখন আমি শুতে যাই ঠিক তখনই ছোঁড়াটার বেয়ালার বাতিক চাগে।

সুখেন্দু মন্তব্য করিল যে, রামাশেষণের বেহালাই তার বৌদির মাথার অসুখের একমাত্র কারণ।

আমি বলিলাম যে রামাশেষণ যখন বেহালা বাজায় তার বৌদি তখন নিশ্চয় ঘুমাইতে থাকেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে মানুষ বেহালা শুনিতে পায় না। কিন্তু আমাদের বাড়ীর রিহের্শাল বসে বিকালে; মাথাব্যথার পক্ষে বিকালটা নেহাত অকাল নয়। আর মাথার রোগের কারণ অনুসন্ধান করিবেন কর্ণেল মাথাই নিজে। আপাতত দু'চার দিন রিহের্শাল বন্ধ রাখিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিলে এমন কিছু আসিয়া যাইবে না; বরং অভিনয়ের দেরীর জন্ত কারও কোন অসুবিধা হইলে রামানুজনের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে মোটা চাঁদা আদায় করা যাইবে।

পরের দিন হর্ষবাহিকা সমিতি আমার প্রস্তাব শুনিয়া বিমর্ষ হইলেও বর্ষামঙ্গলের খাতা সাতদিন স্পর্শ করিল না।

ক'দিন পরে দেখিলাম প্রৌঢ় রামানুজন অষ্টাদশী পত্নী ললিতা দেবীকে লইয়া লেকের দিকে বেড়াইতে যাইতেছেন। সুতরাং আমাদের বাড়ীর রিহের্শাল আবার সুরু হইল।

পাঁচ দিন পরে সকালের দিকে রামাশেষণ আবার আসিয়া জানাইল যে, তার বৌদির কর্ণপ্রদাহের জন্ত কর্ণেল সাহেবকে আবার ডাকা হইয়াছে।

সুমিতা সেখানে বসিয়াছিল; বলিল—তা হলে ত আমাদের গানবাজনা তোমার বৌদির কানেই ঢুকবে না।

রামাশেষণ বাংলা বলিতে পারে; মাথা নাড়িয়া বলিল—না সুমিতদি, ডাক্তার সাহেব বলেছেন যে বৌদির কান দুটোকে একটানা আট দিন রেষ্ট দিতে হবে। কাজেই আপনাদের গান-বাজনা—

সুমিতা বাধা দিয়া বলিল—তোমার বৌদিকে বলো, কানে দেড় সের তুলো গুঁজে অন্ধকার ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতে, তা হলেই তাঁর কান মাথা সবই রেষ্ট পাবে।

রামাশেষণ সবিনয়ে জানাইল যে, ডাক্তার সাহেবের প্রেসক্রিপশানে দেড় সের তুলা ও অন্ধকার ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকার কথা লেখা নাই।

সুমিতা বলিল—নেই ত নেই, আমরা রিহের্শাল বন্ধ করব না।

রামাশেষণ নেহাত বালক নয়; একজন নারীর কাছে হার মানাটা রামাশেষণের মানে বাধিল, তবু প্রতিপক্ষ নেহাত নারী-জাতীয়া জীব বলিয়াই হাত জোড় করিয়া বলিল—মাত্র আট দিনের জন্তে, সুমিতদি; এর মধ্যে বৌদির কান ভাল হবে আশা করা যায়।

সুমিতা কোন উত্তর না দিয়া—দুম দুম করিয়া পা ফেলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

আট দিন বন্ধ থাকিবার পর রিহের্শাল আবার সুরু হইল। তিন দিন পুরাদমে রিহের্শাল চলিবার পর চতুর্থ দিনে প্রৌঢ় রামানুজন নিজে আসিলেন, সঙ্গে তরুণী ভার্য্যা ললিতা দেবী ও ছোট ভাই রামাশেষণ। নীলা সুমিতারা ছুটিয়া আসিল ললিতা দেবীকে অভ্যর্থনা করিতে।

দোভাষীরূপে রামাশেষণ জানাইল যে তাদের বাড়ীতে একটা মহোৎসব লাগিতেছে দক্ষিণ-ভারতের কোন এক মহর্ষির জন্মতিথি উপলক্ষে; সেজন্য দশ দিন ধরিয়া অহোরাত্র কীর্তন নৃত্যগীতানুষ্ঠান চলিবে। মহিলাদের বসিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে এবং প্রতিবেশী হিসেবে সুমিতদি, নীলা বৌদি ও সুখেন্দুদা অবসর কালে যদি কিছু সহযোগিতা করেন তাহা হইলে রামানুজন-পরিবার কৃতার্থ হইবে।

নীলা সুমিতারা কিছু বলিবার পূর্বে আমি সকলের পক্ষে বলিয়া বসিলাম—বেশ বেশ, তোমাদের বাড়ীর কাজও যা আমাদের বাড়ীর কাজও তাই; সকলেই যাবে, যা দরকার করবে—ইত্যাদি।

মাদ্রাজী প্রতিবেশীরা বিদায় লইলে পিসীমা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—আমাকে বাপু অন্য কোথাও নিয়ে চল। ওদের একটা বেহালাতেই আমার ঘুম চড়ে যায়, আর বাইশটা বেহালা বত্রিশটা খোল চারশো বিরাশীটা মাদ্রাজী গলার সঙ্গে দশ দিন ধরে যদি ক্রমাগত বাজতে থাকে প্রাণ তা হলে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে, বাবা।

নীলা বলিল—আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে মেজদার বাড়ীতে চলে যাই।

সুখেন্দু বলিল—মাপ করতে হবে বৌদি, বলাইদা কবে থেকে আমাকে দেওঘরে যাবার জন্যে বলছে। এমন সুযোগটা আর ছাড়ছি নে।

সুমিতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তুই কোথায় যাবি?

সুমিতা বলিল—যমের বাড়ী।

বলিলাম—আমাকেও তোর সঙ্গে নিয়ে চল।

পিসীমা বলিলেন—ষাট।

নীলা বলিল—কি যা তা বল।

সুখেন্দু বলিল—তোমরা সবাই মিলে দাদার মাথাটা খারাপ করে দেবে দেখছি।

বলিলাম—দাদার মাথা খারাপ হলে তুই তো দেখতে আসবি নে, তুই থাকবি দেওঘরে।

সুখেন্দু বলিল—বা রে, তোমাকে ফেলে যাব না কি? ওরা যেখানে খুশি যাকগে, তুমি আর আমি থাকব।

পিসীমা বলিলেন—তার মানে, দুই ভাইয়ে মিলে বাড়ীতে মেলেচ্ছপনার একশেষ করবে।

নীলা বলিল—ফিরে এসে দেখবো দেরাজের জিনিষ চেয়ারের ওপর আর আলমারির জিনিষ খাটের নীচে জড়ো হয়েছে।

সুমিতার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আর তুই এসে কি দেখবি?

'কলা' বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সুমিতা পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় আপিস থেকে ফিরিয়া দেখিলাম সুখেন্দু সুমিতা নীলা, মায় পিসীমা পর্যন্ত কেহই বাড়ীতে নাই। তবে কি এরা আমাকে ফেলিয়া যে যার পথ দেখিয়াছে?

চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বৌদি কোন চিঠি রেখে গেছে?

সে বলিল—না।

দিদিমণি কিছু বলে গেছে?

না।

ছোটবাবু কোন খবর রেখে গেছে?

না।

পিসীমাকে কে নিয়ে গেছে।

পিসীমা বৌদি দিদিমণি ছোটদাদাবাবু সব একসঙ্গে গেছেন।

কোথায়?

মাড্রাজীদের বাড়ী।

যাক, এদের সুবুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সুখেন্দু সুমিতা নীলা—প্রতিবেশীর বাড়ীর মহোৎসবে মহা উৎসাহে কাজকর্ম করিয়া সামাজিক ধর্ম রক্ষা করিয়াছে। পিসীমাও নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়া দশ দিন ধরিয়া বাইশটা বেহালা বত্রিশটা খোল সহযোগে চারশো বিরাশী জন মাদ্রাজী গায়কের কীর্তন শুনিয়াছেন; প্রাণ তাঁর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে নাই।

পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি যে এখনও বেঁচে আছ?

তিনি বলিলেন—রামানুজনের বৌ ললিতা কি ছাড়ে, "পিসীমা পিসীমা" করে অস্থির। রামানুজনের মত ভালমানুষের পেছনে তোরা কি বলে যে লাগতে যাস, বুঝিনে বাপু।'

আমিও বুঝি না এবং কারা পেছনে লাগে তাও জানি না। তবে পিসীমার কথা শুনিয়া মনে হইল উক্ত ভালমানুষটির পেছনে যারা লাগে, আমিই যেন তাদের দলের চাঁই।

রামানুজনের বাড়ীর উৎসবের দিনগুলা কাটিলে সুখেন্দুকে বলিলাম—শরৎকাল পড়ে গেছে, এখন আর বর্ষামঙ্গল নিয়ে মাথা ঘামিও না।

সুখেন্দু বলিল—খ্যাপা শ্রাবণ প্রতি বছরই আশ্বিনের আঙিনায় ছুটে আসে ; সুতরাং বেমানান কিছু হবে না।

আপিস হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, রামানুজনের দোতলার ঘরের লাগোয়া আমাদের বড় ঘরের মধ্যে এস্রাজ সেতার ম্যাণ্ডোলিন বেহালা তবলা ঘুঙুর, ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত আর সতের জন মেয়ে ও আট-দশ জন ছেলেতে মিলিয়া আসর গুলজার করিয়াছে।

পুরা বার দিন ধরিয়া রিহের্শাল চলিবার পর সুখেন্দু ঘোষণা করিল, মহালয়ার দিন বর্ষামঙ্গল অভিনয়ে কোন বাধা থাকিবে না।

আরও কয়েক দিন রিহের্শাল চলিল। শেষে এক দিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম ঘরগুলা সব অন্ধকার। ফিউজ হইয়াছে না কি ?—না তো—আমার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। অথচ বাড়ীর লোকজন সব কোথায় ?

লোকজন সব বাড়ীতেই আছে, তবে ছাদে। ছাদে যাইতেই শুনিলাম সুখেন্দু বলিতেছে—ভারি শয়তান !

জিজ্ঞাসা করিলাম—কে ?

নীলা ধরা গলায় বলিল—রামানুজন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি আবার কি করলেন ?

পিসীমা বলিলেন—যা করবার তাই করেছে।

সুমিতা বলিল—ভয়ানক শত্রুতা করেছে।

সুখেন্দু ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল—যে হলটা আমরা সস্তায় পাব বলে ঠিক করা হয়েছিল, এমন কি পাকা কথাও পেয়েছিলাম, আজ শুনলাম, কোথাকার একটা ক্লাব মোটা টাকা আগাম দিয়ে সেই হলটা মহালয়ার দিনের জন্যে ভাড়া করে ফেলেছে ; আর সেই ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হচ্ছেন রামানুজন। বুঝলে এখন ব্যাপারটা ?

বলিলাম—উনিই যে এসব করছেন তা কি করে জানলে ?

পিসীমা বলিলেন—তাও আবার বিশেষ করে জানতে হয় না কি ?

বলিলাম—বেশ ত, তোমরা আর একটা হল ভাড়া নাও।

সুখেন্দু বলিল—সস্তায় পাব না, তা ছাড়া বৌদিরা রাজী নয়।

কেন ?

সুমিতা বলিল—ঐ হলই আমরা নেব।

নীলা বলিল—দু'দিন আগে আর পরে বই ত নয়।

শেষে স্থির হইল যে পূজার হিড়িক কাটিলে ভাল একটা দিনে বর্ষামঙ্গল অভিনয় হইবে।

মহালয়ার পর আর একটা খারাপ সংবাদ আসিল। অভিনয় ব্যাপারে যে সব ছেলেমেয়ের উৎকট উৎসাহ ছিল তাদের মধ্যে অনেকে ছুটিতে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে। নীলা সুমিতারা মাথায় হাত দিয়া বসিল। পিসীমা বলিলেন—কপাল !

সুখেন্দু বলিল—কপাল না হাতী ! আজ থেকে বাড়িতে ধ্রুপদ খেয়ালের বান ডাকিয়ে দেব। কি রে সুমি,

যখন জমবে ধুলা রিহের্শালের ঘরগুলায়,
পড়বে ছাতা যন্ত্রপাতির ছড়গুলায়,
একলা তখন নাই বা বসে থাকবে ;
তানপুরাটা আনতে বলে
খেয়াল গেয়ে হাকবে।'

হর্ষবাহিকা সমিতির বর্ষামঙ্গল আপাতত ধামাচাপা পড়িল। পিসীমা আবার নিরামিষ ঘরে নির্জ্জনে বসিয়া ভজন সুরু করিলেন। খেয়াল গাহিতে গাহিতে নীলা অনেক সুরের হেঁয়ালি দেখাইল। সুমিতার কণ্ঠ থেকে নায়েগ্রা প্রপাতের মত প্রচণ্ড বেগে ধ্রুপদ নামিতে লাগিল চৌতাল ধামারের উত্তাল তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে ; সে তরঙ্গে সঙ্গত দিবার জন্ম আহারনিদ্রা ভুলিয়া সুখেন্দু পরমানন্দে তবলার উপর পাখোয়াজের আওয়াজ শোনাইতে লাগিল :

কৎ থুন্ দি কেটে তাক্ গদি ঘেনে,
ঢোল আর তবলার বোল সব রাখি জেনে।

কিন্তু ভাগ্যে যা মাপা আছে বারে বারে ফসকাইয়াও শেষ পর্য্যন্ত একদিন তা মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িবেই। যে সব ছেলেমেয়ে ছুটিতে বাহিরে গিয়াছিল কার্ত্তিকের শেষে তারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বেশ লোক তোমরা একেবারে গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছো ? ও সব শুনবো না, অভিনয় আমরা করবোই।

নীলা সুমিতার টনক নড়িল, তানপুরা রাখিয়া অন্য যন্ত্রপাতিতে তার চড়াইতে সুরু করিল। বর্ষামঙ্গলের খাতা আবার খোলা হইল। হর্ষবাহিকা সমিতির সভ্যরা সমবেত হইয়া নূতন উদ্যমে রিহের্শাল সুরু করিল। তবে অনেক টালবাহানার জন্য পার্টগুলা সব ঢিলা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সবই আবার ঢালিয়া সাজিতে হইল। শেষে স্থির হইল যে পুরা সাত সপ্তাহ ধরিয়া রিহের্শাল দিয়া বড় দিনের বন্ধে বর্ষামঙ্গল অভিনয় করা হইবে।

আমি সেই পুরানো কথাটার ধুয়া তুলিয়া বলিলাম—বর্ষামঙ্গলে তোমাদের অরুচি না হতে পারে, কিন্তু দর্শকদের রুচি বলে একটা পদার্থ আছে। পৌষ মাসে বর্ষামঙ্গল মানে কাঁসার বাটিতে অম্বল খাওয়ার সামিল।

সুখেন্দু বলিল—তুমি কিছু বোঝ না দাদা। আমাদের দৃশ্যপটের বালাই নেই বলে আবহাওয়ার সবটাই কল্পনা করে নিতে হবে ; আর কল্পনার লাগামটা একটু আলগা করলেই দেখবে···পৌষে ঘন বরষা ঝর ঝরিয়ে ঝরে পড়ছে।"

রিহের্শাল যখন আবার জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় এক

দিন রামানুজনের বাড়ী থেকে বিকট একটা আওয়াজ উঠিল। মেয়েরা গান বাজনা বন্ধ করিয়া কান পাতিয়া শুনিল, গলা ছাড়িয়া কতকগুলা পেঁচা ডাকিতেছে। শব্দটা যখন খাদে নামিল তখন বুঝিলাম পূজার সময় ঢোল কাঁসির সঙ্গে যে সানাই বাজে কতকটা সেই রকম প্যাঁকপেঁকে আওয়াজ, আর সুরটা যখন চড়িয়া যায়, মনে হয়, সাতটা পেঁচা এক সঙ্গে ডাকিতেছে।

পরের দিন রামানুজনের সঙ্গে পথে দেখা হইলে তার এই নূতন সুরসাধনার জন্য তারিফ করিলাম। সে জানাইল, প্রশংসাটা যার প্রাপ্য…সে রামানুজনের শ্যালক, অর্থাৎ ললিতা দেবীর ভাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সানাইটা আকারে কত বড়?

বেশী নয়, সোয়া দু'হাত।

অর্থাৎ প্রায় রামশিঙ্গার সমান। নীলার ভাই, আমার শ্যালক—খেলার মাঠে ফু ফু করিয়া ছোট একটা বাঁশী বাজায়, আর রামানুজনের শ্যালক রামশিঙ্গার মত প্রকাণ্ড একটা সানাই বাজাইয়া পাড়ার লোকজন তাড়াইতে পারে। এমন গুণী শ্যালকের ভগ্নীপতি রামানুজন ঈর্ষ্যার পাত্র বটে।

সানাইয়ের জবাব দিবার জন্য সুখেন্দু এক জোড়া কর্ণেট ও একটা স্যাক্সহর্ণ জোগাড় করিয়াছে। রাত্রে বড় ঘরে গিয়া দেখিলাম রিহের্শালের মেয়েরা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তবে সুখেন্দু স্যাক্সহর্ণে ফুঁ দিতেছে আর নীলা ও সুমিতা গাল ফুলাইয়া দুইটা কর্ণেট বাজাইতেছে।

পিসীমা বলিলেন—বেশ করছে।

পরের দিন রামাশেষণ বলিল—বড়দা, আজকের রাতের আওয়াজটা শুনে বলবেন…হ্যাঁ।

নূতন একটা বাজনা শুনিব জানিয়া সারাদিন আগ্রহে কাটাইলাম। কিন্তু রাতে যে আওয়াজটা শুনিলাম তাতে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। কালীপূজার পর জগদ্ধাত্রী পূজা শেষ হইয়াছে সবে; সুতরাং কতকগুলি খালি টিনের মধ্যে কয়েক শত পটকার ছালিতে আগুন দিলে শব্দটা অবশ্য উৎকট হয়, তবে নূতনত্ব তাতে কিছুই নাই। ইচ্ছা হইল রামাশেষণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের রসিকতার রস মরিয়া গিয়াছে নাকি?

কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম কালীবোমের দমে ভারী আওয়াজ ও সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং রামানুজনের চড়া গলার চীৎকার। শেষে আসল ব্যাপারটা শুনিয়া গালে হাত দিয়া বসিলাম।

রামানুজনের বাড়ীতে আধঘণ্টা ধরিয়া টিনের মধ্যে পটকা ফাটার পর সুখেন্দু কতকগুলি কালীবোম জোগাড় করিয়া দুমদাম ছাড়িতে লাগিল। একটা বোমের সলিতায় আগুন দেওয়া হইলে বোমটা ব্যাঙের মত হঠাৎ তড়াক করিয়া লাফ দিয়া রামানুজনের বারান্দায় পড়িয়া দুম করিয়া ফাটিল, রামানুজনও রাগে ফাটিয়া পড়িলেন।

রামানুজন সহজে রাগিয়া উঠেন না, তবে একবার রাগিলে সহজে থামিতে চান না।

কি করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময় রামানুজন সোজা আমাদের বাড়ীতে চলিয়া আসিয়া মুখে যা আসিল বলিতে লাগিলেন।

সুখেন্দু বিশুদ্ধ ইংরেজী করিয়া বলিল—মশায়, কাজটা যখন ইচ্ছে করে করা হয় নি তখন অত মেজাজ দেখাবার কি আছে?

রামানুজন রাধাবাজার ও চীনাবাজারের ইংরেজীই শুধু বোঝেন, তাই সুখেন্দুর কেতাবি ইংরেজীতে কোন ফল হইল না। ব্যাপারটা পাছে বেশী দূর গড়ায় সেজন্য সুখেন্দুকে বাড়ীর ভিতরে পাঠাইলাম।

আজ সন্ধ্যা থেকে অনেক পটকা-বোমার আওয়াজ শুনিয়াছি, কিন্তু রামানুজনের বচন-বোমাগুলি সব আওয়াজকেই ছাড়াইয়া গেল।

রামাশেষণের মুখে ভাঙ্গা মাদ্রাজী বুঝিতে পারি, ললিতা দেবীর আধা হিন্দি আধা বাংলাও বুঝি; কিন্তু রামানুজনের কথার এক বর্ণও বুঝি না। না বোঝার অপরাধটা একা আমার নয়, পাড়ার অনেকেই বোঝেন না। তবে নীলা সুমিতারা নাকি বুঝিতে পারে।

রামানুজনের ক্রোধ রোধ করিবার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইলাম না। বাড়া কুড়ি মিনিট ধরিয়া হাতমুখ নাড়িয়া চড়া গলায় বকিয়া বকিয়া গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেলে রামানুজন আমাদের হাটকরা দরজার একটা পাটের উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন। নূতন একটা পোজ দেখাইবেন ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, বিশেষ আর কিছু না বলিয়া মুখ গোঁজ করিয়া তিনি সোজা নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

রামানুজন বিদায় লইলে মাথা ধরিয়াছে বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

সকালে উঠিয়া খাবার ঘরে গিয়া যা দেখিলাম তা আগেই বলিয়াছি।

যাই হোক, নীলা সুমিতা বলিয়াছে যে রামানুজন রাগই করুন বা তাঁদের বাড়ীর লোকজন যত বাগড়াই দিক বর্ষামঙ্গল অভিনয় করিতেই হইবে—এবং এ বিষয়ে আমি তাদের সাহায্য করিবার জন্য 'তথাস্তু' বলিতে বাধ্য হইয়াছি; তবু এত রেষারেষির পর কার্য্যতঃ ব্যাপারটা কত দূর গড়াইবে তা ধারণা করিতে পারিলাম না।

রিহের্শালের মেয়েদের খবর দিবার জন্য সুখেন্দুকে পাঠাইবার আগে একটা মতলব মাথায় আসিল। চুপি চুপি চাকরের হাত দিয়া এক টুকরা কাগজে রামাশেষণকে লিখিয়া

পাঠাইলাম,তুমি আমাকে বড়দা বলিয়া খাতির কর। ভারি বিপদে পড়িয়াছি, একবার আসিবে কি?

রামাশেষণ তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া প্রথমেই বলিল—দাদার হয়ে আমিই মাপ চাইছি বড়দা।

আমি বলিলাম—তোমার দাদার কথা ভুলে গেছি; এখন তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করবো তার জবাব দেবে।

বলুন।

আমাদের বাড়ীর মেয়েরা যে অভিনয় করবার জন্যে আয়োজন করেছে তোমরা তাতে এত বাগড়া দিচ্ছ কেন?

উহুঁ, আমরা তো উৎসাহই দিয়েছি।

রামশিঙ্গা বাজিয়ে আর পটকা ফাটিয়ে?

রামাশেষণ বলিল—এ সব তো হালের ব্যাপার। সুখেন্দুদাকে জিজ্ঞেস করবেন, আগে উৎসাহ দিয়েছি কিনা। গোলমালটা হ'ল শুধু সুমিতদির জন্যে—

অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—সুমিতার জন্যে?

বৌদি বলেছিলেন বর্ষামঙ্গলের গানের সঙ্গে বেহালা বাজাবেন—

তোমার বৌদি, ললিতা দেবী বেহালা বাজাবেন?

হাঁ বড়দা।

বেহালা তো তুমিই বাজাও—

আমি বৌদির কাছে শিখি। বৌদি বেহালা বাজিয়ে অনেক মেডেল পেয়েছেন।

খবরটা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলাম; বলিলাম—বটে! তারপর?

সুমিতদি রাজী হলেন না, আর বৌদিও চটে রইলেন। তারপর যা হ'ল সবই জানেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এত সব কাণ্ড না করে আমাকে আগে জানালে না কেন?

বৌদি বলতে বারণ করেছিলেন।

রামাশেষণকে বলিলাম—আজ বিকেলে তোমাদের বাড়ী যাব। তোমার বৌদিকে বলো কফি তৈরি করে না রাখলে ঝগড়া করব; বুঝলে?

রামাশেষণ বিদায় লইলে সুমিতাকে বলিলাম—তুই তো যত নষ্টের গোড়া।

সুমিতা যেন আকাশ থেকে পড়িয়া বলিল—আমি?

বলিলাম—রামানুজন-জায়াকে বেহালা বাজানোর পার্ট দিস নি কেন?

নীলা বলিল—ওমা, সেই কথাটা এখনও মনে করে রেখেছে না কি?

বিষয়টা চট করিয়া বুঝিয়া লইয়া পিসীমা বলিলেন—মনেই যদি না রাখবে তা হলে মহোৎসবে তোমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে বেহালা বাজাবে কেন?—কিন্তু মেয়েটা কি মিটমিটে শয়তান দেখেছ? তাই ভাবি, ললিতা-বউ আজকাল আমাদের বাড়ীতে আসে না কেন?

সুমিতাদের হর্ষবাহিকা সমিতির জন্য সব চেয়ে মোটা চাঁদা যিনি দেন সেই প্রেসিডেন্ট মহোদয়ার স্বামী বলিয়া যে সম্মানটা পাইয়া থাকি তার কতখানি ঝুটা আর কতখানি আসল তা পরীক্ষা করিবার জন্য দুপুরে রিহের্শালের মেয়েদের লইয়া মিটিং করিয়া প্রস্তাব করিলাম—ললিতাদেবী বেহালা বাজাইয়া বর্ষামঙ্গল মধুরেণ সমাপয়েৎ করিলে সব দিক রক্ষা পাইবে।

মেয়েরা প্রথমে আপত্তি তুলিয়া বলিল—বেনো জল ঢুকিলে বর্ষামঙ্গল ঘোলা হইয়া যাইবে; সুতরাং—

আপত্তিটা খণ্ডন করিবার জন্য উত্তরে বলিলাম—বর্ষার জল চিরদিনই ঘোলা, মাঙ্গলিকী গাহিয়া যদি ফর্সা করিতে না পার, তবে—

কথাটা মেয়েদের প্রাণে লাগিল। ললিতাদেবীর বেহালা সমিতির কাজে বহাল হইল।

বিকালে ললিতাদেবী আমাকে উৎকৃষ্ট কফি খাওয়াইলেন। রামানুজন তস্য জায়ার মুখ দিয়া জানাইয়া দিলেন যে অভিনয়ের খরচের সব ভার তিনি নিজের কাঁধে লইয়া কৃতার্থ হইবেন।

অবশেষে সুখেন্দুর নির্বাচিত হলেই বড়দিনের বন্ধে বর্ষামঙ্গল অভিনীত হইল। রামানুজন প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দৃশ্যপট এবং সাজসরঞ্জামের সাহায্যে ষ্টেজের উপর যে বৃষ্টিটা দেখাইলেন, পুনার আবহাওয়া আপিসে খোঁজ লইলে জানা যাইবে, চেরাপুঞ্জীতেও তত বৃষ্টি কখনও হয় নাই। বিরামের সময় পাখীর পালক মাথায় গুঁজিয়া রামানুজন-শ্যালক সোয়া দু'হাত লম্বা সানাই মুখে করিয়া যখন নাচিতে লাগিল, দর্শকরা তখন হাঁচি কাশি সবই ভুলিয়া গেল।

অভিনয়-শেষে রামাশেষণ সংস্কৃত করিয়া বলিল—নমস্তে।

রামদাস সেন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৫—১৮৮৭

জন্ম ; বিদ্যাশিক্ষা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রজবল্লভ সেন নামে জনৈক বঙ্গজ কায়স্থ পূর্ব্ববঙ্গের ইদিলপুর হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে আসিয়া সস্ত্রীক বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র কৃষ্ণকান্ত সেন নিমকির দেওয়ান হইয়াছিলেন ; কলিকাতা দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার সুবৃহৎ বাস-ভবনটি আজিও "দেওয়ান-বাড়ী" নামে পরিচিত। কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—কৃষ্ণগোবিন্দ। রামদাস এই কৃষ্ণগোবিন্দের পৌত্র ও লালমোহনের পুত্র। ১০ ডিসেম্বর ১৮৪৫ (২৬ অগ্রহায়ণ ১২৫২) তারিখে বহরমপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন।

রামদাস প্রধানতঃ গৃহেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহশিক্ষকগণের মধ্যে ভোলানাথ পালের নাম করা যাইতে পারে। তিনি কিছু দিন বহরমপুর কলেজেও বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন ছিল। বহরমপুরের বাস-ভবনে স্থাপিত তাঁহার পুস্তকালয়টি আজিও তাঁহার বিদ্যানুরাগের পরিচয় দিতেছে। বহরমপুর কলেজের পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' রচনাকালে এই মূল্যবান গ্রন্থ-সংগ্রহটি ব্যবহার করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> "এ স্থলে আমার প্রিয়তম ছাত্র বহরমপুর নিবাসী পরমস্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেনের নাম পৃথক্ ভাবে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অনুচিত কার্য্য করা হয়। রামদাস ধনিসন্তান ও অল্পবয়স্ক পুরুষ, কিন্তু ধন ও বয়সের অল্পতা একত্র সমবেত হইলে সচরাচর যে সকল দোষের সংঘটন হয়, রামদাসে সে সকলের কিছুমাত্র নাই। রামদাস অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও সদনুষ্ঠানরত। বিদ্যানুশীলনই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য। ...তিনি নিজ ভবনে একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা যে সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, সে সকল পুস্তকই প্রায় ঐ পুস্তকালয়ে সুংগৃহীত হইয়াছে।"

বিবাহ ঃ ১৮৫৯ সনের ২১এ ফেব্রুয়ারি, ১৫ বৎসর বয়সে, রামদাসের বিবাহ হয়। পাত্রী—দুর্গাতারিণী দাসী, টাকী-নিবাসী জানকীনাথ রায় চৌধুরীর কন্যা। এই বিবাহ প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' (২৪ মার্চ ১৮৫৯) লিখিয়াছিলেন :

> "বহরমপুরনিবাসি ধনরাশি স্বর্গীয় লালমোহন সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু রামদাস সেন মহোদয়ের শুভোদ্বাহ গত ১০ ফাল্গুন [২১ ফেব্রুয়ারি] সোমবার রজনীযোগে অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে,...।"

বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৬৪ সনে, রামদাস বিপত্নীক হন। পত্নী-বিয়োগে তিনি 'বিলাপতরঙ্গ' নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে টাকীর ভারতচন্দ্র রায় চৌধুরীর কন্যা—বিন্দুলতা দাসীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

সাহিত্যানুরাগ ঃ তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতেই মাতৃভাষার প্রতি রামদাসের অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি কাব্যচর্চা করিতেন ; ক্রমশঃ স্বদেশের অতীত গৌরবের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ; তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। জ্যেষ্ঠতাত রাধামোহনের হস্তলিখিত 'পশুপাশমোক্ষণ'* (প্রশ্নোত্তর ছলে লিখিত) গ্রন্থ দেখিয়া সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট সযত্নে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন রাজকার্য্যে বহরমপুরে অবস্থান করিতেন, সেই সময়ে রামদাস তাঁহার সহিত গভীর সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হন। বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের আসর—সাহিত্য-চর্চায় যেন বান ডাকিয়াছিল। ১৮৭২ সনের এপ্রিল মাসে বহরমপুর হইতে 'বঙ্গদর্শন' প্রচারিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে রামদাস 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন ; এগুলি সাদরে 'বঙ্গদর্শনে' গৃহীত হইয়াছিল।

গ্রন্থাবলী ঃ রামদাস যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। তত্ত্বসংগীত লহরী অর্থাৎ পরমার্থ বিষ্ণুতত্ত্ব বিষয়ক গীতসমূহ।

১ মাঘ ১৭৮০ শক, জানুয়ারি ১৮৫৯।

---

* পুত্র-বিয়োগে রাধামোহন সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনধামে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে তাঁহার বাগান-বাড়ী "বাগিচা বাড়ী" নামে পরিচিত। তাঁহার রচিত 'পশুপাশমোক্ষণের পাণ্ডুলিপি বর্ত্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

"জগন্মান্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার ও অপার করুণা বিতরণ করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়াছেন...।"

২। কুসুম মালা (কাব্য)। ১২৬৮ সাল, ইং ১৮৬১।

সূচী: গোলাপ, জুঁই, রজনীগন্ধ, বকুল, চাঁপা, গন্ধরাজ, কমলিনী, সন্ধ্যামণি, ঝুমকালতা, সূর্য্যমুখী, ধুতুরা।

৩। বিলাপতরঙ্গ (কাব্য)। ইং ১৮৬৪।

প্রথমা পত্নীর বিয়োগে রচিত। ১৮৬৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' লেখেন :—"বহরমপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় স্বপ্রণীত 'বিলাপ তরঙ্গ' নামক একখানি পুস্তক আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রণয়িনী-বিরহ-বিধুর হইয়া গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।"

৪। কবিতালহরী। ১২৭৪ সাল (১৭ জুলাই ১৮৬৭)। পৃ. ৫৯+১ শুদ্ধিপত্র।

৫। চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা। ১২৭৪ সাল (৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৭)। পৃ. ৬৪

ইহা ১২৭৫ সালে প্রকাশিত ২য় সংস্করণ 'কবিতালহরী'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৬। ঐতিহাসিক-রহস্য, ১ম ভাগ। ১২৮১ সাল (২৮ এপ্রিল ১৮৭৪)। পৃ. ২২০

সূচী: ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন, মহাকবি কালিদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ, হেমচন্দ্র, হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, বেদপ্রচার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র, পরিশিষ্ট।

ইহার মধ্যে 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন' ও 'মহাকবি কালিদাস' স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে যথাক্রমে ১৮৭২ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর ও ১৩ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হইয়াছিল।

"ভাগবত-সম্বন্ধীয় সমালোচন 'রহস্য-সন্দর্ভে' ও অপর প্রস্তাবগুলি সমুদয় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার পরম সুহৃদ বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুরোধক্রমে আমি এই প্রস্তাবগুলি বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকারপূর্ব্বক নানাবিধ প্রাচীন সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করি,...।"—বিজ্ঞাপন।

৭। ঐতিহাসিক-রহস্য, ২য় ভাগ। ১২৮২ সাল (১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৬)। পৃ. ২৩৬

সূচী: বাণভট্ট, জৈন-ধর্ম্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়, সঙ্গীত-শাস্ত্রানুগত নৃত্য ও অভিনয়, সাহসাঙ্ক চরিত, বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন, পালিভাষা ও তৎসমালোচন, বেদ, শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি, বুদ্ধদেবের দন্ত, পরিশিষ্ট।

৮। ঐতিহাসিক-রহস্য, ৩য় ভাগ। ১২৮৫ সাল (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯)। পৃ. ২৩৩

সূচী: জৈনমত সমালোচন, বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ-বিভাগ, কুমারপাল, বিদ্যাপতি বিহ্লণ, আর্য্যসম্প্রদায়ের আচারব্যবহার, বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ, স্বরবিজ্ঞান, পাণিনি, রাগ-নির্ণয়।
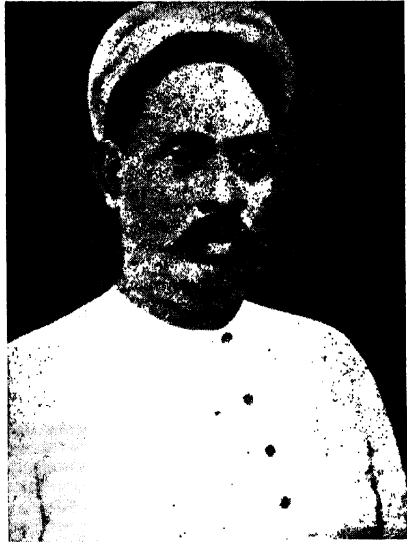
রামদাস সেন

৯। রত্ন-রহস্য। ১২৯০ সাল (২১ জানুয়ারি ১৮৮৪)। পৃ. ২৮৩+১২।

"এই গ্রন্থে সমস্ত মহারত্ন, স্বল্পরত্ন, উপরত্ন রত্নালঙ্কার ও স্বর্ণাদি ধাতু সম্বন্ধে স্থূল স্থূল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে ;... ...

"বৃহৎসংহিতা মণিপরীক্ষা, শুক্রনীতি, মানসোল্লাস, অমর-বিবেক, হেমচন্দ্রকোষ, মুক্তাবলী, রাজনির্ঘণ্ট, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, ও রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কল্পদ্রুম, এই সকল মহান্ নিবন্ধ হইতে ইহার প্রমাণাবলী সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহার শেষে মণিপরীক্ষা পুস্তকখানি ক্ষুদ্র টিপ্পনীসহ মুদ্রিত ও সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"সম্প্রতি খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজা সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর (ডাক্তর অপ্ মিউজিক) মহোদয় 'মণিমালা' নামক এক খানি রত্ন-সম্বন্ধীয় বিস্তীর্ণ পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিদেশীয় জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। উহা এদেশে অতীব বিরলপ্রচার, সুতরাং তাহা আমি দেখিতে পাই নাই।"

১০। ভারত-রহস্য। ১২৯২ সাল (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫)। পৃ. ৩০১।

"ভারত-রহস্য নাম দিয়া ভারতের পূর্ব্বজ্ঞান, ভারতের পূর্ব্বধর্ম্ম, ভারতের পূর্ব্বাচার, ভারতের পূর্ব্ব ব্যবহার, ভারতের সমর-বিজ্ঞান, ভারতের যুদ্ধাস্ত্র এবং ভারতের পূর্ব্বভক্ষ্য ও পূর্ব্ব-পরিচ্ছদ প্রভৃতি অবশ্য স্মর্ত্তব্য কতিপয় বিষয় সাধারণের গোচর করিলাম। পূর্ব্বে ভারতবাসী ঋষিরা কি প্রকারে যাগ-যজ্ঞ করিতেন; কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেন, যুদ্ধের উপকরণ বা অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি কিরূপ ছিল? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর বা প্রকৃতভাব আজকাল জনসাধারণের অবিদিতপ্রায় হইয়া আছে; সুতরাং ঐ সকল তথ্যের অববোধক এতৎপুস্তকের 'রহস্য' নাম দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই।"—ভূমিকা।

সূচী: সোমযাগ, আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, অসি, দেবযান, রাজসূয়যজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ, পুরুষমেধ-যজ্ঞ, রাজাভিষেক-পদ্ধতি, ভারতীয়-যুদ্ধরহস্য, যুদ্ধ-ধর্ম্ম।

১১। বাঙ্গালীর ইউরোপ-দর্শন (ভ্রমণ)।? (২০ জুলাই ১৮৮৬)। পৃ. ২৫২

মৃত্যুর বছর-দুই পূর্ব্বে (এপ্রিল ১৮৮৫?) রামদাস ইউরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ-কাহিনীর প্রায় সমগ্র অংশ প্রথমে ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যা 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হয়। পুস্তকে গ্রন্থকারের বা মুদ্রণ-কালের কোনরূপ উল্লেখ নাই। 'বাঙ্গালীর ইউরোপ-দর্শন' পাঠ করিয়া সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"ভ্রমণবিষয়ক পুস্তক অনেক সময়েই উপন্যাসের অপেক্ষাও মনোহর হয়। কিন্তু ইহা লিপিচাতুর্য্যের উপর নির্ভর করে। সেই লিপিচাতুর্য্য এই গ্রন্থে আছে। চাতুর্য্যের পরিত্যাগই এই চাতুর্য্য। ইউরোপে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় বাঙ্গালির পক্ষে তাহা অদ্ভুত। যেমন দেখিয়াছি, বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তেমনি লিখিলেই উপন্যাসের অপেক্ষা বিস্ময়কর হয়; তাহার ভিতর আপনার গুণপনা প্রকাশ করিতে গেলেই রসভঙ্গ হয়। এই গ্রন্থকার সেই কৌশল বিলক্ষণ জানেন। ইনি দৃষ্ট বস্তুর বর্ণনায় বিশেষ ক্ষমতাশালী; যাহা দেখিয়াছেন, চিত্রকর যেমন তুলিকায় ছবি তুলে, ইনি কথায় সেইরূপ ছবি তুলিয়াছেন; তাহার উপর আপনার সরল, অকৃত্রিম হৃদয়ের ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থ বড় মনোহর হইয়াছে। গ্রন্থে শব্দের অনর্থক আড়ম্বর নাই; কোন প্রকার নিজের বাহাদুরি নাই; কোন পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা নাই; কাহারও প্রতি রাগদ্বেষ নাই; কিছুই বাড়ান হয় নাই; কোন প্রকার রঙ্ ফলাইবার চেষ্টা নাই। ইহাই উৎকৃষ্ট রচনাচাতুর্য্য। এই জন্য এ গ্রন্থ আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।"

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১২। বুদ্ধদেব (জীবনী ও ধর্ম্মনীতি)। (১২ আগষ্ট ১৮৯১)। পৃ. ২৮৩

"ইহার কিয়দংশ প্রচারাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসে যখন পিতৃদেব [রামদাস] পরলোক-গমন করেন, তখন এই পুস্তকের চারি ফরমা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল।"

রামদাস-গ্রন্থাবলী: ১৩০৯ সাল (৩ জুলাই ১৯০২) হইতে ১৩২২ সালের মধ্যে মণিমোহন সেন পিতার গ্রন্থাবলী তিন ভাগে প্রকাশ করেন। ৩য় ভাগ গ্রন্থাবলীতে সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত অথচ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কতকগুলি রচনাও সংগৃহীত হইয়াছে; এগুলি—

সংস্কার-রহস্য, যুদ্ধ-ধর্ম্ম, পার্থিব চিন্তা, উৎকলে শ্রীগৌরাঙ্গ (কবিতা), প্রলয় (কবিতা), শ্রীজীবগোস্বামী (কবিতা), ইন্দ্র (কবিতা), Hasyarnava, On Chand's mention of Sri Harsha, Gaudiya Desa of the Ancients, The Firearms of the Hindus, On the Modern Buddhistic Researches.

১২৯৪ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত "মহাকবি রাজশেখর" প্রবন্ধটি এই সংগ্রহে বাদ পড়িয়াছে।

রামদাস স্বীয় অর্থব্যয়ে কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ পুনঃ-প্রকাশ করিয়া বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন; সেগুলি

'বাসবদত্তা'···মদনমোহন তর্কালঙ্কার

'অভিধান চিন্তামণি'—সংস্কৃত অভিধান

'অগস্তিমতম্' (রত্নশাস্ত্র)।

মৃত্যু

১৯ আগষ্ট ১৮৮৭ (৩ ভাদ্র ১২৯৪) তারিখে, মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে, রামদাস ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি নদীয়া জেলার হাট-বোয়ালিয়া গ্রামে জমিদারী দেখিতে গিয়াছিলেন; তথায় সন্ন্যাস রোগে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭) লেখেন:—

Dr. Ram Das Sen, the Zamindar and *savant* of Berhampore, is no more! It is simply impossible to express in adequate terms the deep sorrow we have felt at the news of his untimely death. The poignancy of the grief is enhanced by the fact that he died in a strange place—a village named Boalia in Nuddea where he had gone to see his zemindari affairs, and not a single member of his family was with him at the time of his death. He was overtaken by that fell disease, apoplexy, and died in the course of nearly 42 hours. The deceased was only forty-two years old, but he had long before established a literary reputation for himself which is not only Indian but European also. He was in constant correspondence with the *savants* of Europe,

and the Italian and the German Governments conferred on him the title of "Doctor." He has left a library the like of which is perhaps not to be seen in whole Bengal. As an author his works always showed vast erudition and deep researches. His name will be remembered as long as the Bengali language ceases not to exist. In his private life, he was a dutiful son, an affectionate father, a loving husband and a warm friend. As a Zamindar, his treatment with the ryots was the most generous. In short, in Dr. Ram Das Sen Bengal has lost a most worthy son—one who, though belonging to young Bengal, had none of his vices, but had all the sterling merits of the old Hindu, and who was as unostentatious and silent a worker as a true patriot ought to be.

মুর্শিদাবাদের এই উজ্জ্বল রত্নের স্মৃতিরক্ষাকল্পে গুণমুগ্ধ দেশবাসী ইতালীয় ভাস্কর সিনিয়র রণ্ডনীর (Signor Rondoni) সাহায্যে তাঁহার পাষাণ-মূর্ত্তি রচনা করাইয়া, গঙ্গাতীরে বহরমপুর কলেজের উত্তর-পশ্চিম কোণের মাঠে স্থাপনা করিয়াছেন। ১ আগষ্ট ১৮৯৯ তারিখে বঙ্গের ছোট লাট উড্‌বার্ণ প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে স্তম্ভ-গাত্রে খোদিত আছে :—

To the Memory
of
DR. RAMDAS SEN.
Born: Dec. 10, 1845. Died: Aug. 19, 1887.

An eminent oriental scholar, a learned antiquarian and a staunch friend of education. This bust is raised by his admiring and grateful friends, the people of the district of Murshidabad August 1. 1899.

রামদাস ও বাংলা-সাহিত্য : ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীদের মধ্যে পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে খুব অধিক লোক কাজ করেন নাই। মাত্র দুই জন বিশিষ্ট গবেষকের নাম আমাদের সর্ব্বদা স্মরণে আসে—রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রামদাস সেন। ইঁহাদের মধ্যে রামদাসের প্রতি আমাদের অধিকতর কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে। তিনি তাঁহার সমস্ত গবেষণা মাতৃভাষার মাধ্যমেই প্রচার করিয়া পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল যাহা ইউরোপীয় ভাষায় ও ইউরোপীয় পদ্ধতিতে করিয়াছিলেন, রামদাস মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে তাহা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি খুব দীর্ঘ দিন মাতৃভাষার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই, কিন্তু তাঁহার স্বল্প-পরিসর জীবনে ঐতিহাসিক, ভারতীয় ও রত্ন রহস্য উদ্ঘাটন করিতে গিয়া তিনি আমাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। এই কারণেই 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' (ইং ১৮৮৪) লিখিয়াছিলেন :—

"An as earnest and indefatigable student of Indian antiquities, he has no equal in this country, with the single exception of Dr. Rajendra Lala Mitra. But he is, in one respect, a greater benefactor to his country than even Dr. Mitra. Dr. Mitra's antiquarian writings are a sealed book to those who know not English ; Dr. Ram Das Sen's antiquarian writings are open to those who know only Bengali, as well as those who know English."

বাংলা-সাহিত্যের প্রতি রামদাসের অসাধারণ প্রীতি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর হইতে যখন 'বঙ্গদর্শন' বাহির করেন, তখন রামদাস তাঁহাকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রসারকল্পে তাঁহার বদান্যতাও স্মরণযোগ্য। তাঁহার নিজস্ব চেষ্টায় পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে যে-সকল মৌলিক গবেষণা আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেগুলি আধুনিক সাহিত্য-সাধকদের আদর্শস্বরূপও চিরদিন কীর্ত্তিত হইবে।

রামদাসের পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-সমাজের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। ইটালীর ফ্লোরেনটিনো একাডেমী তাঁহাকে "ডক্টর" উপাধি ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সংস্কৃত-বিদ্যানুরাগী ইউরোপীয় পণ্ডিত-গণের সহিত রামদাসের পত্র-ব্যবহার ছিল। একবার মনীষী ম্যাক্সমূলার একখানি পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :—

"Take all what is good from Europe only, do not try to become Europeans, but remain what you are, sons of Manu, children of a bountiful soil, seekers after truth, worshippers of the same unknown God, Whom all men ignorantly worship, and Whom all very truly and wisely serve by doing what is just and good."

রামদাসের জীবনের আদর্শও ইহাই ছিল। ধনীর সন্তান হইয়াও তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাব-প্রবাহে অন্য অনেকের মত ভাসিয়া যান নাই, ভারতীয় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সে যুগের পক্ষে ইহা যে কত বড় শক্তির পরিচয়, আজ আমরা তাহা অনুমানও করিতে পারি না।

দেশসেবায় মূক-বধির কারিগর

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার

বাস্তব জগতে শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক। আমাদের সুখসুবিধার জন্য যে নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করি সেকথা ভাবিয়া দেখিলেই উপরোক্ত মন্তব্যটির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। ইহার পশ্চাতে

কামারের কাজ করিতেছে

যে সকল শিল্পীর পরিশ্রম ও বুদ্ধির খেলা চলিতেছে তাহারা সত্যই ধন্যবাদার্হ।

এই শিল্পী কর্ম্মীদের মধ্যে এমন এক দল আছেন যাঁহাদের শিল্পনৈপুণ্য ও কার্য্যকুশলতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় ও তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা সহজেই অপসারিত

দপ্তরীর কাজে রত একটি মূক-বধির বালক

হইয়া যায়। ইঁহারা হইলেন সমাজের নগণ্য মূক-বধির শিল্পী-গণ। এত দিন আমরা ইঁহাদিগকে কালা বা বোবা বলিয়া ঘৃণা ও উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। উপরন্তু বলিয়াছি, ইঁহারা সমাজের বোঝাস্বরূপ। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা আর সেরূপ নাই। ইঁহাদের সম্বন্ধে এখন তেমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করাও উচিত নয়। শিক্ষাগুণে ইঁহারা শিল্পকলায় অপূর্ব্ব দক্ষতা লাভ করে, উপরন্তু কথাও বলিতে শিখে। আজকাল যে সমস্ত মূক-বধির শিল্পী শিল্পকলার সাহায্যে নিজেদের অন্নসংস্থান করিয়া দেশের ও দশের সেবা করিয়া যাইতেছেন তাঁহারা সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়

মাটির পুতুল গড়া

এই যে, এই সকল মূক-বধির নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে যোগ দিতে এবং সমাজেও বিশিষ্ট আসন অধিকার করিতে পারেন। শিক্ষাগুণে সমাজের এই বিকল অংশ অমূল্য সম্পদে পরিণত হইতে পারে।

বিগত মহাসমরে জগতের বিভিন্ন স্থানে স্ব-স্ব দেশের কল্যাণ-কর্ম্মে মূক-বধির শিল্পীদের দানও উল্লেখযোগ্য। মূক-বধিররাও যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিল। তাহারা অন্যান্য বহু কর্ম্মীর মত দেশের সেবা করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহারা সম্মুখসমরে প্রাণ দেন তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ যেমন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়, তেমনই যাঁহারা

যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করেন তাঁহারাও সমানভাবে প্রশংসার্হ। এই মূক-বধিরগণ নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে

কাঠের কাজ করিতেছে

বিগত মহাসমরের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতির কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা নিজেদের শিল্পনৈপুণ্য-গুণে বড় বড় কল-কারখানায় কার্য্যকুশলতা দেখাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মূক-বধিরদের নির্ম্মিত কুটীর-শিল্প যুদ্ধের বহু অভাব মিটাইয়াছে।

অনেকের ধারণা মূক-বধিরগণ বড় বড় কল-কারখানাতে কাজ করিবার অনুপযুক্ত। কারণ সাধারণ বুদ্ধির অভাবে, শ্রবণশক্তির অভাবে যে কোন মুহূর্ত্তে তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে
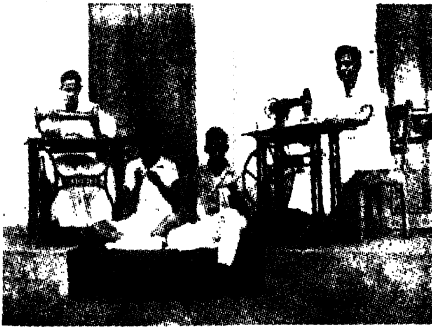
মেসিনে সেলাইয়ের কাজ করিতেছে

পারে। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই অমূলক। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে বহু বড় বড় কলকারখানায় অসংখ্য মূক-বধিরকে নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিয়োগ করা হইতেছে। আমেরিকার বিখ্যাত "ফোর্ড কোম্পানীতে" বহু মূক-বধির সাধারণ কর্ম্মীর মত কাজ করিয়া যাইতেছে। স্বয়ং হেনরী ফোর্ড স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মূক-বধির কর্ম্মিগণকে কার্য্যে

নিয়োগ করা ষোল আনাই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য। তাহাদের দায়িত্ব লইবার জন্য বিশেষ কোন আইন বা

ছুতারের কাজ করিতেছে

ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক মিল-মালিক দয়া-পরবশ হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মূক-বধিরগণ কৃপাপ্রার্থী হইতে যাইবে কেন? তাহারা তাহাদের পূর্ণ কর্ম্মক্ষমতার দাবিতে সর্ব্বত্র সমান মর্য্যাদা পাইবে। জন্ম-বধির হইলেই মানুষ মূক অর্থাৎ বোবা হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল হওয়ায় মূক-বধিরদের দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শনেন্দ্রিয় অতীব প্রখর হয়। এই দুই ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন দ্বারাই উহাদিগকে কথা বলা শিখানো হয়। শিল্পকলাদি বিষয়ে ইহারা ছোটবেলা হইতেই দক্ষতা অর্জ্জন করে, কারণ সাধারণ লোক অপেক্ষা ইহাদের অনুকরণ করিবার ক্ষমতা অনেক বেশী। সেইজন্য সাধারণ লোকেরা কখনো কখনো

ছাপাখানায় কাজ করিতেছে

ইহাদের শিল্পনৈপুণ্যের কাছে হার মানিতে বাধ্য হয়। যাহাতে মূক-বধিরগণ সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত না হইতে পারেন, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেণ্ট তদনুরূপ আইন প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছেন।

কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষা বিভাগে কুঁদে এবং তুরপুনে কর্ম্মরত ছাত্রবৃন্দ

আজ আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। কিন্তু সে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক এবং সর্ব্বোপরি সামাজিক স্বাধীনতা আনিতে গেলে আমাদের এই মূক বন্ধুদের কথা ভুলিলে চলিবে না। প্রগতিশীল সমাজ গঠন করিতে হইলে আমরা এতদিন যাহাদিগকে অবহেলা করিয়া আসিতেছি তাহাদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার করিতে হইবে, 'মূক মুখে ভাষা' দিতে হইবে। তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে তাহারা ঘৃণ্য, অবহেলিত জীবন যাপন করিতে আসে নাই। সম্মুখে তাহাদের করিবার মত বহু কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে।

দপ্তরীর কাজ করিতেছে

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। কয়েক জন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী নীরব কর্ম্মীর প্রচেষ্টায় আজ ভারতের অগণিত মূক-বধিরের সেবাকল্পে কয়েকটি মাত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। মূক-বধিরদের সংখ্যা-অনুপাতে শিক্ষাকেন্দ্র অতি অল্প। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ছাত্র মূক-বধির-শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পরবর্ত্তী জীবনের কথা যদি সকলে ভাবিয়া দেখেন তবে তাঁহাদের জন্য এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সার্থকতা উপলব্ধি

মাটির খেলনা তৈরি করা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে

করিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মূক বধিরদের মধ্যে অনেকে এমন খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন যাহা সচরাচর বিরল। আমাদের দেশেও বহু মূক-বধিরের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোনও বিষয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। যে-কোন মূক-বধির বিদ্যালয়ে মূক-বধিরদের কার্য্যপ্রণালী ও তাহাদের তৈয়ারি নানা ধরণের কাঠের আসবাবপত্র, চামড়ার দ্রব্য, লোহার নানা প্রকার জিনিষ ও বিভিন্ন রকমের পুতুল দেখিলে সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইবেন। আজকাল কলিকাতায় বহু দোকানে মূক-বধির শিল্পীদের তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিষপত্র

পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর শ্রীরাজাগোপালাচারী কারখানায় ছেলেদের কাজ পরিদর্শন করিতেছেন

বিক্রয় হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন মূক-বধির-চালিত অনেক দর্জির দোকান আছে। বহু কর্ম্মী ছাপাখানার কাজ এবং দপ্তরীর কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। অনেক মূক-বধির চিত্রাঙ্কন, চারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। বড় বড় কলকারখানাতেও তাহাদের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকে।

এই সব হতভাগ্য মূক-বধিরকে শিক্ষিত, আত্মমর্য্যাদা বোধসম্পন্ন, স্বাবলম্বী হইতে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। তাহারা প্রত্যেকেই যাহাতে শিল্প-শিক্ষা পাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। শুধু মৌখিক উৎসাহবাণী বর্ষণ করিলে চলিবে না, এই কার্য্যে ধৈর্য্যসহকারে নামিতে হইবে। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টেরও দায়িত্ব অনেক।

পলাতকা

আশরাফ সিদ্দিকী

প্রেমমুকুলিত প্রথম ফাগুনে বকুল-ঝরানো দিনে
হে রাজকুমারী, তেপান্তরিকা, আধো হাসি আধো লাজে
ফুলের বাসরে প্রথম প্রেমের দিয়েছিলে মালাখানি
অধীর আবেগে অধর-সুধায় টেনেছিনু বাহুমাঝে।

শুক্লাতিথির চাঁদেরে জড়ায়ে সরসী স্বপন দেখে
কুমুদ-বাসরে মরাল-মরালী বুকে বুকে মিশে রয়;
আমার ভুবনে নামিল বুঝি রে স্বপ্নতেপান্তর
'বউ কথা কও' ডাকছে তখনো মায়াময়, মধুময়।

চোখে চোখ রাখি সেদিন তোমায় বলেছিনু: 'মমতাজ!
আমি তব কবি—তুমি যে কাব্যশতদল সুবিমল
আমি রূপকার—শ্যামলী গো মোর তুমি হবে রূপায়ণ
ধূলির ধরায় নতুন প্রেমের গাঁথবো তাজমহল।'

মদির মলয়ে কামরাঙা-বন কেঁপে ওঠে থরোথরো
থরোথরো বুক, সেদিন আমায় বলেছিলে: 'প্রিয়তম!
হে চাঁদ, তোমার রূপালী সুধার অমল ঝরণাতলে
আমার পৃথিবী কুসুমে কুসুমে করে দিও অনুপম।'

কাছে থেকে দূর সারাটি দিবস হাজারো কাজের ফাঁকে
চুরি ক'রে তব ভীরু দুটি চোখ আমারে খুঁজিয়া মরে;
হাসনুহানার মধু রজনীর গানের পাখীরা মোর
জানিনি তো হায়! সহসা প্রভাতে লুটাবে ব্যাধের শরে!

জানি স্বরগের সোনার টিয়ারে এ মাটির খেলাঘরে
যাবে নাকো বাঁধা সোনার শিকলে! হাসনুহানার দল
জানি ঝরে যায়—আবার মিলায় অসীম সুরভিলোকে
এ মাটির বুকে সবটুকু তার ঢেলে দিয়ে পরিমল।

এই মধুমাস—এই মধুরাত—জীবন-সাথী গো মোর!
তুমি কাছে নাই—নাই নাই নাই! নীরব বাসর-রাতি
রুদ্ধ কপাট! ঘরের প্রদীপও নিভায়ে দিয়েছি তাই
আলোতে কি কাজ? অন্তরে যার জ্বলিছে প্রেমের বাতি॥

ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্

শ্রীভূপেশ দত্ত, সি.-এ.-আই.-বি. (লণ্ডন)

ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল ও ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল ও পাকিস্থানের সঙ্গে যে আলোচনা সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলস্বরূপ পৃথক পৃথক ভাবে আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্তীকালীন চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। এখন উভয় ডোমিনিয়নের পৃথক সত্তার উপর জোর দিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের "ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ একাউন্ট নাম্বার ওয়ান্"-এর অনুরূপ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া পাকিস্থানের জন্য নূতন করিয়া খুলিয়াছে "পাকিস্থান ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ একাউন্ট নাম্বার ওয়ান্।" পাকিস্থানের একাউন্ট নাম্বার ওয়ানের ওপেনিং ব্যালান্স হইল এক কোটি পাউণ্ড। তাহা ছাড়া দুই ডোমিনিয়নের সম্পত্তি হিসাবে রহিয়াছে "ফ্রোজেন্ ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ একাউন্ট নাম্বার টু"। এই একাউন্ট নাম্বার টু হইতে বর্ত্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নের একাউন্ট নাম্বার ওয়ানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, আর পাকিস্থানের একাউন্ট নাম্বার ওয়ানে করা হইয়াছে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। দুই ডোমিনিয়নের আলাদা আলাদা একাউন্ট নাম্বার ওয়ান চলতি হিসাবের জন্য ব্যবহৃত হইবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারত ও পাকিস্থানের মোট পাওনা ছিল ১১৬ কোটি পাউণ্ড। তন্মধ্যে ব্রিটেন ১৭ কোটি পাউণ্ড পরিশোধ করিয়া দেওয়ায় উক্ত পাওনার অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে ৯৯ কোটি পাউণ্ডে।

ভারতীয় ইউনিয়ন আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্য্যন্ত সেন্ট্রাল রিজার্ভ অব হার্ড কারেন্সীস্ হইতে ১ কোটি পাউণ্ডের বেশী মুদ্রা উঠাইবে না বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। ভারত ইউ. এস্. ডলারের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য মুদ্রা তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

৬ মাসের চুক্তি ছাড়া বর্ত্তমানে ব্রিটেনের সঙ্গে অন্য কোনও আলোচনা হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

যুদ্ধবিরতির পর হইতে দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের সঙ্গে ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ প্রশ্ন লইয়া সামগ্রিক আলোচনা করা হয় নাই। গত আগষ্ট মাসে করা হইয়াছে ৬ মাসের অন্তর্ব্বর্তীকালীন ব্যবস্থা, আর এইবারও করা হইল আর একটা ৬ মাসের চুক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের ঘোর বিপদের দিনে দরিদ্র ভারত অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়া ব্রিটেনকে যে সব যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়াছে সেগুলির ব্রিটিশের ধরা দাম অনুসারে ভারতের পাওনা দাঁড়াইয়াছে ১১৭ কোটি পাউণ্ডে। কিয়দংশ পরিশোধ হওয়ার দরুন ঐ পাওনার অঙ্ক এখন দাঁড়াইয়াছে ৯৯ কোটি পাউণ্ডে। দেনাদার কেবল তার খুশীমত কম দাম ধরিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, সুদের হারও নিজের সুবিধামত ধরিয়াছে। পাওনাদার হওয়া সত্ত্বেও সঙ্কোচের ভাব যেন আমাদেরই বেশী। আমাদের টাকাটা কত বছরের মধ্যে, কি প্রকার কিস্তিতে এবং ষ্টার্লিং, ইউ-এস্. ডলার ও বুলিয়ান্—এই তিনের কি কি প্রকার অংশে ফেরত পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করিবার সৌভাগ্যের অপেক্ষায় আছি।

"কুইট্ ইণ্ডিয়া"র দাবি জানাইয়া আমরা যেমন নির্ভীক ভাবে ব্যাপক আন্দোলন চালাইয়াছি, ব্রিটেনের নিকট ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ পরিশোধের পাকাপাকি ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার দাবি জানাইয়া তেমন কোনও আন্দোলন আমরা চালাই নাই। সাধারণ লোক অর্থনীতির জটিলতা লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহে না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরাও এই ব্যাপারে যথোপযুক্ত উৎসাহ দেখান নাই। পক্ষান্তরে ব্রিটেন তার দেনাটা যত কম ও যত দেরি করিয়া শোধ করিতে পারে তজ্জন্য কর্ণধার হিসাবে পাঠাইয়াছে একজন ভারতের প্রাক্তন অর্থসচিবকে, যাঁর ব্যক্তি-সত্তা ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে অতীব কার্য্যকরী হইয়াছে।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে ব্রিটেন আমাদের পাওনা মিটাইয়া দিবার ব্যাপারে অবিচার করিবে না। ২৩শে নবেম্বর, ১৯৪৪ তারিখে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইকনমিক সোসাইটিতে "আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-তহবিল ও ভারত" শীর্ষক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন,

"But I think it is best to proceed in the belief that Great Britain will not be deliberately unjust and will honour her obligations to India."

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"Britain need only pay about one per cent of her National Income towards the liquidation of India's sterling balances over a period of ten years. This should not put an excessive strain on the National Economy and standard of living of Britain."

কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা থাকিলেই যে দেনাদারের মনে তাহা করিবার ইচ্ছা জাগিবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। আমরা আজও ভারতীয় ঋণ পরিশোধকল্পে ব্রিটেনের দশবার্ষিকী চুক্তির কথা শুনি নাই। আগামী ছয় মাসের মধ্যে ব্রিটেন উভয় ডোমিনিয়নকে দিবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড + ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। মোট ৯৯ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে উভয় ডোমিনিয়ন পাইবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড

(উপরোক্ত পৃথক অঙ্কে)। এই অনুপাতে বছরে পড়িবে প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ড এবং সমস্ত টাকা সুদ সমেত পরিশোধ হইতে সময় লাগিবে ২৫ বৎসরের অধিক।

আমাদের ঘরের টাকা ব্রিটেনের কাছে আটকা পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও পরের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের কি কি লোকসান তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার। চলতি খরচ ছাড়াও আমাদের শিল্প বিস্তার ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হইবে। আমাদের টাকা আমাদের হাতে ফিরিয়া আসিলে যেখানে মূলধন খাতে একটা মোটা রকমের নিজস্ব ক্রেডিট ব্যাল্যান্স থাকিত, পরের নিকট হইতে ধার করিলে সেই জায়গায় আসিয়া পড়িবে একটা ক্যাপিট্যাল লোন। আসল টাকা ও তার সুদ উভয় মিলিয়া একটা বিরাট্ বোঝা ঘাড়ে চাপিবে। নিজেদের ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ ও তার সুদবাবদ কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, কর্জ্জ করা টাকার সুদ কিস্তিমত চালাইয়া যাইতে হইবে। আমাদের ফরেন্ এক্সচেঞ্জ তহবিলের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই সুদের টাকা পরিশোধ করিবার জন্য মুদ্রা-তহবিল হইতে চড়া সুদে কর্জ্জ করা ছাড়া কোনও উপায় থাকিবে না। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা দরকার যে আমরা ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্-এর "বুক এন্ট্রি" হিসাবে যে সুদ পাইতেছি, আমাদের অপরের নিকট হইতে কর্জ্জ করা টাকার উপর সেই সুদ দিতে হইবে এবং ঐ সুদ পরিশোধ করিবার জন্য মুদ্রা তহবিলকে যে সুদ দিব, শেষোক্ত দুইয়ের গড়পড়তা হার প্রথমোক্ত পাওনা সুদের হারের চেয়ে কমপক্ষে শতকরা ১% বেশী হইবে। কোনও কালে আমাদের ঘরের টাকা ঘরে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের মোট লোকসান একটা বিরাট্ অঙ্কে দাঁড়াইবে। ক্যাপিট্যাল লোন গ্রহণ করার দরুন সুদের জের টানা মুদ্রা-তহবিলস্থিত আমাদের চলতি হিসাবকেও দারুণভাবে পঙ্গু করিয়া ফেলিবে। সুদের টাকার বোঝা ও সুদ পরিশোধ করিবার জন্য মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণ—এতদুভয় নিয়মানুসারে মুদ্রা-তহবিলের চলতি হিসাবের এলাকায় আসিয়া পড়িবে। এই গুরুভার মুদ্রা-তহবিল ও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের উপর জোর আঘাত হানিবে—যাহার ফলে আমরা একটা "ক্রনিক অ্যাডভার্স ব্যাল্যান্স-ওয়ালা" দেশে পরিণত হইব। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের নিকট হইতে আমাদের পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করাই সমীচীন।

ভারতীয় ইউনিয়ন ব্রিটেনের সঙ্গে এই প্রকার চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছে যে আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্য্যন্ত "সেণ্ট্রাল রিজার্ভস্ ফর হার্ড কারেন্সীস্" হইতে এক কোটি পাউণ্ডের বেশী উঠাইবে না। দ্বিতীয়তঃ ভারত ইউ. এস্. ডলারের ঘাটতি পূরণ করার জন্য আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিবে। এই কর্জ্জের পরিমাণ হইবে এক কোটি ইউ. এস্. ডলার। এই ঋণের জন্য সার্ভিস্ চার্জ্জ দিতে হইবে শতকরা চার ভাগের তিন ভাগ। ওভারড্রাফট হারের নিয়ম এমন ভাবে বাঁধা আছে যাহাতে মুদ্রা-তহবিল হইতে বেশী পরিমাণ টাকা ধার করা অথবা দীর্ঘ দিন ঋণ পরিশোধ না করা—উভয় কার্য্যই দেনাদারের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িবে। ভারতকে মোটা টাকা ধার করিতে হইবে। আমাদের পক্ষে ইহা কত বড় লাভজনক ব্যাপার তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছে ষ্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকা ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ তারিখের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। উক্ত প্রবন্ধে আছে,

"The Fund's articles of Agreement allow a member to buy the currency of another in exchange of its own currency subject to certain limitations. As India's quota is equivalent to \$400m she is apparently entitled to buy \$100 in the coming year at a service charge of ¾ per cent, rising by ½ per cent annually. The U. K. has already purchased dollars from the Fund. India's present opportunity is a strange commentary to the Bretton Wood's debate in the Central Assembly during 1946. Ratification of the Agreement setting up the Fund was agreed to only after a prolonged debate."

ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা স্বজাতিপ্রেম বশতঃ আমাদিগকে ভুল রাস্তা বাতলাইতেছে। উক্ত পত্রিকা আমাদের পাওনা টাকা ব্রিটেনের নিকট হইতে আদায় না করিয়া মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণের কানুনের কথা উল্লেখ করিয়াছে এবং ইহাকে একটা সুযোগ বলিয়া আখ্যা দিয়াছে। ব্রিটেনের মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ লওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টায় ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা কিঞ্চিন্মাত্র কসুর করে নাই। কিন্তু আর্থিক সঙ্কটে পতিত ব্রিটেনের নিকট যাহা সুযোগ আমরা তাহাকে সুবিধা মনে করিব কোন্ কারণে? বরং ব্রিটেনের অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার পূর্ব্বে আমরা আমাদের টাকা যতটা ঘরে উঠাইয়া আনিতে পারি তাহার চেষ্টাই করিতে হইবে। ব্রিটেন মুদ্রা-তহবিল হইতে ধার লইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইউ. এস.-এর নিকট হইতে যে মোটা অঙ্কের ধার করিয়াছিল তাহার শেষ কিস্তি ১০ কোটি ইউ. এস. ডলার এই মাসের মধ্যে উঠাইয়া লইবে। একদিকে অতি শীঘ্র ব্রিটেনের তহবিল শূন্য হইয়া পড়িবার কথা; কিন্তু অপর দিকে মার্শাল প্ল্যানের দৌলতে আগামী মাসেই ব্রিটেনের হাতে মোটা রকমের ইউ. এস. ডলারের তহবিল আসিয়া জুটিবে। সুতরাং ব্রিটেনের হাতে এই টাকা থাকিতে থাকিতে ভারত তার পাওনার একটা বড় অংশ আদায় করিবার চেষ্টা না করিলে প্রকাণ্ড ভুল করিবে। যাহাতে আমাদের চলতি খরচের জন্য মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিতে না হয় এবং আমরা

আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য একটা বড় তহবিল পাইতে পারি, কালবিলম্ব না করিয়া ব্রিটেনের উপর সেই প্রকার চাপ দিতে হইবে। ষ্টেট্সম্যান পত্রিকা আমাদিগকে যাহা 'opportunity' সুযোগ বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা মোটেই opportunity নহে। বরং ইহা আমাদের অতি বড় দুর্ভাগ্য যে আমাদের মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ করিতে হইতেছে। ইহাতে আমাদের আনন্দিত হইবার কারণ মোটেই নাই।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্-এর প্রয়োজন হইবে খুব বেশী। আমাদের শিল্পপ্রসারে এবং কৃষিকর্ম্মের উন্নতিসাধনে বিদেশ হইতে মূলধন ও কাঁচা মাল আমদানী করিতে হইবে। এইজন্য আমাদের দুইটি স্থায়ী ষ্টার্লিং ফাণ্ড ও ডলার ফাণ্ডের দরকার যাহাতে আমরা প্রয়োজনানুসারে টাকা উঠাইয়া উপরোক্ত বিদেশী মাল ক্রয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে পারি। ব্রিটেনের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াই এই ফাণ্ড দুইটির গোড়াপত্তন করিতে ও বৃহৎ অংশ জোগাইতে হইবে। ব্রিটেনের ডলার ও স্বর্ণের অবস্থা সম্বন্ধে ইউ. এস. ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট হালে যে মন্তব্য করিয়াছে তাহা এই,—

"Britain's gold and dollar resources now at about $200 m will go down to $100 m by the end of 1948 and large dollar deficits will continue thereafter."—*Reuter*, January 14, 1948.

ব্রিটেনের অবস্থার শোচনীয় অবনতি ঘটিবার পূর্ব্বেই জোর তাগাদা দিয়া ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্-এর একটা মোটা অংশ উসুল করিবার জন্য আমাদিগকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ইহাও ভাবিবার বিষয় যে আমরা এক দিকে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করিয়াছি পাঁচ বৎসরের জন্য এবং অপর দিকে ষ্টার্লিং ব্যালেন্সেস্ চুক্তি করিয়াছি ৬ মাসের জন্য। দুইটার সময়ের বিরাট্ ব্যবধান। বৈদেশিক পাওনার প্রশ্নকে এইভাবে উপেক্ষা করিয়া এত বড় একটা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইবে সর্ব্ববিধ উন্নয়ন কার্য্যের সূচনা মাত্র। তারপরে আসিবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এইরূপ পর পর দুইটা পরিকল্পনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের নিকট হইতে যাহাতে পাওনা টাকাটার উদ্ধার ঘটে সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। দীর্ঘকালীন উন্নয়ন-পরিকল্পনার সঙ্গে কি করিয়া স্বল্পকালীন ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্ চুক্তি খাপ খাইতে পারে তাহা আমাদের নেতারা একবার ভাবিয়া দেখিতে পারেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের আশানুযায়ী ব্রিটিশ-জাতি যদি ন্যায়পরায়ণ হইয়া দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের পাওনা টাকা ফিরাইয়া দেয় তাহা হইলে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ থাকে না। কিন্তু আমরা আজ পর্য্যন্ত আশান্বিত হইবার মত কিছুই পাই নাই। অথচ দ্বিতীয় অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন চুক্তিতে আমরা উল্লসিত হইয়াছি এত বেশী যে মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করার মত দুরবস্থা আমাদের হওয়া সত্ত্বেও সর জেরিমি রেইসম্যান্ ও তাঁর জ্ঞাতভাইদের বর্ত্তমান চুক্তির সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছি। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচীতে ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্ লইয়া কোনও বিস্তৃত আলোচনা করা হয় নাই। 'ইকনমিক কমিটি'র নেতা হিসাবে পণ্ডিত জবাহরলালও আজ পর্য্যন্ত ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ সমস্যার উপর কোনরূপ আলোকসম্পাত করেন নাই। একটা বড় প্রোগ্রাম হাতে লইয়া আট-ঘাট বাঁধিয়া কাজে নামা উচিত। এই ক্ষেত্রে বৈদেশিক দেনা-পাওনা সম্বন্ধে চোখ বুজিয়া থাকিলে সমস্যার সমাধান হইবে না।

ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্ এর সামগ্রিক আলোচনায় বিলম্ব ঘটায় আমাদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি হাতে লওয়া ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। একজন বিচক্ষণ ও ভারতীয় স্বার্থ সম্পর্কে অতীব সজাগ ব্যক্তির নেতৃত্বে একটা মিশন ব্রিটেনে পাঠানো দরকার যাহাতে তথায় আমাদের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি হইতে পারে। আর একটা মিশন পাঠানো দরকার অন্যান্য দেশসমূহে। ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্ অর্জ্জন করিতে আমাদের কি প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে আমাদের ঐ টাকার কিরূপ জরুরী দরকার তাহা সকলকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে হইবে—যাহাতে আমাদের পাওনা টাকা আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ঘরে ফিরিয়া আসে। ব্রিটেন অতীব কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের পাওনা ন্যায্য হারে পরিশোধ করিবে এইরূপ আশা করিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের বিফলমনোরথ হইতে হইবে।

পরিশেষে ইহা বলাই যথেষ্ট হইবে যে ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য দেখাইবার বিষয়ও নহে কিম্বা সাধারণ লোকের ভীতির বস্তুও নহে। ইহা আমাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পত্তি। ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্ যুদ্ধের সময় গড়িয়া উঠিয়াছে, আর আজ আমাদের প্রয়োজনের সময় এই টাকা মুক্ত করিতে না পারিলে আমাদের দুর্ভাগ্যের বোঝা ক্রমশঃ ভারী হইতে থাকিবে।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

মধ্য-পশ্চিম

শনিবার সকালে এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিঙের ছাদে গিয়া উঠিলাম। কিছু প্রবেশমূল্য লইয়া ইহারা দর্শনার্থিগণকে ছাদে উঠায়। শ্রেণী-বদ্ধ অসংখ্য লিফট্ নরনারীকে উঠাইতেছে ও নামাইতেছে।

৫টি বা ৬টি করিয়া তলার জন্য এক একটি লিফট্ নির্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক লিফট্ শুধু নির্দিষ্ট তলা কয়টিতেই ওঠানামা করে। এতদ্ভিন্ন এক্সপ্রেস লিফট্ আছে। সেগুলি সকল তলায় না থামিয়া দ্রুত একটি বা দুইটি নির্দিষ্ট তলায় চলিয়া যায়। ছাদে উঠিতে আমাদের একবার লিফট্ বদল করিতে হইল। প্রথম এক্সপ্রেস লিফট্ কোথাও না থামিয়া আমাদিগকে ৮৭ তলায় লইয়া গেল। দ্বিতীয় এক্সপ্রেস লিফট্ ৮৭ তলা হইতে ছাদ পর্যান্ত চলে। অন্য কোথাও থামে না।

মধ্য-ম্যানহাটনে ৫ম এভিনিউ ও ৩৪তম ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে বাড়ীটি অবস্থিত। বাড়ীটি ১০২ তলা, ১২৫০ ফুট উচ্চ—পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম। একবার নাকি একটি এরোপ্লেন এই বাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ছাদ হইতে নিউ ইয়র্ক নগরীর দৃশ্য অপূর্ব। আকাশচুম্বী সৌধমালা এখান হইতে ছোট মনে হয়। অদূরে ১০৪৬ ফুট উচ্চ, ৭৭ তলা ক্রাইসলার বিল্ডিং। ইহা পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় বাড়ী। রকফেলার কেন্দ্রের উচ্চতম ৭০ তলা আর, সি, এ বিল্ডিং উচ্চতায় তৃতীয়। দক্ষিণে ৬০ তলা-বিশিষ্ট উল-ওয়ার্থ বিল্ডিং। ৫০ তলা, ৬০ তলা বাড়ীর অভাব নাই। সমস্ত শহরটি ছাদের উপর হইতে চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠে। দক্ষিণে স্বাধীনতার মূর্তি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। পূর্বে ও পশ্চিমে নদী। নদীতে ইতস্ততঃ ভাসমান জাহাজসমূহ। নদীর উপর সেতুসমূহ দৃশ্যমান। হাডসনের ওপারে নিউ জার্সি শহর। দূরে ক্যাটস্কিল পর্বতমালা। ইষ্ট নদীর ওপারে ব্রুকলিন্। বহু দূরে লাগার্ডিয়া এরোড্রোম। দূরে হাডসনের উপরিস্থিত জর্জ ওয়াশিংটন সেতু। উত্তরে কেন্দ্রীয় পার্ক সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। ওয়ালডর্ফ এষ্টোরিয়া হোটেল বেশীদূর নয়। আমার হোটেলটিও দেখা যাইতেছিল। রাস্তায় প্রবহমাণ নদীর মত জনস্রোত ও শকটশ্রেণী। গাড়ীগুলি চলিতে চলিতে ইষ্ট নদীর টানেলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। সমস্ত মিলিয়া এক অতুলনীয় দৃশ্য।

বিকালে রকফেলার-কেন্দ্রে গেলাম। দর্শনার্থীদের এক একটি দল লইয়া এক একটি গাইড সমস্ত কেন্দ্রটি দেখাইতেছে। কয়েক মিনিট পর পরই এক একজন গাইড এক একটি দল লইয়া রওনা হইতেছে।

উক্ত কেন্দ্রটি ১৪টি আকাশচুম্বী সৌধের সমষ্টি; ৫ম ও ৬ষ্ঠ এভিনিউর মধ্যে ৪৮তম ষ্ট্রীট হইতে ৫১তম ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাড়ীগুলির উচ্চতা সমান নয়। উচ্চতম বাড়ীটি ৭০ তলা। বহু দোকান, আপিস, থিয়েটার প্রভৃতি এই গৃহসমষ্টির মধ্যে অবস্থিত। ৩০,০০০ কর্মচারী প্রত্যহ এই বাড়ীটিতে কাজ করিতে আসে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় ও ছুটির সময় এই ত্রিশ হাজার লোককে উঠানো ও নামানো লিফট্গুলির একটি বিরাট কার্য। প্রত্যহ নানাবিধ কার্যোপলক্ষে এই বাড়ীতে কয়েক লক্ষ লোক প্রবেশ করে। এত বড় অঞ্চলের কেন্দ্রীয় তাপ-ব্যবস্থা ও সুড়ঙ্গপথশ্রেণী বিস্ময়কর বস্তু। বস্তুতঃ ইহা একটি স্বতন্ত্র নগরবিশেষ।

বাড়ীগুলির মধ্যে বহু হোটেল ও আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত আছে। একস্থানে ছেলেমেয়েরা স্কেট করিতেছে। দেখিতে বেশ লাগিল। পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চ ইহারই একটি বাড়ীর মধ্যে অবস্থিত। এখানে ৬,২০০ লোকের বসিবার আসন বিগুমান। একটি বাড়ীর নাম আন্তর্জাতিক বাড়ী। ইহাতে ইংরেজ, ফরাসী, ইটালী, ভারতীয় প্রভৃতি বহু জাতির কন্‌সালগণের আপিস। একটি বাড়ীতে রেডিওতে নানা অনুষ্ঠান চলিতেছে। ছোট ছেলেমেয়েদের একটি গীতাভিনয় আমাদের সমক্ষে প্রচারিত হইল। এখানে টেলিভিশন দেখিতে পাইলাম। আমাদেরই মধ্যে কেহ কেহ দূরের একটি ঘরে গিয়া কিছু আবৃত্তি করিলেন বা অন্য কথা-বার্ত্তা বলিলেন। এ ঘরে যন্ত্রের উপরে তাঁহাদের চেহারা ও অঙ্গসঞ্চালন ভাসিয়া উঠিল। আমরা তাঁহাদিগকে পরিষ্কার দেখিলাম ও তাঁহাদের কথাবার্ত্তা স্পষ্ট শুনিলাম। ইহার কয়েকদিন পরে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সর্বপ্রথম তাঁহার "সাদা বাড়ী"তে বসিয়া টেলিভিশন যোগে কংগ্রেসের অধিবেশন দেখিলেন ও বক্তৃতাদি শুনিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন টেলিভিশন যোগে সাধারণ্যে প্রচার করা সঙ্গত কিনা এ সম্বন্ধে তখন খবরের কাগজে আলোচনা চলিল। এক পক্ষ ইহার বিরোধিতা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "কংগ্রেসের অধিবেশনকালে সভ্যগণের আচরণ প্রত্যক্ষ করিলে কংগ্রেসের উপর এবং কংগ্রেসের পাস করা আইনের উপর সর্বসাধারণের অশ্রদ্ধা আসিবে।"

ঐ দিন রাত্রে নিউইয়র্কস্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতির বাড়ীতে গিয়া সমিতির অধ্যক্ষ অখিলানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করি। ১৭নং পূর্ব-৯৪তম ষ্ট্রীটে সমিতির নিজস্ব বাড়ী। স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম

এবং পরদিন সকালের প্রার্থনা-সভায় এবং মধ্যাহ্ন-ভোজনে উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম। স্বামীজীর নিকট সংবাদ পাইলাম যে মহলানবিশ-গৃহিণী নিউ জার্সিতে ডাক্তার শুহার্ট নামক এক প্রসিদ্ধ সংখ্যাতত্ত্ববিদের গৃহে অতিথি রূপে অবস্থান করিতেছেন।

রবিবার সকালে নিউ জার্সিতে টেলিফোন করিয়া জানিলাম যে মহলানবিশ-গৃহিণী নিউ ইয়র্কে এক ভারতীয় ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে দুই দিন যাবৎ আছেন। সেখানে টেলিফোন করিতেই মহলানবিশ-গৃহিণী তৎক্ষণাৎ আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিতে বলিলেন। ফ্ল্যাটটি দূরে ছিল না— অধিবাসী একজন যুক্তপ্রদেশীয় ভদ্রলোক। তাঁহার পত্নী মার্কিন-বংশে রূপ। মাত্র এক কক্ষের ফ্ল্যাট। অতিথিসেবা-পরায়ণা মহিলাটি স্বামীকে বন্ধুগৃহে ঘুমাইতে পাঠাইয়া মহলানবিশ-গৃহিণীকে স্বীয় কক্ষে অভ্যর্থনা করিয়া স্থান দিয়াছেন। আমি পৌঁছিবার একটু পরেই ভদ্রলোক স্বগৃহে ফিরিলেন। তিনি ইঞ্জিনীয়ার। অনেক দিন এদেশে আছেন। তাঁহার মার্কিন গৃহিণী স্বহস্তে প্রাতরাশ প্রস্তুত ও পরিবেশন করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। প্রাতরাশের টেবিলে একটি বাটিতে পাইন বৃক্ষের কতকগুলি কাঁচা পাতা জ্বালাইয়া দিলেন। এই অভিনব গন্ধে আমোদিত বোধ করিলাম। মহিলাটি বলিলেন, "এ গন্ধটা আমি খুব ভালবাসি।" কালিদাসের সরল বৃক্ষ পরিস্রুত ক্ষীর সৌরভে সুরভিত বায়ুর বর্ণনা মনে পড়িল।

পীতাম্বর পন্থকে খবর দিয়া ওখানে ডাকিয়া আনা হইল। তাঁহাকে বৈকালে আমার হোটেলে আসিতে বলিয়া একটি ট্যাক্সি লইয়া দ্রুত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতির বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তখন স্বামীজীর বক্তৃতা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বাড়ীটির নীচের তলায় বড় হলঘরের প্রান্তে দাঁড়াইয়া স্বামীজী বক্তৃতা করিতেছেন। পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র। মাথায় গেরুয়া পাগ্‌ড়ী। প্রায় দুই শত মার্কিন নরনারী একাগ্রচিত্তে বক্তৃতা শুনিতেছে। বক্তৃতার বিষয়—প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ। বক্তৃতান্তে শ্রোতাগণ কিছুকিছু দান করিয়া উঠিয়া গেলেন।

আশ্রমে একটি বাঙালী যুবক ও একটি মার্কিন যুবক বাস করে। উভয়েই ছাত্র। মার্কিন যুবকটি সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক ভারতবর্ষেই জীবন কাটাইবে সঙ্কল্প করিয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষেই থাকিবে তবে যাতে সে দেশবাসীর কাজে লাগিতে পার এরূপ কিছু শিখিয়া যাও। তিনি যুবকটিকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছেন।

যুবকটি ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ মিশনের ডাক্তারী বিভাগের ভার লইতে পারিবে। সে বিনয়ী, অল্পভাষী ও কর্তব্যপরায়ণ। বাঙালী যুবকটিও অনুরূপ গুণসম্পন্ন। একটি বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনী আশ্রমের খুব ভক্ত। আশ্রমের অনেক কাজকর্ম করেন। আমাকে বলিলেন, "আমার একবার ভারতবর্ষে যাইবার ইচ্ছা আছে। তোমরা আমাকে গ্রহণ করিবে ত?"

আমি—"ভারতবর্ষ সকলকেই গ্রহণ করিয়াছে। কাহাকেও সে প্রত্যাখ্যান করে না।"

মহিলাটি (লজ্জিতভাবে)—"হাঁ, এ বিষয়ে তোমাদের উদারতা সুবিদিত। হয়তো এ উদারতা আর একটু কম হইলেই তোমাদের সুবিধা হইত।" একটি নবাগত গুজরাটি যুবকের সহিত এখানে আলাপ হইল। তিনি টাটা কোম্পানীর অভিজ্ঞ কর্মচারী। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমেরিকা দর্শনে আসিয়াছেন। বলিলেন, 'সঙ্গে আমার স্ত্রী আসিয়াছেন। কিন্তু আবাসস্থলের অভাবে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেছি।"

স্বামীজী বলিলেন—"বাসস্থান এখানে খুবই দুর্লভ। তারপর এখানে আদিম অধিবাসীদের অনেকে বাসা দিতে চায় না। আপনাকে যদি আদিম অধিবাসী বলিয়া ধরিয়া লয় তবে আরও মুশকিল। আপনার স্ত্রী যখন সঙ্গে আছেন তখন এ অসুবিধা নাও হইতে পারে। কারণ শাড়ীপরিহিতা স্ত্রীলোক দেখিলে বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারিবে এবং বিদেশীর সঙ্গে এরা ভাল ব্যবহারই করে।"

বিভা মুখুজ্জ্যে নামে একটি মেয়ে এদেশে এম্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউট্রিশন পড়িতেছে। দুই দিনের ছুটিতে আশ্রমে বেড়াইতে আসিয়াছে। আশ্রমে মেয়েদের থাকিবার বিধি বা বন্দোবস্ত নাই। কাজেই মেয়েটি বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে আছে। মেয়েটি দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসিনী। আমাকে চিনিতে পারিল। সেদিন সে-ই ডাল ভাত, কপির ডালনা রান্না করিল। বহুদিন পর আশ্রমের প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

ঐ দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনে স্বামীজী, আশ্রমবাসী বাঙালী ও মার্কিন যুবকদ্বয়, বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনী, বিভা মুখুজ্জে ও আমি ভিন্ন আরও দুই জন আগন্তুক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এক জন মাদ্রাজী ও অন্য জন হিন্দুস্থানী। মাদ্রাজী ভদ্রলোক হায়দরাবাদ রাজ্যের ব্রডকাস্টিং ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ। হিন্দুস্থানী যুবকটি ছাত্র। ভোজনান্তে নানা বিষয়ে আলাপ চলিল। প্রসঙ্গত স্বামীজী বলিলেন, "আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি যে আমাদের বিবেকানন্দ আমেরিকারই দান। ভারতবর্ষে ত কেহ তাঁহাকে চেনে নাই। যখন আমেরিকা তাঁহাকে চিনিল তখনই ত ভারতবর্ষ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বরণ করিয়া লইল।" সকলের সঙ্গে সদালাপে পরিতৃপ্ত হইয়া, স্বামীজীর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া হোটেলে ফিরিলাম।

বৈকালে পন্থ আমার হোটেলে উপস্থিত হইলেন। পন্থ উচ্চ আদর্শবাদী যুবক। এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী

ছাত্র ও পরে অধ্যাপকরূপে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। ১৯৪২ সনের আগষ্ট-আন্দোলনে জেলও খাটিয়াছেন।

কংগ্রেসের বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় জবাহরলাল নেহরুর সেক্রেটারী রূপে বহু ঘুরিয়াছেন, পরে কলিকাতায় ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে গবেষণা করিবার জন্য যোগদান করেন। সম্প্রতি অধ্যাপক মহলানবিশের সঙ্গে এদেশে আসিয়াছেন। অধ্যাপক দেশে গিয়াছেন; অল্পদিন পরেই ফিরিবেন। তাঁহার কাজের ভার ইহার উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। পন্থ একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, এখানে যে ধরণের হোটেলে আছি তাহাতে খরচ বড় বেশী। ইহার অনেক কম খরচেও এদেশে থাকা চলে এবং সে টাকাটা আমি বোধ হয় চেষ্টা করিলে রোজগার করিয়া লইতে পারি। সরকারের উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে এখানে থাকিতে পারি কিনা তাহাই চিন্তা করিতেছি।"

পন্থের সঙ্গে মধ্য-মানহাটানে অনেক ঘুরিলাম। সন্ধ্যার পর টাইম্ স্কোয়ারের দৃশ্য সত্যই অপরূপ। ব্রডওয়ের উভয় পার্শ্বে ৪২তম ষ্ট্রীট হইতে ৫২তম ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত টাইম স্কোয়ার বিস্তৃত। অঞ্চলটি থিয়েটার, সিনেমা, নাচঘর, হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট প্রভৃতিতে পূর্ণ। আলোক সজ্জা পরমাশ্চর্য্য উজ্জ্বলতায় দিবালোককেও হার মানাইয়াছে। রঙের খেলায় মনে হয় যেন সহস্র রামধনুর উদয় হইয়াছে। আলোকমালার নানা ভঙ্গীর গতিশীলতা এবং পালা করিয়া জ্বলা-নেবার খেলায় এক অপূর্ব মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। মন হয়, ইহার তুলনা নাই।

একটি সিংহল-ভারতীয় রেষ্টুরেণ্টে ভারতীয় খাদ্যে নৈশ-ভোজন সমাপন করিয়া ম্যাডিসন্ স্কোয়ার গার্ডেনের দিকে চলিলাম।

প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ী। ভিতরে হকি প্রভৃতি সর্বপ্রকার খেলা হয়। ১৯০০০ দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা আছে। গৃহাভ্যন্তরে এত বড় ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। শুনিলাম ভিতরে হকি খেলা চলিতেছে। লাইনে দাঁড়াইয়া টিকিট কিনিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। দোতলার ছাতে খেলার মাঠ। উপরে চারিদিকে ঘুরানো গ্যালারী। লোকে পরিপূর্ণ। ফিরিওয়ালা আইস্‌ক্রীম, বাদাম প্রভৃতি হাঁকিয়া বেড়াইতেছে। উজ্জ্বল আলোক দ্বারা ঘরটিকে দিবালোকের মতই আলোকিত করা হইয়াছে। খেলার মাঠটি বরফে প্রস্তুত স্কেটিঙের মাঠের মত। খেলোয়াড়গণ স্কেট পায়ে বাঁধিয়া বরফের উপর খেলিতেছে। স্কেট পায়ে হকি-ষ্টিক হাতে বল লইয়া ছুটাছুটি করার দৃশ্য আমার নিকট শুধু অপূর্ব নয়, অদ্ভুত লাগিতেছে। এ খেলায় পরিশ্রম অত্যধিক। সর্বদা স্কেটের উপর দেহের ভার-সাম্য রক্ষা করিয়া স্কেট ঠেলিয়া বলের পিছনে ছুটায় অত্যধিক পরিশ্রম হয়। রেঞ্জার্স দল ও শিকাগো দলে খেলা হইতেছে। ৬ জনে এক এক পক্ষ। রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিট হইতে সাড়ে দশটা পর্যন্ত খেলা চলিল। ২০ মিনিটের পর ৫ মিনিট বিশ্রাম। এইরূপ তিন বারে মোট ১ ঘণ্টা খেলা হইল। প্রত্যেক দলের রিজার্ভ খেলোয়াড়গণ পাশেই লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া। যে কোন খেলোয়াড় ক্লান্তি বোধ করিলে সেইখানে আসিয়া দাঁড়ায় এবং অপর এক জন তাহার জায়গায় নামিয়া পড়ে। এইরূপে যতবার ইচ্ছা বদলী দিয়া বিশ্রাম লওয়া যায়। এই খেলায় রেঞ্জার্স দল ৯-০ গোলে জিতিল। প্রত্যেক বিশ্রামের সময় মাঠের আল্‌গা বরফ চাঁছিয়া ফেলিয়া জল ছিটাইয়া ঐ জলকে জমাইয়া দিয়া পুনরায় শক্ত ও মসৃণ করিয়া দেওয়া হয়। এই মাঠেই বক্সিং বাস্কেটবল প্রভৃতি খেলাও হয়। যন্ত্র-সাহায্যে মাঠটিকে ইচ্ছামত ছোট বড় করা চলে এবং গ্যালারীগুলিকেও আগাইয়া বা পিছাইয়া লওয়া যায়। প্রয়োজনমত বরফ দিয়া মাঠ ঢাকিয়া দেওয়া হয় বা বরফ গলাইয়া ফেলা হয়।

নিউ ইয়র্কের সুড়ঙ্গ-রেলপথ লণ্ডনের সুড়ঙ্গ-রেলপথের মত সুদৃশ্য নয়। লণ্ডনে লাইনের হদিস ও মানচিত্রগুলি বিদেশীর পরম সহায়ক বলিয়া মনে হয়। এখানে সেরূপ হদিস ও ম্যাপ নাই বলিলেই হয়। তবে লণ্ডন অপেক্ষা শ্রমসংক্ষেপমূলক যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিউ ইয়র্কে অনেক বেশী। এখানে ভাড়ার কোন তারতম্য নাই। একবার উঠিলে পাঁচসেণ্ট ভাড়া—তা তুমি যত দূরই যাও না কেন। টিকিট কেনা-বেচার রীতি নাই। ষ্টেশনে কোম্পানীর কোন টিকিট-ঘর, টিকিট বিক্রেতা বা টিকিট সংগ্রাহক নাই। একটি বাক্সের মধ্যে একটি মাত্র লোক কতকগুলি পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা লইয়া বসিয়া থাকে। যাত্রীগণ ইহার নিকট অন্য মুদ্রার পরিবর্তে পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা পাইতে পারে। ষ্টেশনের প্রবেশপথ যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটি পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা নির্দিষ্ট ছিদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিলে প্রবেশ-পথটি খুলিয়া যায় এবং একজন মাত্র লোক প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। ষ্টেশন হইতে বাহিরে যাইবার পথ আলাদা। সেখানে পয়সা লাগে না। এইরূপে অনেক কম কর্ম্মচারীর দ্বারা, বিনা টিকিটে রেলপথটিতে লোকজন ও যানবাহন চলাচল করিতেছে। রেলের কোন কর্মচারীর সঙ্গে যাত্রীদের দেখাই হয় না। ভাড়াও খুব সস্তা, মাত্র পাঁচ সেণ্ট বা দশ পয়সায় বহু দূর যাওয়া যায়।

নানা স্থানে ঘুরিয়া খেলা দেখিয়া সুড়ঙ্গ-পথে পন্থ ও আমি স্ব-স্ব আবাসে ফিরিলাম।

৬ই জানুয়ারী সোমবার। সকালে ট্যাক্সিযোগে সিটি আপিসের দিকে চলিলাম। এ ট্যাক্সিওয়ালাও আলাপ সুরু করিল। সে যাহা বলিল তাহার মর্ম এইরূপ: "তোমাদের দেশ ঐশ্বর্যের দেশ। পৃথিবীর যত সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা তোমাদের দেশ হইতে আসে। অথচ তোমরা নিজেরা

নিজেরা এত মারামারি কর কেন? ইংরেজ তোমাদের শাসক। তাহারা কি করে? আমরা দেখ ট্রুম্যানকে প্রেসিডেণ্ট করিয়াছি। তাঁহাকে সেলাম করিতেছি। কিন্তু যদি তিনি তাঁহার কর্তব্য পালন না করেন তবে তাঁহাকে গদি হইতে টানিয়া নামাইব। তোমরা সেরূপ কর না কেন? আচ্ছা; তোমরা আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত কর না কেন? ইংরেজ আমাদের কাছে অনেক টাকা ধারে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের কথা না শুনিয়া পারিবে না।"

ঐ দিন নগরীর প্রথম ডেপুটি কণ্ট্রোলার সিড্‌নি সুগারম্যানের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি ট্যাক্স কৌঁসুলি মিল্‌টন স্যাণ্ডবার্গের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইনি জাপানে য়িমাশিটা বিচারে আসামী পক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন।" ইঁহার সঙ্গে নিউ ইয়র্কের বিক্রয়-কর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইল। নদীর ওপারে নিউ জার্সি শহরে বিক্রয়-কর নাই। কাজেই নিউ ইয়র্কের বিক্রয়-করের হার যতক্ষণ খুব বেশী না হয় ততক্ষণ কেহ সামান্য জিনিস কিনিবার জন্য কষ্ট করিয়া নদী পার হইয়া ওপারে যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপের পর য়িমাশিটার বিচারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। স্যাণ্ডবার্গ বলিলেন, "য়িমাশিটা বিচারে নুরেমবার্গ বিচারগুলির ন্যায় আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন উঠে নাই। সাধারণ অপরাধ-ঘটিত আইনের উপরই ইহা চলিয়াছিল। য়িমাশিটার সৈন্যগণ লোকের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, রমণীর উপর অত্যাচার করিয়াছে—এই সমস্ত বিষয়েই সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। এই সমস্ত কাজ যে য়িমাশিটার আজ্ঞায় হইয়াছিল তাহারও কোন প্রমাণ ছিল না। আমি এইরূপ তর্ক করিয়াছিলাম যে এই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সমীচীন যে য়িমাশিটা তাহার সৈন্য-বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় য়িমাশিটার সৈন্যবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব সৃষ্টি করিবার জন্য মার্কিন সরকার তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যখন তাহাদের এই প্রচেষ্টা সফল হইল এবং তাহাদের ঈপ্সিত বিশৃঙ্খলা ও আইন না মানার প্রবণতা দেখা দিল তখন সেই বিশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাবকে য়িমাশিটার অপরাধ বলিয়া বর্ণনা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। আমার এই তর্ক বিচারকগণের মধ্যে অন্ততঃ একজন সমর্থন করিয়াছিলেন।"

৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার এখানকার বয়স্কাউটের সদর আপিসে যাই। আমার পরম সুহৃদ্, উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বঙ্গীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘের প্রাদেশিক কমিশনার। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বয়স্কাউট সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষের সহিত বঙ্গীয় সঙ্ঘের সংযোগ স্থাপন মানসে বঙ্গীয় সঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি লণ্ডনে আন্তর্জাতিক স্কাউট সঙ্ঘের সভাপতি কর্ণেল উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি কলিকাতার স্কাউট-সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ঘোষ মহাশয়ের গুরু। আমার নিকট কলিকাতার এবং বিশেষতঃ ঘোষ মহাশয়ের কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। আগামী জাম্বুরীতে ঘোষ মহাশয়ের যোগ দিবার সম্ভাবনা আছে শুনিয়া তিনি খুবই উৎফুল্ল হইলেন। মার্কিন স্কাউটের ডাক্তার রে ও ওয়াইল্যাণ্ডের নিকট তিনি আমাকে একটি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। সেইটি লইয়াই এখানে আসিয়াছিলাম। সেদিন ওয়াইল্যাণ্ড মহাশয় অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহকারী টম্‌চীন্ পরম যত্নে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিলাম কর্ণেল উইলসনের উপর ইঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা। চীন্ মহাশয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হইল। ইনি বলিলেন, "আমেরিকার হাতে আজ বিশ্বনেতৃত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত শিক্ষা তাহার নাই। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বহু দিনের শিক্ষা। কিন্তু তাহার হাত থেকে আজ বিশ্বনেতৃত্ব চলিয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে আমেরিকার শিক্ষা লইতেই হইবে।" আগামী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন সম্বন্ধে বলিলেন, "ট্যাফ্‌ট যদি দাঁড়ান এবং নির্বাচিত হন তবে সব চেয়ে ভাল হয়। ইঁহার পিতা প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইনি নানা সদ্‌গুণে ভূষিত। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার নেতৃত্ব করিবার পক্ষে ইনি যোগ্যতম ব্যক্তি।" দেখিলাম দেশের বালকদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী হিসাবে স্কাউটিঙের উপর ইহাদের অগাধ বিশ্বাস।

চীন্ মহাশয় আমাকে হাউয়ার্ড আর. প্যাটনের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। ইনি বিশ্ব-বন্ধুত্ব তহবিলের ডিরেক্টর। তাঁহার সহৃদয় ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইলাম। এক এক করিয়া সমস্ত পদস্থ কর্মচারীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। ইঁহাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমাকে বলিলেন। আপিসের যাবতীয় বিভাগ আমাকে দেখাইলেন। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। লণ্ডনে কর্ণেল উইলসনের আপিসে দেখিয়াছি তিনি নিজে একটি সেক্রেটারী লইয়া কাজ করেন। আপিসে দেখিতেছি ৬০০ কর্মচারী। যন্ত্রের ব্যবহারও যথেষ্ট। সমগ্র আমেরিকার স্কাউট-সঙ্ঘগুলি বৎসরে ৮০ লক্ষ ডলার ব্যয় করে। তন্মধ্যে এই আপিসের মারফত খরচ হয় ১৫ লক্ষ ডলার। এ দেশে ২০ লক্ষ স্কাউট আছে। এ দেশে যত লোক যুদ্ধে গিয়াছিল তাহার শতকরা ২৫ জন স্কাউট। এই শতকরা ২৫ জন পুরস্কার ও সম্মানাদির শতকরা ৪০ ভাগ লাভ করিয়াছিল। স্কাউট-সঙ্ঘ তাহাদের এই বিশিষ্টতায় বিশেষ গৌরব বোধ করে।

কায়রো দুর্গ
এইখানে আরবদিগের পক্ষ হইতে যুদ্ধবিরতির সূচনা করা হয়

প্যালেষ্টাইনের হাইফা বন্দর। ইহা আরব ইহুদী উভয় পক্ষের কাম্য

মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ও বন্দর। ইহাই আরবদিগের অন্যতম অভিযান-কেন্দ্র

প্যাটন মহাশয় তাঁহাদের প্রচারিত পুস্তকাবলী কলিকাতার স্কাউট-সঙ্ঘের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে শুনিয়াছিলাম যে তাঁহারা এত পুস্তক পাঠাইয়াছেন ও পাঠাইতেছেন যে কলিকাতার স্কাউট আপিসের কর্ণধারগণের পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

প্যাটন মহাশয় বলিলেন, "সকল জাতির প্রতিনিধির সহিতই আমার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু যে কয়েকটি জাতির বুদ্ধিমত্তা আমাকে চমৎকৃত করিয়াছে ভারতবর্ষ তাহাদের অন্যতম। গ্রীস, চীন এবং কোরিয়ার লোকেরাও অনুরূপ বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন।

প্যাটন মহাশয় আমাকে পরদিন একটি প্রাতরাশের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করিলেন। বলিলেন, "বহু জাতির প্রতিনিধি এই প্রাতরাশে উপস্থিত থাকিবেন। ভারতবর্ষের কেহই নাই। আপনি আসিয়া পড়িয়াছেন ভালই হইয়াছে। আপনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।" পরদিন প্রাতরাশের পূর্বেই আমাকে অটোয়া রওনা হইতে হইবে। কাজেই দুঃখের সহিত নিমন্ত্রণটি প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম।

স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী তারকনাথ দাস মহাশয়ের দর্শনলাভেচ্ছায় তাঁহার নিকট টেলিফোনে একটু সময় চাহিয়া লইয়াছিলাম। তদনুসারে নৈশ ভোজনান্তে রাত্রি আটটায় তাঁহার হোটেলে উপস্থিত হইলাম। ব্রডওয়ে এবং ৭৩তম ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে 'হোটেল এনসোনিয়ার' ১৫৯২ নম্বর ঘরে অর্থাৎ ১৬ তলার ৯২ নং ঘরে তিনি সস্ত্রীক বাস করিতেছেন। শুভ্রকেশ উজ্জ্বল-চক্ষু বৃদ্ধ আমাকে দেখিয়াই 'বন্দেমাতরম্' শব্দে অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। তদীয় গৃহিণীকে আরও বেশী বৃদ্ধা দেখাইতেছিল। ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী লইয়া আলাপ হইল। দেখিলাম দাস মহাশয় বহু বিষয়ে অধুনাতম সংবাদসমূহ রীতিমত সংগ্রহ করেন। যাদবপুর কলেজ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের একটি চিঠিতে কলেজের অনেকগুলি সমস্যার কথা উত্থাপন করা হইয়াছে। সেগুলি উল্লেখ করিলেন। আমাদের দেশে সরকারী সাহায্য সরকারী হস্তক্ষেপের অজুহাত হইয়া দাঁড়ায়। সে হস্তক্ষেপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নতির জন্য না করিয়া বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয়। এরূপ কেন হয়? তিনি অভিযোগ করিলেন, "আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিগণ শিক্ষার জন্য দান করেন না কেন? সাধারণ উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরাই বা তাহাদের আয়ের কিয়দংশ, অন্ততঃ একটি বা দুইটি ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য দান করেন না কেন?"

আমি—আমাদের দেশে শিক্ষার জন্য দানের অভাব আছে কি? শিক্ষার উন্নতিকল্পে রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিতের বদান্যতার কথা তো সুবিদিত। পি. সি. রায় কি করিয়া গিয়াছেন? তাঁহার সমস্ত বেতন তো তিনি এই জন্যই দিয়া গিয়াছেন? শিক্ষার্থীকে স্থান, আহার প্রভৃতি দানে সাহায্য করায় কোন দিনই কি আমাদের দেশের লোক পরাঙ্মুখ ছিল?

দাস মহাশয়—কিন্তু এখন তো সেরূপ দেখি না। এদেশের উচ্চশিক্ষা বেশীর ভাগই ব্যক্তিগত দানে। এই সেদিন জেনারেল মোটরের ম্যানেজার খুব বড় রকমের একটি দান করিলেন। তিনি বাল্যে সামান্য কারিগর রূপে ঐ কারখানায় কাজ সুরু করেন। আজ তিনি জেনারেল ম্যানেজার। তিনি বলেন, স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা ব্যষ্টির প্রতিভা-স্ফুরণের সম্পূর্ণ অবকাশ এদেশে আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। উদ্যোগী পুরুষ-সিংহগণই দেশে দেশে লক্ষ্মীশ্রী আনিয়াছেন। তাই আজ পৃথিবীর এত উন্নতি। আটলান্টিকের ওপারে সংবাদ-প্রেরণ পূর্বে অসাধ্য ছিল। আজ তাহা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত। কয়েকটি ডলার ব্যয়ে যে-কোন লোক ইহা পাঠাইতে পারেন। আজ আমেরিকার দীনতম লোক যে সুযোগ ও সুখ-সুবিধার অধিকারী, পূর্বে তাহা রাজারাজড়ারও অপ্রাপ্য ছিল। ইহা সমস্তই স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্যমের ফল। কাজেই তিনি ব্যক্তিগত উদ্যমের ইকনমিক্স্ পড়াইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু টাকা দান করিতে যাইতেছেন।

আমি—ইহা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ধনী আমেরিকার সঙ্গে দরিদ্র ভারতের তুলনা সাবধানে করা উচিত। ইহাও অবশ্য সত্য যে বর্তমানে ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে দানের উৎস যেন শুকাইয়া যাইতেছে। কেন এমন হইতেছে? শুধু দারিদ্র্যই ইহার কারণ নাও হইতে পারে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাও হয়তো ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। যে জন্য দান করিলাম সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিনা সে সন্দেহও হয়তো লোকের মনে আজ উঠিতেছে। সাম্প্রদায়িক বিষে আজ দেশ জর্জরিত।

ভারতীয় সংবাদপত্রের কথা উঠিল। আনন্দবাজার প্রভৃতি বাংলা সংবাদপত্রের সৌষ্ঠব ও প্রচারের কথা শুনিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, এরা তো দেশের অনেক কাজ করিতে পারে। এখানকার 'নিউ ইয়র্ক টাইম্স্' তো একটি সাম্রাজ্যবিশেষ। বাংলাদেশের এক একটি বড় পত্রিকা দরিদ্র ছাত্রদের জন্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিতে পারে। ইহাতে শিক্ষার উন্নতি হয়, খরচও বেশী নয়, পত্রিকারও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

ভারত বিভাগের কথা উঠিতে বৃদ্ধ গর্জন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সংক্ষেপে এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "যাহারা ধ্যানে বা জ্ঞানে, জাগ্রতে বা স্বপ্নে ভারতমাতার স্বাধীন মূর্তি একবারও দর্শন করিয়াছে তাহারা কিছুতেই ভারত বিভাগের কথা চিন্তা করিতে পারিবে না।"

বৃদ্ধ আমার সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া 'বন্দেমারতম্‌' শব্দে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া ঘরে ফিরিলেন। ভাবিলাম, বৃদ্ধের বিশ্বাস কি সরল ও দৃঢ়! ভারতমাতার যে হাস্যমণ্ডিত অখণ্ড রূপ ইনি এখানে বসিয়া ধ্যান করেন তাহা যে আজ কত পরিবর্ত্তিত, দূরে বসিয়া তাহা হয়তো ইঁহার অজ্ঞাত। আজ দেশে ফিরিলে অনশন-ক্লিষ্ট সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত ভারত-মাতাকে ইনি চিনিতে পারিবেন কি?

স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রভাষা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণে ভারত-মহাসাগরে অনেকগুলি ছোট-বড় দ্বীপ আছে। সমগ্রভাবে এ সকলের বর্ত্তমান নূতন নাম ইন্দোনেশিয়া। দ্বীপগুলির মধ্যে সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস বড় বড় দ্বীপ। ছোটগুলির মধ্যে বলী, মদুরা, তিমোর মলাক্কা, লম্বক আমাদের খুব পরিচিত। ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে এছাড়া আরও অনেকগুলি ছোট ও মাঝারি দ্বীপ পড়ে। দ্বীপগুলি পর্ব্বতময় এবং একটি পর্ব্বতমালার অন্তর্গত। এককালে মালয় থেকে আরম্ভ করে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত একটা বিরাট্ মালভূমি ছিল। কালক্রমে তার অনেক অংশ ভেঙেচুরে ভারতমহাসাগরে ডুবে গিয়েছে। যে যে অংশ এখনও উঁচু রয়েছে, সেইগুলিই এখন এক একটা দ্বীপে পরিণত হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে যারা বাস করে তারা মালয়ী-জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের ভাষাও পুরাতন মালয়ী ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এ সমস্ত ভাষা মূলে এক হলেও এদের পরস্পরের মধ্যে এখন অনেক তফাৎ দাঁড়িয়ে গেছে। তা হলেও এক মালয়ী ভাষার সাহায্যে সমস্ত দ্বীপেই কাজকর্ম্ম চালিয়ে নেওয়া যায়।

পূর্ব্বকালে সমুদ্রপথে ঘুরে বেড়ান ছিল মালয়ীদের স্বভাব। তারা মালয় থেকে সমুদ্রপথে এসে এই দ্বীপগুলিতে বাস করতে আরম্ভ করে। তাদের মালয়ী ভাষাও সেই সঙ্গে এখানে আমদানি হয়।

যে মালয়ী ভাষা থেকে বর্ত্তমান ইন্দোনেশীয় ভাষার উৎপত্তি হয়েছে তার শব্দকোষে অনেক সংস্কৃত, আরবী, ফারসী শব্দ আছে—কিছু তাদের পুরনো রূপে, আর কিছু বিকৃত হয়ে। এ ছাড়া আছে প্রচুর পর্ত্তুগীজ, ইংরেজী ও ওলন্দাজ ভাষার শব্দ।

পুরাকালে আরব, ইরাণী, ভারতীয় এবং চীনা ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে আসে। তারা এদের সঙ্গে আদান-প্রদান ব্যাপারে মালয়ী ভাষাই ব্যবহার করত। সে হিসাবে তৎকালে এখানে মালয়ী ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার কাজ করত। বাণিজ্যসূত্রে ইউরোপীয়েরা এখানে আসে ষোড়শ শতাব্দীতে। তাদেরও কাজকর্ম্ম চালাতে হ'ত মালয়ী ভাষায়। তাতে দ্বীপগুলিতে মালয়ী ভাষা আরও বিস্তৃতিলাভ করে।

ভাষা হিসাবে মালয়ী ভাষার রীতি ও প্রকৃতি খুবই সহজ, সরল। বাঁধাধরা বা জটিল ব্যাকরণের খুঁটিনাটি এতে নাই। সেটা ভাষার অপূর্ণতা হলেও মোটামুটি খানিকটা শিখে নিয়ে তা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া বিদেশীর পক্ষে কঠিন হ'ত না।

ইন্দোনেশিয়াবাসীর জাতীয়তাবোধও উদ্দীপ্ত হয়েছে এই মালয়ী ভাষার ভিতর দিয়ে। পরে তারা জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির পথে এক দিন যেমন তাদের 'নেদারল্যাণ্ড ঈষ্ট ইণ্ডিজ' নাম পরিত্যাগ করে নতুন নাম নিলে ইন্দোনেশিয়া, তেমনি সেই সঙ্গে মালয়ী ভাষা ছেড়ে দিয়ে স্থানীয় এক কথ্য ভাষাকে তাদের জাতীয় ভাষা বলে গ্রহণ করলে এবং এই ভাষাকে তারা নানা রকমে সমৃদ্ধিশালী করতে লেগে গেল।

ইন্দোনেশীয় ভাষার সঙ্গে মালয়ী ভাষার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ—যেমন সংস্কৃতের সঙ্গে আমাদের বাংলার। এর ব্যাকরণ মালয়ী ভাষার ব্যাকরণের আদর্শে রচিত হলেও অন্যান্য ভাষা থেকে নূতন নূতন শব্দ গ্রহণ সম্বন্ধে এই ভাষা সম্পূর্ণ স্বাধীন, এর ব্যাকরণের বাঁধনও অনেক শিথিল।

মালয়ী ভাষা থেকে ইন্দোনেশীয় ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করার পর হতে উক্ত ভাষার দ্রুত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়ে গেল—ধাপে ধাপে উন্নতিও হতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে ইন্দোনেশীয়দের জাতীয় আন্দোলনের সব রকম প্রচারকার্য্য এই ভাষাতেই হতে লাগল।

১৯১৬ সালে হেগে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের এক ঔপনিবেশিক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে তামান্ শিশওয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কি হাজার দেওয়ান্তারা উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোনেশিয়ায় প্রচলিত মালয়ী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে ইন্দোনেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের উপর তিনি খুব

জোর দেন। তাঁর সে প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয় নি। তিনিই প্রথম তাঁর স্কুলে ইন্দোনেশীয় ভাষাকে মুখ্য স্থান দেন। এর পর ১৯২৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার যুবসঙ্ঘ চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যে, তারা এক জাতি এবং তাদের এক ভাষা। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের বা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা যাই হোক, ইন্দোনেশীয় ভাষা হবে তাদের জাতীয় ভাষা। সেই থেকে ইন্দোনেশিয়ার সকলেই তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম্মে ইন্দোনেশীয় ভাষা ব্যবহার করে এবং এই ভাষাকেও তারা তাদের জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করে আসছে। নূতন শব্দও সেই থেকে ইন্দোনেশীয় ভাষার মধ্যে আরও বেশী আমদানি হচ্ছে। সে তার জননীস্বরূপা মালয়ী ভাষা থেকে একেবারে আলাদা হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। আগেকার ইন্দোনেশীয় ভাষা, যা ছিল একটা প্রাদেশিক ভাষা, মাত্র কয়েক হাজার লোকের ভাষা, এখন তা হ'ল কয়েক কোটি লোকের জাতীয় ভাষা।

ওলন্দাজ সরকারের আমলে সরকারী তত্ত্বাবধানে ১৯০৮ সালে "বালাই পুস্তাকা" নাম দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সেখান থেকে যে সকল বই ছাপা হ'ত তা সমস্তই মালয়ী ভাষায়—পাঠ্যপুস্তক। এ হ'ল কেতাবী ভাষা—কথ্য ভাষা নয়। তা ছাড়া এই "বালাই পুস্তাকা" থেকে রাজনীতি বা ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বই ছাপা হতে পারত না—সরকারের নিষেধ ছিল। কবি এবং সাহিত্যিকদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁদের মালয়ী ভাষাতেই লিখতে হ'ত। তা না হলে তাঁদের লেখা "বালাই পুস্তাকা" থেকে ছাপিয়ে বের করা যেত না। জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশীয় ভাষায় স্বতন্ত্র ভাবে বই ছাপান আরম্ভ হ'ল—বিশেষ করে রাজনীতি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বই। ১৯৩৩ সালে ইন্দোনেশীয় ভাষায় ইন্দোনেশীয়দের প্রথম মাসিকপত্র বেরল "পুজাংগা বারু"। চিন্তাশীল রাজনীতিক, প্রতিভাবান সাহিত্যিক, কবি, সকলেই এই মাসিকপত্রে ইন্দোনেশীয় ভাষায় লিখতে আরম্ভ করলেন। ভাষা আর একটা বড় ধাপে উন্নীত হ'ল।

সকল দেশেই যেমন রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বেধে থাকে, ইন্দোনেশিয়ায় ভাষার ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এখানেও পুরাতনপন্থী মালয়ী ভক্তদের সঙ্গে নূতন দলের বিরোধ উপস্থিত হয়। ইন্দোনেশীয় ভাষাকে তাঁরা প্রাকৃতজনের ভাষা বলে অবজ্ঞা করতেন। মালয়ী ভাষাই ছিল তাঁদের কাছে আভিজাত্যের ভাষা। এঁরা শিক্ষকগোষ্ঠী—ইন্দোনেশীয় ভাষাকে প্রশ্রয় দেওয়া একেবারেই পছন্দ করেন নি। তাঁদের মতে কথা বলার ভাষা লিখবার ভাষার পর্য্যায়ে উঠবে সে ত সৃষ্টিছাড়া অরাজক কাণ্ড। প্রথমটায় তাঁরা খুব বাধা দিলেন। তাতে কোন ফল হ'ল না। কারণ তরুণ দলের এই আন্দোলনের মূলে ছিল তাদের স্বদেশপ্রেম। ইন্দোনেশীয় ভাষা হ'ল তাদের নিজের দেশের ভাষা—জাতীয় ভাষা।

বাধা দিয়ে কোন ফল হ'ল না দেখে, মালয়ীভক্তরা ইন্দোনেশীয় ভাষাকে উপেক্ষা করে চলতে লাগলেন। এই উপেক্ষা এবং অবজ্ঞার অবসরে তরুণেরা তাদের জাতীয় ভাষায় প্রয়োজনমত বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে তাকে সমৃদ্ধি-শালী করে তুলতে লাগল। রাজনৈতিক প্রবন্ধ, প্রচারপত্র ইন্দোনেশীয় ভাষায় লেখা হতে লাগল, সভাসমিতিতে ইন্দোনেশীয় ভাষার ব্যবহার হতে লাগল এবং উপন্যাসও প্রকাশিত হ'ল এই ভাষায়।

১৯৪২ সালে গত মহাযুদ্ধে ওলন্দাজেরা জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করার ফলে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি জাপানীদের হাতে গিয়ে পড়ল। ঐ সকল দ্বীপের উপর থেকে ওলন্দাজ আধিপত্য অন্তর্হিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, ভাষার অগ্রগতির পথে তারা যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে আসছিল তাও লোপ পেল। উক্ত দ্বীপসমূহ অধিকার করে তাদের শাসন-কার্য্য চালাতে জাপানীদের ইন্দোনেশীয় ভাষা গ্রহণ করতে হ'ল। স্থানীয় লোকদের জাপানীভাষা শিখিয়ে নিয়ে তার পর কদ্বীপের কাজকর্ম্ম চালানো সম্ভবপর ছিল না। কাজেই তারা ইন্দোনেশীয় ভাষাকে সরকারী ভাষা বলে স্বীকার করে নিলে এবং সরকারী স্কুল কলেজে ঐ ভাষা শেখাবার বন্দোবস্ত করলে। ওলন্দাজ ও ইংরেজী ভাষার ব্যবহার জাপানীরা দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করলে। অবশ্য ভিতরে ভিতরে জাপানী-দের মতলব ছিল, যত দিন কিছু পরিমাণ স্থানীয় লোক কাজকর্ম্ম চালাবার মত জাপানী না শিখছে তত দিন ঐ ভাষাই চলুক, তার পর ক্রমে ইন্দোনেশীয় ভাষাকে বিদায় করে দেওয়া যাবে।

নবীন ইন্দোনেশীয়গণ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলে—তারা ভাষার আরও উন্নতি করে নিলে। তারপর জাপানীরা যুদ্ধে হেরে দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে গেলে তথাকার লোকেরা এবং তাদের ভাষা স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন জাতির ভাষার মর্য্যাদা লাভ করলে। এটা আনুষ্ঠানিক ভাবে হয় ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট। ঐ তারিখে ইন্দোনেশীয়েরা নিজেদের স্বাধীন জাতি বলে ঘোষণা করে।

ইন্দোনেশীয় ভাষা সাধারণতঃ রোমান অক্ষরে লেখা হয়, আরবী অক্ষরেও হয় যদিও খুব কম। নীচে ইন্দোনেশীয়-দের জাতীয় সঙ্গীতের কিয়দংশ বাংলা অক্ষরে দেওয়া গেল।

ইন্দোনেসিয়া তানাঃ আইকু,
তানাঃ তুম্পাঃ দারাকু,
দিসানালাঃ আকু বেরদিরি,
জাদি পান্দু ইবুকু।
ইন্দোনেসিয়া কেবাঙ সাকু,

বাঙ্গ্সা দান্ তানা: আইকু,
মান্বিলা: কিতা বেসের্কু,
ইন্দোনেসিয়া বেসার্তু।
ইত্তুপ্লা: তানা:কু,
ইত্তুপ্লা: নেগেরিকু,
বাঙ্গ্সাকু, রাক্সাৎকু, সেম' ওয়াঞ্ঝা
বাঙুন্লা: জিওয়াঞ্ঝা,
বাঙুন্লা: বাদাঞ্ঝা,
উন্তুক্ ইন্দোনেসিয়া রায়া।
ধুয়া। ইন্দোনেসিয়া রায়া মের্দেকা মের্দেকা,
তানা:কু নেগেরিকু য়াঙ্ কুচিন্তা,
ইন্দোনেসিয়া রায়া মের্দেকা মের্দেকা,
ইত্তুপ্লা: ইন্দোনেসিয়া রায়া।

এর বাংলা মর্ম্মানুবাদ এই রকম—
ইন্দোনেশিয়া আমার মাতৃভূমি,
আমার জন্মভূমি,
আমি সেই দেশে দাঁড়িয়ে আছি,
তাকে পাহারা দিতে।
ইন্দোনেশিয়া এই আমার জাতি,
আমার জাতি, আমার দেশ,
সকলকে আহ্বান করে,
এস এক হয়ে দাঁড়াই।

দীর্ঘায়ু হোক আমার মাতৃভূমি,
দীর্ঘায়ু হোক আমার স্বদেশ
আমার জাতি, আমার জনগণ, আমার সকল,
আত্মা তার জাগো,
ওঠো আমার দেশ,
গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া।
ধুয়া। গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন মুক্ত,
আমার মাতৃভূমি, আমার দেশ, যাকে আমি ভালবাসি,
গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া, স্বাধীন মুক্ত,
দীর্ঘায়ু হোক, গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া।

[এই প্রবন্ধ রচনা করতে 'ইন্দোনেশিয়ান ইন্‌ফরমেশন্ সার্ভিসের' মুখপত্র 'মের্দেকা'য় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। জাতীয় সঙ্গীত বাংলা অক্ষরে লিখতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহায্য করেছেন]

১৩৫৫

শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেন শর্ম্মা

তেরশো পঞ্চান্ন সাল, পূর্বের গগনে এল—
যাত্রাপথে তরী,
বন্দরে বন্দরে, নব তরঙ্গের স্বপ্ন তারে দিক
মণিমুক্তা ভরি;
ভারতের সপ্তডিঙা, রত্নরাগে—আবার ভরুক,
কনক ধান্যের;
অতীতের রক্তরেখা, লুপ্ত করি' জাগুক উৎসব—
মধু নবান্নের।
সঙ্কীর্ণ, সঙ্গীন পথ—অনেক করেছি অতিক্রম,
...সঙ্গে যারা ছিল—
রক্তের অঞ্জলি ভরি, মানবাত্মা-অনির্ব্বাণ শিখা...
তারা জেলে দিল।
ভুলি নি তাদের বন্ধু, সাতারা...মেদিনীপুর...
ভুলি নি, ভুলি নি—
মণিপুর-প্রান্তরের, সূর্যকরোজ্জ্বল ধ্বজা—
চিনি তারে চিনি।
প্রভাত-মধ্যাহ্ন পরে, ছায়াপথে, বর্ষেতে বর্ষেতে—
সাবিত্রী ধরণী;
ঋতুচক্র-আবর্তনে, ফাল্গুন চৈতালী চলে যায়—
অক্ষমালা গণি,
কাঁদা-হাসা, ভালবাসা, উৎকেন্দ্র মনেরে তুচ্ছ করি—
যাত্রা তার চলে,
তেরশো পঞ্চান্ন সাল, বঙ্গের অঙ্গনে এল—
...সূর্য আরো জ্বলে।
মনেরো মঞ্জুষা 'পরে, বহ্নিশিখা দীপ্তিমান জাগে—
আরো অভ্রলেহী,
মানবের, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সে...ব্যথায় কাঁদিছে—
দেহি, মুক্তি দেহি'...
অনেক রক্তেতে ভেজা, সুশুভ্র কঙ্কাল বেদী 'পরে
নতুন বাণীর—
হে রুদ্র, শোনাও গান, সঞ্জীবনী অভয়মন্ত্রের,
দক্ষিণ পাণির।
আশীর্বাদ ঝরি পড়ে,...প্রথম স্বাধীন সূর্য—
স্বাধীন আকাশে,
বন্দরে তরঙ্গগানে, আগামীর হাতছানি...
সুর ভেসে আসে।
রিক্তহাতে, দীপ্তবুকে, তেরশো পঞ্চান্ন সালে মাগি
—বিশ্বের কল্যাণ;
হে রুদ্র, এবার ভরো, ক্লান্তচিতে 'সত্য আর শিব-
সুন্দরের' ধ্যান।

মহাত্মা গান্ধী ও বাংলার রাজনীতি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নানা দেশে নানা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাপুরুষের জন্ম দেশ বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ কথা সত্য। কিন্তু একথাও সত্য—মহাত্মা গান্ধীর জন্ম ভারতবর্ষেই সম্ভব। ইহার অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষ এক অভিনব দেশ, দেবানুগৃহীত দেশ। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য, ভারতের মৃত্তিকা মহামহীরুহের জন্ম ও পরিপুষ্টির জন্য যুগযুগান্তর হইতে প্রস্তুত হইয়া আছে।

মহেঞ্জোদারো বা তাহারও পূর্ব্বের যুগ হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতা প্রবহমাণ। বহু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভারতে জন্মিয়াছে, বহুবিধ ধর্ম্মমত এখানে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, জরথুস্ত্রীয়, খ্রীষ্টান, ইসলাম, শিখ প্রভৃতি ধর্ম্ম এখানে স্থায়ী হইয়াছে। একই ধর্ম্মের নানা শাখা বিভিন্ন মত লইয়া পরীক্ষা করিয়াছে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব বিভিন্ন দিক হইতে সত্যের সন্ধান করিয়াছে। তন্ত্রের প্রভাব হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মে সমান ভাবে পড়িয়াছে।

এ সব সত্ত্বেও দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী হোক, বৌদ্ধ হোক, জৈন হোক, যে-কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অথবা সংস্কারক অথবা ঋষি অথবা সাধক সত্যকে তত্ত্বের মধ্যে রাখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজের জীবনে তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, ত্যাগ করিয়াছেন, কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই—আনন্দের সঙ্গে দুঃখকে বরণ করিয়াছেন। দিগম্বর জৈনদের কথাই ধরা যাক। শীতাতপকে তাহারা অগ্রাহ্য করে, আহারে বিশ্রামে বাক্যে কর্ম্মে কৃচ্ছ্রতা-সাধনই তাহাদের অভ্যস্ত ব্যাপার।

ইহাই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। গান্ধীজীও যখন জীবনে নানা ভাবে সত্যকে লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের ছয় সহস্র বর্ষের ঐতিহ্যই তাহার মধ্যে কাজ করিয়াছে।

জৈন ধর্ম্মের কথা বলিতেছিলাম। গৃহী জৈন—বিশেষতঃ বর্ষীয়সী জৈন মহিলারা—আজ পর্য্যন্ত অল্প কৃচ্ছ্রতা সাধন করেন না। উপবাস অর্থাৎ অনশন ত লাগিয়াই আছে, মাসের মধ্যে চার পাঁচ দিন মৌনব্রতও তাঁহারা পালন করেন। জৈন ধর্ম্মের মূল মন্ত্র—অহিংসা পরমো ধর্ম্ম। এই অহিংসা বৌদ্ধ অহিংসা হইতে কঠোরতর। শুধু মানুষ নয়—দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রাণিজগৎ জৈনের নিকট এই অহিংস আচরণ হইতে বঞ্চিত হয় না। গান্ধীজীর জন্ম গুর্জ্জরে। গুজরাটে জৈনপ্রভাব অল্প নয়। প্রতিবেশ-প্রভাবে শৈশব হইতেই গান্ধীজী অহিংসাপন্থী। বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের বাণী ও জীবন-সাধনা পরবর্ত্তীকালে তাঁহার অন্তরে এই অহিংসা-তত্ত্বকে দৃঢ়মূল করিয়া তুলিয়াছিল। অন্য প্রদেশে জন্মিলে গান্ধীজীর অহিংসা হয়ত অন্য আকার ধারণ করিত। কিন্তু তাহা অনুমান ও কল্পনার কথা। বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম আছে, জৈন প্রভাব নাই।

বাংলা শতবর্ষ ধরিয়া স্বাধীনতার সাধনা করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনে এই ধারা বিরাট রূপ পরিগ্রহ করে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত কাব্যে এই ধারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই দেশপ্রেমকে ধর্ম্মে পরিণত করেন। তিনি মন্ত্রবিৎ। 'বন্দে-মাতরম্' দেশাত্মবোধের এক অপূর্ব্ব মন্ত্র। বঙ্কিম-সাহিত্য দেশপ্রীতির সাহিত্য। বাঙালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পত্রাবলী এবং অন্যান্য রচনার মধ্যে সেই একই ধারার সন্ধান পাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের 'উপক্রমণিকা'য় আছে—

"অতি বিস্তৃত অরণ্য। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদ-শূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য।... সেই অন্তশূন্য অরণ্য মধ্যে, সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল,

—"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

শব্দ হইয়া আবার সেই অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল।... এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রীতির দর্শনকার। এই ভক্তি কি?

গান্ধীজী 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও জানিতেন জীবন তুচ্ছ। চাই ভক্তি।

এইখানে গান্ধীজীর সহিত বাংলার মিল। এই ঐক্যের অনুভূতিতেই বাংলায় বিশেষতঃ মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহ অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করিয়াছিল। এইজন্যই বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের অবসান ঘটাইতে গান্ধীজীকে বেগ পাইতে হয় নাই।

মূলগত আদর্শে যেমন ঐক্য আছে, তেমনি এক প্রভেদও আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তিবাদ ও গান্ধীজীর ভক্তিবাদ এক নয়।

২

'ধর্ম্মতত্ত্ব' বা 'অনুশীলনে' বঙ্কিমচন্দ্র এই ভক্তি কি তাহা বুঝাইয়াছেন।

"ভক্তি" কথাটা হিন্দুধর্ম্মে বড় গুরুতর অর্থবাচক।...

যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয় সেই অবস্থাই ভক্তি।...

সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।...

দেশভক্তির কথা ধরিতে হইলে অবশ্য বলিতে হইবে, সকল বৃত্তিকে দেশাভিমুখিনী করিতে হইবে। "যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।"

শিষ্যের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। শিষ্য বলিতেছে,

"সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ একটা বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায়?"

গুরু বলিতেছেন, "জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার স্মরণ হয়?

ক্রোধং প্রভো সংহরসংহরেতি,
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনঞ্চকার॥

এই ক্রোধ মহা পবিত্র ক্রোধ।...ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ।"

এখানে মহাত্মা বলিবেন, 'অক্রোধেন ক্রোধং জিনে।'

এখানেও কিন্তু গান্ধীজী ও বঙ্কিমচন্দ্রে মূলতঃ প্রভেদ নাই। প্রভেদ অন্যত্র। এই ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইতে বঙ্কিমচন্দ্র গীতার কথা আনিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "যুদ্ধ মাত্র যে পাপ নহে এ কথা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি।"* বলিতেছেন, "আত্মরক্ষার্থ ও স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মমধ্যে গণ্য।"+

৩

মহাত্মা কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার নিকট সত্য ও অহিংসা অভিন্ন।

* "আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, আপনার স্ত্রীপুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম।... যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম্ম।...দুর্ব্বল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্ব্বদায়ই আছে।"—ধর্ম্মতত্ত্ব, অষ্টম অধ্যায়।—শারীরিক বৃত্তি

+ গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,

"যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে, যুদ্ধ কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এমন অবস্থা ঘটে যে, এই নৃশংস কার্য্য অপরিহার্য্য ও অবশ্যসম্পাদ্য হইয়া উঠে।...ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষার জন্যও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এরূপ যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্ম্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্ম্মপালন নহে, অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়।"—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

"Truth and non-violence are synonymous with God, and whatever we do is nothing worth apart from them."

অহিংসার মধ্য দিয়া দেশের স্বাধীনতা যদি না আসে মহাত্মা সে স্বাধীনতা কামনা করেন না।

১৯০৮ সালে স্বদেশী আন্দোলন যখন বাংলায় চরমে উঠিয়াছে তখন মহাত্মা একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থের নাম, *Hind Swaraj or Indian Home Rule.* তখনকার দিনের স্বাধীনতাকামীরা যে সব কথা বলিতেন তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহাত্মা নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী, অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্র-তন্ত্র কিছুই চাহেন নাই। তিনি তখনকার দেশহিতৈষীদের কাম্য দেশপ্রগতির প্রচলিত উপায়গুলিকে পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

বাংলার পথ বঙ্কিমচন্দ্রের পথ। বঙ্কিমের অনুসরণে সেদিনের দেশভক্তেরা গীতাপন্থী ছিলেন। গান্ধীজীও গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু যুদ্ধই ত গীতার পটভূমিকা। যুদ্ধকে বাদ দিলে গীতা দাঁড়াইবে কোথায়? কিন্তু গান্ধীজী অহিংসাবাদী। তিনি গীতার রূপক ব্যাখ্যা—allegorical interpretation প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, "মহাভারতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব'লে ধরা হয়, কিন্তু আমার মতে মহাভারত ও রামায়ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়—ধর্ম্মগ্রন্থ।...দেব ও দানব, রাম ও রাবণের ভিতর প্রতিদিন যে সংগ্রাম চলছে, মহাভারত ও রামায়ণে তারই বর্ণনা রয়েছে।" (গীতাবোধ—প্রস্তাবনা)। প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিতেছেন, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ত নিমিত্ত মাত্র, অথবা আমাদের শরীরই প্রকৃত কুরুক্ষেত্র।"

এইখানেই বাংলার চিন্তাধারার সহিত মহাত্মার চিন্তাধারার মৌলিক প্রভেদ। গীতার সম্বন্ধে নানারূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতে পারে। গান্ধীজীই প্রস্তাবনাতে বলিতেছেন, "গীতা মহাভারতের এক ছোট অংশ।" ভারতকার স্বয়ং মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা গৌণ। মহাত্মা অহিংসায় একান্ত বিশ্বাসী। যে শাস্ত্রে আপাত-অন্যরূপ কথা আছে, মহাত্মা অহিংসার অনুগামী করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন।

তিনি যে রামরাজ্যের কথা বলেন, তিনি অযোধ্যাধিপতি দশরথপুত্র রাবণহন্তা শ্রীরামচন্দ্র নহেন। অর্থাৎ ঐতিহাসিক শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণকেই কি আমরা পূজা করি? ইতিহাস ত দেশ-কালে আবদ্ধ। দেশ ও কালের অতীত যিনি আমরা তাঁহারই অর্চ্চনা করি। এই হিসাবে মহাত্মার রামরাজ্য, Kingdom of God—Heaven on Earth।

৪

কোন্ নীতি সর্ব্বোত্তম—কথা ইহা নয়। মনের গোচরে অথবা অগোচরে বাংলা বঙ্কিম-নিয়ন্ত্রিত পথে চলিয়াছে। অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র কেহই এই পথকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই দেশভক্তির ক্ষেত্রে এক হইয়াও মহাত্মার মত এবং বাংলার পথ বার বার বিভিন্নমুখী হইয়াছে। মহাত্মা-নির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশবন্ধুকে স্বরাজ্যদল গঠন করিতে হইয়াছে। মহাত্মার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াও নেতাজীকে দেশ হইতে দূরে সৈন্যবাহিনী গঠন করিতে হইয়াছে। এ সব সত্ত্বেও মহাত্মার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই। গান্ধীজী যে fundamental difference—মৌলিক পার্থক্যের কথা বলিয়াছেন তাহা এই।

অনেকে মনে করেন বাংলার দেশাত্মবোধ বুঝি Hindu Nationalism। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা মহাত্মা শুনাইয়াছেন। এই কার্য্যে তিনি জীবন দান করিয়াছেন। শেষজীবন বাংলার নোয়াখালীতে বাস করিয়া এই মন্ত্রই প্রচার করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার মনোগত ইচ্ছা।

বাংলার জাতীয়তা হিন্দু জাতীয়তা নয়। এখানেও মহাত্মার সহিত বাঙালী চিন্তানায়কের কোন পার্থক্য নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে কোন কোন মুসলমান সুচক্ষে দেখেন না। সেই বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়ে কি বলিতেছেন দেখা যাক্।

"সীতারামে"র প্রথম সংস্করণের একটি পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।*

শ্যামপুরে সীতারাম একটু স্থির হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর দর্শনে সস্ত্রীক চলিলেন।...দেখিলেন মন্দির ভূগর্ভস্থ, বাহির হইতে কেবল চূড়া দেখা যায়।...সোপান সাহায্যে তাঁহারা তিন জনে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, মন্দিরদ্বারে দেবমূর্ত্তিসমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাবা তুমি ?"

মুসলমান বলিল, "আমি ফকির।"

সীতারাম। মুসলমান ?

ফকির। মুসলমান বটে।

সীতা। আ সর্ব্বনাশ !

ফকির। তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্ব্বনাশ কিসে হইল ?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান !

ফকির। দোষ কি বাবা ! ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইল ?

সীতা। হইল বৈ কি। তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল ?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর ? ইনি করেন কি ?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা।

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

সীতা। ইনিই—যিনি জগদীশ্বর তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইহার মন্দিরদ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন ?

ফকির। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা ? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন ? না, আর থাকিবার স্থান আছে ?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী ; সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন ?

সীতা। অবশ্য—তোমরা মান না কেন ?

ফকির। বাবা, ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না—আমি ইঁহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন ?

[এইরূপ নানা কথার পর ফকির বলিলেন]

তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ তবে এই হিন্দু মুসলমানদের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ, পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি ?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমান রাজ্য ছারেখারে যাইতেছে।...আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না।

অতএব বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যারও সমাধান পাওয়া যায়।

৫

গান্ধীজী একজন আবিষ্কারক। সহনশীলতার মধ্যে যে অসীম শক্তি নিহিত আছে তাহা গান্ধীজীরই আবিষ্কার। তিনি ভারতবর্ষের এই বিপুল অপূর্ব্বপরিচিত সঞ্চিত-শক্তিকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছিলেন। এই নূতন শক্তির সন্ধান পাইয়া তিনি অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। করিলে শক্তি বিক্ষিপ্ত হইত। সত্য এক, কিন্তু সত্য বহুমুখ। বিভিন্ন দিক দিয়া সত্যের সন্ধান করিতে পারা যায়। ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে জনগণের সহিত মহাত্মা নিজেকে একীভূত করিয়াছিলেন

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

বলিয়াই জনগণকে তিনি অনুপ্রেরিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সকল সাধকই নিজেদের জীবনে সত্যকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার তরুণ দেশভক্তেরাও নিজেদের জীবনদানে এই সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মহাত্মার ত্যাগ, কারাবরণ, দুঃখবরণ এবং অবশেষে মৃত্যুবরণও—আত্মজীবনে সত্যকে উপলব্ধি করিবার অপূর্ব্ব চেষ্টা। ভারতবর্ষের ছয় সহস্র বর্ষের সাধনা এই দারুণ দুঃখনিপীড়িত দেশে মহাত্মার আবির্ভাবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। আজ স্বাধীনতার জ্যোতি মহাত্মার আদর্শকে উজ্জ্বল করুক।*

* রবিবাসরে পঠিত।

কথা-সাহিত্যের দু'একটি দিক

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বসূরিগণ বহু দিক থেকেই সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধ-সমূহ বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বনিরূপণ—গতিপ্রকৃতি নির্ণয় ছাড়াও সাহিত্য সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যায়। সেটি হ'ল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুবিধা এইটুকু নয় যে-সত্যের উপর রঙের পোঁচ একটু গাঢ় করে দেওয়া চলে, এদিকে ওদিকে কয়েকটি রেখা টেনে ছবিটাকে গ্রহণযোগ্য করা যায়। এটা সকলেরই জানা আছে যে, যে কাহিনী নিজ গুণে মনের ভেতর আসন করে না নিতে পারে—সে কাহিনী শোনবার কৌতূহল বা শোনাবার উৎসাহ কোন পক্ষেরই থাকে না। দু'পক্ষের যোগসূত্র কাহিনীর প্রাণ।

সাহিত্যের অন্য বিভাগের কথা ছেড়ে দিয়ে গল্প লেখার কথাই বলব। কারণ গল্পলেখক মাত্রেরই গল্পলেখার পিছনে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা বিচিত্র নয় এবং একজন গল্প-রচয়িতা বলে বর্ত্তমান লেখকও তার ব্যতিক্রম নন।

এই প্রসঙ্গে দু'একটি প্রশ্ন যা প্রায়ই শুনতে হয় তার কথাই বলব। গল্প লেখবার সময় বাস্তব সত্যকে কল্পনার সঙ্গে কতটুকু গ্রহণ করি, এই প্রশ্ন বহুবার শুনতে হয় আর লেখবার সময় পাঠককে সামনে রেখে লিখি কিনা—এ বিষয়েও অনেকে জানতে চান। এই ধরণের প্রশ্ন থেকে মনে হয় যে, কাহিনী আমরা ভালবাসি চিরকাল। অপরিপক্ব বুদ্ধির স্তিমিত আলোয় যতটুকু পাই আর পূর্ণ জ্ঞানের জ্যোতিতে যা প্রভাসিত হয়, তার মধ্যে কাহিনীই সর্ব্বোত্তম—যাকে আশ্রয় করে কৌতূহল মেটে—রসপিপাসা পরিতৃপ্তি লাভ করে। সে কাহিনী জীবনজিজ্ঞাসার সমতালে যতই গতিছন্দ মেলায় ততই তা অন্তরকে অভিভূত করে—আনন্দকে পূর্ণতর করে।

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুশর্ম্মা বা ঈসপের গল্পগুলির কথা স্বতঃই মনে পড়ে। বনের বাঘ সিংহ শৃগাল ভল্লুক, গাছের বানর পাখী বা গর্ত্তের সাপ আর জলের কুমীর এরা যখন মানুষের মত আচরণ করে মানুষের ভাষায় কথা বলে তখন তার চেয়ে কৌতুককর ব্যাপার আর কি আছে। যদিও তা হিতোপদেশ তবু তা অদ্ভুত গল্প। এর মধ্যে কতটুকু বাস্তব কতখানি বা কল্পনা এ বিচার জাগে না। যে কথা জীবজন্তুর মুখ দিয়ে বার হচ্ছে—যা তাদের আচার-আচরণে পাওয়া যাচ্ছে, যে প্রবৃত্তিবশত তারা চলাফেরা করছে তা মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যকেই প্রকাশ করছে। অন্তঃসন্ধানী দৃষ্টি না থাকলে এমন মনোহর কাহিনীগুলির সৃষ্টি হ'ত না। বাস্তব অনুভূতির দিক দিয়ে ঈসপ বা বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলি উপাদেয় এবং শিশু ও যুবাবৃদ্ধকে তা সমানভাবেই আকর্ষণ করে।

লেখকমাত্রেই জানেন, যে-কোন উপাদান পেলেই তা থেকে লেখা যায় না। এমন অনেক জীবন আছে যার মধ্যে ঘটনাপ্রবাহ যথেষ্ট অথচ গল্পের উপাদান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—আবার এমন সামান্য ঘটনাও ঘটে যা কাহিনী বলে আপাতদৃষ্টিতে মেনে নেওয়া শক্ত অথচ তা থেকেই গড়ে ওঠে চিত্তাকর্ষক গল্প। আসল কথা, ঘটনা থাক আর নাই থাক, বৈচিত্র্য যার মধ্যে আছে তাই গল্পের উপাদান আর সে উপাদান গ্রহণ করে বৈচিত্র্যপিয়াসী মন। সব মনের গ্রহণ-ক্ষমতা সমান নয়, সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক হবার কথাও নয়। তবু যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশেষ একটি দিকের কাহিনী আমি লিখব তা যেন আমার রসবোধের পরিধিতে আবদ্ধ না থাকে। আমার দুঃখ বেদনা কৌতুক অন্যের দুঃখ বেদনা কৌতুককে উদ্দীপ্ত করতে না পারলে সৃষ্টিকার্য্য সম্পূর্ণ বা সার্থক হবে না। মনের এই গ্রহণ-ক্ষমতার উপরই কাহিনীর বাস্তব কল্পনা উভয় অংশ নির্ভর করে। ধরুন, চোখের সামনে দেখছেন, একজন ধনী লোক দরিদ্র প্রতিবেশীর উপর উৎপীড়ন করছে। আপনার মনের মধ্যে সেই ঘটনার বেগ

সম্প্রসারিত হ'ল। একজনের জন্য জাগল দরদ আর এক জনের উপর ঘৃণা। গল্পে ফুটিয়ে তুললেন ঘটনাটি। কিন্তু এই ঘটনা ফুটিয়ে তুলতে যতটুকু বস্তু আপনি সামনে পেয়েছেন তার চেয়ে বেশী সংগ্রহ করেছেন যা পান নি। অর্থাৎ কল্পনায় আপনি মানবমনের বেদনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে আপনার অনুভূতি যত গভীর হবে, আপনার কল্পনা যত সুদূরপ্রসারী হবে, আপনার চিত্রাঙ্কন ততই হবে সার্থক। আমাদের মনের বিচিত্র ধারা হ'ল কল্পনা-বাস্তবে মেশামিশির ব্যাপার। ধরুন, কোন দুর্বৃত্ত লোকের কথা কারও মুখে শুনলেন, তাকে কোন দিন না দেখলেও তার আচার-আচরণের সঙ্গে একটি অপ্রিয়দর্শন মূর্ত্তি আপনার চোখের সামনে ফুটে উঠবেই। চোখের সামনে যা ঘটে তাই সব সময়ে রূঢ় বাস্তব হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়—অনুভূতির রসে পরিপাক করে জ্ঞান যা প্রকাশ করে তারই মধ্যে সত্য-মিথ্যার সার্থকতা। যেমন দুপুরের চড়া রোদে সঙ্কীর্ণ দিগন্ত পরিপূর্ণ শ্রীতে উদ্ভাসিত হয় না—সকাল-সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে অপূর্ব্ব বিস্তারে তা মনকে অভিষিক্ত করে। সর্ব্বজনগ্রাহ্য যে রস তা পরম আনন্দ থেকে উদ্ভূত—যে পরম আনন্দ থেকে নিখিল চরাচরের যাবতীয় প্রাণীর উদ্ভব। লিখতে বসলেই দেখা যায়—বাস্তবের কাঠামোটা অস্থিকঙ্কালসমেত চোখের সামনে ছায়ার মত এগিয়ে আসছে আর দূরে সরে যাচ্ছে; কল্পনার রক্তে মাংসে যতক্ষণ না সেগুলি কায়াবন্ধনে ধরা পড়ছে ততক্ষণ তার আকার নাই, গতি নাই, লাবণ্য নাই। কথিত আছে, জগৎ সৃষ্টির মূলে এই পরমা কল্পনা নিহিত।

সামান্য অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে গুরুভার তত্ত্বকথা এসে পড়ছে। অভিজ্ঞতা তত্ত্বকথার আকার নিলে উপদেশের অহমিকা প্রকাশ পায় জানি, তবু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা জানাবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। এ কথা জানা আছে যে, অন্তর্লোকপ্রবাহিত রসপ্রবাহের ধারাটি যেইমাত্র কণ্ঠে এসে পৌঁছয় তখনি মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠি, 'চমৎকার'। তা সুন্দর বলেই সত্য এবং রসসমৃদ্ধ বলেই শাশ্বত।

এই রসসমুদ্রে পাক করা বৃহৎ বেদনা—অন্তহীন দুঃখ, অপার আনন্দ ও গভীর অনুভূতি সব কিছুই জীবন-জিজ্ঞাসার বিচিত্র রূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রশ্নে ছিল—গল্পে বাস্তব সত্যকে কতটুকু নিতে পারি? কতটুকু কল্পনায় মিশিয়ে তার প্রকাশ সম্ভব? সে নির্দ্দেশ দেয় অনুভূতিশীল মন। শিক্ষকের নির্দ্দেশে ত্রৈরাশিক অঙ্কের নিয়ম মেনে তবে অঙ্কটাকে নির্ভুল করা যায়, কিন্তু জীবনশিল্পীর গতিপ্রকৃতি ভিন্নরূপ। জাতশিল্পী বলে যে একটা কথা আছে তা মনীষীরা স্বীকার করেন। সবার মধ্যে শিল্পী হবার উপকরণ থাকে না সেজন্য দুঃখ করে কোন লাভ নাই। একথা স্বীকার করতেই হবে—সাহিত্য-সেবার প্রধান উপকরণ হ'ল নিষ্ঠা; মূলধন—অনুভূতিসম্পন্ন মন। কল্পনার বিলাস নয়—বিকাশই হ'ল সাহিত্যের প্রাণ। বলুন তো কল্পনা কার প্রাণে নাই? অশ্ব-মনোরথে চড়ে মানুষ কোন্ দুস্তর পারাবার না উত্তীর্ণ হয়, কোন্ 'সব পেয়েছির দেশে' গিয়ে দু'দণ্ডের জন্যও নিজেকে সার্থক না মনে করে।

লিখবার সময় পাঠক সম্মুখে থাকেন কিনা জানি না—অন্তত ধ্যানলোকে জাগ্রত প্রহরী রেখে কেউ সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছেন কিনা, শুনি নি। আত্মলুপ্তির মুহূর্ত্তে কে রইল, কে রইল না—সে হিসাব রাখা তো সম্ভব নয়। লেখা শেষ হ'লে তবে সে বিচার সম্ভব। তখন তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে সৃষ্টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হবে বহু গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত লোক রয়েছেন আমার সম্মুখে। আমার অকিঞ্চিৎকর দান তাঁদের গ্রহণের অযোগ্য যেন না হয়, যেন অনাদরের দৃষ্টিতে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে না নেন। তাঁদের কথা ভেবে আমার লেখনী নিরঙ্কুশ হবে না এবং সৃষ্টিকার্য্যের খুঁতগুলি আমার মনশ্চক্ষে প্রখর ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে একথা সত্য, তবু তাঁদের প্রসন্নতা অর্জ্জন করবার জন্য আমাকে যত্ন ও পরিশ্রম করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে।

গল্প লেখার গল্পকে আর দীর্ঘ করব না। গল্প যাঁরা বলতে ভালবাসেন তাঁরা নিঃসন্দেহে উত্তম শ্রোতা, কিন্তু যাঁরা গল্প শোনেন একাগ্রচিত্তে তাঁদের ভাল গল্প লিখিয়ে বলে আমি শ্রদ্ধা দিই। কেননা বাণীতে আর শ্রুতিতে প্রীতিবন্ধন চিরকালের। বক্তা ও শ্রোতা দু'পক্ষের মনকেই সৃষ্টিরসের আনন্দে অনুভূতির গাঢ়ত্বে উদ্বেল করে তোলে এই প্রিয় বন্ধন। সমুদ্রের বাষ্প আকাশে উঠে মেঘ সৃষ্টি করে—দুই ঘন নীলের সংযোজন অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে ভরা। তেমনি মিতালী লেখকে আর পাঠকে। এর মাঝখানে রয়েছে যে প্রাণ-সঞ্চারিণী সৃষ্টি তা অনন্ত কালের লীলাপ্রবাহ ছাড়া আর কিছু নয়। জাগ্রত মন, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসু মন—সর্ব্বসংশয়ছিন্নকারী সত্যঅভিমুখী বলিষ্ঠ মন—রসবস্তুর আদানপ্রদান-সেতু দিয়ে মানুষের কাছে মানুষকে এগিয়ে আনে—মানুষকে ভালবাসতে শেখায়—সস্নেহে তার ভুল সংশোধন করে দেয়—গ্রন্থির পর গ্রন্থি মোচন করে সংস্কৃতি-উজ্জ্বল বিস্তৃত জগৎকে তার সামনে তুলে ধরে। এই বাধাবন্ধহীন সংস্কৃতি-উদ্ভাসিত বিস্তৃত জগতের প্রবেশপত্র হ'ল সাহিত্য। সব কালে সব দেশের লোকেরা এরই একাগ্র সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিচ্ছেন।*

* বুড়ুল যুবসঙ্ঘের সাহিত্যসভায় পঠিত।

সোভিয়েট রাশিয়ায় ধনসঞ্চয়ের উপায়

শ্রীঈষিতা দেবী

গত ডিসেম্বর মাসে যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকার মুদ্রা-প্রচলন সম্পর্কে একটি সর্ব্বদেশব্যাপী আইন ঘোষণা করেন, তখন আমেরিকার জনসাধারণ প্রায় সর্ব্বত্রই এই মন্তব্য প্রকাশ করে, "রাশিয়ানদের আবার ব্যাঙ্কে জমা সম্পত্তি থাকে নাকি? আমাদের কেমন জানি ধারণা ছিল তারা কম্যুনিষ্ট, সাম্যবাদী।"

খেলনার দোকান—এই সমস্ত খেলনা অত্যন্ত দামী

আসল কথা হচ্ছে এই যে, সোভিয়েট রাশিয়াও এমন একটি দেশ যেখানে যে-কোন অবস্থাপন্ন লোকে ইচ্ছে করলেই কোন শহরের মধ্যে এবং তৎসঙ্গে শহরের বাইরেও যতগুলি খুশী বাড়ী কিনতে পারে। সে তার খুশীমত আলমারী বোঝাই কাপড়-চোপড় এবং নিজের ব্যবহারের জন্য মোটরগাড়ীও কিনতে পারে। তার স্ত্রী সিল্ক এবং দামী ফার কোট পরে বেড়াতে যায়। মনের সাধ মিটিয়ে রাশিয়ান মদ ভড্‌কা এবং পেন পান করতে পারে। তার বাড়ীর যাবতীয় কাজে-কর্ম্মে সাহায্য করবার জন্য, নিজের কাপড়চোপড়ের যত্ন করবার জন্য, চিঠিপত্র টাইপ করে দেবার জন্য, রান্না-বাড়া করা, গাড়ী চালানো, এসবের জন্য সে বেতন দিয়ে ভৃত্য রাখে। এমন কি, সরকারের অনুমতি পেলেই সে তার নিজের একটি শর্টওয়েভ রেডিও ষ্টেশন তৈয়ারী করাতে পারে (আমেরিকায় অনেক সময় এই ধরণের বিচিত্র রাশিয়ান বেতারবার্ত্তা শোনা গিয়েছে)—দরকার-মত প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ, নিদারুণ বিষের রসদ এবং তার সঙ্গে জুতোর বাক্স ভরে রেডিয়ম রাখতেও আপত্তি নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রজা যা-কিছু জিনিষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে জানে—দলিলপত্র, সব রকম দ্রব্য, টাকাকড়ি, পেটেন্টের স্বত্ব ইত্যাদি সবই তার মৃত্যুর পর তার পরিবারের সম্পত্তি বলে ধরা হয় এবং সেগুলির জন্য তাকে কোন কর দিতে হয় না।

এসব শুনতে নেহাত ধনতন্ত্রবাদী প্রথার অনুরূপ মনে হয়, তবে এর একটা সীমা আছে। ব্যক্তিগত ধনলাভের জন্য মজুরীভুক্ শ্রমিককে "স্বার্থপর" ভাবে খাটিয়ে নেওয়া, "শোষণ" করা সোভিয়েট আইনে নিষিদ্ধ। কোন ধনী ব্যক্তি তাই নিজের ধনসম্পত্তির দ্বারা মজুরী দিয়ে লোক নিযুক্ত করে কোন দ্রব্য তৈরী করে বিক্রী করতে পারে না। সে কোন কারখানা বা ফ্যাক্টরীর মালিক হতে পারে না, বা এমন কোন বড় কৃষিক্ষেত্র বা ফার্ম্মের মালিক হতে পারে না যেখানে কাজ চালাবার জন্য বেতনভোগী মজুর রাখতে হয়। সে একটি বা দশটি বাড়ী কিনতে পারেন, কিন্তু যে জমির উপর সে বাড়ী নির্ম্মাণ করা হয়েছে সেই জমি কিনতে পারে না—সে জমির নিমিত্ত তাকে খাজনা দিয়ে সরকারের কাছ থেকে বহু বৎসরের পত্তনি নিতে হয়। অবশ্য কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই নিয়মে কারুর বিশেষ অসুবিধা হয় না। জমির জন্য তাকে যা খাজনা দিতে হয় তা কোন ধনতন্ত্রবাদী দেশের জমির কর বা ট্যাক্সেরই সমান, এবং সোভিয়েট সরকার যেমন প্রয়োজন-মত জনসাধারণের বা রাষ্ট্রের কোন কাজের জন্য সে পত্তনি বাতিল করে দিতে পারেন, ঠিক তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরেও অন্য দেশেও এমন আইন ও নিয়ম আছে, যাকে বলে রাষ্ট্রীয় একাধিপত্য আইন। এই রকম কয়েকটি সীমাবদ্ধ আইন-কানুন ও নিয়মাদি ব্যতীত সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধিবাসী আপন খুশীমত যে-কোন ভাবে টাকা উপার্জ্জন এবং খরচ করতে পারে।

গোড়াতেই বলা উচিত যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের অতি সম্পদশালী ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য খুব কমই আছে। পার্টির সাধারণ সভ্য অনেকটা আগেকার আমলের আমেরিকার "ট্যামানি" অনুচরের মত রাজকার্য্যে সাহায্য-কারী। তার কাজ হচ্ছে জনসাধারণের মতামতের খবর রাখা, সমবায়ী চাষীদের বা স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্যদের বুঝিয়ে দেওয়া কেন স্থানীয় নেতারা এটাওটা করতে চান, আবার স্থানীয় কর্ত্তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হয় তাদের অনুগত জনসাধারণ কি কি নিয়ম বা সঙ্কল্প সহজেই গ্রহণ করবে, আর কি কি তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই রকম সারা দিনব্যাপী পরিশ্রমের পারিতোষিক হিসাবে পার্টির সভ্য, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উন্নতির প্রত্যাশা করে। জীবনে তবে আমেরিকার শহরস্থিত কারখানার এই ধরণের সাহায্যকারী

এবং এদের মধ্যে তফাৎ আছে। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যেরা সাধারণতঃ খুব সাবধানে ন্যায়পথে চলে এবং আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করে।

সুগন্ধি দ্রব্যের দোকান

কিছুদিন যাবৎ এই মুদ্রাপ্রচলন আইনটি ঘোষণা করবার পর ধনশালী রুশীয়দের সংখ্যা বেশ কমে গেছে। যারা তাদের টাকাকড়ি ঘরে জমিয়ে রেখেছিল, তাদেরই হয়েছে সবচেয়ে বেশী দুর্দ্দশা। অনেকে এরকম ভাবে টাকা ধরে লুকিয়ে রাখে, হয় সঠিক কি পরিমাণ সম্পত্তি আছে তা প্রকাশ করতে চায় না বলে, অথবা ইউরোপের অধিকাংশ চাষীর মত তারাও ব্যাঙ্ক-বইয়ে লেখা নীরস হিসাবের চেয়ে হাতে টাকা ধরে নাড়াচাড়া করা বেশী পছন্দ করে। এইরূপ ধনসঞ্চয়ীরা তিন হাজার রুবলের অধিক যা ছিল তার দশ ভাগের নয় ভাগ হারিয়েছে। সরকারী "বণ্ড" কিনে দেশের ধন-ভাণ্ডার বাড়াবার এবং জনসাধারণকে উৎসাহে অনুপ্রাণিত করবার জন্য আমেরিকায় গবর্মেণ্ট ইদানীং যে রকম চেষ্টা করেছে, ততোধিক চেষ্টার ফলে রাশিয়ায় যেসব স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি এরকম "বণ্ড" কিনে তার দুই-তৃতীয়াংশ হারিয়েছে! তার তুলনায় যেসব লোকের টাকা ব্যাঙ্কে ছিল তাদের ভাগ্য ঢের ভাল—তাদের সম্পত্তির তিন থেকে দশ হাজার রুবলের মধ্যে প্রতি তিন রুবল মুদ্রার পরিবর্ত্তে দুটি "নূতন" রুবল লাভ করেছে, এবং দশ হাজারের উপর টাকার মধ্যে প্রতি দুই রুবলের বদলে একটি নূতন রুবল লাভ করেছে। তবে টাকাকড়ি, ব্যাঙ্কে জমা সম্পত্তি এবং সরকারী দলিলপত্র বাদে অন্য কোন দিক দিয়ে ধনী রুশীয়ের সম্পদের কিছু ক্ষতি হয় নি। তার মাসিক আয়ের কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। সে যদি লেখক বা সুরশিল্পী প্রভৃতি হয় তা হলে তার সম্মান-মূল্য আগের মতই সে পায়। তার বাড়ীঘর, নিজের ভাল জামা-কাপড়, তার মদ্যভাণ্ডার, স্ত্রীর হীরের গয়না, ইত্যাদি যাবতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তিই অক্ষুণ্ণ আছে এবং এই পরিবর্ত্তনের পর তার যা রুবল বাকি রয়েছে, তার মূল্য আগের চেয়ে অনেক বেশী।

এই আইনের ফলে রুবলের মূল্য বেড়ে গেছে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের আগে রুশীয় জনসাধারণ বেশ কম দাম দিয়েই রেশন-নিয়ন্ত্রণানুসারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জিনিষপত্র কিনতে পারত। তবে সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণটি ছিল, নেহাত যতটুকু জিনিষ না হ'লে জীবনযাপন করা যায় না ততটুকু। তার বেশী কিছু যদি প্রয়োজন হ'ত তা হলে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই। হয় সরকারী ব্যবসায়ী দোকানে কিংবা কৃষিকর্ম্মীদের বাজারে লোকে সে সব কিনতে পারত, কিন্তু তার জন্য তাকে যা দাম দিতে হ'ত তা রেশননিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের তিন-চার শত গুণ বেশী। গরীব লোকে তার রেশনের বরাদ্দের বাইরে প্রায় কিছুই কিনতে পারত না, এবং বড়লোককেও বেশী জিনিষ কিনতে হ'লে অত্যধিক অর্থদণ্ড দিতে হ'ত। এখন রেশনপ্রথা তুলে দেওয়ার পর "একাধিক মূল্যের" প্রথার বদলে "এক দর" নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়েছে—(অন্ততঃ এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে) এবং

রেডিও

নিয়ন্ত্রিত দরে সকলেই যত খুশী, নিজ নিজ শক্তিমত, জিনিষ কিনতে পারে। অধিকাংশ জিনিষের দাম এখন যা স্থির করা হয়েছে তা এর পূর্ব্বের রেশনের দামের থেকে একটু বেশী, কিন্তু আগে রেশনের বাইরে জিনিষ কিনতে হ'লে যা দিতে হত তার থেকে অনেক কম—এতে অবস্থাপন্ন লোকেদের খুব সুবিধাই হয়েছে। তবে, পূর্ব্বে অনেকে কোন বিশেষ কাজ—যা জনসাধারণের পক্ষে মহামূল্যবান নির্দ্ধারিত হ'ত, করবার জন্য উচ্চ পারিশ্রমিক পেত, তারা সেগুলি হারিয়েছে। যেমন, তারা খুব আগে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য ন্যায্য রেশন হিসেবে পেত, এবং কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দোকান থেকে অল্প দামে ভালরকমে মজুত রাখা দ্রব্য সব কেনবার অধিকার পেত—এখন সেগুলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আবার এরই সঙ্গে গরীব লোকেরাও এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, তারা পূর্ব্বের রেশনের দামের থেকে কম দামে প্রচুর পরিমাণ রুটি কিনে নিয়ে যেতে পারে—(রুটিই হচ্ছে রুশীয়দের খাবার টেবিলে

একান্ত আবশ্যক খাদ্যদ্রব্য)। নূতন প্রণালী কতদূর সফল হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে জিনিষ সরবরাহের উপর—যে-পরিমাণ রুটি প্রয়োজন গবর্মেণ্ট যদি তত না যোগাড় করতে

মস্কো শহরে একটি বস্ত্র বিক্রয়ের কেন্দ্র

পারে, তা'হলে কৃষকরা বাজারে যতদূর পোষাবে তত বেশী দাম চাইবে। তবে সম্ভবতঃ সোভিয়েট অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করছেন যে তাঁদের দেশে এটা নূতন, পূর্ব্বের চেয়ে অল্পসংখ্যক কিন্তু অধিকতর মূল্যের রুবল দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা যায়, সেই পরিমাণই প্রস্তুত করা যাবে।

অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়াতে এখন একটি শ্রেণীর অবস্থাপন্ন লোকেরা বেশ অসুবিধা ভোগ করবে। কৃষিকর্ম্মীরা বিশেষ করে পূর্ব্বের "বহু মূল্য" প্রথা থাকায় প্রচুর লাভ করে আসছিল। সমবায় কৃষিক্ষেত্রগুলি থেকে তাদের ভাগে যা লাভের অংশ পড়ত তা তো তারা পেতই, উপরন্তু তাদের ব্যক্তিগত কৃষি-ক্ষেত্রে যা উৎপন্ন হ'ত তাও বাজারে বিক্রয় করে যথেষ্ট লাভ করত। একজন সমবায়ী কৃষক পঞ্চাশ লক্ষ (৫ মিলিয়ন) রুবলের সরকারী "বণ্ড" কিনেছিল বলে দৈনিক পত্রিকাগুলিতে তার নাম প্রশংসিত হয় এবং সে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করে। নতুন আইনের ফলে তার এই বৃহৎ সম্পত্তির অনেক-খানিই নষ্ট হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাজার-দর ধরাবাঁধা করে দেওয়াতে আর এই রকম ধনসঞ্চয় করাও সম্ভব হবে না।

এই নূতন আইন প্রচারের পর বে-আইনী অর্থোপার্জ্জনের কয়েকটি পথ বন্ধ হয়ে গেছে। রেশন-নিয়ন্ত্রিত জিনিষ এবং রেশনের বাইরে জিনিষের মূল্যে যে প্রভেদ ছিল তার ফলে "ঝুঁকিদার" ব্যবসায়ীগণ (speculator) যথেষ্ট সুযোগ পায়। তাদের বিরুদ্ধেই এই আইন বিশেষ করে প্রয়োগ করার কথা ঘোষণা করা হয়। এতে আছে, "যে সব দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবসায়ী যুদ্ধের সময়ে প্রচুর ধন অর্জ্জন এবং সঞ্চয় করেছে, তারাই যে রেশন-প্রণালী তুলে দেওয়ার পর বাজারের সব জিনিষ কিনে নিতে পারবে তা সহ্য করা যায় না।"

দেখা গিয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় যুদ্ধে জয়লাভকারী সৈনিকদের উঁচু দরের ব্যবসায়ী (commercial) দোকান-গুলিতে বাজারদর থেকে কম দামে জিনিষ কিনবার অধিকার ছিল। তাদের পক্ষে অন্য লোকের 'মধ্যস্থ' ব্যক্তি হয়ে জিনিষ কিনে দিয়ে ভাগে টাকা দেওয়া খুব সহজ হ'ত। যে সব লোকের রেশনের পরিমাণ অন্য লোকের চেয়ে বেশী ছিল, তারা তাদের পাওনা সবকিছু সস্তাদরে কিনে যা প্রয়োজন হ'ত না তা ফের বাজারে খোলাখুলি ভাবেই বাজার-দরে বেচে দিত। অবশ্য রেশনিং তুলে দেওয়াতে যে সোভিয়েট রাশিয়ায় এরকম বে-আইনী অর্থোপার্জ্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে তা নয়। যখনই এই ভাবে দ্রব্যাদি প্রয়োজন অপেক্ষা কম থাকার দরুন ধরাবাঁধা দামে বিক্রী করা হয়, তখনই কিছু কিছু গুপ্ত বাজারে বা চোরাবাজারে কেনা-বেচা চলবেই। কিন্তু এ
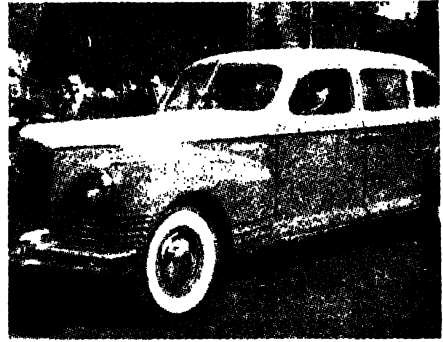
সোভিয়েট রাশিয়ার 'জিস' নামক এক শ্রেণীর মোটর গাড়ী

কথা সত্য, যে এক ব্রিটেন বাদে যুদ্ধকালীন ইউরোপে বোধ হয় সোভিয়েট রাশিয়ার গুপ্ত-বাজারই সব চেয়ে ক্ষুদ্র ছিল। তা হলেও ব্ল্যাক-মার্কেট তখনও ছিল এবং এখনও আছে।

বর্ত্তমান বাসস্থানাভাব দুর্ব্বলচরিত্র বাড়ীওয়ালাদের সম্মুখে প্রলুব্ধ হওয়ার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত করেছে। নিউ ইয়র্কে আজকাল বাসস্থানের যে রকম টানাটানি পড়েছে, মস্কোতে প্রায় তার দশগুণ বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি,—একটি মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থপরিবার বাস করে মাত্র একটি ঘরে, সে ঘরের মধ্যে একটি খাবার টেবিল, চারদিকে দেওয়াল ঘিরে রয়েছে শোবার খাট। রান্নাঘর ও স্নানাগার প্রতিবেশী-দের সঙ্গে ভাগে ব্যবহার করতে হয়, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব রাখা একান্ত আবশ্যক। কোন অল্পবয়স্ক বিবাহিত দম্পতিকে নিভৃতে বাস করতে হ'লে ঘরের মধ্যে পর্দ্দা, ইত্যাদি দিয়ে ঘরের কিয়দংশ ভাগ করে নিতে হয়। মস্কো শহরের লোকসংখ্যা এমন ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে সোভিয়েট সরকার এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, বেশ বড়রকম আয়োজন

করেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করা সুরু হয়, কিন্তু যুদ্ধের দরুন এই প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে যায় এবং এখনও মস্কোর ক্রেমলীন প্রাসাদের পাশ দিয়ে চতুর্দ্দিকে যে সব রাজপথ চলে গেছে তার দু'ধারে অর্দ্ধ-নির্ম্মিত বাড়ীর কাঠামোগুলো পড়ে আছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার একটি খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়-কেন্দ্র

বাসস্থানের এ রকম মারাত্মক অভাব থাকা সত্ত্বেও বাড়ীভাড়া এখনো খুব সামান্যই রয়েছে, এত কম যে, যে সব পরিবারের আয় অতি অল্প তাঁরাও ঘরভাড়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয় না। নিয়ম হচ্ছে, যে সব লোক মস্কোতে কাজ করে, তারাই প্রথমে থাকবার জায়গা পাবে এবং তার জন্য কাকে প্রথম সুযোগ দেওয়া হবে তার নিয়মাবলীও আছে। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় কোন বাসিন্দার মৃত্যু হ'লে বা কেউ অন্যত্র চলে যাওয়ার দরুন কোন ঘর খালি হয়ে গেলেও সেকথা সরকারী দপ্তরে পৌঁছায় না। ইতিমধ্যে যে সব দম্পতির বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তাদেরও স্থানাভাবে এক ঘরে বাস করতে হয়; নববিবাহিত বর তার বধূর পরিবারের সঙ্গেই বাস করতে বাধ্য হয়, শহরে নবাগতরা এসে তাদের পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তাদের ঘরেই আর এক একখানি বিছানা পেতে তাদেরও স্থান দিতে পীড়াপীড়ি করে। এ ছাড়া শহরে হাজার হাজার লোক আছে যাদের বাসস্থান পাবার কোন আশা নেই, কারণ আইন অনুসারে তাদের মস্কোতে বাস করবার অধিকার নেই—কারুর ওপর হয়তো রাজনৈতিক কারণে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে, কেউ বা সুদূর সাইবেরিয়া থেকে ছুটি না নিয়ে কাজ ছেড়ে চলে এসেছে। এমনি একটি মেয়ে ছয় মাস তার এক বন্ধুর হোটেলের কক্ষে গোপনে বাস করবার পর হোটেলে একটি ঘর পায়—তার ভাড়া অবশ্য অতি সামান্য, কিন্তু ঘরটি পেতে ম্যানেজারকে তার যে সেলামী দিতে হয় তার জন্য তাকে পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটি বহুমূল্য মুক্তার মালা বিক্রী করতে হয়।

যে-কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির কাছে যদি কোন একটি দুষ্প্রাপ্য বস্তু থাকে (সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন অনেক জিনিষই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে), সে তার জন্য অভাবনীয় দাম চাইতে পারে। যে সব রুশ সৈন্য এখন জার্ম্মানীতে আছে তারা প্রত্যেকেই হাতঘড়ি যোগাড় করতে ব্যস্ত, তাদের যে সময় সম্বন্ধে অত্যধিক আগ্রহ আছে তা নয়, আসল ব্যাপার হচ্ছে যে-কোন সাধারণ ভাল ঘড়িরই দাম ছিল তিন হাজার রুবল—বাজার ঘড়িতে ছেয়ে যাওয়ার পূর্ব্বে—সাধারণ কারখানার শ্রমিকের মাসিক আয়ের পাঁচ-ছয় গুণ টাকা। ভাল মজবুত একটি ধূমপানের পাইপ, একটি সৌখীন নেকটাই বা দুটি আমেরিকান লিপ-ষ্টিক কিনতে হ'লে দুই সপ্তাহের আয় খরচ করতে হয়। আমেরিকার প্রচারপত্র "আমেরিকা"র প্রকৃত মূল্য হচ্ছে দশ রুবল, কিন্তু এই পত্রিকার মাত্র কয়েক-খণ্ড যায় হাসপাতালগুলিতে, লাইব্রেরিসমূহে, কয়েকটি ক্লাবে এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী রাজকর্ম্মচারীর কাছে। কিন্তু এ ছাড়াও বহুসংখ্যক লোক বহির্জগৎ সম্বন্ধে খবরাখবর জানতে চায় বলে এবং পত্রিকাটি দেখতেও সুন্দর বলে বেসরকারী ভাবে বিক্রী হ'লে এর মূল্য কখনও আশী রুবলে দাঁড়ায়—ব্যক্তিগত ভাবে হাত বদলালে কখনও কখনও এই পত্রিকার বিনিময়ে, যে থিয়েটারে সব টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে, সেরকম স্থানেও দুইখানি টিকিট পাওয়া যায়, কিম্বা নিজের মোটরগাড়ীর জন্য ষ্টোরেজ ব্যাটারী পাবার সুযোগ পাওয়া যায়, কখনও বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করা যায়।

অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়াতে যে কেবলমাত্র ব্যবসা করেই ন্যায়সঙ্গত বা বে-আইনী মতে ধনলাভ করা যায় তা নয়; ব্যক্তিগত ভাবে কোনো বিশেষ কর্ম্মোদ্যমে প্রণোদিত হবার জন্য আর্থিক পুরস্কারই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, সোভিয়েট সরকার দৃঢ়ভাবে তা বিশ্বাস করে। প্রতি কর্ম্মক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে প্রস্তুতকারীরা দক্ষতার সহিত ও সুনিপুণ ভাবে কাজ করবার চেষ্টা করে সেই উদ্দেশ্যে। প্রায় সব শ্রমিককেই প্রতিটি কার্য্যের জন্য পারিতোষিক দেওয়া হয় এবং যারা তাদের সাধারণ গড় পরিমাণের চেয়ে বেশী কাজ দেখাতে পারে, তাদের কাজ হিসেবে যা পাওয়া উচিত তার চেয়ে ঢের বেশী পুরস্কার দেওয়া হয়। সুতরাং "ষ্টাখানো ভাইট"রা (যারা অন্য শ্রমিকদের কাজের চেয়ে বেশী কাজ দেখাতে পারে) বেশ আরামেই দিন

কাটায়…তাদের জীবিকা ও সাধারণ রুশীয় শ্রমিকের আয়ের মধ্যে যা তফাৎ আছে, তা অন্ততঃ আমেরিকার একজন অতি সুদক্ষ, শিল্পপদ্ধতিতে শিক্ষিত কর্ম্মীর ও একজন সাধারণ দিনমজুরের আয়ের তফাতের সমান। রাশিয়ার মত শ্রমশিল্পে নিরত দেশে ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার এবং ইঞ্জিনিয়ার সর্ব্বক্ষণই আবশ্যক এবং যারা কাজে দক্ষতা দেখাতে পারে তারা যে-কোন হিসেবেই অবস্থাপন্ন বলে গণ্য হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় লেখক এবং শিল্পীসম্প্রদায় বেশ মোটারকম আয় করে। সাধারণতঃ তারা তাদের মূল জীবিকা অর্জ্জন করে কোন একটি বিশেষ সঙ্ঘ থেকে, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে কাজ করে যায়। যেমন, কোন একজন লেখক হয়ত এভাবে কোন দৈনিক পত্রিকার পত্র-প্রেরক বা সংবাদদাতা হতে পারে, বা সে হয়ত কোন মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে থাকতে পারে। কিন্তু তার এই মূল মাহিনা তার আসল আয়ের একটি অংশ মাত্র। অন্য কোন পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে যদি তার কোন লেখা প্রকাশ করতে চায় তা হ'লে তার জন্য তাকে বিশেষ নিয়মানুযায়ী দক্ষিণা দিতে হয়। তা ছাড়া উক্ত লেখক তার লেখা প্রতি গ্রন্থের জন্য "রয়্যালটি" বা সম্মান-মূল্য পায়, তার পরিমাণ নির্ভর করে বইয়ের কত পাতা, সংস্করণের সংখ্যা, কয়টি সোভিয়েট ভাষায় সে বই অনূদিত হয়েছে—এ সবের ওপর। এই সব "রয়্যালটির" যা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় তা সব প্রকাশক এবং লেখকের মধ্যে আলোচনা হয়ে ঠিক ধনতন্ত্রবাদী দেশের মত আইনানুযায়ী দলিলপত্রে লেখাপড়া করা হয়। কোন জনপ্রিয় লেখক অনায়াসে রেডিওতে বা এমনি মঞ্চে বক্তৃতা দিয়ে নিজের আয়বৃদ্ধি করতে পারে। কোন লেখক যদি বিদেশে বই প্রকাশ করে কিছু ধন অর্জ্জন করে, সে টাকা সে ইচ্ছামত যেখানে খুশী খরচ করতে পারে—কনষ্টান্টিন সিমিনভ মাত্র অল্প কিছু দিন আগে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে একটি বুইক মোটর গাড়ী কিনে এনেছেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন ইচ্ছে করেই রোজ নিয়মিতভাবে "চ্যাম বোর্ড" নামক নিউ ইয়র্কের বেশ একটি নাম করা রেস্তরাঁতে খেতেন, সেখানে খেতে হ'লে বেশ খরচ করতে হয়। মস্কোনিবাসী লেখকদের মধ্যে অনেকেই শহরের একটু বাইরে সুন্দর সাজান গুছান বাড়ীতে বাস করেন।
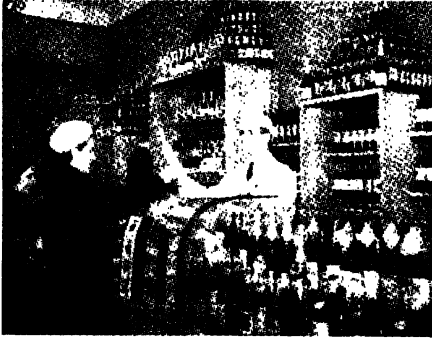
মদের দোকান

ডাক্তারদের পক্ষেও সঙ্গতিপন্ন হওয়া কিছু কঠিন নয়। তাঁদের সবাইকেই রুটিন অনুসারে হাসপাতালে কাজ করবার জন্য কিছু সময় দিতে হয়, তার জন্য তাঁদের ধরাবাঁধা মাহিনা আছে, কিন্তু এছাড়া বাকি সময়ে পৃথক ভাবে রোগী দেখলে তাঁরা পৃথক ফি নিতে পারেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে-কোন প্রজা প্রয়োজনমত বিনা খরচে বা নামমাত্র খরচে ডাক্তারের এবং হাসপাতালের চিকিৎসা পেতে পারে, কিন্তু সে যদি নিজের ইচ্ছানুসারে কোন বিশেষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য যায়, তা হলে তার প্রতিদানে উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়।

নর্ত্তকী এবং ছায়াচিত্র অভিনেত্রীরাও সুখে জীবনযাপন করতে পারে। ছোটবেলায় প্রতিভার লক্ষণ দেখা গেলে তাদের বিশিষ্ট শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি করা হয়, সেখানে অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চেয়ে উত্তম মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা আছে এবং শিক্ষালাভের জন্য ঢের বেশী পরিশ্রম করতে হয়। পরে তারা ধরাবাঁধা মাহিনা হিসাবে বেশ মোট টাকা পায় এবং তার ওপর আলাদাভাবে কনসার্টবাদন, অভিনয় ইত্যাদি করে, অথবা সেই সঙ্গে বেতার-শিল্পী হয়ে উপার্জ্জন করতে পারে। যুদ্ধের সময় আমেরিকার অভিনেতা ও শিল্পীদের মতন রুশীয় শিল্পীরাও সৈন্যদের আনন্দদান করবার জন্য ঘুরে ঘুরে বিনা পারিশ্রমিকে অভিনয় ইত্যাদি করেছিল।

বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী শক্তি যার আছে এমন ব্যক্তিও হঠাৎ ধনবান হয়ে যেতে পারে। নূতন এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের কিছু আবিষ্কার করলে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করবার আশা আছে—তা নূতন প্রণালীতে বল-বেয়ারিং তৈয়ারী করবার পন্থাই হোক বা অজানা নতুন টিনের খনির খোঁজই হোক। এই ধরণের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার সম্বন্ধে দেশ জুড়ে প্রচার করা হয়, কারণ তার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নূতন চেষ্টার উদ্দীপনা করা। লোভনীয় পুরস্কারের উপরেও একটি বিশেষ সুবিধা আছে, এই পুরস্কারের টাকার থেকে কিছু আয়কর দিতে হয় না।

জীবিকার জন্য বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনকারীদের মধ্যে সব চেয়ে উপরের ধাপে হচ্ছে লেখক, শিল্পী, সুরশিল্পী, নর্ত্তকী, রঙ্গমঞ্চ এবং ছায়াচিত্রের অভিনেতা, এর সঙ্গে আছে ফ্যাক্টরী ম্যানেজার ও ইঞ্জিনিয়ার। এর বেশ কয়েক ধাপ নীচে রয়েছে নানা উপজীবিকায় নিরত ব্যক্তিবর্গ—যেমন, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, সেনা ও নৌ-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, শিল্পপদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষিত কর্ম্মী, কারিগর এবং মধ্য-এশিয়ার নূতন

জলসেঁচ-প্রণালী দ্বারা উর্ব্বর-করা কৃষি-ক্ষেত্রগুলিতে যে সব কৃষিকর্ম্মী রয়েছে, সেই সব লোক। একেবারে নীচের ধাপে রয়েছে কেরাণীকুল, সাধারণ সৈনিক ইত্যাদি, অধিকাংশই কৃষক ও মজুর। দুই বছর আগে পর্য্যন্ত শিক্ষকদেরও এই সর্ব্বনিম্ন ধাপে ফেলা হ'ত। কিন্তু ইদানীং তাদের বেতন হঠাৎ তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কারিগরদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলা যায়।

ব্রিটেন, আমেরিকা বা ফ্রান্সের তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়াতে "ইনকম ট্যাক্স" খুব সামান্যই দিতে হয়। সব চেয়ে নিম্নশ্রেণীর আয় যাদের—যেমন সাধারণ মজুর এবং কেরাণী, তাদের আয়ের শতকরা দুই থেকে তিন ভাগ ট্যাক্স দিতে হয় এবং এর মধ্যে যাদের পরিবারে তিন জন বা তার বেশী আশ্রিত আছে তাদের এই ট্যাক্স কম দিতে হয়, অন্যদের চেয়ে শতকরা ত্রিশভাগ কম। উপরের ধাপে আবার যে সব লেখক বা শিল্পী ইত্যাদির বার্ষিক আয় ৩০০,০০০ রুবল অথবা তারও বেশী তাদের ট্যাক্স শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হয়ে থাকে। কৃষিকর্ম্মীদের বেলায় নিয়ম হচ্ছে যে, সমবায় কৃষিক্ষেত্র থেকে তারা যা লাভ করে তার থেকে ট্যাক্স কিছু দিতে হয় না, তবে তাদের ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্র থেকে যা লাভ হয় তার থেকে ট্যাক্স কিছু দিতে হয়, এর সর্ব্বোচ্চ হার হচ্ছে বার্ষিক আট হাজার রুবলের পিছু শতকরা ত্রিশ ভাগ। ১৯৪২ সাল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে দেয় খাজনা বা ট্যাক্স ইত্যাদি উঠে গেছে।

কয়েক শ্রেণীর লোককে একেবারেই ট্যাক্স দিতে হয় না, তার মধ্যে পড়ে সেনা-বিভাগের লোক এবং তাদের পরিবারবর্গ, স্বর্ণ, রৌপ্য, টিন, প্লাটিনাম প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতুর সন্ধানে যারা কাজ করে—সেই সব লোক যারা পেনসনের ওপর নির্ভর করে, যে সব কর্ম্মীর মাসিক আয় ২৬০ রুবলের কম, নূতন জিনিষের উদ্ভাবক এবং আবিষ্কারকগণ, মাসে ২১০ রুবলের কম বৃত্তিধারী ছাত্ররা, এবং এক শ্রেণীর লোক যাদের "হিরোজ অব সোশ্যালিষ্ট লেবার" বলা হয়। অবশ্য, সত্য কথা বলতে গেলে, যাদের এমনি আয়ের ওপর ট্যাক্স দিতে হয় না, তাদেরও অন্যভাবে একটি প্রচ্ছন্ন কর দিতে হয়, তার রকম অন্যরূপ। এর ফলেই রুবল এবং ডলার বা পাউণ্ডের মূল্য তুলনামূলক ভাবে নির্দ্ধারণ করা বৃথা এবং হাস্যকর প্রয়াস হয়ে পড়ে। "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স" পত্রিকার একজন লেখক কিছুদিন আগে লিখেছিলেন যে, এক জন সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধিবাসী যে সব দ্রব্য কেনে তার জন্য আমেরিকাবাসীর চেয়ে তাকে ঢের বেশী অর্থদণ্ড দিতে হয় পরিশ্রমের দিক দিয়ে। তুলনা করে দেখা গিয়েছে যে, এই হিসেবে রুশীয় ও ব্রিটিশ জনসাধারণ, বা রুশীয় ও ইতালীয় বা মেক্সিকোবাসীর মধ্যে এত বেশী প্রভেদ নেই। কিন্তু প্রত্যেক রুশীয়ের ক্রয় করা দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে নিহিত আছে সুবৃহৎ ফ্যাক্টরী ও শ্রমশিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা। স্কুলের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে মধ্যাহ্নের আহার করান, অণুপরমাণু সম্বন্ধে অনুসন্ধান, শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বিরাট্ আমলাতন্ত্র এবং তার অপটুতা, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ, বাসস্থান তৈরির জন্য অর্থ সাহায্য করা, ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের ক্রিমিয়াতে গিয়ে ছুটি উপভোগ করবার দায়িত্ব বহন এ সব তো আছেই—উপরন্তু মস্কো শহরে "দি প্যালেস অব দি সোভিয়েটস"—"সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রাসাদ," আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে যাতে এক দিন সে উচ্চতায় "এম্পায়ার ষ্টেট"-কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই গোপন "ট্যাক্সটি"র জন্যই বিশেষ সঙ্গতিপন্ন রুশীয় যে-কোন অবস্থাপন্ন আমেরিকাবাসীর মতই হালচালে জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু আর একটি লক্ষ্য করবার মত জিনিষ হচ্ছে, সোভিয়েট রাশিয়ার ধনী ও অবস্থাপন্ন লোকেরা তাদের দেশের জনসাধারণের চেয়ে বহুগুণ সুখে স্বস্তিতে জীবন যাপন করে।

বরষার গান

শ্রীশান্তি পাল

এসেছে বরষা, এসেছে বরষা
বিজলী বিহসি চমকে!
এ কি উচ্ছ্বাস মেঘ-ডম্বরে
অম্বরে ডিমি-ডমকে।
বিজলী বিহসি চমকে!

আজি এমনি মধুর যামিনী—
তোরা কেমনে গোঁয়াবি কামিনী?
হের তালীবন ঘন কাঁপিছে সঘন
ঝিম্ ঝিম্ ঝম্ ঝমকে।
বিজলী বিহসি চমকে!

আজি নূপুরে নৃত্যে রণনে
এস চঞ্চল চল-চরণে,
এস যৌবন লোল চরকি উছল
অঞ্চল ঝাঁপি ঠমকে।
বিজলী বিহসি চমকে!

ওগো এসেছে বরষা শ্যামল সরসা
মীড়-মূর্চ্ছনা-গমকে।
দারুণ দামিনী দমকে!

অমৃতের উত্তরাধিকার

শ্রীসুনীলকুমার বসু

মায়ের চিঠিখানা পাওয়ার পর থেকে বারবারই মনে পড়ছে রেণুর কথা। আমার বাল্যের সঙ্গিনী রেণু, দীর্ঘ দশ বছরের উদাসীন বিচ্ছেদের ওপারে যাকে ফেলে রেখে এসেছি। বছর পাঁচেক আগে একবার যখন ওর সঙ্গে দেখা হয়, তখন সে পাকা গৃহিণী এবং অভিজ্ঞ জননী। তার পর দেখা হয় নি, কেননা বিয়ের পর থেকে বরাবরই রেণু স্বামীর সঙ্গে দূর মফস্বল শহরে থেকেছে। হঠাৎ মায়ের চিঠিতে জানলাম মাসখানেক হ'ল রেণুরা কলকাতায় এসেছে। এসেই মাকে চিঠি দিয়েছে রেণু আমার খোঁজ করে, ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে। তাই অনেক দিন পর বারবারই মনে পড়ছে রেণুর কথা। জানি, জীবনের চেহারাটা আজ আমূল বদলে গেছে, বাল্যে যে আনন্দ উৎসারিত হ'ত ঐ মেয়েটিকে কেন্দ্র করে, জানি সে উৎস আজ শুকিয়ে গেছে। তবু মনে হ'ল হয়ত আজও ভাল লাগবে সেই প্রায় ভুলে যাওয়া রেণুকে, ভাল লাগবে তার মুখে পুরানো ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা ওল্টাতে। তাই রবিবার অপরাহ্নে বেরিয়ে পড়লাম ফটিক মিস্ত্রির গলির উদ্দেশ্যে।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর বাসিন্দাদের ভিড়ে এ স্থানটি অদ্ভুত রকমের ঘিঞ্জি, দারিদ্র্যের দুরপনেয় কলঙ্ক এরা যেন লজ্জায় গোপন করতে এসেছে এই সর্পিল গলির মধ্যে, লাস্যময়ী নগরীর এই অন্ধকার অন্তস্থলে। গলিটা এত সঙ্কীর্ণ এবং ঘোরালো যে সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হচ্ছিল যেন তুতেন-খামেনের তমিস্র সমাধিগহ্বরে প্রবেশ করছি। তার উপর আবার এক নাছোড়বান্দা রিক্সাওয়ালা গলির মধ্যে রিক্সাটাকে নিয়ে গিয়ে আর বাইরে আনতে পারছে না। ফলে পথটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং পাড়ার ছেলেরা রিক্সাওয়ালাকে রীতিমত নাকাল করতে লেগেছে।

গলির দু'ধারে পুঞ্জীভূত জঞ্জাল থেকে বেরুচ্ছে বীভৎস গন্ধ, তার উপর ধোঁয়ায় চারদিক ছেয়ে গেছে। একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, ৩৩৷১ ডি নং বাড়ীটা কোথায়? অমনি চার-পাঁচটি উৎসাহী ছেলে এসে আমাকে প্রশ্নবানে জর্জ্জরিত করে তুলল,—'কার বাড়ী যাবেন? কত নম্বর বললেন? রাস্তার নামটি কি? ঠিকানা ভুল হয় নিতে?' ওদের পরহিত-ব্রতকে ধন্যবাদ। কেননা ওদেরই সাহায্যে সেই অন্ধকার গোলকধাঁধার মধ্যে উক্ত নম্বরের বাড়ীটার ভগ্নাংশ খুঁজে বার করতে পারলাম।

একটা ছোট স্যাঁতসেতে ঘরের মেঝেয় বসে গুটিচারেক ছেলে মোমবাতি জ্বালিয়ে বই সামনে নিয়ে কলরব করছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে অবস্থাটা উপলব্ধি করতে না করতেই শুনতে পেলাম তীব্র কণ্ঠের চীৎকার, 'তুমি সাক্ষী থেকো, ভগবান, তুমি তিরিযুগির সার, তুমি শুনো সব, আমারে বলে মিথ্যেবাদী। খসে পড়বে, ওর জিবে খসে পড়বে, আমি অভিশাপ দিচ্ছি, এ বেরথা হবে না…।'

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি বিমলবাবুর বাড়ী, রেণু কি এখানে থাকে?' একটি ছেলে ছুটে চলে গেল বাড়ীর মধ্যে। আর একটি ছেলে পাশের ঘরে গিয়ে শাসনের সুরে বললে, 'থাম না ঠাকুমা, বাইরে একজন ভদ্র-লোক এসেছেন।' উত্তরে শোনা গেল, ভদ্দর নোক এসেছেন তাতে আমার কি, আমি হক কথা বলবই।

পরমুহূর্ত্তেই বেরিয়ে এল রেণু—না, রেণুর প্রেতমূর্ত্তি বললেই ভাল হয়। কে, অভয়দা' না? কি ভাগ্যি আমার! বলে নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে এল ও। আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, এ তোর কি হাল হয়েছে রে রেণু? তোকে যে আর চেনা যায় না। মোমের আলোয় এক ক্ষীণ পরাজিত দীপ্তি ওর শীর্ণ তোবড়ানো গালে ক্ষণিকের জন্য চমক দিয়ে গেল। আমি বললাম, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস্? চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে? কি হয়েছে তোর? উত্তর না দিয়ে ও শুধু বললে, ভিতরে এস অভয়দা', প্রণাম কর, ওরে বিশু, পল্টু, ঘন্টা, ভোম্বল, ইনি তোদের মামা হন…।

ভিতরে ঢুকলাম, আর একটি সঙ্কীর্ণ গলিপথে বললেই চলে। আসলে গলি নয়, একখানা লম্বাটে ঘর। এক দিকে তার কিছু কয়লা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে—অন্য দিকে, সভয়ে চেয়ে দেখি, মাটিতে একটা ময়লা ছেঁড়া বিছানা পাতা—পাশেই কালীর একখানা ছবির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজার ভঙ্গিতে বসে এক বৃদ্ধা এদিকে ওদিকে কুতূহলী চোখে চাইছেন। পূজায় তাকে খুব নিবিষ্টচিত্ত মনে হ'ল না। যেতে যেতে শুনতে পেলাম নিজের মনেই তিনি বলে চলছেন। হে: রোগা হয়ে গেছে না আরও কিছু, ভারি তো হাল ছিল, রোগা, চিমড়ে-পড়া এক বউ নিয়ে এয়েছিলাম। তা' বউরি তো আর বসে বসে খাওয়াতি পারি নে, খেটে খাতি তো হবে…।

পাশের ঘরে একটি মোড়ায় বসেছি। বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর তখনো কানে আসছে, 'ওরে ও পল্টু, ও বিশু, বলি ও লোকটা কেডা?' 'শুনলে না, ঠাকুমা', বললে বিশু, 'উনি

আমাদের মামা হন।' 'ছাঃ, মামা না আরও কিছু,' বৃদ্ধা বললেন, 'কোথাকার কে, বোন পাতাতি এসে হাজির হ'ল। বলি ও রাত্তিরি থাকতি চাবে না তো?' 'জানি না' ঘণ্টা বললে, 'তুমি পুজো করতে বসে বড় বকবক কর ঠাকুমা।' 'তুই থাম, বখাটে ছোঁড়া,' বৃদ্ধা বললেন, 'তোরা মা'পোরা মিলে আমারে জ্বালায়ে খালি।'

বিবর্ণ আলোয় রেণুর মুখে ব্যর্থতার বিশীর্ণ রেখা ফুটে উঠেছে পেন্‌সিল স্কেচের মত, কোটরগত চোখ থেকে স্তিমিত দীপ্তি প্রতিফলিত হচ্ছে ঘোলাটে কাচের মত। মনে হ'ল বহু বৎসরের বিস্মৃতি-ঘেরা এক মমি আমার সামনে উঠে এসেছে পিরামিডের গহ্বর থেকে।

ছেলেগুলি এসে আমাকে ঘিরে ধরেছে। 'গায়ের উপর ঝুঁকে পোড়ো না পণ্টু,' রেণু বললে। ঘণ্টা তীব্র অনুসন্ধিৎসা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি বুঝি আমাদের মামা হন? বিশু বয়সে বড়, অতএব ঘণ্টার প্রগলভতা সে সহ্য করলে না। বললে, তুই থাম্ না। ঘণ্টার সপ্রতিভ ভাব আমার ভারি ভাল লাগল, ওকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি পড় খোকা?' ওর হয়ে জবাব দিলে রেণু, পড়াশুনোয় ওরা চার ভাই-ই বেশ ভাল। ঘণ্টা একটু দুষ্টু। কিন্তু ভারি বুদ্ধিমান, এখনই ও ক্লাস কোরের বই সব পড়ছে। আবার বিশু কেমন ছবি আঁকতে পারে। দেখা না তোর মামাকে, সেই মহাত্মা গান্ধীর ছবিখানা।

রেণুর বিশীর্ণ মুখ এক অলৌকিক আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে আলো মাতৃগর্ব্বের। অতলস্পর্শ অনুভূতির আবেশে ওর চোখ দুটি যেন দীর্ঘায়ত হয়ে মমতার ভারে নিস্পন্দ হয়ে গেছে। মুগ্ধ পুলকের দৃষ্টিতে ও চেয়ে আছে ওর ছেলেদের দিকে। ইতিমধ্যে আর একখানি কুতূহলী মুখ আমার পানে উঁকি দিচ্ছে, গোছা গোছা কোঁকড়ানো চুলে সে মুখের অর্দ্ধেক ঢাকা। রেণু ডাকলে, 'এদিকে আয় না পূর্ণিমা। প্রণাম কর। এ আমার মেয়ে, ঐ একটিই'। মেয়েটি এগিয়ে এল, সুন্দর, সহাস্যমুখ—রুগ্ন, তবু প্রাণের আনন্দে উচ্ছল। রেণু বললে, তোর মামার জন্যে একটু চা করে নিয়ে আয়। আমি বললাম, সে কি, অতটুকু মেয়ে চা করবে কি করে? রেণু বললে, ও সব পারে। আমি তো এই শরীর নিয়ে সব পেরে উঠি না। তাই ওকে করতে হয়। একটু আধটু রাঁধতেও পারে। রাঁধবার লোক তো আর নেই।

শিশুর কান্নার শব্দে সচকিত হয়ে উঠলাম, ঠিক কান্না নয়, অব্যক্ত যন্ত্রণার একটা ভাষাহীন প্রকাশ। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, এবার চেয়ে দেখি, রেণুর ঠিক পাশেই কাঁথা দিয়ে ঢাকা একটি শিশু শুয়ে আছে। স্বল্প আলোয় ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, শুধু তার আকারটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে মাত্র। রেণু ধীরে ধীরে ওর গায়ে চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, 'ইস্, গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।' ঘণ্টা ছুটে এসে শিশুটির গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'তাই ত'। রেণু বললে, 'আমার কোলের ছেলে, দিন দশেক হ'ল অসুখ করেছে, সর্দ্দি জ্বর আর কাশি। পরশু থেকে বেশ একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে'। শিশুটি নড়ে উঠল, তার পর সুরু করলে প্রবল কাশি। রেণু তাকে কোলে তুলে নিয়ে মৃদু দোলা দিতে দিতে তার মুখে তুলে দিলে বিশীর্ণ স্তন দ্বিধাহীন অকপট সারল্যে, তার পর বললে, বাচ্চাটার অসুখের জন্যে মনে শান্তি নেই।

ছেলেরা বাইরের ঘরে ফিরে গিয়ে পুনরায় কলরব সুরু করলে। পাশের ঘরে বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, এ সংসারে শান্তি নেই, উচ্ছন্ন যাবে এ সংসার, যে সংসারে বউ এমন, ছেলেপিলে অমন…। আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কি তোর শাশুড়ী রে, রেণু? রেণু বললে, হ্যাঁ, ওই এক রকমের মানুষ, খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে দিনরাতই খালি খিটমিট করেন।…পূর্ণিমা কানা-ভাঙা কাঁচের গ্লাসে চা নিয়ে এল। বৃদ্ধার স্বর সপ্তমে উঠেছে, যাবে, এডাও যাবে, একটা গেছে, এডাও…। পূর্ণিমা ছুটে গিয়ে দাবড়ি দিয়ে বললে, 'তুমি থামো না ঠাকুমা'। কেন না—বৃদ্ধা দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠলেন, আমি কি কাউকে ভয় করি? কোন বেটাবেটিকে?

রেণুর মুখখানা বাসি ফুলের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি বললাম, তোর ক'টি ছেলেমেয়ে রে? ও বললে, বেঁচে আছে ছ'টি, বাইরের ঘরে ওই চারটি ছেলে আর কোলের এটা। মেয়ে ঐ পূর্ণিমা। কিন্তু…। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল রেণু, ইতস্তত করতে করতে, কি যেন অদম্য আবেগের ঝড় বুকে চেপে রাখবার চেষ্টা করতে করতে বললে, কিন্তু…আর একটি ছেলে ছিল আমার—এই এরই মত। আর বছর ঠিক এই সময় সে চলে গেছে—সেই আমার মিণ্টু… বলতে বলতে ওর রুদ্ধ আবেগ চোখ দিয়ে অজস্র অশ্রুধারায় ঝরে পড়ল।

আমি শুধু শুনে যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চাইছিলাম। সমস্ত ঘরখানায় কি কঠোর নিশ্বাসরোধী দারিদ্র্যের বিষাক্ত আবহাওয়া চারদিক থেকে যেন ঘিরে ধরছে, নিঃশ্বাস রোধ করে মেরে ফেলতে চাইছে—আলো ও হাওয়া বর্জ্জিত সেই ছোট ঘরখানায় মেঝের উপরে শুয়ে সেই মুমূর্ষু শিশুটি প্রাণবায়ুকে আটকে রাখবার জন্যে যেন মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে। পাশে বসে অসহায় জননী। রেণু একটু আত্মসংবৃত হয়ে বললে, মিণ্টুর জন্মের পর থেকে আমার সূতিকা হয়। সে কিন্তু চলে গেল আমাদের ছেড়ে। তার পর যখন পেটে এল এই নানুটু, তখন আমার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। প্রায় না বাঁচার মত। কিন্তু কি সুন্দর চেহারা, কি সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছিল এর। শুধু অসুখে অসুখে বাছা আমার সারা

হয়ে গেল, কিন্তু এবারে তাকে বাঁচাতে পারব কিনা…বলতে বলতে আবার সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা পাচ্ছিলাম না, তবু বললাম, ভয় নেই তোর, বাচ্চাদের ও একটু-আধটু অসুখবিসুখ হয়েই থাকে। তা কি ওষুধ খাওয়াচ্ছিস ওকে? রেণু বললে, গোড়ার দিকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাচ্ছিল। তাতে কোন ফল হয় নি। এখন খাচ্ছে তারিণী বৈরাগীর জলপড়া, আমি বললাম, সে কি? এই মারাত্মক অসুখে জলপড়া? ও বললে, কি করব, শাশুড়ীর ওতে অগাধ বিশ্বাস। তা ছাড়া। তা ছাড়া…মানে…আর কিছু বলতে পারলে না।

বুঝলাম ও আর্থিক অসচ্ছলতার ইঙ্গিত করছে। ও প্রসঙ্গ আর তুললাম না। তার প্রয়োজনও ছিল না। ওর জীবনের পূর্ণাবয়ব একখানি সর্ব্বাঙ্গীণ চিত্র আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, সেখানে আমি সবই দেখতে পাচ্ছি। মনে হ'ল বহু দূরে চলে গেছি। অনেক দূরে, যৌবনের খেয়াপারে, সেখানে হাস্যমুখী সঙ্গিনী রেণু, কোঁকড়ান চুল, ছিপছিপে চেহারা। রেণুর মেয়েটির চুল ঠিক তার মায়ের মতই কোঁকড়ানো। আর রেণুর? ওর মাথার চুল তো প্রায় উঠেই গেছে, কয়েক গাছা আছে মাত্র নুড়ির মত। রেণু অতীতের ভগ্নস্তূপ, যৌবনের ধ্বংসাবশেষ।

অভয়দা, রেণু ডাকলে। চমকে উঠে বললাম, 'বিমল বাবু তো এখনও ফিরলেন না?' ও বললে, 'ওঁর ফিরতে অনেক রাত হয়। আপিস থেকে বেরিয়ে দুটো টিউশনি করে তবে ফেরেন।'

সদরের দরজা পর্য্যন্ত এল রেণু আমাকে এগিয়ে দিতে। 'ভাইকে নিয়ে তো বসে গল্প করা হ'ল অনেকক্ষণ,' বৃদ্ধার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল, বলি আমার দু'খানা রুটি কি তৈরী হবে, না হবে না?'

'আমার অবস্থা, সবই তো দেখলে অভয়দা', রেণু বললে, 'আর একদিন এসো কিন্তু'। ছেলেরা আবার আমায় ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ওদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে রেণুকে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাইরে পা বাড়িয়েছি—এমন সময় রেণু হঠাৎ বলে উঠল, একটা কথা বলব অভয়দা? তুমি কাজের মানুষ, তোমার কি সময় হবে? আমি আগ্রহান্বিত হয়ে বললাম, কি বলবি বল? আমি সময় করে নেব তোর জন্যে। অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ও বললে, একটা জিনিস আনবার কথা বলছিলাম। মানে ওঁর তো সময় হয় না, রবিবারেও উপরি খাটুনি। আর তো কোনো লোক নেই আমার! আমি বললাম, বল না কি আনতে হবে? ও ইতস্তত করে বললে, বলছিলাম কি, একটা মাদুলি। আমাকে বিস্মিত হবার সুযোগ না দিয়ে বললে, বরানগরে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, কালী-সাধক। তাঁর মাদুলির নাকি ভয়ানক ক্ষমতা। এ পাড়ার অনেকেই এনেছে, ফলও পেয়েছে খুব ভাল। এই তো বিনয়বাবুর ছেলের অম্বলের ব্যথা ছিল। তারপর পুঁটির মা'র ছিল বুক ধড়-ফড়ানি—সব সেরে গেছে, আরও অনেকে ঢের উপকার পেয়েছে। তাই আমার খুব ইচ্ছে একটা মাদুলি এনে আমার নান্টুকে পরিয়ে দেখি।—মাদুলিতে বিশ্বাস করি না, তবু মনের উদ্গত আবেগ চেপে বললাম, দেব, নিশ্চয় এনে দেব তোকে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ও বললে, দেবে? একটু দাঁড়াও তবে। পূর্ণিমা যা তো মা, ঐ তাকের উপর সিঁদুরের কৌটোর মধ্যে সোয়া পাঁচ আনা পয়সা আছে। সন্ন্যাসীর কাছে ভোগের জন্য দিতে হয় পয়সা…। আমি বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলাম, থাক্ থাক্ পয়সা দিতে হবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাক্ রেণু, কাল আমি মাদুলি নিয়ে আসব।

পরদিন আবার সেই নিরানন্দ গলিটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। সন্ধ্যা উতরে যাচ্ছে প্রায়। গলির মোড়ে পাড়ার ছেলেদের জটলা। একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে গলির মধ্যেকার পুঞ্জীভূত জঞ্জাল থেকে, ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে বাতাস হয়েছে ভারাক্রান্ত। নিকটে কোনো বাড়ীতে পূজো হচ্ছে। সেখানকার কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ একটা তীব্র রোল তুলেছে। পকেট থেকে মাদুলিটা বার করে এক বার দেখে নিলাম। মাদুলিতে আস্থা নেই। তবু আজ দুপুরে বরানগরে গিয়ে সন্ন্যাসীকে কাতর অনুনয় করে বলেছিলাম, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র মাদুলির বুকে নিরাময়ের অমোঘ শক্তি ভরে দেন, এর স্পর্শ মুমূর্ষু শিশুর জ্বরতপ্ত দেহে যেন বুলিয়ে দেয় চন্দনের স্নিগ্ধ প্রলেপ। ভাল করে দেখে নিলাম মাদুলিটাকে। ক্ষুদ্র তামার একটা জিনিষ, তার ভিতরে ওষুধের শিকড় ভরে মোম দিয়ে মুখটা আঁটা। রোগীর কপালে তিনবার ছুঁইয়ে রঙীন সুতো দিয়ে পরিয়ে দিতে হবে তার গলায়। তারপর তার মাকে পাঁচ সিকের ভোগ দেওয়ার মানত করতে হবে। রোগ সেরে গেলে মাকে ছেলে সহ সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে মানত শোধ দিতে হবে। ভাবতে ভাবতে চলে গেছি ওদের বাড়ীর কাছে।

ছেলেগুলো আজ নিঃশব্দে বসে আছে বাইরের ঘরে। বললাম, 'কি রে, তোরা যে আজ বড় চুপচাপ। গোলমাল করছিস্ না, মারামারি করছিস্ না, ব্যাপার কি? তোদের মা কোথায়?' 'ভিতরে আসুন আপনি', বললে মণ্টা স্বভাব-বিরুদ্ধ গাম্ভীর্য্য নিয়ে। একটা ক্লান্ত, করুণ, বিলাপের সুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দেখি, রেণুর শাশুড়ী বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। ভাবলাম, রেণুর সঙ্গে কলহের পরিণাম হয়তো। ভিতর থেকে পুরুষ-কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া গেল, কে রে ঘণ্টা। কে এলো?—'কে, বিমলবাবু নাকি, বেশ মশায়, আপনার যে দেখাই পাওয়া যায় না।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকলাম। আসুন, আসুন বলে মোড়া

এগিয়ে দিলেন বিমলবাবু। মেঝেয় শায়িত অবসন্ন রেণু তাড়াতাড়ি উঠে বসে গায়ের কাপড় সামলে নিলে, তার পর মাথার উপর ঘোমটাটা টেনে দিলে—তার পাশে বসে পূর্ণিমা। কাল আপনি আমার জন্তে অনেকক্ষণ বসেছিলেন শুনলাম,—বললেন বিমলবাবু। আমি বললাম হ্যাঁ, তা বটে, আপনি কেমন আছেন? কই রেণু, তোর ছেলে কই? কেমন আছে আজ? তার জন্তে মাদুলি নিয়ে এলাম যে, এই নে মাদুলিটা···।

সহসা একটা তীব্র মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ বিষাক্ত তীরের মত ছুটে এসে আমার বুকের মধ্যে বিঁধে গেল, আর তার দীর্ঘায়িত প্রতিধ্বনি বিষবাষ্পের মত সমস্ত ঘরখানাকে অসহনীয় যন্ত্রণায় ভরে তুলল। আকস্মিকতায়, ত্রাসে চমকে উঠলাম। দেখলাম, রেণু উপুড় হয়ে শুয়ে অঝোরে কাঁদছে, আর পূর্ণিমা মায়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে কালকের সেই সুন্দর, সপ্রতিভ ছেলে ঘণ্টা,—আজ তার মুখ ঝড়ের মত গম্ভীর।

কোথা থেকে কি যেন ঘটে গেল, অভাবিত, অপ্রত্যাশিত, কাল ঐখানে ঐ মেঝের উপর শিশুটিকে শোয়া দেখে গেছি। আজ সে নেই। এত শীঘ্র, এত অতর্কিতে মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। কেউ তাকে আটকে রাখতে পারে না। এমন কি মায়ের স্নেহাতুর অন্তরও নয়। বললাম, বিমলবাবু এ কি হ'ল। ম্লান হেসে বিমলবাবু বললেন, ভাগ্য। রাখা গেল না, কাল রাত্রেই চলে গেছে।

রেণু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, গায়ের কাপড় তার বিশৃঙ্খল। লজ্জা পাবার মত সংজ্ঞা নেই ওর। আমি দেখছি ওর অসম্বৃত দেহ—হাড়-বার-করা, শীর্ণ, মাংসহীন কঙ্কাল যেন। জানি না, ঐ কঙ্কালের নিভৃত নিঃসঙ্গ বুকে কি অমৃত লুকানো আছে যার হাজার ধারায় ঐ মাটি ভেসে গেল।

উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে বেরিয়ে এসেছি, সহ্য করতে পারি নি বেশীক্ষণ। জনবহুল পথ দিয়ে আবার চলছি। লক্ষ্যহীন ভাবে চলতে চলতে হঠাৎ মনে হ'ল হাতের মুঠির মধ্যে কি যেন রয়েছে। মুঠি খুলে দেখি সেই মাদুলি।

সংস্কৃতশিক্ষা ও বাঙালী হিন্দু সমাজ

অধ্যাপক শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায়

এদেশে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যসমাজ শিক্ষা বলিতে ইংরেজী শিক্ষাই বুঝিয়াছিলেন। মাতৃভাষা ও সংস্কৃত ভাষা সেই দিন হইতেই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আপাতরম্য তথাকথিত বিজাতীয় শিক্ষার মোহে আমরা এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যাহার দরুন বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র লেখা পর্য্যন্ত আমাদের কাছে লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বনামধন্য স্যর আশুতোষের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই আমাদের বঙ্গভাষা-জননী বিশ্ববিদ্যালয়ভবনে প্রবেশের অধিকার লাভ করিলেন। আশুতোষের চিন্তাশক্তির মৌলিকতা ছিল বলিয়া স্রোতের তৃণের মত তিনি গতানুগতিকতার প্রবাহে ভাসিয়া যান নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার যোগ্য স্থান লাভ যে অত্যাবশ্যক তাহা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। সেও আজ অনেক দিন হইল। তারপর আমাদের ভাষাজননী ধীরে ধীরে নিজের আসন কায়েম করিয়া লইতেছেন, বঙ্গের বাহিরেও তাঁহার প্রভাব আজ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। ইহা খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নাই—কিন্তু সেই বঙ্গভাষার অস্থিমজ্জা যে-সংস্কৃত ভাষার উপাদানে গঠিত সমগ্র ভারতের সেই মহীয়সী ভাষাজননীর মর্য্যাদা আজ বাংলাদেশের শিক্ষামন্দিরে ধূল্যবলুণ্ঠিত একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিছু দিন ধরিয়া 'প্রাচ্যবাণীমন্দিরে'র শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী সংস্কৃত সাহিত্যের অবদান ও উক্ত ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার যোগ্যা সেবিকা, তাঁহার প্রয়াস সার্থক হইবে ও বর্ত্তমান শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিবেন বলিয়াই আশা করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিবিধকুসুমসম্ভারে সংস্কৃতভাষার পূজার স্থান হওয়া এক দিন হয়তো সম্ভব, কিন্তু আমার অত্রকার আলোচ্য বিষয় "টোলের সংস্কৃত শিক্ষা"। যথাযোগ্য উপায়ে এই টোলের অধ্যাপনায় এক দিন শাস্ত্রাদিরক্ষা সম্ভব হইয়াছিল। এই শিক্ষা সরকারের অধীন হইলেও ইহাকে নানা কারণে আর প্রকৃত শিক্ষার কোঠায় স্থাপন করা এখন অনেকেরই অনভিপ্রেত। ভবিষ্যৎ জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শিক্ষাধারার পরিবর্ত্তন আজ যেমন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যেও দরকার হইয়া পড়িয়াছে, সংস্কৃতশিক্ষার মধ্যেও তাহার অনুরূপ প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত অল্প নহে। প্রথমতঃ দেখা উচিত এ জাতীয় টোলের শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা? যদি প্রয়োজন না থাকে তবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমরা টোলের শিক্ষার ভিতরে দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই —প্রথমটি প্রাচীনভাবধারার সংরক্ষণ; দ্বিতীয়টি শাস্ত্রগ্র-

সংরক্ষণ। পূর্বে শিষ্যবর্গ গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক অধ্যয়ন করিত। আচার্য্যেরাই ছিলেন তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী, শিষ্যদিগকে কোন বেতন দিতে হইত না। অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে যথা অভিরুচি কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেওয়া হইত —কিন্তু তাহাও বাধ্যতামূলক ছিল না। শিষ্যেরা গুরুগৃহে বাসকালে গুরুর সাংসারিক কার্যে সাহায্য করিতেন এবং আনন্দের সহিত আপন বাড়ীর মতই থাকিতেন। গুরু ও গুরু-পত্নী অপত্যনির্বিশেষে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় শান্তিনিকেতনে এই ভাবধারা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শিষ্য গুরুদেবের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইলে, শিক্ষা মাত্র আক্ষরিক না হইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এবং ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকভাবেও তাহার অন্তরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। আরশিতে বিম্বের প্রতিফলনের ন্যায় গুরুর মহনীয় শিক্ষার ছাপ শিষ্যে সর্বাংশে ফুটিয়া উঠে। টোলে এই আদর্শরক্ষার কাঠামো এখনও বর্তমান আছে। সংস্কার করিয়া লইতে পারিলে—সমাজ এ বিষয়ে একটু সচেতন হইলে, ইহা অংশতঃ কার্যে পরিণত করা একান্ত অসম্ভব নাও হইতে পারে ; কারণ এখনও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহ টোলের সহিত সংসৃষ্ট ব্যক্তিদের মনে সম্পূর্ণরূপে আসন পাতিয়া লইতে সমর্থ হয় নাই। স্বাবলম্বী-সমাজ গঠন করিতে হইলে এই জাতীয় ভাবধারার অনুবর্তন ফলপ্রসূ হইবে ইহা নিঃসংকোচে বলা যায়। "হাতে কলমে" শিক্ষার সুযোগও ইহাতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। সুতরাং বিশেষ চিন্তা করিলে দেখা যায়, টোলে প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্যটির মর্যাদা নিতান্ত অল্প নহে।

দ্বিতীয়টির মর্যাদা আরও অনেক বেশী। সংস্কৃত দর্শনাদি বিবিধশাস্ত্রসম্পদের যথার্থ অধিকারী হইতে হইলে শাস্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাতৃগণ যে সমস্ত অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন সেগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সেইগুলি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করিলে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাধারা স্বতঃপরিস্ফুরিত হইয়া উঠে—যাহার ফলে শাস্ত্রার্থবোধ ও শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ সম্ভব হয়। শাস্ত্রের যথাযথ তাৎপর্য বোধগম্য না হইলে শিষ্যপরম্পরায় তাহা যে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব নয় তাহা সহজেই বোঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা শাস্ত্রমর্ম সংরক্ষণে অসমর্থ। সংক্ষেপতঃ, উল্লিখিত অপরিহার্য দুইটি কারণে সম্প্রতি টোলের শিক্ষার আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। এজাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়মন্দিরে যে একান্ত অসম্ভব এরূপ কথা বলা যাইতেছে না, কিন্তু যে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লিখিত প্রণালীতে শিক্ষাপ্রবর্তন সম্ভব না হয় সে পর্যন্ত কে এই গুরু কর্তব্যভার বহন করিবে ? কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই কর্তব্য দুইটির গুরুত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। বর্তমানে শাস্ত্রার্থরক্ষা দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে, আমরা শাস্ত্রের মর্মার্থ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছি...তাই ভবিষ্যৎবেত্তা মহর্ষি উদয়ন দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন "জন্মসংস্কারবিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায় কর্মণোঃ। হ্রাসদর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাম্"—(কুসুমাঞ্জলিঃ)। তাঁহার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইতেছে।

যদি বর্তমান সুধীসমাজ মনে করেন, এই দুইটিতে গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন নাই, অথবা অন্য উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে টোলের উচ্ছেদই একান্তভাবে তাহাদের কাম্য। আজ 'টোল' কথাটি পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীর কাছে কাছে উপহাসাস্পদ। টোলে অধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা কৃতবিদ্য হন তাঁহাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে শিক্ষিতের মর্যাদা সময়বিশেষে দেওয়া হইলেও আর্থিক মর্যাদা তাঁহাদের তাদৃশ দেওয়া হয় না। টোলের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা যেন একান্ত কৃপার পাত্র। টোলের শিক্ষার উপর সমাজের অনাস্থা ইহার অন্যতম কারণ হইলেও আজিকার শিক্ষাধারার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও নিতান্ত অল্প নহে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে আমাদের নিত্য নূতন অভাব পূরণের জন্য অর্থের অকারণ আবশ্যকতা সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও মোটামুটি জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যও বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা ঢের বেশী অর্থের প্রয়োজন। আজ টোলের কৃতবিদ্য পণ্ডিতসম্প্রদায় আর্থিক মর্যাদায় যদি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের অপেক্ষাও ন্যূন হন তবে সমাজ কেনই বা এই সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য যত্নবান্ হইবে ? এই ভাবে যে সংস্কৃতশাস্ত্র-সম্পদের নিকট পৃথিবীর সভ্য-সমাজ ঋণী, আজ তাহা চরম অবনতির স্তরে পৌঁছিয়াছে। আজ সমাজের চিন্তা করার সময় আসিয়াছে। আজ ভারতে হিন্দু সংস্কৃতি বজায় রাখার প্রয়োজন থাকিলে সংস্কৃতশিক্ষাকে অধিকতর মর্য্যাদাশালী করিতে হইবে। আজ ভারত ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হইতে চলিয়াছে, সুতরাং তাহার নিজস্ব সংস্কৃতির ভাষাকে তাহার মুখে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

ভারতের প্রদেশবিশেষে সংস্কৃতশিক্ষার একটা বিশিষ্ট মর্যাদা আছে কিন্তু বাংলায় তাহার মর্যাদার প্রশ্ন তোলাও যেন অনাবশ্যক বিবেচিত হয়। তাই বাঙালী সুধীসমাজ ও শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারদের নিকট এই বিষয়টি চিন্তা করিবার জন্য উপস্থাপিত করিতেছি। সংস্কারের যুগ আসিয়াছে—সর্ববিধ সংস্কারের মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধক শিক্ষাসংস্কারের মূল্য যে সর্বাপেক্ষা বেশী সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। সমাজে যে যে শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য সেগুলির আর্থিক মর্যাদার এরূপ তারতম্য নিতান্তই অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক। সমাজের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে আশা করা যায়।

যে ইংরেজ জাতি সংস্কৃত ভাষাকে মৃত ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির চরম অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উক্তিকে অতিরিক্ত মর্য্যাদা দিয়া এতকাল ভারতীয় ভাবধারাকে ও তাহার সংস্কৃতিসমৃদ্ধ ভাষাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। কিন্তু আজ ভারতজননী পুনরুজ্জীবিতা ও মুক্তা। এখন আর সংস্কৃত ভাষাকে পাশ্চাত্ত্য বুলির অনুকরণে মৃত ভাষা বলিয়া অবমাননা করা আত্মহত্যার নামান্তর বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার পুরকায়স্থ

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, প্রথমেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা মনে পড়ে। পৃথিবীর কোন দেশে, কোন কালেই বোধ হয় এই রকম জটিল সমস্যা আর দেখা দেয় নাই।

হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় বহু শতাব্দী হইতে একই দেশে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে। যাহারা এতদিন সৌহার্দ্দ্যের সহিত একত্র বসবাস করিয়াছে, আজ তাহাদের মধ্যে এই হিংসা ও বিদ্বেষের ভাব দেখা দিল কেন?

আজ আমাদিগকে প্রথমে এই কথাটাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে, এবং এই প্রশ্নের উত্তর আমরা যত সত্বর বাহির করিতে পারিব আমাদের আসল সমস্যার সমাধানও ততই সহজ হইয়া আসিবে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। প্রতিবেশীর সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া তাহার কোন মতেই চলে না। এই প্রয়োজনের তাগিদই মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল যাযাবর-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া, দলবদ্ধ ভাবে বসতি স্থাপনে তৎপর করিয়াছিল।

রামপুরের নিতাই মণ্ডলের ঘরে আগুন লাগিলে, মাধবপুরের কেশব সরকার আসিয়া সাহায্য করিবে না। তাহার প্রতিবেশী করিম আলীকেই সাহায্যের জন্য দৌড়িয়া আসিতে হইবে। প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর এই যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্দ্যের ভাব, সুখে দুঃখে ও বিপদে আপদে সমবেদনার ভাব—ইহাই সমাজবন্ধন এবং ইহার বৃহত্তর সংস্করণই জাতীয়তাবাদ।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। দেশ বলিতে আমরা এক একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ স্থানকেই বুঝি। এই সকল স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কতকগুলি সমস্বার্থ থাকে। দেশে যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাহা হইলে কোন দল বা সম্প্রদায়বিশেষ তাহা হইতে রেহাই পায় না। গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে দেখা গিয়াছে, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারী দুর্ভিক্ষের কবলে প্রাণ দিয়াছে। কাজেই দল ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের স্বার্থের জন্য, দেশের সাধারণ উন্নতিবিধান করা ও সকল রকম বিপদ আপদ হইতে দেশকে রক্ষা করার সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইতে দেশের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্য, সহযোগিতা ও সমবেদনার ভাব আসে, একটা একতাবোধ জাগ্রত হয়—ইহাই জাতীয়তাবাদ। এইজন্যই রুশিয়ার খ্রীষ্টান ও মুসলমান অধিবাসী—সম্মিলিত রুশ জাতি। চীনের বৌদ্ধ ও মুসলমান—চীনা জাতি। বাংলার হিন্দু-মুসলমান—বাঙালী। ভারতের অধিবাসী সমুদয় ভারতবাসী একই জাতি।

এক দেশের অধিবাসীদের এক-জাতীয়তার যে সত্যকে আমরা গায়ের জোরে অস্বীকার করিয়াছিলাম, প্রয়োজনের চাপে আজ আমাদিগকে তাহাই স্বীকার করিতে হইতেছে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এক শ্রেণীর লোক সাম্প্রদায়িক ভেদ-নীতিকে প্রশ্রয় দিয়াছে। তাহারা প্রচার করিয়াছে, হিন্দু মুসলমান দুই পৃথক জাতি, কেননা তাহারা দুই পৃথক ধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের মধ্যে মিলন হইতে পারে না, এক দেশে সম্প্রীতির সহিত পাশাপাশি বসবাস সম্ভব হইতে পারে না। কাজেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে (ভৌগোলিক সীমার ভিত্তিতে নয়) দেশ-বিভাগের প্রয়োজন। এই দুই-জাতি-তত্ত্বই আমাদের ভিতরে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি আনিয়াছে, আমাদের বহু শতাব্দীর সাম্প্রদায়িক মিলন ও ঐক্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

দেশবিভাগের পর আজ আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হইলেও উভয় সম্প্রদায়কে উভয় রাষ্ট্রেই থাকিতে হইবে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সৌহার্দ্দ্য বজায় রাখিতে না পারিলে তাহা সম্ভব হইবে না। তাই দল ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দেশের সকল নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিও আজ এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

বর্ত্তমানে যে সাম্প্রদায়িক মিলন ও ঐক্যের চেষ্টা করা হইতেছে, বিভিন্ন রুচি ও প্রয়োজনের অনুসারে তাহাকে যে নামেই অভিহিত করা হোক, আসলে ইহা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এক-জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমরা আসল জিনিষই চাই। আমরা চাই পরস্পর শান্তিতে বাস করিতে, তার জন্ম চাই সাম্প্রদায়িক মিলন ও ঐক্য। যে নামে যে পথ দিয়াই তাহা আসুক, আমরা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াই গ্রহণ করিব।

এ সম্বন্ধে আর কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মিলন আনিতে হইলে প্রথমেই তাহার উপযোগী পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। যে সকল নীতি, যে সকল মতবাদ আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ আনিয়াছে, মিলনের অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইবে। ইহা করিতে না পারিলে কেবল বক্তৃতা ও বিবৃতির দ্বারা কোন ফল হইবে না।

এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই যে, 'ডিভাইড এণ্ড রুল' অর্থাৎ বিভেদ এবং শাসন—এই নীতিই সাম্রাজ্যবাদকে টিকাইয়া রাখার প্রধান অপকৌশল। পরস্পরবিরোধী দল বা সম্প্রদায়গত স্বার্থের সৃষ্টি করিয়া, দেশের মধ্যে দুই বা ততোধিক দলে বিরোধ লাগাইয়া রাখাই ইহার উদ্দেশ্য। তাহা হইলে এক দল অন্য দলকে জব্দ করার জন্ম সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য লইতে বাধ্য হয় এবং তাহারাও এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ আয়ারল্যাণ্ডে আলষ্টার ও মিশরে সুদান-সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদী সমস্যার মূলে রহিয়াছে যাহা, ভারতের হিন্দু-মুসলমান দুই জাতিতত্ত্ব সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি।

ইংরেজরা যখন বুঝিল যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমান এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি বিরোধের সৃষ্টি করা না যায়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে এই দেশে টিকিয়া থাকা সম্ভব হইবে না, তখন বিভেদসৃষ্টির সুযোগেরও অভাব তাহাদের হইল না। অনেক দিন হইতেই শিক্ষিত ও অভিজাতশ্রেণীর এক দল মুসলমান সরকারী চাকুরী প্রভৃতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্ম কতকগুলি বিশেষ সুবিধার দাবী করিয়া আসিতেছিলেন। লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতের বড়লাট মুসলমান জমিদারদের পক্ষ হইতে তখন তাঁহার নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। তখন তাঁহারা এই সব দাবিই উত্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির উদ্গাতা, লর্ড কার্জ্জন পর্য্যন্ত তখন তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। ইঁহার দাবির উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—

"I say you put forward these requests. You are asking for preferential advantages, which are unreasonable and which no Government would dream of giving you.

"Again when you ask for a fixed proportion of appointment in the public service and promotion, regulated not by merit but by a fixed numerical standard, you must see that you are advancing an untenable claim.

"It is a cheering spectacle to see a community, once so great and prosperous and so richly endowed with stability of intellect and force of character, lifting itself again in the world by patient and conscientious endeavour. But the pleasure of the spectacle is diminished and the chances of success are reduced if those who are pluckily engaged in climbing the ladder, cry out for artificial ropes and pulleys to haul them up."

লর্ড কার্জ্জন যাহা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্ম, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই তাহার প্রবর্ত্তন করেন। ফলে মুসলমানসম্প্রদায়ের জন্ম সংখ্যানুপাতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক চাকুরী প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীর একদল মুসলমানের বিনা প্রতিযোগিতায় একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক চাকুরী প্রভৃতি নানা রকম সুবিধা-লাভের বিশেষ সুযোগ হইল। শিক্ষাদীক্ষায় অধিকতর উন্নত হিন্দুসম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া এই সুবিধা আদায় তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। এক-জাতীয়তাবাদের আদর্শ হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথক করিতে না পারিলে, পৃথক ভাবে সৃষ্ট এই বিশেষ সুবিধার অস্তিত্ব থাকে না। নিজের স্বার্থের জন্ম মুসলমান সম্প্রদায়ের এই বিশেষ সুবিধাভোগী দলই হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতিকে উস্কানি দিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই ক্রমে দুই জাতি-তত্ত্বের (Two-Nation theory) উদ্ভব হইল।

কংগ্রেসের ত্রুটীবিচ্যুতিও এর জন্ম কম দায়ী নহে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে বানচাল করার জন্ম কংগ্রেস যতটুকু শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, দেশের আভ্যন্তরিক সংগঠন-কার্য্যে সেই অনুপাতে মনোযোগ দেন নাই। ইহাই কংগ্রেসের মারাত্মক ভুল।

কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্ম যে ব্যাপক প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজন ছিল, কংগ্রেস আশানুরূপভাবে তাহা করেন নাই; মুসলীম লীগের সহিত আপোষ করিয়া, তোষণনীতির আশ্রয় লইলেন। তাহাদিগকে ন্যায্য প্রাপ্যের অনেক বেশী দিয়াও কংগ্রেস তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না, বরং ফল বিপরীত হইল। লীগের সহিত আপোষের জন্ম সীমাহীন উদারতা দেখানোর ফলে, কংগ্রেসের অতিরিক্ত গরজ ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল।

ওদিক কোনো কোনো মুসলমান নেতা মুসলমানসম্প্রদায়কে বুঝাইলেন যে, কংগ্রেস হিন্দু-প্রতিষ্ঠান। হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনই তাহার লক্ষ্য। কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতা আসিলে মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য কিছুই থাকিবে না।

ভারতবর্ষ হইতে ইসলাম ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। উপরন্তু লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষের আগ্রহকে, মুসলমান সমাজকে ধোঁকা দেওয়ার কূটনৈতিক চাল বলিয়াই বুঝানো হইল। একতরফা প্রচারের ফলে সরলবিশ্বাসী মুসলমান জনসাধারণ তাহাই বুঝিল।

১৯৩৫ সালের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তখন কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমান নির্যাতনের নানা মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হইল।

তার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল। মুসলমান-সমাজ কংগ্রেসের জুলুম-জবরদস্তি হইতে রেহাই পাইল বলিয়া, মুসলিম লীগ হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে একদিন মুক্তি-দিবস (Day of deliverance) পালনেরও নির্দেশ দেওয়া হইল।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি সর মরিস গায়ার বা অন্য যে-কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্বে একটা জুডিশিয়াল ট্রাইবিউন্যাল গঠন করিয়া ইহার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক। কিন্তু মিঃ জিন্নাই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। নিরপেক্ষ তদন্তের ফলাফল তাহার অনুকূল হওয়ার আশা থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই এরূপ করিতেন না।

মহাত্মা গান্ধী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিঃ জিন্নার মধ্যে এই সম্বন্ধে যে পত্র বিনিময় হয়, সেগুলি পড়িয়া দেখিলেই সমস্ত পরিষ্কার বুঝা যায়। এই সমস্ত পত্রাবলী এখানে উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ অহেতুক দীর্ঘ হইয়া পড়ে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার মৌলবী জামাল-উদ্দীন আহম্মদ প্রণীত "Recent speeches and writings of Mr. Jinnah" নামক বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

ঘটা করিয়া মুক্তিদিবস পালন ও একতরফা প্রচারের ফলে মুসলমান জনসাধারণ বুঝিল যে, কংগ্রেসের চেয়ে মুসলমান সমাজের বড় শত্রু আর নাই।

তার পর বলিতে হয় আসামের বহিরাগত-উচ্ছেদ প্রথার কথা। বাংলার যে সকল বহিরাগত আসাম গবর্ণমেণ্টের খাস জমি ও গোচরণ-ভূমি দখল করিয়াছিল, আসাম গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে উচ্ছেদ করেন। সাদুল্লা গবর্ণমেণ্ট (লীগদল) ইহাদিগকে এক বৎসরের মেয়াদে উচ্ছেদের নোটিশ দেন। তার পর বরদলৈ (কংগ্রেসদল) গবর্ণমেণ্টের আমলে সেই নোটিশের মেয়াদ পূর্ণ হয়। লীগ-গবর্ণমেণ্টের নোটিশের সর্তই কংগ্রেস-গবর্ণমেণ্ট কার্য্যকরী করেন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে (অবশ্য হিন্দুর সংখ্যা খুব কম) সকল বহিরাগতকেই এই সময় উচ্ছেদ করা হয়।

এই উচ্ছেদনীতি অসমীয়াদের বাঙালীবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নহে। অসমীয়া মুসলমানদেরও ইহাতে সমর্থন ছিল। কাজেই ইহাকে কংগ্রেসের মুসলমান বিদ্বেষের পরিবর্তে, অসমীয়াদের বাঙালীবিদ্বেষ আখ্যা দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু এই সকল ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া কংগ্রেসের মুসলমানবিদ্বেষ বলিয়াই প্রচার করা হইয়াছে। কংগ্রেসের তরফ হইতে প্রতিবাদের একটা ক্ষীণকণ্ঠ পর্য্যন্ত জনসাধারণের কাছে পৌঁছে নাই।

কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যের ত্রুটির জন্যই মুসলমান জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভুল বুঝিয়াছে। ধীরে ধীরে কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

আগে যে দুই জাতি-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহার অস্তিত্ব রাখিয়া সাম্প্রদায়িক মিলন সম্ভব হইবে না। কারণ ইহার মধ্যে মিলনের কোন নীতি নাই। পরস্পরকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই ইহার আদর্শ। দুই জাতিতত্ত্বের সমর্থকগণ আজও তাঁহাদের পুরাতন নীতিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। জাতিতত্ত্ব লইয়া উদ্দেশ্যমূলক গবেষণা চালাইলে, দুই জাতিকে আরও বহু জাতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। হিন্দুদের ভিতরেও আরও একটা উপ দুই-জাতির (বর্ণহিন্দু ও হরিজন) সৃষ্টি ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছেন, কায়স্থ আছেন, হরিজনদের ভিতরেও নানা সম্প্রদায় আছে। ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে আরও কয়েকটা জাতিতে বিভক্ত করা যায়।

মুসলমানসম্প্রদায়ও বাদ যান না। তাঁহাদের সমাজেও সিয়া আছেন, সুন্নি আছেন, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, জোলা-সম্প্রদায়—অনেক কিছুই আছে। মুসলমান মৎস্যজীবীদের মধ্যে পৃথক সুবিধার দাবি করিবার প্রয়াস ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রভাবও সাম্প্রদায়িক মিলনের পথে কম অন্তরায় নয়।

পাকিস্থানের মুসলমানগণ মনে করিতেছেন, পাকিস্থান তাঁহাদের নিজস্ব হোমল্যাণ্ড বা বাসভূমি—হিন্দুরা এখানে 'পরবাসী' অবস্থায়ই আছে। হিন্দুরাও মনে করিতেছেন, পাকিস্থানে তাঁহাদের কোন অধিকারই নাই। মেজরিটির দয়া করিয়া দেওয়া, কেবলমাত্র প্রাণে বাঁচিয়া থাকার অধিকারটুকু লইয়াই তাহাদিগকে থাকিতে হইবে। এই সব কারণে জনসাধারণের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ দেখা দিয়াছে, তাহারা দলে দলে দেশত্যাগ করিতেছে।

এই অবস্থা দূর করিতে না পারিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্ভব হইবে না। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝাইতে

হইবে যে, কোন দেশেই সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া অধিকার নাই। উভয় দেশে উভয় সম্প্রদায়েরই সমান অধিকার বিদ্যমান। তাহা হইলে আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া দল, সম্প্রদায় ও ধর্ম্মনিরপেক্ষ সকলের মিলিত সেই এক-জাতীয়তাবাদের আদর্শেই আসিতে হয়।

হিন্দুসম্প্রদায় চিরদিনই মিলনের প্রত্যাশী, মিলনের অর্ঘ্য লইয়া তাহারা চিরদিনই প্রস্তুত হইয়া আছে। হিন্দুর স্বার্থপরতায়, হিন্দুর অদূরদর্শিতায় সাম্প্রদায়িক মিলন ব্যর্থ হইয়াছে, হিন্দুর উপর কাহারও এই দোষারোপ করিবার সঙ্গত হেতু নাই। কংগ্রেসের আহ্বানে হিন্দুসমাজ চিরদিনই সাড়া দিয়াছে,। কংগ্রেসের আন্দোলনে মহাজনী আইন পাস হইল। ইহাতে শতকরা প্রায় একশত হিন্দু মহাজনেরই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া মুসলমান খাতকদেরই উপকার করা হইল। হিন্দুরা ইহার প্রতিবাদ করে নাই। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বৃহত্তর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিই তাহাদিগকে তাহা করিতে দেয় নাই।

সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিন্দুর চেষ্টা ও অর্থেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু দাতাগণ ইচ্ছা করিলে এই সব দান কেবল নিজ সম্প্রদায়ের উপকারের জন্যই করিতে পারিতেন। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্যই তাঁহারা ইহা করেন নাই।

সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় আজ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে, অন্য প্রদেশের অযোগ্য মুসলমান ছাত্ররা তাহাতে প্রবেশাধিকার পাইতেছে, কিন্তু সিন্ধুপ্রদেশের যোগ্যতর হিন্দু ছাত্রদের জন্য উহার দ্বার রুদ্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া কি রকম টানাহ্যাঁচড়া চলিয়াছিল, তাহা কাহারও অজানা নাই।

দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকাংশই মুসলমান। তাহাদের দাবি ও অধিকার লইয়া কংগ্রেসই চিরকাল আন্দোলন করিয়াছে, আজও করিতেছে। মুসলীম লীগ কোনদিনই তাহাদের জন্য দরদ দেখায় নাই, বরং কংগ্রেসের আন্দোলনে চিরদিন বাধাই দিয়াছে। ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে কংগ্রেস যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার লবঙ্গ বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, হিন্দুব্যবসায়ীরা তাহাতে যোগ দেন, কিন্তু মুসলমান ব্যবসায়ীরা সহযোগিতা করেন নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার মুসলমান অধিবাসীদের জন্য পাকিস্থানের দরদের পরিচয় আজও পাওয়া যায় নাই।

হিন্দু নিজের সংস্কৃতি অন্যের উপর চাপাইয়া দিতে চাহে না। কিন্তু অন্যের সংস্কৃতি তাহার ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হোক, ইহাও তাহারা মানিয়া লইতে পারে না। ইস্‌লামের সত্য ও আদর্শকে তাহারা শ্রদ্ধা দেখাইতে প্রস্তুত এবং বহুক্ষেত্রে তাহা দেখাইয়াছেও, কিন্তু ইস্‌লামের সত্য ও আদর্শ নহে, কেবল এইজন্যই অন্য যে-কোন ধর্ম্মের সত্য ও আদর্শকে ঘৃণা করিতে হইবে, ইহাও তাহারা সমর্থন করিতে পারে না।

সাম্প্রদায়িক মিলন ও সম্প্রীতির জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন তাহা করিতে হিন্দু-সম্প্রদায় কোন দিনই পশ্চাৎপদ ছিল না, আজও নহে।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া বলিতে চাই, আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের উপরই আজ অধিকতর দায়িত্ব পড়িয়াছে। তাহাদিগকেই আজ অধিকতর উদারতা দেখাইয়া মিলনের জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে—অবশ্য, ইহার অর্থ এই নহে যে, মুসলমানসম্প্রদায়কে নিজেদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহার অর্থ, নিজের যথাযোগ্য দাবি ও অধিকারের ন্যায় অপরের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, তাহা মানিয়া লওয়া। মুসলমানসম্প্রদায়কে, শাসকসম্প্রদায়ের পর্য্যায়ে উন্নীত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া দেশের সকল দল ও সম্প্রদায়ের সহিত সমান অধিকার লইয়া মিলিয়া-মিশিয়া থাকার গণতান্ত্রিক নীতিই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহা করিতে না পারিলে সাম্প্রদায়িক মিলনের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

ইহা করিতে হইলে সকল রকম বিশেষ সাম্প্রদায়িক সুবিধার অস্তিত্ব লোপ করিতে হইবে। তাহা হইলে দুই-জাতিতত্ত্বের আর কোন প্রয়োজনই থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিভাগের সমস্ত যুক্তিও বানচাল হইয়া যায়।

দেশ-বিভাগের পক্ষে যে সকল যুক্তি ছিল, তাহার অসারতা ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। পুনরুক্তি হইলেও কথাটা এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।—হিন্দু-মুসলমান দুই পৃথক জাতি, ইহাদের মিলন হইতে পারে না, এক দেশে পাশাপাশি বাস করা সম্ভব হইতে পারে না—কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক হোম ল্যাণ্ডের প্রয়োজন—পাকিস্থানের নির্দ্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা না দিলেও লীগ নেতৃবৃন্দ এই সব কথা চিরদিনই খোলাখুলি ভাবে প্রচার করিয়াছেন এবং দেশবিভাগের পক্ষে ইহাই ছিল আসল যুক্তি। এই সকল যুক্তি দেখাইয়া যাহারা দেশবিভাগ করিয়াছেন, দেশবিভাগের পর তাহারাই আজ স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মিলন হইতে পারে এবং উভয় সম্প্রদায়ই উভয় ডোমিনিয়নে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারিবে।

বিভক্ত ভারতের উভয় ডোমিনিয়নে, উভয় সম্প্রদায়ই যদি মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে অবিভক্ত ভারতেও তাহারা এইভাবেই মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিত—একথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কাজেই দেশ-বিভাগের সকল যুক্তি ও উদ্দেশ্য আজ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

যাহাই হোক, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা লইয়া পৃথক পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের জন্য বিভক্ত অঞ্চল গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা করার অধিকারও হয়তো তাহাদের আছে। হিন্দুদের ইহাতে আপত্তি করার কোন কারণ নাই।

কিন্তু পাকিস্থানে হিন্দুসম্প্রদায়কে কতটুকু অধিকার দেওয়া হইবে এই সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

কথা উঠিয়াছে পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র শরিয়তের বিধান অনুযায়ী রচিত হইবে। ইহা যদি ইসলামিক রাষ্ট্র হয়, এবং মেজরিটির কৃপালব্ধ শুধু কায়ক্লেশে প্রাণধারণের অধিকার লইয়া সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া মাইনরিটির আর কোন গত্যন্তর না থাকে, তাহা হইলে এই সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। আর ইহা যদি সত্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়, তাহা হইলে ইহার গঠনতন্ত্রে যাহাতে গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলি অনুসৃত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

রাষ্ট্রের আচরণ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমান ও পক্ষপাতবর্জ্জিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের অধীন প্রত্যেক নাগরিকই নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতার অনুপাতে আত্ম-বিকাশের ও সব রকম সুখ-সুবিধা ভোগ করার স্বাধীন ও অবাধ অধিকার পাইবে। জাতি ধর্ম্ম বা বর্ণের জন্য রাষ্ট্র কাহারও প্রতি কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না। ইহাই গণতান্ত্রিক নীতি।

এক সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য অন্য সম্প্রদায়ের বিশেষ অসুবিধা ঘটাইবার নীতি, এক সম্প্রদায়কে অগ্রগামী করার উদ্দেশ্যে অন্য সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক অগ্রগতির পথে আইন-কানুন ও বাধানিষেধের কৃত্রিম গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া তোলার নীতি—এই সকল নীতিকে গণতান্ত্রিক নীতি বলা চলে না।

মুসলমান-সম্প্রদায় ধর্ম্মে মুসলমান, কেবল এইজন্যই যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক শতকরা সত্তরটি সরকারী চাকুরী, কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতি তাহাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। যোগ্যতা, না থাকিলেও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বৃত্তি পাইবে। হিন্দুরা হিন্দু, কেবল এইজন্যই, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের যোগ্যতা তাহাদের প্রতিভা উপেক্ষিত হইবে, আত্ম-বিকাশের সব রকম সুযোগ-সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে, এই রকম একদেশদর্শী ও পক্ষপাতমূলক আচরণ পৃথিবীর কোন সভ্য দেশই সমর্থন করিতে পারে না। এই সুয়োরাণী দুয়োরাণী নীতিকে গণতন্ত্র বলা চলে না। ইহাকে ধর্ম্মীয় ফ্যাসিজম্ আখ্যা দিলেই ঠিক হয়।

যোগ্যতাকেই চাকুরী প্রভৃতির মাপকাঠি করা উচিত। ইহা হইতেই জনসাধারণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব আসে, জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা করে। তাহা ছাড়া এই নীতি অনুসৃত হইলে রাষ্ট্র ও দেশের যোগ্যতম ব্যক্তিদের প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতা কাজে লাগাইবার সুযোগ হওয়ায় জনসাধারণ উপকৃত হইতে পারে। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই এই নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। পাকিস্থানকে যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করিতে হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের এই মৌলিক নীতিগুলিও তাহার মানিয়া লওয়া উচিত।

এখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভারত এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত নিপীড়িত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক। সে চিরদিনই তাহাদের দাবি ও অধিকার লইয়া দৃঢ়তার সহিত আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানও তাহার এই দায়িত্বের গুরুত্ব আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমদর্শিতা ও উদারতাই প্রদর্শন করিয়াছে। সেখানে মাইনরিটি ও মেজরিটিতে কোন তফাৎ নাই। মাইনরিটিকে সেখানে মেজরিটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয় নাই, পর করিয়া দূরে রাখা হয় নাই। তাহাদিগকে সুখ-সুবিধা ভোগ ও আত্মবিকাশের সুবিধা সংখ্যানুপাতের নিক্তি দিয়া ওজন করিয়াও দেওয়া হয় নাই। সামর্থ্য ও যোগ্যতার অনুপাতে সেখানে সকল নাগরিকের অধিকারই সমান—মুক্ত, উদার, সব রকম বাধানিষেধ ও পক্ষপাত বর্জ্জিত।

কংগ্রেস দেশ-বিভাগ মানিয়া লইয়াছে। আমাদের মতে ইহা কংগ্রেসের ভুল নহে—এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভুল বুঝিয়া বিরূপ হইয়া উঠিতেছে, তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেস এই সম্বন্ধে কোন প্রতিকারই করিতেছেন না—ইহা বাস্তবিকই কংগ্রেসের ভুল। তাহা ছাড়া স্বাধীনতার পর কংগ্রেস জাতিকে কোন সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন নাই। উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন জাতি মাঝপথে দিশাহারা হইয়াছে। আর প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি এই সুযোগে তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে।

দিশাহারা ও বিচ্ছিন্ন জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই রাষ্ট্রনায়কদের আজ প্রধান কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে সময়োপযোগী মত ও পথের সন্ধান দিতে হইবে। এইজন্য দেশের আভ্যন্তরিক প্রচার ও গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনই বেশী। জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে—দেশবিভাগ স্বীকার করিয়া কংগ্রেস ভুল করে নাই। বরং বিচার করিলে মনে হয়, কংগ্রেসের জয়ই সূচনা করিতেছে।

দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য কংগ্রেস লীগকে যে চড়া মূল্য দিতে রাজী হইয়াছিল, ইহা দ্বারা দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখিতে পারিলেও, আভ্যন্তরিক জটিলতা দূর হইত না। পরস্পর রেষারেষি পরস্পরকে বাধা

দেওয়ার ও নাজেহাল করার মনোবৃত্তি, দেশের আভ্যন্তরিক সমস্যাকে আরও জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তুলিত। কংগ্রেস-লীগের অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের অল্পদিনের কার্য্যকালে আমরা এই সম্বন্ধে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি।

তাহা ছাড়া অখণ্ড ভারতে প্রত্যেক প্রদেশই প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিত। প্রদেশের আভ্যন্তরিক কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের থাকিত না। কারণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা কেবল দেশরক্ষা, যানবাহন, ডাক, বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকিত। ইহার ফলে, দেশের যতটুকু অংশ লইয়া এখন পাকিস্থান হইয়াছে, তার চেয়ে অনেক বিস্তৃত অংশে—(সমস্ত পঞ্জাব ও বাংলা) পাকিস্থান না হওয়া সত্ত্বেও, পাকিস্থানী নীতি কায়েম হইত। পাকিস্থান স্বীকার করিয়া কংগ্রেস এই সব জটিলতা হইতে রেহাই পাইয়াছেন। প্রাকৃতিক সম্পদহীন একটা ঘাটতি এলাকা পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে। বিরাট জনবল ও প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ যে বিস্তৃত এলাকা কংগ্রেসের হাতে আসিয়াছে, তাহা যথাযথ কাজে লাগাইতে পারিলে অচিরেই ভারত পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

কংগ্রেসের এই দেশবিভাগ মানিয়া লওয়ার ফলে পাকিস্থানের হিন্দুদের উপর অবিচার করা হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় পাকিস্থানের হিন্দুরাও ইহাতে মত দিয়াছিল। জাতির বৃহত্তর মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই তাহারা স্বেচ্ছায় এই দুরবস্থা বরণ করিয়া লইয়াছে। পাকিস্থানে যদি তাহাদের বসবাস অসম্ভব হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় পাইবে ইহাই তাহারা আশা করে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—হিন্দুরাষ্ট্র, এইজন্যই হিন্দুগণ এখানে আশ্রয় পাইবে—এই ধারণা হইতেই তাহারা ইহা দাবি করে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। নিপীড়িত মানবতার প্রতি যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ—ভারতকে, ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান, দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় (অধিকাংশই মুসলমান) এবং পৃথিবীর অন্যান্য নিপীড়িত মানবজাতির স্বার্থের জন্য আন্দোলন করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, সেই নীতিবোধই তাহাকে পাকিস্থানের হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতি, হিন্দু হিসাবে নয়, একদল নিপীড়িত মানব হিসাবে—সহানুভূতি-সম্পন্ন করিয়া তুলিবে। পাকিস্থান যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয় এবং জাতিধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকল অধিবাসীর সমান নাগরিক অধিকার সেখানে থাকে তবে ইহার কোন প্রয়োজন হইবে না।

পাকিস্থানের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য ভারতের হিন্দুদের যে যথেষ্ট দরদ ও সহানুভূতি আছে একথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। কাজেই তাহারা নিজেদের রাষ্ট্রকে যদি শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে তাহারা আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থানের হিন্দুদেরও স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। পাকিস্থানের হিন্দুরাও তাহাই চায়।

ভারতের মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে পাকিস্থানের হিন্দুদের কোন লাভ হইবে না, বরং ইহা তাহাদের নিজেদেরও সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। দেশের ভিতরে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা জীয়াইয়া রাখিলে তাহারা নিজেদের গবর্ণমেণ্টকেই বিব্রত করিয়া তুলিবে। গঠনমূলক বা প্রগতিমূলক কোন কাজেই সরকার হাত দিতে পারিবেন না। ইহাতে তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং শত্রুদেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

তা ছাড়া একের অপরাধের জন্য অন্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ নীতির দিক দিয়াও গর্হিত এবং সমস্ত মুসলমানই মুসলমান সম্প্রদায়ের অপকর্ম্মের জন্য দায়ী নহেন। মৌলানা মাদানী ও মৌলানা আজাদের মত নেতা মুসলমান-সমাজ হইতেই আসিয়াছেন। পৃথিবীর যে-কোন দেশ ও জাতি ইঁহাদের নেতৃত্ব লাভে গৌরব-বোধ করিতে পারে।

ইংরেজ বলিয়াছিল, তাহারা চলিয়া গেলে ভারতে হানাহানি সুরু হইবে, গৃহযুদ্ধে ভারত ছারখার হইয়া যাইবে। তাহাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী আংশিকভাবে সফল হইয়াছে। ইহাতে স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের উপর কলঙ্ককালিমা লিপ্ত হইয়াছে। যে-কোন মূল্যে, যে-কোন উপায়ে ভারতকে এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে হইবে। "পাকিস্থানে যাহা ঘটিয়াছিল ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে"—সভ্য জগৎ এই ধরণের কৈফিয়ত শুনিতে রাজী হইবে না।

যে ন্যায় ও সত্যকে সঙ্গী করিয়া আমরা দুর্গম পথে যাত্রা সুরু করিয়াছিলাম, বহু অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাহা আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমরা আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছি। তীরের কাছে আসিয়া আমরা আজ হাল ছাড়িয়া দিতে পারি না। আমাদিগকে ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে। এই দুঃখ-দুর্য্যোগ ও অশান্তির ভিতর দিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ চিরদিনের জন্য অক্ষয় হইয়া রহিবে যে, সত্য কখনো ব্যর্থ হইতে পারে না।

এই সঙ্গে পাকিস্থানের হিন্দুসম্প্রদায়কে এ কথাটাই বলিতে চাই যে, দেশত্যাগে বাধ্য করা না হইলে তাহাদের দেশত্যাগ করা উচিত হইবে না। পাকিস্থান যদি হিন্দু-মুসলমানের দেশ হয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়, তাহা হইলে আমাদের অধিকার কেহই ক্ষুন্ন করিতে পারিবে না। আর আমাদিগকে যদি জানাইয়া দেওয়া হয় যে, ইহা মুসলমানের দেশ—দয়া করিয়া যতটুকু অধিকার দেওয়া হইবে, তাহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা প্রতিকার অসম্ভব

হইলে প্রতিবাদ না করিয়া ভারতে চলিয়া আসিব। ভারত যদি আমাদিগকে আশ্রয় না দেয় আমরা পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির কাছে মানবতার আবেদন জানাইব, সকলের সাহায্য ভিক্ষা করিব। সমস্ত সভ্যজগৎ তখন আমাদের কথা শুনিবে। কিন্তু বিনা কারণে আমরা যদি দেশত্যাগ করি, দুয়ারে দুয়ারে আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরি, আমাদের অদৃষ্টে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই জুটিবে না।

ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ যে অহেতুক চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, স্থানে স্থানে কলকারখানার শ্রমিকদলের ধর্ম্মঘটের ফলে দেশের উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে, রাষ্ট্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, এসকল জাতির উন্নতির সূচনা করিতেছে না। ছাত্রদের ও যুবকদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার নামই ব্যক্তি-স্বাধীনতা নহে। শ্রমিকদের তরফ হইতেও অভিযোগের অনেক কিছুই আছে। বিক্ষোভপ্রদর্শন এবং ধর্ম্মঘট করার অধিকারও তাহাদের আছে একথাও স্বীকার করি, কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বুঝা উচিত যে, মাত্র সেদিন আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি; সমস্ত সমস্যা দূর করিয়া, সরকার এরই মধ্যে দেশকে একেবারে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবেন—আমরা এখনই এতটা আশা করিতে পারি না। এই সকল অভাব-অসুবিধা আমরা যখন এত দিনই সহ্য করিয়াছি, তখন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের উচিত—অন্ততঃ কিছুকাল ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ দেওয়া। তারপর যদি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এই দিকে মনোযোগী না হন তাহা হইলে আমরা আমাদের খুশীমত ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারিব। কিন্তু এখন দেশের ভিতর এই রকম হট্টগোল বাঁধাইয়া তুলিলে আমরা আমাদের নবজাত স্বাধীনতাকে সূতিকাগারেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিব।

ভারতের সমস্যা বহুবিধ। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে অনেক অভিনব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাহার কোনটার চেয়ে কোনটাই ছোট নয়। তবু আত্মরক্ষাব্যবস্থাকে সকলের উপরে স্থান দিতে হইবে। কারণ স্বাধীনতা বজায় থাকিলে আজ হোক, আর দুই দিন পরেই হোক আমরা আমাদের অন্যান্য সমস্যারও সমাধান করিতে পারিব। কিন্তু আবার যদি স্বাধীনতা হারাইতে হয়, তাহা হইলে কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। আমরা আবার যে তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবিয়া যাইব। কাজেই আমাদের দেশরক্ষাব্যবস্থাকে প্রথমেই দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়া তোলা প্রয়োজন।

ইংরেজ সৈন্য আমাদের দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে। দেশীয় সৈন্যও দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে আমাদের সামরিক শক্তি স্বভাবতই দুর্ব্বল হইয়াছে। এই সব কারণে আমাদের সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনে বিশেষ ধৈর্য্য, বিচক্ষণতা ও সাবধানতার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কামান-গর্জ্জন থামিতে না থামিতে তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণ-দামামা বাজিয়া উঠিতেছে। আজ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া ভারতকেও চলিতে হইবে। তাহা ছাড়া, ভারতের আভ্যন্তরিক জটিলতা, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থান এই প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি করিয়াছে।

শান্তিই আমাদের কাম্য, কিন্তু দুর্ব্বল ও কাপুরুষের শান্তি নহে। আধুনিক জগতে শান্তির ব্যাখ্যা অন্যরূপ। Perpetual Preparedness for war is peace—যুদ্ধের জন্য সব সময় প্রস্তুতির নামই শান্তি। আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত এমনই একটি বিরাট শক্তিশালী সৈন্যদল আমাদিগকে গঠন করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইবে তাহারই প্রতিকার আমরা করিতে পারিব। শক্তির প্রাচুর্য্যের মধ্যে সংযমের বিকাশ হইতে যে শান্তি আসিবে সেই শান্তিই আমরা চাই। কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত শত্রুতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যুদ্ধকে আমরা অকারণে নিজের দেশে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে চাই না। কিন্তু বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ যদি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, ন্যায় এবং সত্য যদি তাহাই চায় তবে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখার পক্ষে যুক্তি নাই।

আমরা চাই, সব রকম অত্যাচার-অবিচার, উৎপীড়ন ও শোষণ, মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব পৃথিবী হইতে বিদূরিত হোক। পৃথিবীর প্রত্যেকটি নরনারী মানুষের মত বাঁচিয়া থাকার অধিকার লাভ করুক। শান্তির কুসুমাস্তীর্ণ পথে তাহা যদি নাই আসে তবে তার জন্য আমরা বসিয়া থাকিব না। দুর্যোগের কণ্টকাকীর্ণ পথেই আমরা তাহার সন্ধানে বাহির হইব। ভারতকে যদি কোনদিন অস্ত্র ধরিতে হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বমানবের কল্যাণের মহান উদ্দেশ্য লইয়াই সে তাহা করিবে।

খাদ্য-সমস্যা আজিকার পৃথিবীর একটি প্রধান সমস্যা। ভারত-সরকারকে প্রত্যেক বৎসরই অত্যন্ত চড়া দামে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হয়। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সাড়ে তিন বৎসরে মাত্র ৫৫ লক্ষ টন খাদ্য-শস্যের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ১৬৯ কোটি টাকা বিদেশে পাঠাইতে হইয়াছে। দেশের ভিতর ইহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার ফলে, প্রত্যেক বৎসরই গবর্ণমেণ্টকে অনেক টাকা ঘাটতি দিতে হয়। এইজন্য আগামী সাড়ে সাত মাসেই মোট ২২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই এই খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন। কলিকাতার মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি শ্রীযুক্ত বি. এন. জালান দেশের খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি

দেখাইয়াছেন যে, ভারতে মোট ৯ কোটি ৪০ লক্ষ একর আবাদযোগ্য অনাবাদী জমি আছে। এই সব জমি যদি বন্দোবস্ত দিয়া ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে কৃষিকার্য্যের প্রজাগণ নিজেরাই এই সব পতিত জমি আবাদ করিয়া ফসল উৎপন্ন করিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্টকে এর বেশী কোন দায়িত্বই লইতে হইবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানীতে ব্যাপক খাদ্য-সঙ্কট দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয়ের ইহাই প্রধান কারণ। তারপর তাহারা দেশের খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মন দেয়। এই প্রচেষ্টাকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা দেশের এক ইঞ্চি জমিও পতিত ফেলিয়া রাখে নাই। ধনিগণ তাহাদের সখের বাগান পর্য্যন্ত এইজন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অবস্থায় সরকারের অবিলম্বে এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। ইহা দ্বারা এক দিকে যেমন সরকারকে প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ আর বিদেশে পাঠাইতে হইবে না, অন্যদিকে তেমনি খাদ্য-শস্য চড়া মূল্যে ক্রয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার ঘাটতি হইতেও সরকার রেহাই পাইবেন। অপর দিকে রাজস্বও বৃদ্ধি পাইবে।

এই কাজে লোকেরও অভাব হইবে না। পশ্চিম-পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ হইতে যে-সব আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে, তাহাদিগকে এই সব জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই রকম জমি বন্দোবস্ত পাইলে পূর্ব্ববঙ্গ ও পাকিস্থানের অন্যান্য স্থান হইতেও কৃষক সম্প্রদায় উৎসাহ সহকারে ছুটিয়া আসবে।

আমাদের দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী করিয়া তোলার জন্য দেশের লোকবল ও সম্পদকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগাইতে হইবে। কোথায় কোন্ শিল্প, কি ভাবে গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা আছে, কোথায় কোন সম্পদ নিহিত, তাহা কি ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে—এই সম্বন্ধে ব্যাপক তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন কমিটি গঠন ও জনসাধারণের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে পরিকল্পনা রচনার সাহায্য গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হোক। এইসব পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া, কমিটিসমূহ নিজ নিজ মত গঠন করিবেন। ইহাই হইবে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায়। ইহা দ্বারা সরকার দেশের প্রত্যেকটি প্রতিভার উদ্ভাবনী-শক্তি কাজে লাগাইবার সুযোগ পাইবেন।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কি হওয়া উচিত, এখন এই সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। পৃথিবীর যাবতীয় দেশ বিশেষ ভাবে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত ভারতের বন্ধু-ভাবাপন্ন হওয়াই সঙ্গত।

সত্যই যদি পৃথিবীতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ভারতের উচিত হইবে—নিরপেক্ষ থাকিয়া নিজের শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তোলা। প্রথম মহাযুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রসমূহ যখন যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে, জাপান তখন নিরপেক্ষ থাকিয়া এই সুযোগে তাহার শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতকেও এই সুযোগে নিজের শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপসংহারে এই কথাই বলিতে চাই—আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু অত্যন্ত জটিল অবস্থার ভিতর দিয়াই তাহা পাইয়াছি। এইজন্য আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। জাতির জীবনে দুঃখ আসে, দুর্য্যোগ আসে, সমস্যা আসে। জয় পরাজয় ও উত্থান-পতনের কাহিনী প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই আছে। নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে সকলেই তাহা অতিক্রম করিতে পারে। আমরা দুর্ব্বল নহি, অক্ষম নহি, ব্রিটিশ শাসকদের আমরাই ভারত ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছি। আমাদের শিক্ষা, আমাদের প্রতিভা, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ পালন করিতে পারি তাহা হইলে কোন প্রতিকূল শক্তিই আমাদের অগ্রগতি রোধ করিতে পারিবে না।

সমস্ত হিংসা-দ্বেষ ও দলাদলি ভুলিয়া আমাদিগকে আজ এক হইতে হইবে। "জীবন ধূলিমুষ্টির চেয়েও তুচ্ছ, কর্ত্তব্য পর্ব্বতের চেয়েও কঠোর"—এই মহামন্ত্রেই আমাদিগকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের জন্য, জাতির জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য, পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলের জন্য মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আমরা সহজ ও শান্ত ভাবে বরণ করার শিক্ষা গ্রহণ করিব। সমস্ত পৃথিবীকে আমরা নূতন সত্য ও আলোকের সন্ধান দিব।

ধাতুর বিনতি

শ্রীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঠিন্য ধাতুর সাধারণ ধর্ম্ম হলেও তার বিনতি (প্লাস্টিসিটি) আছে। এই বিনতির সুযোগ নিয়ে কামার গড়ে কৃষাণের কাস্তে লাঙল, দিন-মজুরের কোদাল কড়ুল, সেকরার কাঁসারির হাতুড়ি; সেকরা সোনা রূপা গড়ে পিটে তৈরী করে কৃষাণ বৌয়ের, কামার বৌয়ের, মজুর বৌয়ের হাতের কাঁকন, পায়ের মল; কাঁসারি কাঁসা পিটে তৈরী করে তাদের ঘটি বাটি, থালা কলসী। কৃষাণ ফসল ফলায়, দিন-মজুর রাস্তা ঘাট তৈরী করে, সেই ফসলকে পৌঁছে দেয় হাটে বাজারে।

ধাতুর দুটি প্রধান ধর্ম্ম হ'ল ঘাত-কাঠিন্য (work hardening) ও ক্ষর-লেখ দ্রাবকের (etching agent) প্রভাবে বহু বিচিত্র নক্সা ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা। এ দুটি ধর্ম্মের মূলেও রয়েছে তার বিনতি। প্রথম ধর্ম্মটি অর্থাৎ ঘাত-কাঠিন্যের সঙ্গে কামার, সেকরা ও কাঁসারির বিশেষ পরিচয় আর দ্বিতীয়টিকে চেনেন গোয়েন্দা পুলিশের অপরাধ-তত্ত্ব বিভাগের ধাতুবিদ্।

পিটলে ধাতু নমনীয় হয়। কিন্তু ক্রমাগত পিটতে থাকলে এমন একটা অবস্থা আসে যখন ধাতু আর নরম না হয়ে কঠিন হতে সুরু করে, তার ভঙ্গপ্রবণতা বেড়ে যায়। এই অবস্থায় তাকে তাতিয়ে না নিয়ে যদি কেবলই পেটা হয় তা হলে সে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু তাতিয়ে নিলে তার নমনীয়তা আবার ফিরে আসে, তাকে প্রসারিত করা যায়। তাপের মাত্রাটা এ ক্ষেত্রে ধাতুর গলনাঙ্কে (মেল্টিং পয়েন্ট) পৌঁছবার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই কোনও কিছু পেটাই করে গড়তে হলে ধাতুকারকে জিনিষটিকে একবার গরম করতে ও একবার হাতুড়ির ঘা মারতে হয়। অবিচ্ছিন্ন আঘাতে কঠিন হয়ে যাওয়া ধর্ম্মকে বলা হয় ঘাত-কাঠিন্য (ওয়ার্ক হারডেনিঙ্)।

খুনের তদন্ত করতে গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ অনেক সময় দেখে যে খুনী পলাতক, ঘটনাস্থলে খুন-করা বন্দুকটা ফেলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও চিহ্ন রেখে যায় নি। ধরা পড়বার ভয়ে গোয়েন্দা পুলিশের পাকা খাতায় টোকা, বন্দুকের গায়ে খোদাই করা রেজিষ্টার্ড নম্বরটা উকো দিয়ে একেবারে ঘসে তুলে ফেলেছে। খুনীর চালাকি কিন্তু খাটে না। গোয়েন্দা পুলিশের ধাতুবিদ বন্দুকটার ঘসা জায়গায় ক্ষর-লেখ দ্রাবক লাগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রজালের মত নম্বরটি পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তোলেন, ধরে ফেলেন খুনীর কেরামতি।

ধাতুর ঘাত-কাঠিন্য বা সংখ্যার নক্সা ফোটান ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানীরা কি বলেন তার সংবাদ নেওয়া যাক্। বিজ্ঞানীরা বলেন ধাতু তৈরী হয় বহু ছোট ছোট কেলাস অর্থাৎ ক্রিষ্টাল দিয়ে এবং কেলাস সজ্জার বৈচিত্র্যের ফলেই জন্ম নেয় ধাতব-বিনতি, ঘাত-কাঠিন্য ও নক্সা-ফোটন ধর্ম্ম। ঠিকমত তৈরী করতে পারলে যে কোন ধাতুখণ্ডে এই ছোট ছোট কেলাসগুলিকে অনুবীনের (মাইক্রসস্কোপ) সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়। অনুবীনের নাগালের বাইরে আছে কেলাসের অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র কোঠাদল (ক্রিষ্টাল ব্লকস্) আর বহু কোঠাদলের সমাবেশে গড়ে ওঠে এক-একটি অনুবীক্ষণিক কেলাস (ক্রিষ্টাল)। কেলাসের বহু অনু-কোঠা (ইউনিট সেল) এক সঙ্গে মিলে তৈরী করে এক একটি কোঠাদল। কেলাসে কোঠাদল বা অনুকোঠার সমাবেশ-বৈচিত্র্য তাদের এক্স-রশ্মির (X-rays) আলোক-চিত্রের পাঠোদ্ধার করে বুঝতে পারা যায়। কেলাসে কোঠাদল অনুকোঠার সমাবেশের তারতম্য অনুযায়ী তাদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে-আসা রঞ্জন রশ্মির (X-rays) তীব্রতা কমে বাড়ে। অঙ্কের সাহায্যে এই কমা-বাড়ার হিসাব করা যায় এবং তার থেকে ধরা পড়ে কেলাসে কোঠা-দল ও অনুকোঠাদের সমাবেশ-বৈচিত্র্য।

ধাতুর কেলাসে অনুকোঠাই আদি নয় কারণ অনুকোঠার আদিতে রয়েছে ধাতুর পরমাণু কণারা। অনুবীক্ষণিক কেলাসের দেশে একটি কেলাস যেন আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদ, এক একটি কোঠাদল যেন তার এক একটি তলা আর এক একটি অনুকোঠা যেন তার এক একটি ঘর। এক একটি অনুকোঠার ঘর আবার তৈরী ধাতুর একাধিক পরমাণু কণা দিয়ে—প্রত্যেকটিই নক্সা অনুযায়ী তলায় তলায়, ধাপে ধাপে, সারিতে সারিতে সমস্ত কেলাসটিতে সুন্দর ভাবে মেপে-জুপে সাজান। একটি কোঠাদল আর একটি কোঠাদলের, একটি অনুকোঠা আর একটি অনুকোঠার, একটি পরমাণু আর একটি পরমাণুর আকর্ষণে বাঁধা। স্বাভাবিক অবস্থায় আকর্ষণের টান এড়িয়ে তাদের অবস্থান সমাবেশ বদলাতে পারে না—টানের বাঁধনেই সমস্ত কেলাস প্রাসাদটা টিকে থাকে, তাসের ঘরের মত সহজে ধ্বসে পড়ে না। কোন একটি ধাতব কেলাসে প্রচণ্ড চাপ পড়লে কেলাসের কোঠাদলগুলির একটি অপরটির ওপরপিছলে যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তারা সিঁড়ির ধাপের মত বা হাতের ঠেলায় ছড়িয়ে-পড়া এক প্যাকেট তাসের মত সাজিয়ে পড়ে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই পিছলে যাওয়াটা

চলতে থাকে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় একে বলে বিনতি-বিকৃতি (প্লাসটিক ডিফরমেশন)। চাপের বহরটা যদি মাঝামাঝি রকমের হয় তা হলে এই স্খলনটা প্রত্যাকর্ষণের বাইরে যায় না, কোঠাদলেরা পরস্পরের টানের এলাকার মধ্যেই থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্বাভাবিক অবস্থান থেকে পরমাণুদের সামান্য বিচ্যুতি ঘটে। চাপটা সরিয়ে নিলে পরামাণু কণারা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের স্থানে ফিরে যায়, কেলাসের বিকৃতিটা স্থায়ী হয় না। প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে উঁচু পাকা বাড়ীর অবস্থা অনেকটা এ রকম হয়। ঝড়ের প্রচণ্ড বেগের মুখে বাড়ীটা একটু ঝুঁকে পড়ে, ঝড় কমলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে। এ ধরণের বিকৃতিকে বৈজ্ঞানীরা বলেন বিনতি-বিকৃতি বা স্থিতিবেদী বিকৃতি (ইলাষ্টিক ডিফরমেশন)। বিনতি-বিকৃতির ব্যাখ্যায় এক টুকরো ধাতুকে পিটে পাতে, কিম্বা টেনে তারে কেন রূপান্তরিত করতে পারা যায় তার উত্তর দেওয়া চলে। কিন্তু ধাতুর ঘাত-কাঠিন্য, ভঙ্গপ্রবণতা বা নক্সা ফুটিয়ে তোলার রহস্য ভেদ বিনতি-বিকৃতির ব্যাখ্যায় হয় না।

কয়েকটি সিদ্ধান্ত বা প্রকল্পের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এই ধর্ম্মগুলির ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম সিদ্ধান্ত অনুসারে কেলাসের একটি কোঠাদল আর একটি কোঠাদলের উপর চাপের ঠেলায় হড়কে গেলে কোঠাদলের ঘষটে-যাওয়া পিঠদুটি থেকে পরমাণু কণারা ছিঁড়ে আসে; ছিঁড়ে-আসা পরমাণু কণারা ঘষটে-যাওয়া পিঠদুটোর মাঝখানে এলো-মেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়ে মিশে যায়। এই অনিবদ্ধ অবস্থায় পরমাণু কণারা আঠার মত কাজ করে এবং রগড়ে যাওয়া কোঠাদল দুটোকে টান লাগিয়ে ধরে রাখবার চেষ্টা করে। চাপের ধাক্কায় কোঠাদলেরা যতই পেছলাতে থা[কে] আঠাল পরমাণুদের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে এবং জোরাল হতে থাকে স্খলন-নিবর্ত্তি বাধা। এভাবে স্খলন-নিবর্ত্তি বাধার টানে পিছলে যাওয়াটা কমলে ধাতুর বিনতিটাও কমে যায় এবং তার ঘাত-কাঠিন্য বাড়ে। চাপের ধাক্কাটা পরিমাণে খুব বেশী হলে কোঠাদলদের পরস্পরের সংযোগটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, আর এর ফলে ধাতুর টুকরোটা ভেঙ্গে বা ছিঁড়ে যায় দু'ভাগে। এই ভেঙ্গে যাওয়াটাই আমরা চোখের স্থূলদৃষ্টিতে দেখি। সিদ্ধান্তটিকে আঠালপরমাণুর সিদ্ধান্ত (এটমিক গ্লু থিওরি) বলে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটির ভাষ্যটি একটু অন্য রকমের। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘষটাবার সময় কোঠাদল থেকে খুব ছোট টুকরো ভেঙ্গে গিয়ে স্খলন-তলের (স্লিপ-প্লেন) মাঝে মাঝে আটকে থাকে। টুকরো জমায় রুক্ষতায় ও চাপের ধাক্কায় কোঠাদলের পেছলানটা মোলায়েম ভাবে ঘটতে পারে না কারণ টুকরোগুলো বাধা দেয়। সানবাঁধান রকে পেছলান আর খোয়া-ওঠা কাঁচা রাস্তায় আছাড় খাওয়ায় যে তফাৎ সেই আর কি! সিদ্ধান্তটির নাম হ'ল "টুকরো ভাঙ্গা সিদ্ধান্ত" (ফ্র্যাগমেন্টেশন থিওরী)

তৃতীয় সিদ্ধান্তটি অনুসারে পিছলে যাবার সময় কোঠাদলরা নিজেরাই বেঁকে তরঙ্গিত হয়। ঢেউ খেলান একটি লোহার পাতকে আর একটি ঢেউ খেলান পাতের উপর দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে টেনে যাবার সময় একটির ঢেউয়ের মাথা অপরটির ঢেউয়ের পেটের সঙ্গে খাঁজে খাঁজে মিলে আটকে যাওয়ার জন্য যেমন বাধার সৃষ্টি করে এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কোঠাদলে ভাঁজ পড়ে সেই রকম বাধার সৃষ্টি করে, চাপের ধাক্কায় পিছলে যাওয়া কোঠাদলদের আটকে রাখে; পেছলান বাড়লে কোঠাদলের তরঙ্গ বিকৃতির মাত্রাও বাড়ে, ফলে তাদের পেছলানটা ক্রমশঃ কমতে কমতে থেমে আসে, বিনতি-বিকৃতি পৌঁছায় তার শেষ সীমায়। সিদ্ধান্তটিকে "অণুজাল বিকৃতি" (ল্যাটিস্ ডিসটরসন) বলা হয়।

এতক্ষণ কেবল একটিমাত্র কেলাসের কথা ধরা গেছে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এক টুকরো ধাতুর মধ্যেও এ রকম হাজার হাজার কেলাস আছে। প্রত্যেকটি কেলাস তার কোঠা-দলকে নিয়ে দৈবক্রমে নানা দিকে নানা ভাবে পংক্তি করা থাকে, আশে পাশের কেলাসদের সঙ্গে সকল সম্ভাব্য কোণে সাজান থাকে। কেলাসদের এই সমাবেশটিকে কাঁচের ইঁটের নিচ্ছিদ্র ভরাট স্তূপের সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে। কাঁচের স্তূপটিতে চাপের ধাক্কা লাগলে কতকগুলো ইঁট সামনে এগোবে, কতকগুলো তাদের পাশেরগুলিকে পাশে বা পেছনে ঠেলে দেবে। যেন খেলার মাঠে পুলিশের গুঁতোয় দর্শকদলের মধ্যে ঠেলাঠেলি। প্রত্যেক দলেরই চেষ্টা আশ-পাশের দলকে ঠেলেঠুলে নিজের দলকে সামলে রাখা। চাপের ধাক্কায় ধাতুর ঘন সন্নিবিষ্ট কেলাসদের মধ্যেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটে; কতকগুলি কেলাসের কোঠাদল ধাক্কার মুখে পিছলে যায়, ঠেলমারা অপরাপর কেলাসের কোঠা-দলকে পাশে ওপরে নীচে পিছলে যেতে বাধ্য করে। চাপটা হাতুড়ির ঘা, টান বা ঠেল যেরূপেই আসুক না কেন এলো-মেলো পেছলানোর ফলটা হয় একই। প্রত্যেক কেলাসের কোঠাদলরা বিনতি-বিকৃতির শেষ সীমায় পৌঁছয়। তারা বিনতি-বিকৃতির সীমা ছাড়ালে ধাতুর টুকরোটি ভেঙ্গে যায়। পূর্ব্বোক্ত তিনটি সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় ঘাত-কাঠিন্যের রহস্যটা একটু পরিষ্কার হলেও সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোন্ সিদ্ধান্তটি আসলে ঠিক সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজও নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি।

ঘাত-কাঠিন্যের রহস্য ত একটু পরিষ্কার হ'ল। এইবার তাতাবার পর পেটাই করা রূপটা (যে রূপটার জন্য হাতুড়ীর ঘা থেকে) না হারিয়ে ধাতু আবার নমনীয় ও প্রসার্য্য হয় কেন বা ধাতুর বিনতি ফিরে আসে কি ভাবে তার ব্যাখ্যায়

আসা যাক। ক্ষর-লেখ দ্রাবকের প্রভাবে নম্বর বা নক্সা ফুটিয়ে তোলার কারণও সেই সঙ্গে বুঝতে পারা যাবে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায় পারস্পরিক টান এড়িয়ে ধাতুর কেলাসে কোঠাদল ও তাদের পরমাণু কণাদের অবস্থান সমাবেশ বদলান দুর্ঘট। কেলাসে কোঠা-দলে পরমাণু কণাদের স্তরে স্তরে পংক্তিতে পংক্তিতে সাজিয়ে পড়বার ঝোঁকটা খুব প্রবল। চাপের ধাক্কায় একটি কোঠাদল আর একটি কোঠাদলের ওপর যখন পিছলে যায় তখনও এই ঝোঁকটা থাকে। কিন্তু ঝোঁকটা থাকলেও সেটা সব সময় কার্য্যকরী হতে পারে না। হাতুড়ীর ঘা বা অন্য চাপের ধাক্কায় পিছলে যাবার সময় প্রায়ই কোঠাদলের পিঠ থেকে একটা পরমাণু কণা ছিঁড়ে গিয়ে তার নিকটবর্তী কোঠাদলের দুটো পরমাণু-কণার মাঝামাঝি থামতে বাধ্য হয়। তখন দুটো লড়ায়ে জাতের মাঝখানে একটা নিরপেক্ষ জাতের মত এই ছিঁড়ে আসা পরমাণু-কণাটির অবস্থা উভয় সঙ্কট হয়ে দাঁড়ায়, দু'পাশের পরমাণু-কণার টানে সে একই সময়ে যেতে চায় দুটো অবস্থিতিতে। কাজেই নিরপেক্ষ জাতটার মত অসম্ভব টানাটানির মধ্যে থাকা ছাড়া তার অন্য উপায় থাকে না। চারদিকের টানের মাত্রাটা এত বেশী হয় যে তাকে অচল হয়েই থাকতে হয়। হাতুড়ীর ঘা বা অন্য কোন বাইরের চাপ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ধাতুর ওপরের পিঠে ও ভিতরের মাঝামাঝি জায়গার কোঠাদলগুলিতে এটা ঘটতে থাকে, কিন্তু বাইরের চাপ সরিয়ে নিলে ধাতুর ওপরের পিঠের অবস্থার সঙ্গে ভিতরের মাঝামাঝি জায়গার অবস্থার আর কোনও মিল থাকে না। দু'জায়গার অবস্থা তখন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। সে সময় ধাতুর ওপরের পিঠের কোঠাদলগুলি থেকে ছিঁড়ে আসা পরমাণু-কণাদের ওপর চাপের ধাক্কায় স্থানচ্যুতির টান ছাড়া অপর কোন বাড়তি চাপ থাকে না। তখন তাদের ওপর ধাতুর মাঝামাঝি জায়গার পরমাণু-কণাদের টানটা তাদের স্থানচ্যুত অবস্থায় আর ধরে রাখতে পারে না। এর ফলে স্থানচ্যুত রমাণু-কণারা স্থানচ্যুতির টান এড়িয়ে কাছের পংক্তিতে আবার সারি দিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হাতুড়ীর ঘা বা অন্য কোন বাইরের চাপ সরিয়ে নিলে ধাতুর ভিতরের মাঝামাঝি জায়গার কোঠাদল থেকে স্থানচ্যুত পরমাণু-কণারা স্থানচ্যুতির টান এড়াতে পারে না—স্থানচ্যুতির টান ছাড়াও সেখানে তাদের ওপর চারদিক থেকে, ওপর থেকে নীচে থেকে দু'পাশ থেকে একটা বাড়তি টান থাকে এবং এই টানের জোরটা তাদের পংক্তিতে সারি বাঁধবার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে অনেক বেশী জোরাল। সুতরাং ধাতুর ভিতরের পিঠের স্থানচ্যুত পরমাণুদের স্থানভ্রষ্ট হয়ে
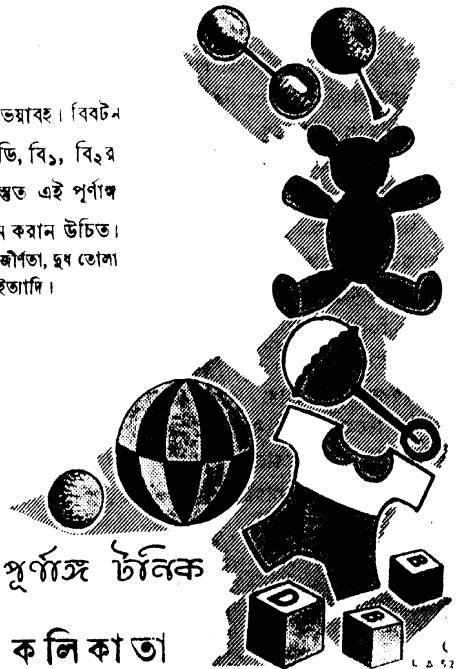
অচল অবস্থায় টানাটানির মধ্যেই থাকতে হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ধাতুর ওপরের পিঠের ও ভিতরের মাঝামাঝি জায়গার কেলাসের কোঠাদলে পরমাণু-কণারা বাইরের চাপের ফলে টান-পীড়িত হয়। বাইরের চাপটা সরিয়ে নিলে ধাতুর ভিতরে এই টানটা থেকে যায় কিন্তু ধাতুর ওপরের পিঠের পরমাণু-কণারা এই টানটাকে এড়িয়ে পংক্তি সাজিয়ে ধাতুর ওপরের পিঠে কেলাসের কোঠাদলে টানমুক্তি ঘটায়।

খুনের বন্দুকের নম্বর ফুটে ওঠার কারণ এবার পরিষ্কার হবে। নম্বরগুলো বন্দুকের ওপর প্রচণ্ড চাপে খোদাই করা হয়। উকোর ঘষটানিতে খুনী নম্বরগুলো ও তার আশপাশের টানযুক্ত তলটাই কেবল নষ্ট করে কিন্তু নম্বরগুলোর নীচে প্রবল টান-পীড়িত কেলাসগুলির ওপর কোন প্রভাব রেখে যেতে পারে না। ক্ষর-লেখ দ্রাবক প্রথমে টান-পীড়িত কেলাসগুলির ওপরের পাতলা স্তরটা ক্ষয়ে ফেলে, তার পর টানমুক্ত কেলাসগুলির চেয়ে টান পীড়িত কেলাসগুলিকে বেশী এবং তাড়াতাড়ি ক্ষয় করায়। কাজেই নম্বরগুলোর নীচের কেলাসগুলি ক্ষয় হয় বেশী আর ক্ষয় হওয়ার ফলে ঘষে ফেলা নম্বরক'টি ফুটে ওঠে।

ভেতরে টান থাকা ধাতু মোটেই ভাল নয়। তাপের প্রথম কাজ হ'ল এই টান দূর করা। ধাতুতে পরমাণু-কণার, এমন কি স্থানভ্রষ্ট পরমাণুরা পর্য্যন্ত একসঙ্গে তাড়াতাড়ি কাঁপতে থাকে; উষ্ণতা যত বেশী হবে কাঁপুনিটা ততই বাড়বে। ক্রমে এমন একটা অবস্থা আসে যখন পরমাণুদের কাঁপুনি এত বেশী বাড়ে যে আভ্যন্তরিক টান থাকা সত্ত্বেও স্থানচ্যুত পরমাণুরা পংক্তিতে ফিরে যেতে পারে এবং যায়ও। এই রকম তাপ লাগানকে ধাতুবিদ্‌দের ভাষায় বলে পীড়ন মুক্তি (ষ্ট্রেস রিলিভিং) বা আরোগ্য (রিকভারি)। পীড়ন মুক্তির জন্য খুব বেশী উষ্ণতার দরকার হয় না। কতকগুলি ধাতু আবহিক উষ্ণতায়ও (রুম টেম্পারেচর) টানযুক্ত হয়। সাদা কথায় ক্রমাগত হাতুড়ির ঘা খেলেও তারা কঠিন বা ভঙ্গপ্রবণ হয় না—কারণ হাতুড়ির ঘা থামলেই তারা তাদের পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পায়। রাং (টিন) ও সীসে হ'ল এ সব ধাতুদের দলে।

কেবলমাত্র আরোগ্য ধাতুর প্রসার্য্যতা বা নমনীয়তা ফিরিয়ে দিতে পারে না। কেলাসরা তখনও বিস্তৃত এবং বিকৃত অবস্থায় থাকে। ধাতুকে যদি আরও বেশী গরম করলে ব্যাপক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়; বিকৃত বিস্তৃত কেলাসরা ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়, ও তাদের জায়গায় নূতন সুগঠিত ছোট ছোট কেলাসরা গড়ে ওঠে। অনিয়তাকার আঠাল পরমাণু-কণারা লাগাম-টানা (ব্রেকিং) টুকরো পরমাণুপুঞ্জ তরঙ্গিত বন্ধুর কোঠাদলরা নূতন গড়ে ওঠা কেলাসগুলিতে মিশে যায়। অণুবীনের দৃষ্টিতে এটা দেখতে ও ধরতে পারা যায়। নূতন কেলাসগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন স্খলন তলও (শ্লাইড প্লেনস) গড়ে ওঠে। নূতন স্খলন তল গড়ে ওঠার ফলে কোঠাদলগুলি আবার পেছলাতে পারে এবং ধাতুর টুকরাটি তার পূর্ব্বের প্রসার্য্যতা ফিরে পায়। তখন তাকে আবার তার বিনতি সামর্থ্যের (প্লাষ্টি-এবিলিটি) শেষ সীমা পর্য্যন্ত পেটাই করা বা টানা চলতে পারে।

এভাবে ধাতুর ঘাত-কাঠিন্য ও কমলায়নের (অ্যানিলিং) নানা পর্য্যায়ের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন ধাতুর বিনতি সীমা (প্লাসটিক-লিমিটস্), আরোগ্যদায়ক উষ্ণতা (রিকভারি টেম্পারেচর),কেলাস পুনর্ব্বিকাশক তাপমাত্রা (রিক্রিষ্টালি-জেসন টেম্পারেচর) সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা ধাতুকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ধাতু নিয়ে কাজ করার বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তার এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান জন্মান স্বাভাবিক কিন্তু বিজ্ঞানীই ধাতুর নানা ধর্ম্মের উৎস জেনে তার ব্যাখ্যা করেন, যে অদৃশ্য ছন্দ দোলায় ধাতুর দেহে নানা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন রূপ নেয় তাকে লোকগোচর করেন।

পুস্তক-পরিচয়

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজ-চিত্র—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

'সমাচার দর্পণে' "বাবুর উপাখ্যান" প্রকাশিত হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "কলিকাতা কমলালয়" ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং "নববাবুবিলাস" ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতেই বাংলা-সাহিত্যে সামাজিক নক্সা রচনার ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ উপন্যাস-রচনার পূর্ব্ব হইতেই সমাজচিত্র-রচনায় বাঙালী মন দিয়াছে। ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে আরম্ভ করিয়া "আনন্দ-লহরী" পর্য্যন্ত দশখানি সামাজিক চিত্রের নাম করিয়া বলিয়াছেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা-গদ্যে এইরূপ আরও অনেকগুলি চিত্র জন্মলাভ করে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" প্রথম প্রচারিত হয়। বলিতে গেলে বাংলা ভাষা ও রচনারীতির উপর "হুতোম প্যাঁচা"র প্রভাব সাধারণ নয়। আজকাল চলিত ভাষায় গ্রন্থ-রচনার যে রীতি প্রচলিত হইয়াছে "হুতোম"কে তাহার পথপ্রদর্শক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) শুধু মহাভারতের অনুবাদ সম্পাদন এবং প্রকাশ করিয়াই যশস্বী হন নাই, "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। "নক্‌শা"য় তখনকার কলিকাতার অপূর্ব্ব চিত্র দেখিতে পাই। সচিত্র "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সহিত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "সমাজ কুচিত্র" (১৮৬৫ খ্রীঃ) ও রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণের "পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব" (১৮৬৮ খ্রীঃ) পরিষৎ-প্রকাশিত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয় লিখিত ভূমিকাটি মূল্যবান।

দেবতার জন্ম ও অন্যান্য গল্প—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। দি বুক এম্পোরিঅম লিমিটেড, ২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

ছোট গল্পের বই, এগারোটি গল্পের সমষ্টি। গ্রন্থকারের লিখিবার একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে এবং এই বিশেষ রচনাভঙ্গী গল্পগুলিকে সরস ও সুপাঠ্য করিয়াছে। প্রথম গল্প 'দেবতার জন্ম'। পথের-মাঝে-পড়িয়া-থাকা এক শিলাখণ্ড কিরূপে প্রস্তর জন্ম পরিহার করিয়া দেবতার পদে উন্নীত হইল তাহারই কাহিনী। শেষের গল্পটি 'মহা পাকিস্থানের পথে'। গল্পটি অত্যন্ত সুকৌশলে লিখিত। যাহা মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি হইতে পারিত তাহাই এক কৌতুককর ঘটনায় পরিণত হইয়া প্রচুর হাস্যের উপাদান যোগাইয়াছে। 'আমার প্রথম লেখা' নামক গল্পটিতে লেখক বলিতেছেন, "আমার গল্পরা যখন রূপান্তরিত হয়ে সেজেগুজে আপনাদের সমক্ষে গিয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের দেখে হয়ত হাস্যকর বলে মনে হলেও হতে পারে কিন্তু যখন আমার সামনে বা আশেপাশে, আমাকে জড়িয়ে নিয়ে, গাঁজতে থাকে তখন তা দস্তুরমতই গঞ্জনাদায়ক। মোটেই হাস্যকর নয়, অন্ততঃ আমার পক্ষে তো নয়।" ভাবাবেগসঙ্কুল গুরুগাম্ভীর্য্যের দেশে হাসি এবং কৌতুকের লীলাচাপল্য সত্যই রুচিকর। তবে ভঙ্গী যেখানে ভঙ্গিমায় অর্থাৎ mannerism-এ পরিণত হইবার

বিশেষ সম্ভাবনা লেখককে সেখানে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। পাঠক গল্পগুলি পড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৬৮—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র। সাহিত্যের এই নীরব এবং অক্লান্ত সাধক বহু বিষয়েই অগ্রণী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম প্রথম সম্পাদকরূপে থাকিলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথই "ভারতী"র সঙ্কল্পয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা। "পুরুবিক্রম", "সরোজিনী", "অশ্রুমতী" প্রভৃতি নাটক, "কিঞ্চিৎ জলযোগ" "অলীক বাবু" প্রভৃতি প্রহসন একদা যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত ও ফরাসী সাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্নপ্রকার গ্রন্থের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত সুষ্ঠু অনুবাদগুলি বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। জ্যেষ্ঠ-অনুসৃত পথে তিনি বাংলা স্বরলিপির নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রাঙ্কনশক্তি সাধারণ ছিল না। তিনি নানা-বিষয়ক প্রায় অর্দ্ধ শত গ্রন্থের প্রণেতা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন-গঠনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব অল্প নহে।

স্বদেশপ্রেমিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক "হিতবাদী"র খ্যাতনামা সম্পাদক, স্বদেশী আন্দোলনের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও প্রচারক, কয়েকটি বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা, সুরসিক এবং সুলেখক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) মাত্র ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ এবং নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা প্রতিপক্ষের ভয়ের কারণ ছিল। তাঁহার সম্পাদনায় "হিতবাদী" একদিন সংবাদপত্র-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সাহিত্যবিচার—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। ৮সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি এবং সমালোচক মোহিতলালের রচনা সাহিত্যরসিকমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। বর্ত্তমান গ্রন্থে 'কবি ও কাব্য,' 'কাব্য ও জীবন', 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস,' 'সাহিত্যের ষ্টাইল' 'নাটকীয় কথা,' 'আধুনিক সাহিত্যের ভাষা', 'সাহিত্যের আসরে' এবং 'সংবাদপত্র ও সাহিত্য' এই আটটী প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। মোহিতবাবু চিন্তাশীল এবং সুরসিক লেখক। মনস্বিতা এবং হৃদয়বত্তার এরূপ সম্মিলন বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে বিরল। লেখক 'কাব্য কথা' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থরচনার সংকল্প করিয়াছিলেন, ঐ নামে কতকগুলি প্রবন্ধও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল,—'কবি ও কাব্য' সেই সংকল্পিত গ্রন্থের অংশবিশেষ। দেশী ও বিদেশী শ্রেষ্ঠ কাব্যের রসে তাঁহার চিত্ত পরিপুষ্ট। আজিকার অনেক সমালোচক নূতন ভঙ্গীমাত্র দেখিয়া চমৎকৃত, কেহবা পাণ্ডিত্যপ্রকাশে উদ্‌গ্রীব, কাহারও দৃষ্টি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারে আচ্ছন্ন, আবার কাহারও কাব্যবিচার অপর সমালোচকের প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়। মোহিতলালের আছে স্বাধীন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, তাঁহার আলোচনায় পাই সংবেদনশীল হৃদয়ের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। পুরাতনের মধ্যে যাহা অমর, তাহার প্রতি তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্, নূতনের মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা দেখিলে তিনি তাহার অভ্যর্থনায় অগ্রসর। তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন, স্থায়ী সাহিত্যের কষ্টিপাথরে কষিয়া যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা অকুণ্ঠিত ভাবে জানাইয়াছেন। শুধু জানাইয়াছেন বলিলে যথেষ্ট হইবে না, রচনাগুণে আপন আনন্দ ও প্রত্যয় পাঠকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

সাহিত্যের মূলতত্ত্বের অভ্যন্তরে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই

পূর্ব্বাশা-প্রকাশিত কয়েকটি গল্পের বই

সুবোধ ঘোষের

পরশুরামের কুঠার

দ্বিতীয় সংস্করণ। দুই টাকা।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পসৃষ্টিতে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তার অনেকখানিই এনে দিয়েছিলেন সুবোধ ঘোষ। আশ্চর্য্য এক রূপ ও রসের আমদানী করে তিনি যেন বাংলা-সাহিত্যের গতিকেই মোড় ফিরিয়ে নতুনতর পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর ভাষাও এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সুবোধ ঘোষের গল্পের আলোচনাপ্রসঙ্গে চতুরঙ্গ বলেছিলেন: 'রবীন্দ্রনাথের পর কি বিষয়বস্তুতে কি রচনাশৈলীতে বাংলা ছোট গল্পের মোড়কে তিনিই দিয়েছেন নূতন যাত্রা-পথের ইঙ্গিত। সুবোধবাবুর গল্প দুঃখবিলাসের কান্না নয়, মুক্তির বাণীর অদম্য প্রেরণাতেই সেগুলি গতিবান, ফলে শিল্প চাতুর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন।' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় যে তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে, একটিমাত্র উক্তি থেকেই তা স্পষ্টই জানা যাবে, 'সুবোধবাবুর দৃষ্টি আধুনিকতার দৃষ্টি—সত্যের প্রত্যক্ষতায় তাঁহার লেখা সরস এবং সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।'

শুক্লাভিসার

দুই টাকা চার আনা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

পতাকা

দুই টাকা।

সাহিত্যক্ষেত্রে নেমে খুব অল্পদিনের মধ্যেই যারা পাঠকসাধারণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করতে সমর্থ হন, তাঁদের সংখ্যা সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে খুব বেশী নয়, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সেই অল্পসংখ্যক লেখকদের অন্যতম। ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানবমনের যে আবর্ত্তন তা-ই নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনায়। 'পতাকা' তাঁর সর্ব্বাধুনিক গল্পগ্রন্থ।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের

নয়নচারা

দেড় টাকা।

জাহাজের সারেং এবং নৌকার দাঁড়ি মাঝিমাল্লা আমাদের প্রতিদিনকার পরিচিত জগতের অধিবাসী নয়, কিন্তু তাদেরই হৃদয়ের অন্দরমহলে প্রবেশ করে লেখক এই অজ্ঞাত-পরিচয় মানুষগুলির সত্যিকার রূপকে প্রকাশ করেছেন এই গল্পগ্রন্থে। মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত কয়েকটি গল্প যে এমন সার্থক সুন্দর হয়ে উঠতে পেরেছে তার কারণ লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত্ত মমত্ববোধ ও অন্তর্দৃষ্টিতে কোথাও ফাঁকি থাকে নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

মহানগর

যে কয়জন লেখকের সাধনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথপরিক্রমা সুরু হয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের অন্যতম। সরস গল্পরচনায় তাঁর প্রতিষ্ঠা বহুদিনের। সব জড়িয়ে তিনি তাঁর গল্পে যে ভাবটি পরিস্ফুট করে তোলেন তা এমনি অনির্ব্বচনীয় রসে পরিপূর্ণ যে আপনি যদি রসের অভিসারী হন এবং জীবনে দার্শনিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবার দিকে যদি আপনার মনের সহজ প্রবণতা থাকে, সোজা কথায় আপনার যদি জীবন-বোধ থাকে, তাহলে তার দ্বারা আপনি অভিভূত হবেনই হবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ। দুই টাকা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের

ফসল

দ্বিতীয় সংস্করণ। এক টাকা চার আনা

যে দুঃখীসাধারণকে নিয়ে দেশের বৃহৎ জনসমাজ চিরাচরিত স্রোতোধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে, তারাই এ-গল্পগুলোর প্রধান চরিত্র; গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও আন্তরিক সহানুভূতির স্পর্শে প্রত্যেকটি চরিত্রই সত্যিকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে—লেখক কোথাও আবরণের আশ্রয় নেন নি।

ঋণ

এক টাকা সাড়ে ছয় আনা।

বাঙালীর সমাজ ও পারিবারিক জীবনের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধুরতা অন্তর্হিত হতে চলেছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক কারণে। যে আর্থিক সাচ্ছল্য পারিবারিক শান্তি ও মাধুর্য্য রক্ষা করবার পক্ষে অপরিহার্য্য তার অভাবে পিতামাতার প্রতি ভক্তি, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, অপত্য স্নেহ, বন্ধুপ্রীতি সবই ধীরে ধীরে কমে আসছে। বাংলার এই পর্য্যুদস্ত সমাজজীবনের রূপটিই প্রতিফলিত হয়েছে 'ঋণ' গল্পগ্রন্থে।

নতুন দিনের কাহিনী

দুই টাকা।

'গল্পগুলির উপাদান প্রধানতঃ আধুনিক শিক্ষিত অভিজাত ও সম্পন্ন পরিবারের যুবক-যুবতীর মনস্তত্ত্বের অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। ভাষা বলিষ্ঠ, বর্ণনাভঙ্গী চিন্তাকর্ষক।'—আনন্দবাজার

'চিরাচরিত পরিবেশে গল্পগুলি দাঁড় করান হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষার সৌকর্য্যে এবং রচনাশৈলীর নিপুণতায় সেগুলি আকর্ষণীয়।'—যুগান্তর

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

খেলনা

দেড় টাকা।

আজকের দিনের উদ্‌ভ্রান্ত অনিশ্চয়তার ঠুনকো খেলনার মতোই দেখায় অজস্র মধ্যবিত্তের নষ্টভ্রষ্ট জীবনের দাবী। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সাম্প্রতিক গল্প-সাহিত্যে এ-জন্যই বিশিষ্ট যে তাঁর নায়ক-নায়িকার চরিত্রে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে ভঙ্গুর খেলনারই করুণ প্রতিভাস।

প্রকাশক ঃ

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

কারণেই তাঁহার বিচার কেবল কঙ্কাল বিশ্লেষণ নহে, তাহা প্রাণ-রহস্যেরই সন্ধান সঙ্কেত। 'সাহিত্যের ষ্টাইল' প্রবন্ধ তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 'Mind in Style' এবং 'Soul in Style'-এর পার্থক্য দেখাইয়া লেখক বলিয়াছেন: "যাহার মধ্যে 'Soul of humanity', বিশ্বমানবের প্রাণস্পন্দন, অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি, তাহাই Great Art—অতএব তাহাই শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল। আধুনিক ভাষাবিকারের দিনে লেখকের নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "ভাষার রীতি একটা খেলা বা খেয়ালের বস্তু নয়, ব্যক্তিবিশেষের খুশী বা বিলাস-বাসনা যদি এমন করিয়া কোনও জাতির ভাষাকে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে চায় ও পারে তবে সে জাতির মৃত্যু অবধারিত। বাঙালী কি সত্যই মরিতে বসিয়াছে?"

সাহিত্য-বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা ও চর্চ্চা করেন, তাঁহারা এ গ্রন্থখানিকে পরম মূল্যবান বিবেচনা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পুতুলনাচের ইতিকথা শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দি বুকম্যান—৮৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

ছোট একটি গ্রামের অতি সাধারণ কয়েকটি নরনারীকে গল্পের উপাদান হিসাবে লেখক বাছিয়া লইয়াছেন। এরা অদৃষ্টের অদৃশ্য হস্তের ক্রীড়নক। এদের পরিমিত আশা-আকাঙ্ক্ষা চারিপাশের ঘটনা-সংঘাতে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—রূপ বদল করিতেছে। বাহির হইতে এই সব অতি সাধারণ নরনারীর জীবনযাত্রার ধারাটিকে অত্যন্ত সরল বোধ হয়, কিন্তু এদের প্রণয় ব্যভিচার স্নেহ ভালবাসা নিষ্ঠুরতা মহত্ত্ব প্রভৃতির অন্তর্নিহিত রহস্য লেখক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই ধরণের চরিত্র-বিশ্লেষণ বাস্তবানুগত্যের পরিচয়।

কাহিনীর প্রধান পুরুষ শশী অদৃশ্য হস্তের পুতুলের মতই ইতস্তত সঞ্চরণশীল। সেই কারণে অস্পষ্ট এবং প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। কুসুম বাস্তব কল্পনায় মেশানো হইলেও জীবন-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। অত্যন্ত সজীব ও স্পষ্ট হইল কুমুদ আর মতি। চলমান জগতে তাদের চলা এখনও শেষ হয় নাই। গোপাল, রূপসী, সেন-দিদি ও বিন্দুচরিত্রের অন্তর্বিপ্লবের হেতু বাহিরের আচার আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। খানিক আলো খানিক ছায়া মেশানো এই সব চরিত্র, এদের চারিপাশের ঘটনা—এদের খেয়ালখুশিভরা আচরণের তলায় মনোবিকলনের ধারা—এই সব অনুসরণ করিতে করিতে প্রশ্ন জাগে - মানুষের মনের অন্ধকার দিকটা প্রকাশ করাই কি মনস্তত্ত্বের বিষয়? উপরের মহত্ত্ব কি তার ক্ষুদ্রত্বের আবরণ মাত্র? গৌরব-সৃষ্টির প্রচণ্ড মোহে মানুষ অকাতরে আত্মহত্যা করে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু সংসার হইতে প্রায়-বিযুক্ত আত্মসম্পূর্ণ মানুষের মহত্ত্বের তলায় আত্মহত্যার দ্বারা অমর হইবার বাসনা হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়; বাস্তববাদের ঊর্দ্ধে যে জগৎ মানুষের কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মানুষকে পার্থিব কামনার কলুষমুক্ত করিতেছে বস্তুসঙ্কীর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাহার রহস্যভেদ করা কি ততটাই সহজ? এ যেন নৈরাশ্যবাদীর মনস্তত্ত্ব নিরূপণ চেষ্টা।

অনেকে বলিবেন, সম্পূর্ণ জীবন-দর্শন দুর্লভ বস্তু; তার খানিকটা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাকিটা সমৃদ্ধ কল্পনার সঙ্গে মিশাইয়া আলো ছায়া ভরা ছবি আঁকার যে দক্ষতা তাহার পরিচয়কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণে থাকিলেই তো যথেষ্ট। সুস্থ মনোবিকলনের চেষ্টা হয়ত ইহার মধ্যে নাই, তবু কাহিনীগত রস উপভোগে পাঠক-সম্প্রদায় যে বিমুখ নহেন দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মহামানব মহাত্মা—শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত। এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। ১৭০ পৃ, মূল্য ২॥০ টাকা।

এই সেদিন মহাত্মা আমাদের মধ্যে ছিলেন, আজ তিনি নাই। এই বিরাট ব্যবধান জাতি হিসাবে আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে এবং সমস্ত পৃথিবী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। ১৮৬৯ সনের ২রা অক্টোবর যাঁহার জন্ম ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী যাঁহার তিরোধান। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার স্থান কত সুপ্রতিষ্ঠিত, মানব-মনে তাঁহার কর্ম্ম ও সাধনাময় জীবনের ছাপ কত গভীর এই বেদনাবিক্ষুব্ধ বিবদমান ও ভ্রাতৃঘাতী জাতিসমূহের নির্ম্মল শান্তিস্থাপন-প্রয়াসের মধ্যে তাহা প্রতিদিনই প্রকট হইতেছে। তিনি কি কেবল ভারতের ছিলেন? আজ সমস্ত পৃথিবী কোন্ আকর্ষণে মহাত্মার জয়গান করিতেছে? এযুগে মহাত্মাজীই ভারতের পরিচয়। আমরা গান্ধীর দেশের লোক বলিয়া বিদেশে সম্মান পাইয়াছি। পরাধীন ভারতের আবার সম্মান? আজ ভারতের স্বাধীনতালাভের সাধনায় যদি কেবলমাত্র এক জনকে সম্মান দিতে হয় সে সম্মান, সে শ্রদ্ধা, দেশ-বিদেশের কৃতজ্ঞতার মূল্য পাইবেন আমাদের গান্ধীজী। বিজয়বাবু এই মহামানবের যে আলেখ্য আঁকিয়াছেন তাহাতে গান্ধীজীর কর্ম্মময় জীবনের সকল দিকেই অল্পবিস্তর আলোকপাত করা হইয়াছে। ছাত্র, ব্যবহারজীবী, দক্ষিণ-আফ্রিকায় অপমানিত সত্যাগ্রহী, গোখেলের শিষ্য, চম্পারণের কৃষক, অসহযোগী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, অহিংস, সেবাব্রতী, লবণকর অমান্যকারী, জেলের কয়েদী, আশ্রমিক, শিক্ষাব্রতী, চরখার প্রচারক, হরিজন-প্রেমিক ও কর্ম্মী, সর্ব্বশেষে হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য অমূল্য জীবন উৎসর্গকারী—নানা দিক দিয়া বিজয়বাবুর গ্রন্থখানি তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। গান্ধীজীর নানা সময়ের কয়েকখানি চিত্র পুস্তকখানির আরও শোভা-বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থশেষের জীবনপঞ্জীতে এই মহাজীবনের বিশেষ ঘটনাগুলি স্বল্পপরিসরের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপ সুলিখিত মহাপুরুষ-জীবনী দেশের সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের মধ্যে যতই প্রচারিত হইবে ততই মঙ্গল।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

অবরোধ (নাটক)—শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্য। ইণ্টারন্যাশনাল পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড। ৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। ১২৩ পৃ, মূল্য দুই টাকা আট আনা।

"পৃথিবীর মানুষ আজ এক অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ শ্রেণীবিন্যাসে চিহ্নিত। আমাদের সমাজেও সেই শ্রেণী-বিন্যাস তেমনি নির্ম্মম ও ধারালো। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিতান্ত সাধারণ ও অনাড়ম্বর মানুষ কি করে আজকের প্রবল ও বিচিত্র শিবিরে ভাগ হয়ে গেল সে এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এবং সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীদের সংঘাত ও সংঘর্ষই 'অবরোধ-এ'র মূল উপজীব্য।" চলতি নাটক ও মঞ্চের বিরুদ্ধে বহুদিনের অভিযোগ ক্রমশঃই পুঞ্জীভূত হয়ে এসেছে এবং তারই প্রতিবাদে নতুন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নতুন রীতিতে নাট্য-রচনার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। এই নব-নাট্য আন্দোলনের অগ্রণীদের মধ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থকার অন্যতম।

শ্রেষ্ঠ নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে তা পাঠক এবং দর্শকের মনে বিরাট 'ইমোশন' সৃষ্টি করে। নাটক পড়তে পড়তে বা অভিনয় দেখতে দেখতে আমরা নাটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই, তার পাত্র-পাত্রীর সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনাকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলি। নাটকের ট্র্যাজেডি বা কমেডিতে নিজেরা দুঃখে ম্রিয়মাণ হই অথবা খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। নাট্যরচনার এই রহস্য যাঁর যত বেশি আয়ত্ত তিনি তত বড় নাট্যকার। শ্রেষ্ঠ নাটক-সৃষ্টির এই সত্যকে মনেপ্রাণে উপলব্ধি না করে শুধু আধুনিক মঞ্চের আদর্শভ্রষ্টতা এবং সমসাময়িক মঞ্চ-সফল নাটকের বিরুদ্ধে মেলোড্রামা এবং হাল্কা রস-পরিবেশনের অভিযোগ করলে না হবে নব-নাট্য আন্দোলনের পুষ্টি, না হবে মঞ্চ-সংস্কার। একটা বড় সমস্যাকে নাটকের কাঠামোতে ঢেলে সাজলেই তা নাটক হয় না। 'অবরোধে' নাটক লেখার চেয়ে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন-শ্রেণীতে বিভক্ত মানব-গোষ্ঠির 'ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া'র বিশ্লেষণ করবার প্রয়াসই বড় হয়ে উঠেছে। পড়তে পড়তে সব সময়ই মনে হয়, সংলাপ ও সিচুয়েশনের মাধ্যমে যেন একটি বিশেষ সমস্যাকে বিশ্লেষণ করবার জন্যেই লেখক তাঁর ঈপ্সিত বক্তব্য বলে যাচ্ছেন। নাটকের অনিবার্য্য গতিবেগে নয় নাট্যকারের ইচ্ছানুসারেই যেন ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই 'ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া'কে ফুটিয়ে তুলবার জন্যে গোটা নাটকটাই যেন সাজানো এবং ছককাটা। নাট্যকারের এই সচেতন প্রয়াসই 'অবরোধ' নাটকের রসস্রোতকে বার বার ব্যাহত করেছে। নাটকের যে আবেগ, যে বিস্ময়, যে লীলা পাঠকের মনকে হাসি-অশ্রু, আনন্দ-বেদনায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চঞ্চল করে তুলে, 'অবরোধের' নাট্যকার যেন সচেতন ভাবে তা এড়িয়ে গিয়েই নাটকের নূতন পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। নূতন আঙ্গিকে নাটক লেখবার প্রয়াসকে খাটো করে দেখব না—সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও নয়। সমস্যা-মূলক নাটক লেখা হবে না—এমন আবদারও কোন রসগ্রাহী পাঠক করবেন না। কিন্তু নাটক নাট্যরসের চেয়ে যদি সমস্যা বড় হয়ে উঠে তবে তা ভালো নাটক বলে কোন কালেই অভিনন্দন লাভ করবে না। কারণ নাটকের বড় কথাই হচ্ছে 'নাটকত্ব'। 'নবান্ন' রচনা করে শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য্য প্রশংসা লাভ করেছিলেন। তিনি শক্তিমান নাট্যকার। সত্যকার রসোত্তীর্ণ নাটক লিখে তিনি তাঁর খ্যাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন এটাই কাম্য।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ—স্বামী সত্যানন্দ গিরি। প্রকাশক সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। মূল্য ১৲।

ব্যায়ামাচার্য্য বিষ্ণু ঘোষের অগ্রজ পরমহংস যোগানন্দ স্বামী তাঁহার Autobiography of a Yogi নামক পুস্তকে শ্রীরামপুরের লাহিড়ী মহাশয় ও তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিকে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই উন্নতশির দীর্ঘকায় সৌম্যদর্শন বিরাট্ পুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধুসভা বা সৎসঙ্গ নামক আশ্রমগুলি শ্রীরামপুর, রাঁচি, পুরী, মেদিনীপুর প্রভৃতি বাংলার এবং বাহিরে বহু পল্লীতে নানা লোক-হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে। তাঁহার প্রধান শিষ্য যোগানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধুসভাগুলি তাঁহার নামানুসারে 'যোগদা সৎসঙ্গ' নামে পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতাশ্রম বা বেদান্ত মঠগুলি যেমন আমেরিকার প্রধান প্রধান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতবর্ষের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে, যোগানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক নিউইয়র্ক, বোষ্টন, লস্ এঞ্জেলস্, হলিউড, ক্যালিফর্ণিয়া, ওয়াশিংটন, মেক্সিকো প্রভৃতি বহু স্থানে Self-Realisation Church নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের বাণী প্রচারে সহায়তা করিতেছে। তাঁহার ধর্ম্মমন্দিরগুলির মুখপত্র East-West নামক পত্রে যোগানন্দ স্বামী নিয়মিতভাবে ভারতের বাণী ও সাধনা প্রচার করেন। এই গ্রন্থের লেখক স্বামী সত্যানন্দ গিরিও শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের অন্যতম শিষ্য হিসাবে ঝাড়গ্রামস্থ সেবায়তনে প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত আছেন। তল্লিখিত গিরি মহারাজের এই জীবনী পড়িয়া কৌতূহলী পাঠক উপকৃত হইবেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন) পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। সুকুমার বাবু বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামসদন চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র।

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুকুমার বাবু ১৯০৮ সনে বেঙ্গল সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৯৩৬ সনে ইনস্পেক্টর-জেনারেল অফ রেজিষ্ট্রেশন পদে উন্নীত হন। সত্যকার স্বদেশপ্রীতি থাকিলে ইংরেজ আমলের শেষের দিকে সরকারী কর্ম্মচারীরা কখন কখন কিরূপে দেশের কাজ সুষ্ঠুভাবে করিয়া যাইতে পারিতেন সুকুমার বাবু ছিলেন তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বীরভূম জেলার দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিতে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব বিমোচনে, গোপালগঞ্জের কচুরীপানা ধ্বংস-কার্য্যে, ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটির উন্নতি-বিধানে তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার রচিত বয়স্কদের শিক্ষা-পরিকল্পনা তৎকালীন বাংলা-সরকার গ্রহণ করেন। তিনি বয়স্কদের সহজ-পাঠ 'পড়ার বই' প্রবর্ত্তন করেন। [সুকুমার বাবু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সরকারী কর্ম্ম ছাড়িয়া ১৯৩৮ সনে বিশ্বভারতীর পল্লীউন্নয়ন বিভাগের কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার অবসর গ্রহণের অল্পকয়েক বৎসর মাত্র অবশিষ্ট ছিল। দেশসেবায় তাঁহার এতাদৃশ ত্যাগ-স্বীকার কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি দেশের কথা ভাবিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ জলাভাব ও সেচের অব্যবস্থা। আর ইহার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে সেচোপযোগী পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার দ্বারা। সুকুমার বাবু অসুস্থ অবস্থায়ও এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন এবং আলাপ-আলোচনা চালান। বাঁকুড়ার তিনি আদর্শ সুসন্তান ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে তিনি বাঁকুড়া সম্মিলনীর ও বাঁকুড়া উন্নয়ন সমিতির সভাপতি ছিলেন। সংস্কৃত সহিত্য সুকুমার বাবুর বড় প্রিয় ছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও তাঁহার গভীর প্রবেশ ছিল।

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

১৮৮৬ সনে শ্যামবাজারের বিখ্যাত ঘোষ-পরিবারে কান্তিচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

যুক্ত ছিলেন। তিনি পরে বঙ্গীয় আইন-পরিষদের রিপোর্টার ও লাইব্রেরিয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কবিতা, গল্প প্রভৃতি লিখিতেন। তৎকৃত ওমর খৈয়ামের সুললিত বঙ্গানুবাদ সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিগত ১৭ই মে কালিম্পঙে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

প্রিয়দা দত্ত

বাংলার বিশিষ্ট জননায়ক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা প্রিয়দা দত্ত বিগত ২৩শে মে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনের কলিকাতা শাখার সহ-সভানেত্রী ছিলেন। নারী-আন্দোলনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং কলিকাতা, দিল্লী ও কুমিল্লায় বহু নারী-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি পতির সঙ্গে কারা-বরণ করিয়াছিলেন। গত ১৯৩৭ সনে তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন।

নটী

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রাইসট্যাগ শহর—যুদ্ধের পূর্ব্বে

যুদ্ধোত্তর রাইসট্যাগ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
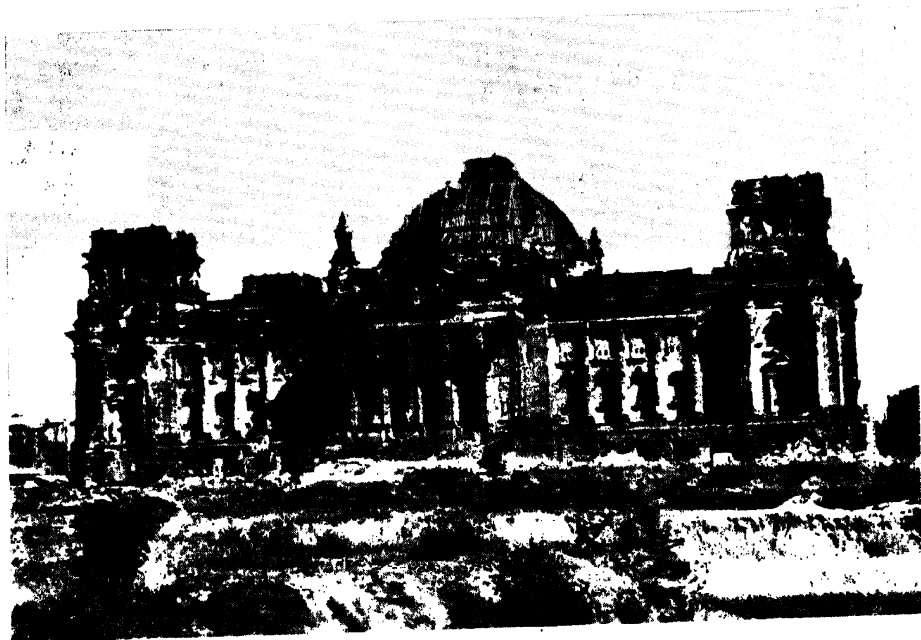
৪৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৫৫

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতার প্রথম বৎসর

স্বাধীনতার প্রথম বৎসর শেষ হইতে চলিয়াছে। এই বৎসরের হিসাব-নিকাশের এখনও সময় হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কি সন্দেহ আছে যে এই বৎসরের মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যে ঝড়-ঝঞ্ঝার, যে বিষম অনাচারের স্রোতের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার তুলনা ভারতের ইতিহাসে অতি অল্পই আছে? আজ দেশ যে দুরাচারদিগের কবলে পড়িয়া অতিশয় শঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে রহিয়াছে তাহারা সকলেই ঘরের শত্রু, সকলেই এদেশের মাটিতে জন্ম ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এখন আর বিদেশীর উপর দোষারোপ করিয়া নিজের মনকে ভুলাইবার উপায় নাই। স্বাধীনতার যে উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সকলেরই মানসচক্ষের উপর এত দিন ছিল, আজ বাস্তবের কঠোর সঙ্ঘাতে তাহা মৃগতৃষ্ণিকার মত ক্রমেই দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যাইতেছে কেন?

কারণ প্রধানতঃ দুইটি, প্রথমতঃ স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এবং রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ যাঁহাদের হস্তে আমাদের দেশের শাসন ও পরিচালনের ভার রহিয়াছে তাঁহাদের অনেকের নিদারুণ নৈতিক অবনতি। স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচারের মধ্যে এবং স্বাধীনতা ও স্বার্থসিদ্ধির মধ্যে প্রভেদ বুঝেন আমাদের মধ্যে এরূপ লোক এক লক্ষে এক জনও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এত দিন আমাদের বিশ্বাস ছিল যে কংগ্রেস নেতৃবর্গ এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সজাগ; আজ তাঁহাদের অধিকাংশের চরম অধঃপতনের পরিচয় পাইয়া আমাদের চমক লাগিতেছে। জনসাধারণের তো কথাই নাই, চতুর্দ্দিকে স্বাধীনতার নামে যে সকল যুক্তি-তর্ক শুনা যায়, যেরূপ কার্য্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ছয় শতাব্দী ব্যাপী দাসত্বের ফলে আমরা স্বাধীনতার অর্থে বুঝিয়াছি স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ ও প্রবঞ্চনার সুযোগ, স্বাতন্ত্র্য অর্থে বুঝিয়াছি ফাঁকি দিয়া কার্য্যসিদ্ধির সুযোগ। স্বাধীনতা বিনামূল্যে পাওয়া যায় না একথা আমাদের বুঝাইবে কে এবং স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য যে আমাদের সদাসর্ব্বদা সজাগ হইয়া থাকিতে হইবে ইহাই বা বলিবে কে? ইংরেজীতে যে প্রবাদ আছে "Eternal vigilance is the price of Liberty."—"স্বাধীনতার মূল্য অবিশ্রান্ত সজাগ-সতর্কতা"—ইহা আমাদের সকলেরই সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

ঘুষ, চোরাকারবার এবং শাসনতন্ত্রের অবনতির ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে যে কলুষ চতুর্দ্দিক কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার প্রতিকারে কয়জন প্রকৃতপক্ষে চেষ্টিত? প্রায় সকলেই উহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্রামের সময় পরনিন্দায় আনন্দলাভ করেন, কেহ কেহবা স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্ররূপে উহাকে আশ্রয় করিয়া পরের অনিষ্টের ব্যবস্থা করেন। কদাচিৎ একজন দেখা যায়, যিনি নিজে সচেষ্ট হইয়া উহার প্রতিকারের বিষয়ে চিন্তা করেন। দেশ জাগ্রত হইলেও চোরাকারবার, ঘুষ ইত্যাদি বন্ধ করা যায় না ইহা অবিশ্বাস্য কথা। এক জনের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, দশ জনের চেষ্টাতেও ফল না ফলিতে পারে, কিন্তু শত সহস্র লোকের মিলিত চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে না, ইহা স্বাধীন দেশে সম্ভব নয়। আসলে আমরা এখনও সমষ্টিগত ভাবে দেশের ও নিজেদের প্রগতির বিষয় চিন্তা করিতেই শিখি নাই।

নেতৃবর্গের উপর নির্ভর করিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। ইংরেজ অভিধানকার জনসন অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক দুঃখে লিখিয়া গিয়াছিলেন, "Patriotism is the last resort of a scoundrel"—"দুর্বৃত্ত নরাধমের শেষ আশ্রয় দেশভক্তি"—এবং ঐরূপ লেখার ফলেই বোধ হয় ইংরেজ পরে জগতে অত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল। আজ আমাদের ঐ কথা মনে রাখিয়া যাঁহারা দেশভক্তির ও "ত্যাগ" নামক পরশপাথরের সাহায্যে আমাদের কর্ণধার হওয়ার দাবী করিতেছেন তাঁহাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ-স্বরূপ সেই দলের কথা বিচার করা যাউক যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের লোকজনকে বিপদে ফেলিয়া পশ্চিম বঙ্গের "গদী" দখলের চেষ্টায় ব্যস্ত—বলা বাহুল্য, প্রকৃত দেশপ্রেমী ও ত্যাগী যাঁহারা তাঁহাদের প্রায় সকলেই পূর্ব্ববঙ্গেই থাকিয়া স্বদেশবাসীর পরিত্রাণের চেষ্টা করিতেছেন—ইঁহাদের ব্যবহারে ও কার্য্যকলাপে দলগত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণ ভিন্ন অন্য কিছুর পরিচয় পশ্চিম বঙ্গের লোক কোনও দিন পায় নাই। আজও ইঁহাদের যদি পশ্চিম বঙ্গের লোক না চিনে তবে এদেশের উদ্ধারের

আশা কম। ইঁহাদের মুখে আজকাল এক নূতন যুক্তি শুনা যাইতেছে যে, ইঁহাদের "ত্যাগ" না থাকিলে, পশ্চিম বঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না, সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের লোকের ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ উচিত ইহাদের কাছে দাসখত লিখিয়া দেওয়া। "ত্যাগ" কি করিয়াছেন সে প্রশ্নের উত্তরে শুনা যায় যে ইঁহারা যে দয়া করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় ভোট গ্রহণ-কালে বঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গের ভারতরাষ্ট্রে যোগ-দানে বাধা দান করেন নাই, তাহাতেই উঁহারা ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে ইঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের আত্মীয়স্বজনকে যেভাবে ভাসাইয়া দিয়া স্বার্থচিন্তায় বিভোর রহিয়াছেন, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের লোকের ইঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে ইঁহারা ঐ চরম বিশ্বাসঘাতকতার লোভ সম্বরণ করিয়া, "নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ" করেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু বাঙালীর দুঃখ-সুখের চিন্তা আমাদের সর্ব্বদাই করা কর্ত্তব্য, আত্মীয়তার জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য, কিন্তু তাঁহাদের এই যে রাষ্ট্রনৈতিক চোরাকারবারী নেতৃবর্গ—যাহারা সুদিনে তাঁহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং দুর্দ্দিনে তাঁহাদের মাথায় পা দিয়া জলা পার হইয়া পশ্চিম বঙ্গের ডাঙ্গায় উঠিতে ইচ্ছুক—তাঁহাদের প্রতি আমাদের প্রকৃত দায়িত্ব কি তাহা সকলেরই বুঝা উচিত। পশ্চিম বঙ্গ না বাঁচিলে না বাড়িলে বাঙালী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে একথা সকলেরই বুঝিতে হইবে। দেশে যে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল নিয়ম-বিরোধিতা চলিয়াছে, তাহা যে চরম দেশদ্রোহিতার পরিচয় ইহা সকলেরই জানা প্রয়োজন। দেশের লোক যদি বাঁচিতে চাহে তবে এখনই এই অনাচারের স্রোতে বাঁধ দিতে কর্ত্তৃপক্ষকে আহ্বান ও সাহায্য করা প্রয়োজন।

স্বাবলম্বী বাঙালী

গত বার বৎসর যাবৎ বাঙালীর উপর দিয়া সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত এই ঝঞ্ঝায় ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবন প্রায় ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র এবং প্রত্যেকটি নিত্য-ব্যবহার্য্য শিল্পদ্রব্যের জন্য বাঙালী পরমুখাপেক্ষী। বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার সমগ্রভাবেই ভিন্ন প্রদেশীয়দের হাতে চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের হাতে তেল, ঘি প্রভৃতির ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে চলিয়া যাওয়ার ফল হইয়াছে এই যে ভেজাল খাদ্যে বাঙালীর জীবনী-শক্তি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; দুধের ব্যবসা অবাঙালীর হাতে চলিয়া যাওয়ায় উহাতেও যে ভেজাল চলিতেছে তাহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। ভেজাল দুধ এবং ভেজাল খাদ্যের দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশীয় বাঙালীকে ক্ষীণজীবী ও পঙ্গুপ্রায় করিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার পথ প্রশস্ত হইতেছে। বাংলার যে মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল তাহাই মরণের পথে দাঁড়াইয়াছে। স্বদেশীর নামে কষ্টস্বীকার ইহারা করিয়াছে, তাহার লাভ কুড়াইয়াছে অবাঙালী ধনীর দল। দীর্ঘস্থায়ী দুর্মূল্যের বাজারে এবং ভেজাল খাদ্যে মধ্যবিত্ত, বিশেষতঃ নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে একটু কঠিন রোগের ধাক্কা সামলাইবার শক্তি তাহার আর নাই, আগেকার দিনে যাহাকে সাধারণ রোগ বলা হইত এখন তাহাতেই অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিতেছে। যক্ষ্মা তো প্রায় ঘরে ঘরে।

বাঙালী জাতিকে বাঁচাইতে হইলে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশকে সর্ব্ববিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পশ্চিম বঙ্গে যে জমি আছে তাহার সবটা যদি ভাল ভাবে চাষ হয়, কৃষকেরা যদি ভাল বীজ, সার এবং অল্প সুদে প্রয়োজনানুযায়ী ঋণ পায়, সেচ-ব্যবস্থার যদি উন্নতি হয়, তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে। র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ডে পশ্চিম বঙ্গের আয়তন এমন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বাঙালীকে গ্রাম্য জীবনের পরিবর্ত্তে এখন শহরকেন্দ্রিক শিল্পজীবন অবলম্বন করিতে হইবে। এই পরি-বর্ত্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়া এখন হইতে উহাকে রূপ দিবার জন্য পরিকল্পনা আরম্ভ করা দরকার। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এখনও এ বিষয়ে কোন পরিকল্পনা আরম্ভ পর্য্যন্ত হয় নাই। প্রতি জেলায় একটি করিয়া সুতাকল বসাইয়া তাঁতে কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা করিলে বাঙালীর বস্ত্রসমস্যা ঘুচিয়া যায়, বহু লোকের কর্ম্মসংস্থানও হয়। বস্ত্র উৎপাদনের দায়িত্ব মুষ্টিমেয় কয়েকজন মিল-মালিকের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া উহা বহু জনের মধ্যে ছড়াইয়া সমবায় নীতিতে বণ্টন করিয়া দিলে এখনকার ন্যায় রক্তচোষা জুয়াচোর বস্ত্রব্যবসায়ীর সৃষ্টিও হইতে পারিবে না। বাংলার বড় বড় শিল্পগুলি এতদিন ছিল ইংরেজের হাতে, এখন ঐগুলি ক্রমে অন্য প্রদেশীয় লোকে কিনিয়া লইতেছে; উহা আশু বন্ধ হওয়া দরকার। কাপড়ের এবং খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা মাড়োয়ারীদের এবং দুধের ব্যবসা অবাঙালীদের একচেটিয়া অধিকার থাকা অত্যন্ত বিপদজনক। পশ্চিম বঙ্গের পরিত্রাণের পথ সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানের গঠন এবং শিল্পকেন্দ্র-গুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা—বাঙালী জাতিকে বাঁচাইতে হইলে এ কাজ করিতেই হইবে।

অভিজ্ঞ, দূরদর্শী এবং উপযুক্ত লোক লইয়া অবিলম্বে একটি অর্থনৈতিক বোর্ড গঠন করিয়া বাঙালীকে স্বাবলম্বী করিবার উপায় নির্দ্ধারণের ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করা উচিত। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা বাঙালীর স্বাবলম্বনের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলে এবং উহা কাজে পরিণত হইলে বাঙালীর বাঁচিবার উপায় হইবে। কাজটা কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু মোটেই অসম্ভব নহে। তবে ইহা ঠিক যে, এ বিষয়ে যতই অবহেলা করা হইবে কাজ ততই কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিবে।

কংগ্রেস গবর্মেণ্টের ভিতরে ও বাহিরে

শ্রীকিশোরীলাল মশরুওয়ালা সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস গবর্মেণ্টের যে সমালোচনা করিয়াছেন দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিতেছেন যে যাহারা

কংগ্রেস কমিটিসমূহে পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং যাহারা তাহার বাহিরে আছে তাহাদের উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সদ্ভাবপূর্ণ নহে। গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের ও প্রতিষ্ঠানেরভিতরে যে কংগ্রেস কাজ করিতেছে এবং বাহিরে যে কংগ্রেস কাজ করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধও মোটেই সদ্ভাবপূর্ণ নহে। প্রত্যেক শ্রেণীই অপর দুই শ্রেণী সম্বন্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। এই সকলের বাহিরে আরও দুই শ্রেণীর কংগ্রেসের লোক আছে। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণী স্বাধীনতা অর্জ্জন ও ন্যায়নিষ্ঠ নিষ্কলঙ্ক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যৌবনের প্রারম্ভে আন্তরিক আগ্রহ ও আনুগত্যের সহিত কংগ্রেসের কাজ করিয়াছে। স্বাধীনতালাভের দ্বারা তাহাদের মনে শান্তি ও আনন্দ আসে নাই বরং তাহারা অসুখী ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে; কারণ যে মহান্ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার কাজে তাহারা সাহায্য করিয়াছে সেই কংগ্রেস ক্ষমতা লাভ করিয়াই জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছে এবং যে সকল উচ্চ আদর্শের কথা পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছে আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির জন্য তদনুযায়ী কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহারা অতি বেদনাহত চিত্তে চোখের সম্মুখে দেখিতেছে যে কংগ্রেস এখন স্বার্থসিদ্ধির ও ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল-উপদল গঠনের সুবিধাজনক যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন আর নিজেরা সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে না কিন্তু চারিদিকে দুর্নীতির বিস্তার দেখিয়া শান্তিতে বিশ্রাম করিতেও পারিতেছে না। দ্বিতীয় শ্রেণী সাধারণ লোক; তাহারা এদল ওদল লইয়া মাথা ঘামায় না। তাহারা চায় ন্যায়নিষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট, ভদ্র ব্যবহার, জনসাধারণের আবেদন নিবেদন সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা এবং দুর্নীতিবিহীন শাসন পরিচালনা যাহাতে জনসাধারণের সুখসুবিধা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই সকল বিষয়ে জনসাধারণ কোন উন্নতি দেখিতে পাইতেছে না এবং তাহাদের ধারণা জন্মিতেছে যে অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে আরও মন্দের দিকে চলিয়াছে। ইহার ফলে কংগ্রেসের নাম লোকের নিকট দিন দিন অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

গবর্ণমেণ্টের ভিতরের কংগ্রেসকর্ম্মী এবং কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মীদের মধ্যে বিরোধ কেন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং একটা দ্বৈত শাসন কেন দেখা দিতেছে শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা তাহা অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন—

"কংগ্রেসের যাহারা গবর্ণমেণ্টের ভিতরে আছে আর যাহারা বাহিরে আছে, তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষভাবের প্রধান কারণসমূহ এইরূপ বলিয়া আমার মনে হয়।

"যে লোক গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদ অধিকার করিয়া আছে, সে লোক দায়িত্বের বোঝা ততটা অনুভব না করিয়া তাহার পদকে অর্থ ও মর্য্যাদা লাভের উপায়স্বরূপ মনে করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক পদে ও গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত কমিটির প্রত্যেক স্থলে, ভাতা, মাহিনা, অন্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া, চাকুরী প্রদানের ক্ষমতা কিম্বা অন্যের দ্বারা নিজের কিছু কাজ করাইয়া লওয়া—যে কাজ গবর্ণমেণ্টের পদ অধিকার করিয়া না থাকিলে আদায় করা যায় না—এই সমস্ত সুযোগ আছে। তাহাকে যে সকল কাজ করিতে হয় তাহা অপেক্ষাকৃত হালকা আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেখানে দায়িত্ব বৃহৎ ও চরম সেখানে কংগ্রেস-পরিচালিত গবর্ণমেণ্টসমূহেও জা'ত ও সম্প্রদায় দেখিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। অথচ কংগ্রেস নীতি এই পদ্ধতিতে কর্ম্মচারী নিয়োগের বিরোধী। যখন কংগ্রেসের সমর্থন দেওয়া হয়, মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়, এমন কি অল্প সময়ের জন্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করা হয় সেই সকল ক্ষেত্রেই কোন্ ব্যক্তির কি যোগ্যতা আছে না আছে সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া, সেই ব্যক্তি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ও কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। দলকে মজবুত রাখিবার জন্য এরূপ প্রয়োজন হইয়া উঠে এবং প্রত্যেক চাকুরীই গোপন ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। চাকুরীর জন্য লালায়িত নহে এরূপ লোক খুব অল্পই আছে এবং যদিও চাকুরীর প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে তথাপি যত লোক আশা করিয়া থাকে চাকুরীর সংখ্যা তত নয়, ফলে যাহারা চাকুরী পায় না তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যলাভে ব্যর্থ হইয়া ইহারা কংগ্রেস কমিটিসমূহের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে স্থান করিয়া লইবার চেষ্টা করে এবং কংগ্রেসের যাহারা গবর্ণমেণ্টের কাজে নিযুক্ত আছে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে পরিচালিত করে। এই প্রকারে এক রকম দ্বৈত শাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। কংগ্রেসের যাহারা গবর্ণমেণ্টের অভ্যন্তরে আছে কংগ্রেস কমিটিগুলি তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চায়, আর যাহারা গবর্ণমেণ্টের অভ্যন্তরে আছে তাহারা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিতে চায়।"

রাজনৈতিক কারণে উচ্চপদে প্রিয়পাত্র নিয়োগ দেশের পক্ষে যে কি ভয়ানক ক্ষতিকর "spoil system" প্রবর্ত্তন করিয়া আমেরিকা তাহা বুঝিয়াছিল এবং এখন উহা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ভাবে কর্ম্মচারী নিয়োগের নীতি অবলম্বন করিয়া নিজের শাসনযন্ত্র সুদৃঢ় করিয়াছে। আমাদের দেশে কংগ্রেস ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার পরিত্যক্ত এই spoil system চাকুরিক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তার ফলে উচ্চপদে অযোগ্য লোক নিয়োগ করিয়া শাসনযন্ত্রের দক্ষতা যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা রসাতলে দিয়াছেন ও দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। পাবলিক সার্ভিস ট্রিবিউনাল কর্ত্তৃক প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার দ্বারা নিরপেক্ষ ভাবে নিছক যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ ও প্রমোশনের নীতি প্রবর্ত্তিত হইলে শাসনযন্ত্রের দক্ষতা বাড়িবে, গবর্ণমেণ্টের ভিতরের ও বাহিরের কংগ্রেস কর্ম্মীদের বিরোধের মূল কারণটি দূর হইবে এবং ইহাতে শাসনযন্ত্রের ব্যয়ভারও অনেক কমিয়া আসিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় কংগ্রেস এই ন্যায়ানুগ ও কল্যাণকর নীতি এখনও প্রবর্ত্তন ও পালন

করিতে চাহেন না, খসড়া রাষ্ট্রবিধিতেও এখানকার ন্যায় পাবলিক সার্ভিস ট্রিবিউনালকে এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। কংগ্রেস কমিটিগুলিতে বর্ত্তমান দলাদলি যে এত বাড়িয়াছে তার একমাত্র কারণ মন্ত্রিত্ব ও চাকুরির লোভ। ইহারই জন্য কংগ্রেস সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে জনসাধারণের সম্মুখে আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। যাহারা এখন বড় হইয়া উঠিতেছে, যাহাদের বয়স উনিশ-বিশ বৎসর হইতে চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই ধারণা জন্মিতেছে যে কংগ্রেস অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে ইহা আর যুবকদের যোগদান করিবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নাই। শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা এই কথা বলিয়া বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতাদের সতর্ক করিয়া দিয়া মন্তব্য করিতেছেন যে যদি কংগ্রেস নিজের দোষ দূর না করে তবে ইহা কয়েকটি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির পয়সায় পোষা লোকের সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

ট্যাক্স ফাঁকি

ভারতের যে সমস্ত কোটিপতি আয়কর ফাঁকি দিয়া বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি আয়কর তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছে। সর্ এস বরদাচারী কমিশনের সভাপতি। গত বাজেট-বক্তৃতায় অর্থসচিব শ্রীষন্মুখম চেট্টি বলিয়াছেন যে সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি না দিলে কাহারও পক্ষে কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব নহে। আয়কর কমিশন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনকুবেরদের নামের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তালিকায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহাদের সম্পত্তি যুদ্ধের পূর্ব্বে কি ছিল এবং এখন উহার পরিমাণ কি তাহা জানাইবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমেদাবাদ, বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, কোয়েম্বাটুর, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ এবং আজমীঢ়ে প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। যাহাদের অভিযোগ আয়কর তদন্ত কমিশনের বিচারের জন্য দেওয়া হইয়াছে তাহার কয়েকটি তুলিয়া লওয়া হইবে বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। ভারতের কয়েকটি সবচেয়ে বড় ধনকুবের পরিবারের অনেকগুলি নাম তদন্ত কমিশনের তালিকায় আছে এবং ইঁহাদের সম্বন্ধে তদন্ত স্থগিত রাখিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া সাধারণের মনে একটা ধারণা জন্মিতেছে। এই ধারণা যত শীঘ্র দূর করিয়া দেওয়া হয় ততই মঙ্গল।

শুধু আয়কর নয়, বড় বড় ধনকুবেরগণ প্রাদেশিক ক্রয়শুল্ক ফাঁকি দিতেও সমান আগ্রহশীল এরূপ সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ এক গোষ্ঠীর প্রায় ৬৮টি কোম্পানী আছে; তার মধ্যে কয়েকটি বড় বড় কারবার কলিকাতায় আছে। ইহাদের নিকট হইতে ক্রয়শুল্ক যথারীতি আদায় হইতেছে না বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আমাদের আছে। এই শ্রেণীর বৃহৎ কারবারগুলি হইতে যথারীতি ক্রয়শুল্ক আদায় হইলে বাজেটে আদায়ের পরিমাণ যাহা ধরা হইয়াছে তাহা হইতে অনেক বেশী আদায় হওয়ার কথা। এই সব কোম্পানীর ব্যালান্স শীটে উৎপাদনের পরিমাণ যাহা দেখানো হয় তাহা সঠিক কিনা বলা কঠিন, তথাপি উহার উপরও ক্রয়শুল্ক ধার্য্য হইলে টাকা অনেক বেশী আদায় হওয়ার কথা। এখন আইন যাহা আছে তাহাতে খাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া পার পাওয়া কঠিন নয়। অবিলম্বে এই মর্ম্মে অর্ডিনান্স জারী করা উচিত যে প্রত্যেক কোম্পানী তাহাদের পাঁচ বৎসরের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবের খাতা রক্ষা করিতে এবং প্রয়োজন মাত্র সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে। ম্যানুফ্যাকচারিং একাউণ্ট শাখা আপিস মারফৎ বিক্রয়ের হিসাব এবং ফাটকাবাজির হিসাব লুকাইয়া সরকারের ট্যাক্স এবং অংশীদারের লভ্যাংশ ফাঁকি দেওয়ার জন্য ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত কোম্পানীগুলির আগ্রহ এত বেশী যে খাতা গোপন করিবার জন্য ইঁহারা অত্যন্ত উদগ্রীব। শুধু জরিমানার ভয় দেখাইয়া ইহাদিগকে খাতা বাহির করিতে বাধ্য করা যাইবে না, ইহার জন্য কঠোর কারাদণ্ডের বিধান আবশ্যক। এইরূপ অর্ডিনান্স করা হইলে আয়কর এবং ক্রয়শুল্ক উভয় বিভাগেরই আয় বাড়িবে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে ল্যাণ্ড কাষ্টমসের বিবেকবান কর্ম্মচারীরা ট্রেন তল্লাসী করিতে গেলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার বাধা দেন একথা প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমরাও লিখিয়াছি। ক্রয়শুল্ক বিভাগেও বড় কারবারিয়াদের বাঁচাইবার জন্য এরূপ হইতেছে কিনা তাহা দেখা দরকার।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার

কয়েক দিন হইল পশ্চিম বঙ্গের গবর্মেণ্ট আটা, ময়দা ইত্যাদির দাম প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ বাড়াইয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পাউরুটির কথা বলা যায়—আধ সের ওজনের রুটির দাম ছিল ।/০ ; হইয়াছে ।।০। এই মূল্যবৃদ্ধির অজুহাত দেওয়া হয় যে বিদেশ হইতে গম ও আটাময়দা খুব বেশী দামে কিনিতে হয় এবং আমাদের প্রদেশে বিক্রয় করিতে হয় কম দামে; এই ব্যবসায়ে প্রায় ৪ কোটি টাকা বৎসরে ক্ষতি হয়। কত দামে কেনা হইয়াছিল তাহা না জানিলে, এই হিসাব গ্রহণ করা যায় না। গম, আটাময়দার আসল দাম; জাহাজ ভাড়া, রেল ভাড়ার খরচ; গুদাম ভাড়ার খরচ; কর্ম্মচারিবৃন্দের অসাবধানতায় শস্যের ক্ষতি—এই সব এই হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। এরূপ হিসাব না দেখাইয়া সরবরাহ বিভাগের খেয়াল মত দাম ধার্য্য করিলে তাহার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। কারণ কাপড় ও চিনি লইয়া যে খেলা চলিতেছে, তাহার সঙ্গে গবর্মেণ্টের নানা বিভাগের যোগাযোগ না থাকিলে ইহা কখনও সম্ভব হইত না।

পাঁচ-ছয় মাস পূর্ব্বে চিনির জন্য আমাদের দিতে হইত

সেরপ্রতি ॥৵১০ আনা ; এখন দিতে হয় ১/০, ১৷৵০ আনা। কাপড়ের বাজারে শুধু ফাট্‌কাবাজী চলিয়াছে ; তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট দাম নাই। গত মে মাসের ৮ তারিখে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন মিলে যে ধুতি জোড়া বিক্রয় হইত ৫৷৵১০ আনায়, ৯ই মে তারিখে তাহা বিক্রয় হইয়াছিল ১০৷৵১০ আনায়। তারপর কাপড়ের বাজারে যাহা হইয়াছে তাহা আমাদের হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়া দিয়াছে "স্বদেশী ভাবের" মূর্খামি। গবর্মেণ্ট প্রায় আড়াই মাস এই গলা-কাটা দৃশ্য দেখিয়াছেন দ্রষ্টারূপে, বেদান্তের ব্রহ্মরূপে। এই গলা-কাটাগিরি ন্যায্য বা অন্যায্য তাহা স্থির করিবার ভার শুল্ক সমিতির (Tariff Board) উপর দিয়া কিছু সময় কাটাইলেন ; এই সুযোগে কাপড়ের কলের মালিক ও ব্যবসায়ীরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা আমাদের গলা টিপিয়া ট্যাঁকে পুরিলেন। এখন শুল্ক সমিতি নাকি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বর্ত্তমানে কাপড়ের কলে যে দাম আদায় হইতেছে তাহা "অত্যধিক ও অন্যায়" ("exhorbitant and unjustified")। গত জানুয়ারী মাসের তুলনায় মোটা কাপড়ের দাম শতকরা ৫০ ভাগ, মাঝারি কাপড়ের দাম শতকরা ৭৫ ভাগ ও মিহি কাপড়ের দাম শতকরা ১০০ ভাগ অধিক। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের মন্ত্রিমহোদয়গণ কাপড় কিনেন না ; খাদি পরেন। কাপড়ের দাম যে চড়িতেছে তাহার খবর তাঁহাদের কানে পৌঁছিতে কত সময় লাগিয়াছিল জানি না। কিন্তু জনসাধারণ শুল্ক সমিতির হিসাব-নিকাশ না দেখিয়াই কাপড়ের কলের মালিকের ও ব্যবসায়ীর ডাকাতিটা বুঝিতেছিল।

কাপড় ও চিনি সম্বন্ধে বিদেশ হইতে আমদানীর অজুহাতটা চলে না। কিন্তু আমাদের সরবরাহ বিভাগগুলির কল্যাণে একটা অজুহাত খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে। তাহাদের পেছনে পুলিশ ও মিলিটারি আছে ; তাহার জোরে আমাদের ঘাড়ে যাহা ইচ্ছা তাহাই যে চাপাইয়া দেওয়া চলে তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে চিনি ও গুড় মজুত হইয়া যাইতেছিল ; তাহাদের দাম কমিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। আমাদের সদাশয় সরকার বাহাদুর হুকুম দিলেন— "চালাও এসব বিদেশে ; দেশের লোকে বেশী দাম দিয়া কিনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যখন তখন দাম কমিতে দেওয়া হইবে না ; বিদেশে চালান দিতে পারিলে দাম কমাইবার কোন কথা উঠিবে না।" এই ত অবস্থা। কৌপিনবস্ত হইয়া থাকিতে হইবে ; আধপেটা খাইয়া থাকিতে হইবে। আর দিল্লী কলিকাতায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা "স্বাধীনতার" শ্লোগান তুলিয়া আমাদের বুদ্ধিকে করিবেন বিভ্রান্ত ; চোরাকারবারীরা আমাদের পকেট মারিবে ; আর আমাদের সরকার বাহাদুর ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিবেন। আছি বেশ! কোন অন্যায়ের প্রতিকারের কথা দুরাশা ছাড়া কিছু নয়।

পাকিস্থানে চোরাই চালান

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদপত্রে পত্র লিখিয়া পাকিস্থানে কাপড় চালানের একটি বিবরণ দিয়াছেন। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত উহা হুবহু মিলিয়া যায়। বে-আইনি চালান কি ভাবে কোথা দিয়া হয় এতদিনে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাইয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে এই চোরা কারবার সপ্তাহ কালের মধ্যে বন্ধ করা অসম্ভব কাজ নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বহু আন্দোলন সত্ত্বেও সরকার ইহা নিবারণের জন্য কোন আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন না বরং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া এই পাপের প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছেন। শিয়ালদহ হইতে বেনাপোল পর্য্যন্ত কি কৌশলে কাপড় চালান যাইতেছে প্রত্যক্ষদর্শী ভদ্রলোকের বিবরণ হইতে তাহা সুন্দর ভাবে জানা যায়। গ্রীষ্মাবকাশে তিনি পাকিস্থানের পল্লীভবনে যাইতেছিলেন ; সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ ষ্টেশনের ভীড়ে সাধারণ যাত্রীদের ফটক অতিক্রম করাও দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু প্লাটফর্ম্মে ঢুকিয়া দেখা গেল বস্ত্রের পুঁটুলিধারী অসংখ্য নরনারী পূর্ব্বে সুকৌশলে প্রবেশলাভ করিয়াছে। শুল্ক-বিভাগের কর্ম্মচারীদের প্রথম সাক্ষাৎ মিলিল কয়েকটি ষ্টেশন পার হওয়ার পর, শিয়ালদহ ষ্টেশনে নহে এবং তদন্ত আরম্ভ হইল বনগাঁ ষ্টেশনে। বনগাঁয় পৌঁছিবামাত্র প্রত্যক্ষদর্শী যে কামরায় ছিলেন সেই কামরা হইতেই পাঁচ-সাত জন লোক কাপড়ের বড় বড় বোঁচকা পিঠে করিয়া নামিয়া বিনা বাধায় অদৃশ্য হইয়া গেল। লক্ষ্য করিয়া তিনি দেখিলেন যে প্রত্যেক কামরা হইতেই এইরূপ কয়েকজন পাইকারী ব্যবসায়ী নামিয়া গেল। পাকিস্থানে প্রবেশ করিবামাত্র সমগ্র কামরাটি কর্ম্ম-চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভোজবাজীর ন্যায় নানা অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে কাপড়ের বাণ্ডিল বাহির হইতে লাগিল। যে সব ফেরিওয়ালা এতক্ষণ 'আশ্চর্য্য মলম' বা 'নকল দানা' বেচিতে-ছিল তাহারা থলি হইতে 'আসল দানা' চার-পাঁচ জোড়া ধুতি-শাড়ী বাহির করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দিল। বারো আনা যাত্রীই তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ লুঙ্গি খুলিয়া দেখাইল চার-পাঁচখানা কাপড় সুকৌশলে তাহারা পরিধান করিয়াই চলিয়াছে। অনেকে উলঙ্গ ও অর্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া লুক্কায়িত কাপড়ের বস্তা বাহির করিতে আরম্ভ করিল।

রেলের কামরাগুলি এতক্ষণে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের দর কষাকষিতে মুখরিত হইয়া ছোটখাট এক একটি বড় বাজারে পরিণত হইয়াছে। দেখা গেল ট্রেনের বারো আনা যাত্রীই এই মাল বেচাকেনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক পল্লীতেই বেকার দল রাতারাতি বড়লোক হইবার এই ফন্দীতে দলবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা প্রতি ট্রেনে দলে দলে কলিকাতায় আসে। যশোর হইতে আগত আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতার

ট্রেনে ছাদে ফুটবোর্ডে ও চাকার পাশের লোহার ডাণ্ডায় পর্য্যন্ত লোকের ভীড় দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে ইহারা 'স্মাগলার'—কাপড় আনিতে কলিকাতা চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে কাপড় কিনিয়া ইহারা পুলিস, শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারী এবং রেল-কর্ম্মচারীদের সহায়তায় গাড়ীতে কাপড় উঠায় এবং ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গাড়ীতেই বিক্রী আরম্ভ করে। বিক্রয়াবশিষ্ট মাল পল্লীগ্রামে পৌঁছে এবং সেখানে স্বর্ণমূল্যে বিক্রীত হয়।

খুলনা লাইনে এবং রাণাঘাট লাইনে এই চোরাকারবার নিরঙ্কুশভাবে চলিয়াছে। বেকার দল ছাড়া ইহার মধ্যে পুলিস, শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারী এবং রেল কর্ম্মচারীদের একটা বড় অংশ রহিয়াছে। রেলগাড়ীর তলায় বাঁধা অবস্থায় এবং ছাদের তক্তা সরাইয়া তাহার ভিতর হইতে কাপড় বাহির হওয়ার অর্থ রেল কর্ম্মচারীদের সক্রিয় সাহায্য; তাহাদের সহায়তা ভিন্ন ঐ সব স্থানে কাপড় প্যাক করা যাইতে পারে না। শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীরা কি ভাবে এই কুকার্য্যে সহায়তা করে তার একটা বড় দৃষ্টান্ত সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শিয়ালদহে শুল্ক বিভাগের লোক আছে; তন্মধ্যে দুই-তিন জন কর্ম্মচারী চোরাই মাল ধরিবার জন্য উদ্‌গ্রীব কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতেছেন। এই কর্ম্মচারীটি আদেশ দিয়াছেন যে সন্ধ্যা ৬টার পর কোন ট্রেনে তল্লাসী করাই চলিবে না, অথচ সন্ধ্যার পরেই শিয়ালদহ হইতে দার্জ্জিলিং মেল, ঢাকা মেল, খুলনা মেল প্রভৃতি বড় বড় ট্রেনগুলি ছাড়ে। শিয়ালদহে মোতায়েন শুল্ক বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সম্বন্ধেও গুরুতর অভিযোগ হইতেছে যে তিনি দুই-চারিটা ক্ষুদে লোক ধরিয়া বড় বড় কারবারিয়াদের পার করিয়া দিতেছেন। এই সমস্ত অভিযোগ দীর্ঘকাল যাবৎ হইতেছে কিন্তু তার কোন প্রতিকার আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। চোরাকারবারে লিপ্ত পুলিস, রেল এবং শুল্ক বিভাগের কতকগুলি বড় বড় কর্ম্মচারীকে ধরিয়া কঠোর শাস্তি দিলে যে কাজ হইত, সহস্র ইস্তাহার জারী করিলেও তাহার একাংশও হইবে না ইহা নিশ্চিত। এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত-খণ্ড হইতে পাকিস্থানে মাল চোরাই চালান যায় কিন্তু যশোর, খুলনা বা পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থান হইতে একটি সব্জী পর্য্যন্ত কেহ আনিতে পারে না। এ বিষয়ে পাকিস্থানের কর্ম্মচারী এবং নাগরিক উভয়েই সমান সতর্ক।

আসামে প্রাদেশিকতা

আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় বাঙালীর দ্বার ক্রমশঃ কি-ভাবে রুদ্ধ করিয়া আনা হইতেছে এবং বাঙালীর উদার-চিত্ততা ও আদর্শানুরাগের সুযোগ লইয়া কিভাবে ঐ তিন প্রদেশেরই লোক বাংলায় বসিয়া বাঙালীকে শোষণ ও অপমান করিতেছে তার কিছু কিছু আলোচনা আমরা করিয়াছি। নিজের প্রদেশে অপর প্রদেশের লোককে বসবাসের জন্য আসিতে না দেওয়া ঐ সব প্রদেশে সাধারণ নিয়মে পরিণত হইয়াছে কিন্তু বাংলা আত্মরক্ষার জন্য এবং নিজের বেকার-সমস্যা মিটাইবার জন্য বাংলাদেশের কাজে কর্ম্মে আগে বাঙালীর দাবি গ্রহণের কথা তুলিলেই বলা হয় বাঙালীর মন অতি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতায় ভরিয়া উঠিতেছে। এই কয়েক দিন আগেও আসামের নওগাঁ জেলায় পূর্ব্ব-বাংলা হইতে আগত কতক লোক খড়ের ঘর বাঁধিয়া বসবাসের চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন; গবর্মেণ্ট তাঁহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। একটি প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট অপর প্রদেশের লোক সেখানে আশ্রয়ের জন্য আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের ঘর জ্বালাইয়া বিতাড়িত করিয়াছে এ দৃষ্টান্ত বোধ হয় পৃথিবীর কোন অসভ্য দেশেও নাই। গৌহাটিতে বাঙালীদের উপর আক্রমণের কথা ছাড়িয়া দিলেও জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক" গানে আসামের নাম নাই বলিয়া একদল অসমীয়া গৌহাটি বেতার-ষ্টেশন উদ্বোধনের দিন ভারত-সরকারের নিমন্ত্রিত অতিথি দুইটি আমেরিকান মহিলাকে যেভাবে অপমান করিয়াছে তাহা তীব্র নিন্দার যোগ্য। এই লোকগুলির অতিশয় অসঙ্গত দাবি সমর্থন করিয়া এবং অতিথিদের অপমানের নিন্দা না করিয়া আসাম-সরকার যে প্রেসনোট দিয়াছেন প্রাদেশিকতাসূচক সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টান্ত হিসাবে তাহাও অতুলনীয়। আসামের এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে শ্রীরোহিণী চৌধুরী একটু শক্ত ভাষা প্রয়োগ করিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আসামের অন্যতম মন্ত্রী মৌলানা তায়েবুল্লা চৌধুরী মহাশয় বিবৃতিটির আপত্তি করিয়া শিলচরে বক্তৃতা করিয়াছেন। আসামে ৭৮ লক্ষ লোকের বাস। তন্মধ্যে মাত্র ২২ লক্ষ অসমীয়া এবং ইহারাই প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অলস লোক। আসামের প্রধান সম্পদ চা-বাগান ও পেট্রল। প্রায় সমস্ত বড় ও ছোট চা-বাগানের মালিক ইংরেজ; অতি অল্প কয়েকটি মাত্র অসমীয়া-দের হাতে। সমস্ত চা-বাগানের শ্রমিক সাঁওতাল, কোল, ভীল, মাদ্রাজী প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশের লোক; আসামের চা-বাগানে একটিও অসমীয়া শ্রমিক নাই। পেট্রল কোম্পানীর মালিক ইংরেজ, সমস্ত শ্রমিক আসামের বাহিরের লোক। আসামের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য মাড়োয়ারীদের হাতে। কৃষকদের মধ্যেও অধিকাংশই অসমীয়া নহে। তালুকদারী প্রভৃতি জমির উপস্বত্ব ভোগ করে অসমীয়ারা, কৃষি ব্যবসা বা শিল্প কোনটিতেই তাহারা পরিশ্রম করে না। এণ্ডি, মুগা, পাট প্রভৃতি রেশমের কাপড়ের ব্যবসা আসামে আছে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে পরিচালনা করে অসমীয়া স্ত্রীলোকেরা। স্ত্রী-

লোকেরা সেখানে পুরুষদের চেয়ে বেশী পরিশ্রমী এবং ঘরের বাহিরের কাজ তাহারাই বেশীর ভাগ করিয়া থাকে। চাকুরি ও বিনাশ্রমে জমির উপস্বত্ব ভোগ অসমীয়া পুরুষদের একমাত্র লক্ষ্য। আসামে আবাদী এবং গোচারণ ভূমি ছাড়া বহু লক্ষ বিঘা আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে। ঐ সব জমিতে প্রচুর আনারস, কলা প্রভৃতি ফল ফলিতে পারে, ঘাস তো প্রচুর আছে। কানাডার ন্যায় আসামে ফলের চাষ ও ডেয়ারী ফার্ম্ম গঠন করিয়া টিনের ফল ও টিনের দুধের বড় বড় ব্যবসায় গড়িয়া তোলা যায় কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম দরকার। অসমীয়ারা নিজেরাও ইহা করিবে না, জমি ফেলিয়া রাখিবে তবু বাঙালীকে আসিয়া উহা করিতে দিবে না। ইংরেজ, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল প্রভৃতি কাহারও বিরুদ্ধে অসমীয়ারা একটি কথাও বলে না, যত আক্রোশ তাহাদের বাঙালীর উপর। বাঙালী যাহাতে আসামে স্থায়ীভাবে বাস করিতে না পারে তাহার জন্য যত সতর্কতা সম্ভব সমস্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট তো বহু পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আসামে যে সময়ে বাঙালীদের ঘরে আগুন দেওয়া পর্য্যন্ত সুরু হইয়া গিয়াছে সেই সময়েও বাংলাদেশে অসমীয়ারা নির্ভয়ে এবং নির্ব্বিবাদে লেখাপড়া, চাকুরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন। আমরা এখানে অসমীয়াদের অসভ্যতার অনুকরণ করিতে বলি না কিন্তু এই দাবী করি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠোর হস্তে এখানে অসমীয়াদের প্রবেশ, ব্যবসা ও চাকুরি প্রভৃতি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন, যাহাতে অসমীয়াদের সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত হইতে পারে। বাঙালীর এই প্রচেষ্টাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না।

বিহারে প্রাদেশিকতা

বিহারে প্রাদেশিকতা যে কত নীচে নামিয়াছে সম্প্রতি শ্রীজগৎনারায়ণ লাল তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মানভূম, সিংভূম প্রত্যর্পণের বিরোধিতাকল্পে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে সুরু করিয়া সকল বিহারী নেতা এবং বিহার গবর্ণ্মেণ্ট যাহা করিতেছেন তাহাকেও অসমীয়া ও আসাম গবর্ণ্মেণ্টের ন্যায় বর্ব্বরোচিত আখ্যায় ভূষিত করা যাইতে পারে। পাটনায় বিড়লার কাগজ সার্চলাইট বাঙালীদের বিরুদ্ধে অসংযত ভাষায় বিষোদ্গার এবং কলিকাতায় বিহারীদের উপর ট্রামে, বাসে ও বাজারে ব্যাপক আক্রমণের মিথ্যা কাহিনী প্রচার করিয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে যাহাতে যে কোন সময়ে বিহারে বাঙালীদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড রকমের মারামারি আরম্ভ করিয়া দেওয়া যায়। মানভূম, সিংভূম প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে বাংলার দাবী ক্রমশঃ যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে এরূপ একটা গোলমাল বাধাইতে পারিলে উচ্চস্থানীয় নেতারা উহার সুযোগ লইয়া ইহার মীমাংসা ধামাচাপা দিতে পারিবেন। মানভূম, সিংভূম প্রত্যর্পণের দাবীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস-সভাপতি ও গণপরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলালের অভিমত আজ কাহারও অজানা নাই; সম্প্রতি গঠিত সীমানা-কমিশনে বাংলার দাবী কেন সুকৌশলে এড়ানো হইয়াছে তাহাও দুর্ব্বোধ্য নহে। পাটনার বিড়লা-পরিচালিত সংবাদপত্রই বা কেন বাঙালীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ও বিষোদ্গার করিয়া আসর গরম করিয়া রাখিতেছে তাহারও তাৎপর্য্য অনুমান করা কঠিন নয়। সীমানা-কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রীজগৎনারায়ণ লাল সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। নববঙ্গ সমিতির কয়েকজন সদস্য তাঁহার সহিত বঙ্গ-বিহার সীমানা লইয়া আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীজগৎনারায়ণ আসল কথা এড়াইয়া গিয়াছেন কিন্তু পাটনা ফিরিয়া গিয়াই বাঙালীকে প্রাদেশিক মনোভাব পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ বিহারী এসোসিয়েশন তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে এখানে নাকি বিহারীদের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক মনোভাব বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে এবং মারামারিও বেশ চলিতেছে। আমরা যত দূর জানি এটা নির্জ্জলা মিথ্যা এবং এই সব ধরণের প্রচার-কার্য্যের দ্বারা বাঙালীর উপর ভবিষ্যৎ আক্রমণের পথ পরিষ্কার করা হইতেছে। বাঙালীদের উপর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে সুরু করিয়া বিহারী নেতাদের মনোভাব বিহারে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রবর্ত্তনের সময় এবং বাঙালী-বিহারী সদ্ভাব সৃষ্টির জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু-প্রদত্ত লক্ষ টাকার ব্যাপারে বেশ ভাল করিয়াই দেখা গিয়াছে। এখন ত মানভূম ও সিংভূমে, পাটনায় ও রাঁচীতে উহা প্রত্যহ প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

বিহারে বাঙালী বিতাড়ন চলিতেছে কিন্তু বাংলায় লক্ষ লক্ষ বিহারী বিনাবাধায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে এবং সৎ অসৎ নানাবিধ উপায়ে অর্জ্জিত অর্থ মণিঅর্ডার করিয়া দেশে পাঠাইতেছে। বাংলা হইতে প্রাপ্ত মণিঅর্ডারের টাকা বিহারের সবচেয়ে বড় জাতীয় আয়। বিহারীরা এখানে কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ, রেলষ্টেশনে মুটেগিরি, রিক্সা টানা, ঠেলাগাড়ী চালানো, দারোয়ান ও সিপাহীর চাকুরী, দুধের ব্যবসায় প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করে। ইহারা ফুটপাথে বা আত্মীয় দারোয়ান থাকিলে পরের দালানে শোয় এবং ফুটপাথে রান্না করে; ঘরভাড়া ইহাদের লাগে না। সরকারের ট্যাক্স ইহারা সর্ব্বরকমে ফাঁকি দেয়। কাজেই ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙালীরা পারিয়া উঠে না; Rate war যেমন নিন্দনীয়, ফুটপাথে বাস করিয়া খরচা কমাইয়া ইহাদের এই অন্যায় প্রতিযোগিতাও ঠিক তেমনি আপত্তিজনক। বাংলাদেশে ইহাদের সংখ্যা ৩০ লক্ষের কম হইবে না। ইহারা নিজেদের ভাষা সম্পূর্ণরূপে বজায়

রাখে ; বাঙালী মনিব নীচে নামিয়া ইহাদিগের ভাষায় কথা বলেন কিন্তু বাংলা ভাষা শিখিতে ইহাদের বাধ্য করেন না। দেশে ইহারা বাঙালীকে ঠেঙ্গাইয়া হিন্দী বলায়, এখানেও বাঙালী inferiority complex বশতঃ হিন্দী বলে। ট্রামে বিহারী কণ্ডাক্টারকে বাংলায় কথা বলিতে বলিলে সে বলিয়াছে "আমার ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবে, তোমাদেরই এখানে হিন্দী বলিতে হইবে।" আত্মস্বার্থ এবং হিন্দীর প্রাধান্ত সম্বন্ধে অশিক্ষিত বিহারীদেরও যে মনোভাব প্রতি পদে ফুটিয়া উঠে তৎপ্রতিও বাঙালীর সতর্ক হওয়া দরকার। বিহারে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কঠোরভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে। বাংলায় বিহারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত কাজের জন্য লাইসেন্স এবং ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রবর্ত্তিত হওয়া একান্ত দরকার, ইহাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। Reciprocity বলিয়া একটি জিনিষ আছে এবং তাহা রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ডিগ্রী অনমুমোদিত করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৎক্ষণাৎ উহাদের ডিগ্রী সম্বন্ধে ঠিক সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই চৈতন্য উদ্রেক হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত ভারতবর্ষের ব্যবহার এখনও এই Reciprocity নীতির দ্বারাই চালিত হইতেছে। মাড়োয়ারী, উড়িয়া প্রভৃতি আরও যাহারা বাঙালীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধেও বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ও অন্যান্য কাজের জন্য ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রবর্ত্তিত হইলে উহাদেরও চৈতন্য সম্পাদনে বিলম্ব হইবে না।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

ভারতীয় গণ-পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠন সম্পর্কে একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। তার প্রথম অধিবেশন বসিবে আগামী ৩রা শ্রাবণ তারিখে। যুক্তপ্রদেশের দুই জন শ্রী এস্. কে. দার ও ডাঃ পান্নালাল ও বিহারের এক জন শ্রীজগৎনারায়ণ লাল, এই কমিশনের মূল সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিভিন্ন নূতন প্রদেশের গঠন সম্বন্ধে এই কমিশন অনুসন্ধান করিবেন। বর্ত্তমানে এই উপলক্ষে চারিটি প্রদেশের নাম শুনা যাইতেছে —অন্ধ্র, তামিল, কর্ণাটক ও মারাঠা। যদি এই প্রদেশ কয়টি রূপ গ্রহণ করে, তবে গুজরাটী ও মালয়লম-ভাষী লোকসমষ্টির জন্ত একটা পৃথক ব্যবস্থার আয়োজন করিতে হইবে। উপরোক্ত চারিটি প্রদেশ সম্বন্ধে যখন আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিবে, তখন তত্তৎ প্রদেশের প্রতিনিধি এই কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন ; এই প্রতিনিধিবর্গের নামও ঘোষণা করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিম বাংলার দাবী সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন না। ১৯১২ সালে আমাদের প্রদেশের যে কয়টি অংশ বিহারে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া পাইবার দাবী নূতন নয় ; গত পঁচিশ বৎসর নানা ভাবে ইহা জানানো হইয়াছে। ১৯১২ সালে বিহারী নেতৃবৃন্দ এই দাবীর যুক্তি মানিয়া লইয়াছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আজ সে কথা মনে করিতে চাহেন না। এই সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোন স্বীকৃতি যে আছে, তাহা তিনি ভুলিবার ভান করিতেছেন। কিন্তু লোকে তাঁহাকে জ্ঞানপাপী হইতে দিবে বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য দেখি যে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র স্তম্ভে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের এই স্বীকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৪ই জুন তারিখে প্রেরিত একটি পত্রে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরকার তাহা লোক সমক্ষে আনিয়াছেন। জ্যোতিষবাবু বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলা উদ্বাস্তু সমিতির সম্পাদক। এক সময়ে তিনি বিহার প্রদেশে সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন, বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন, পালামৌ জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।

জ্যোতিষবাবুর বক্তব্য হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

> "গত ১৯৩১ সালে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে মানভূম জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতির আসন হইতে আনীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—
>
> যে হেতু এই মানভূম জেলার শতকরা ৮৯ জন লোক বঙ্গ-ভাষায় কথা বলে, সেই হেতু যখন দেশ স্বাধীন হইবে এবং ভাষানুযায়ী প্রদেশ গঠিত হইবে, তখন এই মানভূম জেলা বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হইবে।
>
> বিনা বাধায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। যখন এই প্রস্তাব বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় রচিত হয়, তখন ইহার বিরোধিতা করেন ৺নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি বলেন দেশ যখন স্বাধীন হইবে তখন কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী এই জেলা ত বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হইবেই। সুতরাং এই প্রস্তাবের সার্থকতা নাই।"

১৯৩১ সালের পরে পৃথিবীর অনেক কিছু বদলাইয়া গিয়াছে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তিন-তিন বার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। গণ-পরিষদের সভাপতি হইয়াছেন ; কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীও হইয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনের এই নানা পরিবর্ত্তনে যদি তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু এই কথাটা পরিষ্কার

করিয়া সকলকে জানাইয়া দিলে, আমরা এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তাঁহার দু'মুখো নীতি অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। নববঙ্গ সমিতির সভাপতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাঁহার এক মূর্ত্তি, গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে তাঁহার ভিন্ন মূর্ত্তি। এইরূপ পোষাক পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে; নানা কারণে বাঙালী দু'ভাগ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসী বিধানমতে পশ্চিম-বাংলা ভারত-রাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। এই প্রদেশের লোকের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখাইলে রাষ্ট্রের কল্যাণ নাই; এই প্রদেশের লোকের উপর পূর্ব্ব সীমান্তরক্ষার ভার দিতে হইবে। সুতরাং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তাচ্ছিল্য করিলে চলিবে না। বিহারের অন্তর্গত বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের বঙ্গভুক্তি এই আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি প্রতীক।

"অসংযত প্রাদেশিকতা"

এই প্রসঙ্গে শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা "হরিজন" পত্রিকায় ২৭শে জুন (১৩ই আষাঢ়) সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রনিধানযোগ্য। বিহার সরকারের রাজস্ব বিভাগ ৪৮টি খনি-শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দ্দেশ দিয়াছে। মশরুওয়ালাজী তাহা উদ্ধৃত করিয়ছেন; নিম্নে তাহা দেওয়া হইল,—

পাটনা—১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮

• বিষয়: সিংভূম জেলার খনি-শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিহারীদের নিয়োগ সম্পর্কে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালকগণের প্রতি:

মহাশয়, প্রাদেশিক সরকারের খনিনীতির সর্ত্ত আপনার গোচরে আনিতে আদিষ্ট হইয়াছি। গবর্মেণ্ট একটি বোর্ড নিযুক্ত করিবেন। এই বোর্ডের সুপারিশক্রমে অ-শ্রমিকের চাকরিগুলিতে লোক লইতে হইবে, নহিলে কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায়কে ভবিষ্যতে ইজারা ('লিজ') দেওয়া হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে এই সকল প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ভাবে বিহারীদের এবং বিশেষভাবে স্থানীয় লোকদের ঠিক মত চাকরি দেওয়া হয় না। এ কথা সত্য যে বর্ত্তমান ইজারাদারদের উপর এরূপ কোন সর্ত্ত নাই। কিন্তু গবর্মেণ্ট ভাল করিয়াই বলিতে চান যে অতঃপর এই নীতি অনুযায়ী যেন কাজ হয়। নির্দ্দেশপত্র অনুযায়ী আপনি কি ব্যবস্থা করেন গবর্মেণ্টকে তাহা জানাইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইতি—

কর্ম্মসচিব

পত্রলেখক বলিতেছেন যে এই নির্দ্দেশপত্র বিহারী-দের স্বার্থের অনুকূলে বলা হইলেও আসলে বাংলা ভাষা-ভাষী সংখ্যাল্পগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই ইহা কাজ করিবে—ইহা তাহাদেরই বিরুদ্ধে অভিযান।

এইরূপ ইঙ্গিত করা পত্রলেখকের পক্ষে কতটা ঠিক হইয়াছে তাহা আমি জানি না। তবে এই কথা বলিতে পারি, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে যদি স্বীকৃত হয় যে প্রত্যেক ভারতবাসীর ভারতের যে কোন স্থানে বসবাস করিয়া স্থায়ী হইবার অধিকার আছে, তাহা হইলে সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই কর্ত্তব্যেরও উল্লেখ করিতে হয়, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গ (প্রদেশ) এরূপ কোন নীতির অনুসরণ করিতে পারিবে না যদ্দ্বারা সেখানকার কোন অধিবাসী তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকার্জ্জনের কাজ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। কংগ্রেস যে ধরণের প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের পরিকল্পনা করেন তাহাতে সেই গবর্মেণ্ট সেই প্রদেশে কার্য্যরত কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে কোন একটা বিশেষ শ্রেণীর লোক হইতে কর্ম্মচারী নিয়োগের নির্দ্দেশ দিতে পারেন কি না সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। এরূপ চেষ্টাকে আমি কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন ব্যাপারে ব্যবসায় পরিচালকগণের স্বাধীনতার উপর অযথা আক্রমণ বলিয়া মনে করি।

আজ পঁচিশ বৎসর যাবৎ বিহার প্রদেশে বাঙালীর বিরুদ্ধে যে অভিযান চলিয়াছে তৎসম্বন্ধে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে অনেক আলোচনা হইইয়াছে। এক রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যেরূপ ভাবে বিহারে, আসামে ও উৎকলে বাঙালীর সম্বন্ধে পার্থক্য করা হয়, তৎপ্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী সজাগ আছেন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বরং তাঁদের প্রশ্রয় পাইয়া এদের ব্যবহার এত উৎকট হইয়া উঠিয়াছে যে ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের কোন মূল্য আছে বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়। উৎকল ও বিহারের শাসক সম্প্রদায় ভুলিয়া গিয়াছেন যে বাংলাদেশের কল্যাণে যত লক্ষ উড়িয়া ও বিহারী জীবিকা উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন, তার এক-চতুর্থাংশ বাঙালী এই দুই প্রদেশে উক্ত উদ্দেশ্যে যান নাই। এই হিসাব হইতে বিহারের বাংলাভাষা-ভাষী অঞ্চলের ২০।২২ লক্ষ বাঙালীকে বাদ দিতেছি। এই অবস্থায় নিজেদের স্বার্থের খাতিরেও উৎকল ও বিহার ভদ্র ও সংযত হইতে পারিত। কিন্তু এই দুই প্রদেশের শাসক সম্প্রদায় তাহা হন নাই।

মানভূম জিলার ভবিষ্যৎ

কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারী। বিহারের বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলসমূহ পশ্চিম বাংলায় প্রত্যর্পণ করা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব আজ আর কাহারও অবিদিত নহে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতীয় গণ-পরিষদেরও সভাপতি, ভারতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার দায়িত্ব

আছে। এই শাসনতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রদেশসমূহের আঞ্চলিক সীমা পরিবর্তন অপরিহার্য্য। ভাষার ভিত্তিতে নূতন নূতন প্রদেশ গঠন করিবার নীতি এই পরিবর্ত্তনের পরিপোষক। সেইজন্যই গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে তিনি একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। গত ১৬ই জুন (২রা আষাঢ়) এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি পরিষদ দপ্তর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে :

জনসাধারণ কিছুদিন হইতে কয়েকটি নূতন প্রদেশ গঠনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। গণ-পরিষদ যে খসড়া কমিটি গঠন করিয়াছিলেন তাঁহারা এ সম্পর্কে একটি কমিশন গঠনের জন্য সুপারিশ করেন। উক্ত সুপারিশে বলা হয় যে কমিশনকে নূতন প্রদেশ গঠন সম্পর্কে সকল বিষয় তদন্ত করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হউক এবং ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে এই সম্পর্কিত রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হউক। তদনুযায়ী গণ-পরিষদের সভাপতি অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র এই ৪টি নূতন প্রদেশ গঠন সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য নিম্নলিখিত কমিশন গঠন করিয়াছেন—

শ্রী এস কে ধর (এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ)—চেয়ারম্যান, ডাঃ পান্নালাল (অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস, (শ্রীজগৎনারায়ণ লাল, শ্রী সি, সি, ব্যানার্জ্জী (অ্যাকাউণ্টেট জেনারেল, বিহার) সম্পাদক।

কমিশনের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য নিম্নলিখিত সহযোগী সদস্যগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সহযোগী সদস্যগণ—শ্রীরামকৃষ্ণ রাজু (মাদ্রাজ), শ্রীরামলিঙ্গম চেট্টিয়ার (অন্ধ্র), শ্রী টি সুব্রাহ্মনিয়াম (বেলারি কর্ণাটক) শ্রী কে এম মুন্সী (গুজরাট), শ্রী আর আর দিবাকর (কর্ণাটক), শ্রী এইচ ভি পাতাসকর (মহারাষ্ট্র) শ্রী টি এল শেয়োদে (নাগপুর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ) শ্রীগোপীলাল শ্রীবাস্তব (মহাকোশল)। উপরে যে ৪টি স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কয়টি নূতন প্রদেশ গঠিত হইতে পারে, কমিশন সে সম্পর্কে রিপোর্ট করিবেন এবং উক্ত প্রদেশসমূহের সীমানা কি হওয়া উচিত কমিশন সে সম্পর্কেও রিপোর্ট দিবেন। পরে নূতন প্রদেশসমূহের সীমানা কমিশনের সাহায্যে চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হইবে।

নূতন প্রদেশগুলি গঠনের ফলে ঐসব প্রদেশের অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া কি হইবে কমিশন সে সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত জানাইবেন। নূতন প্রদেশসমূহ গঠনের ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া কি হইবে কমিশন তাহাও রিপোর্ট করিবেন।

এই ইস্তাহারে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার দাবী পূরণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, একজন "সহযোগী সদস্য" পশ্চিম বাংলার পক্ষ হইতে নিযুক্ত করা হইত। তাহা করা হয় নাই। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত উকীল এই কার্য্যের সপক্ষে যুক্তি বা অজুহাত আবিষ্কার করিতে পারিবেন না, তাহা আমরা মনে করি না। এই যুক্তি বা অজুহাত আমরা স্বীকার করিতে পারি না, স্বীকার করিয়া লইব না, এবং পশ্চিম বাংলার জনমতকে এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর চলিবে না। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে বিহারের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসী সভ্যগণ বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে যে তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। এই অন্যায়ের প্রতিকার বাঙালীকে করিতে হইবে—যেমন ব্যর্থ করিতে হইয়াছিল বড়লাট কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রচেষ্টাকে। এই কার্য্যে কে অগ্রণী হইবে, তাহা দেখিবার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিয়া আছি। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী নেতৃবর্গ এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট। নব বঙ্গ সমিতি যে আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা জমাট বাঁধিতেছে না। পশ্চিম বাংলা হইতে মনোনীত গণ-পরিষদের সদস্যবর্গও তদপেক্ষা তৎপর বলিয়া কোন প্রমাণ পাই নাই। এক এক জন করিয়া তাঁহাদের নাম ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—এই বিষয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আপনারা কে কি করিয়াছেন বা করিতেছেন? যত দূর মনে হয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পশ্চিম বাংলার পক্ষ হইতে গণ-পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং এই পদ অধিকার করিয়া আছেন : শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, জনাব আবদুল হেলিম গজনবী, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত, শ্রীবসন্তকুমার দাশ, শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়; ২।১টা নাম হয় ত বাদ যাইতেছে। সে যাহাই হউক এই কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বিহার প্রদেশস্থ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে পশ্চিম বাংলায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন, তার একটা হিসাব দিবার সময় কি আসে নাই? এবং গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহার প্রতিকারকল্পে তাঁহারা কি করিতে প্রস্তুত আছেন? অবস্থা দেখিয়া মনে হয় ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এই অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু ভাষার ভিত্তিতে নূতন প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে তাঁহার অমত জানাইয়াছিলেন। কিন্তু গণ-পরিষদের সভাপতি ঐ অমত মানিয়া লইতে পারেন নাই। অন্ধ্র, তামিল, মহারাষ্ট্র, গুর্জ্জর সম্বন্ধে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাংলার

বেলায় এক যাত্রায় পৃথক ফল হইবে কেন তাহার উত্তর কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের নিকট জানিতে হইবে।

পশ্চিম বাংলায় সামরিক সংগঠন

গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এই সম্বন্ধে দুইটি সংবাদ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটি আমাদের জানাইয়া দিল যে "জাতীয় রক্ষীবাহিনী" বলিয়া পশ্চিম বাংলার পূর্ব্ব সীমান্তবাসী জনগণকে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় সংবাদটি দুই ব্যাটেলিয়ন প্রায় ১,৮০০ হইতে ২,০০০ বাঙালী যুবক লইয়া দুইটি পদাতিক বাহিনী গঠনের সুসংবাদ আমাদের মধ্যে বিতরণ করিল।

কি কারণে "জাতীয় রক্ষীবাহিনী"র শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, তৎসম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী নীরব। সেইজন্য নানা জল্পনা-কল্পনা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন যে কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগ কোন বিষয়ে বিশেষ আপত্তি জানাইয়াছে, কেহ বলিতেছেন যে পূর্ব্ব সীমান্তবাসী জনমণ্ডলী এই বিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেছে না; সামরিক জীবনের দায়িত্ব ও হাঙ্গামা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর শিক্ষা বন্ধের সংবাদে এরূপ একটা ইঙ্গিত ছিল বলিয়া মনে হয়। আমরা সর্ব্বদাই বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া আসিয়াছি; প্রধানতঃ এই কারণে যে ইংরেজ আমলে বাঙালীকে অসামরিক বলিয়া সামরিক জীবন সম্বন্ধে অপটু করিয়াছে, কোনরূপ বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইবে না। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেনাবাহিনীতে ও বিমানবিভাগে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হইয়াছে; নৌবিভাগেও কয়েকজন উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ সৈনিকবৃত্তি যে সব শ্রেণীর অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা তাহারা কেহই অগ্রসর হইয়া আসে নাই। সেইজন্য কাশ্মীর রণাঙ্গনে বাঙালী সৈন্যাধ্যক্ষ দেখা যায় কিন্তু পদাতিক শ্রেণী অনুপস্থিত; এই দৃশ্য দেখিয়া অন্য প্রদেশের সাংবাদিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

সেইজন্য আমরা মনে করি শেষ পর্য্যন্ত বাঙালী পল্টনের সম্পূর্ণ সংগঠন বিষয়েও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রায় দেড় শত বৎসরের অনভ্যাসজনিত মনোভাব দূর করা কঠিন হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত ভাবিতেছেন যে সব শ্রেণী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের নানা বিভাগে যোগদান করিয়াছিল, তাদের মধ্য হইতে এই দুই হাজার সংগৃহীত হইতে পারে। একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে প্রকৃত রণাঙ্গনের মধ্যে খুব কম বাঙালীই উপস্থিত ছিল; বেশীর ভাগ লোক রাস্তাঘাট, বিমানকেন্দ্র তৈয়ার করিতে খাটিয়াছে মজুরের মত; রেলওয়ে বিভাগে বা মোটর বিভাগে অনেকে যোগদান করিয়াছিল; তাহারা লড়াই করিয়াছে কয় জন বা কয় শত? পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিষয়ে একটা আদমসুমারী লইলেই প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিতে পারিবেন; ভ্রান্ত ধারণায় চালিত হইয়া আয়োজন-উদ্যোগের ঘটা করিয়া লোককে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়োজন নাই। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সংগঠন ব্যাপারে এই কথাটা পরিষ্কার প্রমাণিত হইয়াছে। কেন এই শিক্ষার ব্যবস্থাটা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল, তাহা যদি আমাদের জানাইয়া দেন তবে লোকের মনে যে আশাভঙ্গের ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা যায়।

দুই ব্যাটেলিয়ন বাঙালী পল্টনে রংরুট ভর্ত্তি করা কঠিন হইবে না; কিন্তু তাহা বাঙালী হইবে কি না, সেই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলে "পাহাড়ী" জাতি হইতে এই সংখ্যক লোক অতি সহজে সংগৃহীত হইতে পারে। আমরা চাই বাংলার জনসাধারণ সামরিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত হউক; নিয়মানুবর্ত্তিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিবার যোগ্যতা ও সাহস অর্জ্জন করুক। "জাতীয় রক্ষীবাহিনী" সংগঠন ব্যবস্থায় সেইজন্য উৎফুল্ল হইয়া বিধান-মন্ত্রিমণ্ডলীকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়াছিলাম। সেই ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া বাঙালী ব্যাটেলিয়ন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইতেছে "মন্দের ভাল" বলিয়া তাহা আমরা গ্রহণ করিব। কিন্তু যত দিন বাঙালী জনসাধারণের কপালে "অসামরিক" জাতি বলিয়া যে কলঙ্কের ছাপ দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মুছিয়া না যায়, তত দিন আমরা বাংলার কোন মন্ত্রিমণ্ডলীকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দিব না। কলঙ্ক মোচন যে সম্ভব তাহা পূর্ব্ববঙ্গে প্রমাণিত হইয়াছে; মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী "আনছার বাহিনী" গঠন করিয়া এবং তাহাদের সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া একটা কাজের মত কাজ করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিষয়ে গড়িমসি করিয়া দিন গুণিতেছেন; দলাদলিতে কাল কাটাইতেছেন। সামরিক শিক্ষা এই দলাদলির উর্দ্ধে থাকা উচিত, এবং দেশের লোককে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে অবহিত হইবার শিক্ষা দেওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিষয়ে যে তৎপর হইয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। তাঁহাদের একটা প্রচার-বিভাগ আছে; তাহা যে এই বিষয়ে সজাগ তাহার লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ে না। দেড় শত বৎসরের নিশ্চেষ্টতা এই সরকারের সকল বিভাগে অনড় হইয়া আছে বলিয়া মনে হয়। একটা বিপ্লব না আসিলে তাহা দূর হইবে না।

অবশ্য এতদিনের বাধা যে ক্লীবত্বের বন্ধন ছিল তাহা দূর করিয়া বাঙালীকে সচেতন ও সচেষ্ট করা কঠিন ব্যাপার

তাহা আমরা জানি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে যে সঠিক পন্থা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। বাঙালী কৃষক, মৎস্যজীবী ও ঐরূপ শ্রেণীর মধ্যে বলিষ্ঠ সৈনিক সংগ্রহ করা মোটেই অসম্ভব নহে।

ভারত-রাষ্ট্রের মুসলমান

হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত অর্থনীতিক সংগ্রাম চলিতেছে; নিজাম সরকার কর্তৃক পুষ্ট "রজাকর" দল রাজ্যের হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে। ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ এই দৃশ্য দেখিয়াও এখনও কোন চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন না। তাঁহাদের অক্ষমতার কারণ কি তৎসম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া তাঁহারা কিছু বলিতে চাহিতেছেন না যদিও দাক্ষিণাত্যের প্রধান সেনাপতি রাজেন্দ্র সিংজী আমাদের অভয় বাণী শুনাইতেছেন। এ বিষয়ে আমরা যাহা বুঝি তাহাতে মনে হয় ভারত-সরকার যে কয়েকটি কারণে এখনও ইতস্তত করিতেছেন তাহার তাহার মধ্যে প্রধান কথা সংযুক্ত জাতিসঙ্ঘের কাশ্মীর কমিশনের উপস্থিতি। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, ভারত-সরকার এখনও নিজামের পক্ষে বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তা ও সহানুভূতির পরিমাণ বিচার করিতে পারিতেছেন না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভারত-রাষ্ট্রে এখনও সাড়ে তিন চারি কোটি মুসলমান রহিয়া গিয়াছেন। হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধানকল্পে কি ইহাদের মনোভাব হিসাবের মধ্যে ধরা হইতেছে এবং সেইজন্যই ভারত-রাষ্ট্রের নীতি সম্বন্ধে একটা দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে? এই মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইমস্" দৈনিক পত্রিকায় একটি পত্র গত মে মাসের ২৭ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রটি "জামাল-উদ্দিন" এই নামে লিখিত হইয়াছিল। পত্রলেখকের বিশ্লেষণ ও তার রাজনীতিক গুরুত্ব এত অধিক যে আমরা তার মূল অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

> এই কঠোর সত্যটি এখনও স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, ভারতের মুসলমানেরা কোনকালেই ভারতীয়দের মত চিন্তা করিতে, কার্য্য করিতে অথবা নিজেকে সম্পূর্ণ ভারতীয় বলিয়া উপলব্ধি করিতে শিখে নাই। ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, মুসলমানেরা সমগ্র জগতের মুসলমানকেই ভাই বলিয়া মনে করে। প্যান-ইসলামিজিম একটি কাল্পনিক বস্তু নহে। পাকিস্থান জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র মুসলমান জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। সকল মুসলমানই মুসলিম রাষ্ট্র চাহে। জগতে একই সম্প্রদায় (মুসলিম সম্প্রদায়), একই ধর্ম্মশাস্ত্র (মুসলিম শাস্ত্র) এবং একই রাষ্ট্র (মুসলিম রাষ্ট্র) স্থায়ী হউক, ইহাই মুসলমানগণের কাম্য। সুতরাং যে সকল মুসলমান ভারতরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতেছে, হয় তাহারা নিজেকে প্রবঞ্চিত করিতেছে, নচেৎ পরম উদার ভারত গবর্মেণ্টকে প্রতারিত করিতেছে। মুসলমানেরা মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখিতে অসমর্থ; কেবল মুসলমান কি অ-মুসলমানরূপে দেখিতে পারে। অ-মুসলমানকে মুসলমানের সমান অধিকারপ্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে সে অভ্যস্ত নহে। মুসলমানের দৃঢ়মূল সাম্প্রদায়িকতা যে কোন অ-মুসলমান রাষ্ট্রে ঘোরতর সমস্যা সৃষ্টি না করিয়া পারে না। আমাদের দেশে এক দিকে পণ্ডিত জবাহরলাল বিশ্বমানবতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছেন, অপরদিকে মুসলমানেরা কেবল মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথা চিন্তা করিতেছে।

"হিন্দুস্থান টাইমস্" পত্রিকা এই পত্র প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, বিশেষতঃ "কংগ্রেসপন্থী রাষ্ট্রনায়কগণকে" প্রশ্ন করিয়াছেন—"এ সমস্যার সমাধান কোথায় মিলিবে?" এই বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মন ও বুদ্ধি আমাদের সায় দেয় না, তবে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর প্রচেষ্টা সহজ হইবে না। তিনি চাহিতেছেন ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে; কিন্তু তাহা তিন-চারি কোটি নাগরিকের জ্ঞানবিশ্বাসের বিরোধী; এবং এই বিপুল জনসমষ্টির প্রকৃত মনোভাবের বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রীয় বিধান চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব কি? নূতন রাষ্ট্রের গঠন সম্বন্ধে নানা পরিকল্পনা চলিতেছে; এই পরিকল্পনা নানাভাবে আমাদের চিরাচরিত চিন্তা ও কর্ম্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিবে; প্রায় প্রতি পদে তাহা আমাদের নানা সংস্কারের উপর আঘাত হানিবে। গত এক শত বৎসরে হিন্দুসমাজ নানাভাবে বর্ত্তমান যুগ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতীয় মুসলমান সমাজ তাহা পারে নাই বলিয়াই "পাকিস্থানের" জন্য আন্দোলন করিয়াছে, এবং প্রতিবেশী সমাজের বিরুদ্ধে আক্রোশ উদ্দীপিত করিয়া আমাদের দেশের জন-মনকে বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই অসুস্থ মনোভাবের একটা বহিঃপ্রকাশ নিজাম সরকারের কার্য্য-কলাপের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতরাষ্ট্রের তিন-চারি কোটি মুসলমান বর্ত্তমানে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া আছে। হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে যদি কখনও কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, তবে তাঁহারা কি করিবেন, তৎসম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন লোকের মনকে ভারাক্রান্ত করিতেছে।

ভারতীয় রাজ্যসমূহের নূতন সংগঠন

ইংরেজ আমলে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে

তাহাদের প্রতিবেশী জনপদের কোন রাষ্ট্রিক যোগ ছিল না। ইংরেজের বিধানে দেশীয় রাজ্যসমূহ অনেকটা যাদুঘরের প্রদর্শনীর মত পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯৪৭ সনের ৫ই জুলাই হইতে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অধীনে যে দেশীয় রাজ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার একটা কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দেখিতে পাই ৫৩২টি দেশীয় রাজ্যের একটি নূতন সংগঠন চেষ্টা। ২১৯টি রাজ্যকে প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ৩১৩টি রাজ্য মিলাইয়া নূতন প্রদেশ গঠন করা হইয়াছে অথবা নূতন "রাজস্থান" সৃষ্টি করা হইয়াছে। "হিমাচল" প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ২১টি ক্ষুদে রাজ্য ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন রাখা হইয়াছে, ভারতবর্ষের পশ্চিম সমুদ্রকূলে কচ্ছ-রাজ্যেও সেই ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে; এই রাজ্যটি সিন্ধুদেশের প্রতিবেশী বলিয়াই ভারত-রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ২৯১টি রাজ্য মিলাইয়া যে ৬টি "রাজস্থান" সঙ্ঘের পত্তন করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ২১৭টি রাজ্যকে "সৌরাষ্ট্র" সঙ্ঘের মধ্যে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; "মৎস্য" সঙ্ঘের ভাগে পড়িয়াছে ৪টি রাজ্য; "বিন্ধ্য প্রদেশ" গঠিত হইয়াছে ৩৫টি রাজ্যের সমবায়ে; "রাজস্থানে"—১০টি, "মধ্য ভারতে"—২০টি এবং "পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব-পঞ্জাবে" ৮টি রাজ্য পড়িয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে সান্দুর রাজ্য, যুক্তপ্রদেশে বারানসী ও রামপুর রাজ্য, পূর্ব্ব-ভারতে ত্রিপুরা, কুচবিহার, ১৯টি খাসিয়া রাজ্য ও মণিপুর সম্বন্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

এই বিধান অনুসারে রাজ্যের নৃপতিবৃন্দের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রহিল না। যে সব রাজ্যকে প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের রাজারা একটা "ভাতা" পাইয়া পেনসন ভোগ করিতেছেন বলিলেই চলে; তাঁহাদের আত্মীয়-কুটুম্বদেরও সেই অবস্থা। এই "বেকার" রাজাদের ভারত-রাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত করা যাইবে কিনা বা যাইতে পারে কিনা, তৎসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। বড় বড় রাজ্যের রাজাদের, যেমন—জামনগর, গোয়ালিয়র, উদয়পুর, রেওয়া, পাতিয়ালা, যোধপুর, ভরতপুর, ইন্দোর,—তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও রাজপ্রমুখ ও উপ-রাজপ্রমুখ প্রভৃতি পদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে। এই সব রাজ্যসঙ্ঘে, দায়িত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা যখন প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন তাঁহাদের ক্ষমতা বা অধিকার ভারত-রাষ্ট্রের প্রদেশ-পালের (Governor) ক্ষমতা ও অধিকার হইতে উচ্চ হইবার কথা নয়।

এই বিবরণী হইতে আমরা যে নূতন সংগঠনের পরিচয় পাই, তাহাতে মনে হয় এই নৃপতিবৃন্দ বর্ত্তমান যুগের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন; রাজ্য পরিচালনে তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতার দিন ফুরাইয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন; অনেকেই স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের সংগঠনে সাহায্য করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াও নিজেদের স্বার্থ বলি দিয়াছেন। হায়দরাবাদ রাজ্য কিন্তু ভিন্ন পথে চলিতেছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কাশ্মীর ও জুনাগড় সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংসদের দরবারে হাজির হইয়াছে। এই তিনটি রাজ্যের ভবিষ্যৎ লইয়া ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। ইহাদের ভাগ্য লইয়া কূটনীতির খেলা চলিতেছে। আমেরিকা ও বিলাত "পাকিস্থানের" পিছনে থাকিয়া ঘুঁটি চালিতেছে। এই বিষয়ে আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালকদের পিছনে জনমণ্ডলীর অকুণ্ঠ সহযোগ আছে। হায়দরাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতি ছাড়া, রাজপুতানা ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহেও কিছু কিছু গণ্ডগোল চলিতেছে।

উড়িষ্যা প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে উড়িষ্যার প্রদেশপাল জনাব আসফ আলী বক্তৃতা প্রসঙ্গে তথাকার নৃপতিদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, তাঁহারা যেন কোনোপ্রকার বেআইনী কার্য্যকলাপে জড়িত না হন। প্রাদেশিকতার নিন্দা করিয়া তিনি বলেন, আমাদের উদার ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন।

তিনি বলেন, "আপনারা জানেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত গবর্মেণ্টকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদের ব্যাপারেও তাঁহাদিগকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে। আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, ভারত গবর্মেণ্ট প্রত্যেক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত আছেন।"

গবর্ণর বলেন, সুখের বিষয় এই যে, উড়িষ্যা এই সকল অঞ্চল হইতে দূরে আছে। তবুও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলির পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সজাগ থাকা দরকার।

উড়িষ্যার রাজ্যগুলির সংহতির কথা উল্লেখ করিয়া জনাব আসফ আলী বলেন, চুক্তি শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইঁহারা পূর্ব্বেকার ব্যবস্থায় যে সকল ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা পাইতেন সেগুলি পাইবেন না এই মনে করিয়া ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্ত অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। যাঁহারা এখনও বাস্তব অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহারা যাহাতে বিপথে চালিত না হন তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়।

জনাব আসফ আলী উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহের মূল্যবান খনিজ সম্পদের উল্লেখ করিয়া বলেন, এতদঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারণের উন্নতিকল্পে এই সমস্ত সম্পদ নিয়োজিত হইবে।

তিনি নৃপতিবৃন্দকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন।

তিনি বলেন, নৃপতিদিগকে বিশেষ করিয়া শিল্পোন্নতিতে সহযোগিতা করিতে হইবে। ইহার ফলে শুধু যে ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠামো রচিত হইবে তাহা নহে; নৃপতিবৃন্দ দেশবাসীর সদিচ্ছাও লাভ করিতে পারিবেন। আমি উড়িষ্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বাস্তব রূপ যেন চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাইতেছি। জীবনধারণের মানের উন্নতিকল্পে নৃপতিবৃন্দ প্রজাদের সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আমি আশা করি। তবে এই সতর্কবাণী আমি উচ্চারণ করিতেছি যে, যাঁহারা বে-আইনী কার্য্যকলাপে জড়িত হইবেন তাঁহাদের পরিণতি ভয়াবহ হইবে।

অতঃপর তিনি বলেন, চরম প্রাদেশিকতা আজ সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে, ইহা সত্যই দুঃখজনক ব্যাপার। বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতি হিসাবে ভারতকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আমরা যে ভিত্তি স্থাপন করিতেছি তাহা ঘাতসহ ও শক্তিশালী করিতে হইবে—ইহার জন্য প্রয়োজন উদার, বলিষ্ঠ সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী। সংলগ্ন প্রদেশসমূহ নিজেদের সীমান্ত অঞ্চল বিস্তার সাধনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা চলিতেছে। আমাদের প্রদেশে সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ান রাজ্য লইয়া অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, আমি ইহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি। প্রদেশগুলির সীমা পুনর্নির্দ্ধারণের চূড়ান্ত সময় এখনও আসে নাই। আমাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য হইতেছে শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করা। তখন আমরা সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণের ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পুনর্ব্বণ্টনের অনেক সময় পাইব। বর্ত্তমানে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দিকেই সর্ব্বাধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সিন্ধু দেশের হিন্দু-শিখ

সিন্ধু দেশে প্রায় ১৪ লক্ষ হিন্দু-শিখ ছিলেন; পাকিস্থানীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রায় ১২ লক্ষ তাঁহাদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। পাকিস্থানীদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, বিধর্ম্মীর মুখ আর তাহাদের প্রতিদিন দেখিতে হইবে না। এই বিরাট জনসমষ্টি ভারতরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে বোম্বাই, কাথিবার, কচ্ছ, ও রাজপুতানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, নূতন করিয়া জীবন সংগঠন করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই কাজে তাঁহাদের সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইবে। নানা প্রকার কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এই আয়োজন সার্থক করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। আচার্য্য কৃপালনীর একটা বিবৃতির মধ্যে এইরূপ একটি প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। কচ্ছ রাজ্যে কান্দলা (Kandla) নামক একটি স্থান সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। কচ্ছের মহারাজের নিকট হইতে এই ৪৫,০০০ হাজার বিঘা জমি দানস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু পুনর্ব্বসতি সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে; সমবায় প্রণালীতে এই জমি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, এবং সিন্ধুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিন্নভিন্ন না হইয়া এই স্থানকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কচ্ছ রাজ্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে লইয়াছেন এবং কান্দলাকে একটি বন্দরে পরিণত করিবার দায়িত্ব এখন তাঁহাদের। কালে এই বন্দর করাচি বন্দরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে পরিগণিত হইবে, এরূপ কল্পনা উদ্ভট নয়। এই বন্দরের কল্যাণে সিন্ধুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সহজাত কৌশল ও ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারা নূতন ভাবে নিজেদের লুণ্ঠিত সম্পদ পুনর্গঠন করিতে পারিবেন। কান্দলার উদাহরণ অন্যান্য প্রদেশের বাস্তু-ত্যাগীদের নিকট পথপ্রদর্শকরূপে অনুপ্রাণনা দিবে।

রাষ্ট্রপাল মাউণ্টব্যাটেন—রাষ্ট্রপাল রাজাগোপালাচারী

গত ৭ই আষাঢ় রাষ্ট্রপাল মাউণ্টব্যাটেন চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর হাতে কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়া ভারতরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ১৯০ বৎসরের ব্রিটিশ আধিপত্য শেষ হইল। এই আধিপত্যের ফলাফল লইয়া আলোচনা করিয়া লাট মাউণ্টব্যাটেনকে দায়ী করিবার প্রয়োজন নাই। নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তা বলিয়া ভারতরাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট লাট মাউণ্টব্যাটেন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তা হইলেন। তাহার পূর্ব্বে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত, ২ মাস ১১ দিন যে কাজ বা অকাজ করিয়াছেন, তাহার জন্য দায়ী তিনি। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মন্ত্রিমণ্ডলী এই সময়ের কার্য্যকলাপের জন্য কোন দায়িত্ব স্বীকার করিবেন কিনা তাহা আমরা জানি না। এই সময়ের মধ্যেই পঞ্জাবের খুনাখুনি আরম্ভ হয়। সেই জন্য "পাকিস্থানের" অর্থমন্ত্রী জনাব গোলাম মহম্মদ লাট মাউণ্টব্যাটেনকে দায়ী করিয়াছেন, "পাকিস্থানের" ভূতপূর্ব্ব পুনর্ব্বসতি মন্ত্রী জনাব গজনফর আলী খাঁ বলিতেছেন যে লাট মাউণ্টব্যাটেন তাঁহাকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে যদি খুনাখুনি আরম্ভ হয়, তবে নিষ্ঠুরভাবে তাহা দমন করা যাইবে। সে চেষ্টা হইয়াছিল কিনা তাহা আমরা এখন পর্য্যন্ত জানি না। তবে পশ্চিম-পঞ্জাব হইতে হিন্দু ও শিখকে বাস্তুত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছিল তাহাদের মুসলমান প্রতিবেশীর অত্যাচারে এবং পূর্ব্ব-পঞ্জাব, পাতিয়ালা, আলোয়ার ও ভরতপুর রাজ্য হইতে সম-সংখ্যক মুসলমানকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহাদের হিন্দু ও শিখ প্রতিবেশীর প্রতিশোধের অত্যাচারে। প্রতিবেশীর মধ্যে এই হানাহানির জন্য ব্রিটিশ কূটনীতি দায়ী, তাহার জন্য ব্যক্তিগতভাবে লাট

মাউণ্টব্যাটেনের কোন দায় আছে কিনা ইতিহাস তাহা স্থির করিবে। সেই ইতিহাস আমরা জানি না।

এর বেশী তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় আসে নাই। যাঁহার হাতে তিনি কার্য্যভার দিয়া গেলেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা জানি যে শান্তির জন্য ভারত বিভাগ তিনি পছন্দ করিয়াছেন। ১৯৪২ সাল হইতে মুসলিম লীগের "পাকিস্থানি" দাবী মানিয়া লইবার জন্য তিনি চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না যে খণ্ড "পাকিস্থান" স্বীকার করিয়া লইলেন তাহা যদি ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে করিতেন তবে শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর রাজনীতিক কৌশলের সার্থকতা হইত। আজ দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষে যে রক্ত-গঙ্গা দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে তাহার মধ্যে কোন সেতু নির্ম্মাণ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য নূতন রাষ্ট্রপাল তাহা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। আর করিবেন ব্রিটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর (British Commonwealth) সঙ্গে সম্বন্ধ অটুট রাখিতে। দুনিয়ার কূটনীতির ক্ষেত্রে যে ঠেলাঠেলি চলিয়াছে, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে রাষ্ট্রপাল রাজাগোপালাচারী ব্রিটেনের সামরিক আয়োজন-উদ্যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবেন না। এই সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন কথা না বলিলেও আমরা জানি তাঁহার মনোভাব কি। এই মনোভাবের সঙ্গে দেশের রাজনীতিক সাধারণ কর্ম্মিবৃন্দের বিরোধ আছে, কংগ্রেসের নানা ঘোষণা তাহার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু এই বিরোধের সমাধান হইবে যেমন হইয়াছে "পাকিস্থানী" সমস্যার। শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী এই বিশ্বাস করেন যে অবস্থার তাড়নায়, দুনিয়ার রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রের নানা জটিলতার প্রয়োজনে একটা গোঁজামিলের ব্যবস্থা হইবে। আমাদের নূতন রাষ্ট্রপাল বস্তুতান্ত্রিক, ভাবের উন্মাদনায় তিনি চলেন না; আপদ্‌ধর্ম্মের নীতি অনুসারে তিনি কর্ত্তব্য পালন করেন। এই কথাটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

বার্লিন লইয়া ঝগড়া

"ওয়ার্লড অভার প্রেস" (*Worldover Press*) মার্কিন মুলুকের একটি সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান; ইহা পৃথিবীর নানা-স্থানের সংবাদের উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করে—এই সংবাদের অন্তর্নিহিত ভাব ও কর্ম্ম-ধারা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য। এইরূপ একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে (ভাদ্র-আশ্বিন) ইউরোপের বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিবে; তখন জার্ম্মানীর পশ্চিম অংশে ত্রিশক্তি—যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স—একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে, হয়ত বা তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবে। সোভিয়েট ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছে; তখন হয়ত তার প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে গিয়া এমন কোন কার্য্য করিয়া বসিবে যাহা পরিণতি লাভ করিবে যুদ্ধে। বার্লিন লইয়া যে ঝগড়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়।

বর্ত্তমানে বার্লিন অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে; ত্রিশক্তি তাহাদের এলাকায় যাইতে পারিতেছে বিমানের সাহায্যে; প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি বিমানপথে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইতেছে; কয়লা পর্য্যন্ত এই ভাবে পাঠানো হইতেছে। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ এই বিমানপথ রুদ্ধ করিবার ভয় দেখাইতেছে; তাহারা যদৃচ্ছ ভাবে সোভিয়েট বিমান বার্লিনের উপরের আকাশপথে চালাইয়া যাইবে; যদি তার ফলে ত্রিশক্তির বিমান জখম হয়, তবে তার ফলাফল সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব তারা গ্রহণ করিবে না। এইরূপ এক তরফা ব্যবস্থা ত্রিশক্তি মানিয়া লইলে বার্লিন হইতে তাহাদের বাহির হইয়া আসিতে হইবে, নতুবা সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট নতি স্বীকার করিতে হইবে। যুদ্ধের হার-জিত ছাড়া, এই অবস্থা কল্পনা করা কঠিন। "ওয়ার্লল্ড অভার প্রেসের" পর্য্যবেক্ষক যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল বলিয়া মনে করেন না।

তার সপক্ষে একটা যুক্তি তিনি দিতেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের আশ্রিত রাষ্ট্রসমূহ এই টানা-হেঁচড়ায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে; তারা মনে করে না যে মার্শাল-পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া তাদের উপকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীতে (Polit Buro) মলোটভ নীতির বিরুদ্ধে মনোভাব দেখা দিয়াছে; এখনও তাহা দানা বাঁধে নাই। কিন্তু বার্লিনের ঝগড়া না মিটিলে ও যুদ্ধ ছাড়া মীমাংসার কোন উপায় দেখাইয়া দিতে না পারিলে, সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ বেশী দিন তাহাদের দেশের লোককে ও তাহাদের আশ্রিত রাষ্ট্রসমূহের লোককে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখিতে পারিবেন না।

বার্লিনে যেমন ভিয়েনায় তেমনি ত্রিশক্তিকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য ঠেলাঠেলি চলিতেছে। তাহারা কিন্তু খুঁটি গাড়িয়া বসিয়া আছে; যুদ্ধে না হারিলে নড়িবে বলিয়া মনে হয় না। ইতিমধ্যে যুগোস্লাভিয়ার শাসকশ্রেণীর সঙ্গে বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে। মার্শাল টিটোর পিছনে দেশের কম্যুনিষ্ট দল পর্য্যন্ত সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তের দেশসমূহে যে কম্যুনিষ্ট সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে একটা ফাটল দেখা দিয়াছে। এই ফাটল একটা ছিদ্রমাত্র হইতে পারে, কিন্তু ছিদ্র দিয়াই বন্যার জলের তোড় পথ করিয়া বাঁধ ভাঙিয়া দেয়। এরূপ অবস্থা হইলে আমরা বিস্মিত হইব না। ইউরোপের ভাগ্য লইয়া যে খেলা চলিতেছে, তাহার শেষ কখন ও কোথায় হইবে তাহা বিশেষজ্ঞগণও বলিতে পারিতেছেন না। বার্লিন লইয়া ঝগড়া এমন এক মনোভাবের

সাক্ষ্য দিতেছে যাহা শান্তির পথে বিশেষ বিঘ্নস্বরূপ। এর বেশী কেহ কিছু দেখিতে পাইতেছেন না।

প্যালেষ্টাইন

প্রায় চারি সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির পর আবার প্যালেষ্টাইনে রণদামামা বাজিয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের প্রতিনিধি কাউণ্ট বার্ণাদেত্তো বিফল হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন—ইহুদি ও আরবের পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সমন্বয় বিধান সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃবর্গের যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মতের ও পথের মিল নাই বলিয়াই ইহুদি ও আরব এই ভাবে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নস্যাৎ করিবার পক্ষে সাহস পাইল। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন প্যালেষ্টাইন বিভাগের পক্ষপাতী ছিল; ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়—প্যালেষ্টাইনে দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের সম্মতি ছিল; ব্রিটেন তখনও প্যালেষ্টাইনের "অছি" ছিল; তাঁহার পক্ষে ঘোষণা করা হইল যে ইহুদি ও আরবে মিলিয়া যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, ব্রিটেন তাহা স্বীকার করিয়া লইবে। আপাতদৃষ্টিতে এই মনোভাব সরল বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যাহাদের ব্রিটিশ কূটনীতির সহিত সামান্য পরিচয় আছে, তাহারা ইহাতে বিভ্রান্ত হইতে পারে না। ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে প্যালেষ্টাইনে ইহুদির জন্য একটা আস্তানা করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে; ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরবদের তোয়াজ করিতে হইল। এই যুদ্ধের সময়েই জেরুজালেমের মুফতি আল্-হুসেনী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন; ইরাকের রশিদি সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করেন; মিশরের শাসক সম্প্রদায় কেবলমাত্র ভদ্রতা রক্ষা করিয়া প্রকাশ্যে কোন অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু ইহাদের মনস্তুষ্টির জন্য এমন কোন অন্যায় কাজ নাই, যাহা ইহুদির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রাজনীতিকরা করেন নাই।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইহুদিরা পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের লোকবল ১ লক্ষ হইতে ৬ লক্ষে পরিণত করিয়াছে; বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের সাহায্যে প্যালেষ্টাইনে অভূতপূর্ব্ব অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিয়াছে। এই উন্নতি দেখিয়াও আরবদের মোহ ভঙ্গ হয় নাই। ব্রিটিশ শাসন তাঁহাদের মধ্যযুগীয় মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। কিন্তু ব্রিটেন তাঁহার নিজের স্বার্থের জন্য আরব নৃপতিবৃন্দের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এ কথা আজ অবিদিত নাই যে অধুনা-প্রসিদ্ধ "আরব লীগের" জন্ম হইয়াছিল ব্রিটিশ কূটনীতিকবর্গের চক্রান্তে। মিঃ বরার্ট কেসি ১৯৪২-৪৩ সনে আরব দেশসমূহে ব্রিটিশ দূত ও মন্ত্রীরূপে বিরাজ করিতেছিলেন; ১৯৪৪-৪৬ সনে তিনি বাংলাদেশের গবর্ণর হইয়া আসেন। তিনি ও ব্রিগেডিয়ার ক্লেটন "আরব-লীগের" জন্মদাতা। এই ইতিহাস যাঁহারা জানেন, ব্রিটেনের কূটনীতিক চাল বুঝিতে তাঁহাদের কোন কষ্ট হয় না। "অছি-গিরির" দায়িত্ব এড়াইয়া আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্যে ব্রিটেন নিজের ক্ষমতা ও স্বার্থ এই অঞ্চলে অটুট রাখিতে চায়। এই বিষয়ে আমেরিকার পুঁজিপতিদের স্বার্থ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য আমেরিকার পক্ষ হইতে প্যালেষ্টাইন বিভাগের সমর্থন প্রত্যাহার করা হইয়াছে, যদিও ঘটা করিয়া ইসরাইল রাষ্ট্রকে এক প্রকার স্বীকার করা লওয়া হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়াছে। কিন্তু গভীর জলের সব মাছ; কত খেলাই যে তাহারা খেলিতেছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ইহুদি-আরবের যুদ্ধ ঘনীভূত হইয়া উঠিলে তাহাদের স্ব-মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিবে।

সত্যানন্দ বসু

সত্যানন্দ বসুর দেহত্যাগে স্বদেশী যুগের একজন নীরব ও নিরলস কর্ম্মী আমরা হারাইলাম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোভাগে আমরা দেখিয়াছি সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে। এই আন্দোলনের আয়োজন-উদ্যোগে বহুবাজারের ভারত-সভা সর্ব্বপ্রথমে অগ্রণী হইয়াছিল; এবং এই সভার একজন কর্ণধার ছিলেন সত্যানন্দ বসু। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে কোন চাকুরী করিতে হয় নাই, তিনি সেইজন্য আজীবন নানা প্রকার লোকসেবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। দেশের শিল্পবাণিজ্যের নূতন শিক্ষা ও ব্যবস্থার আয়োজনে তাঁহার আগ্রহ ছিল বলিয়াই তিনি বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (Council of National Education) প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। এই পরিষদের কাজ যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া আছে। সত্যানন্দ বসু বহু বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকমণ্ডলীর একজন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। দেশের অর্থনৈতিক নানা সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত "বেঙ্গলী" পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্থান পাইত, এবং বিগত বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বেও তাঁহাকে এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়াছি। স্বদেশী যুগের স্মৃতি-কথা লিপিবদ্ধ করিবার তাঁহার কল্পনা ছিল; কিন্তু তৎসম্বন্ধে কিছু করিয়া যাইতে পারিয়াছেন কি না জানি না। যৌবনে ও প্রৌঢ়ে তিনি রাজনৈতিক ভাবে ও কর্ম্মে ছিলেন নরমপন্থী (Moderate)। ১৯১৭ সাল হইতে তাঁহাদের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত অনেক কর্ম্মপন্থায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কারণ ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলী তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। পূর্ব্বযুগের একজন বাঙালী প্রধানের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

কালা-আম

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

[তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের লুপ্ত স্মৃতি]

১

কালা-আম একটি আমগাছ। পাণিপত শহর হইতে কয়েক মাইল দূরে ধূ-ধূ মাঠে পথহারা পথিক কিংবা রৌদ্র-ক্লিষ্ট কৃষক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে ইহার ছায়ায় বিশ্রাম করিত। তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের পরে এক বিষাদময় স্মৃতি বুকে লইয়া এই "কাল-আম" কখন মরিয়া গিয়াছে কেহ জানে না। এই আমগাছের তলায় মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত কালো সন্ধ্যার আঁধারে বিলীন হইয়াছিল। এইজন্য উহা "কালা-আম" বা অভিশপ্ত আম্রবৃক্ষ দুর্নাম বহন করিয়া জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দিকস্থ জনপদের গ্রামবৃদ্ধগণ পুরুষানুক্রমে এই জনশ্রুতি শুনাইয়া আসিতেছে, গ্রাম্য যোগী বা চারণ যুদ্ধগীতিকা গাহিয়া ইতিহাসকে সজীব রাখিয়াছে।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি সূর্য্যাস্তের সময় তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের বহুবিস্তৃত রণক্ষেত্রে শ্মশানের নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছিল। এই সময় রাশীকৃত শবদেহের মধ্যে ভূপতিত এক সৈনিক পুরুষ সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং হস্তস্থিত ভল্লের সাহায্যে দেহভার রক্ষা করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় চলিতে লাগিলেন, কেন কিংবা কোথায় চলিয়াছেন তিনি জানেন না। এইভাবে তিনি অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া জনশূন্য মাঠে একটি আমগাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন। যোদ্ধার বয়স তখনও ত্রিশ পার হয় নাই; তাঁহার সবল দেহসৌষ্ঠবের মধ্যে যেন সৌন্দর্য্য ও বীর্য্যের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। পরিধানে তাঁহার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে ভূষিত। যুবকের রাজশ্রীমণ্ডিত প্রশস্ত ললাটে ব্রাহ্মণ্যের পরিচায়ক তিলক, গলায় মুক্তার মালা, কানে হীরকের দুল, মস্তকে রত্নখচিত উষ্ণীষ, অবসন্ন চক্ষুদ্বয় ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত স্তিমিতদীপ্তি। ঐ দিন সূর্য্যোদয় হইতেই তিনি অমিতবিক্রমে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহাকে পিঠে লইয়া পর পর তিনটি ঘোড়া মরিয়াছে। হয় যুদ্ধজয় কিংবা মৃত্যু—ইহাই ছিল তাঁহার কাম্য কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁহার এ দুটি আকাঙ্ক্ষার কোনটিই চরিতার্থ হইল না। বসিয়া বসিয়া তিনি আপন অদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিলেন এমন সময় পাঁচ জন দুরাণী পাঠান অশ্বারোহী আমিষলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় শিকার খুঁজিতে খুঁজিতে "কালা-আমে"র তলায় পৌছিল। বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রক্তাপ্লুত অবসন্ন রাহুগ্রস্ত মধ্যাহ্নভাস্করসদৃশ সেই মারাঠা সেনানীর বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া পাঠানেরা বিস্মিত ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইল। সরাসরি মাথা না কাটিয়া তাহারা তাহাকে বলিল, যাহা আছে দাও, প্রাণে মারিব না। নির্ভীক যোদ্ধা আত্মপরিচয় দিলেন না, নির্ব্বাক্ নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া রহিলেন। লুঠের লোভে পাঠানেরা তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিবামাত্র সেই অর্দ্ধমৃত যোদ্ধার দেহে যেন নব চেতনার সঞ্চার হইল; নিমেষমধ্যে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া একাকী পাঁচ জনকে তিনি আক্রমণ করিলেন। ভল্লের আঘাতে চারি জন পাঠানকে আহত করিয়া স্বয়ং বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন। ক্রুদ্ধ পাঠানগণ যোদ্ধার বসনভূষণের সহিত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন মস্তকটিও লইয়া চলিল। ইহাতে আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। ইহাই তো বীরের অভীপ্সিত মৃত্যু। কবি বলিয়াছেন—

"জীয়ত সিংহ নহি আপুধরাবা, মুয়ে পিছে কোই ঘিসি আওবা।"

(প্রাণ থাকিতে জীবন্ত সিংহ নিজে ধরা দিবে না। মরিলে যে কেহ তাহার গা ঘেঁষিতে পারে।) বীরধর্ম্ম অনুসরণকারী এই তরুণ সেনানীও জীবিত অবস্থায় শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করেন নাই, সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুকেই বরণ করিয়াছিলেন। পাঠানেরা কাহাকে হত্যা করিয়াছিল তাহা কিন্তু কেহই জানিতে পারিল না।

২

যে আহত মহারাষ্ট্র বীরকেশরী চিরাভ্যস্ত "মারা! মারা! হানা! হানা!" এই মারাঠী রণহুঙ্কার ছাড়িয়া একাকী পাঁচ জন দুরাণী অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি কে? আচার্য্য যদুনাথ লিখিয়াছেন, ইনিই সেনাপতি সদাশিব রাও "ভাওসাহেব"। পাণিপতের কালা-আম সম্বন্ধে জনশ্রুতি তাঁহার অজানা নয়; উহার অবস্থান নির্দ্দেশসূচক পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রস্তর ফলক তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু স্বরচিত ইতিহাসে কালা-আমকে স্থান দেন নাই। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

"As he was walking over the field . . . a knot of five Durrani horsemen surrounded him and cried out to him to surrender . . . he gave them no reply . . . he was killed and his head cut off and carried away by his slayers."*

* *Fall of the Mughal Empire*, II, p. 343.

কয়েক পাতার পর ঐ পুস্তকেই ভাও সাহেবের শেষ-কৃত্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"The headless trunk of the Bhau *was dragged out of a huge heap of the slain* two days after the battle, and the *head on the third day,* and *burnt at different times with* proper rites."†

উদ্ধৃতাংশদ্বয় আমাদের কাছে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হইতেছে, যথা :—

(১) প্রথমাংশের বর্ণনা যদি সত্য হয় তবে ভাও-সাহেব যুদ্ধস্থলে যেখানে এবং যে সময়ে নিহত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার সঙ্গে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না, আক্রমণকারী পাঠানগণ আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহ মরে নাই। সুতরাং ঐ স্থানে দ্বিতীয়াংশে উদ্ধৃত "huge heap of the slain" কেমন করিয়া আসিল ?

(২) ঐ মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে শুধু ভাওসাহেবের ধড় কেমন করিয়া পড়িয়া রহিল ? যে ব্যক্তি মাথাটি কাটিয়াছিল সে যদি জানিত উহা ভাওসাহেবের মাথা তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা সরাসরি আহমদশাহ আবদালীর কাছে পৌছাইয়া দিয়া শাহান্‌শাহ-র দুশ্চিন্তা এবং তৎসহ আনুষঙ্গিক সকল ঐতিহাসিক সমস্যার অবসান ঘটাইত।

আমাদের মনে হয় তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের প্রমাণপঞ্জী বিচারের সময় মারাঠী ভাষায় লিখিত "ভাওসাহেবাঁ-চী বখর" প্রায় সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া আচার্য্য যদুনাথ সরকার মহাশয় সংশয়গ্রস্ত হইয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"But what puzzles the critical historian in the *Bhau Sahibanchi Bakhar* is that, hopelessly mixed up with its mass of demonstrably false statements, there are some true traditions (as proved by authentic facts), and some statements which have every appearance of being true though unsupported elsewhere. Therefore, the simple remedy of rejecting this work in its entirety would impoverish our scanty store of information on the battle, and *yet it is not safe to accept any of its statements so long as it cannot be corroborated by other and more reliable sources.*"

উদ্ধৃত কথাগুলির সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে, সংশয়স্থলে যাহা একাধিক প্রমাণদ্বারা সমর্থিত হয় না ঐরূপ কোন উক্তি তাঁহার মতে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে। আমরা কিন্তু বিপদের ঝুঁকি লইবার পক্ষপাতী। যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ক্ষেত্রে যে উক্তি অধিকতর প্রামাণ্য, প্রতিকূল উক্তির দ্বারা তাহা যত দিন খণ্ডিত না হয় তত দিন ঐ উক্তিকে সত্যের কাছাকাছি কিছু বলিয়া গ্রহণ করিতে দোষ কি ? অবশ্য এই রীতি—নীতি নহে, আপদ্ধর্ম্ম—ইহাতে সত্যের সন্ধান না মিলিতেও পারে। 'ভাও-বখর' হইতে ইতিহাস সংগ্রহ অনেকটা স্বর্ণকারের পোড়া কাঠকয়লা ধুইয়া চালিয়া দু-এক রতি সোনা বাহির করার মত ব্যাপার। ভাওসাহেব এবং তাঁহার দ্বিখণ্ডিত শব ও মস্তকের পরিণাম আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা আচার্য্য যদুনাথের বর্জ্জন-নীতির একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি।

ভাওসাহেব-বখরে লিখিত আছে—বিশ্বাস রাও এবং অপর তিন জন মারাঠা সর্দ্দারের মৃতদেহ নিজের বেতন হইতে তিন লক্ষ টাকা কাটাইয়া সুজাউদ্দৌলার সেনানায়ক উমরাও গিরি গোঁসাই মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয় বিধিপূর্ব্বক অগ্নিসংকার করিয়াছিলেন। এই উক্তির মধ্যে যে অংশ ভ্রমাত্মক আচার্য্য যদুনাথ অধিক প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্যে উহা সংশোধন করিয়াছেন; কিন্তু ছাঁটাইয়ের সঙ্গে "তিন লক্ষ টাকা" এবং গোঁসাই উমরাও গিরির প্রশংসা এই ব্যাপার হইতে বাদ পড়িয়াছে। আমাদের অভিযোগ এই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে। "তিন লক্ষ টাকা" ভাওসাহেব-বখর ব্যতীত অন্য কোথাও নাই বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন নাই। বিশ্বাস রাও-র মৃতদেহ তিন দিন দুরাণীর ডেরায় আটক ছিল। কাঁচা চামড়ার ভিতর বিচালী পুরিয়া ঐটিকে তাহারা বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ দেশবাসীকে "হিন্দুর বাদশাহ" দেখাইবে ইহাই ছিল পাঠানদের দাবি। বিনা মূল্যে শুধু সুজাউদ্দৌলার কাকুতি-মিনতিতে দুরাণী বিশ্বাস রাও-র মৃতদেহ হাতছাড়া করিল—ইহা যত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, মৃতের জন্য "তিন লক্ষ টাকা" পণ ততদূর অবিশ্বাস্য নহে। দ্বিতীয় কথা—উমরাও গিরির নাম স্বতন্ত্র প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত না হইলেও তাঁহার দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। দুরাণী যদি কোন কাফেরের উপর এই মেহেরবাণী করিয়া থাকেন তবে সেই কাফের উমরাও গিরি ছাড়া আর কেহ নহে। কেননা মুসলমান অপেক্ষা অধিক ইমানদারীর সহিত তিনি ও তাঁহার নাগা চেলারা দুরাণী-পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বহু মারাঠা বধ করিয়াছিলেন। ইহার উপরে আরও তিন লক্ষ টাকা না পাইলে দুরাণী হয়ত বিচালী-ভরা বিশ্বাস রাওকে কাবুল লইয়া যাইতেন। বিভিন্ন বর্ণনার গোলমাল মিটাইবার জন্য আচার্য্য যদুনাথ গোঁসাইজীর নাম না করিয়া লিখিয়াছেন, "সুজাউদ্দৌলার ব্রাহ্মণগণ"। ইহাতে গোঁসাইজীর প্রতি হয়ত অবিচার করা হইয়াছে। গোঁসাই উমরাও গিরির গুরু রুদ্রতেজা রাজেন্দ্রগিরি ছিলেন সুজাউদ্দৌলার পিতা নবাব সফদর জঙ্গের গুরু এবং নাগা-

† *Ibid*, p. 349.

বাহিনীর সেনানায়ক; শিষ্যের জন্য বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ফিরোজশাহ কোটলা আক্রমণ করিবার সময় তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দেওয়ার সময় সুজাউদ্দৌলার মাতা উমরাও গিরির হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, যেহেতু রাজমাতা সুন্নী মুসলমানের সান্নিধ্য মিত্র হিসাবেও শিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করিতেন। সুতরাং ভাও-বখর-বর্ণিত উমরাও গিরির পুণ্যকৃত্যের প্রশংসা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা যায় না; পাঠান শিবিরে থাকিয়া হিন্দুর শেষকৃত্য সমাধা করিবার মত বুকের পাটা এক মাত্র উক্ত নির্ভীক সন্ন্যাসী যোদ্ধা ব্যতীত আর কাহারও হইতে পারে না।

৩

তৃতীয় পাণিপত-যুদ্ধের সম্পূর্ণ প্রমাণপঞ্জী আচার্য্য যদুনাথ ব্যতীত আর কাহারও হস্তগত হয় নাই। তাঁহার সর্ব্বশেষ এবং অতি মূল্যবান সংগ্রহ সৈয়দ নূরউদ্দীন হাসান-প্রণীত নাজিবুদ্দৌলার জীবন-চরিত যুদ্ধের বার বৎসর পরে লিখিত। নূরউদ্দীন যুদ্ধের কয়েক মাস পূর্ব্বে ভরতপুরে পলাইয়া গিয়াছিলেন। সুজাউদ্দৌলার শিবিরে এবং মহম্মদ জাফর শামলু দুরাণী সর্দ্দার শাহ-পছন্দ খাঁর ডেরায় উপস্থিত ছিলেন। কাশীরাজ যুদ্ধের ১৯ বৎসর পরে এবং শামলু ৩৫ বৎসর পরে ক্ষীয়মাণ স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভাওসাহেব সম্বন্ধে অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, এ ধরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন মহারাষ্ট্রবাসীর লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। বহু বৎসর পরে জনশ্রুতিমূলক কতকগুলি বখর এবং কৈফিয়ত লেখা হইয়াছিল। ভাওসাহেবাঁ-চী বখর এই শ্রেণীর রচনা এবং এইগুলির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আচার্য্য যদুনাথ ভাও-বখরকে আফিমখোরের গল্পের পর্য্যায়ে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই তাঁহার মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অন্য কোন লেখক কর্তৃক সমর্থিত না হইলেও ইহার কোন কোন অংশ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া তিনি মনে করেন, এবং স্বয়ং স্থানে স্থানে এই বখরের বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও আমাদের মনে হয় ইহাকে তিনি কিছু অতিরিক্ত সন্দেহের চোখে দেখিয়াছেন। যাহারা এই যুদ্ধ দেখিয়াছে, যুদ্ধের পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি যাহারা সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে অবগত হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে এই বখর-লেখক খবর সংগ্রহ করিয়াছেন—এইরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। মারাঠা পক্ষের সত্য এবং অর্দ্ধ সত্য বিবরণ এই বখর ছাড়া আর কোথায়ও আছে বলিয়া মনে হয় না। সন তারিখ অশুদ্ধ কিংবা বিভিন্ন অংশ পরস্পর অসংলগ্ন এই ক্রটির জন্য ইহাকে বাতিল করা যায় না। এই বখর জনশ্রুতি সংগ্রহ; কিন্তু 'নাহ্যমূলা জনশ্রুতি':—শুধু এই কারণেই আমরা ইহাকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী নহি। "জনশ্রুতি অমূলক নয়"—এই দুর্ব্বলতার স্থান ঐতিহাসিক গবেষণায় থাকিতে পারে না; অথচ বিনা বিচারে সামান্য বস্তুকেও ত্যাগ করিবার অধিকার ঐতিহাসিকের নাই। উৎপত্তিস্থল, সময় এবং বক্তা ও শ্রোতার মনোভাব দ্বারা জনশ্রুতির বিচার যদি ইতিহাস-সম্মত হয় তবে ভাও-বখর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

যাহা হোক, ভাওসাহেবের অন্তিমদশা এবং মৃতদেহের কি গতি হইয়াছিল উহাই বিচার্য্য বিষয়। আচার্য্য যদুনাথের বিবরণ বহু পুস্তক হইতে সংগৃহীত এবং প্রত্যেকটি ঘটনা বিচারের কষ্টিপাথরে তিনি ঘষিয়া দেখিয়াছেন; তবে পাচ জন পাঠানের সহিত ভাওসাহেব একা যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন, অথচ দুই দিন পরে তাঁহার ধড় মৃত দেহের স্তূপ হইতে বাহির হইল—ইহাই বা কেমন কথা? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় ইহার একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা। যাহারা কাশীরাজের পুস্তক অন্যান্য বিবরণের সহিত মিলাইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন উক্তিদ্বয়ের কোনটাই মিথ্যা কিংবা অসম্ভাব্য নহে। দুইটি ঘটনার মধ্যে যেমন দু'দিনের ব্যবধান, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যাপারগুলি আচার্য্য যদুনাথ বিশদভাবে বর্ণনা করিলে পুস্তকের (*Fall of the Mughal Empire*, vol. ii) অন্ততঃ দুই পাতা বাড়িয়া যাইত এবং সাধারণ পাঠক কোন অসংলগ্নতা দেখিতে পাইত না। তিনি মাত্রারক্ষার খাতিরে তাহা করেন নাই বলিয়া আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছি। প্রথমে আমরা ভাওসাহেব-বখর হইতে মোটামুটি ঘটনাবলী উদ্ধৃত করিব। বখরকার লিখিয়াছেন—

"[ভাওসাহেব এবং জনকোজী সিন্ধিয়া] কিছুক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। ইহার পর ভাওসাহেব ও জনকোজী সিন্ধের গতি কি হইল কেহ বলিতে পারে না; বিশেষতঃ তাঁহারা দুই জন কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হইলেন না—গায়েব হইলেন, কি আশমানে উড়িয়া গেলেন, কি পৃথিবীর পেটে ঢুকিয়া পড়িলেন? ভগবানের লীলা ব্রহ্মাদি বুঝিতে পারে না, মানুষের কি কথা? শত্রুর হাতে পড়িলে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তাহাদের আনন্দ হইত—তাহাও হয় নাই।"

(পৃঃ ১৫৩ টিঃ ১৭)।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভাওসাহেব সম্বন্ধে ইহার বেশী কিছু জানা যায় না। তাঁহার স্ত্রী পার্ব্বতী বাঈ অতি কষ্টে

দিল্লী পৌঁছিলেন; ভাওসাহেব সেখানেও নাই দেখিয়া তিনি নিরাশ হইলেন। সেখান হইতে হতাবশিষ্ট মারাঠা সর্দ্দারগণের সহিত পার্ব্বতী বাঈ মথুরার পথে গোয়ালিয়রে আসিয়া একমাস অপেক্ষা করিলেন। ভাওসাহেবকে তালাশ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে সন্ন্যাসী-চর প্রেরিত হইল; কিন্তু তাঁহার কোন ঠিকানা মিলিল না। ভাও-সাহেব মরিয়াছেন কি বাঁচিয়া আছেন কেহ নিশ্চয়পূর্ব্বক জানিতে পারে নাই। মোট কথা, যুদ্ধের বিশ বৎসর পরেও মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ ভাওসাহেব বাঁচিয়া আছেন এই গুজবে বিশ্বাস করিত, এবং এইজন্যই এক "জালী ভাও" উত্তর-ভারতে দেখা দিয়াছিল। "বলবন্তনামা"-প্রণেতা ঐতিহাসিক ফকর উদ্দীন এলাহাবাদী লিখিয়াছেন, একজন মারাঠা কর্ম্মচারী নিরুদ্দিষ্ট ভাওসাহেবকে চুণারে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। পেশবা-দপ্তরের কাগজপত্রে এই "জালীভাও"-র সহিত যাহারা ভোজন করিয়াছিল তাহাদিগকে দণ্ডপ্রদানের উল্লেখ আছে। ভাও-বখর হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়, ভাওসাহেবের মৃতদেহ আবিষ্কার ও অগ্নি-সৎকার মারাঠাগণ বিশ্বাস করে নাই। বিশ্বাস রাও এবং অন্যান্য মারাঠা সর্দ্দারদের মৃতদেহ উমরাও গিরি গোঁসাই' কর্ত্তৃক উদ্ধার এবং দাহক্রিয়া সম্পাদনের কথা ভাও-বখরে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই ব্যাপার জানিতেন, অন্য ব্যাপার অর্থাৎ ভাওসাহেবের ধড় ও মাথার বিভিন্ন দিনে দাহক্রিয়ার কথা তিনি শুনেন নাই এমন অনুমান করা যায় না।

তবে ভাওসাহেবের কি হইল? দুরাণী রক্ষী সেনা-দলের শেষ হাম্‌লায় ভাওসাহেব আহত ও ভূপাতিত হইয়া-ছিলেন কিন্তু প্রাণে বাঁচিয়া ছিলেন; নতুবা শেষ বেলা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাঁহার পক্ষে পাঠানের দৃষ্টি এড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আধ ক্রোশ দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। আধ ক্রোশ দূরে যেখানে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন ঐ স্থান পাণিপতের "কালা-আম"। আচার্য্য যদুনাথের বিবরণ জনশ্রুতি হইতে গৃহীত না হইলেও জনশ্রুতি উহার পরি-পূরক। তাঁহার বর্ণনার মধ্যে "কালা-আম" নাই কিন্তু এখন উহাকে ইতিহাসে স্থান দেওয়া আমরা অযৌক্তিক মনে করি না।

৪

কালা-আমের তলায় ভাওসাহেবের যে মস্তকবিহীন দেহ নিভৃতে পড়িয়া রহিল দুই দিন পরে উহা স্তূপীকৃত মড়ার গাদার মধ্যে কেমন করিয়া আসিল? এই প্রশ্নের উত্তর কাশীরাজ-লিখিত বিবরণে নাই; কিন্তু মৃতদেহের স্তূপের মধ্যেই ঐ দেহ পাওয়া গিয়াছিল ইহা তিনি লিখিয়াছেন। যুদ্ধের পরের দিন পাণিপতের ময়দানে মরা বাছাই এবং গণনার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। মুসলমানদের মৃতদেহ গোর দেওয়া হইল এবং কাফেরগণ পড়িল শকুন-শিয়ালের ভাগে। যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য বীভৎস—স্থানে স্থানে মড়ার গাদা এবং প্রতি দুরাণী তাঁবুর সামনে কাটা মাথার স্তূপ। আটাশ হাজার মৃত এবং বাইশ হাজার বন্দী মারাঠার মধ্যে ভাওসাহেবকে না পাইয়া দুরাণী আহমদ্‌শাহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। বন্দী স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যাহারা ভাওসাহেবকে চিনিত তাহাদের দ্বারা মড়া সনাক্ত করিবার হুকুম জারী হইল। ভাওসাহেবের নর্ত্তকী এবং ক্রীতদাসীগণ গায়ের গন্ধ শুঁকিয়া ভাওসাহেবের মৃতদেহ চিনিতে পারে কিনা এই জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধস্থলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, ইহার বেশী ইতিহাসে নাই। কিন্তু ইহা হইতে বুঝা যায় মৃত-দেহগুলির মধ্যে মাথাকাটা শব বিস্তর ছিল। মুখ দেখিয়া চিনিবার উপায় থাকিলে গায়ের গন্ধ শুঁকাইবার বুদ্ধি মাথায় গজাইত না। তালাশের এই তোলপাড়ের হিড়িকেই যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে গৃহীত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের মধ্যে সম্ভবতঃ ভাওসাহেবের কবন্ধ ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। মাথা না থাকিলেও অন্তরঙ্গ-জনের পক্ষে সদাশিব রাওয়ের মত সুপুরুষের ডন-কুস্তী করা শরীর ঠিক ঠিক সনাক্ত করা এবং আটাশ হাজার মড়া উলট-পালট করিতে দুই দিন সময়ক্ষেপ কিছুই বিচিত্র ব্যাপার নহে। ভাওসাহেবের ধড় পাইয়াও আহমদ্‌শাহ-র সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। এইজন্যই ধড়ের পরে আসিয়া-ছিল মাথা সনাক্তের পালা। যে পাঁচ জন দুরাণী অশ্বারোহী অজ্ঞাতসারে মহারাষ্ট্র সেনাপতির ছিন্নমস্তক লইয়া ফিরিয়া-ছিল তাহারা অন্যান্য গাজীগণের ন্যায় বাহাদুরির নমুনা-স্বরূপ ঐ মাথা তাঁবুর সামনে নিশ্চয়ই রাখিয়া দিয়াছিল এবং পরে তালাশের সময় উহা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

আচার্য্য যদুনাথ টিপু স্থলতানের মৃত্যুর সহিত সদাশিব রাওয়ের অসীম সাহস ও বীরোচিত মৃত্যুর তুলনা করিয়াছেন বলিয়া যদি কেহ মনে করেন যুদ্ধস্থলে শত্রুমিত্রের শবদেহ-বেষ্টিত হইয়া ভাওসাহেব মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন, এই কথা ঐতিহাসিক বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা হইলে ভুল করা হইবে। এইরূপ অভিপ্রায় থাকিলে ঐ অংশ পুস্তকের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে সংযুক্ত হইত।

আহমদ্‌শাহর মত আচার্য্য যদুনাথও অনেককাল ভাওসাহেব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। এই জন্য দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি একবার সশিষ্য "কালা-আম" অভিযান করিয়াছিলেন; সম্প্রতি সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই পাঠকদের কাছে নিবেদন করিব।

৫

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর বেলা ১১টার সময় একখানা মোটরগাড়ীতে আচার্য্য যদুনাথ তাঁহার যে দুই জন ছাত্রকে লইয়া পাণিপত যাত্রা করেন তন্মধ্যে এক জন এক ছদ্মবেশী রাজপুত্র,অপর ব্যক্তি বর্ত্তমান লেখক স্বয়ং। আমাদের সঙ্গে পাণিপত তহশীলের ৪ মাইল স্কেল ম্যাপ, ক্যামেরা ইত্যাদি ছিল, স্থানীয় কোন পথপ্রদর্শক ছিল না। বেলা সাড়ে বারটার সময় পাণিপত ষ্টেশনে মোটরগাড়ী রাখিয়া আমরা শহরের মধ্যে একটি জৈন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাজির হইলাম। স্কুলের প্রধান পণ্ডিত আচার্য্য যদুনাথের পূর্ব্বপরিচিত। তাঁহার খর্ব্বাকৃতি দোহারা চেহারা, রং কালো চোখ দুইটি বড় এবং দৃষ্টি চঞ্চল। জাতিতে তিনি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ; মহাদজী সিন্ধিয়ার আমল হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পাণিপত তহশীলে জায়গীর ভোগ করিয়া প্রায় হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছেন। আমরা "কালা-আম" দেখিতে যাইব, অথচ পথ কাহারও জানা নাই। স্কুলের এক জন শিক্ষক তালাশ করিয়া এক ব্যক্তিকে লইয়া আসিলেন, জাতিতে চামার, নাম রামদাস। উক্ত শিক্ষক এবং রামদাসকে সঙ্গে লইয়া আমরা শহরের বাহিরে ধূ-ধূ করা মাঠে উপস্থিত হইলাম। ঐখানে রাস্তা দূরের কথা, পাকদণ্ডী পর্য্যন্ত নাই, মাথার উপর রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। মাইলখানেক চলিবার পর আচার্য্যদেব একটা উঁচু ঢিবির মত দেখিতে পাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কালিকা! ওটা কি?' আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, চারিদিকেই যেন শুধু অতীত ইতিহাসের ছবি দেখিতেছি। গুরুদেবের কথায় চমক ভাঙিল, দেখিলাম একটি ছোটখাটো পাহাড়, লাল রং, রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। একটু বুদ্ধি খাটাইয়া উত্তর দিলাম, 'বোধ হয়, ইটের পাঁজা, কি কোন পুরনো জিনিষ হইতে পারে।' আমার উত্তর শুনিয়াই সকলে হাসিয়া উঠিলেন; আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। গুরুজী হাসিয়া বলিলেন—'তোমার নেহাত চেনা জিনিষ চাটগেঁয়ে লঙ্কামরিচ চিনিতে পারিলে না?' একটু কাছে গিয়া দেখিলাম সত্যই শুক্‌না লঙ্কামরিচের ক্ষেত যেন ছোটখাটো একটি পাহাড়ের মত। চলিতে চলিতে আমি কল্পনায় পাণিপতের ময়দান মারাঠার রক্তে লালে লাল দেখিতেছিলাম, লঙ্কামরিচ কল্পনায়ও আসে নাই।

ইহার পর আরও কিছুদূর যাইবার পর আমাদের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িল। রামদাস আমাদিগকে কখনও বামে, কখনও ডাহিনে হাঁটাইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিল। তাহাকে বিদায় দিয়া গুরুজী ম্যাপ খুলিয়া বসিলেন। কদম ফেলিয়া স্থানের দূরত্ব নির্ণয়ের তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তিনি ম্যাপ দেখাইয়া আমাদিগকে বলিলেন, 'শহর হইতে আমরা এত দূরে এই জায়গায় এখন আছি; অমুক গ্রাম হইতে এত মাইল দূরে লড়াই হইয়াছিল; মারাঠারা পলাইয়া হয় উত্তর না হয় পশ্চিম দিকে গিয়াছিল। এই জায়গা হইতে দুই মাইল অমুক দিকে গেলে আমরা "কালা-আম"-এ পৌঁছিতে পারি। রামদাসের মত আমিও দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। আমরা তাঁহার পিছে পিছে চলিলাম। এক ঘণ্টা পরে প্রায় তিনটার সময় "কালা-আম"-এ পৌঁছিলাম। এক শত ছিয়াত্তর বৎসর পূর্ব্বে এমনি সময়েই তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল; শস্ত্রাঘাতে সম্বিৎহারা ভাওসাহেব তখনও শবদেহের স্তূপ হইতে উঠিয়া কালা-আমের দিকে শেষ যাত্রা সুরু করেন নাই। "কালা-আমে"র স্মৃতিচিহ্নের কাছে এক জন সপ্ততিপর ব্রাহ্মণ-কৃষক Persian wheel-এর দ্বারা কুয়া হইতে ক্ষেতে জল দিতেছিল। গুরুজী বলিলেন,'এই স্থানের সন্নিকটে কোন একটা বাউলী বা পাকা ঘাট-বাঁধান কুয়ার ধারে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর মারাঠা সৈন্যগণ এক দল দুরাণী অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দিয়াছিল। ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ এই জায়গার কাছাকাছি কোন বাউলী আছে নাকি।'

এই বার আমার পালা। পূর্ব্ব-পঞ্জাবের গ্রামীণ লোকের সহিত কথা বলিবার ভাষা গুরুজী কিংবা রাজপুত্রের রপ্ত নাই। দিল্লী রোহতকের গ্রামে জাঠ চৌধুরী-গণের সাহচর্য্যে আমি গ্রাম্য ভাষা কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়া-ছিলাম। আমি কুয়ার কাছে গিয়া নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলাম। বৃদ্ধ বলিল, 'লালাজী, (যেহেতু আমার মাথায় লক্ষ্ণৌর লালা টুপী ছিল) এই জায়গার চারদিকে বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত মাঠ-গ্রাম আমার কদম কদম জানা আছে। যেখানে আমরা চাষবাস করিতেছি সেইখানে সুয়া খেরী নামে এক গ্রাম ছিল। এখান হইতে দেড় মাইল দূরে রাজা খেরী গ্রামে একটা বাউলী আছে; গ্রামের যোগী এখনও ভাও-র গীত গাহিয়া ভিক্ষা করে।' আমি আসিয়া গুরুজীকে এই কথা বলিবামাত্র তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি সেই বাউলী দেখিয়া যোগীর নিকট হইতে ঐ গীত লিখিয়া আনিতে পার? অতঃপর স্থির হইল, আচার্য্যদেব তাঁহার অপর শিষ্যসহ আমার জন্য ষ্টেশনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন, ইতিমধ্যে আমি রাজা খেরী গ্রামে যাইয়া যোগীর গান লিখিয়া আনিব এবং বাউলী দেখিয়া আসিব। তিনি কয়েকটা টাকা আমাকে দিলেন, টাকার কি প্রয়োজন

হইতে পারে আমি তখন ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। পরে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ এবং আরও কয়েক-জন লোকের সহিত আমি গ্রামের দিকে চলিলাম। কথা-বার্ত্তায় তাহাদের সঙ্গে ভাব হইয়া গেল। তাহারা বলিল রাত্রে আমার থাকার বন্দোবস্ত করিবে এবং যোগীর গীত শুনাইবে। আমরা গ্রামে পৌঁছিতেই বেলা প্রায় শেষ হইয়া-ছিল। গ্রামের বাহিরে যেখানে লোকে গরু-মহিষকে জল খাওয়ায় সেখানে আসিয়া আমার সঙ্গীরা ফিস ফিস করিয়া কি বলাবলি করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকজন লোক সেখানে জমায়েৎ হইল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-কৃষক বলিল, গ্রামের ভিতরে গেলেই "বাউলী" দেখা যাইবে, আমি ইচ্ছা করিলে সেটি গিয়া দেখিয়া আসিতে পারি, আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আমার জন্য তাহারা অপেক্ষা করিবে। বৃদ্ধ যে দিকে পথ দেখাইয়া দিল সেই দিকে গিয়া দেখিলাম কিছুই নাই; কতকগুলি উলঙ্গ শিশু ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। ফিরিয়া আসিয়া দেখি বৃদ্ধ ও তাহার সঙ্গী লোকজন সবাই চম্পট দিয়াছে। বেগতিক দেখিয়া আমি সটান গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া সরকারী মেজাজে কড়া আওয়াজে এক জনকে বলিলাম, 'চৌকিদার-কো বোলাও।' ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন লোক জড় হইয়া সন্ত্রস্তভাবে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা আমাকে গ্রামের চোপাড়ে লইয়া গেল।

চোপাড় কাঁচা চৌচালা বড় হল-ঘর, সর্ব্বসাধারণের খরচে তৈয়ারী। ঐখানে সারি সারি খাটিয়া, গোটা দুই জলের মট্‌কা, দুই ডজন হুঁকা। এই হল-ঘর একাধারে গ্রামের ক্লাব, অতিথিশালা এবং পঞ্চায়েতী আদালত। ঐ গ্রামের লম্বরদার এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ জাঠ। এইবার আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার উপস্থিতিতে গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল। আমি কে? কি জন্য আসিয়াছি? কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। যোগীর খবর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে এই গ্রামের লোক নয়; রিসালু গ্রামে তাহার নিবাস। একজন লোক সাইকেল লইয়া যোগীকে আনিবার জন্য চলিয়া গেল। আমি এই অবসরে বাউলী দেখিয়া আসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম পুরনো বাউলীর নূতন সংস্কার হইয়াছে। এক ঘণ্টা পরে লোকটি রিসালু হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যোগী ভিক্ষা করিবার জন্য কোন দূর গ্রামান্তরে গিয়াছে, পরের দিন ফিরিতে পারে। গ্রামের লোকেরা এক বানিয়ার বাড়ী হইতে আমার জন্য রুটি আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। আমি কিন্তু আতিথ্যগ্রহণে অক্ষমতা জানাইয়া একাকীই পানিপত যাত্রা করিলাম। গ্রামবাসীরা সম্ভবতঃ মনে করিল নায়েব তহশীলদার বাউলীর তদন্ত করিতে আসিয়াছিলেন, বাড়ী গাজিয়াবাদ। তাহারা গ্রামের সীমানায় রাস্তা পর্য্যন্ত আমাকে আগাইয়া দিয়া বিদায় লইল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে যাহাকে জিজ্ঞাসা করি পানিপত কত দূর, সে-ই বলে আধ ক্রোশ। এই ভাবে চারি আধ ক্রোশ চলিয়া পানিপতে উপস্থিত হইলাম। তখন রাত প্রায় ৮টা হইয়াছে। নূতন কিছু পাওয়ার উত্তেজনা এবং সরকারী মেজাজের গরমে এতক্ষণ শীত অনুভব করি নাই; এবার কাঁপুনি আরম্ভ হইল। শীতে কাতর হইয়া আমার আসল বিলাতী গরম ওভারকোটের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম যাওয়ার সময়ে গুরুজী হয়ত গাড়ীতে তালাশ করিয়া প্রাইমারী স্কুলমাষ্টারের কাছে ওটি রাখিয়া গিয়াছেন। মাষ্টারের বাড়ীতে গিয়া জানিতে পারিলাম সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া গুরুজী দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন, কোন কোট রাখিয়া যান নাই। ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, শুনিলাম রাত ১২টায় দিল্লীর একখানা গাড়ী আসিবে। ঐখানে ভাজা ছোলা ও গুড় ছাড়া কোন ভোজ্য দ্রব্যই নাই। দুই আনায় পেট ভরাইয়া শেষে ঠাণ্ডা জল খাইলাম। ইহার পরে শীতের সহিত লড়াই। দুইখানা হাত মাত্র সম্বল—বুকটা চাপিয়া ধরিলাম। যাত্রী সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর। এক জন গরীব জাঠ ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়া বসিয়াছিল। আমার অবস্থা দেখিয়া সে বলিল, "মাষ্টারজী, আধা কম্বল ওড় লেও।" তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলাম—রাত্রি ২টায় দিল্লী পৌঁছিয়া বাকী রাতটা কাটাইব কোথায়? গুরুজী যেখানে আছেন রাত্রিবেলা সে আস্তানা বাহির করা যাইবে না, হ্যামিল্টন রোডে রাস্তা হইতে চীৎকার ছাড়িলে বন্ধু অশ্বিনী মুখুজ্জে জাগিবেন কিনা সন্দেহ; সুতরাং ষ্টেশন ইয়ার্ডে যেখানে কাঁচা কয়লা পোড়াইয়া কুলীরা রাত কাটায় সেখানেই আশ্রয় লইতে হইবে। যাহা হোক শেষে অশ্বিনীবাবুর কাছে জানিতে পারিয়াছিলাম, রাত প্রায় ৮ টার সময় একখানা মোটর গাড়ী হইতে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন; তিনিই আমার ওভারকোট রাখিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছিলেন রাত্রিতে আমি দিল্লী ফিরিব। তাঁহার সঙ্গে আর একজন যুবক ছিলেন—বলা বাহুল্য ইনিই "সীতামৌ" রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাঠোর কুল-তিলক কুমার রঘুবীর সিংহজী। দিল্লীতে পৌঁছিয়া প্রস্তুত অন্ন এবং অপেক্ষমাণ অর্দ্ধজাগ্রত বন্ধুকে পাইয়া পথশ্রম সার্থক মনে করিলাম।

৬

এই অভিযান নিতান্ত নিরর্থক হয় নাই। রিসালু গ্রামের যোগীর গীত সম্বন্ধে যে খবর পাইয়াছিলাম, ঐ গীত প্রায় এক মাস পরে পাণিপতে আচায্য যদুনাথের পরিচিত এক সহৃদয় ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ গীত ব্যতীত ভাওসাহেব সম্পর্কিত অন্য জনশ্রুতিও গ্রাম্য লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে। রাজাখেরী গ্রামের চোপাড়ে নিকট হইতে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম উহার সারমর্ম্ম এই :—

"ভাওসাহেবের এক গেড়োরিয়ার সহিত এক পাঠানের ষড়যন্ত্র ছিল। পাঠান ঐ গেড়েরিয়াকে বলিল, বাবা! এইবার লড়াইয়ে আমাকে জিতাইয়া দাও, না হয় দুরাণীর কাছে আমার মান থাকে না। ভাও কুঞ্জপুরার (কুরুক্ষেত্রের কাছে) "ওলী"কে [নবাব] বন্দীদশায় অনাহারে রাখিয়াছিলেন, মরিবার সময় সে শাপ দিয়াছিল তাহারাও অন্নকষ্ট পাইবে। এইজন্য ভাও-র ডেরায় দুর্ভিক্ষ লাগিল। যুদ্ধে হার-জিতের অনিশ্চয়তার সময় ঐ গেড়েরিয়ার কথায় ভাও হাতী হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল। এই সময় ঐ বিশ্বাসঘাতক নীল ঝাণ্ডা তুলিয়া পাঠানকে ইশারায় জানাইয়া দিল সব শেষ হইয়াছে অর্থাৎ ভাও মরিয়াছে। ইহার পর দক্ষিণীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেল; এবং ঐ পাঠানের যোগসাজসে গেড়েরিয়া সরিয়া পড়িল। ভাও "কালা-আমে"র তলায় যুদ্ধ করিতে করিতে মারা গেল।"

ইহার অধিক ইতিহাস প্রায় দুই শত বৎসর পরে জনশ্রুতির মধ্যে কেহ আশা করিতে পারেন না। কুঞ্জপুরার যুদ্ধে (অক্টোবর, ১৭৬০) বিজয়ী মারাঠাগণ বর্ব্বরোচিত আচরণ করিয়াছিল। গুরুতররূপে আহত এবং বন্দী হইয়া কুঞ্জপুরার পাঠান-বীর কুতবু শাহ মারাঠাদের কাছে প্রার্থনা করিলেন, "আগে আমাকে একটু জল দাও, পরে আমার মাথা কাটিয়া ফেলিও।" দিল্লী হইতে ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে বাদলীর যুদ্ধে দত্তাজী সিন্ধিয়া যখন মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন (৯ই জানুয়ারী ১৭৬০) তখন এই কুতব শাহ দত্তাজীর মাথা কাটিয়া দুরাণীকে উপহার দিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর আচরণ মারাঠারা ভুলিয়া যায় নাই, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত মারাঠারা মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া মুমূর্ষু যোদ্ধাকে অশ্লীল গালাগালি দিল—"য়া মাত্রাগমনিয়াস লঘুশংকা প্রাশণ করবণে" [—কে মূত্র খাওয়াইয়া দাও]; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। জনশ্রুতি-উল্লিখিত "গেড়েরিয়া" বিশ্বাসঘাতক হীন প্রতিহিংসায় উত্তেজিত মলহর রাও হোলকর। হোলকর এবং সিন্ধিয়া শূদ্রজাতীয় ছাগল ও মেষপালক (হিন্দী—গেড়েরিয়া) ছিলেন। নজীব খাঁ রোহিলার নাম গ্রামবাসীরা ভুলিয়া গিয়াছে; তিনিই এই গল্পের "পাঠান।" "নীল ঝাণ্ডা" সম্পূর্ণ কাল্পনিক হইলেও হোলকার-নজীব খাঁর ব্যাপার সম্পুর্ণ ঐতিহাসিক। "সুক্করতাল" দুর্গে সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ নজীব খাঁ হোলকারকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া রেহাই না পাইলে দুরাণী শেষ বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করিত না এবং পাণিপতের তৃতীয় যুদ্ধও হইত কিনা সন্দেহ। হিন্দুস্থানে হোলকারের অনেক "ধর্ম্মপুত্র" ছিল—নজীব ইহাদের অন্যতম।

রিসালু গ্রামের যোগীর যুদ্ধগীতি* ছাপা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু "কালা-আম" এইবার সত্যই মরিয়া গেল। কারণ, আচায্য যদুনাথ "কালা-আম"কে তাঁহার ইতিহাসে স্থান দেন নাই। ভবিষ্যতে কোন ঐতিহাসিক উহা করিতে সাহসী হইবেন কিনা বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না

* *Fragment of a Bhao-Ballad in Hindi* by K. R Qanungo in *Sardesai Commemoration Volume.*
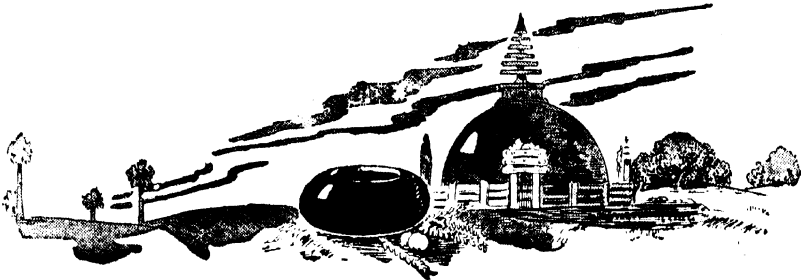
আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩০

যত বার শুভার সান্নিধ্য থেকে সরে এসেছে তত বারই মনে হয়েছে, এক একটা দুঃস্বপ্নের অবসান হ'ল। মনে হয়েছে সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে বৃহত্তর পরিধিতে বুঝি মুক্তি এল এগিয়ে। আসক্তির বাষ্প তরল হবামাত্র কর্ত্তব্যের পথ স্পষ্ট ফুটে ওঠে সামনে। প্রশান্ত তখন ভিন্ন মানুষ। তবে সে কাঠিন্যও কিছু দিন বাদে দ্রব হতে থাকে, যেখান থেকে আঘাত খেয়ে বিমুখ হয়েছিল চিত্ত—আবার সেই দিকেই তার গতিবেগ প্রসারিত হয়। আবার জমে বাষ্প—আশায় আবেগে উচ্ছ্বাসে আবার সব ভাসানোর, সব ভুলানোর মত্ততায় সে অধীর হয়ে ওঠে। দুর্নিরীক্ষ্য নক্ষত্রের নাগাল পাবার জন্য—এত ত্বরা কেন—সে রহস্য কে বোঝাবে তাকে! ঘৃণা কি মানুষকে নিকটবর্ত্তী করে? বেদনা কোন্ আনন্দ-অমৃত-রসের সন্ধান দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে লঘু করে—আত্মবিশ্বাসকে শিথিল করে দেয়? দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বুঝি পূর্ণত্বের প্রথম সোপান।

এ অন্যায়—অন্যায়। শুভা আজ তাকে আনন্দ দিতে পারে না—পূর্ণতা তো নয়ই। ওর কাছে এসে কেবল অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করবার বাসনা হয়। যুক্তি দিয়া যুক্তি খণ্ডনের পুলক সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করা যায়। ওকে অস্ত্রহীন করে যদি বাধ্য করাতে পারে আত্মসমর্পণে অর্থাৎ পরাজয় স্বীকারে—তার চেয়ে বড় সম্পদ প্রশান্তর কামনাতে আর কি-ই বা আছে। কিন্তু এই দণ্ডে মনে হচ্ছে—এ খেলার মত তুচ্ছ জিনিষ জগতে কিছু নাই। আনন্দ-অমৃতের সন্ধান শুভাই তাকে দেয় নি—মালতীও দিয়েছে পূর্ণতার ইঙ্গিত। একখানি ঘর, একটি মধুর সঙ্গ, নির্জ্জন অবসর আর আত্ম-উদ্‌ঘাটনের মুহূর্ত্তে—আত্মনিমজ্জন—পৃথিবীতে এই পাওনাটাই তো নর-নারীর সর্ব্বোত্তম সম্পদ। শুভা মরীচিকা—মালতী বন্দর। মালতী পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তার আত্মার সমীপে এসে দাঁড়িয়েছে—তাকে প্রত্যাখ্যান করবার ক্ষমতা প্রশান্তর নাই। এ রকম আত্মবঞ্চনা সে নাই বা করলে।

হাঁ অন্যায় হয়েছে—কালই মালতীকে নিয়ে তার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। শুভার সঙ্গে বুঝাপড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে পার্টির অণুতম অংশ শুভা—সেই পার্টির কাছেই তার দরবার। তাদের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনকে যুক্তি বলে স্বমতে আনলেই ব্যাপারটার আশু নিষ্পত্তির সম্ভাবনা ছিল। অথচ আলোচনার ছুতায় শুভাকে আর একবার দেখে···

পায়ের গতি দ্রুত হ'ল। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে দেখলে ট্রাম ডিপোর কাছে জনতা। কারা উত্তেজিত ভাবে কি বলছে—মাঝে মাঝে চীৎকার উঠছে শ্রমিকের ন্যায্য দাবি নিয়ে। ওরা শাসাচ্ছে ধর্ম্মঘট করবে। আট হাজার শ্রমিক রুখে দাঁড়িয়েছে বিলিতী মালিকের দ্বারা শোষিত না হবার দৃঢ় সঙ্কল্পে। আয়ের অঙ্ক যাদের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সে উপচে পড়ছে তাদের কর্ম্মচারীরা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে চারশো গুণ দ্রব্যমূল্য যুগিয়ে অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করছে। যা সামান্য মুষ্টিভিক্ষা রেশনে ও মাগ্‌গি ভাতায় মিলছে—তা 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম'। ওরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে ধর্ম্মঘট করবে।

পাশ থেকে একজন বললে—পনেরোটা দিন সবুর করলেই হ'ত—বিলেতের কর্ত্তাদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া হ'লে—

একজন রোগামত ছোকরা খেঁকিয়ে উঠল—বুঝাপড়া তো মাসখানেক থেকে চলছে। ন্যাকা! কর্ত্তারা কিছু জানে না—না?

তবু—

না—মশাই—না—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হওয়া দরকার।—উৎসাহে ছোকরার মুখ-চোখ জ্বলছে।

প্রশান্ত সরে এল। এ সব আলোচনা তার ভাল লাগছে না। আগুন জ্বললে দাহ্য বস্তুর বিচার-বিবেচনা নিরর্থক। ধর্ম্মঘট হবেই।

মালতীর সন্ধানে সে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করলে। কিন্তু মালতীর ঠিকানা সে জানে না। বারকয়েক গলির এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়ে আবার ফিরে এল বড় রাস্তায়। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। মেসে ফিরে যাবার ইচ্ছা তার নেই—একটা মাঝারি মত রেষ্টুরেণ্ট দেখে ঢুকে পড়ল।

শুধু আসন্ন ট্রাম-ধর্ম্মঘটের নয়—আরও বহু জায়গায় ধর্ম্মঘট চলছে ও চলবে তারও কর্ণরোচক মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। পোর্ট ট্রাষ্ট নাকি কুড়ি হাজারের ওপর কর্ম্মচারী নিয়ে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। প্রস্তুত হচ্ছে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—রাস্তায় রাস্তায় ওদের প্রাচীরপত্র দেখা যাচ্ছে। একশো চুয়াল্লিশ ধারা না থাকলে ধর্ম্মঘট ঘোষণার বন্যায় কলকাতা পরিপ্লাবিত হয়ে যেত।

ভাবতে ভাবতে মালতী যে গলিতে থাকে সেই গলিটাই সে বার দুই পরিক্রমা করলে। যদি পরিচিত কারও দেখা মেলে—কিম্বা মালতীই যদি দৈবক্রমে তাকে দেখে ছুটে আসে।

দুপুর বেলা—গলিটা নির্জ্জন আর আলো-আঁধারী। কারণ

সঙ্কীর্ণ অষ্টবক্রাকৃতি গলি। লোকজনের চলাচল কম। চার বার পাক খেয়ে গলিটা বড় রাস্তায় এসে মিশেছে। দ্বিতীয় বার পরিক্রমা সেরে প্রশান্ত যেমন মাঝামাঝি একটা বাঁকের কাছে পৌঁছেছে—অমনি তার মনে হ'ল কারা যেন সুড়ুৎ করে সরে গেল অন্ধকারের মধ্যে। দুষ্কৃতকারী না হ'ল অমন করে পালাবে কেন ওরা?

কে—কে—ওখানে? প্রশান্ত চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি কঠিন দ্রব্যের আঘাত এসে পড়ল মাথায়। অতর্কিত আক্রমণের বেগ সহ্য করতে পারলে না—জ্ঞান হারিয়ে ও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তার পর কিছুদিন কাটল ছায়ার জগতে। পরিচিত পৃথিবীর বহু দূরে সে লোক। তন্দ্রা-জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হল। অগাধ আলস্যে মন্থর হয়ে উঠল মুহূর্ত—বিস্তৃত হ'ল দিন—আবার গভীর নিদ্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল—কোন চিহ্ন না রেখে। কত সংবাদ শ্রবণ-পথে অর্থহীন প্রবাহে ভেসে এল—নিদ্রা আর অর্দ্ধ চৈতন্যে মিশে তারা কালসমুদ্রে হারিয়ে গেল একে একে। প্রায়ই দেখা দেয় সুপ্রসাধিতা একটি মেয়ে। মমতাভরা দুটি চোখে তার পলক পড়ে না—সেবানিপুণ করে প্রশান্তর মাথার চুলে সে পরিচর্য্যার স্পর্শ রেখে দেয়।

সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর স্পর্শে চৈতন্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত হতে চায়—আবার ছেয়ে আসে গভীর অন্ধকার। এমনি ভাবে চলতে চলতে এক দিন সে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কোথায়?

মেয়েটি ছুটে এসে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, আমায় চিনতে পারছ?

ক্ষীণস্বরে প্রশান্ত উচ্চারণ করলে, মালতী।

মেয়েটির মুখচোখ আনন্দে ঝলসে উঠল। পরম স্নেহে প্রশান্তর মাথায় হাতখানি রেখে বললে—ঘুমোও।

আমি কোথায়?

আমাদের বাড়ীতে।

প্রশান্ত মাথা নাড়লে। জ্ঞান ফিরে আসছে—মালতীও ফিরে এসেছে—কিন্তু সে কোথায়? অস্থির হয়ে উঠল প্রশান্ত। হাত দিয়ে টেনে টেনে মাথার বালিশটা খাটের একধারে সরিয়ে দিলে—ডান হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটাকে অল্প তুললে—বিস্ফারিত চোখে মালতীর পানে চেয়ে বললে, না—না—এসব সরিয়ে নাও—[illegible]রিয়ে নাও। ওরা ধর্ম্মঘট করেছে—বুঝতে পারছ না।

মালতী তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোমল কণ্ঠে বললে, কেউ ধর্ম্মঘট করে নি—তুমি ঘুমোও।

শরীরে ক্লান্তি—মনে কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে কৌতূহল জেগে উঠেছে। ও একটার পর একটা প্রশ্ন করেই চলল। অবশেষে ওর জিজ্ঞাসায় ক্লান্ত হয়ে মালতী উঠে গিয়ে রেডিয়োর চাবিটা ঘুরিয়ে দিলে। স্বরের অনর্গল প্রবাহ বয়ে চলল।

আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলন শেষ হ'ল আজ। গান্ধীজী বললেন—এক-দুনিয়া তৈরির মহৎ ব্রত এশিয়াবাসীরা যেন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত নেহরু বললেন, ইউরোপের শক্তির উৎস আজ দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একটি ধারা আত্মসাৎ করেছে আমেরিকা—আর একটি ধারা এশিয়াতে পৌঁছল। দু'শো বছরের নিপীড়িত মানুষেরা সেই শক্তিকে যেন সত্যের মহিমায় শুদ্ধীকৃত করে নিতে পারে। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদে এই বিশোধিত শক্তি আঘাত করুক প্রচণ্ড ভাবে, এশিয়ার জাগরণ হোক—পৃথিবীর নির্যাতিত মানবের কল্যাণময় জাগরণ।

৩১

এর পর ভারতবর্ষের জয়যাত্রা সুরু হ'ল। ঘটনার পর ঘটনার প্রবাহ ত্বরিত গতিতে বয়ে চলল। বিদায় নিলেন ওয়াভেল—শেষ বড়লাট হয়ে এলেন মাউণ্ট ব্যাটেন। ভারত-সমস্যার মীমাংসার জন্য ত্বরান্বিত হয়ে উঠলেন তিনি।...তিন মাসের স্তিমিতপ্রায় অগ্নি—জাতিবিদ্বেষ আবার জ্বলে উঠল। যে যেখানে প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিল সবাই তৎপর হয়ে উঠল। কেউ বললে, দ্বিজাতি-তত্ত্বের ফয়সালার জন্য এ একটা চাপ—কেউ বললে, না এটা বিদায়ী ব্রিটিশের কূটনীতি। দিনে দিনে নরশোণিতে ঘাতকের অস্ত্র হ'ল রঞ্জিত—পঞ্জাবী পুলিশের অত্যাচারে শহর হ'ল দূষিত। পঞ্জাবেও আগুন জ্বলে উঠল। মুসলিম লীগ দৃঢ় পণ করলে—পাকিস্থান চাই-ই। জীবন-পণ। হিন্দুর ষড়যন্ত্রজাল ছেদন করে মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করলে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। অবশেষে কংগ্রেসও টলল তার দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে। দ্বিখণ্ডিত বাংলা আর দ্বিখণ্ডিত পঞ্জাবের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে। প্রস্তাব নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ছুটলেন বিলেতে। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি ঘোষণা করলেন—যেহেতু নেতৃবৃন্দ অখণ্ড ভারতের আপোষ মীমাংসায় রাজী নন সেজন্যে ভারতবর্ষ দুটি খণ্ডে বিভক্ত হবে—হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান। সেই সঙ্গে পঞ্জাব আর বাংলাও বিভক্ত হবে। দুটি গণপরিষদ বসবে—প্রয়োজন হবে দু'জন গভর্ণর-জেনারেলের। দেশীয় রাজারা যে-কোন একটি গণপরিষদে যোগদান করতে পারবে। আর কোন বিভাগ হবে না। কেবল শ্রীহট্ট জেলা গণভোটের দ্বারা আসামে থাকবে কি বাংলায় যাবে—ঠিক হবে। আর সীমান্ত প্রদেশেও গণভোট প্রযুক্ত হবে। ওখানকার কংগ্রেসী মন্ত্রী বহাল থাকা-না-থাকা তারই দ্বারা নির্ণীত হবে। ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্য্যাদা দেওয়া হবে—আর পনেরই আগষ্টের ভিতর ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। একে ৩রা জুনের পরিকল্পনা বলা যায়।

মলয় এক মনে ডায়েরি লিখছিল। ভারতবর্ষের এই পরিবর্ত্তন তাকে নিজ শক্তি সম্বন্ধে প্রত্যয়শীল করে তুলেছে। এক দিন দুর্গম অন্ধকারে যাত্রা হয়েছিল সুরু—পথের নিশানা দৃষ্টিগোচর ছিল না—মনের দৃঢ় সঙ্কল্পে পথ চলছিল। লাঞ্ছনা নির্যাতন সয়ে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে সর্ব্বস্বান্ত হবার পর যে পথ আজ সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার আবিষ্কার ইতিহাসের নজীর হয়ে থাকবে—বিশ্বের বিস্ময়ও বটে! বিনা রক্তপাতে···ভ্রূকুঞ্চিত করে এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে থেকে মলয় হাসল। আবার সে কলম তুলে নিয়ে লিখলে, এই ভাবে বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতনতর অধ্যায় সংযোজিত হ'ল। বিনা রক্তপাতেই বটে! শক্তির কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে আঘাত পড়ছে—টুকরো ভারত শুধু নয়—জাতি-বিদ্বেষ ও শক্তি বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান উপকরণ হয়ে আরও কতকাল ধরে এই দেশকে—প্রত্যক্ষ না হোক অলক্ষ্য-নিয়ন্ত্রিত পরশাসনের ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ করে রাখবে, কে জানে! ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব তো চলছেই—পৃথক অস্তিত্বে সে বিদ্বেষের নিবৃত্তি ঘটবে এ ধারণা হয়ত ভুল। তবু আলাপ না হয়ে আজ গত্যন্তর নাই।···রুগ্ন অঙ্গে অস্ত্রোপচারের দ্বারা আসল মানুষটাকে সুস্থ করে তুলবার মত আশা পোষণ না করে উপায় কি! আবার খণ্ড ভারত জোড়া লাগবে—যদি মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। মানুষ সৃষ্টি করেছে দেশকে—মানুষকেই আবার দাঁড়াতে হবে দৃঢ় সঙ্কল্পে—যাতে ক্লেদ-পঙ্কিল বিষাক্ত বাসনাগুলির ধ্বংসসাধন হয়।

সুচিত্রার হাসিতে মলয় মুখ তুলে চাইলে। ও এতক্ষণ চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে মলয়ের লেখনী চালনা লক্ষ্য করছিল। কলমের ডগায় বাইরের ঘটনা মনের রসে অভিষিক্ত হয়ে যা ব্যক্ত করছিল তা একান্ত মলয়ের বক্তব্য নয়। রক্তমোক্ষণজনিত দৌর্ব্বল্যে পৃথিবী ফিরে পেতে চাইছে এমন শান্তি যা সত্যকারের কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা তাই জাতিকে সতর্ক করে দিচ্ছেন—পরমাণুর ধ্বংসকারিতা শক্তি বাড়াবার গবেষণা এইবার ইতি হোক। মানুষ আর তার সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্য এই অনুসন্ধিৎসাকে নিবৃত্ত করতেই হবে। অস্ত্র সঞ্চয় করে যুদ্ধ করব না—এই নীতি অচল। আগেকার বহু যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী গত দুটি মহাযুদ্ধে এর প্রমাণ স্বাক্ষরিত রয়েছে। সুচিত্রার হাসির পরও কলম নিয়ে মলয় ঐ ক'টি লাইন যোগ করে দিলে।

ডায়েরি বন্ধ করে সে হাসিমুখে বললে, তোমার হাসির কারণ?

কারণ—সৃষ্টির আদিযুগের প্রথম কথাটি মনে পড়ল। পুরাণে আছে না—সুর-অসুরের দ্বন্দ্ব পৃথিবীর জন্মকাল থেকে চলে আসছে। সমুদ্র মন্থনে এর সূত্রপাত—

মলয় বললে, তখন অসুরেরা ছিল বর্ণজ্ঞানহীন, কাজেই তাদের কথা পুরাণে নাই। তবু সুচিত্রা, সেই প্রথম যুগের বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া আজও চলছে।

আজ অসুরেরা কোথায়—দেবতাই বা কে?

সেটা এক কথায় বলা শক্ত নয়। আর বললেও কেউ মানবে না। হিটলারের 'আমরা আর্য্য' নীতির প্রত্যুত্তরে রাশিয়ার নৃতত্ত্ববিদেরা ঘোষণা করেছিলেন, সভ্য মানুষের আদি জন্মভূমি নাকি ঐ দিকে—স্বর্গ বলতে সেকালে যা বোঝাত তা উরাল পাহাড়ের ওপিঠে কোন দেশ—।

আচ্ছা—ওসব বড় বড় কথা না বললেও আমরা জানি—আজকার অসুরেরা আর বর্ণজ্ঞানহীন নয়—তারা বুদ্ধিহীনও নয়। তারা বেশ বদল করেছে বলে আমরা তাদের চিনতে পারছি না।

আজকের দেবতারা কে?

আজ দেবতার সংখ্যা কমে গেছে—এত কম যে আঙুলের পর্ব্বে এসে দাঁড়িয়েছে সে সংখ্যা। যাই হোক—তোমার মিলনতত্ত্বের মধ্যে এই কথাটিও লিখে রাখ—দুটি পরস্পর-বিপরীত-ধর্ম্মী দ্রব্যের মিশ্রণেই সৃষ্টির উন্নতি—সৃষ্টির সার্থকতা। অনেক চেষ্টা করেও—আধবুড়ো বয়সের মাথার কাঁচা চুল থেকে পাকা চুলগুলো নিঃশেষ করা যায় না—তেমনি এই সৃষ্টিকেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তবে চেষ্টা করব না? মলয় হাসল।

বাঃ! না হলে বেঁচে থাকার অর্থ কি রইল!

মলয় কলম তুলে নিয়ে বললে, দাঁড়াও তোমার মন্তব্যটা লিখে রাখি।

সুচিত্রা ওর হাত চেপে ধরে বললে, না। কলম রেখে এটা পড়ে ফেল তো চট্ করে! একখানা চিঠি সে এগিয়ে দিলে।

খাম ছিঁড়ে মলয় বার করলে চিঠিখানা। চার পৃষ্ঠার চিঠি—আসছে গ্রাম থেকে। মায়ের জবানীতে লেখা। পুত্রকে স্নেহ জানিয়ে তিনি লিখেছেন কিছু টাকা পাঠাতে। আর জানিয়েছেন মেজ ছেলে ও পুত্রবধূর আচরণের কথা। তা ছাড়া দেশের সংবাদও জানিয়েছেন সবিস্তারে। তাতে জানা যায়—দেশ এখন শান্ত। আসন্ন বাঁটোয়ারা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা তো চলছেই—খানিকটা উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়েছে। বড়লাটের ঘোষণা অনুযায়ী—অস্থায়ী বিভাগে কোন পক্ষ উল্লসিত—কোন পক্ষ ম্রিয়মাণ হলেও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের দিন গুনছে। তখন কিছু অশান্তি ঘটতে পারে—তবে সবাই আশা করে কলিকাতায় নোয়াখালির পুনরাবৃত্তি হবে না। মলয়ের কি মত?—এসব মায়ের জবানীতে এলেও লেখকের অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ। আর একটা খবর সর্ব্বশেষে দিয়েছেন মা এবং সকাতরে জানিয়েছেন যে যেখানে থাকুক জন্মভিটার টানে মায়ের কোলে একদিন ফিরে আসেই। মলয় কি

ফিরে আসবে না? সর্ব্বশেষের খবরটি এই—দুর্গামোহন পক্ষাঘাতে মারা গেছেন—প্রশান্ত বাড়ী ফিরে এসেছে। সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে—ওর বাগ্‌দত্তা বধূ। রূপে-গুণে মেয়েটির তুলনা নেই; আবার ধনবতীও—শোনা যাচ্ছে এই বিয়েতে যৌতুকই পাবে একটা লাখো টাকার সম্পত্তি—

মলয় হেসে বললে, রূপগুণের ওজনটা খাঁটি কি বল চিত্রা?

সুচিত্রা বললে, যতই সাম্যবাদের জাঁক করি না আমরা আমাদের মন থেকে ও-বিষ সহজে যাবার নয়।

যাবে দেশে?

না। মুখ নামিয়ে সুচিত্রা উত্তর দিলে। সেবারও তো যাবার সব ঠিক করেছিলাম কিন্তু—

শেষ পর্য্যন্ত আমিই পিছিয়ে ছিলাম নয়? কি করি চিত্রা—মার সেই চিঠিখানা যদি না আসত—!

আজ তো মা তোমায় যেতে লিখেছেন।

তোমাকে যেতে লেখেন নি।

তবু তোমার কর্ত্তব্য—

মলয় একটু হাসল। বললে, জান চিত্রা—এই পৃথিবীটা আশ্চর্য্য। সম্পদ আমাদের মনকে এতখানি বিষিয়ে তুলেছে যে আসল-মেকি চিনলেও—মানতে পারি না। একটু থেমে বললে, আমি না গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিই যদি—তাতেই মা খুশী হবেন। হয়ত বেশী খুশী হবেন। মৃদু একটা নিশ্বাস পড়ল।

সুচিত্রা বললে, এমনও হতে পারে দুটি জিনিষই তাঁর অত্যন্ত দরকারী।

স্বাভাবিক সেটা। সংসার যাকে ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে—সে সংসারের তুচ্ছ জিনিষটিকে পর্য্যন্ত আগলে রাখতে চায়। তা হয় না বলেই আমরা অনেক দুঃখ পাই।

মলয়ের গভীর দুঃখ সুচিত্রাকে স্পর্শ করল। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে সে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিলে। আচ্ছা, প্রশান্ত-ঠাকুরপো তা হলে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করলে না—যার জন্য ও বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

মলয় বললে, সে এখন একটা ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার—তার মনের খবর জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি?

সুর আগেই কেটে গেছে—এ প্রসঙ্গটাও তাই ভেসে গেল। সুচিত্রা আর কি বলবে ভেবে পেলে না। টেবিলের ওপর একখানা বই পড়ে ছিল, গান্ধীজীর নোয়াখালি-ভ্রমণের বৃত্তান্ত। গান্ধীজীর সত্য-পরীক্ষার শেষ অধ্যায়। পরীক্ষা শেষ হতে না হতে তিনি বিহারে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গেছেন দিল্লীতে। স্বাধীন ভারতের কর্ত্তব্য নির্ণয়ে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন—অত্যাসন্ন স্বাধীনতার মুখে চারদিকে জ্বলছে আগুন। গান্ধীজী তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে রোধ করতে চান এই বহ্নিবিস্তৃতিকে—অকল্যাণকে।

বইখানা হাতে নিয়ে সুচিত্রা বললে, পড়বে?

মলয় বললে, বেশ ত। গান্ধীজী বলেন, স্বাধীনতা আসছে। এত দিন পরশাসনের প্রতিবাদে যে সংগ্রাম-শক্তি আমরা প্রয়োগ করেছিলাম—সেই শক্তিকে গঠনের কাজে নিয়োগ করতে হবে। ভারতীয় রাষ্ট্র ভারতবর্ষীয়দের রাষ্ট্র—কোন ধর্ম্মগত দাবি নিয়ে সে সার্থক হতে পারবে না। স্বাধীনতা আর স্বরাজ এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টা বড় জান সুচিত্রা?

সুচিত্রা বললে, স্বাধীনতা?

না—স্বরাজ। মলয়ের সংক্ষিপ্ত গম্ভীর স্বর নিস্তব্ধ কক্ষে প্রতিধ্বনিত হ'ল।

স্বাধীনতার সাধনা আমাদের প্রায় শেষ হয়ে এল—এবার চলবে স্বরাজের সাধনা। শোন।

মলয় বইখানি হাতে তুলে নিলে।

৩২

স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার শেষ অধ্যায় চলছে। কঠিন পরীক্ষা সম্মুখে। বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে—বহু প্রতিবন্ধক রয়েছে সামনে। মার্চ্চের শেষ থেকে আবার যে আত্মঘাতী কলহ সুরু হয়েছে কলকাতায়, তার মধ্যে স্বাধীনতার ঘোষণাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া যাবে কি না—এই আশঙ্কা জাগছে সকলের মনে। পূর্ব্বপাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হলে আবার ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হবে হয়ত। গান্ধীজী আশ্বাস দিয়েছেন ঐ দিন তিনি পূর্ব্ব-পাকিস্থানে থেকে স্বাধীনতা-দিবস পালন করবেন। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভা কার্য্যলাভ করবে; সরকারী কর্ম্মচারীদের লিখিত ভাবে জানাতে হবে—পাকিস্থান অথবা ভারতবর্ষ—কোন্ ডোমিনিয়নে তারা যোগদান করবে। পাঠান পুলিস কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ভাগা-ভাগির কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ নিয়ে—পদস্থ কর্ম্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। গান্ধীজীও এসেছেন কলকাতায়। দু-একদিন এখানে কাটিয়ে যথাসময়ে তিনি নোয়াখালি যাবেন। সংবাদপত্রের নিত্যনূতন সংবাদে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

আর সেই উত্তাপের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল অচিরেই। হানাহানি কাটাকাটি ত চলছিলই—স্বাধীনতা-দিবসের সপ্তাহ-খানেক আগেই তা দাবানলের মত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার যে সব উপকরণ এতদিন গোপনে গোপনে সঞ্চিত হয়েছিল—পুলিস-শাসন শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রতিহিংসাকে শাণিত করে তুলল। বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী গান্ধীজীর কাছে প্রার্থনা জানালেন—স্বাধীনতা-দিবসে তিনি যেন কলকাতা ত্যাগ না করেন। গান্ধীজী কর্ত্তব্য বেছে নিলেন। বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বসে তিনি সারা বাংলাকে রক্ষা করবার ব্রত গ্রহণ করলেন। সেই সঙ্গে

নগরোপান্তে এক অখ্যাত পল্লীতে এসে আশ্রয় নিলেন—আরম্ভ হ'ল অগ্নিপরীক্ষা।

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন বাপুজী ?

সুচিত্রার প্রশ্নে ডায়েরি লেখা বন্ধ করলে মলয় ? তোমার কি মনে হয় চিত্রা ?

কালকের রাত্রির ঘটনা পড়েছ তো—ক্ষিপ্ত জনতা ওঁর বাসগৃহ আক্রমণ করেছিল—ওঁকে আঘাত করেছিল।

দাঁড়াও লেখাটা শেষ করি। সত্যকে সামনে রেখে যিনি বলতে পারেন—হয় জীবন, নয় মৃত্যু—তাকে এই ভাবেই বারবার পরীক্ষা দিতে হয়। আর সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। কাল রাত্রিতে গান্ধীজী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

ডায়েরিটা বন্ধ করে মলয় হাসল।

বাঃ রে—কোথায় পেলে এ খবর। বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে সুচিত্রা।

চল—দেখবে। হিংসার উদ্যত ফণা যেইমাত্র নত হ'ল—তখনই হ'ল সত্যাশ্রয়ীর জয়। চল দেখে আসি।

দু'জনে গান্ধীজীর আশ্রয়স্থলের দিকে এগুতে লাগল। পদব্রজেই চলল। যেন তীর্থযাত্রা করেছে। বহু অখ্যাত পল্লী দিয়ে নির্ভয়ে ওরা অগ্রসর হ'ল। আরও অনেকে চলেছে। নিরস্ত্র—নির্ভীক। কয়েকদিন আগে এই পথ দিয়ে সশস্ত্র হয়েও চলবার কল্পনা পর্য্যন্ত কেউ করত না।

তীর্থে এসে দেখলে—হিংস্র সাপটা ফণা নীচু করে পড়ে আছে। ষ্টেনগান, বোমা, এসিড বাল্‌ব, তীর, বর্শা, তরবারি প্রভৃতি নানান রকমের মারাত্মক অস্ত্রে আকীর্ণ হয়ে রয়েছে গৃহ-প্রাঙ্গণ।

মলয় হাসিমুখে সুচিত্রার পানে চাইলে, কি চিত্রা, পরীক্ষা শেষ হয় নি ?

সুচিত্রা উত্তর না দিয়ে যুক্ত কর ললাটে স্পর্শ করালে। ওর দুটি চোখের কোণ অশ্রুবাষ্পে মেদুর হয়ে উঠল।

স্বাধীনতার উৎসবের ঢেউ গ্রামেও এসে লাগল। তবে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশিত না হওয়ায় দ্বিধা সন্দেহে দুলতে লাগল দু'পক্ষের মন। তবু উভয় পক্ষেরই আয়োজন চলল—গোপনে এবং প্রকাশ্যে। বড়লাটের অস্থায়ী ঘোষণা অনুযায়ী এ গ্রাম আপাতত পাকিস্থান এলাকায়—র‍্যাডক্লিফ ঘোষণা না বেরুলেও—গোপন সংবাদে জানা গেছে ভারত-রাষ্ট্রে সংলগ্ন হয়েছে এ জায়গা। প্রকাশ্য ঘোষণা না হলে—উৎসব করতে নিষেধ করে দিয়েছেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। হিন্দুরা তাই ম্রিয়মাণ চিত্তে রোয়েদাদের অপেক্ষায় দিন গুনছে। রীতিমত আশঙ্কাও জেগেছে তাদের মনে। যারা অতি সাবধানী তারা ইতিমধ্যে যতদূর সম্ভব—স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ভারত-সীমানায় অর্থাৎ গঙ্গার অপর পারে চালান করে দিয়েছে। কেউ উঠেছে আত্মীয়-বাড়ী—কেউ নিয়েছে অস্থায়ী ভাড়াবাড়ী। কেউ কেউ জমির বায়না দিয়েও রেখেছে—শেষ ফল জেনে সরে পড়বে। মোট কথা দু'শো বৎসরের দাসত্বমোচনের উল্লাসকে সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারছে না কেউ। তবু উৎসবের আয়োজন চলছে। নন্দ-দাদুর বৈঠকখানায় ছেলেরা জমায়েত হয়েছে। একটা হারমোনিয়ম এসেছে—তার সঙ্গে একটা ক্ল্যারিওনেট বাঁশী—আর একটা পিকুল জোগাড় হয়েছে। স্বদেশী গানের বই থেকে বাছা বাছা কয়েকটি গানের মহলা দেওয়া চলছে। বাড়ীর ভেতরে উৎসাহী ছেলেরা মিলে তৈরি করেছে অশোকচক্র-চিহ্নিত তিনরঙা পতাকা—লাল শালুর অভাবে—লালরঙে ন্যাকড়া ছুপিয়ে তাতে তুলো বসিয়ে তৈরি করছে স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণাবাণী—জয়হিন্দ—বন্দেমাতরম্। দিল্লী পৌঁছে গেল যারা তাদের দিল্লীযাত্রার তাগিদ বা লাল কেল্লা ধ্বংস করার উৎসাহ না থাকাই স্বাভাবিক। শ্লোগানটা বাদ পড়েছে। আর তৈরি হচ্ছে নেতাদের প্রতিমূর্ত্তি—গ্রাম্য পটুয়ারা আঁকছে। মুচিপাড়ায় খবর দেওয়া হয়েছে—সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র তারা যেন যন্ত্রপাতি নিয়ে ইস্কুলের মাঠে এসে জমায়েৎ হয়। এখান থেকেই বিরাট একটি শোভাযাত্রা বেরুবে—কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে। পুরোভাগে থাকবে গান্ধীজী আর নেতাজীর পুষ্পমাল্যভূষিত সুবৃহৎ ছবি। পরি-কল্পনা প্রতিদিন পরিপুষ্ট হচ্ছে। শহর থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা এসে বর্ণনা দিচ্ছে কি ভাবে ওখানকার উৎসব হবে। হিন্দুরাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে কোনো কোনো উৎসাহী যুবক। গান্ধীজী একা আর কি করবেন। বৃদ্ধ হয়েছেন—ওঁর এখন এ সব চিন্তা না করাই ভাল। এই ধরণের সংবাদে এরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু পাছে শান্তিভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় যথেষ্ট বন্দুকধারী সৈন্য মোতায়েন করা হচ্ছে—শহরে, গ্রামে। কংগ্রেস-নেতারা উপদেশ দিচ্ছেন—অহিংস থাকতে। তাঁদের অনুরোধ পাকিস্থানের আনুগত্য স্বীকার করে জনগণ যেন সংযত থাকে—শান্ত থাকে। ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে স্বাধীনতাকে অসম্মান করা হবে। বলা বাহুল্য—এই উপদেশ বা অনুরোধে অনেকেই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার না করে নিরীহ গোছের একটি শোভাযাত্রা, খানিকটা বন্দেমাতরম বা জয় হিন্দ বলে চেঁচানো, কোন মাঠে লোক জমিয়ে কিছু জোলো বক্তৃতা—এরই জন্য দু'শো বছর ধরে এত কাণ্ডকারখানা, জেলখাটা সর্ব্বস্বান্ত হওয়া, ফাঁসি কাঠে ঝোলা, গুলি বা বিষ খেয়ে মরা—এ সবের কি দরকার ছিল ? উত্তেজক সুরার মত যদি উৎসবকে না প্রাণ ভরে পান করতে পারলাম—তবে কেমনতর উৎসব এ ? ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাঠান পুলিস বসিয়ে শান্তি রক্ষার অছিলায় ধমক

দিচ্ছেন বাংলা-সরকার, খবরদার অন্যায় কাজ কর না—শাস্তি পাবে। তবু র‍্যাডক্লিফ সাহেবের রোয়েদাদ বেরুলে—দলবেঁধে রাস্তা দিয়ে যখন চেঁচাতে চেঁচাতে যেতে পারবে তখন উৎসবের নামে প্রতিশোধস্পৃহা খানিকটা অন্তত চরিতার্থ করে নিয়ে এরা পরিতৃপ্ত হবে। পনেরোইএর মধ্যে খবরটা কি আসবে না!

হেমলতা আশুর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দিদি—দিন-কতকের জন্ত না হয় আবার ময়রাপাড়ায় গিয়ে থাকি। কি বল?

আশুর মা বললেন, মরণ—কি দুঃখে যাবি সেখানে। শুনছি রাজ্যি আমাদেরই হবে! মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে হেঁটে কাঁটা আর ওপরে কাঁটা দিয়ে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াবে না?

সাহস সঞ্চয় করে হেমলতা ভিটেয় পড়ে রইলেন। বড় বাড়ীটা শূন্য খাঁ খাঁ করছে। মেজ ছেলে বউ নিয়ে কলকাতা-বাসী হয়েছে। যে সংসার কোলাহলে পূর্ণ ছিল—সেখানে আজ সাধন ভজনের অনুকূল আবহাওয়া। বৃদ্ধ বয়সে নিরিবিলিতে বসে দু'দণ্ড ভগবানের চিন্তা করবার আকাঙ্ক্ষা কি মানুষের মনে জাগে না? এই রকম অবসর পেলে অনেকে ত ধন্য হয়ে যান। তবু হেমলতা এমন অখণ্ড অবসর চান না। সংসারে আজ তাঁর কেউ নেই—অথচ ভাঁড়ারে গুছানো জিনিসের প্রাচুর্য্য—রান্নার ধুম নেই, গৃহপারিপাট্যের শ্রম আছে; যে সংসারের তুচ্ছতম খবরে বাইরের বড় পৃথিবীর আহ্নিক গতি সুনিয়ন্ত্রিত সে সংসার হেমলতার কল্পলোক থেকে মুছে যাচ্ছে—তবু তাতেই মগ্ন হয়ে রয়েছেন তিনি। উঠান ঝাঁট, বাসিপাট সারা—শাকের ক্ষেত বা ফুলগাছে জল ঢালা, রান্নার আয়োজন—ঘর-বারান্দা ধোয়া মোছা—লেপ বালিশের ওয়ার তৈরি, ঘর-বারান্দার ঝুল ঝাড়া—কি না করছেন তিনি। দুপুরে খাওয়ার পর মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে খানিকটা ঘুম, ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান—দুটি পান ও এক খামচা দোক্তা গালে দিয়ে কোন দিন প্রশান্তদের বৈঠকখানা ঘেঁষে আড়িপাতা কোন দিন বা পাড়ায় টহল দিয়ে সংবাদ বিতরণ ও সংগ্রহ কোনটির অঙ্গহানি ঘটছে না। ঘুম তাঁকে শুধুই আনন্দ দেয় না—দুঃখও নিরবচ্ছিন্ন বেদনাদায়ক নয়। এ দুয়ের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বৃহৎ ভিটেয় স্বচ্ছন্দে দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন। দেশের স্বাধীনতা কি বস্তু হেমলতা বোঝেন না—তবে চারদিকে যে ফিস্‌ফাস্ কানাকানি চলছে তাতে উত্তেজনা খানিকটা—খানিকটা কৌতূহল আর তৃপ্তিও বেশ লাভ হচ্ছে। প্রশান্তদের বৈঠকখানায় প্রায়ই আলোচনা বসে—এবং রোয়াকের কোল ঘেঁষে তিনিও জলের গ্লাস ও জরদার কৌটা নিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেন। কয়দিন আগে প্রশান্তদের উপরে তাঁর কৌতূহলটা উগ্র হয়েছিল। মালতী মেয়েটি চলে যাওয়াতে সে কৌতূহল স্তিমিত হয়েছে—এবার রটনার বিষয় অভাবে রসনাও প্রায় স্তব্ধ হয়েছে। কিন্তু মেয়েটি ভাববার খোরাক যথেষ্ট রেখে গেছে। আশ্চর্য্য ছেলে মেয়ে আজকালকার! ওরা মিশবে হাসবে কথা বলবে নির্লজ্জের মত অথচ বিয়ে করবে না।

কথাটা পেড়েছিলেন এক দিন, হাঁ দিদি—এই মেয়েটির সঙ্গেই তো ঠিক করলে? তা স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন সেকালে দময়ন্তী—

প্রশান্তর মা গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছিলেন, ছেলে আমার আগে সারুক—তারপর বিয়ে।

ঢোক গিলে বলেছিলেন হেমলতা, তা বিয়ে হবে তো! ওই মেয়েটি না থাকলে—ছেলেকে কি ফিরে পেতে ভাই!

সেও তাঁর দয়া। উপর দিকে চেয়ে প্রশান্তর মা কাজের অছিলায় অন্য ঘরে গিয়েছিলেন চলে। সেই থেকে প্রকাশ্য সংবাদ নেওয়া দুষ্কর জেনে হেমলতা জরদা আর জলের গ্লাস নিয়ে ওদের বৈঠকখানা ঘেঁষেই প্রায় শুয়ে থাকেন।

স্বাধীনতা-উৎসবের দু'দিন আগে মালতী বললে, কলকাতায় যাবে না তুমি?

না।

মামা চিঠি লিখেছেন আমায় যেতে। তোমাদের ফ্যাক্টরী তো ভালই চলছে। স্বাধীনতা-উৎসবে শ্রমিকদের কিছু বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা নাকি হচ্ছে।

ভাল।

আচ্ছা—তুমি এমন মুষড়ে পড়লে কেন বল ত? আর কি ফিরে যাবে না?

কি হবে সেখানে গিয়ে—কাজের যখন অসুবিধে হচ্ছে না। প্রশান্তর কণ্ঠস্বর নিরুৎসাহ।

কিন্তু মামা লিখেছেন—একখানা চিঠিতে নয় প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে লিখেছেন—তোমার জন্যই নাকি অতবড় ধর্ম্মঘট বন্ধ হয়ে গেল।

আমার জন্য! প্রশান্ত হাসল! আমি তো তখন শয্যাশায়ী।

তার ফলে শ্রমিক-নেতাদের সঙ্গে কি সব চুক্তি নাকি করেছিলে—

চুক্তি! আমি করেছিলাম? প্রশান্তর কণ্ঠস্বর উচ্চ হ'ল।

হাঁ—সেই রফা অনুসারেই তো দশ হাজার টাকা দিয়ে—এতবড় ব্যাপারটা মিটল!

প্রশান্তর স্বর পুনরায় স্তিমিত হয়ে এল। সে বললে, তা হবে।

হবে নয়—সবাই জানেন—

সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রশান্ত, আচ্ছা মালতী, এতবড় অসম্মানের বোঝা আমার ঘাড়ে না চাপালে কি চলছিল না?

অসম্মান ? বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে মালতী।

হাঁ—বিশ্বাসঘাতকতাও বলতে পার। কিন্তু বিশ্বাস কর—এ কাজ আমি করি নি—আমি করতে পারি না। অত্যন্ত কাতর শুনাল তার স্বর।

মালতী তার একখানি হাত টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিলে, আঃ কি পাগল তুমি! ছিঃ লক্ষ্মীটি, আবার কাঁদে।

ফোঁপানোর শব্দ—সান্ত্বনা দেওয়ার গদগদ ভাষা—আরও কম্পিত কয়েকটি মধুর আশ্বাসের স্পর্শ—হেমলতা দুরুদুরু বুকে উঠে বসলেন।

তারপর দিন মালতী চলে গেল। পাড়ায় রটল প্রশান্ত তার সম্মানহানি করেছে।

তারপর ঝড়ের মত এল কতকগুলি ঘটনা। স্বাধীনতা-দিবস ঘোষিত হ'ল ঘটা করে। মুসলমানরা আল্লা-হো-আকবর রবে ঘরবাড়ী কাঁপিয়ে—রাস্তা দিয়ে মার্চ্চ করে গ্রামের বারোয়ারি তলায় একটা প্রকাণ্ড বাঁশের খুঁটিতে চাঁদ-তারা-মার্কা পতাকা টাঙিয়ে দিল। এ যেন স্বাধীনতার জয় ঘোষণা নয়—দ্বিজাতিতত্ত্বের বনিয়াদের গাঁথুনিকে পাকা করবার জন্য খানিকটা সিমেন্ট আর খানকয়েক ইট বসানো হ'ল। দু'দিন বাদে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ বেরুনোর পর হিন্দুরা দিলে এর প্রত্যুত্তর। চাঁদ-তারাকে ভূমিশায়ী করে অশোকচক্রলাঞ্ছিত তিন বর্ণের পতাকাকে উড্ডীন করে দিলে সেইখানে। ব্যাণ্ড বাজিয়ে সদর্প কুচ কাওয়াজ—জয়ধ্বনি আর মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। বলা যেতে পারে এরাও আর খানকয়েক ইট আর কিছু মশলা দিয়ে পার্থক্যের বনিয়াদকে আরও শক্ত করে দিলে। স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথঃ শিল্পী ও দার্শনিক

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

মানুষ সীমাবদ্ধ জীব। ভাষাটুকু তার অর্থ দিয়ে ঘেরা—সে অর্থ দেহ সীমায় পীড়িত মানবের চারিপাশে নিরন্তর ঘুরে বেড়ায়। অথচ মানুষ চায় মুক্তি—সীমার বন্ধন থেকে মুক্তি। এই মুক্তিসাধনায় প্রয়োজন শিল্পীর। তাই তো এলেন শিল্পী, সৃষ্টি করলেন ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে—রূপের মধ্যে অরূপকে। রবীন্দ্রনাথ "ভাষা ও ছন্দ" কবিতায় লিখেছেন—

> "মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
> অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
> ভাবের স্বাধীন লোকে।"

এই হচ্ছে প্রকৃত শিল্পীর কাজ। আর্ট দেয় মানুষকে সীমা থেকে মুক্তি, শিল্পী আমাদের ভুলিয়ে দেয় পৃথিবীর অন্তবিহীন বন্ধন। নিখিল-বিশ্বের সহিত মানুষের একটা নিগূঢ় যোগ আছে, অথচ মানুষের কাছে অনেক সময়ই তা থাকে অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। শ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই নিগূঢ় যোগকে প্রকাশ করে। শিল্পী প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা থেকে মানবাত্মাকে দেয় মুক্তি, তাকে নিয়ে যায় অসীমের পথে, তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে সুদূরের পিপাসা। বাসনা থেকে মানবাত্মাকে মুক্তি দেওয়াই যে কবি বা শিল্পীর কাজ, রবীন্দ্রনাথ সে কথাই "ফাল্গুনী"তে কবি-বাউলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে একটি কবি বা শিল্পী-মন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তার প্রকাশ নেই। একমাত্র প্রকৃত শিল্পীই পারেন মানুষের অন্তর্নিহিত শিল্পীকে মুক্তি দিতে, সীমার মধ্যে অসীমের যোগসূত্র রচনা করতে। এখন দেখতে হবে আর্টের জন্ম-রহস্যের মূল কোথায়। বাইরের জগতে যে অজস্র আনন্দধারা নানা রূপে নানা বর্ণে বিকীর্ণ হচ্ছে তা শিল্পীর মনে সাড়া জাগায়। শিল্পী ভুলে যায় সব, ভুলে যায় নিজেকে, অন্তবিহীন আনন্দধারার সহিত আপন সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করে দেয়—জীবনে আসে সৃষ্টির মাহেন্দ্র ক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আজকের আকাশে যে ভীষণ নির্মমতা, তার মধ্যে ভয়ানক দুঃখের আশঙ্কা আছে। এর যেমন একটা বাণী আছে, তেমনি বসন্তকালে আনন্দের রবে চতুর্দ্দিক ভরে উঠে, তাতে আমরা কান দেই বা না দেই, তার প্রতি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।"

"এই বাণীর ভাষায় কোথাও প্রকাশ নেই, ব্যাকরণশুদ্ধ বানানো কোনও কথা নেই, কিন্তু তার একটা ধ্বনি আছে তা অনির্ব্বচনীয়। সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে সেই ধ্বনি উঠে। আমাদের চারিদিকে যা রয়েছে তা অসীম, তার কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষা নেই, তা অতি বিরাট, কবি তাকে ছন্দের মধ্যে ছাঁচের মধ্যে ফেলে তৈরি করে তুলেছেন, তিনি মনের ভিতর যে প্রতিমা গড়েছেন তাতে তার আশা, ভালবাসা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে কবির কাজ। তাকে সুন্দরের সীমায় বাঁধতে চেয়েছেন, তাই তিনি তার মানসী প্রতিমা গড়েছেন, সেই প্রতিমায় রূপ নিয়েছে তার আশা, তার ভালবাসা।"

নিখিল-বিশ্ব অন্তরে-বাহিরে নিরন্তর যে বিচিত্র সংঘাত দ্বারা কাব্যরূপের সৃষ্টি করে, কবি তাকে রসের পথে ভাষা-

অলঙ্কারে গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্য-গ্রন্থের "উপহার" কবিতাটি তারই অভিব্যক্তি :

"নিভৃত এ চিত্ত'মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয় তাই মুহূর্ত্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর
ধ্বনি শুধু সাথে নাই ভাষা ;
বিচিত্র কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু, অসীমের সীমা ;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।"

শিল্পের জন্ম আনন্দের মধ্যে। নিখিল-বিশ্বের আনন্দধারা কবি-চিত্তে ধ্বনিত হয়ে উঠে, কিন্তু সে ধ্বনি নির্দ্দিষ্ট নয়, সুস্পষ্ট নয়—তা বিরাট, তা অসীম। এই নিয়েই তো শিল্পীর কারবার। তাই শিল্পীর সাধনায় দেখি তিনি নির্দ্দিষ্টকে চান না—চান অনির্দ্দিষ্টকে, অরূপকে—রূপাতীতকে।

আর্টের সৃষ্টি আনন্দের মধ্যে, আর্ট তাই মানুষকে দেয় আনন্দ। নিখিল প্রকৃতির আনন্দধারার সহিত 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' কবি রচনা করেন তাঁর কাব্য। আর্ট মানুষকে আনন্দ দান করে, তা বলে একথা যেন কেউ না মনে করেন, আনন্দ দিতে হবে এই সজাগ উদ্দেশ্য নিয়েই আর্টিষ্ট সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর্টিষ্টের অন্তরে যখন আনন্দবেগ দুর্ব্বার হয়ে ওঠে তখন তিনি তা প্রকাশ না করে পারেন না। অন্তরের মধ্যে রস উচ্ছল ও দুর্নিবার হয়ে উঠলে তবেই প্রকৃত আর্টের সৃষ্টি সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ বারবার নানা জায়গায় নানা প্রবন্ধে এই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আর্টের জন্ম প্রয়োজনাতীত আনন্দের মধ্যে—রসের মধ্যে। প্রয়োজনে মানুষ দীন, আত্মসুখী, অপ্রয়োজনে সে ঐশ্বর্য্যবান—সে সকলের। তাঁর নিজের ভাষায়, "যে রস সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন মাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হয়, তাহাই সাহিত্যরস। এইরূপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদকেই আমরা ঐশ্বর্য্য বলিয়া থাকি। সাহিত্য মানব-হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যেই সকল মানুষ সম্মিলিত হয়—যাহা অতিরিক্ত তাহাই সর্ব্বসাধারণের।"* "বিশ্ব-সাহিত্য" প্রবন্ধেও কবি সেই একই কথা জানিয়েছেন, "সাহিত্যে আমরা কিসের পরিচয় পাই? না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য্য, যাহা ঐশ্বর্য্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যাহা তাহার সংসারের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইতে পারে নাই।"* 'শিক্ষা' বা 'সাহিত্য' গ্রন্থে কবি যে কথা বলেছেন, সে কথাই Religion of an Artist নামক প্রবন্ধে এবং অন্যত্রও স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, সাহিত্যসৃষ্টির জন্য দরকার রসের, কিন্তু সে রস হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কেননা যা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী তাই আমরা আর এক জনকে দিতে পারি। সাহিত্যরস সকলের জন্য। তাই সাহিত্যের এত গৌরব।

প্রয়োজনে মানুষ বদ্ধ, সেখানে তার প্রকাশ নেই, অথচ মানুষের অন্তরাত্মা ডুকরে কেঁদে উঠে আত্মপ্রকাশের জন্যে। তারই জন্যে এল চিত্র, এল সঙ্গীত, এল নৃত্য—এগুলি মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই মানুষ নিজকে প্রকাশ করতে চেয়েছে চিত্রের মধ্য দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে, নৃত্যের মধ্য দিয়ে। প্রয়োজনের ভিতরে মানুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ নেই, সেই তার অখণ্ড বিকাশ। সম্পূর্ণ প্রকাশ আছে একমাত্র সাহিত্য আর শিল্পে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "যতই আলোচনা করছি ততই অনুভব করছি যে সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ।...মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে; তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকবে না, কেবল সাহিত্যে থাকবে। সঙ্গীতে চিত্রে, বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এইজন্যই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যই সাহিত্য সর্ব্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার।"

সৃষ্টির মধ্যে যেমন স্রষ্টার লীলা তেমনি মানুষের লীলা চলেছে সাহিত্যে। সাহিত্যে মানুষ নিজেকেই বিচিত্র রূপে দেখে। মানুষ এক—সাহিত্যে সে বহু এবং বিচিত্র। সাহিত্য তাই ব্যক্তির প্রকাশ। যাঁরা বলেন সাহিত্য নৈর্ব্যক্তিক তাঁরা ভুলই করেন। সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ-অনিবার্য্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "হৃদয় আপনার ভিতরের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগকে যখন বাইরের কিছুতে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তখন অন্তত: সে নানা উপকরণ লইয়া নিজের হাতে তাহার একটা প্রতিরূপ গড়িবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এমনি করিয়া জগৎকে আপনার ও আপনাকে জগতের করিয়া তুলিবার জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা কেবলি কাজ করিতেছে।"† এই চেষ্টাতেই সাহিত্যের সৃষ্টি। সুতরাং সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ না থাকার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত নয়। এখানে 'ব্যক্তি' শব্দটিতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরই জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার

* শিক্ষা—পৃঃ ১০৯

* সাহিত্য—পৃঃ ৬৩

† সাহিত্য—পৃঃ ৫৯

সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।"* প্রশ্ন হবে, এই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় কোন্ পথে? হৃদয় যখন পরিপূর্ণ আনন্দে রসের তরঙ্গে উচ্ছল হয়ে ওঠে, প্রয়োজন নিঃশেষে শেষ হয়ে যায় তখনই ব্যক্তি 'বেগের আবেগে' প্রকাশমান হয়। এই প্রকাশে মানুষ পায় নিজেকে—তার আত্মাকে। এই প্রকাশের পথে মানুষ সীমার বন্ধন হতে মুক্তি পায়, সীমার মধ্যে পায় অসীমের সন্ধান। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'—আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণেগন্ধে, রূপেসঙ্গীতেনৃত্যে, জ্ঞানেভাবে-কর্ম্মে। কবির কাব্যও সেই বাণীর ধারা: যে চিত্তযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত হয়, তার প্রকৃতি অনুসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। সেই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন করে নিয়ে তার রস পাই।"† তা হলে দেখা যাচ্ছে যে অনন্তের সন্ধান দার্শনিক করেন, কবিও চান সেই অসীমকেই প্রকাশ করতে। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। কবি সৌন্দর্য্যের পূজারী আর দার্শনিক সত্যের সাধক। কবি বা শিল্পী সৌন্দর্য্যের পূজারী বটে, কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যের নয়—আনন্দজাত সৌন্দর্য্যের। প্রশ্ন হবে আনন্দ কি? কোথায় তার প্রকাশ?

উপনিষদ বলেন, জ্ঞানময় অনন্ত সত্য অহরহ নিখিল প্রকৃতি ও মানবসমাজে আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশিত হয়ে চলেছেন। এই আনন্দধারা যা নিখিল-বিশ্বে অজস্র সৌন্দর্য্য-ধারায় প্রকাশমান, কবি বা শিল্পীর কারবার সেই সৌন্দর্য্য নিয়ে। সুতরাং বলতেই হবে, যে আনন্দজাত সৌন্দর্য্য নিয়ে কবির কারবার সেই সৌন্দর্য্য এবং জ্ঞানময় অনন্ত সত্য একই। ইংরেজ কবি তাই বলেছেন, Truth is beauty, beauty is Truth। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, আনন্দই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।' তিনিই রস, এই রসকে পাইলে মানুষ আনন্দিত হয়।"‡

সৃষ্টির মধ্যে দার্শনিক খুঁজে বেড়ান স্রষ্টাকে, বৈচিত্র্যের মধ্যে সন্ধান করে ফিরেন এক-কে। যে মুহূর্ত্তে সেই এক-কে পান—বলে উঠেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

অর্থাৎ—আঁধারের পরপারে আমি জ্যোতির্ম্ময় এক-কে পেয়েছি। প্রকৃত কবি বা শিল্পীর সন্ধানও সেই একের জন্য।

* কবি-পরিচিতি—পৃঃ ১১
† কবি-পরিচিতি পৃঃ ২
‡ সাহিত্য—পৃঃ ৪৮

নিখিল-বিশ্বের নানা সৌন্দর্য্য, নানা বৈচিত্র্য শিল্পীকে বিস্মিত করে, শিল্পী নিজেকে হারিয়ে ফেলেন সেই রসমাধুর্য্যের মধ্যে। তারপর আনন্দানুভূতির পথে শিল্পীর মনে জাগে প্রশ্নের পর প্রশ্ন—বিশ্বের এই নানা বৈচিত্র্যের মূল কি এবং কোথায়। সেই জিজ্ঞাসার সমাধান করতে গিয়ে শিল্পী আবিষ্কার করেন বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় যোগসূত্রকে—আঁধারের পারে জ্যোতির্ম্ময় এক-কে। তাই দেখা যায়, কবিরা বাস্তবকে স্বীকার করেও বাস্তবের অতীত এক আদর্শকে বরণ করে নেন এবং সেইখানেই হয় কাব্যসাধনার চরম সার্থকতা।

পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য, নদীর কলধ্বনি, প্রভাতের সূর্য্যালোক এবং বসন্তের মিলন-উষার মধ্যে অনন্তকাল ধরে যে সুর ধ্বনিত হয়ে চলেছে তাতে আছে এক অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সেই আদর্শে বিশ্বাসী। কবি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেই ইন্দ্রিয়াতীত জগতের বাণীকে এবং এমনি করে সুদূরের সন্ধান করতে গিয়ে পৌঁছেচেন 'মহান্ত পুরুষে'র কাছে। পূর্ব্বেই বলেছি সাহিত্য ব্যক্তির প্রকাশ। মানুষের অন্তরে যে শিল্পী বাস করে সে ক্রমাগত নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করে থাকে—নিখিলবিশ্বের আনন্দধারা যাঁর প্রকাশ তাকেই পাবার জন্য সে সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

"In Art the person in us is sending its answers to the Supreme Person, Who reveals Himself to us in a world of endless beauty across the lightless world of facts." (*Personality*, p. 27)

রবীন্দ্রনাথের মতে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য এবং মানবপ্রেম অসম্পূর্ণ; এই সৌন্দর্য্য, এই প্রেম অসীমের ছায়ামাত্র। অসম্পূর্ণের মধ্যে পরিপূর্ণতাকে, অখণ্ডকে নিয়ে আসতে না পারলে কবি-মানসের চরম তৃপ্তি হতে পারে না এবং কাব্য সৃষ্টিও সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। "অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal-এর মিলনেই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার centrifugal force Ideal-এর দিকে Real-কে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের Centripetal force Real-এর দিকে Ideal-কে আকর্ষণ করে; কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।"* কবিত্বের এই উভয় অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা কঠিন, কিন্তু প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যেই সেই সামঞ্জস্য আছে। শ্রেষ্ঠ কবির রচনার তাই তো এত গৌরব।

কাব্যসৃষ্টির গোড়ার কথা আত্মপ্রকাশ, "In Art man reveals himself and his objects।" মনের ধর্ম্ম এই যে, বাইরের জগৎ অন্তরে এসে এক নূতন জগতের সৃষ্টি করে।

* সবুজপত্র, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৪

সেই অন্তরজগৎ নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ নয়, বাইরে পুনর্ব্বার প্রকাশিত হ'লে তবে সে হয় পূর্ণ। কবি-হৃদয় সেই প্রকাশে তৃপ্ত হয়।

কবি জীবনের পথে বদ্ধ নন, তাঁর গতি সর্ব্বত্র। "ফাল্গুনী"* নাটকে আছে, "সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই তো বৈরাগী, সেই তো পথিক, সেই তো কবি-বাউলের চলা।"+

কবি যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও গানের ভিতর দিয়ে নিজকে প্রকাশ করতে করতে চলেন, সে কি কেবল অর্থহীন চলা? তাঁর চলার কি কোন স্থির লক্ষ্য নেই? কবি বলেন:

"আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ,
সেই তো বাঁধায় সেই তো মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে বাঁধে
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় দ্বন্দ্ব
এক নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।"

তাই কবি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠেন—

"ঘণ্টা যে ঐ বাজলো কবি, হোক রে সভাভঙ্গ।
জোয়ার জলে উঠচে তরঙ্গ।
এখনো সে দেখায় নি তার মুখ,
তাই তো দোলে বুক।
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ।"
(বলাকা, পৃ: ৮০)

দার্শনিকের মত শিল্পীও অজানার সন্ধানী। শিল্পী তার সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন—আপনাকে জানতে চান। সেই জানার মধ্য দিয়ে কবি উপলব্ধি করেন নিখিল বিশ্বব্যাপী এককে—অনন্তকে। ভারতীয় কলাসৃষ্টির মূল কথা সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে সপ্রমাণ করেছেন, সৌন্দর্য্যের প্রকাশ সাহিত্যের বড় কথা নয়, সৌন্দর্য্য সাহিত্যসৃষ্টির উপলক্ষ্যমাত্র—অখণ্ড মানুষকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য; বাইরের জগৎকে অন্তরের জগৎ—আপনার জগৎ—মানুষের জগৎ করে তোলাই সাহিত্যের কাজ। কবি বলেন, মানুষের সত্যিকার জগৎ সেইখানেই গড়ে উঠে যেখানে সে নিজের মধ্যে অনুভব করে অনন্তকে, জানতে পারে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে,

"Building of man's true world…is the function of Art. Man is true, where he feels his infinity, where he is divine, and divine is the creator in him" (*Personality* p. 31)।

রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি হ'ল ধ্যানী দার্শনিকের দৃষ্টি। কবি দার্শনিক নন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই যে আনন্দানুভূতির দ্বারা অহরহ জীবনের ব্যাখ্যা করে থাকেন তা দার্শনিকসুলভ আনন্দানুভূতি। Poetry is the criticism of life—কাব্যের মধ্যে রূপায়িত হয় জীবনের ব্যাখ্যা। এইজন্যই কবিমানসের পিছনে একটি দার্শনিক মন না থাকলে সেই কবি, বড় কবি—শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারেন না। তাই শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই দার্শনিক। দার্শনিক কবি না হতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত কবিকে দার্শনিক হতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ কবি এবং কবি বলেই দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথ কবি—তাঁর একটি মাত্র পরিচয় তিনি শিল্পী। কাব্যসৃষ্টিকে সার্থক করে তুলতে হ'লে যে দার্শনিক অনুভূতির প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম্ম' সেই পথেরই যাত্রী। দার্শনিক কবির ধর্ম্ম তার শিল্প-চেতনার পথ ধরেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। 'Religion of An Artist' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মর্ম্মে লিখেছেন, "আমার ধর্ম্ম মূলতঃ কবির ধর্ম্ম। কাব্যের প্রেরণা যেমন করে অজ্ঞাত অপরিচিত পথ ধরে আমার কাছে এসেছে সেই পথ ধরেই এসেছে আমার জীবনে ধর্ম্মপ্রেরণা। আমার ধর্ম্মজীবন ও কবিজীবন একই পথে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। যদিচ এই উভয় জীবনের সম্মিলন হয়ে গেছে বহুকাল পূর্ব্বে তবু অনেক দিন পর্য্যন্ত তা ছিল আমার কাছে অজ্ঞাত।*

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন এবং ধর্ম্মজীবনের পরিপূর্ণ মিলন হয়েছে এবং সেই মিলনে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কাব্যসম্ভার। রবীন্দ্রকাব্যে তাই অধ্যাত্মরাজ্যের অন্তহীন সুর, অসীমের জন্য অনন্ত ব্যাকুলতা, সুদূরের জন্য অশান্ত ক্রন্দন।

---

* *Personality*, p. 12

+ ফাল্গুনী, পৃ: ১৩

* রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত *Contemporay Indian Philosophy* পৃ, ৩২।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি অক্ষয়কুমার গাহিয়াছেন :—

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি ;
তবু কাঁদ কাঁদ,—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও বঙ্গভূমির এইরূপ একজন ভাগ্যহীন কবি। বর্ত্তমান খুলনা জেলার ভৈরবনদতটবর্ত্তী সেনহাটি গ্রামে, এক বৈদ্য-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-তারিখ—১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪ (৩১ মে ১৮৩৭)। তিনি যখন ৬ মাসের শিশু, সেই সময়ে তাঁহার পিতা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অগ্রজেরও কাল হয়। কি করিয়া দিন চলিবে এই চিন্তায় তাঁহার মাতা ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এই দুঃসময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতার মাতামহ—বরিশাল কীর্ত্তিপাশার ভূম্যধিকারী রাজারাম সেন জমিদারী হইতে তাঁহাদের কিছু কিছু বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে তাঁহাদের দিনাতিপাত হইত। কৃষ্ণচন্দ্র গুরুমশায়ের গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, গৃহ-পুরোহিতের নিকট কলাপ ব্যাকরণ পড়িয়া এবং কীর্ত্তিপাশায় ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়া, ১৯ বৎসর বয়সে, ভাগ্যান্বেষণে ঢাকায় উপস্থিত হন।

এই সময়ে গবর্মেণ্ট হইতে বাংলা শিক্ষা প্রদানের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছিল। কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিত নিয়োগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ বেতনের একটি সার্কেল পণ্ডিতের পদলাভ করেন। ইহার অল্প দিন পরেই তিনি ঢাকা নর্মাল স্কুলের অন্তর্গত মডেল স্কুলের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার অবসরকাল মাতৃভাষার সেবায় নিয়োগ করিতেন। 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর,' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রভৃতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা লেখা অভ্যাস করিতেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন ; ইনি তাঁহার সমবয়সী কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র। তাঁহাদের প্রাথমিক রচনাগুলি ১৮৫৮ সনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' স্থান পাইয়াছিল ; গুপ্ত-কবি তাঁহাদের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজসুন্দর মিত্র, ভগবানচন্দ্র বসু (আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পিতা) প্রমুখ কয়েক জন কৃতবিদ্য বাঙালীর চেষ্টায় ঢাকায় সর্ব্বপ্রথম একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র—'ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্রেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটকের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা যন্ত্রের মুদ্রাকর ছিলেন—কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধু হরিশ্চন্দ্র। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে, এই দুই দরিদ্র কবির উদ্যোগে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'কবিতাকুসুমাবলী' নামে একখানি পদ্যবহুল মাসিক পত্রিকা জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের 'সদ্ভাবশতকে'র অধিকাংশ কবিতাই ইহাতে স্থান পাইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে 'কবিতাকুসুমাবলী'ই ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র।

এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের মনের মত একটি নূতন চাকুরী জুটিয়া গেলে, তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র-সেবায় ব্রতী হন। ঢাকাবাসীরা অনেক দিন হইতে স্থানীয় একখানি বাংলা সংবাদপত্রের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। বাঙ্গলা যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকবর্গের দ্বারা সে অভাব পূরণ হয়। তাঁহারা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'সোম-প্রকাশে'র আদর্শে, 'ঢাকাপ্রকাশ' নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারই সম্পাদকের গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর।

ইহার তিন বৎসর পরে বালিয়াটী-নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকায় আর একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ও 'বিজ্ঞাপনী' নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি ৫০৲ বেতন দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে 'ঢাকাপ্রকাশ' হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে পত্রিকা ও প্রেসের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। 'বিজ্ঞাপনী'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—মার্চ ১৮৬৫।

যোগ্যতার সহিত সাড়ে তিন বৎসর 'ঢাকাপ্রকাশ' ও দেড় বৎসর 'বিজ্ঞাপনী' পরিচালন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঢাকার সংবাদপত্র প্রসঙ্গে কলিকাতার 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' একবার লিখিয়াছিলেন :—"কলিকাতায় যে যে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে, ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকাপ্রকাশ ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে।" প্রকৃতপক্ষে বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ঢাকার প্রথম সাংবাদিক-পদের গৌরব কৃষ্ণচন্দ্রেরই প্রাপ্য। এই হিসাবে তিনি ঢাকাবাসীর কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকায় সঙ্গদোষে সুরাপানে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার আত্মকথায় প্রকাশ :—"দেশেও তখন সুরার বড়ই প্রকোপ। বড়-লোকের চিহ্ন ছিল তখন—

সুরাপান। ভাগ্য-দোষে, মতিহীন আমি, আমিও তাহাতে মজিয়াছিলাম।…বন্ধুগণ বলিতেন, 'পোলাও-কালিয়া ভাল খাবার খেতে হ'লে মদ খাওয়া চাই-ই; নহিলে, শরীর টেঁকে না—অতিসারে মারা যেতে হয়।' কাজেই, আমিও প্রথমে বুঝিয়াছিলাম, তাই। এই প্রলোভনে, ক্রমেই তাহা নেশায় পরিণত হইয়াছিল; আর, তাহাতেই আমার সর্ব্বনাশ। শেষ, ইহাতেই, ঝগড়া করিয়া আমার কাজ যায়; আমি পরিবারাদি লইয়া বাড়ী চলিয়া আসি। কর্ম্ম ছাড়িয়া আমি কেবলই দুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইতে থাকি। এমন কি, ক্রমে যতই সাংসারিক কষ্ট বাড়িয়াছে, আমিও ততই পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে, আমায় পাগলের মত হইতে দেখিয়া, আমার কোন আত্মীয় আমায় কীর্ত্তিপাশায় লইয়া যান। এবং তাঁহারা নানারূপে আমার চিত্ত-সংস্কারেরও চেষ্টা পাইতে থাকেন। এই সময় মদটাও আমার আর তত জুটিত না; ক্রমে আমিও একটু স্থির হইতে থাকি। অধিকন্তু, 'শিব-বিবাহ' নাম একখানি গানের পুস্তক এবং পারশী, উর্দ্দ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই ভাষা চতুষ্টয়ে আমার পূর্ব্বতন শিক্ষকগণের গুণবর্ণনা নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া, আমার মতি অনেকটা ফিরিয়া যায়। এই সময়ই আমার মাতাঠাকুরাণী আমায় কীর্ত্তিপাশা হইতে বাড়ী আনিতে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া আমিও প্রতিজ্ঞা করি—'আর কখনও এমন কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না।' বেশীর ভাগ, বাড়ীর তাৎকালিক দুর্দ্দশা দেখিয়াও আমার মনে বড়ই ঘৃণা জন্মে।" ('অনুসন্ধান,' ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮)

কর্ম্মহীন অবস্থায় দুই-তিন বৎসর দেশে কাটাইবার পর, কৃষ্ণচন্দ্র সামান্য বেতনে কখন ঢাকা ব্রাহ্মস্কুলে (ইং ১৮৭০), কখন দৌলৎপুর স্কুলে, কখন-বা পিলজঙ্গ-নপাড়া এন্‌ট্রান্স স্কুলে পণ্ডিতী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; শেষে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ২৫৲ বেতনে যশোহর জেলা-স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। যশোহরে অবস্থানকালে তিনি 'দ্বৈভাষিকী' নামে একখানি স্বল্পায়ু সংস্কৃত-বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ উনিশটি বৎসর অতি দীনভাবে যশোহরে এক ব্রাহ্মণের হোটেলে কাটাইয়া, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি শিক্ষকতা কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার ও গণিতজ্ঞ কালীপদ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণচন্দ্রের শেষের দিনগুলি স্বগ্রাম সেনহাটিতেই বিশৃঙ্খলভাবে কাটিতেছিল। "ক্রমে বিশ্বাসী ও সাধক কৃষ্ণচন্দ্রের মর্ত্ত্যলীলা শেষ হইয়া আসিল। লোকচক্ষুর অগোচরে প্রস্ফুটিত বনকুসুমের মত সমগ্র দেশকে অজ্ঞাতসারে সৌরভে আমোদিত করিয়া তাঁহার জীবন-পুষ্প ঝরিয়া পড়িবার দিন আসিল। কিছু দিন হইতে তিনি রোগে অত্যধিক ক্লেশ পাইতেছিলেন। এইরূপে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ [১৩ জানুয়ারি ১৯০৭, ৭০ বৎসর বয়সে] প্রত্যূষে জন্মভূমি সেনহাটির ক্রোড়ে তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলেন।" ('জীবনচরিত')

ইহাই সংক্ষেপে কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-কথা।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

এইবার বাংলা-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের দানের কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার দানের পরিমাণ বিপুল নহে। তিনি চারিখানি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে দুইখানি কাব্য,—'সদ্ভাবশতক,' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি (ইং ১৮৬১) ও 'মোহভোগ'—মহাভারতের বাসব-নহুষ সংবাদ অবলম্বনে নাটকাকারে লিখিত ক্ষুদ্র কাব্য (জানুয়ারি ১৮৭১)। অপর দুইখানি—গদ্য-গ্রন্থ; 'ইতিবৃত্ত' নামে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত আত্মকথা (এপ্রিল ১৮৬৮) ও 'কৈবল্যতত্ত্ব'* নামে সন্দর্ভ-

* ইহার "বিজ্ঞাপনে" কৃষ্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"এই পুস্তকে কৈবল্য ও কৈবল্য লাভের উপায় বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।" যশোহরে অবস্থানকালে তিনি সাত্ত্বিক হিন্দুর আচার পালন করিতেন। একদিন দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁহার ধর্ম্মমতটি জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন :—"এখন তো বুঝিতেছেনই! তবে ঢাকায় যখন ছিলাম, সেখানে তখন বড়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন; আমারও তখন যৌবনোচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি! কাজেই, তখন সেইরূপ ভাবেই ছিলাম। পরেই এই ভাব!"

সমষ্টি (জানুয়ারি ১৮৮৩)। পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার গদ্য-পদ্য বহু রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল রচনার মধ্যে ১২৯৮-১৩০০ সালের পাক্ষিক 'অনুসন্ধানে' প্রকাশিত তাঁহার আত্মকথা, সানুবাদ "শিবপঞ্চাশৎ" ও নীতি-কবিতা" উল্লেখযোগ্য। 'ব্রহ্ম-সঙ্গীতে'ও "তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় হে" ও "কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়া" প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি গান স্থান পাইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের অপর সকল রচনা বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু একমাত্র 'সদ্ভাবশতক'ই তাঁহাকে বাংলা-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, যশোহরে অবস্থানকালে, একদা দুর্গাদাস লাহিড়ী 'অনুসন্ধান' পত্রের জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বিনয়-সহকারে বলিয়াছিলেন :—

"কোন এক পারস্য-গ্রন্থে একটি গল্প পড়িয়াছিলাম। সে গল্পটির মর্ম্ম এই যে, ধনুর্ব্বাণ দ্বারা এক লক্ষ্য-ভেদ করিবার জন্য কয়েক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক ছিল। যাহার বাণ সেই লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারিবে, সে-ই ঐ মুদ্রা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু কেহই সে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিল না। মহা মহা ধনুর্ব্বিদ্যা-পারদর্শীগণও তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন। অতঃপর, কৌতুকচ্ছলে, একটি বালক তৎপ্রতি একটি বাণ প্রয়োগ করায়, কি দৈব ঘটনা, সেই লক্ষ্যটি ভেদ হইয়াছিল। কিন্তু যেই লক্ষ্যটি ভেদ হইল, বালক অমনি তাহার ধনুর্ব্বাণ জলে ফেলিয়া দিল। এবং লোকে তাহার ধনুর্ব্বাণ জলে নিক্ষেপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে উত্তর দিল,—'দৈবাৎ একটা লক্ষ্য ভেদ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমি তো আর ধনুর্ব্বিদ্যা-পারদর্শী হই নাই। আমার ছেলেখেলার যন্ত্রে কেন আর লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইব ; তাই উহা ফেলিয়া দিলাম।'…আমারও হইয়াছে তাই। দৈবাৎ 'সদ্ভাব-শতক'টা একটু ভাল হইয়াছে বলিয়া, আমি তো আর একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হই নাই যে, আমার জীবনে নানা গৌরব-গরিমার কথা পাইবেন ?"

'সদ্ভাবশতক' প্রকাশিত হয়—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ; কৃষ্ণচন্দ্র তখন 'ঢাকাপ্রকাশে'র সম্পাদক। এই কাব্যখানি বাংলা দেশের ছাত্র-সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইতে লব্ধ এই খ্যাতি ছাত্র-সমাজকে অতিক্রম করিয়া অভিভাবক-সমাজকেও অভিভূত করিতে বিলম্ব হয় নাই।

চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে, দংশে নি যারে ?

কবিতার লেখককে বাংলা দেশের রসিকমাত্রই সহজে চিনিয়া লইয়াছিলেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্র পারস্য ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন এবং সর্ব্বদা পারসিক কবি হাফেজ ও সাদীর কাব্যরসে নিমগ্ন থাকিতেন। 'সদ্ভাবশতক' প্রধানতঃ হাফেজের কাব্য অনুসরণেই রচিত। পারসিক কবিদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবোধ ও এই বিশ্বপ্রকৃতির যিনি স্রষ্টা, তাঁহার প্রতি সহজ আত্মনিবেদন কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সৌন্দর্য্য ও ভগবৎ-প্রীতিই বাংলা-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ দান।

'সদ্ভাবশতকে'র কবিতাগুলি এমনই প্রসাদগুণবিশিষ্ট যে অনেক কবিতার অনেক পংক্তিই আমরা প্রবাদবাক্যস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি ; ব্যবহার করি বটে, কিন্তু এগুলির রচয়িতা যে কৃষ্ণচন্দ্রই তাহা অনেক ক্ষেত্রে বিস্মৃত হইয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ "অপব্যয়ের ফল" নামে তাঁহার সুপরিচিত

যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জালায় মোমের বাতি ;
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর,
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।

কবিতার উল্লেখ করিতে পারি। শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের মত খ্যাতনামা কবি ও সমালোচকও কবিতাটিকে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের নামে 'কাব্য-মঞ্জুষা'য় স্থান দিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর মজুমদার-কবি উনবিংশ শতাব্দীর মজুমদার-কবির সম্যক্ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কবি-পক্ষেই যদি এইরূপ হয়, সাধারণে যে তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি !

আমরা সাহিত্যিক পূর্ব্বপুরুষদের স্মরণীয় করিবার জন্য সচরাচর বার্ষিক স্মৃতিবাসরের অনুষ্ঠান করি ; কখন কখন তাঁহাদের নামে রথ্যা-রচনা, পদক-দান বা স্মৃতি-সৌধের আয়োজন করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থাকি। কিন্তু কেবল-মাত্র এইগুলির দ্বারাই তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন না ; তাঁহারা সত্যকার বাঁচিয়া থাকেন—সাহিত্যে তাঁহাদের বিশিষ্ট দানের জন্য। কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বদেশবাসীর অন্তরে জাগরূক রাখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাঁহার 'সদ্ভাবশতকে'র একটি সুষ্ঠু সংস্করণ প্রকাশ করা ; তবেই তাঁহার আত্মার শান্তি হইবে, তবেই তাঁহার যথোপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা হইবে।*

* কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে, ৬ই জুন অনুষ্ঠিত কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বার্ষিক স্মৃতিসভায় প্রধান অতিথির ভাষণ।

যুদ্ধোত্তর বার্লিন

শ্রীপশুপতি ঘোষ

অনেক দিন থেকেই বার্লিন দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় বার্লিনের যে চিত্র খবরের কাগজে পাঠ করেছি তাতে হিটলারের পতন হওয়ার পরেও বার্লিনে যাওয়ার ইচ্ছা আমার একটুও কমে নি। বার্লিনের পতন হয়েছে, মিত্র-শক্তির আক্রমণের আঘাতে বার্লিন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, বোমার আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবে বার্লিনের কত ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বার্লিনের প্রসিদ্ধ রাইস্ট্যাগ, ব্রাণ্ডেনবার্গ গেট, কাইজার উইলহেলম্‌স গেট ইত্যাদি অতীতের কত সমৃদ্ধ স্মৃতি বহন করে দণ্ডায়মান, ইতিহাস তার সাক্ষী। বোমার আঘাতে ধ্বসে-যাওয়া তাহাদের বিষাদ-মাখা স্মৃতি মনকে অভিভূত করেছিল। যে বার্লিন মাত্র পনর-ষোল বৎসরের মধ্যে বিপুল শক্তির অধিকারী হয়ে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবার সামর্থ্য অর্জ্জন করেছিল তার সেই শক্তির উৎস কোথায় দেখবার জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। একা হিট্‌লার, এক গোয়েরিং বা গোয়েবল্‌সের সাধ্য ছিল না এত বড় একটা বিরাট্ শক্তিকে পূর্ণ বিকাশের পথে চালিয়ে নেবার। যারা জার্ম্মানীকে গড়ে তুলেছিল, শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিল, দিগ্বিজয়ীর বিরাট্ পরিকল্পনাকে মূল কেন্দ্রাভিমুখে পরিচালিত করেছিল, তারা জার্ম্মানীর অসংখ্য শিল্পী বা টেকনিসিয়ান। তাদের পরিশ্রম ও প্রতিভা, তাদের অনমনীয় কর্ম্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা, জাতিকে বড় করার উদগ্র বাসনা হিট্‌লারের কর্ম্মকুশলতায় সুপরিচালিত হয়ে জার্ম্মানীকে এত বড় করে তুলেছিল। জার্ম্মানীর মধ্যমণি সেই বার্লিনকে দেখবার জন্যে আমি ভারত থেকে যাত্রা করেছিলাম।

ভারতবর্ষ থেকে ১৯৪৭ সনের ২২শে ডিসেম্বর বিওসি-এর ইয়র্ক প্লেনে যাত্রা করে আমি ২৪শে ডিসেম্বর বেলা ২টায় লণ্ডনে উপস্থিত হলাম। লণ্ডনে কয়েক দিন নানা কাজে কাটিয়ে শেষে বার্লিন যাত্রা ঠিক করলাম। লণ্ডনের ৪৬ মাউণ্ট ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়া সাপ্লাই কমিশনের অধ্যক্ষ মিঃ বিল্লিমিনের সঙ্গে দেখা করলাম। মিঃ বিল্লিমিন পঞ্জাবের অধিবাসী, ভারতীয় খ্রীষ্টান। প্রত্যেক মাসেই ভারতবর্ষ থেকে বার্লিনের যাত্রীদের একটা সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে—নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা সাপ্লাই কমিশনের অধ্যক্ষই করে থাকেন। তিনি আমার নাম নির্ব্বাচন করে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করলেন। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে লণ্ডনে দেখা করলে আমার ছাড়পত্রে

যুদ্ধোত্তর বার্লিনের একটি রাস্তা

অনুমতির স্বাক্ষর দিয়ে আমাকে আর একখানি চিঠি দিলেন। সেই চিঠি পেয়ে আমার বার্লিন যাত্রার ব্যবস্থার জন্য প্রথমে এক্সচেঞ্জ আপিসে (ফরেন অফিস, নরফোক হাউস, সেণ্ট-জেমস্ স্কোয়ার, লণ্ডন) টাকা জমা দিতে গেলাম, সত্তর পাউণ্ড ব্রিটিশ ও আমেরিকান জোনের জন্য জমা দিলাম এবং পনের পাউণ্ড জমা দিলাম লিপজিগের মেলা দেখবার জন্য। ঐ মেলা দেখবার জন্য পূর্ব্ব থেকেই আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

আমষ্টার্ডাম থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ রওনা হয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারী বৈকালের দিকে বার্লিন পৌঁছলাম। ইংরেজদের অতিথি হয়ে যাঁরা বার্লিন দেখতে যান তাঁদের জন্যে ব্রিটিশ জোনে দুটি হোটেলের ব্যবস্থা আছে। একটি হোটেল আমজু আর একটি হোটেল সেভয়। যাত্রারম্ভেই বেশ খানিকটা নাজেহাল হয়েছিলাম। ভুল করে জার্ম্মান ট্রেনে উঠেছিলাম। জার্ম্মান ট্রেনে কোনও রেষ্টুরেণ্ট-কার নেই এবং পথে যে সমস্ত হোটেল পড়ল তাতেও কিছু কিনতে পাওয়া যায় না।

ফলে সারারাত্র হরিবাসর করেই কাটাতে হয়েছিল। আমি হোটেল আমজুতেই উঠলাম।

পরের দিন থেকেই আমার কাজ সুরু হ'ল। আমি এক জন মুদ্রাকর—আমার একান্ত অভিপ্রায় ছিল মুদ্রাযন্ত্র যাঁরা নির্ম্মাণ করছেন তাঁদের খোঁজ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাঁদের কাছ থেকে যন্ত্রপাতির কলাকৌশল শিখে তবে ভারতে সেটাকে কার্য্যকরী করা। সাম্রাজ্যবাদ-নিষ্পেষিত ভারতে এটা আশা করতে পারি নি, গঠনমূলক কার্য্যে বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত গবর্ণমেন্টের কোনও সাহায্য পাব আশা করতে পারি নি, তাই স্বাধীন ভারতের নয়া তালিমে যন্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে বার্লিন থেকে কিছু কার্য্যকরী শিক্ষা আয়ত্ত করে নিজের দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করব এই আশা নিয়েই বার্লিন গিয়েছিলাম।

বার্লিনের একটি দৃশ্য

বার্লিনে পৌঁছবার পরের দিনই সেখানকার ভারতীয় সামরিক মিশনের সহিত সাক্ষাৎ করে বার্লিনের নাম-করা মুদ্রাকরদের এবং মুদ্রাযন্ত্র-নির্ম্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম জানতে চাইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা আমায় কোনও সংবাদ দিতে পারলেন না। তাঁদের এই অজ্ঞতায় খুব বিস্ময়বোধ করলাম। এইখানেই বলে রাখছি যে ভারতীয় সামরিক মিশনের কর্ম্মচারীদের ভিতরে একজনও টেকনিসিয়ান ছিল না। সামরিক মিশনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ভারত ইউনিয়নের সহিত বার্লিনের যোগসূত্র অটুট রাখার দায়িত্ব কি সামরিক মিশনের নয়? তাই যদি হয় তবে পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্ত ভারতের পক্ষে বর্ত্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কি তার আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করা নয়? বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে যে সকল জাতি শিল্প-উন্নয়ন দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে জাতিগঠনমূলক কার্য্যে তাদের কাছ থেকে যেটুকু আমাদের গ্রহণ করবার আছে তৎসম্বন্ধে আমরা যদি সুচেতন না হই তা হলে আমাদের কল্যাণ হবে কিসে? বার্লিনে বসে বসে এসব প্রশ্ন আমার মনকে ব্যাকুল করে তুলত এবং নিজেদের অসহায়তা আমার মনকে পীড়া দিত।

যুদ্ধোত্তর বার্লিনের একটু পরিচয় এখন দেওয়া প্রয়োজন। প্রায় পঁচাত্তর ভাগ বার্লিন এখনও ধ্বংসের গর্ভে। ধ্বসে-যাওয়া প্রাসাদগুলির সংস্কার করা দূরে থাকুক ছাইয়ের জঞ্জালও দূর করা হয় নি। মিত্রশক্তি অধিকৃত বার্লিন চার ভাগে বিভক্ত।

(১) ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল।
(২) মার্কিন অধিকৃত অঞ্চল।
(৩) রুশ অধিকৃত অঞ্চল।
(৪) ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল।

আমি ইংরেজ সরকারের অতিথি। অতএব আমার পক্ষে সকল স্থান পরিভ্রমণ করার কোনও বাধা ছিল না। হোটেল থেকে ট্যাক্সি দেওয়া হ'ল এবং ট্যাক্সিতে সব জায়গা ঘুরে দেখতে লাগলাম। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে আমি চলাফেরা করছি, সর্ব্বত্র ঘুরে সবকিছু দেখার চোখের স্বাধীনতা আমার রয়েছে, কিন্তু মনের স্বাধীনতা আমার নেই। চোখ খুলে দেখতে পারি, কিন্তু মন খুলে কথা কইতে পারি না এবং ইচ্ছামত নিজের পকেটের টাকা ব্যয় করবার অধিকার আমার নেই। অন্তরের এই রিক্ততায় কেন আমার মন বিষিয়ে উঠেছিল তার বর্ণনা একটু পরেই পাবেন। লণ্ডন থেকে যে টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা জার্ম্মানদের দেওয়া ছিল নিষিদ্ধ, কোনও জার্ম্মানকে টাকা দিতে পারবে না এই ছিল কর্ত্তৃপক্ষের বিধান—পারিতোষিক হিসাবে কেবল সিগারেট বিতরণের প্রথাটাই দেখলাম, টাকার বদলে সিগারেটকেই চতুঃশক্তি কারেন্সি হিসাবেই মেনে নিতে চায়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে ভারতীয় সামরিক মিশন আমাকে কোন সাহায্য করতে পারে নি, ইংরেজী জানা একজন জার্ম্মান ডাক্তার বন্ধু এখানে পেলাম। নাম Dr. Kuhnest। তিনি স্থানীয় একটি মেডিক্যাল জার্ণালের সম্পাদক এবং এই সূত্রে অনেক মুদ্রাকরের সহিত ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচিত। ডাঃ কুনের সৌজন্যের অভাব ছিল না—কিন্তু তাঁর সময় এত কম ছিল যে তিনি সব সময় আমাকে নিয়ে ঘোরাফেরা করবার অবসর করে উঠতে পারেন নি। তিনি

এক জার্ম্মান ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমায় পরিচিত করে দিলেন। তিনি কাজ চালাবার মত ইংরেজী ও রুশ ভাষা জানতেন। তিনিই আমার দোভাষীর কাজ করতেন। ডাঃ ক্যুনের কাছ থেকে যুদ্ধ-পূর্ব্ব বার্লিনের যে সকল ছাপাখানার তালিকা পেয়েছিলাম তন্মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্বের সন্ধানই পেলাম না। অনেক খোঁজাখুজির পর ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে একটি প্রেসের পাত্তা পাওয়া গেল। ডাঃ ক্যুনেকে সঙ্গে করে প্রেসের মালিকের সঙ্গে দেখা করলাম, জঞ্জালের স্তূপ পরিষ্কার করে একটি মেসিন বের করা হ'ল। এজন্য শুধু সিগারেটের খরচাই হয়েছিল। কর্ম্মব্যপদেশে বার্লিনে যে সকল জার্ম্মানের সহিত পরিচিত হয়েছিলাম তাঁদের সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

বার্লিন একটি শিল্পকেন্দ্রিক শহর, যুদ্ধ-পূর্ব্ব বার্লিনের পরিচয় আগে পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু যুদ্ধোত্তর বার্লিন নিজের চোখে দেখতে গিয়ে হতাশ হয়েছি। বার্লিনের বাজারে দোকানীরা দোকানপাট সাজিয়ে বসে, কিন্তু অতি সাধারণ জিনিষও কিনতে পাওয়া যায় না। নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের অভাব বার্লিনে প্রচুর। স্থঁচ ব্লেড প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বার্লিনের বাজারে নেই। জার্ম্মানীর "পানামা" ব্লেড এক সময় সারা দুনিয়ার বাজারে খুব চালু হয়েছিল, কিন্তু বর্ত্তমান বার্লিনে ব্লেড দুষ্প্রাপ্য বললেই চলে। এত সব দুর্ভাগ্যের মধ্যেও দেখলাম বার্লিনের শিল্পীদের প্রতিভায় মরচে পড়ে নি, সৃজনীশক্তি তারা হারায় নি। ইংরেজ ও মার্কিনরা টিনে ভরা খাদ্যটুকু গ্রহণ করে টিনগুলিকে অকেজো জিনিষ বলে ফেলে দেয়, কিন্তু বর্ত্তমান বার্লিনের শিল্পকারগণ সেই পরিত্যক্ত টিনগুলি কুড়িয়ে তা দিয়ে কাজ চালাবার মত ব্লেড প্রস্তুত করছে। ধাতুর অভাব খুবই বেশী, দেখলাম কাঠ দিয়ে ক্ষুরের হাতল তৈরী করে চমৎকার ভাবে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। বার্লিনে বস্ত্রসমস্যা ভারতের চেয়ে অনেক প্রবল, বিশেষ করে শীতের দেশে গরম কাপড় না হলে চলতেই পারে না, তারা কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাকে খুশীমনে মেনে নিয়েছে—বস্ত্রাভাবের জন্যে হা-হুতাশ নেই।

যুদ্ধের সময় থেকেই জার্ম্মানীর খাদ্য ভাণ্ডারে বাট্‌তি সুরু হয়েছে—বর্ত্তমান অবস্থার ত তুলনাই হতে পারে না।

বার্লিনে প্রত্যেক জার্ম্মান সপ্তাহে ৫১ গ্রাম (সাড়ে চারি তোলা) মাংস পায়, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে সকলের ভাগ্যে তাও জোটে না। লার্ড বা ফ্যাট নামক পদার্থ খাদ্যদ্রব্য ভাজবার জন্য অল্প পরিমাণেও সেখানে পাওয়া যায় না। রুটি প্রতি সপ্তাহে আধ পাউণ্ড করে দেওয়া হয়, দুধ চোখে দেখা যায় না। নবজাত শিশুকে প্রথম কয়েক দিন স্যাকারিন জলে ভিজিয়ে খাওয়ান হয় তারপরে সুপ অভ্যাস করান হয়। কোনও প্রকারের কাঁচা বা পাকা ফল জার্ম্মানীর কি গ্রামবাসী কি শহুরে লোকেরা বহুদিন চোখে দেখে নি।

স্কুল কলেজের শিক্ষা চলছে মন্দাক্রান্তা ছন্দে।* বাইরের জলুস খানিকটা আছে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের প্রাণখোলা স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত আনন্দের অভিব্যক্তি নেই। বার্লিনে পৌছে বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচিত হওয়ার বাসনা ছিল, কিন্তু অন্তরায় হ'ল জার্ম্মান ভাষা সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা। বিশেষ চেষ্টা করে কতকটা কাজ চালাবার মত ভাষা আয়ত্ত করলাম, আর বাকিটা বোঝাবার প্রয়াস পেতাম অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে। তৎসত্ত্বেও যেটুকু ত্রুটি রয়ে যেত—সেটুকু পূরণ করতে চেয়েছিলাম ভালবাসা দিয়ে তাদের চিত্ত জয় করে। ট্যাক্সি করে টিফিনের সময় প্রায়ই কোনও না কোন স্কুলের দরজায় গিয়ে হাজির হতাম—কাঁধে বেদুইনের ঝুলি তাতে নানা রকমের চকলেট, লজেঞ্জ, টফি ইত্যাদি। ওগুলি তাদের বিলিয়ে দিয়ে এক নির্ম্মল আনন্দ লাভ করতাম। বালকবালিকারাও তাদের ভারতীয় বন্ধুকে কয়েক দিনের মধ্যেই আপন করে নিয়েছিল।

রুশ অধিকৃত অঞ্চলের প্রবেশদ্বার

পূর্ব্বেই বলেছি যে আমি হোটেল আমজুতে উঠেছিলাম। হোটেল আমজুর একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার। হোটেল আমজুর কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে ম্যানেজার ইংরেজ এবং রান্না-ঘরের তত্ত্বাবধানকারী দু'জন ছিলেন ইংরেজ। নিম্নতন কর্ম্ম-চারীদের ভিতরে সবাই ছিল জার্ম্মান। পরিবেশন থেকে

আরম্ভ করে ধোয়া-মোছা পর্য্যন্ত সব কাজই জার্মানগণ করে। আগন্তুকদের প্রাতরাশের চার প্রকারের খাদ্য, দুপুরের লাঞ্চের জন্য ছয় প্রকারের খাদ্য, বিকালে চায়ের চার প্রকারের খাদ্য এবং রাত্রের জন্য সাত প্রকারের বিভিন্ন খাদ্য জার্মান পরিবেশকগণ পরিবেশন করে; কিন্তু নিজেরা এক টুকরো কালো রুটি এবং এক মগ সুপ দিয়ে তাদের অভ্যন্তর-মানবকে তুষ্ট করার ব্যর্থ প্রয়াস পায়। এ ধরণের পার্থক্য অন্যান্য ব্যাপারেও অনুরূপ ভাবে বিদ্যমান। হোটেলের বসবার ঘর দু'রকমের। স্থায়ী বাসিন্দারা আসবাবপত্র-সমৃদ্ধ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর পাচ্ছেন আর জার্মান কর্ম্মচারিদের ঠাণ্ডা ঘরে দুই খানা টেবিল ও কয়েকখানা কাঠের চেয়ার নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হচ্ছে। এদের সঙ্গে কোনও জার্মান অতিথি দেখা করতে এলেও সজ্জিত ঘরে বসবার অধিকার পায় না। হোটেলের নিয়ম জার্মান কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁদের বিশিষ্ট পুরুষ-বন্ধুদের সপ্তাহে একবার করে খাওয়াতে পারবেন।

বার্লিনে থাকাকালে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনেকেই আমায় প্রশ্ন করেছেন, বিশেষ করে গান্ধীজী ও জবাহরলালজী সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহলের অন্ত নেই। অন্যান্য স্থানের ন্যায় বার্লিনবাসীরাও মনে করেন, গান্ধীজী জগতের শ্রেষ্ঠ মানব। গান্ধীজীর মৃত্যুসংবাদ যখন বার্লিনে পৌঁছল তখন বার্লিনের সর্ব্বসাধারণ শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানবের লোকান্তরিত আত্মার প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে তারা একটি শোকসভার আয়োজনও করেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয় নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আমি বার্লিনে কয়েকজন লোককে বিশেষ ভাবে প্রশ্ন করেছিলাম। আমার সঙ্গে নেতাজী বসুর ফটো ছিল, আমি তাদের সে ফটো দেখিয়েছিলাম—অনেকে নেতাজী বসুকে চিনতে পেরেছিলেন এবং যুদ্ধকালীন বার্লিনে হিট্‌লারের সঙ্গে একত্র দেখেছিলেন বললেন।

রুশীয় জোনে আমার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটুকু বলে আমি বার্লিনের কাহিনী শেষ করব। বার্লিন পরিত্যাগের আগের দিন সকালে আমি আমার ট্যাক্সিচালককে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ইচ্ছে ছিল শহরটাকে একবার ঘুরে দেখা। ট্যাক্সিচালক ইংরেজী জানত না। ভুল করে রুশ অধিকৃত অঞ্চলের মুখে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দু'জন রুশীয় সৈনিক আমাকে এবং ট্যাক্সিচালককে ঘিরে ফেলে রুশ ভাষায় কি সব বলতে লাগল বুঝতে পারি নি। আকারে ইঙ্গিতে বুঝলাম যে আমার কাছ থেকে ও চালকের কাছ থেকে তারা আমাদের ছাড়পত্র চাইছে। যে মহিলাটি আমার দোভাষীর কাজ করত তার কাগজপত্রও দেখতে চাইলে। মহিলাটি ইংরেজ বলে পরিচয় দিতেই তাকে নিয়ে আর কোনও গোলমাল করল না। দূর থেকে দেখতে পেলাম ব্রিটিশ পতাকাবাহী একখানি লরী আসছে। গাড়ীটি কাছে এলে আরোহী সৈনিকদের একজনের কাছে আমার নাম ও অন্যান্য খবরসম্বলিত এক টুকরো কাগজ বার্লিনে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে পৌঁছে দেবার জন্যে দিয়েছিলাম। তখন বেলা সাড়ে দশটা। বার্লিন থেকে আমাদের উদ্ধারের জন্য লোক আসতে সাড়ে তিনটে হ'ল। এতক্ষণ ঠাণ্ডার ভেতরে একটা সেতুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। ভারতীয় সামরিক মিশন থেকে লোক এসে আমাদের উদ্ধার করল। রুশ অঞ্চলের কথা শেষ করবার পূর্ব্বে জার্মানী সম্বন্ধে রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষের কর্ম্মপন্থা বিষয়ে একটু বলে আমার কথা শেষ করব। মধ্যযুগের কথা ছেড়ে দিয়ে বর্ত্তমান যুগ থেকে আরম্ভ করলে দেখা যাবে যে, ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সঙ্গে থেকে আরম্ভ করে ইংলণ্ড, ফরাসী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জার্মানী অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। ইতিহাসে তাদের শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। অতীতের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য বার্লিনে অনেক স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়েছিল। শুনতে পেলাম রুশ কর্তৃপক্ষ সে সকল ঐতিহাসিক স্তম্ভগুলি ধ্বংস করে ফেলবেন, কেন না ঐ স্তম্ভসমূহ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক এবং ফাসিষ্ট মনোবৃত্তিকে বাঁচিয়ে রাখে তাই রুশ কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যৎ ফাসিষ্ট আন্দোলন বিনাশ করার জন্যে জার্মান ঐতিহ্যের বাহন স্তম্ভগুলিকে ধ্বংস করে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য আমি করব না, কিন্তু অন্য প্রশ্ন বাদ দিলেও শিল্পসম্পদের ধারক ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভগুলির এরূপ পরিণতি চিন্তা করলে মন বিষাদে পূর্ণ হয়। হোটেল আমজুতে ফিরে আসার পরক্ষণেই রয়টারের লোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করে আমার কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে নিলেন। লণ্ডনের কয়েকটা কাগজে এ খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

পরের দিন বার্লিন ত্যাগ করলাম।

স্মৃতির ব্যথা

(সাঁওতালী গল্প)

শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায়

"বাং" (না) শুনা ধমক দিলে। তার কুকুর 'কাট্‌কো' তাকে খাটিয়ার তলা থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। "যা না হতভাগা," মনিব আবার রেগে আদেশ দিলে। কুকুরটা ঘেউ করে উঠল, তাতে আব্দার ও হাসির খাদ মেশান। সে আবার কাপড় কামড়ে টানতে লাগল। শুনা আবার বললে, "কেন বিরক্ত করছিস", তারপর খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে স্মৃতির স্বপ্নের জালটাকে আবার আঁকড়ে ধরতে চাইল, চেষ্টা করলে—আবার বোনা যায় কি না।

কাট্‌কো খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইল, যেন গোবেচারী; ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। তারপর যেমন চিরকালের অভ্যাস, আবার খাটিয়ার নিচে গিয়ে মাথা দিয়ে শুনাকে নাড়া দিলে। এবার প্রভু উঠল চেঁচিয়ে, গালমন্দ সুরু করলে। কাট্‌কো বেত্রাহত ছাত্রের মত লেজটি গুটিয়ে নিয়েছে। প্রভুকে একখানা লাঠি হাতে করার চেষ্টা করতে দেখে, কেঁউ মেঁউ করে বাইরে চলে এসে, পরম দার্শনিকের মত এই মায়াময় পৃথিবীর অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কথাই বুঝি ভাবতে লাগল।

সত্যি কথা বলতে গেলে কাট্‌কোরই বা কি দোষ? বদলে গেছেন প্রভুই; ও বেচারী কি জানে? শুনার ঘরের বেড়ার ফাঁকে সূর্য্যের আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। এতক্ষণ ত সে শুনার সঙ্গে পাহাড়ে, মাঠে ঘাটে হৈ হৈ করে বেড়ায়। আজ তার আবলুষ-কালো বুকের উপরে সোনালী রোদ, চোখে ঘুমের ঘোর···এখনো। তার চাউনিই বদলে গেছে, মনে হয় চোখ দুটোয় স্বপ্নের ছায়া ঘুরছে।

খাটিয়া নড়ল। শুনা আড়মোড়া ভেঙে, আঙুল মটকাচ্ছিল। কাট্‌কো তাকাল বাইরের দিকে, দেখলে সূর্য্য আকাশে উঠে গেছে। আজ তার দেরী হয়ে গেছে, এমন কখনও হয় না। শুনা হেসে ফেলল, "হিজু মে" (এদিক আয়) বলে ইসারা করলে। এবার কাট্‌কোর পালা; সে স্থাণুর মত স্বস্থানে বসে রইল।

"আসুন না মশাই", শুনা রাগ ভাঙাবার মোলায়েম সুরে বললে। কাট্‌কোর সাড়াশব্দ নেই।

"আচ্ছা, দেখি রাগ কতক্ষণ থাকে", বলে শুনা একটা মাটির ভাঁড় থেকে কিছু খই নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিলে। চোরা চাউনিতে প্রভুকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে, মনে হ'ল কাট্‌কোর মতটা বদলে গেল। সকাল বেলার খাবার—নিত্যকার পাওনা, মাঠে মারা যায় কেন? খাওয়াই যাক না।

"বেটা পেটুক কোথাকার!" বলে শুনা আপন মনে হাসতে লাগল।

সেই সাত সকালে কাট্‌কোকে নিয়ে বেরুবেই কি করে। সারারাত ঘুমায় নি। এখনও মনে পড়ে তার—সমস্ত দেহ-মনে একটা নতুন সাড়া, একটা মত্ততার চাঞ্চল্য···। সুখ?··· শান্তি?···আবার? এই পাঁচ-ছ' বছর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছে, আঁকড়ে ছিল স্ত্রীর স্মৃতি আর কোলে ছিল কাট্‌কো, তার একমাত্র চিহ্ন। এত দিন সে ভেবেছে সুখশান্তি এ পৃথিবীতে থাকলেও তার নাগালের বাইরে। এখানে থাক, খাও-দাও, হাঁড়িয়া টান দুঃখ কষ্ট ভুলে যেতে। বছরের পর বছর কেটেছে···এসেছে নাচ, গান, শিকার··· আবার শিকার···নাচ···গান। হাঁড়িয়া মদে চুর হয়ে থেকেছে, শুঁড়ির দোকানে বাঁধা রেখেছে স্ত্রীর অলঙ্কারগুলো। এদিকে আবার অজন্মা হ'ল···বীজের ধান খেয়ে বাঁচল কিছু দিন··· ঘরে চাল নেই, যা কিছু পায় মজুর খেটে, লেগে যায় কাট্‌কোকে খাওয়াতে আর হাঁড়িয়া তৈরি করতে···জীবনে এসেছে একটা উন্মত্ততা···এই জীবন একটা দুঃখ কষ্টে ভরা মলিন অধ্যায়···যা করে হোক ভুলে যাও যে বেঁচে আছ।

এদিকে এক দিন ঘরে আগুন লেগেছে। কাট্‌কো চেঁচিয়ে কেঁদে পাড়া মাথায় করে তুলেছে। শুনা দেখলে তার আশ্রয়—শেষ সম্বল—তাও চলে যাচ্ছে। বাইরে এসে হতভম্বের মত আলোর খেলা দেখলে। শুনা ভাবলে, "বা, কি সুন্দর! ধোঁয়াগুলি কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। আগুনে চারদিকে লালে লাল···।" হঠাৎ পিছু টান পড়ল, তার কাপড়ের খুঁট ধরে কে টানছে! কাট্‌কো? দেখা যায় পরগনাইত লোকজন নিয়ে এসে পড়েছে আগুন নেবাতে। "আগুন সে নেবাবেই বা কেন?" ভাবলে শুনা। তার কি অধিকার? এ সৌন্দর্য্য নষ্ট করতে হয়? বিদ্যুদ্বেগে শুনা নিয়ে এল তীর-ধনুক। তার চোখে যেন বাঘের চাউনি, হুঙ্কার দিয়ে বললে, "যে আগুন নেবাবে, মারব এই তীর!" তার মুখে অট্টহাসি। সবাই ভাবলে, পাগল হতে আর বাকী নেই। তার বাড়ী যাক পুড়ে, আমাদের কি মাথাব্যথা? পরগনাইত এলেন, শুনাকে শান্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। আগুনের "বোঙ্গারা" সব ছাই করে রেখে চলে গিয়েছে···শুধু একটা গরম ভাপ্‌সা হাওয়া বইছে।

পরের দিন পরগনাইত আবার শুনার কাছে এলেন, তার সঙ্গে একটি মেয়ে। দেখে মনে হয় চেনা চেনা, তুলসী না? হাঁ সেই তো বটে। পরগনাইত শুনাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, "গাঁয়ের সবাই এ টাকাটা উঠিয়েছে। তুলসী ত বাড়ী বাড়ী গিয়ে অর্দ্ধেক আদায় করেছে। যা হবার হয়েছে, এখন ঘরটা তোল।" শুনার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল, টাকা কয়টা সে

বুঝি ছুঁড়েই ফেলে দেয়। তুলসীর চোখ যেন মৌন ভাষায় বলে, "আহা, কত কষ্ট। নাও না এ টাকা কয়টা।" সে যেন মূর্ত্তিমতী করুণা। কি জানি কি ভেবে শুনা রাজী হ'ল।

দিন সাতেক পর তুলসী আবার এল, তার হাতে কিছু জনরা আর মহুয়া ফল। শুনা রাঁধছিল। হাসি হাসি চোখে তুলসী বেটাছেলের রান্না করা দেখছিল,...হাত পুড়ছে, ভাত পুড়ছে; হাঁড়ি হেঁসেল ওলটপালট...

যার কাজ তাকে সাজে। তুলসী বললে, "আসব আমি"। শুনা না বলতে পারল না। মুহূর্ত্তে সব বদলে গেল নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়। মেঘের মত কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে, কতদিন গোবর-লেপ পড়ে নি মেঝের ওপর কে জানে। উনুনের আগুনের লাল আভা এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে—আঙুলের ডগাগুলির লীলায়িত গতি, সুডোল বাহু দুটি চোখকে আকৃষ্ট করে। সর্ব্বাঙ্গে নিকষ-কালোর অপরূপ চাকচিক্য।

পেটুক ছেলের মত শুনা খেতে বসল। এ যে কতদিন জোটে নি, এই মমতার স্নিগ্ধতা, গৃহিণীপনার স্নেহস্পর্শ! শুনার সামনে শালপাতা, তুলসী হাওয়া করছে; বলছে, 'এটা খাও, ওটা ফেলো না'—এর মধ্যে অকস্মাৎ শোনা গেল কাট্‌কোর বিকট ঘেউ ঘেউ, যেন বাড়ীতে ডাকাত চড়াও হয়েছে। দাঁত খিঁচিয়ে কুকুরটা তুলসীকেই যেন বলছে "তফাৎ যাও, নইলে টের পাবে আমার দাঁতের ধার"? তার চোখে যেন খুনীর দৃষ্টি। তুলসীকে এক কোণে ভয়ে জড়সড় দেখে শুনা ভাত ফেলে একটা চেলাকাঠ নিয়ে কুকুরটাকে এক ঘা বসিয়ে দিলে, তারপর মনে হ'ল যেন চোখের জল সামলাল। কাট্‌কো কিন্তু থামে না, উঠানে বসে আর্ত্তনাদে পাড়া কাঁপিয়ে তুলল, যেন বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তুলসী হেসেই বিদায় নিলে, যাবার সময় কি ভাবল সে-ই জানে। কাট্‌কো আড়চোখে মেয়েটির চলনশীল ছায়াকেই যেন লক্ষ্য করতে লাগল।

বিকালবেলা শুনার মনে পড়ল কাট্‌কোর খাওয়া হয় নি; অনুতাপের গ্লানিতে তার মনটা ভরে গেল। কুকুরটা তার একসঙ্গে খায়, তাদের দুজনের সমান সমান ভাগ। আজ সে করেছে কি? অবোলা জীবটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। তাই তো শ্রীমানের গোসা হয়েছে। শুনা ডাক দিলে 'কাট্‌কো'। সে এল, ভাবে ভঙ্গিতে তাহার ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই, একটা সলজ্জ অপরাধীর দৃষ্টি। প্রভু খাবার দিচ্ছে দেখে কাট্‌কো আনন্দে যেন উপচে পড়ল।

শুনা হাসল, আদরের সুরে বললে, "হ্যাংলা, হাভাতে"। তারপর কুকুরটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল, আদরে আদরে, হাসিঠাট্টায় উচ্ছল হয়ে উঠল। মনে পড়ল মৃতা স্ত্রীর কথা, কাট্‌কো ছিল একান্ত ভাবে তারি আদরের। সেই এক আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনে মায়ের মত যত্নে সে কুকুরটাকে এত বড়টি করেছিল, সন্তানহীনা নারী মাতৃত্বের স্বাদ সে পেত কাট্‌কোকে আদর সোহাগ করে। খাওয়া-দাওয়া শোয়া সব সময়েই কাট্‌কোর খোঁজ পড়ে, এ যেন তার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন। সবাই বলত, কুকুর-পাগলী এমন আর দেখি নি বাপু! লক্ষ্মীছাড়া কুকুরটার কাণ্ডও ছিল অদ্ভুত। এক এক দিন সে কোথায় পালাত কে জানে। তখন "খোঁজ, খোঁজ" বনেবাদাড়ে, পাহাড়ে, মাঠে। ওদিকে শুনার স্ত্রীর খাওয়া-দাওয়া বন্ধ...দু দিন-তিন দিন পর মহাপ্রভু বাড়ী ফিরলেন যেন হারানিধি।

ক্রমে ক্রমে মনে পড়তে লাগল, স্ত্রীর মৃত্যুর কথা, তার শেষ উক্তি 'কাট্‌কোকে দেখো'। চারপাইয়ে করে শব নিয়ে তারা যাত্রা করেছে, সঙ্গে তাদের কাট্‌কো, চোখ ফুলেছে কেঁদে কেঁদে, মাঝে মাঝে করুণ আর্ত্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠছে...

আর ভাবা যায় না। মাথাটা বন্ বন্ করে ঘোরে... টলতে টলতে শুনা বেরিয়ে পড়ে, সামনের জঙ্গলে গিয়ে কি একটা লতাপাতা নিয়ে এল। তারপর তা ছেঁচে কাট্‌কোর সেই কাটা জায়গাটায় দিতে গিয়ে ক্ষত দেখে বুঝতে পারল সে কি অন্যায় করেছে। ততক্ষণে চোখের জল আর মানা মানে না।

•

বিপত্নীকের বিয়ে হবে, চারদিকে একটা হাসিঠাট্টার জোয়ার এসে গেছে। কেউ বলছে, "এ সব মন্দরা মুখ ভেঙচায় বানরের মত।" কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি মত প্রকাশ করছে, "সব সমান, 'ছাড়ই কুড়ী' (তালাক দেওয়া মেয়ে) সবুজ বুলবুল, হাজার রকম ডাকে। রাঁড়ীগুলো বাঁজা ঘোড়া, হান্ হান্; আর বউ-মরা বর, কর্কশ ঝাঁটার মত।"

চলল নাচগান, তুলসী-শুনাকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা...শুনা যেন কি একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে...এক একবার আড় চোখে তুলসীকে দেখছে, আর ভাবছে এতক্ষণ 'লু' বইছিল, দিগদিগন্ত জলে পুড়ে যাচ্ছিল; তার মধ্যে আজ বর্ষা নেমেছে, সেই নব জলধারায় সে ভিজছে—এ যেন তার মুক্তিস্নান।

দূরে বুড়া পরগনাইত্, পাকা দাড়িওয়ালা মুখে হাসছে। সামনে তার বউ। দু'জনার চোখেই যেন একটা স্বপ্ন খেলে যাচ্ছে..প্রকৃতি আজ উর্ণনাভের মত দুটি নরনারীকে তার জালে জড়িয়েছে।

শুনা কাপড়ের মধ্য থেকে একটা রূপার হাঁসুলী বার করে পরগনাইতের স্ত্রীর হাতে দিলে। বুড়ী তুলসীকে কোলে করে তার গলায় পরাল...মেয়েরা কতকগুলি ফুল তার হাতে গুঁজে দিচ্ছে...

দূরে মনে হ'ল সরে যাচ্ছে এক জোড়া ভাঁটার মত লাল চোখ। আপন মনে শুনা বলে উঠল, "কাট্‌কো"!

চার দিকে একটা মাতাল হাওয়া বইছিল। বসন্ত এসে গেছে, কিন্তু শুনার মনে হ'ল আচমকা একটা কুয়াসার জাল এসে যেন দিগ দিগন্ত আচ্ছন্ন করে দিলে। হঠাৎ সে যেন অন্ধ হয়ে গেল……

আবার বিশ্রম্ভালাপ, নিজের কুটিরে খাটিয়ায় শুয়ে।

"পাগল হয়েছিস। দেখি মাথাটা। বাবা, কি গরম।" কাট্‌কো মাথা নাড়ে, "না।"

"তা হ'লে এখানে সেখানে কেঁদে কেঁদে বেড়াস কেন? তুলসীর সঙ্গে আমায় দেখলেই ক্ষেপে যাস কেন? বল্ কেন, হতভাগা পাজী।…"

কাটকো গুড়িসুড়ি মেরে শুনার পা চাটছে।

"জবাব দে, তা নইলে, তোর এক দিন আমার এক দিন।"

কুকুরটা সাড়া দিলে। ঘেউ ঘেউ নয়, যেন একটা কাঁদুনীর সুর, ক্লান্ত, অতীতের স্মৃতিবিজড়িত; কোথায় যেন কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়।…

ক্রুদ্ধ প্রভু হুকুম জারী করলেন, "এক দিন উপোস, ঠায় উপোস। পাগলামির ওষুধ দিলাম।"…

বিয়ের দিন এসে গেছে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে, বাজনা বাজিয়ে বরপক্ষ দক্ষিণ কাঠিকুণ্ড রওনা হ'ল। পৌঁছুতেই জগ-মাঝি মেয়েদের নিয়ে এল বরপক্ষের পা ধোয়াতে…দু-পক্ষে একটা দাঙ্গার নাটক হ'ল, বর কাড়াকাড়ি…নাচ, গান, মদ্যপান… জগ-মাঝি মাতালদের সামলায়, গ্রামের ভদ্রতা বাঁচায়…

পাগড়ী মাথায় শুনা বসে আছে, সিন্দুর দানের এখনো অনেক দেরি। সব যেন আজ ওলটপালট, খেয়ালী কাণ্ড। চোখে যেন পৃথিবী, নরনারী—সব কিছুরই চেহারা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। লোকগুলো কি 'বোঙ্গা' (অপদেবতা), নারীগুলো সব ডাইনি? মনে হচ্ছে শুনা যেন পাতালপুরীতে যাচ্ছে…তাদের রূপকথায় যেমন বলে…তাকে পাকড়াও করেছে এক অপরূপ 'বোঙ্গী' রাজকন্যা…গভীর অন্ধকার, গহ্বর…রাজসভা…অজগরের মাথায় আসনগুলো ঝলমল করছে…বোঙ্গী? না তুলসী? সে নাচছে, দুলছে, সাপ-বাঘের সঙ্গে খেলা করছে…

আর একটি মেয়ে এসে শুনাকে বলছে, "আমরা জিতেছি।"

শুনার সাহস বেড়েছে—সে জবাবে বলছে, "মেয়েরা সব-খানেই জেতে।"

পাশ থেকে আর এক বোঙ্গী হাসল, "এটা কাপুরুষ।"

একটি ছিপছিপে তরুণী বললে—"বোকা"। তার দেহে একটা চাঞ্চল্য খেলে যাচ্ছে…

"তুলসীর চাকর গো," খিল খিল করে হেসে বললে এক মোটা বোঙ্গী।

তার পর নাচ সুরু হ'ল, দাড়িওয়ালা বোঙ্গা, অর্দ্ধেক নারী অর্দ্ধেক পশু বোঙ্গীর দল…হৈ হৈ, কলরব, উদ্দণ্ড তাণ্ডব…

অনতিদূরে শোনা গেল একটা কোলাহল, তার পর একটা চীৎকার, "মার, মার। খেপা কুকুর।" আর একজন যেন বলছে—"মেরো না ওটা শুনার পোষা, কাট্‌কো যে।"

তন্দ্রাবিজড়িত চোখে শুনা আঁৎকে উঠল, বললে—"কাটকো, কি বলছ।"

একজন শুনাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে—"দেখ দেখ, তোমার কুকুরটা পাগল হয়েছে। কাছে গেলেই কামড়াতে আসে।"

নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। "হ'ল কি", ভাবলে শুনা। রাগে আগুন হয়ে বুড়া পরগনাইত্ শুনাকে এসে বললে—"তোমার কুকুর তুলসীকে কামড়েছে।"

শুনা হাঁকল, "কোথায় ওটা?"

আঙ্গিনার কোণে একটা পেঁপে গাছের নীচে কাট্‌কো গুড়ি মেরে বসে ছিল। কোথা থেকে একটা লাঠি যোগাড় করে শুনা তার দিকে ছুটল। কাটকো চাইল শুনার পানে, যেন সে জানে তার অন্তিম মুহূর্ত এসে গেছে। শুনা চোখ বুজল…তড়িদ্বেগে তার চোখের সামনে যেন একটা ছায়া-ছবি খেলে গেল…তার স্ত্রীর মৃত্যু হচ্ছে…মৃত্যুপথ-যাত্রিণী বলছে, "ওকে দেখো।" লোকজনের চিৎকার কানে গেল, কে একটা লোক, হয় তো বা একটা মাতাল, বলছে—'মার, মার, ক্ষেপা কুকুর, মার।' দিশাহারা শুনা মারল লাঠি ছুঁড়ে।

মেয়েরা বর নিতে এসে শোনে শুনা কাট্‌কোর মৃতদেহ নিয়ে পালিয়েছে। এ কি কাণ্ড! লোকে ছুটল শুনার বাড়ী, কিন্তু ভগ্নদূত ফিরে এল, শুনা আসবে না।

চার দিকে যেন একটা অমঙ্গলের ছায়া ঘুরছে। তুলসীকে সবাই প্রবোধ দিচ্ছে, এমন সময় পরগনাইত্ ও তার স্ত্রী ফিরে এলেন দেখা গেল; ততক্ষণে সাঁওতাল পরগণার জাঙ্গালে রাঙা বেলুনের মত সূর্য্যোদয় হচ্ছে।

শোনা গেল কুকুরটাকে নিয়ে পাঁচ মাইল দৌড়ে এক ওঝার বাড়ী ছুটেছিল শুনা। সে মরা বাঁচিয়েছে কি এক পাতা দিয়ে। অদ্ভুত ওষুধ, পেয়েছিল সে ময়ূরভঞ্জের এক জান-গুরুর কাছে।

"কিন্তু, কুকুরটা ত বেঁচেছে; বিয়ে করতে ক্ষতি কি?" একটি মধ্যবয়সী নারী প্রশ্ন করলে।

"তা, হয় না গো," জবাব দিলেন পরগনাইতের স্ত্রী। "শুনা আমার পা ধরে বললে, তুলসীকে বল আমায় ক্ষমা করতে। আমি নিজের মন বুঝিনি, কাটকোকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। আসলে আমি তো তুলসীকে ভালবাসি নি, চেয়েছিলাম ভুলতে…"

ততক্ষণে কুয়াসার মধ্য দিয়ে সূর্য্যালোক এসে সবাইকে যেন অভিষিক্ত করছে। ধীরে ধীরে কখন যে এসে তুলসী সেখানে দাঁড়িয়েছিল, কেউ দেখে নি। সে বলে উঠল, "তা বেশ, ওরা সুখী হোক।" মনে হ'ল গলাটা যেন কেঁপে গেল।

আঁরি বার্গ্‌সঁ

(১৮৫৯-১৯৪১)

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

১৯১৪ সাল প্রথম মহাযুদ্ধের বাড়বাগ্নিকে পৃথিবীর বুকে নিয়ে এল। মানবসমাজ নীতিজ্ঞান হারিয়ে ধ্বংসের লীলায় মেতে উঠল। সেদিন মনে হয়েছিল সভ্যতার অগ্রগতির পথ বুঝিবা রুদ্ধ হয়ে গেল।

ঠিক এমনই সময় এই প্রলয় তাণ্ডবের অন্তরাল থেকে ফরাসী দেশের এক সৌম্যমূর্ত্তি অধ্যাপক সর্ব্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করলেন এই বাণী নিয়ে: 'আজ মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছে, পথচলায় তার ক্লান্তি এসেছে। কিন্তু নিরাশার কিছু নেই। এক দিন আমিও ক্লান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই অকস্মাৎ আমি এ জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করেছি।'

প্রথম জীবনে এই সত্যসন্ধ অধ্যাপকটির অন্ধ ভক্তি ছিল বিজ্ঞানশাস্ত্রে, গণিতে ছিল অসাধারণ মেধা। কিন্তু তারই সঙ্গে ছিল শিল্পকলায় অনুরাগ ; সুন্দর ভাষা, সুন্দর প্রকাশভঙ্গী —একই সঙ্গে বার্গ্‌সঁর ব্যক্তিত্ব দুটি বিভিন্ন ধারায় বয়ে চলেছিল। একই সময়ে তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞান ও গ্রীক্ সাহিত্যে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

১৮৫৯ সালে পারী শহরে বার্গ্‌সঁর জন্ম। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন ঘোরতর জড়বাদী। হৃদয়াবেগের মূল্য তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। তাঁর মতে মায়ের অশ্রু, প্রকৃতির রূপরাশি অর্থহীন, জগতের সব কিছু আকস্মিক আণবিক সংগঠনের ফলে উদ্ভূত, আবার ধূলিতেই তারা মিশে যায়। জীবন একটা আকস্মিক ঘটনা—তার কোন উদ্দেশ্য নেই।—এই ধরণের মতবাদের জন্যে সহপাঠীরা তাঁকে নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিল।

পরীক্ষা পাসের পর 'ক্লেরমঁ-ফের্যাঁ'র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিলেন বার্গ্‌সঁ। এইখানে মহানগরীর কলকোলাহল থেকে বহুদূরে শান্ত পল্লীর পথে ঘুরতে ঘুরতে বার্গ্‌সঁর মনে একটা পরিবর্ত্তন এল।

এখানে মহানগরীর 'জনসঙ্ঘাত-মদিরা' ছিল না, ছিল মুক্ত প্রকৃতির দৈন্যলেশহীন রূপসম্ভার। এখানকার মৌন প্রশান্তির মধ্যে বার্গ্‌সঁ উপলব্ধি করতে পারলেন জীবন নামে সত্তাটাকে শুধু একটা বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে বেঁধে ফেলা যায় না—তার অন্তরালে নিগূঢ়, অনির্ব্বচনীয় কোনও একটা শক্তি রয়েছে। পল্লীর আকাশে সূর্য্যাস্তের আরক্ত মহিমার কাছে রসায়নাগারের পরীক্ষাগুলিকে বড় তুচ্ছ, বড় ক্ষুদ্র মনে হ'তে লাগল। তারাখচিত নৈশ আকাশের অতন্দ্র মৌনতায় যে জীবন গোপন রয়েছে, মহাকবি শেক্‌স্‌পিয়রের যে বিরাট মনের আভাস পেয়ে বিশ্ববাসী বিমুগ্ধ—সে সব কি শুধুই কতকগুলি আকস্মিক আণবিক সংগঠনের ফল? বার্গ্‌সঁর মন বলল, 'না। যারা জীবনে বিশ্বাস হারিয়েছে, জীবনের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য যাদের অন্ধ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না, বিজ্ঞান তাদেরই সম্বল। বিজ্ঞান জীবনের সারল্যকে অনর্থক জটিল করে তুলেছে। পূর্ণকে খণ্ড করে দেখাই তার স্বভাব। এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—

'আপনারা সকলেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখেছেন ও ব্যবহার করেছেন। একটি মাকড়সার পা-কে অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়ে কি অদ্ভুত দেখায়। কিন্তু জিনিষটাই বা কি, আর আপনারা দেখলেনই বা কি!'

তিনি যা বললেন, তার সার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সব পাওয়া যায়, শুধু পাওয়া যায় না গতিকে। বিজ্ঞান গতিকে আজ অবধি ব্যাখ্যা করতে পারে নি। গতিকে সে স্থিতির রূপ দিয়ে দেখায়। দুটি বিন্দু এঁকে একটি রেখার সাহায্যে তাদের যুক্ত করা হ'ল। বিজ্ঞান বলবে, ঐ দুটি বিন্দুর মাঝে ঘন ঘন ক'রে আরও বহু 'স্থির' বিন্দু অঙ্কনের ফলে এই রেখাটি হ'ল। বার্গ্‌সঁ বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করলেন তা নয়, আয়ত্তাতীত একটি 'গতিবেগ এর অন্তরালে রয়েছে। রেখা আঁকার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত যে চঞ্চল হয়ে উঠল, সে কি শুধু কতকগুলি স্থির অবস্থার সমষ্টি?—তা নয়।

আবার, কালের মাপকে আমরা স্থানের মাপের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। ঘড়ির কাঁটা অথবা দোলক যতটা স্থান অতিক্রম করল, তাই তো আমাদের সময় নয়। সময়ের কোনও পরিমাণ নেই, কোনও পরিমাপ নেই। ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডের সমষ্টিই সময় নয়—সময় ধরা-ছোঁয়ার অতীত, সে অমেয়। তাকে শুধু অনুভব করা যায় আমাদের 'অস্তিত্ব' দিয়ে।

মনোরাজ্যের একটি গুণকে বার্গ্‌সঁ আবিষ্কার করলেন—সেটি আন্তর অস্তিত্ব বা 'ইনর ডুরেশন্'। তিনি বললেন, 'আমাদের মনের যে অংশ যুক্তিতে অভ্যস্ত, সে পারে শুধু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে, অনুভব করতে পারে না। এই অনুভূতির ক্রিয়া মনের আর এক অংশে—তার নাম স্বজ্ঞা বা ইনট্যুইশন্। তাঁর মতে 'স্বজ্ঞা' মনোরাজ্যের মহান্ একটি বিভাগ। বস্তুতঃ বস্তুর অন্তরসত্তা উপলব্ধি করবার এ-ই একমাত্র সহায়।'

বার্গ্‌সঁ বিচার ক'রে দেখলেন, স্বজ্ঞা জিনিষটি মানুষের 'মস্তিষ্কের' অন্তর্গত নয়। রাগ, ভয়, শোক, স্নেহও মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত নয়। মস্তিষ্কের অনুভূতি তার উদ্দীপনার মান বা

'ম্যাগনিট্যুড অফ ট্রিম্যুলি' অনুসারে ধার্য্য হয়। কিন্তু আমাদের অন্তরের কোনও আবেগকে কি 'এত ক্যালরি তাপ' এই হিসাব করা যায়'? রণক্ষেত্রে সেদিন স্বদেশের জন্যে যে লক্ষ লক্ষ যুবা প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, তাদের সে বীর্য্যের পরিমাণ কি তাদের মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ গুনে পাওয়া যাবে?—বস্তুতঃ তা সম্ভব নয়। আপনার মনুষ্যত্ব নিয়ে মানুষ যেখানে সমগ্র জীবজগতে অদ্বিতীয়, তার হিসাব তার মস্তিষ্কে পাওয়া যাবে না। ধরাছোঁয়া না গেলেও অনুভবে সে আছে আমাদের স্বজ্ঞাসম্পন্ন সত্তায় বা 'ইনট্যুইটিভ সেল্ফ'-এ। বার্গসঁ তারই নাম দিয়েছেন সৃজনী বুদ্ধি—'ক্রিয়েটিভ ইনটেলেক্ট্'। এরই সাহায্যে অমৃতের সন্তান, মানুষ আমরা উপলব্ধি করি আমাদের অস্তিত্ব এবং বুদ্ধি, অনুভব করি আত্মার অমরতা।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ বৈজ্ঞানিক বার্গসঁ দর্শনের অধ্যাপক হয়ে এলেন। দেশ-বিদেশে তখন তাঁর নবপ্রচারিত মতবাদ নিয়ে তুমুল আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে; এই বস্তুবাদের যুগে যিনি আত্মার অমরতার বাণী নিয়ে এলেন, সকলের দৃষ্টি পড়ল তাঁর ওপর। নিন্দা-প্রশংসার কোলাহল উঠল চারদিকে।

তাঁর বক্তৃতাগুলি খুবই জনপ্রিয় হতে লাগল। ধীরপদক্ষেপে এসে তিনি যখন মঞ্চে বসতেন, ঘরে নামত নিঃশব্দতা, শ্রোতৃমণ্ডলীর মুখে পড়ত নীরব প্রতীক্ষার ছায়া। ধীরে ধীরে তিনি ব'লে যেতেন—সংক্ষিপ্ত, মধুক্ষরা কথাগুলি সবার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করত। শ্রোতাদের তিনি অনুরোধ করতেন, যেন অন্ধের মত তাঁর মতবাদ অনুসরণ না ক'রে তাঁরা তাঁর চিন্তাগুলিকে পরীক্ষা ক'রে নিজেরাও ভেবে দেখেন।

জনসাধারণের কাছে দর্শন যতই দুর্বোধ্য হোক্, বক্তৃতা-সভায় বার্গসঁর সরল কথাগুলি কিন্তু সবাই বুঝত, তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তারা মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হ'ত। তাদেরই মত ক'রে সহজ সরল ভাষায় বলতে পারতেন তিনি।

বার্গসঁ ইহুদিবংশজাত। ১৯৪০-এ হিটলার ফরাসী দেশ অধিকার করেন। বিশুদ্ধ আর্য্যত্বাভিমানী তিনি, সেমিটিক ইহুদিদের প্রতি তাঁর সুতীব্র ঘৃণা। কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এর সমস্ত ইহুদি অধ্যাপক পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হ'ল, শুধু বার্গসঁকে এ নির্দেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি এ অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান ক'রে সহকর্মীদের ভাগ্যই বরণ ক'রে নিলেন। পর বৎসরেই অকস্মাৎ তাঁর জীবনান্ত হ'ল।

আজ দেশে দেশে মারণ-মন্ত্র উদ্ঘোষিত। এই মহামরণের মধ্যে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন বার্গসঁ—আলো-আঁধারের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে ক্ষয়হীন সেই মহাজীবন শুধুই এগিয়ে চলেছে কোন্ অজানা লক্ষ্যের দিকে। এ পথ জীবনের অগ্রগতির পথ, সেই জীবন-পথ-যাত্রীর এক মুহূর্ত্তও আর পিছনে ফিরে যাওয়ার, ফিরে চাওয়ার উপায় নেই।

আকিঞ্চন

শ্রীঅমলকুমার মাল

আজাদী এবং অন্ন এবং বস্ত্রের সংগ্রামে—
দেশের ভাগ্যে দশের ভাগ্যে কি যে সঁপিয়াছ প্রভু
তার মাহাত্ম্য আজিও বুঝিতে নারি!
আজিও বুঝিতে নারি—
মৃত্যুর সাথে যে-ই জীবনের শাশ্বত সংগ্রাম
যে জীবন অবিনাশী, সৃজনপিয়াসী, বিধাতার শুভাশীষ;
সেই জীবনের অজস্র অপচয়
লাঞ্ছনা আর নির্যাতনের নিত্য-নূতন রূপ।

দ্বিধাবিভক্ত মা ও মাটির
বুক চিরে জাগিয়াছে—
শ্বেত-হস্তের সর্ব্বশেষের দান!
হিন্দু এবং পাকিস্থানের বুকে,
ইস্‌লাম আর শাস্ত্র বেঁধেছে বাসা—
মানুষের ঠাঁই নাই।

মহিমা তোমার অপার, তোমার করুণা অসীম জানি—
তাই আকুল আবেগে করুণ-কণ্ঠে আকুতি জানাই,
প্রভু, রেখোনা প্রতীক্ষায়—
বজ্র-আঘাত হানো গো বিধাতা
বজ্র-আঘাত হানো,
মিলিত-মৃত্যু দাও
এক সাথে যেন সবাই মরিতে পারি।
তিলে তিলে ক্ষয়, সে তো অপচয়—মৃত্যুর লাঞ্ছনা,
শুধু হানাহানি আর অন্নহানিরও ক্ষুদ্র অস্ত্রে জানি—
ব্যাপক বিনাশ? সে নহে তো সম্ভব!

ওগো দয়াময়!
তোমার দয়ার আদি ও অন্ত নাই।
দয়া কর প্রভু—বজ্র আঘাত হানো,
মিলিত-মৃত্যু দাও—
এক সাথে যেন সবাই মরিতে পারি।

বাঙালী

শ্রীনির্ম্মাল্য দাশগুপ্ত

নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কোন কথা কেহ যদি বলিতে যায়, লোকে তাহাকে মনে করে সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক মনোভাবপূর্ণ। আমি বাঙালী হইয়া বাঙালীর কথা বলিতে বসিয়াছি, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা মনোভাবাপন্ন হইয়া বা প্রাদেশিকতার মনোভাব লইয়া নহে। আমি সাম্প্রদায়িক নই, তবে মানুষ মাত্রেরই নিজ গৃহ ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি টান সর্ব্বাগ্রে, তার পর সে ভাবে প্রতিবাসীর কথা। নিজের ঘরে আগুন লাগিলে, প্রতিবেশীর গৃহ নিরাপদ আছে—এই আশ্বাস তাহার মনে সান্ত্বনা আনে না। তাহার নিজের গৃহ তো পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল, সতর্ক না হইলে এই আগুন প্রতিবেশীর গৃহেও ছড়াইতে পারে। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ীই বাঙালীর বাংলার প্রতি আকর্ষণ সর্ব্বাগ্রে। তাহার জন্য তাহাকে প্রাদেশিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলা সঙ্গত নহে। বাঙালী জাতির আর যাই দোষ থাকুক সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা নাই। সাজাত্যাভিমান তাহার আছে বটে, কিন্তু সাজাত্যাভিমান ও প্রাদেশিকতা এক নয়।

বস্তুতঃ বাঙালী যতটা উদার মনোভাববিশিষ্ট এমন আর ভারতের কোন প্রদেশের অধিবাসীই নয়। বিদেশ ভারতবর্ষকে প্রথম জানিয়াছে বাঙালীর ভাবধারা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়াই। বাংলার রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ চন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বিদেশে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সমগ্র ভারতের জন্যই ভাবিয়াছেন, সমগ্র ভারতের কথাই বলিয়াছেন কেহই কখনও শুধু বাংলার কথা বলেন নাই। সাধারণ বাঙালীরও অন্য প্রদেশবাসীর প্রতি অসূয়া নাই। বাঙালীত্বের গর্ব্বে ভিন্ন প্রদেশবাসীর প্রতি কিছু অবজ্ঞা হয়তো আছে, কিন্তু যেখানে তাহাদের গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, বাঙালী সেখানে অবাঙালীত্বের জন্য তাহাকে গুণের মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত করে নাই ; বরং অগ্রসর হইয়া কণ্ঠে যশের মাল্য পরাইয়াছে। ভারতের বাহিরেও তাহার এই উদার দৃষ্টি প্রসারিত।

কিন্তু মানবপ্রীতি ও স্বাদেশিকতা সভ্য জগতের পক্ষে যতই উচ্চ আদর্শ হোক বাঙালীর এখন নিজের ঘর সামলাইবার সময় আসিয়াছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমেই পিছু হঠিতেছে। বাংলা আজ যাহা ভাবে, কাল সারা ভারত তাহাই া করে—গোখেলের এই প্রশংসাবাণী লইয়া আমরা বহুকাল গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি, কিন্তু এখন আর সে জের টানিয়া লাভ নাই। অতীতের ঐশ্বর্য্যের কথা বার বার টানিয়া আনিলেও বর্ত্তমানের দৈন্য ঢাকা পড়ে না।

একদা বাংলাদেশ সর্ব্বক্ষেত্রে ভারতের শীর্ষস্থানে ছিল। সে স্থান বাংলাদেশ ক্রমে হারাইতে বসিয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলা আজ অবজ্ঞাত। অথচ রাজনীতির চেতনা জাগে প্রথম এই বাংলা দেশেই। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন সর্ব্ব ভারতের নেতা ছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি বাঙালী উমেশচন্দ্র। ভারতের বিপ্লবাত্মক কার্য্য প্রসারলাভ বাংলাদেশে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহীদ বাঙালী ক্ষুদিরাম। কিন্তু বর্ত্তমান বাংলা অতীত বাংলার যোগ্য উত্তরাধিকারী হইতে পারে নাই। বাংলার যুবশক্তি আজ বিবদমান বিভিন্ন দলে বিভক্ত। বাংলাদেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া হৃতশক্তি। একযোগে গঠনমূলক কাজ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা আজ বাঙালীর নাই। দলাদলি ও ভাঙ্গাচোরাতেই তাহার রাজনীতি পর্য্যবসিত। এক দিন বাংলার যে প্রাণশক্তি একযোগে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাহা পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী এখন ভাঙার কাজেই মন দিয়াছে, গড়িতে যেন ভুলিয়া গিয়াছে। বিদেশী শাসন যেদিন দেশে ছিল, সে দিন বাঙালীর এই ভাঙার মন্ত্র কাজে লাগিয়াছিল। আজ দেশ স্বাধীনতার সোপানে উঠিয়াছে—এখন দরকার ভাঙা নয়, গড়া। বাঙালী এখনও এই নূতন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছে না।

বাঙালীর সব চেয়ে গর্ব্ব তাহার সংস্কৃতি লইয়া। বাংলার বহু পুণ্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথের মত অসাধারণ মানুষেরা এদেশে জন্মিয়াছেন। বাংলার কৃষ্টি-জগৎ তাঁহাদের দানে গৌরবোজ্জ্বল হইয়া আছে। ইঁহাদেরই প্রভাবে বাঙালী অন্যান্য প্রদেশ হইতে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। সংস্কৃতি লইয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার বাঙালীর এখনও আছে, তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা দিয়াছিল, আধুনিক বাংলায় সেইরূপ দেখা যায় নাই।

চিত্রশিল্পে আমরা পাইয়াছি শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদিগকে। ইঁহাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা আমরা দিতে পারি নাই। আমাদের চিত্ত কি চিত্রশিল্পের রস গ্রহণে উন্মুখ হইয়াছে? চলচ্চিত্রের তারকাদের নাম-ধাম ও বিভিন্ন অভিনয়-ভূমিকা আমাদের কণ্ঠস্থ, কিন্তু চিত্র-শিল্পে কাহার কি অবদান তাহা কি আমরা ভাল করিয়া জানি?

সাহিত্য লইয়া বাঙালীর এখনও গৌরব করিবার

অধিকার আছে। সাহিত্য-সৃষ্টিতে বাঙালী অন্যান্য প্রদেশের বহু উর্দ্ধে। বর্ত্তমান কালেও বাঙালীর যদি কিছু গর্ব্ব করিবার থাকে তবে সে তাহার সাহিত্য। অনন্যসাধারণ প্রতিভা না থাকুক, বাংলাদেশে এখনও প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন লেখক আছেন যাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন।

কিন্তু শুধু ভাববিলাস লইয়া এবং সাহিত্য বা শিল্পকলার-চর্চ্চা করিয়া কোনো জাতি দাঁড়াইতে পারে না। তাহার মধ্যে বলিষ্ঠতা থাকা চাই। আরও চাই পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা এবং একত্রে কাজ করিবার আগ্রহ। সর্ব্বোপরি চাই একাগ্রতা ও নিষ্ঠা। বাঙালী-চরিত্রে এ সমস্ত সদ্‌গুণের অভাব ঘটিয়াছে। কেন আজ বাঙালী তাহার পুরাতন গৌরবময় আসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। একদা বাঙালী বিপ্লবনীতিকে কাজে লাগাইয়া বিদেশী শাসনকে বানচাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এখনো সেই সংগ্রামের উন্মাদনা তাহার অস্থিমজ্জায় ও প্রতি শোণিত-বিন্দুতে মিশিয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই বোধ হয় বাঙালী এখনও স্থির হইয়া কাজ করিতে শিখিল না। মতের অমিল সে সহ্য করিতে পারে না; ফলে পরিণামে কাজে বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

বাঙালীর অবনতির আর একটি কারণ তাহার অহমিকা। একদা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে ভারতে সে অগ্রণী ছিল। সেই গর্ব্বে আজিকার বাঙালী কিছু না করিয়া এবং কিছু না হইয়াও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে শিখিল। সে যে পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। অতীতের সেই গৌরব বাঙালী এখনও মূলধন করিয়া রাখিতে চায়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে অন্যান্য প্রদেশ যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই। সর্ব্বত্রই সে ফাঁকি দিয়া জয়ী হইতে চায়। সে দলাদলি করিতে ভালবাসে। কাজ কেমন হইল, সে বিচার সে করে না। কে নেতৃত্ব করিবে তাহাই তাহার লক্ষ্য। সকলেই বড় হইতে চায়। দলাদলি বাঙালী-চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক। তদুপরি বাঙালী হুজুগপ্রিয়।

প্রবাসী বাঙালী আমরা, এই অবাঙালীর প্রদেশে চারিদিকে দেখি বাঙালীর পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি। স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বাঙালী কর্ত্তৃক স্থাপিত। বহু বাঙালী অতীত কালে এই প্রদেশে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আজিও স্মরণীয় হইয়া আছেন। শুধু এই একটি প্রদেশেই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই এইরূপ। বাঙালী সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যেখানে গিয়াছে সেখানেই সে জ্ঞান, চরিত্র ও কর্ম্মে সেখানকার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। বাংলা আজ সে মর্য্যাদা হারাইয়াছে। এই অবস্থা অত্যন্ত বেদনা-দায়ক। রাজনীতিতে বাংলাকে পুরোভাগে লইয়া যাইতে পারেন এমন লোক বর্ত্তমানে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও জনসেবা, একনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সহৃদয়তার দ্বারা বাঙালী এখনও পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে।

বাঙালী আগে চলুক, অন্য সমস্ত প্রদেশ পিছনে পড়িয়া থাকুক—এমন কথা বলার অর্থ সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা। এমন কথা বলি না। নিজের প্রদেশের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশে তাহার গৌরবে গৌরবান্বিত, অপমানে ক্ষুব্ধ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এ কথা যেন বিনা দ্বিধায় আমরা বলিতে পারি যে অখণ্ড ভারত গঠনে বাংলার দান যেন কম না হয়। রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় বলিতে গেলে, "এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফল-প্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে তারই জন্যে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলন-যজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। বাংলা দেশের সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপ-চারে সত্য হউক, ওজস্বী হউক, তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।"

ধ্বনিতত্ত্বের নূতন নিয়ম

শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী

ধ্বনিতত্ত্বের কতকগুলি নূতন নিয়ম দৃষ্টান্তসমেত এখানে দেখাব। এই ধ্বনির বিকৃতিগুলি বহুকাল থেকেই ঘটে আসছে, সুতরাং অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের কাছে এগুলি পরিচিত বলেই বোধ হবে। তবু এই বিকৃতিগুলি এখানে তুলে দেখানর সার্থকতা হচ্ছে এই যে এ পর্য্যন্ত এগুলো কোন নিয়মের অধীন বলে ব্যাখ্যাত হয় নি।

(১) শক্র-হেটেরো রীতি—অনেকটা "সতেম-কেন্তম রীতি"র মতন, তাই সংস্কৃত "শক্র" শব্দ আর গ্রীক "হেটেরো" শব্দ দিয়ে এই বিশেষ রীতির নামকরণ হ'ল। গ্রীক ও ইরাণীয় উপভাষা-বিশেষে ইন্দো-ইউরোপীয় "স"ধ্বনি "হ"-ধ্বনিতে পরিবর্ত্তিত হ'ত। ফলে ঐ গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষার সঙ্গে উপরোক্ত শাখা দুটির উপভাষার "স-হ" পার্থক্য হ'ত। যেমন, সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার "শক্র"= ইরাণীয়—"হাথর"=গ্রীক-"হে-টে-রো"; সংস্কৃত—"সিন্ধু"=

ইরাণীয়-"হিন্দু"=গ্রীক "ইন্ ডুস্" ; সংস্কৃত-"সম"=ইরাণীয় "হম"=গ্রীক—"হো মো" ; সংস্কৃত—"সূর্য্য"=গ্রীক—"হে লি ও" ; সংস্কৃত—"সোম"=ইরাণীয় "হওম" ; সংস্কৃত "সরমা"= গ্রীক—"হে র্মে স্" ইত্যাদি।

(২) ধ্বনি সম্প্রসারণ ও ধ্বনি-দৃঢ়ীভবন (Phonetic elongation and phonetic elaboration—একটি শব্দ তার আয়ুষ্কালের মধ্যে কোন সময়ে দৃঢ়ীভূত বা সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। সব ভাষাতেই এই লক্ষণটি দেখা যায়। যেমন, ইংরজী Message + er = Messenger ; Passage + er = Passenger। আবার ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলিতে— সু + নর = সুন্দর ; বানর<বান্দর<বাঁদর ; "মক্ষি" স্থলে "মক্ষিকা" ; "স্ত্রী" স্থলে "স্ত্রিয়ক" ; "ময়ূর" স্থলে "মজুর" ও "মজুল","পারিজাত" স্থলে "পারিয়াত্র" ; "বঙ্গ" স্থলে "বাঙ্গালা" *"ক-লি" স্থলে "কদলী, কন্দলী" ; *"বাঁ, বাং" হইতে "বংশ, বেতস, বেত্র" ; "লঙ" হইতে "লিঙ্গ", "উলঙ্গ," ইত্যাদি।

(৩) ধ্বনি-ব্যত্যয় (Reduction)—অনেক সময়, প্রায় সব ভাষাতেই দেখা যায় যে, শব্দবিশেষের কোন অংশ খসে পড়েছে। এমন কি, তার যথাযোগ্য কারণও নির্দ্দেশিত হয় না। যেমন—ইংরেজীতে university থেকে varsity, কি, Cabriolet থেকে Cab। আমাদের ভারতীয় আর্য্যভাষা-গুলিতে—"হ্রদ" থেকে "হদ"; কি "দহ"; "জ্ঞাতৃক পুত্র" থেকে" জ্ঞাত-পুত্ত", আবার তা থেকে "ঞাত পুত্ত", আবার তা থেকে "নাথ পুত্ত" এবং তার পরিণতি (উপাধিবাচক) "নাথ-"এ। *"আবুবকর্-গঞ্জ" থেকে "বকর-গঞ্জ" এবং তার পরিণতি "বাখরগঞ্জ-"এ ; "মোমিনশাহী" থেকে "মৈমনসিং" "পগার" থেকে "গড়", ইত্যাদি।

(৪) ধ্বনি-দ্বিত্ব (Doubling)—অনেক সময় ভাষা-বিশেষের মধ্যে দেখা যায় যে, কোন দ্রব্য, গুণ বা অবস্থাকে বুঝাবার জন্ম এক সঙ্গে দুইটি একার্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন ইংরেজীতে—Cruc + hill = Cruc hill<Churchill (দুইটিই পাহাড়বাচক শব্দ)। ভারতীয় আর্য্যভাষাতে পাই— "আগাগোড়া, বেটাছেলে, জুমচাষ, কলিকাতা" ইত্যাদি। "আগা" সংস্কৃত "অগ্র" থেকে উদ্ভূত ; তার সঙ্গে মিলেছে অষ্ট্রিক "গুল্" বা "গুরহ" থেকে উৎপন্ন "গোড়া" শব্দ। দুটো শব্দই আদিবাচক শব্দ, কিন্তু একত্র হ'লে অর্থ হয়—আদ্যোপান্ত। সংস্কৃত "পুত্র" শব্দ থেকে উৎপন্ন ("পুট<বুট<") "ব্যাটা" আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাব + আল + ইআ = শাওয়ালিআ =ছাওয়ালিআ<ছেলিআ<"ছেলে।" দুটিই সন্তানবোধক শব্দ, কিন্তু একত্রিত হয়ে অর্থ করে পুরুষ। "জুম্"—অষ্ট্রিক কৃষিবোধক শব্দ আর সংস্কৃত "কৃষি" শব্দ থেকে উৎপন্ন "চাষ" একত্রিত হ'লে বিশেষ এক রকম কিনা, পাহাড়ে-জমিতে শস্যোৎপাদন বোঝায়। "কলি" অর্থে শামুক পোড়ান চুণ বোঝায়, তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল সংস্কৃত "কাথ্" থেকে উৎপন্ন "কাতা"-কিনা জলে গোলা চুন ; এই দুইয়ে মিলে স্থানবিশেষ বোঝায়।১

(৫) ভ্রান্তশ্রুতি (mis-audition)—"তিলকে তাল করা" আর "ধান শুনতে কান শোনা"র ব্যাপার প্রায় সব ভাষাতেই আছে। এ রকম দুর্ঘটনাকে শ্রুতিভ্রম কি, ভ্রান্তশ্রুতি বলে। "অজাত শ্মশ্রু বালক"-এর বদলে অনেকেই-"অজাতশত্রু বালক" বলে থাকেন ; "সবার উপরে মনুষ্যত্ব" কি না, "ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"—"সবার উপরে মানুষ সত্য" বলে বহুকাল চলে আসছে। লোকে একবারও ভেবে দেখে না যে মানুষের চেয়ে সত্য, মানুষের ওপরে সত্য আরও কত রয়েছে, সুতরাং কি ক'রে এমন কথা আমরা বলে থাকি। রীতিমত নামকরা লেখকও—"উদ্দেশের" জায়গায় "উদ্দেশ্যে", "মুদিত"র জায়গায় "মুদ্রিত", "আব্রহ্মস্তম্ব"-র জায়গায় "আব্রহ্মস্তম্ভ", "লক্ষ্য"র বদলে "লক্ষ" লিখে থাকেন।

(৬) ধ্বনি-বৈপরীত্য (Spoonerism)—অনেক ভাষা-তাত্ত্বিক মনে করেন যে, কোন শব্দ বা কোন ধ্বনি একেবারে উল্টে যেতে পারে না। ভারতীয় আর্য্য ভাষাতে অন্ততঃ, এই রকম উল্টে যাওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, "হ্রদ<রহদ<হদ<দহ ; সবুর<সউর<সোর<রোস ; দেখ<দেহ<দেহো, দেহে<হেদে (= "হ্যাদে", ইত্যাদি।

(৭) অনুনাসিকতা (Nasalization)—আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলিতে নাসিক্যপ্রবণতা কিছু দেখা যায়। যে সব শব্দ মূলতঃ নাস্ত, কি মাস্ত নয়, এমন কি যাঁর মধ্যে কোন অনুনাসিক ধ্বনির আভাসমাত্র নাই, এমন শব্দও সময় সময় দেখা যায় চন্দ্রবিন্দুযুক্ত হইয়াই উচ্চারিত হইতেছে। যেমন অক্ষি<আঁখি ; বক্র<বাঁকা ; কুজ<কুঁজা ; ওষ্ঠ<ঠোঁট ; চীং (কার)<চেঁচান, ইত্যাদি।

(৮) সংস্কৃত-করণ (Sanskritization)—আর্য্যী-করণের অনুরূপ ব্যাপার এই সংস্কৃত-করণ। আনার্য্যিক—হয় অষ্ট্রিক, নয় দ্রাবিড় শব্দগুলিকে, অনেক সময় দেখা যায় যে, সংস্কৃত তার নিজের রঙে রসে সবুজ ক'রে সভ্য ক'রে তুলেছে, যেমন—*"দিস্তাং" বা "তিস্তা"কে "ত্রিস্রোতা" করা; "তমলুক", কি, "তম্-লক্"কে "তাম্রলিপ্তি" করা ; *"ত্রক" *"ত্রক" থেকে "ময়ূর" কি "বহ্র" ইত্যাদি।

এ ছাড়া, কোন কোন বিদেশী শব্দও সংস্কৃতান্বিত হয়েছে বলে দেখা যায়, যেমন—Shakespeare হয়েছে "সেক্ষপীয়র" বা, "সেক্ষপীর" ; Max-muller হয়েছে—"মোক্ষমূলর", Anderson হয় "ইন্দ্রসেন" ; Sun yat-sen হয় "সনৎ সেন" ইত্যাদি।

---

১ অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণার ফল। তিনি আরও এই রকম যুক্তশব্দের উল্লেখ করেছেন তাঁর ইউরোপ-ভ্রমণ সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকে।

শিল্পী প্রণবনাথ ঠাকুর

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

ছবি এঁকে ও খেলনা বানিয়ে সময় কাটানো যে কত আনন্দদায়ক হতে পারে, সে বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান লেখকের আছে। সেইজন্যে যখন শ্রীপ্রণবনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হ'ল, আর তাঁর খেলনার কারখানা ও তাঁর আঁকা ছবি দেখলাম—খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম।

খেলনার কারখানায় প্রণবনাথ ঠাকুর (বাঁদিকে)

নিজের খেয়ালমত ছবি এঁকে ও কাঠের খেলনা বানিয়ে জীবিকা অর্জ্জন করা আমাদের দেশে খুবই কঠিন। এতে ব্যবসায়-বুদ্ধির দরকার—যাঁরা ছবি আঁকেন সাধারণতঃ তাঁদের সেটার বড়ই অভাব। আবার ব্যবসায়-বুদ্ধি অত্যুগ্র হয়ে উঠলে সার্থক শিল্পসৃষ্টিও যে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই। শিল্প-প্রতিভার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবসায়-বুদ্ধির সংমিশ্রণ আমাদের দেশে দুর্ল্লভ বললেই চলে।

বাংলাদেশের বাইরে আমার বহুকাল কাটল। হিমালয়ের পাদদেশে দেরাদুনে নিজের কাজ নিয়ে আমার দিন কাটে। এখানে যে আর কেউ নিজের খেয়ালে ছবি এঁকে ও খেলনা বানিয়ে সময় কাটাচ্ছেন, যখন প্রথম তা জানতে পারি তখন যেন কোন নূতন জিনিষ আবিষ্কারের আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম। আমার আস্তানা থেকে শহরে যাবার পথে একটি প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী দেখতাম—বাড়ীটির নাম "টেগোর ভিলা"। শুনেছিলাম এটা হচ্ছে কলকাতার রাজা পি. এন. ঠাকুরের বাসভবন। মাঝে মাঝে সে বাড়ী লোকজনে আগমনে সরগরম হয়ে উঠত—কিছুকাল পরেই বাড়ীটি হ'ত জনশূন্য, সদরে পড়ত তালা—বিরাট ভবনটি যেন চলে-যাওয়া অতিথিদের স্মৃতি নিয়ে ঝিমাত।

কয়েক বছর আগেকার কথা—একদিন খবর পেলাম শিল্পী শ্রীপ্রণবনাথ ঠাকুর সপরিবারে ঐ বাড়ীতে এসে উঠেছেন এবং একটি কাঠের খেলনার কারখানা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমরা দু'জনেই শিল্পতীর্থের যাত্রী, সুতরাং সমধর্ম্মী—কাজেই আমাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হওয়ার পথ খুবই সুগম। এগিয়ে গিয়ে অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে নিলেই হ'ল। এক

প্রত্যাখ্যাতা

দিন ঢুকে পড়লাম বাড়ীর ভেতর। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। প্রণবনাথের আঁকা ছবি দেখলাম, তারপর তিনি আমাকে তাঁর কারখানায় নিয়ে গেলেন।

কাঠের পুতুল থেকে আরম্ভ করে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী নানান রকম জন্তু জানোয়ার—সবই শিল্পী তৈরি করছেন। বাজারে কিছু কিছু বিক্রীও হচ্ছে। নানান রকমের যন্ত্রপাতিও বসিয়েছেন। কথাবার্ত্তায় বুঝলাম—নেহাৎ আনন্দের প্রেরণায়ই তিনি এসব নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। নূতন কিছু খেলনা বানাতে পারলেই তাঁর মন খুশীতে ভরে ওঠে। সে-গুলো বাজারে বিক্রী করার তেমন উৎসাহ তাঁর নেই।

কালো মেয়ে

ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁর তেমন প্রখর নয়, সেইজন্যেই বাজারের চাহিদামত গতানুগতিক খেলনা তৈরির পক্ষপাতী তিনি নন।

এক দিন দিবাভাগে তাঁর কারখানায় গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম রং দেবার যন্ত্র হাতে তিনি কাজে ব্যস্ত। তাঁর ছোট মেয়ে দুটিও হাতে পায়ে রং মেখে তাঁর কাজের সাহায্য করছে, কি ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে—ঠিক বোঝা গেল না। যাই হোক, মনে হ'ল খেয়ালী শিল্পীর সময়টা কাটছে বেশ।

নূতন ছবি কিছু আঁকছেন কি না জিজ্ঞেস করলাম। একটি ছবি দেখালেন। তখনও শেষ হয় নি। বললেন, ছবি আঁকতে আমার বড় দেরি হয়।

বললাম—হোক না দেরি ক্ষতি কি? আপনাকে ত ছবি এঁকে জীবিকা অর্জ্জন করতে হবে না।

তিনি উত্তর দিলেন, কথাটা সত্য কিন্তু কাঠের খেলনা বানিয়ে খরচটা অন্ততঃ উঠিয়ে নিতে পারলে ত মনটা খুশী থাকে।

ছবি আঁকা তিনি শিখেছিলেন কলকাতায় শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। পরে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট'-এ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে শিখতেন। একখানা ছবি দেখিয়ে বললেন, "এতে অবনবাবুর হাতের 'টাচ' আছে"—দেখলাম সেই আগেকার 'ওয়াশ' পেণ্টিং গোছের। খুব ভাল 'ফিনিশ'।

তাঁর আঁকা ছবির আলোকচিত্র কয়টি থেকে বুঝতে পারা যাবে যে কাজ তিনি বেশ ভাল ভাবেই শিখেছিলেন। যদি আরো কিছু সময় তিনি ছবি আঁকার সাধনায় রত থাকেন তবে তাঁর হাত দিয়ে যে নূতন ধরণের শিল্পসৃষ্টি বেরিয়ে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

রবিস্মৃতি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাহিরে মলিন ধূমল আকাশ, ভিতরে আঁধার ঘর,
নবজীবনের স্বপ্ন দেখালে তুমি।
নব অরুণের উদয়রশ্মি লাগিল ললাট 'পর,
জাগে ধরিত্রীভূমি।

ভেঙে গেল ঘুম, প্রাণ-নির্ঝর বহিল কলোচ্ছ্বাসে,
দূরে সরে গেল মরণের কালো ছায়া,
অজানা রূপের অপরূপ আভা আকাশে বাতাসে ভাসে,
এ কোন্ মন্ত্রমায়া।

শিশু-মনে দিলে লীলা-হিল্লোল কল্পনা-মধুধারা,
যৌবনশিখা জ্বালালে তরুণ প্রাণে,
ছন্দে বহিল স্বর্গ-মর্ত্ত্য রবি শশী গ্রহতারা—
নিখিল ভরিল গানে।

মালয় উপদ্বীপের পুরাবৃত্ত

শ্রীনিরুপমা দত্ত

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় যতগুলি খণ্ড রাজ্য আছে তন্মধ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে মালয় আজও যে সর্ব্বনিম্নস্থানীয় এ কথা অস্বীকার করিবার জো নেই। কিন্তু ইহার বর্ত্তমান পরিস্থিতি যাহাই হোক না কেন, প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার গৌরবোজ্জ্বল অতীত হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। মালয় উপদ্বীপের অধিবাসীরা প্রধানতঃ মোঙ্গোলীয় মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত এই যে, ইহাদের দেহে আর্য্যরক্তের কিঞ্চিৎ ছিটেফোঁটা আছে। স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কত বিভিন্ন জাতি আসিয়া এই সুজলা সুফলা ভুখণ্ডে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। তাহাদের পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী পরম চিত্তাকর্ষক।

মালয়ের ইতিবৃত্ত কবে প্রথম লিপিবদ্ধ করা আরম্ভ হয় সে বিষয়ে এখন আলোচনা করা যাইতেছে। গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে এই দেশের ইতিকথা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অলিখিত ছিল, এবং ইহার ইতিহাসের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাঁচিয়া রহিয়াছিল শুধু মালয় জাতির উপকথা ও কিংবদন্তীর ভিতর দিয়া। মালয় যে অতি প্রাচীন দেশ তা সেখানকার ভূগর্ভ খনন করিয়া যে সমস্ত নিদর্শন-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীত হয়। সেই আদিম যুগ হইতে ইসলাম অভিযানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার বুকে যে কত বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতন হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও পাওয়া যায় নাই।

গত চতুর্বিংশ বৎসর ধরিয়া পুরাতত্ত্ববিদদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিস্মৃত অতীতের যে সমস্ত প্রত্নসম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি সম্বন্ধে আমরা এবার আলোচনা করিব।

উত্তর-মালয়ের ওয়েলস্‌লি জেলায় ধান্যক্ষেত্র মধ্যে অনেকগুলি সুউচ্চ ঝিনুক-স্তূপ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের কোনটিরই উচ্চতা কুড়ি ফুটের কম নয়। এগুলির গড়ন ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উক্ত স্থানটি সমুদ্রোপ-উপকূলবর্ত্তী ছিল। সাগরের এই তীরভূমিতে বাস করিত নাম-গোত্র না-জানা এক দল মানুষ, যাহারা কৃষিকার্য্য এবং শিকার করিতেও জানিত না। ঝিনুক, গুগলি, কাঁকড়া ইত্যাদি সমুদ্রতীরে অনায়াসলব্ধ খাদ্য আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করিত। তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট ঝিনুকের খোলাগুলি ক্রমে ঐ সকল স্তূপে পরিণত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, সুদূর অষ্ট্রেলিয়ার হাক্সবেরি নদের উপকূলেও অনুরূপ স্তূপাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক জার্ম্মান নৃতত্ত্ববিদ্ বলেন, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের দৈহিক গঠন হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আসিয়াছিল বৃহত্তর ভারত ও ইন্দোনেশিয়া হইতে। তাহাদের নির্ম্মিত পাত্রাদি এবং প্রস্তর-যন্ত্রসমূহের আশ্চর্য্য সাদৃশ্যের জন্য এই ধারণাটি দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে।

প্রস্তর-যুগের অসংখ্য যন্ত্রপাতি মালয়ের বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বেশ সুদৃশ্য এবং কারুকার্য্যখচিত। মধ্য-মালয়ের পাহাঙ জেলায় তেমব্লিং নদীর তীরেও সম্প্রতি প্রস্তরোত্তর যুগ ও লৌহ-যুগের কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করা হইয়াছে। প্রাগ্‌যুদ্ধকালে এই নদীটির উপকূলস্থ নিবিড় অরণ্য-মধ্যে আবিষ্কৃত অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ লোকেদের মনে অভিনব কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। এখানে উদ্ধৃত বিভিন্ন বস্তু হইতে ইহা নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া মনে হয় যে একদা ঐ স্থানে একটি বিরাট নগরী বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশের সরস্বতী নদীতীরস্থ সপ্তগ্রামের ন্যায় তেমব্লিং নদীতীরস্থ উক্ত বিস্মৃতনামা নগরীটিও বহির্বাণিজ্যের দৌলতে একটি মহাসমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই নগরীটি আন্নোন রূপকথায় বর্ণিত "দ্বারাওয়াংশা" রাজ্যের প্রধান বন্দর "আমারোয়াতী" (অমরাবতী ?)। কিন্তু আসলে ইহা অনুমান ছাড়া কিছুই নহে। কারণ রূপকথায় উল্লিখিত 'আমারোয়াতী' চীনসমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল— তেমব্লিং নদীর সহিত ইহার কোনই সংস্রব ছিল না।

আদিম যুগের তথাকথিত অসভ্য মানুষ কি ভাবে গিরিগহ্বরে বাস করিত তাহার নিদর্শনও মালয়ে মিলিয়াছে। উত্তর-মালয়ে কেডা ও পেরাক জেলায় অবস্থিত চুন পর্ব্বত-গুহায় (Lime Stone Hills) তাহাদের ব্যবহৃত অস্থি ও প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র এবং মৃৎপাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি এখন স্থানীয় যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত।

উক্ত অঞ্চলে এক প্রকার পাতলা শিলাখণ্ডে নির্ম্মিত কতকগুলি আশ্চর্য্যজনক মৃতের সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বাঙ্কা, বিলিটন ও বিহাউ দ্বীপে অনুরূপ সমাধি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির মধ্যে মৃৎপাত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং কাঁচের ও পুঁতির অলঙ্কার ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কঙ্কাল বা এক খণ্ড অস্থিরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ কঙ্কালগুলি শত শত বৎসর ভূগর্ভে পড়িয়া থাকার দরুন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কাহারা এই সমস্ত সমাধি তৈয়ার করিয়াছিল এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দিতে পারেন নাই।* তবে সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাটো ব্র্যাডেল বলেন, অতি প্রাচীনকালে ভারত হইতে যেসব ব্যবসায়ী টিনের সন্ধানে মালয়ে আসিয়া পেরাক অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এগুলি তাহাদেরই সমাধি···।

কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ মালয়ে জোহর নদীতীরে অবস্থিত একটি অখ্যাত শহরের উপকণ্ঠে প্রাপ্ত কতকগুলি দুর্লভ হিটাইট† পুঁতির সাহায্যে এই দেশের অতীত কালের অনেক অজানা তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। উক্ত পুঁতিগুলি বিবিধ বর্ণের কাঁচে নির্ম্মিত। খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হিটাইট রাজ্যের মেয়েরা অনুরূপ পুঁতির অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা প্রমাণিত করিয়াছেন। এখানে এই প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সেই বিস্মৃতপ্রায় মান্ধাতার আমলে সুদূর হিটাইট হইতে উক্ত বস্তু কি করিয়া এই ভূখণ্ডে আসিল? ইহার সঠিক উত্তর ইতিহাস আজও দিতে পারে নাই। তবে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে মিশরীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ টলেমির অঙ্কিত একখানি মানচিত্র হইতে উক্ত প্রশ্নের উত্তর কতকটা মিলিতে পারে বলিয়া মনে হয়। উক্ত মানচিত্রটি হইতে জানা যায় যে, প্রাচ্যে আসিবার জলপথ টলেমির সমসাময়িক আলেকজান্দ্রিয়ার নাবিকদের অজানা ছিল না। ইহাতে মালয় উপদ্বীপের চিত্রটি এমন নিখুঁত ভাবে খুঁটিনাটিসহ অঙ্কিত যে তাহা আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। উত্তর মালয়ের "ক্রা" যোজকটিও ইহাতে অঙ্কিত আছে।

টলেমি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন—স্বর্ণভূমির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত "পালাণ্ডাস" নামক নদীতীরে অবস্থিত পালাণ্ডা নগরী ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়া বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। প্রাচ্য-ভাষাতত্ত্ববিদ্ ফরাসী পণ্ডিত বার্থিলট দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন টলেমির উল্লিখিত "পালাণ্ডাস" নদীই বর্ত্তমানে জোহর নদী নামে পরিচিত। কিন্তু জোহর নদীতীরে অবস্থিত বর্ত্তমানে "কোটাতিঙ্গী" শহরটি টলেমি-বর্ণিত সেই পালাণ্ডা নগরী কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে "কোটাতিঙ্গী" শহরটি যে অতি প্রাচীন এবং ইসলাম অভিযানের বহু পূর্ব্ব থেকেই যে বিদ্যমান ছিল তাহা ইহার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার ভূগর্ভ হইতে হিটাইট পুঁতি ছাড়া আরও এমন সব দুষ্প্রাপ্য বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা দুই সহস্র বৎসর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত মালয়ের ব্যবসায়গত এবং অন্যবিধ কিরূপ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার নীরব অথচ অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উদ্ধৃত বস্তুগুলি

মালয় উপদ্বীপ — টলেমির স্বর্ণভূমি

* *Notes on Ancient Times in Malay*—R. Braddell.

† ভূমধ্যসাগর তীরস্থ সিরীয়া রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন দেশ।

পরীক্ষা করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া জানা গিয়াছে যে একদা সেগুলি এদেশে আসিয়াছিল হিটাইট, ফিনিসিয়া, মিশর, ইটালী, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোজ, চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি অধুনাবিলুপ্ত রাজ্য হইতে। এই সমস্ত নিদর্শন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান সুবিখ্যাত নগরী "পালাণ্ডা" বোধ হয়, কালক্রমে আজিকার অখ্যাত শহর কোটাতিংগীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।*

সুপ্রাচীন কালে ভারতবর্ষের সহিত তৎকালীন "স্বর্ণভূমির" (মালয়ের প্রাচীন নাম) যে কি সুদৃঢ় যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল তাহা যে শুধু ভূগর্ভে নিহিত বিবিধ দ্রব্যনিচয় হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে তাহা নহে; এই উপদ্বীপের নগর পল্লী পর্ব্বত নদী ইত্যাদির সংস্কৃত নাম এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা সংস্কৃতি আচার-ব্যবহারাদিতেও তাহা সুপরিস্ফুট। শিক্ষিত মালাইরা আজও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন একথা বলিতে গৌরববোধ করেন।

জাপানী যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে ক্লান্তান ও ত্রাংগানু জেলার সীমান্তে "চিন্তাশা" পর্ব্বতের উপত্যকায় একটি প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন মালয়ে ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি যে কি বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন এই নাম-না-জানা শহরটির প্রতি ইষ্টকখণ্ডে বিদ্যমান। শহরটির চারিদিকে ছিল প্রশস্ত রাজপথ; পথিকদের নিমিত্ত পথিপার্শ্বে কয়েক ফারলং অন্তর অন্তর কূপ এবং সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল। দক্ষিণ-ভারতের শৈব-মন্দিরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কয়েকটি ভগ্ন জীর্ণ মন্দির এখানে বিদ্যমান। তন্মধ্যে একটি মন্দিরে প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গের অর্দ্ধাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেকগুলি মৃৎপাত্র, দু'খানি তাম্রথালা এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের কয়েকটি মুদ্রা ও পদক এ স্থানের ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত মূল্যবান বস্তু সিঙ্গাপুরে আনিয়া যাদুঘরে রাখা হইয়াছিল। এমনি ভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্য বেশ চলিয়াছিল। কিন্তু মালয়ে অকস্মাৎ জাপানীদের আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু হওয়ায় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কাজকর্ম্ম একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

তখন এদেশীয় জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদ জাপানী সরকারকে অনুরোধ করেন যে যাদুঘরে রক্ষিত মালয়ের অতীত সম্পদগুলি কোন নিরাপদ স্থানে সরাইতে পারিলে ব্রিটিশ বিমানবহরের ব্যাপক আক্রমণ হইতে এগুলিকে রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে।

প্রথমে এই আবেদনটি অগ্রাহ্য করা হয়। আত্মসমর্পণের কিছুদিন পূর্ব্বে, যখন সিঙ্গাপুরের উপর রোজ তিন-চার বার করিয়া বিমানহানা চলিতেছিল তখন যাদুঘর হইতে মালয়ের বহু অমূল্য প্রত্নসম্পদ বিমানযোগে জাপানে প্রেরিত হয়। কিন্তু শত্রুর ঘাঁটি অতিক্রম করিয়া সেগুলি যথাস্থানে ঠিকমত পৌঁছিয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই।

উত্তর মালয়ে কেডা জেলায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি

মালয় ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগটিও পুনরায় খোলা হয়।

দুই বৎসর পূর্ব্বে কেডা অঞ্চলে আর একটি চমকপ্রদ বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা শাক্যমুনির একটি ব্রোঞ্জনির্ম্মিত মূর্ত্তি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ওয়েলস্ বলেন, ইহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গুপ্তযুগে নির্ম্মিত মূর্ত্তি। কেডা অঞ্চলে অদ্যাবধি যতগুলি হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর বিগ্রহ উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে শুধু এই মূর্ত্তিটিকেই অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটির গঠনপ্রণালী হইতে ইহাও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কেডার হিন্দু ঔপনিবেশিকরা আসিয়াছিলেন কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চল হইতে। উক্ত মূর্ত্তিটি বর্ত্তমানে স্থানীয় যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

* *Road to Angkor.*—By Dr. Q. Wales.

শিশুশিক্ষার গোড়ার কথা

শ্রীনীলরতন দাশ

অতীতের বহু স্মৃতি-বিজড়িত ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ইটন স্কুলের নাম অনেকেই জানেন। বস্তুতঃ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদীক্ষার গুণে বহু ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া পরবর্ত্তী জীবনে প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছেন। এই ইটন স্কুলের জনৈক প্রধান শিক্ষক রোজই ক্লাসে প্রবেশ করিয়া প্রথমে নিজেই ছেলেদিগকে অভিবাদন করিতেন। ফলে ছেলেরা আগে তাঁহাকে অভিবাদন করিবার সুযোগ পাইত না। একবার ছেলেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি আগেই কেন তাহাদিগকে অভিবাদন করেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "কে বলতে পারে, তোমাদের মধ্যে একজন ভাবী সেক্স-পিয়ার নেই? কে জানে তোমাদের ভেতরে কোনও নূতন নিউটন বালকরূপে রয়েছে কিনা? কে বলতে পারে, তোমাদের মধ্যে আর একজন ক্রম্‌ওয়েল আসেন নি? তোমাদের রয়েছে সেই অজানা মহা সম্ভাবনা। তাই আমি ক্লাসে প্রবেশ করেই তোমাদের সেই অজানা মহা সম্ভাবনাকে জানাই আমার অন্তরের অভিবাদন।"

বাস্তবিক, ভগবানের কি অদ্ভুত সৃষ্টি মানবশিশু। দেহে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এক বিরাট্ সম্ভাবনা। তাই ইংরেজ কবি বলিয়াছেন—"The child is father of the man." "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুরই অন্তরে।" অনাগত ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী এই মানবশিশু বহন করিয়া আনে সমগ্র জীবনের নবীন বার্ত্তা। এই অসহায় ক্ষুদ্র প্রাণীটির উপরেই নির্ভর করে পরিবারের সুখশান্তি, সমাজের কল্যাণ, জাতির গৌরব, রাষ্ট্রের শক্তি, দেশের আশাভরসা। যে শিশুটি আজ এক আনা মূল্যের একখানি 'শিশুশিক্ষা' বই, 'নব ধারাপাত' এবং ভাঙা শ্লেট সম্বল করিয়া পাঠশালার জীর্ণ গৃহে বসিয়া বর্ণমালা শিখিতেছে, অথবা নামতা মুখস্থ করিতেছে—সেই শিশুটিই হয়ত এক দিন হইবে দেশের ও দশের ভাগ্যবিধাতা। বৃক্ষজীবনের যেমন অঙ্কুর, মানবজীবনের পক্ষে সেইরূপ শৈশব। শৈশব সমগ্র ভবিষ্যৎ মানবজীবনের অঙ্কুরীভূত সম্ভাবনা মাত্র। তাই উপযুক্ত যত্নে লালন করিতে না পারিলে শৈশব সার্থক যৌবনে পরিণত হইতে পারে না।

অতএব ছেলেকে যদি প্রকৃত মানুষ করিতে হয়, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; নতুবা "সে ছেলেই থাকিয়া যাইবে, মানুষ হইবে না।" ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে, শৈশব হইতেই আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে তাহার প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে আনন্দের ভিতর দিয়া তাহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুকে শিক্ষাদান করা যে কত কঠিন, কত জটিল, কত গুরুতর বিষয় তাহা আমরা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অনেকেই বলেন, "ছেলে পড়ান? ও! এ আবার কঠিন কি? পড়াইলেই হইল।" এই শ্রেণীর লোক শিক্ষাদানের যোগ্য অধিকারী নহেন। অধ্যাপনা যে কিরূপ গুরুতর এবং কঠিনতর কার্য্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষাদাতাকে শিশু হইয়া শিশুর অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। শিশু কি প্রকার জ্ঞান চাহিতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার জ্ঞানপিপাসা স্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত ও পরিতৃপ্ত হইবে, শিশু কেন বুঝিতেছে না, কি করিলে সে সহজে বুঝিতে পারিবে ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদাতার বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত, বিকশিত ও পরিপুষ্ট করিয়া তাহাকে সমাজ ও সংসারের উপযুক্ত করিয়া তোলা। শিশুর মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে, তাহাকে জীবনে রূপায়িত করিয়া তোলা—শিক্ষার সোনার কাঠি স্পর্শে তাহার অন্তরের 'মানুষটি'কে জাগ্রত করিয়া তোলাই শিক্ষাদাতার কাজ। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, শিশুশিক্ষার এই গুরু দায়িত্বভার কে গ্রহণ করিবে? কবির কথায় বলিতে গেলে—

> "এই যে শিশু তরুণ তনু
> নতুন মেলে আঁখি,
> ইহার ভার কে লবে আজি
> তোমরা জান তা কি?"

ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত মনীষী রুশো বলিয়াছেন—মাতৃগর্ভ হইতে মানবশিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়; সুতরাং গৃহই শিশুশিক্ষার ভিত্তিভূমি এবং শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া মানুষ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্বও পিতামাতার। কিন্তু শিশুকে যথোচিতরূপে শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অথবা সুবিধা সকল পিতামাতার থাকে না। বিশেষতঃ আমাদের দেশে, যেখানে শতকরা ৯০ জন নরনারী নিরক্ষর, সেখানে পিতা-মাতার পক্ষে গৃহে শিশুশিক্ষার ভার গ্রহণ করা কতটা সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়। এমন কি, শিক্ষাদীক্ষায় সম্যক্ অগ্রসর এবং জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমুন্নত পাশ্চাত্য দেশসমূহে—যেখানে শতকরা ৯০ জনের অধিক নরনারী শিক্ষিত, সেখানেও শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নার্সারি স্কুলে

প্রধানতঃ শিক্ষয়িত্রীরাই চালিত হয়। ইংলণ্ডের জনৈক খ্যাতনামা শিক্ষক বলিতেন যে, যদি তাঁহার কোন ছাত্রের বাড়ী না থাকিত, তবে তিনি তাঁহার আদর্শকে কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন। তাঁহার অধিকাংশ ছাত্রই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে ছিল, এবং তাহারা সকলেই বোর্ডিঙে থাকিয়াই অধ্যয়ন করিত। তথাপি উক্ত শিক্ষকের ধারণা ছিল যে, ছুটির সময় ছাত্রগণ গৃহে অবস্থান করে বলিয়া তাঁহার শিক্ষাদানকার্য্যের সাফল্যে ব্যাঘাত জন্মে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা-স্থানীয় না হইলে চলে না। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর প্রয়োজনই বেশী। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মত ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই। তাহা মনকে যতটা দেয়, তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশী। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি, যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন।"

সদাচঞ্চল ও ক্রীড়াশীল শিশু খেলাধুলা, হাসি-গান ও আনন্দের মধ্য দিয়া এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কৌতূহলবশে যে শিক্ষালাভ করিবে, তাহাই হইবে সত্যকার শিক্ষা। শিক্ষক যদি সকল শিশুকে একই ছাঁচে ঢালিয়া, ঘষিয়া মাজিয়া, মারিয়া পিটিয়া, অচিরাৎ পণ্ডিত বানাইতে চেষ্টা করেন, তবে কালক্রমে সেই শিশুর মানসিক বৃত্তিসমূহের উপযুক্ত বিকাশ হইবে না, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে বিকৃত মনোবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। শিক্ষকের প্রধান কাজ হইবে, সর্ব্বদা শিশুর সঙ্গে থাকিয়া সাবধানে, সযত্নে ও সুবিবেচনার সহিত তাহাকে পরিচালিত করা। শিক্ষক হইবেন শিশুর "Friend, philosopher and guide"। শিশু ও কিশোরদের এই ভাবে শিক্ষাদানের জন্য পৃথিবীর স্বাধীন ও প্রগতিশীল দেশগুলিতে কত বিচিত্র রকমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং নিত্য কতই না অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির আবিষ্কার ও গবেষণা চলিতেছে। শিশুর জীবনকে শিক্ষাদীক্ষায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য সেই সকল দেশে নার্সারি স্কুল, এবং কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী ও মন্টেসরী-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য কত উন্নত-ধরণের শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উপরন্তু প্লেওয়ে রীতি, ড্রামাটিক্ ওয়ে অব টিচিং প্রভৃতি শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। ইহার সহিত আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার কুব্যবস্থার তুলনা করিলে মন দুঃখ ও নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠে। কারণ এ দেশে শিশুশিক্ষার নামে চলিতেছে শিশুপাল বধ, এখানে এখনও বহু-ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থার অনুরূপ শিক্ষাদান চলিতেছে। "Spare the rod and spoil the child"—এই নীতিবাক্য এ দেশের অনেক শিক্ষক এখনও পরিহার করিতে পারেন নাই। কাজেই শিশু যেদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম আসিয়া ভর্ত্তি হইল, সেদিন হইতে আরম্ভ হইল তাহার জীবনের ট্রাজেডি। যে সুকুমারমতি সদাপ্রফুল্ল শিশু আপনার গৃহে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে, সর্ব্বদা ছুটাছুটি করিয়া খেলাধুলায় মাতিয়া মনের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিত, আজ সহসা তাহার উপর নামিয়া আসিল শিক্ষকের প্রচণ্ড শাসনদণ্ড। সদানন্দ শিশুর অন্তরাত্মা শিক্ষকের রক্তচক্ষু আর ঘূর্ণ্যমান বেত্রদণ্ড দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। শিশুমনে সেই যে প্রথম আতঙ্কের সৃষ্টি হইল, তাহা আর ঘুচিল না। শিশু পাঠশালাকে আনন্দ-নিকেতন বলিয়া ভাবিতে পারিল না, উহা তাহার কাছে একটা ভীতিপ্রদ বন্দীশালাসদৃশ বলিয়া মনে হইল, মুক্ত বনবিহঙ্গ যেন পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া পড়িল। এখানকার বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে নিরানন্দ শিক্ষাপ্রণালীকে সে প্রাণের সহিত, আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না। রুদ্ধশ্বাসে বদ্ধঘরে আনন্দহীন পরিবেশের মাঝখানে বসিয়া বসিয়া তাহার শিশুচিত্ত অবসাদ ও অস্বস্তিতে হাঁপাইয়া উঠিল। শিশুর মানস-শতদলের পাপড়িগুলি পূর্ণবিকশিত হইবার পূর্ব্বেই স্নেহবারি-সিঞ্চনের অভাবে এবং রুদ্রশাসনের খররৌদ্রে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িল। যে সকল নববিদ্যার্থী পুথিহাতে গুরুমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হয়তো ভাবী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ ও চিত্তরঞ্জন লুকাইয়া ছিল,—তাহাদের হইল অকালমৃত্যু।

রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখেই বলিয়াছেন—"বাঙালীর ছেলের মত এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্ব্বণ করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন স্কুলের বেঞ্চের উপর কোঁচাসমেত দুই-খানি শীর্ণ খর্ব্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত্র হজম করিতেছে, মাষ্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর অন্য কোনরূপ মসলা মিশানো নাই।"

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও ইউরোপের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীকে শারীরিক শাস্তিদানের ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু শিশুচরিত্র ও শিশুমনস্তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিদ্ পণ্ডিতগণ শারীরিক দণ্ডবিধান প্রথা বিদ্যালয় হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার আইন অনুসারে পিতামাতা পর্য্যন্ত সন্তানকে প্রহার করিতে পারে না, সন্তানকে শারীরিক কষ্ট দেওয়া তথায় অপরাধ

বলিয়া গণ্য, এবং ইহার জন্ত পিতামাতাকে শাস্তি পাইতে হয়। কিন্তু এ দেশে শিশুদের কোমলগাত্রে কত পিতামাতা আর শিক্ষক যে প্রতিদিন আঘাতের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। জীবনের প্রভাতে শিশুর যাত্রাপথ যদি চোখের জলে ভিজিয়া উঠে, তবে শিশুজীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না। স্বাধীনতা এবং আনন্দের মধ্য দিয়া যদি শিশুদের জীবনকে আমরা পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ দিতে পারিতাম, তবে আজ পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া যাইত। শিশুর জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে জোরজবরদস্তিতে নয়, স্নেহমমতা দিয়া; আঘাত করিয়া নয়, আলিঙ্গন করিয়া। শিশুশিক্ষা বেত্র-কণ্টকিত পথে ঠিকমত হইবার নয়; অপরিমেয় সহানুভূতি, অসীম ধৈর্য্য আর অফুরন্ত দরদের পথই শিশুশিক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা।

জৈন মহর্ষি রায়চাঁদ ভাই

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

গুজরাটী ভাষায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি রাজচন্দ্র অথবা রায়চাঁদ ভাই কাথিয়াবাড় ষ্টেটের অন্তর্গত ভবানীয়া নামক স্থানে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। লণ্ডন থেকে ১৮৯১ সালে, যেদিন আমি দেশে ফিরে আসি সেদিনই বোম্বাইয়ে ডক্টর পি. জে. মেহতার বাসভবনে এই কবির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমি কবি বলেই তাঁকে সম্বোধন করতাম, তিনি ডক্টর মেহতার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি শত-বাঁধনী অর্থাৎ একসঙ্গে এক শত বিষয় স্মরণ রাখতে সমর্থ বলে আমার নিকট পরিচিত হন। কবি তখন যুবক ছিলেন, আমার প্রায় সমবয়সীই হবেন। বয়স খুব সম্ভব তখন একুশের কাছাকাছি। বাস্তব জগতের সকল কাজকর্ম্ম থেকে অবসর নিয়ে তিনি ধর্ম্মসাধনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন। আমি তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবন, এবং স্বাধীন বিচারশক্তির জন্য তাঁর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতাম। তিনি সর্ব্ববিধ অন্ধ গোঁড়ামির হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি কর্ম্মকে সক্রিয় ধর্ম্মসাধনায় রূপান্তরিত করেছিলেন বলেই সম্ভবতঃ তাঁর প্রতি আমি সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলাম। অধ্যাত্ম-দর্শনের একজন কৃতী ছাত্র হিসাবে তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই কার্য্যত অনুশীলনেও সচেষ্ট হতেন। স্বয়ং জৈন ধর্ম্মাবলম্বী হলেও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর সহনশীলতা উল্লেখযোগ্য। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ড যাবার সুযোগ পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

তিনি ইংরেজী শেখেন নি। তাঁর বিদ্যালাভ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই যা কিছু হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশেষ প্রতিভার অধিকারী। তিনি সংস্কৃত ও মাগধী ভাষা জানতেন এবং আমার ধারণা পালী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি একজন গ্রন্থকীট ছিলেন। গুজরাটী ভাষার মাধ্যমে তিনি অধ্যাত্মশাস্ত্র-বিষয়ক প্রভূত জ্ঞান আহরণ করেন, এমন কি ইসলাম ধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং জরথুষ্ট্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিষয়েও যথোচিত ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করেন। তিনি বাস্তবিকই একজন মনীষী ছিলেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আমাকে নিরতিশয় মুগ্ধ করেছে। আমি অন্যত্র বহুবার বলেছি যে, আমার আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে উক্ত কবির প্রভাব টলষ্টয়, রাস্কিন প্রভৃতির প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। কবিবরের প্রভাব গভীরতম হওয়ার এটাই মুখ্য কারণ যে, আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের নিকটতম সংস্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছিলাম। তাঁর উপদেশাবলী জীবনের বিরাট কর্ম্ম-ক্ষেত্রের অধিকাংশ ব্যাপারেই আমার বিবেককে প্রবুদ্ধ করেছে। তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলভিত্তি নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে অহিংসা। একমাত্র বৃদ্ধ ও রুগ্ন গৃহপালিত পশু এবং বিবিধ কীটপতঙ্গ ইত্যাদিকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করাই অহিংসার পরাকাষ্ঠা একথা যারা বলে থাকে, সেইসব তথাকথিত অহিংসার পূজারীর দ্বারা যে সকল অদ্ভুত আচরণ অনুষ্ঠিত হতে দেখতে পাওয়া যায়, রায়চাঁদ ভাইয়ের অহিংসা ঠিক সে ধরণের নয়। তাঁর অহিংসা ক্ষুদ্রতম কীট থেকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সমভাবে প্রযুক্ত হ'ত।

তথাপি কবিকে দোষত্রুটিহীন পূর্ণ মানবরূপে মেনে নিতে আমি কখনো পারি নি। কিন্তু যেসব শ্রেষ্ঠ মনীষীর সঙ্গে আমি সবিশেষ পরিচিত তাঁদের সকলের চেয়ে এই কবি পূর্ণতার অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলে আমার নিকট প্রতিভাত হতেন। হায়! তিনি অকালে, মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সত্যলোকে প্রয়াণ করলেন। তিনি তাঁর স্তাবক রেখে গেছেন অসংখ্য, কিন্তু অনুগত শিষ্য রেখে গেছেন খুবই কম। তাঁর লেখার ভিতর অধিকাংশই পত্রাবলী, যা তিনি অনুসন্ধিৎসুদের নিকট গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিপূর্ণ প্রাণের ভাষায় লিখেছিলেন। এই পত্রসংকলন প্রকাশিত হয়েছে গুজরাটি ভাষায়। হিন্দীতে অনূদিত হয়ে এগুলি প্রকাশের চেষ্টাও হচ্ছে। এর ইংরেজী অনুবাদও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আমি জানি। এই পত্রাবলীতে বর্ণিত বিষয়গুলি প্রধানতঃ কবির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।*

* ১৯৩০ জুনের 'মডার্ণ রিভিয়ু'র একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত।

পোর্ট তকিফে 'আরব লীগের' দুই কর্ণধার।
সৌদি আরবের নৃপতি ইব্‌ন সৌদ (বামে) ও মিশরের রাজা ফারুখ

ইজ্‌রায়েল রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র তেল আভিভ

সমবায় নীতিতে গঠিত, ঘরবাড়ি ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ইহুদী উপনিবেশ কাফার জেখেস্কেল

কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্য ও তাহার বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ-প্রণালী

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্‌সি

ভারতবর্ষে উৎপন্ন কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যে একান্ত প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ও জলসেচন প্রভৃতির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রত্যেক ফসলের উৎপাদন বহুলাংশে বাড়ানো যেতে পারে। বর্ত্তমানে কৃষিবিদ্‌গণ এ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং আশা করা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্য পরিচালনা করলে ক্রমশঃ উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেড়ে চলবে। কিন্তু কেবল ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয় চিন্তা করলেই চলবে না—দেখতে হবে কি করে এই উৎপন্ন ফসলসমূহ সুরক্ষিত অবস্থায় দেশবাসীর নিকট দীর্ঘ কালের জন্য ব্যবহারযোগ্য থাকে। আমরা সকলেই ফসলের ক্ষতি-সাধনকারী বিবিধ কীটপতঙ্গের বিষয় অবগত আছি। ফসল গোলাজাত করবার পরও কীটপতঙ্গের দ্বারা বহুলাংশে বিনষ্ট হতে পারে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এজন্য বহু অর্থের অপচয় ঘটে এবং গবর্ণমেণ্ট ও বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় এইরূপ অপচয় বহুলাংশে নিবারণ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের পক্ষেও এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই দেশেও এইরূপ কীটপতঙ্গের জন্য বহুল পরিমাণ শস্য বিনষ্ট হয় এবং বার্ষিক অপচয়ের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ টাকা হবে সন্দেহ নাই। বিস্তর ধান, চাল, ডাল, গম, তামাক ও বিবিধ ফল এইরূপ কীটপতঙ্গের জন্য বিনষ্ট হয়। এর আশু প্রতিকার একান্ত প্রয়োজন।

উপরোক্ত কীটপতঙ্গসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে এবং এদের বিনষ্ট করারও নানারূপ উপায় আছে। সাধারণ ভাবে গরম ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে উপযুক্ত আধারের মধ্যে শস্যাদি সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থা করলে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে অনেকাংশে সেগুলোকে রক্ষা করা যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ১৪০° ফারেনহাইট টেম্পারেচারের সাহায্যে ধান ও তামাক ছাড়া অনেক শস্য-বীজকে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে বাঁচানো যেতে পারে। এই উপায় অবলম্বন করলে বীজগুলির অঙ্কুরিত হবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয় না। অতিশয় ঠাণ্ডা আধারসমূহের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। অবশ্য এটা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং এদেশের পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ঠাণ্ডা ও গরম আধারের মধ্যে শস্য ও ফসলসমূহ সংরক্ষণ করার বিষয় আলোচনা করা গেল। এক্ষণে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগে কিভাবে শস্যাদি সংরক্ষিত হতে পারে তা দেখা যাক।

ফরমালডিহাইড, ন্যাপথলিন প্রভৃতি কতিপয় রাসায়নিক পদার্থের সহিত অনেকেই সুপরিচিত এবং এই সকল পদার্থ সাধারণ টেম্পারেচারেই ধীরে ধীরে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হয়ে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে ও সকল রকম কীটপতঙ্গ বিনষ্ট করে। সঞ্চিত দ্রব্যসমূহ এই বাষ্পের কিয়দংশ শোষণ করে রেখে দেয় যার ফলে অনেকদিন নূতন কীটসমূহ জন্মাতে পারে না। খাদ্যদ্রব্যাদি সঞ্চয়ের জন্য যে সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে সেগুলো মানুষ ও যাবতীয় জীবজন্তুর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিষ হওয়া দরকার। অবশ্য এই সকল পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করেই বহুল পরিমাণ খাদ্যশস্য সংরক্ষিত করা চলবে। কীটপতঙ্গ বিনষ্ট করবার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঔষধ পাইরেথ্রাম নামক একপ্রকার গাছের ফুল হতে প্রস্তুত হয় এবং তাকে পাইরেথ্রাম একস্‌ট্রাক্ট বলে। এটি একটি তরল পদার্থ এবং তৈলে দ্রবীভূত করে স্প্রে করবার ব্যবস্থা করলে এর কীটবিনাশক শক্তি অনেক বেড়ে যায়। পাইরেথ্রাম জাপান থেকে বেশী পরিমাণে আমদানী হ'ত এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকা থেকেও কিছু কিছু পাওয়া যেত। শস্য সংরক্ষণাগারে পাইরেথ্রাম স্প্রে দিয়ে মধ্যে মধ্যে কীটাদি বিনাশ করবার চেষ্টা করতে হবে। এতে কীটপতঙ্গ বহুল পরিমাণে ধ্বংস হবে। শুষ্ক আবহাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। তাতে কীটপতঙ্গ বেশী পরিমাণ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। সে কারণ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যেন খাদ্যশস্য-সঞ্চয়ের আধারসমূহ বেশ শুষ্ক থাকে ও স্যাঁতসেঁতে না হয়।

আমেরিকায় আর একটি মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে—এর নাম ডি, ডি, টি। এর পুরা রাসায়নিক নাম ডাইক্লোরো, ডাইফেনিল, ট্রাইক্লোরোইথেন। এটা দেখতে শাদা লবণের মত এবং কেরোসিন তৈল, ইথার, স্পিরিট প্রভৃতি তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়। ডি, ডি, টি উপরোক্ত দ্রাবক পদার্থসমূহের সহিত ভালরূপ মিশে গেলে স্প্রে করা উচিত। তখন বাষ্পীয় আকারে ডি, ডি, টি কণাসমূহ কেরোসিন, ইথার প্রভৃতি তরল পদার্থসমূহের সহিত সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত হয়ে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। ফলে বায়ুমণ্ডলস্থ কীটাণুসমূহ সত্বর বিনষ্ট হয়। স্প্রের সাহায্যে ডি, ডি, টির ক্রিয়া কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাপকভাবে ডি, ডি, টি স্প্রে করবার জন্য বড় বড় স্প্রে পাম্প ব্যবহার করা যেতে পারে। ডি, ডি, টি যেখানে স্প্রে করা

সম্ভব হবে না সেখানে পাউডার ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। ডি, ডি, টি অন্যান্য পাউডারের সহিত মিশ্রিত করা হয় এবং সাধারণতঃ শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ ডি, ডি, টি এই পাউডারের মধ্যে থাকে। কীটাণুসমূহের বাসস্থানে এই পাউডার ছিটান হয়, ফলে আস্তে আস্তে সমস্ত কীটাণু ধ্বংস হয়ে যায়। স্প্রের মত এত শীঘ্র না হলেও বেশ স্বল্পকালের মধ্যেই সমস্ত কীটপতঙ্গ বিনষ্ট হয়। ডি, ডি, টি-র কীটাণু-বিনাশক শক্তি অসীম এবং সঞ্চিত শস্যাদি মাত্র সহস্র ভাগের এক ভাগ ডি, ডি, টি-র প্রয়োগেই কীটাণুর আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকে।

আদর্শ শস্যাগার নির্ম্মাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। আবহাওয়া ভেদে খাদ্যদ্রব্যাদির সংরক্ষণ-কার্য্যের মধ্যে বেশ তারতম্য দেখা যায়। বাংলাদেশের জলীয় বাষ্পপূর্ণ আবহাওয়ায় কীটাণু সহজেই জন্মগ্রহণ করে এবং সেজন্য এখানে খাদ্য সঞ্চয়ের আধারসমূহ খুব সাবধানে তৈরি করতে হবে। পক্ষান্তরে শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলশস্যাদি প্রকৃতির সাহায্যেই বেশ কিছুকাল সংরক্ষিত হতে পারে। এর উপর যদি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আধারসমূহ নির্ম্মাণ করা যায় ত এগুলো দীর্ঘকাল টাটকা থাকবে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ পঞ্জাব এবং আরও কয়েকটি শুষ্ক আবহাওয়া প্রধান দেশে আদর্শ শস্যাগারসমূহ নির্ম্মিত হতে পারে। এমন কি, বাংলায় উৎপন্ন মূল্যবান খাদ্যশস্যাদির কিয়দংশও ঐ সকল দেশে ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত করা যেতে পারে।

খাদ্যসংরক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি না হলে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্যাদি বিনষ্ট হবে। এরূপ অপচয় নিবারণ করা অবশ্য কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, তবুও বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক সহযোগিতা পেলে এটা সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে হলে এই সঞ্চয় ও সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অবশ্য এ সম্বন্ধে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতাও দরকার। সাধারণ কৃষক যদি বুঝতে পারে যে তার উৎপন্ন ফসল দীর্ঘদিন সযত্নে সংরক্ষিত থাকবে এবং সে উপযুক্ত মূল্যে একদিন নিশ্চয়ই তা বেচতে পারবে তা হলে সে এই সংরক্ষণনীতি অবশ্যই মেনে চলবে। আদর্শ শস্যাগার নির্ম্মাণ যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকারের সহায়তা পেলে এই কাজ কঠিন হবে না। কৃষি-দ্রব্যাদি বার মাস সমান উৎপন্ন হয় না। প্রত্যেক ফসলেরই একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে এবং এই উৎপন্ন ফসলের স্থায়িত্ব সব সময় সমান নহে। অধিকাংশই দু-এক মাসের মধ্যে পচে নষ্ট হয় এবং সেজন্য শীঘ্র জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। জনসাধারণও প্রত্যেক খাদ্যশস্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করে। ফলে অনেক সময় তাদের অর্থের অপচয় ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এরূপে অবশ্য খাদ্যদ্রব্য কীটপতঙ্গের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেল, কিন্তু এর দ্বারা ঠিক অপচয় নিবারণ হ'ল না। যে সকল খাদ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন হয় সেগুলো যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় ত ভবিষ্যতে তাদের সদ্ব্যবহার হবে এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অনেকাংশে নিবারিত হবে। খাদ্যশস্য সংরক্ষণ বিষয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করা দরকার। এরূপ পরিকল্পনা যে জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাংলা পরিভাষা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের দেশের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া অজস্র ইংরেজী শব্দ বাংলায় অনূদিত হইয়া বাংলার শব্দভাণ্ডারকে পুষ্ট করিতেছে। সাধারণতঃ লেখকগণ যে যাহার প্রয়োজন মত শব্দের অনুবাদ করিয়া থাকেন—সংঘবদ্ধ চেষ্টাও মাঝে মাঝে কিছু কিছু দেখা যায়। তবে দেশের জনসাধারণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ সম্পর্কে বিশেষ কোনও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যই শিক্ষাভিমানী সমাজের মুখ্য উপজীব্য—দু'চার জন ছাড়া তাঁহাদের অধিকাংশই বাংলার ধার ধারেন না—বাংলায় কোনও গভীর বিষয়ের গুরু আলোচনার প্রয়োজন বা তাগিদ তাঁহাদের অনেকেরই নাই। বাংলায় কিছু বলিতে বা লিখিতে হইলে বিপন্ন বোধ করেন এরূপ লোকের সংখ্যা শিক্ষিতের মধ্যেও যথেষ্ট। তার পর ইংরেজী ভাবে ভাবিত, ইংরেজীর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অনেকে যাহা লেখেন তাহা বাঙালীর বাংলা প্রায়শই হয় না—তাহার মধ্যে সাহেবী গন্ধ পুরা দস্তুর বর্ত্তমান। বাংলার এই অবস্থার কথাই অতি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়া শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখিয়াছেন—

'বাংলায় লিখতে ব'সে দেখি ইংরেজীতে ভাবছি, অথচ ইংরেজীতেও কথাটা পুরোপুরি বলতে পারি তা নয়। বাংলা লেখা আমাদের শিখতে হয় অতি কষ্টে প্রাণপণ পরিশ্রমে··· ভাষাকে শিল্পরূপে গড়ে তোলা এমনিতেই শক্ত কাজ, আমাদের দেশে তার ওপরে বিদেশী ভাষার মধ্যবর্ত্তিতা জড়িত হ'য়ে ব্যাপারটিকে আরও দুরূহ ক'রে তোলে।···এখন পর্য্যন্ত আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বেশির ভাগই, ভাল বাংলা দূরে থাক, নির্ভুল বাংলাও লিখতে পারেন না— ছাপার অক্ষরের বইয়েও শুধু অপটুতা নয়, প্রমাদও লক্ষিত হয় প্রচুর।' (সব পেয়েছির দেশ, পৃঃ ৮৫-৬)।

এই অবস্থায় ভাষার সৌন্দর্য্য ও পরিপুষ্টির দিকে দেশের জনসাধারণ বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তেমন ভাবে পড়ে নাই। এক জনের ব্যবহৃত শব্দ সুন্দর হইল কি অসুন্দর হইল, শুদ্ধ হইল কি অশুদ্ধ হইল তাহা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন কচিৎ দুই এক জন মাত্র অনুভব করিয়াছেন। ফলে আজ যে কত অসঙ্গত, অসুন্দর ও অশুদ্ধ শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভ্রূকুটি বা অনুনয় এ বিষয়ে বিশেষ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বহুল প্রচলিত শব্দের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, কৃষ্টি, সহানুভূতি, অন্তরীণ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথচ কয়জন তাহার খবর রাখে বা রাখার প্রয়োজন বোধ করে?

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথারই পুনরুক্তি করিয়া আমরা বলিতে পারি 'ভাষা যে সব সময় যোগ্যতম শব্দের বাছাই করে কিম্বা যোগ্যতম শব্দকে বাঁচাইয়া রাখে' তা নয় তথাপি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের দোষগুণ সম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করা যে কোন ভাষাভাষীর পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় নহে। এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি ও মমত্ববোধ থাকিলে তবেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর, অন্যথা নহে। আজ স্বাধীনতালাভের পর যখন বাংলাভাষার প্রসারবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী—যখন ইংরেজীকে একেবারে না ছাড়িলেও বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই আমাদিগকে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে তখন আর কাহারও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অনবহিত হওয়া সঙ্গত ও শোভন নয়। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে সরকারী অনুবাদ সমিতি, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রবর্ত্তিত সারস্বত সমাজ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ইংরেজী শব্দের সুষ্ঠু বাংলা প্রতিশব্দ প্রণয়নে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ চেষ্টার সূত্রপাত করেন তখন যথেষ্ট চাহিদার অভাবতশতঃ এই সকল প্রচেষ্টা কল্পনাবিলাসীর বিলাস হিসাবে জনসমাজ কর্তৃক অনাদৃত বা উপেক্ষিত হইয়া থাকিলেও তেমন দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু বর্ত্তমানে শোভন অনুবাদের মধ্য দিয়া কেবল বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য নহে আধুনিক জগতের ভাবধারা বাঙালীর কাছে বাঙালীর মত করিয়া বলিবার প্রয়োজনে উপযুক্ত শব্দের চাহিদা ও মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জনসাধারণের ঔদাসীন্যের ভাব এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। ফলে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দেশীয় ভাষার পূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থার জন্য যখন বিভিন্ন বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইল তখন দেশের লোক শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে বরণ করিয়া লয় নাই— নিন্দা করিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে কিন্তু দোষ থাকিলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই—দোষগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার ক্লেশ পর্য্যন্ত স্বীকার করে নাই। সদ্যপ্রকাশিত 'সরকারী কার্য্যে ব্যবহার্য্য পরিভাষা' সম্বন্ধেও অনুরূপ মনোভাব ও ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছি। বিভিন্ন পত্রিকা একরূপ সমস্বরে ইহাকে নিন্দা করিয়াছেন—উপহাস করিয়াছেন। পথে-ঘাটে বন্ধুবান্ধব, সরকারী কর্ম্মচারী, উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী যাহারই সঙ্গে কথা হয় তিনিই ইহার নিন্দা করেন—ইহা অচল, অব্যবহার্য্য বলিয়া মত প্রকাশ করেন। সংস্কৃতের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিতা, প্রচলিত ইংরেজী বা অন্য দেশীয় শব্দের প্রতি উপেক্ষা ও খাঁটি বাংলার প্রতি অশ্রদ্ধা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সরকারী পরিভাষার প্রধান দোষরূপে সাধারণত উল্লিখিত হইয়া থাকে। তবে ইহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে অনেকের কাছেই জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। কোন্ কোন্ শব্দের অনুবাদের প্রয়োজন নাই—কোন্ কোন্ শব্দের অনুবাদের কিরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইতে পারে এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি আলোচনায় বিশেষ কেহ অগ্রসর হইতে চাহেন না। সত্য বটে, অনেকের পক্ষেই এরূপ আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। হয়ত বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের মতামত সরকারের পরিভাষাসংসদের নিকট সরাসরি পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু দেশের সাধারণ লোকের যে আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ আছে তাহার তেমন কোনও নিদর্শনও পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সভাধিবেশনের বিবরণ প্রতি দিনের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কিন্তু কোথাও এই পরিভাষার আলোচনার ইঙ্গিতমাত্র দেখা যায় না। সাধারণের আগ্রহের ফলেই ছোট বড় নানা বিষয় সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের মতামত সাড়ম্বরে পত্রিকায় প্রচারিত হয়। সরকারী পরিভাষা সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ববিদ্ বা সাহিত্যিকগণের অভিমত বা সমালোচনা কিন্তু পত্রিকাধ্যক্ষগণ সংগ্রহ করিয়া পত্রিকাস্থ করার বিশেষ কোনও প্রয়োজনই অনুভব করেন নাই। সাধারণের এ বিষয়ে আগ্রহের অভাবই কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? অথচ এরূপ সমালোচনা উপযুক্ত পরিভাষা নিরূপণের কাজে হয়ত প্রচুর সহায়তা করিতে পারিত।

একথা কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে প্রস্তাবিত পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। প্রথমেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, এ বিষয়ে যে সাধারণ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার প্রথম ও প্রধান কথা—'বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই, অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা কর্ত্তব্য, কিন্তু বিবাদ করা অসঙ্গত।' আজ কবিগুরুর এই উপদেশ মাথায় করিয়া আমাদের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। নূতন শব্দ গঠনের সময় ভাষার প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য, বিশুদ্ধি ও অর্থের স্পষ্টতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অবশ্য সব সময় সকল দিক রক্ষা হইবে না—তবে তাই বলিয়া বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নতুন তৈরি শব্দ নতুন নাগরা জুতোর মতই কিছুদিন অস্বস্তি ঘটায়।' 'বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দ বিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে।' (শব্দতত্ত্ব, পৃঃ ১৬৬, ১৮৭)। অবশ্য এই অজুহাতে যদৃচ্ছাচার শোভা পায় না বা সমর্থন করা চলে না। যথাসম্ভব, নির্দ্দোষ শব্দ গঠনের চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এজন্য বিপুল সমৃদ্ধিশালিনী সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন—'একথা স্বীকার করতেই হবে সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কি জ্ঞানের কি ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ ক'রতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষাগুলিকেও এমনি ক'রেই গ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়।' (বাংলা ভাষাপরিচয়, পৃঃ ৫০)। কারণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত একটা দৌর্ব্বল্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন —'বিশেষ্যকে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। তাই বাংলা ভাষার আপন রীতিতে শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য।' (বাংলা ভাষাপরিচয়, পৃঃ ১০৪)। তাই দেখিতে পাই বিগত দেড় শত বৎসর ধরিয়া যখনই বাংলায় নূতন শব্দের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে—শুদ্ধ ভাবে হউক বা অশুদ্ধ ভাবে হউক, মূল অর্থ বজায় রাখিয়া হউক বা উহাকে সঙ্কুচিত, প্রসারিত বা বিকৃত করিয়া হউক সংস্কৃতমূলক শব্দকেই বাঙালী তাহার ভাষার মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমানেও যে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা মোটেই বলা চলে না। ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক স্থাপনের পর যে সমস্ত নূতন শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহাদের কোনও তালিকা এখন পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই সত্য তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই জাতীয় শব্দের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত বা সংস্কৃতের আদর্শে রচিত। যাঁহারা চলতি বা কথ্য বাংলার একান্ত পক্ষপাতী তাঁহারাও যে দরকারমত অজস্র সংস্কৃত শব্দ গঠন ও প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অতি আধুনিক মতাবলম্বীদের লেখা হইতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উদ্গাতা, ঋত্বিক্, পুরোধা, স্নাতক, সমাবর্ত্তন প্রভৃতি লৌকিক সংস্কৃতে অপ্রচলিত বৈদিক শব্দ পর্য্যন্ত আজ অবাধে বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে। বস্তুতঃ মুখে আমরা যাহাই বলি না কেন সংস্কৃতের প্রতি আমাদের অন্তরের টান অস্বীকার করিবার উপায় নাই—পরিভাষারচনায় বা নূতন শব্দ গঠনে তাই সংস্কৃতের প্রভাব অপরিহার্য্য।

তাই বলিয়া প্রচলিত শব্দের স্থলে নূতন অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ গঠন করিয়া চালাইতে হইবে এরূপ কথা বলা চলে না। অবশ্য প্রচলিত শব্দের দ্বারা সমস্ত কাজ চলে কিনা এবং প্রচলিত বলিতেই বা ঠিক কি বুঝায় তাহা ধীর ভাবে পর্য্যালোচনা করা দরকার। পুলিশ শব্দটি প্রচলিত সন্দেহ নাই কিন্তু পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে প্রচলিত বলিলে ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা হয় কি? Deputy Superintendent of Police, Inspector-General of Police প্রভৃতির বেলায় কোনও অজুহাতেই অনুবাদ ঠেকাইয়া রাখা সঙ্গত বা শোভন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আর এগুলি অনুবাদ করিতে গেলে পুলিশ শব্দটিকে বাঁচাইয়া রাখা সুকঠিন। এইরূপ magistrate, deputy-magistrate প্রভৃতি শব্দও বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া না যাওয়ায় তাহাদেরও অনুবাদ না করিয়া বাংলা ভাষায় কাজ চালান চলে না। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মুখে মুখে সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যেও অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয় সত্য তবে সেগুলিকে বাংলা ভাষার অঙ্গ বা আভরণ কোনওক্রমেই বলা চলে না—সেগুলি পরাধীন জাতির পরানুকরণের মোহ ও বিকারের সাক্ষ্য বহন করে মাত্র। জোর করিয়া সেগুলিকে ভাষায় চালাইতে গেলে তাহাতে ভাষা পরিপুষ্ট না হইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে—ভাষার শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া বিকৃতিই প্রকট হইয়া উঠিবে। তাই আমরা কথাবার্ত্তায় যত ইংরেজী শব্দই ব্যবহার করি না কেন লেখার বেলায় যথাসম্ভব বাংলা শব্দ ব্যবহার করিতে সাধারণত ত্রুটি করি না। meeting, secretary, editor, election, nomination, report, proceedings, result, class, subject প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ আমরা কথ্য ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু লেখার সময় সভা, সম্পাদক, নির্ব্বাচন, মনোনয়ন, কার্য্যবিবরণ, ফল, শ্রেণী, বিষয় প্রভৃতি ব্যবহার করিতে কোনও দ্বিধা করি না অথচ কথ্য ভাষায় এ সব শব্দ ব্যবহার করিতে যে একটা সংকোচ বোধ করি না এমন কথা কয়জন হলপ করিয়া বলিতে পারেন?

অনুবাদ-প্রবণতা শুধু বাংলাদেশে নয় বাংলার বাহিরেও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে সমস্ত ইংরেজী শব্দ আজ বিভিন্ন দেশীয় ভাষার অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের দেশীয় রূপ প্রচারের অসীম আগ্রহ সর্ব্বত্র অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তাই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হোটেল, থিয়েটর, সিনেমা আজ দেশীয় ভাষায় সাদরে গৃহীত হইলেও বিদ্যালয়, বিদ্যানিকেতন, বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা, মহাবিদ্যালয়, আরোগ্যশালা, ভোজনাগার, নাট্যনিকেতন, চিত্রমন্দির, ছবিঘর প্রভৃতি অনুবাদাত্মক শব্দ ব্যবহারের দিকেও ঝোঁক নিতান্ত কম নয়। মধ্যপ্রদেশ সরকার তাঁহাদের এলাকার সরকারী কলেজগুলির দেশী নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নাগপুর মরিস কলেজ, জব্বলপুর রবার্টসন কলেজ, অমরাবতী এডওয়ার্ড কলেজের পরিবর্ত্তিত নাম নাগপুর মহাবিদ্যালয়, মহাকোশল মহাবিদ্যালয় ও বিদর্ভ মহাবিদ্যালয় নিশ্চয়ই লোকরুচির পরিপন্থী নহে। বোম্বাই শহরে রেষ্টোর্যাণ্ট অবাধে উপাহারগৃহরূপে চলিতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত দোকান ইংরেজী নাম লইয়া সাধারণের মধ্যে মর্য্যাদা লাভ করিত কিছুকাল যাবৎ তাহাদের স্বজাতীয় অনেকেই বাংলা নামকরণকেই অধিকতর লোকরঞ্জক মনে করিয়া আরামঘর, তৃপ্তিসদন, বসনালয়, বাসনালয়, সাধনালয়, সূচীশিল্পসদন, রূপায়তন, মিষ্টান্নাগার, বস্ত্রাগার, বস্ত্রালয়, বস্ত্র প্রতিষ্ঠান, পরিচ্ছদভবন, মাতৃভাণ্ডার, কমলাভাণ্ডার, বিক্রমপুরভাণ্ডার, খাদ্যপ্রতিষ্ঠান, পাদুকাপ্রতিষ্ঠান, উপানৎ শিল্পসদন, মুদ্রণী, মুদ্রণালয়, গ্রন্থগেহ, প্রকাশনী, পুঁথিঘর প্রভৃতি নাম সাড়ম্বরে প্রচার করিতেছে। এই সকল ব্যাপার হইতে দেশের লোকের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—তাহার মানসিক গতির প্রত্যক্ষ আভাস মিলে। নির্ব্বাধে নিজের রুচির অনুসরণ করিতে দিলে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃতমূলক গালভরা শব্দের দিকে আকৃষ্ট হইবে।

পরিভাষা রচনায়ই হউক আর সাধারণ ইংরেজী শব্দের অনুবাদেই হউক মূল শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—কেবল আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া দেশের প্রকৃতি, রীতিনীতি অনুসারে নূতন শব্দ গঠন করিতে হইবে। ইংরেজী হাবভাব আদবকায়দা আজ আমাদিগকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র ও তাহার দেশী পরিভাষা রচনার সময় আমাদিগকে ভাবিতে হইবে—আমাদের কাজকর্ম্ম কি চিরদিনই বিলাতী ছাঁচে চলিবে? বিলাতী নামগুলিই অন্ত ভাষায় আমাদিগকে চালাইয়া যাইতে হইবে? ইংরেজীর ভুলত্রুটি অসম্পূর্ণতাও কি নির্ব্বিবাদে উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদিগকে বহন করিয়া যাইতে হইবে? Gazetted officer এবং non-gazetted officer এই পার্থক্য কি চিরকাল আমাদিগকে ঠিক এই নামেই বা ইহার আক্ষরিক অনুবাদ দিয়াই বজায় রাখিতে হইবে? আমাদের দেশে ত উত্তম মধ্যম বা প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি নামে শ্রেণীবিভাগ অধিকতর সুপরিচিত এবং সাধারণের নিকট সহজবোধ্য।

পূর্ব্ব আমলে নানা সময়ে যখন নূতন নূতন পদের সৃষ্টি ও নামকরণ হইয়াছে তখন যে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা করা হইয়াছে এরূপ মনে হয় না। যখন আমাদিগকে নূতন ভাবে সমস্ত জিনিষ গড়িয়া তুলিতে হইবে তখন এ বিষয়ে যথাসম্ভব শৃঙ্খলা ও সারল্য বিধানের চেষ্টা করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। Superintendent, manager, director, ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কর্ম্মগত যে সূক্ষ্ম পার্থক্যই থাকুক না কেন ইঁহারা সকলেই প্রাচীন মতে অধ্যক্ষ বা মুখ্যাধিকারী—ইঁহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র শব্দ উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। Care-taker (Writers Buildings) এবং superintendent (Governor's Estate) দুইয়ের মধ্যে কর্ম্মগত এমন কি বিভেদ আছে যাহাতে দু'জনকেই তত্ত্বাবধায়ক বলা চলে না? অপরপক্ষে Superintendent (Government House Gardens) স্বতন্ত্র পদের দরকার থাকিলেও সেই পদাধিকারীও কি তত্ত্বাবধায়কমাত্র নহেন? Chief Executive Officer (Calcutta Corporation) এরূপ স্থলে executive শব্দটির বিশেষ কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না—অনুবাদে ইহাকে বর্জ্জন করিলে বিশেষ অঙ্গহানির আশঙ্কাও করা যায় না। বিষয়পতি বা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের করণীয় বিচিত্র কর্ম্মরাশির পূর্ণ পরিচয় কেবল গুটি দুই শব্দের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইতে পারে না অথচ পতি শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সুতরাং magistrate and collector-এর অনুবাদে দুইটি শব্দ ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র বিষয়পতি শব্দের দ্বারাই বেশ কাজ চালান যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে কোনও ভাষায়ই পারিভাষিক শব্দ বাঞ্ছিত অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র অর্থ প্রকাশ করিতে যাওয়ার চেষ্টা নিষ্ফল। তাহাকে যথাসম্ভব সরল ও সুন্দর করিতে হইবে। তাহার পর বিভাগীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

পরিভাষা বিষয়ে সর্ব্বভারতীয় ঐক্যের কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরেজ এ সকলের রাজত্বকালেই এই বিশাল ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া শাসন ব্যাপারে মোটামুটি একটা ঐক্য ছিল; সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষার মারফত শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে একই শব্দ সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন প্রান্তের

লোকসমাজের মধ্যে তখনকার দিনে ভাবের আদান-প্রদান বা পারস্পরিক আলাপ-পরিচয় মেলামেশার তেমন প্রয়োজন বা প্রচলন না থাকিলেও এই ঐক্যের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক যুগে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ঐক্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই ঐক্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য চাই ভাষার ঐক্য—সর্ব্ব-ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা যাহাই হউক না কেন প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়াও যথাসম্ভব এই ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে—শাসন-সংক্রান্ত বা অন্য বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ-গুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়ও যাহাতে একটা সাম্য থাকে সে দিকে তৎপর হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মধ্য দিয়া এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ পণ্ডিত সমাজে বহু দিন হইতেই দেখা দিয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় প্রকৃত কার্য্যের মধ্যে তাহা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমানে যখন সমগ্র দেশময় ইংরেজী শব্দের দেশীয় প্রতিরূপ প্রণয়নের আয়োজন চলিতেছে তখন এই ঐক্যের কথা প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য বিষয়। এজন্য সকল ভাষার প্রতিনিধি লইয়া একটি সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা দরকার। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্তৃক এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠিতও হইয়াছিল মনে হইতেছে। তবে কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল জানি না। প্রদেশগুলি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিলেও বিভিন্ন প্রদেশের—বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের—পক্ষ হইতে যে কাজ হইতেছে তাহার ব্যাপক প্রচার ও আলোচনা আবশ্যক। ভারতীয় গঠন-পরিষদ বা গণপরিষদ এ সম্পর্কে যে সমিতির উপর কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন তাহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু কার্য্যের পূর্ণ পরিচয় এখনও প্রকাশিত বা প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই—এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনার আভাসও পাই নাই। অন্য প্রদেশের মধ্যেও কোন্‌টি কত দূর অগ্রসর হইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই। অথচ এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মনীষিগণের কৃত কার্য্যের বিবরণ যথাযথ প্রচারিত হইলে পরস্পরের কার্য্যে সহায়তা হয়—যথাসম্ভব ঐক্যপ্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়—একের প্রস্তাবিত সুন্দর গ্রহণযোগ্য শব্দের কথা না জানার জন্য নূতন শব্দ সংকলনের অনর্থক প্রয়াসের পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূল দৃষ্টি সাগ্রহে ও সনির্ব্বন্ধভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

বাঙালীর যখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও সংসারে আসন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে তখন আমাদের বার বার ও সবলে উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা সামান্য নই, বিশ্বে আমাদের অন্তত এমন একটি দান আছে যার গৌরবে ও গুরুত্বে আমাদের ইতিহাস চির গরীয়ান্ হয়ে থাকবে। হঠাৎ একটা মহা প্রলয়ে যদি বাঙালীর যা-কিছু সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কোন দিন, দূর ভবিষ্যতে যদি সে প্রলয়-সাগর-তীরে মন্থর কোন বংশধর—বাঙালীর বিস্মৃত পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করতে বসে, তখনো রবীন্দ্রনাথের অভ্রভেদী বিশালতা তার দৃষ্টি অতিক্রম করবে না। রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালী ছিলেন, অতএব বাঙালীর স্থান যে সভ্যতার ইতিহাসে সার্থক, সে কথা সে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করবে।

তার কারণ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি। যে-পৃথিবী তিনি রচনা করেছেন, যে-সৌরভ ও অনুভব তাতে সৃষ্ট ও বিকশিত হয়েছে তা বিশ্বমনের জন্য; বিশ্বমানবের প্রতিবিম্ব তাতে আছে। গত বৎসর ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী শহরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ-এশিয়া মহাসম্মেলনে, শুধু সমগ্র এশিয়ার নয়, বিশ্বের মহামানবতার ঐক্য-গাথার কবি রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করতেও বহু ভারতপ্রধান যখন কুণ্ঠা ও বিস্মৃতির পরিচয় দিয়েছিলেন তখন আমরা নিখিল-ভারত সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ থেকে এশিয়ার সাহিত্যিকদের যে সংবর্দ্ধনা করেছিলাম তাতে সেই বিদেশী সাহিত্যিকরাই বার বার বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথের কথা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করে-ছিলেন; তাঁর বাণী যে মানুষকে নূতন আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রত্যয়ের ভাষা দিয়েছে, ঐক্য ও মৈত্রীর গান শুনিয়েছে সে কথা স্বীকার করেছিলেন, এবং বর্ত্তমান লেখক সে সময় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁদের যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেজন্য তাঁরা ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।

"আমি পৃথিবীর কবি, সেকথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।"

পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানেই এ আক্ষেপ করেছেন, কিন্তু তাঁর বাঁশীর সুরে যদি সব সময় সাড়া না জেগে থাকে সে ত্রুটি পৃথিবীর ; পৃথিবীর কবির নয়। আমরা কবি-জগতে গৌরী-শৃঙ্গের ঠিক নীচেই এখন রয়েছি ; তাই তাঁর বিশালতা ও উচ্চতা বুঝতে পারার সময় আসে নি এখনো। হয়ত ১৪০০ সালের মানুষ সেই ভাবী কালের নববসন্ত-প্রভাতে অনুভব করবে আমাদের যুগের ও চিরযুগের এই কবির প্রভাব এবং তাঁর কাব্যের বিস্তার ও প্রসার। তবুও আমরা ত এমনি বুঝতে পারি।

"কতো যে প্রাতের আশা ও রাতের প্রীতি
কতো যে সুখের স্মৃতি ও দুখের গীতি"—

নব নব বিকাশ ও বৈচিত্র্য নিয়ে কারণে অকারণে সময়ে-অসময়ে চিত্তে দোলা দিয়ে যায়। বাঁশীর উচ্ছ্বাসে হাসির উল্লাসে বেদনায় ও সমবেদনায় বিচিত্র অনুভব জাগিয়ে তোলে বিশ্বমনের মধ্যে।

জীবনে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও সঙ্গীত তিনি এনে দিয়েছেন। "পুরস্কার" কবিতাটির অভাবগ্রস্ত কবি রাজসভায় গেয়েছিল যে ধরণীতে সে আর একটি সুর যোগ করে দিতে চায়, আর একটু সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে দিতে চায়। সে কথাই কবিরও মর্ম্মবাণী। পৃথিবীকে তিনি মায়াময় বলে ত্যাগ করেন নি ; কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতও লিপ্ত হয়ে থাকেন নি। অবজ্ঞা বা উপেক্ষার চোখে তিনি জীবনকে দেখেন নি। বন্ধনের মধ্যে মুক্তির, সংগ্রামের মধ্যে সমন্বয়ের সন্ধান তিনি করেছেন। প্রাচীর বৈরাগ্য ও প্রতীচীর অনুরাগ মিশ্রিত হয়েছে তাঁর কাব্যধারায় রাসায়নিকের প্রক্রিয়ায় নয়, রসস্রষ্টার প্রতিভায়। তাই তিনি বিশ্বনিখিলের কবি ; শুধু বাঙালীর বা ভারতবাসীর নয়।

তাই মর্ত্ত্যই কবির কাছে স্বর্গ ; মর্ত্ত্যই মহান্—মানবেরই অশ্রুজলে চিরশ্যামল, প্রীতিফুলে চিরসুরভিত। প্রেমধারা মানুষকে শুধু প্রিয় করে নি দেবতা করেছে। "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"— এই ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মর্ম্মকথা। মানুষকে এই মূল্যদান, দেবতাকে এই প্রীতিমাল্য-দান রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ তথ্য।

শুধু যে প্রিয় দেবতা হয়েছে তা নয়, সাধারণ মানুষ 'মানুষ' হয়েছে—বিশ্ববিধানে এটাও তো কম কথা নয় ; তারও যে জীবন সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পারে এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছেন। মানুষ তার সভ্যতাসৌধের ভিত্তি ও প্রাকার গড়ে তুলেছে মানুষকে সমষ্টিগত ভাবে বলি দিয়ে। ধনী শ্রমিককে শোষণ করেছে, রাজা প্রজাকে শাসনের নামে উৎপীড়ন করেছে। প্রতাপশালীর প্রতাপের আগুন জ্বলেছে দুর্ব্বলের রক্ত-আহুতিতে, রাষ্ট্র-স্বার্থের রথ চলেছে রজ্জুবদ্ধ প্রজার সম্মিলিত আকর্ষণে। এই সভ্যতার মধ্যে ক্ষমতা আছে মমতা নেই, আত্মম্ভরিতা আছে, কিন্তু আত্মা নেই। রক্তকরবীর রাজা যে যৌবনকে হত্যা করে, আনন্দকে নিঃশেষ করে নিজেই নিজের নিগড় গড়ে তুলেছে সে কথা বিশ্বকবি যত গভীর ভাবে বলেছেন বিশ্বব্যাপী যে দিবসের সরব ও প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যেও সে কথা তেমন ভাবে ফুটে উঠে না। "মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা" দিতে "শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা" ধ্বনিত করে তুলতে যিনি এরূপ সার্থক চেষ্টা করেছেন তিনি বিশ্বজনের কবি, তাই তিনি বিশ্বকবি।

রবীন্দ্রনাথের জগতে পাই মানব, অনুভবের প্রভাবে যে মহামানব হয়ে উঠেছে ; কিন্তু অতিমানব সেখানে নেই। তিনি মহাকবি, কিন্তু মহাকাব্য তিনি রচনা করেন নি, কারণ মহাকাব্যের অতিমানব পৃথিবীর কবির সৃষ্টিতে থাকার কথা নয়। দীনের জীবন মহত্তর, বৃহত্তর হবে, কিন্তু দীনতর বা অসুন্দর হয়ে প্রকাশিত হয় নি কখনও সে প্রচেষ্টার মধ্যে। যেখানে সমাজ ক্ষমাহীন, ধর্ম্মাচার দয়াহীন ও মানুষ উদাসীন সেখানে সাধারণ জীবনের সাধারণ কাজে ও কল্পনায়, চিন্তায় ও চেষ্টায় তিনি এনে দিয়েছেন সুকুমারতার আভা ও সার্থকতার আভাস। এই যে শ্যামল সুন্দর ধরণী—প্রিয়গৃহ ও গিরিপ্রান্তর, সাগর ও অরণ্যানী নিয়ে অপরূপ শোভায় প্রতিভাত হয়ে উঠেছে কাব্যে ও জীবনে, এই প্রকৃতি যদি নিজেই প্রধান হ'ত মানবকে বাদ দিয়ে তা হলে তা হ'ত প্রাণহীনা। এখানে যারা ছিল, যারা আছে ও যারা আসবে তাদের সকলেরই কবির জগতে সার্থক স্থান আছে। "পলাতকায়" বাইশ বছরের রোগিণী যখন প্রথম বসন্ত অনুভব করে, মরণ-পথের যাত্রিণী বিনু যখন বাইরের জগৎকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠে ও দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি দেখায়, 'শ্যামলী'র প্রণয়ভীতা প্রমিতা যখন দুঃসাহসে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে, তারা এই আমাদের গৃহকোণের সামান্য প্রাণী হলেও বিশ্বনিখিলের অধিবাসিনী। শ্যামল বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসে এরা পৃথিবীর প্রান্তরে স্থান পেয়েছে ; নিখিলের অনুভব এদের জন্য প্রতিভাত হয় কবির মানসদর্পণে। সেই জন্যই তিনি বিশ্বকবি।

শুধু প্রাণধারণ করলেই যে বাঁচা যায় না, শুধু প্রত্যহের দিন যাপনের গ্লানি ও ম্লানিমা, সংশয় এবং সংগ্রামের ঊর্দ্ধে ও অতীত ক্ষেত্রে যে এমন একটি জগৎ আছে যা আমাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন সে কথা যিনি আমাদের বুঝিয়েছেন তিনি বিশ্বের কবি। স্নেহলোলুপ অথচ বীরভাবময় বাল্য, অসীমের আহ্বানচঞ্চল কৈশোর, প্রেমের আনন্দবেদনারসে উচ্ছল যৌবন, বহুমুখী কর্ম্মসাধনার পথে পরিণত প্রৌঢ়ত্ব ও জীবনের চরম পরিণতি—এই সব স্তরেরই বিকাশ ও বিস্তার প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীতে। তারই প্রতিবিম্বে আমরা নিজেদের চিনতে পারি—

"সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে।"

জীবনে যে আশা ও আলো ছিল বলে মনে করি নি, তাকে এনে দিলে এই সাহিত্য। তাই বৈশাখের ভয়াবহ তাপের মধ্যে দেখি নটরাজের পিঙ্গল জটাজালময় ধূসর ভৈরব-মূর্ত্তি, বর্ষার নবমেঘভারে বিশ্বের সব বিরহীর শোক সঘন সঙ্গীতের ধারায় ঝরে পড়ে। কেউ বা তখন জীবনদেবতার অভাব অনুভব করে বলে

মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

সেই একই বর্ষণমুখর দিনে বিশ্ব থেকে ব্যক্তিতে যখন ফিরে আসি, গ্রামের পাশেই চাষাকে সোনার ধানের তরী বেয়ে চলে যেতে দেখি।

মানব থেকে মানসে এই পরিণতি, উভয় লোকের এই সমন্বয় ও সুসম্বদ্ধ আত্মীয়তা কাব্যকে দিয়েছে নূতন আত্মা, প্রেমকে দিয়েছে নবীন সত্তা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সংসারকে সুন্দরতর করে তাই দেখতে পাই, সাংসারিকতার মধ্যে থেকেও সংসারাতীত শালীনতা ও শোভনতা অনুভব করি। দেহের নিগড়ে গড়া গৃহের বনিতা তাই কল্পনার উদার মুক্তিতে বিশ্বের কবিতারূপে উদয় হয়, 'পরাণের সাথে ঝুলন খেলা' খেলে। তার বিয়োগে কবি এই প্রভাত এই পৃথিবী সব-কিছুকে বিলোপ করে দিয়ে নিজের চিত্ত দিয়ে তার কামনাকে ফুটাতে চেয়েছেন—"তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ"—এই অতীন্দ্রিয় আশ্বাস অনুভব করতে পেরেছেন। মিলনে যে একটি মূর্ত্তিতে আবদ্ধ, বিচ্ছেদে সে দগ্ধধূপগন্ধসম বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে চিরমিলনের আশ্বাস দেয়। এই ভাবেই বসন্তবিলাসের ধরা প্রেমের অমরাবতীর পথে পরম পরিণতি লাভ করে।

কিন্তু আগে সাধনা, পরে সিদ্ধি। প্রেমপূজায় দেহের আরাধনার পরেই তাতে দেহাতীতের আরোপ হয়। যৌবনের প্রথম আষাঢ়ের বাসনার মেঘে আবৃত এই আকাশ, তার ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য, নীলিমাম্লান গিরিশিখর কিন্তু—কামনার মৃৎপঙ্কের বহু বহু ঊর্দ্ধ্বের প্রতিচ্ছবি। সেই যুগ চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন মেঘকে সুখস্বপ্নের মতন পিছনে ফেলে, হৃদয়ের বাঁধ ভেঙে, নবনীপ ও কেতকীর গন্ধবিকল, নদীকলধ্বনিত বিপুল কল্পনার পৃথিবীতে আমাদের নিয়ে যায়। সে এক অপরূপ সুখসৌন্দর্য্যভোগ ঐশ্বর্য্যের চিত্রলেখা যা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু কাছে আসতে দেয় না, আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, কিন্তু নিবৃত্তি করে না।

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

এই আকুল ও অন্তহীন অন্বেষণ ক্রমে অরূপের সন্ধানে পরিণতি লাভ করল। প্রেম কখনও বলে—

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না

কখনও বলে—

নাই নাই কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।

কখনও প্রশ্ন করে—

হৃদয়ের ধন কভু ধরা দেয় দেহে?

প্রশ্ন ও প্রাপ্তি, আবাহন ও আবির্ভাবের মাঝখানে যে ব্যবধান তাকে কবি অতিক্রম করলেন বহু বিচিত্র ভাবধারা বিকাশের মধ্য দিয়ে। ক্রমে দেখি কোন্ সময় যে ইন্দ্রিয় অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করেছি তা লক্ষ্য করি নি। লীলাসঙ্গিনী লীন হয়ে গেছে মানস-আকাশের নীলিমায় এবং যে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ আছে তার প্রকাশ হচ্ছে এই বাণী রূপে—

দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি পরশ,
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ সুধারস।

এ ভাবেই কবি বিরহের ধরণীতেই মিলনের সরণী রচনা করেছেন; মুহূর্ত্তকে অনন্তে পরিণত করে দিয়েছেন। তাই মানব চির আশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে যে "এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল।" সবচেয়ে বড় কথা এই যে, মানসী যে অন্তরদেবতার মধ্যে লীন হয়ে যান, প্রেমের পরম পরিণতি যে অনন্ত পরমাত্মায়, সে বাণী নবীন করে আমরা পেয়েছি নূতনের আবেদনের মধ্য দিয়ে। তাই ত আমাদের মানসী প্রিয়া মর্ত্ত্যের মানবীর সসীমতা অতিক্রম করে সেই অসীমে স্থান লাভ করেছে যেখানে বাসনা নেই সাধনা আছে, আকুলতা নেই আত্মা আছে।

আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি যুগল মিলনস্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে।

এই উৎস যে পরমাত্মা সে কথা কবি কখনও ভাষায় প্রচার করেন নি, কিন্তু ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা বহু বিচিত্র ব্যঞ্জনায়।

বিরহী যখন ভাবে—

পাছে আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনে ফুটে।

অথবা যখন বাণবিদ্ধ বেদনাহত মূক হরিণের মত অনাসক্ত প্রিয়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুধু শুদ্ধ রাত্রিতে একটি চুম্বন রেখে চলে যায় প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ও উদার বৈরাগ্য অন্তরে বহন করে—

অথবা যখন আশ্বাস পায়—

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই,
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল,
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল—

তখন যে মিলনের আশ্বাস আমরা লাভ করি সে মিলন জীবনদেবতার সঙ্গে যাকে উদ্দেশ করে কবি নিবেদন করেছেন—

মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশী ফিরে তুমি পাও।

জীবন যখন অন্ধকার হয়ে আসে তখনি আমরা তাঁর কবিতার দীপশিখায় অন্তর উদ্ভাসিত করে দেখতে পাই, "কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।"

কিন্তু শুধু অতীন্দ্রিয় প্রেমাভিষেক বা আত্মার অমৃত নিষেকেই বিশ্বের প্রতি কবির বাণী নিবদ্ধ ছিল না। সত্য শিব ও সুন্দর এই তিনের সমন্বয়ে তাঁর আদর্শের পরিপূর্ণতা এসেছে; সুন্দরের প্রতি অনুরাগ সমাজে অসত্য বা অকল্যাণকে প্রশ্রয় দেয় নি। সাহিত্য ও শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করে কবি দেখেন নি। স্বজাতির সমাধির উপর ফুলবাগান রচনা কখনো তাঁর কাব্যে সম্ভব হ'ত না। বিশ্বের পক্ষে যা শিব তাই তিনি চেয়েছেন, জাতীয়তার পরিপূর্ণ অনুরাগী হয়েও আন্তর্জাতিকতাকে নবজীবন দান করতে চেয়েছেন। তিনি ত শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষের ছিলেন না। আমাদের সৌভাগ্য যে জন্মভূমি তাঁর ছিল এখানে; কিন্তু মনোভূমি তাঁর ছিল বিশ্বময়। নিখিল-মানস-স্বর্গ যিনি রচনা করেছেন তিনি পৃথিবীর কবি।

এই যে পৃথিবী কবি সৃষ্টি করে গেছেন সেখানে তার

—মনের নৃত্য কতবার জীবন মৃত্যুরে
এড়ায়ে চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।

সেখানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অক্ষয় দান ও অনন্ত প্রেরণা ভারতবর্ষের বৈশাখের তপ্ত তাম্র আকাশ ও শুষ্ক ধূসর প্রান্তর অতিক্রম করে শ্যামল সুন্দর এক বিশ্বসৃষ্টি করে নশ্বর মর্ত্যেই ভাস্বর অমরতা দান করে গেছে। কবির লোকান্তর হয়েছে যেমন ভাবে হয়ে থাকে আমাদের সকলের, কিন্তু তাঁর কবিতার আলোক চিরকাল অন্তরের গহনে চির উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখবে। পৃথিবীর কবির পৃথিবীতেই ত আমরা আছি।*

* জোড়াসাঁকো রবীন্দ্র-ভবনে নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন-অভিভাষণ।

স্বাধীনতার প্রতীক—প্রাচ্যে

স্বাধীনতার প্রতীক—প্রতীচ্যে

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

সমৃদ্ধ মার্কিন

সমৃদ্ধিতে আমেরিকা আজ শুধু অদ্বিতীয় নয়, অন্য যে-কোন দেশকে সে বহু পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে মাত্র ১৩টি রাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া একটি কন্‌ফেডারেশন গঠন করিয়াছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই নেতৃত্বে এই কন্‌ফেডারেশন ফেডারেশনে পরিণত হয়। তখন 'নূতন পৃথিবীতে' অল্পসংখ্যক শ্বেতকায় মানুষ পুরাতন লোকালয়ের বহুদূরে নিজেদের আবাস গণ্ডিতে মনোযোগ দেন। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান, আর আটলান্টিক রাষ্ট্রগুলি ছিল বাণিজ্যপ্রধান; কৃষি ছিল দাসপ্রথার উপর নির্ভরশীল।

স্থানীয় আদিম অধিবাসিগণ দাসরূপে আগন্তুক শ্বেতকায়গণের কৃষিকর্মে সহায়তা করিত। কৃষিস্বার্থ ও বাণিজ্যস্বার্থে শীঘ্রই সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ দেশ-বিভাগের দাবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এব্রাহাম লিঙ্কন তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট। তিনি দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার দাবি প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হইল। লিঙ্কন জয়ী হইলেন। লিঙ্কনের নেতৃত্বে আমেরিকা সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইয়া জাতীয় ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যুক্তরাষ্ট্র তখন স্ব-শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী। ক্রয় চুক্তি প্রভৃতি দ্বারা বহুদেশ এক এক করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূত হইয়া গেল। এইরূপে আজ ৪৮টি রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ইহা ছাড়া আলাস্কা, হাওয়াই প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলও তাহার শাসনাধীন। যদি রুশ-মার্কিনে কখনও যুদ্ধ হয় তবে সে যুদ্ধে আলাস্কা হইবে আমেরিকার একটি মূল্যবান ঘাঁটি। আলাস্কা আয়তনে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪ শত বর্গ মাইল। ১৯৪০ সালের আদমসুমারী অনুসারে এখানে ৭২,৫০০ লোকের বাস। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা মূল্যে আমেরিকা রুশিয়ার নিকট হইতে এই দেশটি ক্রয় করিয়াছিল।

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৩০ লক্ষ ২২ হাজার ৩ শত ৮৭ বর্গ মাইল, আলাস্কা, হাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চল ধরিলে ৩৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬ শত ৬০ বর্গ মাইল। ইহার লোক-সংখ্যা ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ২ শত ৭৫; উপরোক্ত অঞ্চলসমূহের লোকসংখ্যা ধরিলে ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ২১ হাজার ২ শত ৩১। ঐ অঞ্চলগুলির মধ্যে পুয়োর্টো রিকোর জন-সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার আর হাওয়াইয়ের জনসংখ্যা ৪ লক্ষ ২৩ হাজার।

রাষ্ট্রগুলির আয়তনের তারতম্য অনেক। ক্ষুদ্রতম নেভাডা রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাজার। বৃহত্তম নিউইয়র্ক রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার। জনবসতির গড়পড়তা হার প্রতিবর্গ মাইলে নেভাডায় ১, নিউইয়র্কে ২৮১°২, রোড দ্বীপে ৬৭৪°২, এবং সমগ্র দেশে ৪৪°২।

জনসংখ্যার শতকরা ৫৬°৫ শহরে এবং ৪৩°৬ গ্রামে বাস করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই অনুপাতের প্রভূত তারতম্য আছে। শহরবাসীর সংখ্যা রোড দ্বীপে শতকরা ৯১°৬, ম্যাসাচুসেট্‌স্ রাষ্ট্রে ৮৯°৪, নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে ৮২'৮ এবং সি সি সি পি রাষ্ট্রে মাত্র ১৯°৮।

সমগ্র দেশে ৩৪৬৪টি শহর। লক্ষাধিক লোকপূর্ণ শহরের সংখ্যা ১৯৯। ১০ লক্ষাধিক লোকপূর্ণ শহরের সংখ্যা ৫। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশে শ্বেতকায় জনসংখ্যার অনুপাত ছিল শতকরা ৮৬'৫, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ৮৯'৫-এ উঠিয়াছে।

পর্ব্বতসঙ্কুল ওয়াইয়োমিং রাষ্ট্রের চেই-এন্ শহরের উচ্চতা ৬১৪৪ ফুট। সমুদ্রতীরবর্ত্তী মায়ামী শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ২৫ ফুট উচ্চ।

নিউইয়র্কের তাপ জানুয়ারীতে ২৪' ডিগ্রী, জুলাইয়ে ৮২' ডিগ্রী। শীতে মায়ামীর দিনগুলি পরিষ্কার, তুষারপাতশূন্য। মায়ামীর শীত কলিকাতার শীতের মতই উপভোগ্য। মণ্টানা, মিনেসোটা প্রভৃতি অঞ্চলে শীতকালে তাপ শূন্যের ৪৯' ডিগ্রী নীচে পর্য্যন্ত নামিয়াছে, এবং ৫৫″ ইঞ্চি পর্য্যন্ত তুষারপাত হইয়াছে। গ্রীষ্মে তাপ আলাবামায় ১১৮° ডিগ্রী পর্য্যন্ত এবং মিনিয়াপলিসে ১০৮° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

দেশের শিল্প ও বাণিজ্য পূর্ব্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল কৃষিপ্রধান। কৃষিপ্রধান পশ্চিমে মজুরীর হার শিল্পপ্রধান পূর্ব্বাঞ্চলকেও হার মানাইয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলের টেনেসী প্রভৃতি স্থানের কৃষি নিম্নস্তরের।

এই বিশাল ও বিচিত্র দেশের কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদ অতুলনীয়। এই দেশবাসীদের সংগঠনশক্তি অসাধারণ। ফলে এখানকার কলকারখানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং বিরাট কোম্পানী-গুলি শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ীতে বা লিঙ্কনের গ্রামে যে সব যন্ত্রপাতি দেখা যায় তাহা খুব উন্নত যন্ত্রশক্তির ব্যবহারের পরিচয় দেয় না। তার পর ধীরে ধীরে আমেরিকা উন্নতির পথে চলিয়াছে। মনরো নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে পুরাতন পৃথিবীর আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে নিজেকে লিপ্ত করে নাই। ফলে তাহার উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। বিংশ

শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতে তাহার উন্নতির গতি বিস্ময়কর রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। যে দুইটি যুদ্ধ ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক প্রথা ভাঙিয়া দিয়া তাহার অর্থনৈতিক কাঠামোকে চূর্ণপ্রায় করিয়া দিয়াছে সেই উভয় যুদ্ধই আমেরিকার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে বিপুল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতে অদ্বিতীয় করিয়া তুলিয়াছে। আমেরিকার উন্নতি কোনরূপ ঔপনিবেশিক প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহার প্রতিষ্ঠা তাহার নিজস্ব কৃষি-শিল্প ও খনিজ সম্পদে। তাহার লোকবল ছিল কম। এখনও ভারতবর্ষের দ্বিগুণায়তন দেশে ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে। অতএব স্বতঃই সে যন্ত্রশক্তির সমধিক ব্যবহারে বাধ্য হইয়াছিল। আজ যন্ত্রশক্তিতে তাহার জুড়ি নাই। নব নব যন্ত্রের দ্রুত আবিষ্কারে তাহার সমকক্ষ নাই। যুদ্ধ দুইটিতে জড়িত হইয়া পড়ায় দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। সেই ধাক্কায় তাহার উৎপাদনশক্তি এত বাড়িয়া গেল যে যুদ্ধের মধ্যেই যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়াও সে জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিয়া তুলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের যে স্থায়ী উন্নতি হইয়াছিল, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যচক্রের মহাবেগে নিম্ন আবর্ত্তনে তাহা কথঞ্চিৎ ব্যাহত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তখন ডিমোক্রেটিক দলের নেতা রুজভেল্ট তাঁহার 'নিউ ডিল' অবলম্বনে বাণিজ্যচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এবারও নানা পথে বিপদ আসিতে পারে। যুদ্ধকালে জনসাধারণের হাতে যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা এখন দ্রুত বাজারে আসিয়া মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিয়া বিপদ আনিতে পারে। যুদ্ধকালে যে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নামিয়া আসিবার সময় বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। উৎপাদন-বৃদ্ধিতে বাধা হইলে বিপত্তির সৃষ্টি হইবে। জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান, উৎপাদনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে না পারিলেও বিপদ অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে এবারে হয়তো সমস্ত সঙ্কট এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে অনেকেই এরূপ আশা পোষণ করেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের "গ্রোস্ ন্যাশন্যাল প্রোডাক্ট" বা "সমগ্র জাতীয় উৎপাদনে"র মূল্য ছিল ৮৮'৬ বিলিয়ন ডলার; ১৯৪৫ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭'৩ বিলিয়ন ডলারে উঠিয়াছিল।(১) এত অল্প সময়ে এত বেশী বৃদ্ধি পূর্ব্বে লোকের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আমেরিকার বহির্বাণিজ্য তাহার স্বকীয় উৎপাদনের তুলনায় নগণ্য। কয়েক বৎসরের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(সংখ্যাগুলি সহস্র ডলারের)

	রপ্তানী	আমদানী	বিয়োগ ফল
১৯৩৯	৩,১৭৭,১৭৬	২,৩১৮,০৮১	+৮৫৯,০৯৫
১৯৪০	৪,০২১,১৪৬	২,৬২৫,৩৭৯	+১,৩৯৫,৭৬৭
১৯৪১	৫,১৪৭,১৫৪	৩,৩৪৫,০০৫	+১,৮০২,১৪৯
১৯৪২	৮,০৭৯,৫১৭	২,৭৪৪,৮৬২	+৫,৩৩৪,৬৫৫
১৯৪৩	১২,৯৬৪,৯০৬	৩,৩৮১,৩৪৯	+৯,৫৮৩,৫৫৭
১৯৪৪	১৪,২৫৮,৭০২	৩,৯১৯,২৭০	+১০,৩৩৯,৪৩২
১৯৪৫	৯,৮০৫,৮৭৫	৪,১৩৫,৯৪০	+৫,৬৬৯,৯৩৫

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার নিজস্ব উৎপাদন ছিল ১৭৯ বিলিয়ন ডলার, বিদেশ হইতে আমদানী মাত্র ৪ বিলিয়ন ডলার এবং বিদেশে রপ্তানী মাল ৯'৮ বিলিয়ন ডলার। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তি পরনিরপেক্ষ; এবং তাহার অর্থনৈতিক গঠন ইংলণ্ডের গত শতাব্দীর অর্থনৈতিক গঠন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

আমেরিকার বর্ত্তমান সমৃদ্ধির প্রধান প্রমাণ তাহার মজুরীর হারে এবং মজুরগণের দৈনিক শ্রমকালে। ১৯৪৫ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে কৃষি-মজুরীর মাসিক হার ছিল ১৮৬ ডলার বা ৬২০ টাকা।

শিল্প-মজুরীর সাপ্তাহিক হারের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৬'০৮ ডলার বা ১৫০ টাকার কিছু বেশী এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৪'৪১ ডলার বা ১৫০ টাকার কিছু কম। সাপ্তাহিক শ্রমকালের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৫'২ ঘণ্টা এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩'৪ ঘণ্টা। এত বেশী মজুরী এবং এত অল্প শ্রমকাল ইংলণ্ড রাশিয়া বা যে-কোন দেশে স্বপ্নেরও অগোচর। মজুরের স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে সে আমেরিকা।

সমস্ত পৃথিবীতে ডলারের দুষ্প্রাপ্যতার কারণও আমেরিকার অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে নিহিত। আমেরিকা দুনিয়ার নিকট খুব কম জিনিষই চায় বা পায়। অথচ দুনিয়া আমেরিকার কাছে চায় নানা প্রকারের মাল—এমন কি খাদ্যশস্য পর্য্যন্ত। কিন্তু তাহার বিনিময়ে আমেরিকার চাহিদামত তুল্য-মূল্য মাল সরবরাহ করিবার সামর্থ্য পৃথিবীর নাই। ডলারের দুষ্প্রাপ্যতা এই মৌলিক অসামঞ্জস্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমেরিকার মাল কিনিতে চাই ডলার। আমেরিকায় মাল বেচিতে না পারিলে ডলার পাওয়া যায় না। আমেরিকায় আমরা কম মালই বিক্রী করিতে পারিতেছি; কিন্তু কিনিতে চাহিতেছি তদপেক্ষা অনেক বেশী। কাজেই যত ডলার পাইতেছি তদপেক্ষা বহু বেশী ডলারের প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ফলে আমাদের নিকট ডলার দুর্লভ হইয়াছে। চাহিদার তুলনায় কম পাওয়া যাইতেছে বলিয়াই সব দেশে ডলার রেশনিং চলিতেছে। ডলারের

(১) টেব্‌ল নং ৩০২, ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অ্যাবস্‌ট্রাক্‌ট অব দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্, ১৯৪৬

দুষ্প্রাপ্যতা কমাইতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ খাদ্য বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইয়া আমেরিকা হইতে খাদ্যশস্য আমদানী বন্ধ করিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার বাজারে আমাদের মাল যাহাতে বেশী কাটে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমেরিকা বাহির হইতে যত মাল আমদানী করে তন্মধ্যে পাট-জাত দ্রব্যের স্থান বেশ উচ্চে। আমেরিকায় পাটজাত দ্রব্য বেচিয়া আমরা কম ডলার পাই না।

আমেরিকার সমৃদ্ধি-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে ডিমোক্রেসি ও ব্যক্তি-উদ্যোগের ভিত্তিতে। সাধারণ মানুষেরাই এই সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে। ষ্ট্যালিন বা হিটলারের মত কোন ডিক্টেটর তাহাদিগকে জবরদস্তি করিয়া একাজে লাগায় নাই। তাহারা নিজের স্বাধীন এবং সহজ বুদ্ধিতেই এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্য হইতেই উদ্যোগী পুরুষ-সিংহগণ আবির্ভূত হইয়া দেশে লক্ষ্মী আনিয়াছেন। ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যেই লোকে এখানে কাজ করে। অথচ লক্ষ্মী এখানে ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের করায়ত্ত হন নাই, ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন। ফলে এদেশের দীনতম মজুর মাসিক ৬০০ টাকা উপার্জ্জন করে এবং সপ্তাহে ৪০।৪৫ ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করে না। ডিক্টেটরশিপ ও দারিদ্র্যনিপীড়িত পৃথিবীতে আমেরিকা ডিমোক্রেসি ও স্বাধীন ব্যক্তি-উদ্যোগের আকাশচুম্বী বিজয়-নিশান স্বরূপ।

বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমেরিকায় ব্যক্তি-উদ্যোগের এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। আবর্ত্তমান বাণিজ্য-চক্রের প্রচণ্ড সঙ্ঘাতে ব্যক্তি-উদ্যমের কক্ষচ্যুত হইবার উপক্রম হয়। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তখন তাঁহার 'নিউ ডিল' নীতি অনুসারে বহুমুখী রাষ্ট্র-উদ্যমের আয়োজন করেন। এই নীতিতে রাষ্ট্র-উদ্যমকে ব্যক্তি-উদ্যমের প্রতিযোগীরূপে ব্যবহার করা হয় নাই—ক্ষণ-বিভ্রান্ত ব্যক্তি-উদ্যমকে গণ-তন্ত্রোচিত উপায়ে স্ব-মর্য্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

আমেরিকায় ব্যক্তি-উদ্যমের প্রসার দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। টেলিগ্রাফ লাইন পর্য্যন্ত এখানে কোম্পানীর হাতে। রাষ্ট্র ব্যক্তির ক্ষমতাকে অভিব্যক্ত করিবার জন্যই—ব্যক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য নয়। এখানকার ডাকবিভাগের খরচ স্বকীয় আয়ে নির্ব্বাহিত হয় না। ডাকমাশুল সস্তা করিয়া ব্যক্তি-উদ্যমকে সহায়তা করা সরকারের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য।

ডিমোক্রেসি সাধারণ মানুষের শক্তিতে আস্থাশীল। সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলে সাধারণ মানুষ সত্য ও মঙ্গলের পথই বাছিয়া লইবে। স্বাধীন উদ্যম এবং স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ এই অবস্থাগুলির মধ্যে প্রধান। যুক্তিদ্বারা অপরকে স্বমতে আনিবার অবাধ সুযোগ ডিমোক্রেসির অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সমস্ত বিষয়ে সুযোগ-সাম্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে চাই সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, পুস্তক প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে অবাধে মিলিত হইবার স্বাধীনতা, এবং স্বমত প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরঙ্কুশ বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা। গবর্ণমেণ্টকেও সমস্ত বিষয় যথাসম্ভব সাধারণের গোচরীভূত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। গোপনতা ও রহস্যসৃষ্টি ডিমোক্রেসিতে যথাসম্ভব পরিহার্য্য। এইরূপ স্বাধীনতা ও সুযোগ-সাম্যের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া জনসমুদ্র মন্থন করিতে পারিলেই কল্যাণ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে।

গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই ডিমোক্রেসি হয় না। সাধারণ মানুষকে নিগড়বদ্ধ করিয়া বা তাহাকে উপযুক্ত সুযোগ না দিয়া নির্ব্বাচন নিরর্থক। নির্ব্বাচনের পিছনে স্বাধীনতা ও সুযোগ-সাম্য থাকা চাই। তদ্রূপ মেজরিটি শাসনও ডিক্টেটরি শাসন হইতে পারে, যদি মাইনরিটির কখনও মেজরিটি হইবার সম্ভাবনা বা সুযোগ না থাকে। ডিমোক্রেসির আসন এই সমস্ত নাম ও রূপের মধ্যে নয়। নাম ও রূপের বহু পিছনে ডিমোক্রেসির সন্ধান করিতে হইবে।

মেজরিটির আনুকূল্য লাভ করিলেও পেসিস্ট্রেটাস্-এর গবর্ন্মেণ্টকে কেহ ডিমোক্রেসি বলে নাই। সিজারের শক্তি নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং রিপাবলিকান্ গবর্ণমেণ্ট রূপে প্রকাশিত হইলেও তাঁহার গবর্ণমেণ্ট ডিমোক্রেসি নামের অযোগ্য ছিল। ষ্টালিন বা হিটলারের গবর্ণমেণ্টের কদাপি ভোটের অভাব হয় নাই। অবিভক্ত বঙ্গে মুস্লিম লীগ গবর্ণ-মেণ্টেরও ভোটের অভাব হয় নাই। তথাপি ইহারা কেহই ডিমোক্রেসি নয়। ইহারা সকলেই ডিমোক্রেসির ছদ্মবেশে ডিক্টেটরশিপ।

সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধিতে আস্থা ডিমোক্রেসির প্রথম প্রতিজ্ঞা। ডিমোক্রেসির দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা—মানুষ যুক্তিবাদী এবং তৃতীয় প্রতিজ্ঞা—মানুষ পরস্পর সদিচ্ছাপরায়ণ ও সহযোগিতা-মূলক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। সামাজিক জীবনের মধ্যে নানা প্রকার বিরোধ নিহিত আছে। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের সংঘাত সেখানে উপস্থিত হইবেই। ডিমোক্রেসির বিশ্বাস এই সমস্ত বিরোধের উভয় দিক বুঝিবার মত বুদ্ধি সাধারণ মানুষের আছে এবং তাহারা পরস্পরের প্রতি এইরূপ সদিচ্ছাপরায়ণ ও সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন যে অপর পক্ষের স্বার্থ বুঝিয়া একটি গ্রহণযোগ্য আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হইবার মত সুবুদ্ধিও তাহাদের আছে।

আলোচনা দ্বারা মীমাংসায় পৌঁছিবার ক্ষমতা আমেরিকা-বাসিগণের স্বভাবসিদ্ধ। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে যেখানেই আইন প্রণয়নে দুইটি স্বতন্ত্র সভার ঐকমত্য প্রয়োজন সেখানেই দেখা যাইবে যে, অন্ততঃ টাকাকড়ির বিষয়ে একটি সভাকে

সম্পূর্ণ ক্ষমতাশূন্য করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের লর্ড সভার এ বিষয়ে প্রায় কিছুই ক্ষমতা নাই। এরূপ ব্যবস্থার কারণ এই যে সভা দুইটি আলোচনা দ্বারা সর্বদা ঐকমত্যে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এবং টাকাপয়সাঘটিত প্রস্তাব ঐক-মত্যের অভাবে গৃহীত না হইলে রাষ্ট্রব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। আমেরিকায় কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এখানে হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভ ও কংগ্রেসের সর্ববিষয়ে তুল্য শক্তি—বাজেট, ট্যাক্স প্রভৃতি সমস্ত জরুরী বিষয়ে আলোচনা দ্বারা প্রতি বৎসর ঐকমত্যে উপনীত হওয়া ইহাদের নিকট এখন পর্য্যন্ত অসম্ভব হয় নাই। আমি অবাক হইয়া সবাইকে প্রশ্ন করিয়াছি—"ইহা কিরূপে সম্ভব হয়।" সহজভাবে জবাব আসিয়াছে "কোনরূপে হইয়া যায়।"

শ্রমিক-বিরোধও এখানে আলোচনাদ্বারা মীমাংসা হয়। যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে সবাই অভ্যস্ত। শ্রমিকগণ এখানে যন্ত্রব্যবহারের বিরোধিতা করে না। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ নিয়মিতরূপে অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদদের নিযুক্ত করিয়া উৎপাদনের অগ্রগতির হিসাব রাখে এবং বর্দ্ধিত উৎপাদনের ন্যায্য অংশ দাবী করে। ধর্মঘট করার স্বাধীনতা সকল শ্রমিকেরই আছে। আলোচনাদ্বারা যাহাতে যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা হয় তাহার অনুকূল অবস্থার পোষণ করাই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনযাত্রার মানও বাড়িয়া চলে।

আইন-আদালত যুক্তিদ্বারা বিরোধ মীমাংসারই একটি উপায়। এইজন্য গণতান্ত্রিক দেশ মাত্রেই আইন-আদালতের বিশেষ প্রাধান্য।

পারস্পরিক সদিচ্ছা ও যুক্তিপ্রবণতা ইহাদের জীবনযাত্রার সর্বত্র সুপরিস্ফুট। ডিমোক্রেসি ইহাদিগকে আলোচনাপরায়ণ করিয়াছে; আলোচনাপরায়ণতা ইহাদিগকে যুক্তিপ্রবণ করি-য়াছে এবং যুক্তিপ্রবণতা ইহাদিগকে প্রত্যেকটি বিষয়ের সুনিপুণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে উদ্যোগী করিয়াছে। ইহাদের উন্নতির মূলে এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি। কাজ সম্বন্ধে ইহাদের ঢাক-ঢাক গুড়গুড় ভাব নাই। প্রত্যেকটি কাজ ইহারা এরূপভাবে নিষ্পন্ন করিবে যে তাহার সম্পাদন-চাতুর্য্য এবং ফলোৎকর্ষ সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ না থাকে। সরকার তাঁহার কার্য্যাবলী ও সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অনাবশ্যক গোপনতা অবলম্বন করেন না—সরকারের সমস্যা জনসাধারণেরই সমস্যা। তাহার সমাধান চিন্তায় সকলেরই তুল্য অধিকার।

এদেশে সুযোগ-সমতা অতুলনীয়। ন্যূনতম শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক ব্যবস্থা সকলেরই করায়ত্ত। দীনতম মার্কিন শ্রমিক যে আয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী তাহা অন্য দেশের শ্রমিকদের আশাতীত। সাধারণ সামাজিক ব্যবহারে ছোট বড় ভেদ নাই। প্রভু ভৃত্যের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় একত্র বসিয়া আহার করেন।

মনুষ্যজাতির পাঁচ-ছয় হাজার বৎসরের ইতিহাস প্রায় ডিক্টেটরশিপেরই ইতিহাস। পৃথিবীতে ডিক্টেটরশিপ নানা সময়ে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; নানা মতবাদের উপর স্বীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, ফ্যাসি-বাদ, কম্যুনিজম প্রভৃতি ডিক্টেটরশিপের রূপভেদ মাত্র। ইহাদের মধ্যে কেহ নির্জ্জলা শক্তিবাদের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কেহ ঈশ্বরদত্ত অধিকার দাবি করিয়াছে; কেহ সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রাদর্শের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বলি দিয়াছে, আবার কেহ বা ইতিহাসের অনিবার্য্য স্রোতোবেগের মুখে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ভাসাইয়া দিয়াছে।

সাধারণ মানুষে অনাস্থা ডিক্টেটরশিপ মাত্রেরই প্রথম প্রতিজ্ঞা। ইহারা সকলেই অতিমানবে বিশ্বাসী। সাধারণ মানুষ ভ্রান্তবুদ্ধি। অতিমানবের বুদ্ধি অভ্রান্ত। অতএব সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করিবার অধিকার তাঁহার জন্মগত।

ডিক্টেটরশিপ মাত্রই শক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তিবাদে ইহাদের আস্থা নাই। সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধি ভ্রান্ত। যুক্তিদ্বারা তাহাদিগকে কাজ করান সব সময় সম্ভব নয়। অতএব নিয়ন্ত্রণ ও জবরদস্তির বিশেষ প্রয়োজন।

কম্যুনিষ্টদের মতে শক্তিবাদী ডিক্টেটরশিপ আরও দুইটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি শ্রেণীবিদ্বেষ, অপরটি ইতিহাসের এক অনিবার্য্য গতির ধারণা। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম অনিবার্য্য। শ্রেণী প্রধানতঃ দুইটি; শোষক ও শোষিত। এই সংগ্রামে পরিণামে শোষিতের জয় সুনিশ্চিত। ইতিহাসের গতি এই সুনিশ্চিত পরিণামের দিকে দুর্ব্বার বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই দুর্ব্বার গতি ডিক্টেটর বা মহানায়করূপে আমাদের সমক্ষে প্রকট। তাহার কাছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই; ব্যক্তি এই দুর্ব্বার নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র।

ডিমোক্রেসি ও কম্যুনিজম আদর্শ হিসাবে সম্পূর্ণ বিরোধী। ডিমোক্রেসি সাধারণ মানুষে আস্থাবান ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠ। কম্যুনিজম সাধারণ মানুষে আস্থাহীন ও শক্তিপ্রতিষ্ঠ। ডিমো-ক্রেসি বলিতেছেন সংসারের ভিত্তি প্রেমে। পারস্পরিক সদিচ্ছাই মনুষ্য-সমাজের বিশেষত্ব। সদিচ্ছাপ্রণোদিত আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিরোধী স্বার্থসমূহ বা বিরোধী ভাব-সমূহ মীমাংসায় উপনীত হয়। এক মীমাংসা হইতে অন্য মীমাংসায় সংক্রমণ দ্বারাই ইতিহাসের অগ্রগতি সূচিত হয়। কম্যুনিষ্ট বলিতেছেন শোষক ও শোষিত লইয়াই সমাজ। হিংসা ও বিদ্বেষেই এই সমাজের প্রতিষ্ঠা। যুক্তি এখানে অচল। মীমাংসা এখানে অসম্ভব। সংগ্রাম সর্বত্র ধূমায়িত। দুর্ব্বার নিয়তি তোমাকে এই সংগ্রামে লিপ্ত

করিবেই এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে লইয়া যাইবে। শোষক ও শোষিতের সংগ্রামে শোষিতের জয় অনিবার্য্য। তাহাদের মধ্যে যে সংগ্রাম সর্ব্বত্র প্রধূমিত অবস্থায় বর্ত্তমান, তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়া উদ্দীপ্ত করিতে পারিলেই শোষিতের জয় অনিবার্য্য। সংগ্রাম হইতে সংগ্রামান্তরে গমনই ইতিহাসের অগ্রগতি সূচনা করে।

ডিমোক্রেসির একটি অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন। যখন মানুষের ন্যূনতম আর্থিক প্রয়োজন সহজেই মিটিয়া যায় এবং মোটামুটি সুযোগ-সমতাও বিদ্যমান থাকে তখনই মানুষ সাধারণতঃ সদিচ্ছাপরায়ণ ও যুক্তিপ্রবণ হয়। যাহার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নাই এবং সংস্থান করিবার সুযোগও নাই তাহার বিদ্বেষপ্রবণ ও যুক্তিবিমুখ হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই ডিমোক্রেসির জন্য কথঞ্চিৎ আর্থিক সমৃদ্ধি অবশ্যপ্রয়োজনীয়। দারিদ্র্য কম্যুনিজমের প্রসূতি। বণ্টন-ব্যবস্থায় অসমতা বেশী দূর গড়াইলে শ্রেণীবিদ্বেষ দেখা দেয়। তখন উৎপাদন কমিয়া যায়। উৎপাদন কমিয়া গেলে ভাগ লইয়া টানাটানি আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপে বিদ্বেষ হইতে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্য হইতে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। তখন সাধারণ মানুষকে তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ঐক্যতাবদ্ধ ও সদিচ্ছাপরায়ণ রাখা দুরূহ হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় গণতন্ত্রোচিত মনোবৃত্তিসমূহ লোপ পায়। দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ সহজেই ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ইহাই ডিক্টেটরশিপের আবির্ভাবের চিরন্তন কারণ।

আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেই আজ সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চতম এবং স্বাধীনতা সর্ব্বতোমুখী। কাজেই ফলদ্বারা বিচারে ডিমোক্রেসির শ্রেষ্ঠতা সুপরিস্ফুট। কিন্তু শুধু শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ডিমোক্রেসি আপনা আপনি আসিবে না, বা আসিলেও টিকিয়া থাকিবে না।

ডিমোক্রেসিকে জীয়াইয়া রাখিতে হইলে সাধারণ মানুষকে বিদ্বেষমুক্ত ও যুক্তিপ্রবণ রাখিতে হইবে। তজ্জন্য চাই ন্যূনতম সমৃদ্ধি ও সুযোগ-সমতা। যদি আমরা এবিষয়ে কৃতকার্য্য না হই, আমাদের ডিমোক্রেসি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বজায় রাখিতে বিফল হইব। বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রেম ও সদিচ্ছার সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্ব-স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। তবেই দারিদ্র্য দূর হইবে; ডিমোক্রেসি ও স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় এ কাজের দুরূহতার প্রমাণ মিলিবে।

মানুষ স্বরূপতঃ অনন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্যময়। ব্যবহারে মানুষের অশেষ দোষ। স্বরূপই যদি তাহার আসল পরিচয় হয় তবে একথা অবশ্যই মানিতে হইবে যে পরিণামে ডিমোক্রেসিই মঙ্গলকর। কিন্তু স্বরূপ বা তত্ত্ব লইয়া তো লোক-ব্যবহার চলে না। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান চলিতে পারে কিন্তু সমব্যবহার তো চলিতে পারে না। অতএব যদিও ডিমোক্রেসি মানুষের স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত তথাপি ব্যবহারিক জগতে মানুষের দোষ-গুলির নিয়ন্ত্রণের যথোচিত ব্যবস্থা ডিমোক্রেসিকে করিতে হইবে। আবার ব্যবহারের দ্বারা যদি স্বরূপই ব্যাহত হইয়া যায় তবে ফল অবশ্যই অশুভ হইবে, কাজেই স্বরূপকে ব্যাহত না করিয়া তাহার দোষরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

ডিক্টেটরশিপ মানুষের দোষগুলির উপরই নিবদ্ধদৃষ্টি হওয়ায় স্বরূপকে বিকৃত করিয়া দেখে। বস্তুতঃ তাহা মানুষের প্রকৃত স্বরূপে অবিশ্বাসী।

তত্ত্ব এবং ব্যবহারের সামঞ্জস্যবিধানের উপরই ডিমোক্রেসির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তত্ত্ব ও ব্যবহারের নব নব সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে হইবে। তবেই তো ডিমোক্রেসি টিকিবে। অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেই নূতন অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হইবে, নূতন সমস্যার উদয় হইবে। এই সমস্যার সমাধান করিয়া নূতন সামঞ্জস্যে উপনীত হইতে হইবে। ইতিহাসে সমস্যার সমাধান নাই, রূপান্তর মাত্র আছে। সমস্যার রূপান্তরের মধ্য দিয়াই ইতিহাস অগ্রসর হইতেছে। আর এই অগ্রগতিতে মানুষের একমাত্র সহায় তাহার বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি।
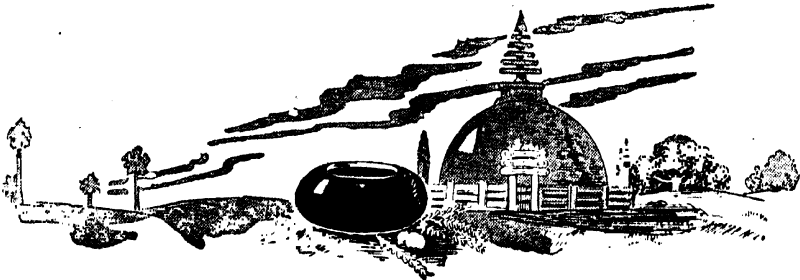
নতুন মানুষদের কাহিনী নয়

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার পকেট বার কয়েক হাতড়াল সুমন্ত। আধপোড়া একটা সিগারেট যে ছিল, গেল কোথায়? কে নিলে? হঠাৎ মনে পড়ল, প্রতুল সেদিন বলছিল, বলাই নাকি গোল্লায় গেছে। গোল্লায় যাওয়া মানে অনেক কিছু; সিগারেট টানাও তার মধ্যে আসে। এই ভেবে সে সটান ওকে ধরল।

—এই, আমার পকেটে একটা সিগারেট ছিল, নিয়েছিস তুই?

স্পষ্টই বললে বলাই—হাঁ।

রাগে ফেটে পড়ল সুমন্ত—হারামজাদা, উল্লুক ছেলে, এ সব কবে থেকে সুরু করেছ?

—গাল দিও না বলছি। ভারি তো একটা সিগারেট, তাও আবার পোড়া!

—বেশ করব দোব, একশ বার দোব।

—ভদ্রলোকের ছেলে, ভদ্রলোকের মত কথা বল।

সুমন্ত চেঁচিয়ে উঠল,—বেরো বাড়ী থেকে, বেরো।

—বেরুব না। তোমার বাড়ী নাকি!

মা ছুটে এলেন—তোরা থামবি না কি? দুই ভায়ে রোজ ছোটলোকের মত ঝগড়া। কে বলবে এটা ভদ্দর লোকের বাড়ী।

সুমন্ত বললে—ওই রাস্কেলটাই তো প্রথম ঝগড়া সুরু করলে।

—রাস্কেল বোলো না বলছি বড়দা।

—না বলবে না। আদর দিয়ে তুমিই ওর মাথাটা খেয়েছ, মা।

—'খেয়েছি, বেশ করেছি।' মা বললেন—'তুই এখন যাবি কিনা এখান থেকে।'

—আমার কি, আমি যাচ্ছি। তোমরা দু'জনে মিলে যা ইচ্ছে কর।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সোজা রাস্তায়। রাগ হয়েছে ওর বলাই ইডিয়েটটার ওপর। এই বয়স থেকে সে ওসব নেশা করতে শিখেছে বলে নয়, সিগারেটটা মেরে দিয়েছে বলে। যে যাই নেশা করুক, তার তাতে কি? হোক না সে যতই আপনার লোক। নেশা কর আপত্তি নেই। তবে যে যার গাঁট খসিয়ে কর। সিগারেটটা দামী, ক'ল দুটো কিনেছিল। বাজে সিগারেট খেয়ে মুখ মরে গেছে। রেখে দিয়েছিল অর্দ্ধেকটা। আজ সুখে টানবে বলে রেখেছিল। হতভাগা বলাইটার ঠিক চোখ পড়েছে।

পানের দোকানটার দিকে তাকাল। ব্যাটা বড় চালাক হয়ে গেছে। আর ধার দেয় না। তা ওরই বা দোষ কি। ধার দিলে ধার বেড়েই চলে। পুরনো ধার শোধ হবার কোনই আশা নেই দেখেই না ও নতুন ধার দেওয়া বন্ধ করেছে। তা বেশ করেছে। সুমন্ত পকেটে হাত দিয়ে একটা ষষা সিকি পেলে। দোকানটার সামনে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। নাঃ, রোজ আর পয়সা দিয়ে নেশা করা চলে না।

হনহন করে দোকান পেরিয়ে গেল। অন্ধকার, ভিজে ঘর। দরজার ফাঁক দিয়ে দিয়ে উঁকি মারল সুমন্ত। বিলাস এক কোণে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে।

—কি কবি, কি করছ?

—কিছু নয়, কিছু নয়। এই যে এস।

—কি অত তন্ময় হয়ে ভাবছিলে?

—কিছু নয়, আচ্ছা বল তো রাতারাতি কি করে বড়-লোক হওয়া যায়? আচ্ছা মনে কর, কেউ যদি আমার নামে লাখ দু'য়েক টাকা উইল করে যায়।

—কে ক'রবে?

—এই ধর যে কেউ।

—তার আপনার লোক থাকতে তোমাকে কেন দিয়ে যাবে শুনি?

—ধর, তার তিন কুলে কেউ নেই।

—তবে সে কোনো ভাল কাজে দান করে যাবে।

—'তা বটে।' বিলাস ঘাড় হেলাল।—'আচ্ছা মনে কর, এখানে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ যদি সোনার খনি আবিষ্কার করি।'

হাসল সুমন্ত।—'খুঁড়ে দেখেছ নাকি কোন দিন?'

—দেখলে হয়, কি বল?

—তুমি দেখছি টাকা টাকা করে পাগলই হয়ে যাবে। এখন একটা সিগারেট খাওয়াও দেখি।

—সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি। বিড়ি দিতে পারি।

—ছেড়ে দিয়েছ! কবে থেকে?

—এই দিন কয়েক হ'ল।

—তাই দাও। কিন্তু কবি, বিড়ি! স্বপ্ন থেকে একেবারে নেমে এলে বাস্তবে।

ভাতের থালার সামনে বসে বলাই ডাকলে—মা।

—কি রে?

—রোজ রোজ খাওয়ার এ কি ছিরি হচ্ছে!

জবাব দিলে বাপ—'যা পাচ্ছিস খেতে হয় খা, না হয়

উঠে যা।'…একটু থেমে—'নবাবের জন্তে নবাবী খানা আসবে কোথেকে শুনি?'

সুমন্ত নিবিষ্টমনে খাচ্ছিল। বললে—তোমরাই ত নবাব করে তুলেছ ওকে।

বলাই ভারিক্বী চালে বললে, 'রোজ এমনি যা-তা খাওয়া যায় নাকি! এই এক ভাত আর চচ্চড়ি। তুমি কি বলে এসব খাওয়াও বাবা! ছেলেদের ভাল খাইয়ে মানুষ করা তোমার মরাল ডিউটি।'—বাপ চেঁচিয়ে উঠল: 'শূয়ার ছেলে, ফাজলামি করতে হবে না। ভাল খেতে হয়, গাঁটের পয়সা খরচ কর। বাপের হোটেলে নবাবী চলবে না।'

সুমন্ত না হেসে পারল না।

আমার এক বন্ধুর হোটেল আছে। সেখানেই খাব কাল থেকে।—বলাই বললে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইখানেই যা। দূর হ'।

ভাত খেয়ে আঁচাতে আঁচাতে বললে—নিশ্চয়ই যাব। এখানে আধ-পেটা আর অখাদ্য খেয়ে মরব নাকি!

রাণী বললে—সত্যি ঠাকুর পো, রাগ করে চলে যেও না।

—'যাবে কোথায় শুনি?' বাপ বলে উঠল—'কোন চুলোতেই কারুর জায়গা হবে না। সব মিয়াকেই এখানে ফিরে আসতে হবে। ওসব লম্বা-চওড়া বুলি আমার জানা আছে। ওর সেই হোটেলওয়ালা বন্ধু কেমন মাগনা পাত সাজিয়ে খেতে দেয় দেখি!…'

কবির কাছ থেকে কতকগুলো বিড়ি পকেটে পুরেছিল সুমন্ত। ঘরে বসে তারই একটা টানতে থাকে। বিড়িতে নেমে মন্দ করে নি কবি।

একটু পরে রাণী ঘরে এল। বললে—একটা কথা বলব।

—নিশ্চয়ই বলবে।

—এমনি করে কত দিন বসে থাকবে!

—যত দিন পারা যায়।

—রোজ মা-বাবা গাল দেন। সেটা কি খুব ভাল?

সুমন্ত বললে—বাপমায়ের গালাগাল না খেয়ে কোন্ ছেলে বড় হয়েছে বল।

—তুমি আর বড় হবে কি, বড় তুমি অনেক দিনই হয়ে গেছ।

—তা যা বলেছ। হাসল সুমন্ত।

—পুরুষমানুষ হয়ে ঘরে বসে থাকতে তোমার লজ্জা করে না?—আমি তো তোমার জন্তে লজ্জায় মরে যাই।

—সে তো মরবেই। কেননা লজ্জা সখী, রমণী-ভূষণ।

—ঘরে বসে থাক, নানা লোকে নিন্দে করে।

—কেন? দোষটা কি করলাম? কারুর বাড়ীতে সিন্দুক ভাঙি নি, কারুর মেয়ের দিকে কুনজরে তাকাই নি।

—কিছু বলতেই তোমার আটকায় না দেখছি!

—না, আটকায় না। লোক ভাবে আমার কথা, আমি ভাবি তোমার কথা—আর তুমি ভাব লোকের কথা।

রাণী বললে—ভাব তুমি আমার কথা?

—নিশ্চয়ই। তোমায় আমি খুব ভালবাসি। আর যেই বিয়ে করুক তোমায়, আমার মত এত ভালবাসতে পারবে না। আমি বেকার বলে তুমি আমায় ততটা ভালবাস না। দুঃখ কেন তোমার, আমি বেকার বলে? কবি বিলাস কি বলে জান, 'বেকারস্ আর দি মেকার্স অব নেশ্যন'।

ওকে দু'হাতে একটু উঁচুতে তুলে ধরল সুমন্ত।

—এই ছাড় ছাড়। বাবা মা দেখে ফেলবেন যে!

—বাবা-মা দেখুন, ভাই দেখুক, পাড়ার লোকেরা দেখুক। দেখুক না, তোমার ভয় কি!…

সতীনাথ পেনসন্ পান সত্তর টাকা। সত্তর টাকায় এই বাজারে সংসার চালানো অসম্ভব ব্যাপার। দুটো ছেলে—দুটোই বেকার। কিছুই তারা করে না। তবে ঘরে বসে থাকে না। দিনরাত্র বাইরে ঘোরে। কি যে করে সতীনাথ জানেন না, তবে টাকাকড়ি যে উপায় করে না তা নিঃসংশয়ে জানেন। সতীনাথের ঘাড়ে বিরাট সংসার, অভাবে-অনটনে মাথা ঠিক থাকে না। একটা ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছেন। ভাবতে ভাবতে মাথা তাঁর গরম হয়ে ওঠে। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যান। গৃহে শান্তি নেই। দিনরাত চীৎকার, কলহ। সব সময় অশান্তির আগুন জ্বলছে।…

সোজা বলে দিলেন সতীনাথ—সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, আমি আর ঘরে বসিয়ে ষাঁড় পুষতে পারব না। যে যার খেটে খাও।

বলাই বলে উঠল—ভারি তো পুষছো! দু'বেলা চাট্টি তো খেতে দাও। তাও যা দাও, তা বলবার নয়।

—যাই হোক, তাও আজ থেকে বন্ধ।

—দিও না, চায় কে!

—তবে রে উল্লুক, এত বড় কথা! বেরো বেরো এখুনি। …লাল হয়ে ওঠে সতীনাথের মুখ-চোখ।

—থাম। আর কিছু পার না, শুধু গাঁক গাঁক করে চেঁচাতেই শিখেছ।

থেমেই যান সতীনাথ। ইচ্ছে হয়, এমন জোরে ওর গালে এক চড় মারেন যে আর কোন দিন উঠে দাঁড়িয়ে কথা না বলতে পারে। কিন্তু পারেন না।

সাতে পাঁচে নেই সুমন্ত। কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে না। কেউ ঝগড়া বাধালেও চুপ করে থাকে। তা তার দোষ থাকুক আর না থাকুক। চেঁচামেচি করতে ওর ভাল লাগে না। বাড়ীতে সব সময় চেঁচায় সবাই। তাই ঘরে ওর মন টেকে না।

বাড়ীওয়ালা রাস্তায় ধরে।—দিব্যি গা-ঢাকা দিয়ে আছ বাবাজী। যখনই যাই, বাড়ী নেই। বাপ যেমন ধড়িবাজ শয়তান ছেলেগুলোও ঠিক তেমনি হয়েছে।

—বাপ তুলো না বলছি।

—আলবৎ তুলব। একশো বার তুলব। বাপ কেন, বাপের বাপ তুলব।

সুমন্ত হাসল : তা তোলো। তবে তাতে লাভ এই হবে যে ভাড়া পাবার সম্ভাবনার যেটুকু ছিটেফোঁটা ছিল, তাও হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

বাড়ীওয়ালা একটু যেন নরম হ'ল। : ও, তবে ভাড়া দেবে ঠিক করেছিলে নাকি!

—পাগল! ও এমনি কথার কথা বললাম।

—পুরো পাঁচটা মাস তো বিনা ভাড়ায় কাটালে। কত দিন আর এভাবে চালাবে!

—যত দিন পারি।

—মানে!

—এর আর মানে নেই।

—ওসব চালাকি ঢের হয়েছে। শোন, আজ বলে যাচ্ছি, কাল সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ী খালি করা চাই।

—ক্ষেপেছো! যাদের পাঁচ মাসেও নড়াতে পারলে না, এক দিনে তারা নড়বে কি করে!

—তার মানে বলতে চাও, ভাড়া কোনদিনই দেবে না!

—টাকা থাকলে কি আর দিই না।

—টাকা না থাকে, বাড়ী ছেড়ে দাও।

—তার পর?

—তারপর যেখানে যাও, আমার কি!

—বাঃ, বেশ বললে যা হোক! টাকা নেই বলে বাড়ীতে থাকা হবে না!…

বাড়ীওয়ালার অবাঞ্ছিত সঙ্গ যত তাড়াতাড়ি পারল ত্যাগ করলে। পানের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। বিড়ি টেনে মুখ নষ্ট হয়ে গেছে। বললে : দুটো পাসিং দাও তো…

—নগদ পয়সা ছাড়ুন। ধার চলবে না।

—অমন বেয়াড়া কথা বল কেন? সখ করে নেশা করব তার জন্তেও পয়সা! এই নাও। একটা আনি অনেক খুঁজে ধার করে নিজের মান রাখল সুমন্ত।

বিলাস ঘরের মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে। সুমন্ত ডাকল : কবি, কি খবর?

—আচ্ছা হঠাৎ যদি লাখখানেক টাকা পাই, কি করে খরচ করা যায় বল তো? বাড়ী আর গাড়ী তো হবেই।

—পাবার আশা আছে নাকি?

—নিশ্চয়ই।

—'পাব' 'পাব' রোজই শুনছি। তুমি আর পেয়েছ কবি!

—লাখ না হোক, আধ লাখই যদি পাই।

—দেখো লাখ থেকে শেষ পর্য্যন্ত হাজারে নেমো না। শোনো, বিড়িটিড়ি তো খাওয়াও। সিগারেট দুটো ঝট করে কিনে ফেললাম। থাক, অসময়ে কাজ দেবে।

—বিড়ি নেই, ছেড়ে দিয়েছি।

—সে কি! এবার দেখছি কোন্ দিন ভাত ছাড়বে কবি। নাঃ কবি, তোমার স্বপ্ন দেখা বৃথাই গেল।

—'নাঃ, কিছু টাকাকড়ি উপায়ের চেষ্টা দেখতে হবে। ট্যাঁক খালি রেখে আর তো দিন চলে না।'—ভাবতে থাকে সুমন্ত।—'লেখাপড়া কেন যে শিখেছিল ছোটবেলায়! এতগুলো আপিস রয়েছে, যে-কোন একটাতে স্থায়ীভাবে ঢুকে পড়া গেল না এত দিনে। গেল মাসে সেই কারখানায় কাজ করে তিরিশ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তারপর ওরাই তাড়িয়ে দিলে। ওখানে একবার ঢুঁ মারলে মন্দ হয় না। নাঃ, থাক। লোহা-লক্কড় নিয়ে ঠোকাঠুকি, ওসব কি আর ভদ্রলোকের ছেলের পোষায়! গোকুল সেদিন বলছিল, ওদের আপিসের সামনে নতুন একটা কোম্পানী খুলেছে। সেখানকার শেয়ার বিক্রিতে মোটা কমিশন দেয় নাকি। একবার দেখলে হয়।—গালে হাত বুলালে সুমন্ত। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। কামানো বিশেষ দরকার। তিনটে আনা গচ্ছা হবে। হোক গে।…

রাণী কেমন যেন হয়ে গেছে আজকাল। হয়েছে অনেক দিন থেকেই। চোখে পড়ে নি সুমন্তর। কথা কয় না, হাসে না। গায়ের সেই উজ্জ্বল রং ম্লান হয়ে গেছে। কানায় কানায় ভরা উচ্ছল যৌবন অকালেই রিক্তপ্রায়। চোখের কোলে পড়েছে কালি। দেহে ছেঁড়া, ময়লা শাড়ী।—সুমন্তর ভাবনার স্রোত চলেছে অবাধ গতিতে—কেন এমন হ'ল! পরে নিজেই হেসে ওঠে। এই অভাব আর হাহাকারের সংসারে ও যে এতদিন বেঁচে আছে, এইটেই আশ্চর্য্য!

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে সুমন্ত বলে : এখানে তোমার বড় কষ্ট না, রাণী?

—কষ্ট কেন? কে বললে?

—আমি জানি।

—ইস্, ভারি আমার গনৎকার এসেছেন!

—তুমি আর হাস না, সব সময় চুপ করে থাক।

—কি যে বল! হাসবার আর হৈ হল্লা করবার বয়েস আর আছে নাকি!

সুমন্ত আস্তে আস্তে বললে : সত্যিই কি সে বয়েস তুমি হারিয়েছ রাণী?

রাণী কি বলবে ভেবে পায় না।

—রোজ দেখি ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে থাক। ভাল কাপড় পর না কেন?

হাসল রাণী। বা রে, ঘরে কেউ বুঝি ভাল কাপড়-জামা পরে থাকে!

—থাকলে ত পরবে!

—আছে গো আছে, অনেক আছে।

—ঘোড়ার ডিম আছে!

প্রতিবাদের ভাষা পায় না রাণী। বলে: তোমারও তো ময়লা ছেঁড়া কাপড়।

—আমার কথা তোমায় ভাবতে হবে না।

—আমার কথাও তোমার ভাববার দরকার নেই।

—কে ভাবছে কে? বয়ে গেছে ভাবতে! তুমি ময়লা ছেঁড়া কাপড় পর, না খেয়ে শুকিয়ে মর কার কি!

কিন্তু সত্যিই কি কিছু নয় সুমন্তর?…

অনেকদিন আগে বিশ্বনাথের কাছ থেকে কুড়িটা টাকা ধার করেছিল সুমন্ত। ফিরে পাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে, বাজারে সবার সামনে বিশ্বনাথকে যা মুখে এল তাই বলে অপমান করলে। কুতূহলীদের ভিড় জমে গেল।

হেসে বললে সুমন্ত: এতদিন ধরে এই জিনিষটাই শিখলে বিশ্বনাথ!

—টাকা ধার করে শোধ না দিলে এমনি গালই দিতে হয়।

—তোমার টাকা ফেরত দেবার মত অবস্থা আমাদের নেই।

—তবে ধার নিয়েছিলে কেন?

—ভীষণ দরকার পড়েছিল।

—বেশ তো, এখন শোধ দাও।

হেসে জানায় সুমন্ত—শোধ দেবার মত অবস্থা থাকলে কি কেউ কখনও ধার নেয়।

রাগে গজরাতে লাগল বিশ্বনাথ,—জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ!

ভিড়ের মধ্যে বলাইও ছিল। সহ্য করতে পারল না। ছুটে গিয়ে ওর নাকে মারল সজোরে এক ঘুষি। বিশ্বনাথ ছিটকে পড়ল মাটিতে আচমকা আঘাত পেয়ে। নাক দিয়ে রক্ত ছুটল। সবাই হৈ হৈ রৈ রৈ করে উঠল।

—এই বলাই রাস্কেল, এ কি করলি!

বলাই চেঁচিয়ে উঠল—তুমি থাম বড়দা। ঠিকই করেছি! ও শুয়ারকে মেরেই ফেলব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় মারতে শিখেছিস! চল শিগ্‌গীর এখান থেকে চল। এক রকম জোর করে টানতে টানতেই সুমন্ত ওকে ভিড়ের মাঝখান থেকে বার করে আনল।

—মারলি কেন?

—না মারবে না! যা তা বলে অপমান করবে।

—বেশ করবে।

—আমিও বেশ করেছি, মেরেছি। সেই কখন থেকে যা-তা বলে যাচ্ছে, আর তুমি চুপ করে শুনে যাচ্ছ। একটু লজ্জাও করল না তোমার!

—লজ্জা করে করব কি? টাকা তো শোধ দিতে পারব না।

—তাই বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপমান হবে।

—তা ছাড়া উপায় কি? মারলেই কি অপমান বন্ধ হবে?

—ও সব তুমি সহ্য করতে পার বড়দা, আমি পারব না।

মুখ ভেংচে উঠল সুমন্ত—না পারবেন না! না পারবি তো কেন গরীব হয়ে জন্মেছিলি?…

নগরীর চোখে ঘুম নেমেছে। সঙ্কীর্ণ ছোট্ট গলিটায় নিব নিব আলো। হোটেলটার এক কোণে ক'জন গোল হয়ে বসে তাস পেটা সুরু করেছে। মুখ তাদের নির্ব্বাক, চোখে হিংস্র লোলুপতা। বিড়ির কড়া ধোঁয়া পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। বলাইকে এদের মাঝে দেখা গেল। পকেটে একটা সিকি ছিল, তারই ভরসায় এগিয়ে এল। কেউ কেউ ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

মোটা মতন একজন শুধাল—কত সঙ্গে আছে?

—যাই থাক। তোমার কি দরকার তাতে?

বলাই উঠে দাঁড়িয়ে টাকাগুলো গুণে নিলে। চব্বিশ টাকা দশ আনা। সিকির বদলে হাতে এল। মন্দ কি!

একজন বলে উঠল—এরই মধ্যে চললে? এই তো সবে সন্ধ্যে হ'ল। আর খেলবে না?

—না।

—ও আর কি নিয়ে চললে! নিয়েই যদি যেতে হয়, কম করে একশো নিয়ে যাও।

বলাই কোন জবাব না দিয়ে এগুলো। পার হ'ল গলিটা। ভীষণ খিদে পেয়েছে। খেতে হলে মোড়ের মাথার ওই বড় হোটেলটাতেই ঢুকতে হয়। হোটেলে ঢুকে গোগ্রাসে গিলে চলল। অনেক খাবার—ভাল খাবার, দামী খাবার। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল বৌদির কথা। বৌদি না খেয়ে আছে। বৌদি কি খায়, কখন খায় সে জানে না। উপোসই বোধ হয় করে রোজ। কেউ তো আর দেখতে যায় না। বাড়ীর সবার খাওয়া হলে বৌদি খায়। সকলের খাবার পর হাঁড়িতে কিছু কি পড়ে থাকে।

একটা ঠোঙায় রকমারি মিষ্টি প্রচুর কিনে বলাই বাড়ী ফিরল। বন্ধ দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিলে।

—কে?

—আমি, বৌদি।

রাণী দরজা খুলে দিয়ে বললে—কোথায় ছিলে এত রাত অবধি ঠাকুরপো?

—এই এমনি ঘুরছিলাম। তোমার জন্তে কি এনেছি দেখ।

—কি? কি আছে এতে?

—খুলেই দেখ না।

—ওরে, এ যে অনেক খাবার, এ কি হবে?

বলাই বললে—তুমি খাবে।

—এ···তো! তা ছাড়া এই তো ভাত খেয়ে উঠলাম। পেট একদম ভর্তি।

—তা হোক। এত ভাল খাবার তো তুমি খেতে পাও না।

—তোমরাও যেন কত পাচ্ছ!

বলাই জবাব দিতে না পেরে চুপ করে থাকে।

রাণী ডাকল—ঠাকুরপো।

কি?

এত খাবার কোত্থেকে পেলে?

বলাই হাসল—পাব আর কোত্থেকে! কিনলাম।

—টাকা পেলে কোত্থেকে?

—পেলাম।

—জুয়া খেলেছ বুঝি?

বলাই চুপ করে রইল। সুমন্ত এতক্ষণ চুপ করে এক কোণে শুয়েছিল। বলে উঠল—যা করে পাক তোমার তাতে কি বল তো? তোমায় খেতে দিচ্ছে, খেয়ে নাও।

সুমন্তর কথায় কান দিলে না রাণী। ওকে বললে—তোমায় না আমি জুয়া খেলতে বারণ করেছিলাম! তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে ঠাকুরপো, আর কোন দিন খেলবে না!

বলাই বললে—সত্যি। কিন্তু বৌদি অনেক চেষ্টা করে দেখলাম এ ছাড়া টাকা রোজগারের আমার আর কোন পথ নেই। ভাল কাজ করে টাকা উপায় আমা দ্বারা হবে না।

সুমন্ত বললে—পুরুষ মানুষ টাকা রোজগার করেছে। তা যা করেই হোক। চুরি ক'রে বা জুয়ো খেলে তা নিয়ে এত চুলচেরা বিচার কেন?

চেঁচিয়ে উঠল রাণী—তুমি থাম। নিজে তো নীচে নেমেছ, ওকে আর নামিও না। এ সব বলতে লজ্জাও করে না!

হাসল সুমন্ত। তুমিই বল রাণী, চোরের মুখে কি শোভা পায় ধর্মের কাহিনী।

রাণী বলাইকে বললে—খাবার আমি খাব না, ঠাকুরপো! তুমি নিয়ে যাও।

—কেন?

জবাব নেই রাণীর।

—ইস্ খাবে না! না খাবে তো বয়ে গেল! তেজ দেখ! আমরাই খাব, দে তো বলাই। গরীবের আবার তেজ কি!

—না। বলাই খাবারের ঠোঙাটা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়।—তোমাদের কারুরই ভাল করতে নেই।

সুমন্ত কিছুক্ষণ প্রাণ ভরে হাসল। অন্ধকারে এক কোণে রাণী আচ্ছন্নের মত বসে। কেউ দেখতে পেলে না, ওর কাল দুটো চোখে জল টল্‌টল্ করছে।···

মাসের শেষ সপ্তাহ। রেশন আনতে হবে। হাতে একটাও টাকা নেই সতীনাথের। বাক্স হাতড়ালেন, এদিক-ওদিক খুঁজলেন। কোথাও নেই কিছু। রাণীকে বললেন, তোমার কাছে কিছু টাকা হবে বৌমা?

—না তো।

—তাই তো। আজ রেশন আনার দিন।

স্বামীকে বললে রাণী, তোমার কাছে টাকা আছে? দাও তো আমায় কিছু।

—কেন কি হবে?

—দরকার আছে।

সুমন্ত জোরে হেসে উঠল।—টাকা চাইছ আমার কাছ থেকে? হায় নারী, এখনও পতি-দেবতাকে চিনলে না!

রাণী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, টাকা না দিতে পার, একটা কাজ করতে পারবে?

—টাকা দেওয়া ছাড়া আর সব কিছুই পারব।

—বেশ।—দু' হাতে দুটো সোনার চুড়ি ছিল। সে দুটো খুলে ওকে দিলে।—এই নাও।

—এ কি হবে?

—এ দুটো জমা রেখে আমায় অন্তত: দশটা টাকা এনে দাও।

—এ তো সোজা কাজ। কিন্তু টাকার তোমার কি এমন জরুরী দরকার শুনি?

—টাকা না আনলে এই হপ্তা উপোস করে থাকতে হবে।

—উপোস করতে তোমার তো বেশ অভ্যাস আছে।

—ছি ছি, আমি আমার নিজের জন্তে বলছি নাকি!

চুড়ি দুটো হাতে নিয়ে সুমন্ত রাস্তায় নামল। মন্দ নয় চুড়ি দুটো। বিয়েরই সময় রাণী পেয়েছিল। বনর কয়েক সে দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। অনেক ময়লা জমেছে। কেমন যেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে ম্লান হয়ে গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে সোজা প্রতুলের বাড়ী হাজির। প্রতুল ডাক্তার, বড়লোক।

—কি রে, কি ব্যাপার? আজকাল যে বড় আসিস্ না?

—চাইতে আর ভাল লাগে না। কাঁহাতক আর হাত পাতা যায় বল? এবার তাই দিতে এলাম।

চুড়ি দুটো ওর দিকে এগিয়ে দিল সুমন্ত।

—এ কি, এ কার চুড়ি? বউয়ের বুঝি?

—হুঁ।

—ছিনিয়ে এনেছিস নাকি ?

—না। ও নিজেই দিলে। এগুলো রেখে দশটা টাকা দে দিকি। অন্ত কোথাও বাঁধা রাখতে পারলাম না।

—কেন ?

—কনসান্সে বড় বাধলো রে।

—হুঁ। হাসল প্রতুল।—কিছু ইম্প্রুভমেণ্ট হয়েছে দেখছি! মনিব্যাগ থেকে দশ টাকার ছুটো নোট বার করল।—এই নে।

—থ্যাংক্‌স্। চুড়িটা রাখ্।

—পাগলামি করিস নে। বাড়ী যা।

বাড়ীর পথেই পা বাড়াল সুমন্ত, কিন্তু বাড়ী গেল না। কুড়ি টাকা পকেটে রয়েছে। একসঙ্গে কুড়িটা টাকা কদাচিৎ তার পকেটে থাকে। এখন সে যা যা খুশী করতে পারে। কিন্তু টাকা নিয়ে যা খুশী সে করল না। দোকান থেকে খুব ভাল দেখে একটা শাড়ী কিনল। বেশ মানাবে এ শাড়ী রাণীকে। কত দিন ও ভাল শাড়ী পরে নি কে জানে! এ শাড়ীতে তাকে চমৎকার দেখাবে। দেখাবে ঠিক রাণীরই মত। রাণী সত্যিই ছিল রাণী। সেই তো তাকে ভিখারিণী করেছে।

বাড়ী ঢুকতেই রাণী শুধাল—টাকা এনেছ ?

—আমার কাছে এস। হাত ছুটো দেখি।

—কেন ?

—এস তো।

কাছে আসতেই ওর ছু' হাতে চুড়ি ছুটো পরিয়ে দিল।

—এ কি, চুড়ি ফিরিয়ে আনলে কেন ? টাকা কই ?

—টাকা আনি নি।

—পাও নি বুঝি ?

—পেয়েছিলাম। টাকা দিয়ে শাড়ী এনেছি। দেখতো কি সুন্দর শাড়ী! কেমন তোমায় মানাবে!

—এ কেন আনলে! এ তো আমি চাই নি।

সুমন্ত বললে, চাও নি বলেই তো আনলাম। মেয়েরা নিজের জন্তে কখনই যে কিছু চায় না। ওই তো মেয়েদের দোষ।

—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ? এতো টাকা খরচ করে এই দামী শাড়ী কিনতে বলেছিল কে ?

—কেউ বলে নি। তোমায় আজ রাণীর বেশে সাজাব, তাই আনলাম।

—খুব কাজই করেছো! এদিকে একটা হপ্তা যে উপোস করতে হবে, তা ভেবে দেখছো ?

—না খেয়ে থাকা আমাদের জীবনে নতুন নয়। এমনি উপোস করার দিন প্রায়ই আসে। কিন্তু আজ হঠাৎ এই যে মনের কোণে রং লাগল, একি আর কোন দিন ঠিক এমনি করে লাগবে!

—সত্যিই তোমার মাথা খারাপ হয়েছে আজ!

রাগে ঘর ছাড়ল রাণী।

আবছা অন্ধকার ঘরে রাণী নির্ব্বাক হ'য়ে বসেছিল। বলাই আস্তে ডাকল—বৌদি।

—কে, ঠাকুরপো ? রাণীর যেন তন্দ্রা ভাঙে।—একি তোমার চেহারা হয়েছে! কোথা থেকে আসছ ?

বলাই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, কোথাও তো যাই নি। এই নাও, ধর।

—কি ?

—নাও তো।

এক গাদা নোট মুঠো ক'রে ওর দিকে এগিয়ে দিল। রাণী ভীত, কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল—এ কি, এত টাকা কোত্থেকে আনলে ? সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতের দিকে চোখ পড়তে রাণী শিউরে উঠল। থেঁৎলে গেছে হাতের আঙুলগুলো। টস্ টস্ করে রক্ত পড়ছে হাত বেয়ে। ও আর্ত্তনাদ করে উঠল—এ…এ তোমার কি হয়েছে ঠাকুরপো!

—ও কিছু নয়, হাসল বলাই।—পালাতে গিয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিলাম বৌদি। পুলিসের জুতোটা একেবারে হাতের উপর এসে পড়ল। কি ভারি জুতো, নীচে লোহা লাগানো।

তাই তো…

সতীনাথ কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করে নি একবারও। সাড়া পেয়ে ছু'জনেই চমকে উঠল।

—দেখি টাকাগুলো। গুনতে গুনতে বললেন, এ যে অনেক টাকা রে! তারপর বলাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস! পালা শিগ্‌গীর। নিজে তো যা করবার করেছিস, বাড়ীসুদ্ধ সবাইকে কাঁসাতে চাস নাকি! পালা পালা।

রাত্রির অন্ধকারে ও ঘর ছাড়ল।…

'কে কাঁদে ?' সুমন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।—'রাণী।'

—আঃ, চুপ কর।

রাণী থামে না।

—আঃ, আচ্ছা এক ছিঁচকাঁছুনে মেয়ে নিয়ে পড়া গেছে।

তবু কান্না ওর থামে কই ? ওই ছেলেটা, যাকে এরা সবাই অনাদরে, অপরাধের বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিয়ে এই গভীর রাত্রে ঘরে ঠাঁই দিল না তার জন্তে ঘরের মেয়ের বুক কি ভাঙবে না। তারাই যে ঘর বাঁধে, ভালবাসে, স্নেহমমতা দিয়ে প্রিয়জনকে ঘিরে রাখে ?

সুমন্ত ওর কাছে এগিয়ে এল। আস্তে আস্তে বললে, পাগল এত বড় হলে এও জান না, আমাদের কাঁদতে নেই! কাঁদা আমাদের পাপ।

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

জীবনময় রায়

(জনমনের খোলা কথা)

[বামপন্থীদের জন্যে এ প্রবন্ধ লেখা হয় নি। তাদের মনোভাবের সঙ্গে আমার প্রবন্ধের আন্তরিক কোন যোগ নাই। পণ্ডিত জবাহরলালের সততা ও কৃতিত্ব বিশ্ববিদিত। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি দুরূহ সমস্যায় তাঁর রাজনীতি প্রয়োগপদ্ধতি, তাঁর শান্ত, দৃঢ়, আত্মশক্তিতে আস্থাবান মনের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচক্ষণতা প্রমাণ করে।

আমি ভারতের জনসাধারণের যে মনোভাব ব্যক্ত করেছি, সে জনসাধারণ জবাহরলালের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন জনসাধারণ এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনে তাঁর নায়কত্বের উপর তারা নির্ভর ও আশাশীল।

প্রবন্ধটিকে এই মনোভাব নিয়েই পড়তে হবে।]

ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা পেয়েছে এ ধারণা ভারতবাসীর মনে ঠিকমত শিকড় নিতে পারে নি। ৬০ বছর ধরে এই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে আসমুদ্রহিমাচল সমস্ত ভারত। কংগ্রেসের পত্তন থেকে সুরু করে কংগ্রেসের নায়কেরা এবং তাঁদেরই ভাবে প্রভাবিত নরনারী বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে চেয়েছে ব্রিটিশবর্জ্জিত স্বাধীনতা আর প্রকাশ্যে চেয়েছে—আরো চাকরি দাও, আরো সুবিধা দাও, দেশের শাসনে তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে দাও—অর্থাৎ যতটুকু আবদার করলে ব্রিটিশ প্রভুরা সেটাকে বেয়াদবি বলে মনে করবেন না, ততটুকু। ইংরেজের কামানের সামনে দাঁড়িয়ে তখনও "ভারত ছাড়ো" বলে হুঙ্কার দেবার হিম্মৎ হয় নি তাঁদের। কিন্তু আজ যখন বহু যুগের প্রতীক্ষিত সেই সাধনার ধন ধরে এল তখন তাকে দেখে আমরা চিনতে পারছি না। কেন? ভারতবাসী কি এতই অসাড়, এত বিচারজ্ঞানহীন? প্রকৃত স্বাধীনতার বিদ্যুৎপ্রবাহ কি তাদের ধমনীতে চেতনা আনতে পারে না? যদি আনত তবে 'দুশমনের' (Satanic Government শব্দটি স্মরণ করুন) কবলমুক্ত ভারতবর্ষে দুশমনির বাড় বৃদ্ধি এত কেন? তবে কি ভারতবর্ষ আসলে 'দুশমনে'র কবল মুক্ত হয় নি? প্রচ্ছন্ন ভাবে তারা কি সর্ব্বঘটে বিরাজ ক'রে ভারতের সর্ব্বনাশ সাধনে নিযুক্ত আছে? তা নইলে, মুক্ত ভারতের জনগণের যে ছবি যে স্বপ্ন দেখিয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জনতাকে নায়কেরা, ধন-প্রাণ সুখ-শান্তি তুচ্ছ করতে আহ্বান করেছিলেন, সে ছবি আজ তারা দেখতে পাচ্ছে না, কেন? তবে কি নায়কেরা দুশমনের সঙ্গে রফা করে একটা মেকী স্বাধীনতা হাত পেতে নিয়েছেন? এবং তাকেই কি গলার জোরে সকল নায়কে মিলে প্রজাসাধারণের কাছে "স্বাধীনতা, স্বাধীনতা" বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছেন? নইলে এত সাধের স্বাধীনতা ধন এত প্রতীক্ষার পর লাভ ক'রেও আজ তারা স্বাধীনতার সেই স্বাস্থ্যকর প্রাণবান চেতনা পাচ্ছে না কেন?

আর সে প্রতীক্ষা এবং চেষ্টা কি এক দিনের? রামমোহন রায়ের মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ সুপ্ত ভারতের অন্তরে এসে আঘাত করেছে। সে মুক্তি দিকে দিকে দিনে দিনে আত্মপ্রকাশ করেছে মানুষের জীবনের সর্ব্ববিধ বন্ধন ছেদন করে ভারতবাসীকে মুক্তি-প্রয়াসী হবার শিক্ষা দিতে—বহু যুগের অন্ধকার কারাগার ভেঙে—সংস্কারে, ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ভাষায়, চরিত্রে, শিক্ষায়, মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্ব্বক্ষেত্রে। এক দিকে বহুশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জড়তা এবং অন্য দিকে সেই দাসত্ব-প্রসূত নব-উজ্জীবনের প্রতি ভয়, সন্দেহ, বিরুদ্ধতা, স্বার্থ পদে পদে সেই মহামুক্তির আন্দোলনকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু পারে নি। ধীরে ধীরে ভারতবাসীর মন জেগে উঠেছে সেই মুক্তির আহ্বানে। ক্রমে তীব্রতর হয়েছে তাদের অন্তঃকরণে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?" পরাধীনতার অপমান বহন করে, নিশ্চিন্ত নিরাপদে, শান্তিপূর্ণ আরামে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করার ঘৃণ্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে, একদিন দুর্দ্ধর্ষ বিদেশী দানবের বিরুদ্ধে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিশ্চিত মৃত্যুর আহবে—পরমানন্দে, নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। "আমি ধন্য হব মায়ের জন্য ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে।" এ কথা কোনো দিনই তারা মনে করে নি যে তারা সামান্য কয় জনে কয়েকটা বোমা ছুঁড়ে ব্রিটিশকে ভারত ছাড়া করবে। ব্রিটিশের প্রসাদভোজী ভীরু বুদ্ধিমান দল তাঁদের চায়ের আসরে নিরাপদে বসে সে দিন একে "ছেলে মানুষি" বলে বাঁকা হাসি হেসেছিল। নির্ব্বোধেরা এ কথা সে দিন ভাবে নি যে এই বীর-ভঙ্গী সুধু প্রবলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে "মানি না তোমাকে" বলবার নৈতিক বলের ভঙ্গী; দেশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার জন্যেই তারা প্রাণ উৎসর্গ করেছিল। সেই নির্ভয় দল যে আগুন জ্বেলেছিল, দেশের প্রাণে সে আগুন নেবে নি। ক্রমেই সে আগুন প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশের পূর্ণ মুক্তি লাভ করতে চাইলে, প্রাণটা যে তুচ্ছ করতে হয়, এ প্রেরণায় দেশের যুব শক্তি জেগে উঠেছে। আজ দেখতে পাচ্ছি, দেশের জনতার সঙ্গে সঙ্গে সেই 'বাঁকা-হাসি'র দলও ওদের "শহীদ" বলার জন্যে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। কালের কুটিল গতি!

কামান-বন্দুক-মাইন-রণপোত-বোমা-বোমযানে সুসজ্জিত

ইংরেজকে ভারত ছাড়াবার নূতন শিল্পকলা আবিষ্কার করলেন ও শেখালেন মহাত্মা গান্ধী।

১ম—কংগ্রেসের আন্দোলনকে শিক্ষিত মুষ্টিমেয়ের অভিজাত মঞ্চ থেকে বঞ্চিত জনতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার শিল্প। "দেশের জনতাই প্রকৃত দেশ; তারা স্বাধীনতা দাবি করতে না শিখলে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না; ভারতবর্ষ জন সাধারণের; দেশের অল্প কয়েক জন মানুষের হাতে শাসনভার গেলেই দেশ স্বাধীন হ'ল না। স্বাধীনতা আনবে জনতা, স্বাধীনতা গড়বে জনতা, স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখবে জনতা। তাদের বঞ্চিত করলে, দেশের ত্রাণ নাই।"

"ভাগ করে খেতে হবে সবাকার সাথে অন্নপান।"

"সেই নিয়ে নেমে এসো নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।"

কবি এ কথা অনেক আগেই গেয়েছেন। সাধক তাকে কাজে রূপান্তরিত করার শিল্পকলা শিক্ষা দিলেন।

২য় শিল্পকলা—অহিংসা। প্রচুর মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচুরতর মারণাস্ত্র সংগ্রহ ক'রে, কোন পরাধীন দেশের পক্ষে ব্রিটিশের মত কোনও দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে জয় করা অসম্ভব। অতএব বিনা অস্ত্রে, নির্ভয়ে মৃত্যুপণ করে, প্রবলের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াও অহিংস অসহযোগ ক'রে। সেই দুর্জ্জয় সাহস মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলো, সম্পূর্ণ অপ্রমত্ত অনুত্তেজিত অবস্থাতেও যে সাহস মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করতে পারে; বলতে পারে, 'সির দিয়া, সর্ নাহি দিয়া।'—প্রাণ দিয়েছি, ধর্ম্ম দিই নি। বলতে পারে, 'মানি না তোমার পশু-শক্তিকে, আমাকে মারতে পারো—মানাতে পারো না।' বড় দুর্জ্জয় সেই মৃত্যুশঙ্কাশূন্য বীরত্ব। ভীরু পরপদাশ্রয়ী মানুষ এমন সাহসের কথা কল্পনা করতে পারলে না। আবার নিরাপদ আরামীর দল বাঁকা হাসি হাসলে। কেউ বললে, তা কি করে হবে? লড়াই না করে কি ওদের তাড়ানো যাবে? চটে গেল তারা গান্ধীজীর উপর। "তুলসীর মালা নিয়ে উনি হিমালয়ে চলে যান।" "এই বোষ্টোমী করেই দেশটা নপুংসক হয়ে গেল।" বললে, কিন্তু 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই খামচি মারেঙ্গা'র দল কোন উপায় বাৎলাতে পারলে না—কি করে ব্রিটিশ ষাঁড়কে ভারতছাড়া করবে। আবার তার চেয়েও বুদ্ধিমান্ কেউ কেউ বললে, "ও অহিংসা লড়াই করে মরার ভয়ে।" কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নিজস্ব মৃত্যুশঙ্কাপরিশূন্য বীর্য্য ও প্রেম ধীরে ধীরে জনতার মধ্যে, দেশের যুবকদলের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। সম্ভব হয়ে উঠল, যা অসম্ভব। দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ভয়ে শান্তমুখে বারংবার ব্রিটিশের গুলির মুখে এগিয়ে গেল। শিক্ষিত অশিক্ষিত ভারতের জনতার পবিত্র শোণিতে দেশ প্রাণের ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। লোকে মার খেতে খেতে মরে গেল, জেলে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার হাসিমুখে সয়ে প্রাণ দিলে, সঙ্কল্পে স্থির থেকে মেসিনগানের সামনে বুক পেতে দিলে। সমস্ত দেশের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কল্পস্রোতের মত বইতে লাগল। এক দিন লাহোর কংগ্রেসে বীর জবাহরলাল যে পূর্ণ স্বাধীনতা পণ করেছিলেন, বছরের পর বছর সেই পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার যুদ্ধ চলতে লাগল।

তার পর পৃথিবী জোড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে উপস্থিত হ'ল—ইংরেজের সঙ্গে জার্ম্মানীর স্বার্থ বিরোধে। একজন সাম্রাজ্যবাদী, আর একজন ফ্যাসিষ্ট। ইংরেজ ভারতবাসীকে এসে বললে, গত যুদ্ধের মত এস আমার জন্যে লড়, আমাকে বাঁচাও—তোমাদের স্বাধীনতা দেব। কংগ্রেস উত্তর দিলে যে গত যুদ্ধেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার স্বরূপ আমাদের জানতে বাকী নেই। ভারতবাসী ধনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে বাঁচালে আর তুমি তার প্রতিদানে দিলে জালিয়ানওলাবাগ। বেশ, এবারেও তোমাকে বাঁচাতে আমরা রাজি আছি, কিন্তু আগে স্বাধীনতা চাই। হাত পা বাঁধা নিয়ে আমরা ইচ্ছামত লড়তে পারি না। এখন লড়তে গেলে তোমাদের ইচ্ছা এবং আবশ্যক মত আমাদের দিয়ে লড়িয়ে শুধু আমাদের প্রাণ বের করে দেবে; তাতে তোমরা বাঁচবে কিনা জানি না, কিন্তু আমরা যে মরব তা নিশ্চয়। স্বাধীনতা দাও। চল্লিশ কোটি মানুষের জনসমুদ্র তোমাদের পক্ষে উদ্বেল হয়ে উঠলে সেই বিরাট শক্তির কাছে যুদ্ধ আপনিই অসম্ভব হয়ে উঠবে। নইলে মুখে তোমরা বলবে দুনিয়ার মানুষের মুক্তির জন্যে লড়াই করছ আর কাজে আমাদের তোমরা তোমাদের ঘানিতে বেঁধে রেখে তেল ভাঙাবে তা হতে দেব না। স্বাধীনতা যদি না দাও তবে বুঝব যে স্বাধীনতা-যুদ্ধ কথাটা ভাঁওতা বই আর কিছুই নয়। তোমাদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থেই তোমরা আমাদের ধনেপ্রাণে সারা করতে চাও; অতএব সে রকম যুদ্ধে আমরা বাধা দেব। চার্চ্চিল কথাটা স্পষ্টই কবুল করলে, মন্ত্রী হয়ে সে সাম্রাজ্য ভেঙে দিতে বসে নি।

ক্ষেপে গেল ইংরেজ। ১৯৪২, ৮ই আগষ্ট, কংগ্রেসের সব বড়দের নিয়ে জেলে ভরলে একদিনে। নায়কহীন দেশ, ৯ই আগষ্ট, অহিংস সংগ্রামে নেমে পড়ল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। হাজারে হাজারে নিরস্ত্র মানুষকে খুন করলে ইংরেজ, লক্ষ লোক জেলে পচতে লাগল, তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিলে মেয়েদের বে-ইজ্জৎ করলে, শিশু বৃদ্ধ কেউ তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেলে না। দেশে হিন্দু মুসলমানের যে বিরোধ ঘটিয়েছিল, তাকে চরমে আনবার জন্যে তলে তলে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। দুর্ভিক্ষ ঘটালে, কালো বাজারের সৃষ্টি করলে, টাকার দাম কমিয়ে দিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ-গুলোকে খাওয়ার লোভ, টাকার লোভ, মুনাফার লোভ আর সর্ব্বনাশের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করতে বাধ্য

করলে। দেশের সয়তান স্বার্থলোভীর দল সুবিধার লোভে, টাকার লোভে, চাকরির লোভে, নিরাপত্তার লোভে এবং কংগ্রেসের উপর যে, অত্যাচার চলছিল সেই অত্যাচারের আতঙ্কে সাম্রাজ্যলোভী ব্রিটিশের তাঁবেদারীতে লেগে গেল। ভেঙে পড়ল দেশের নৈতিক ভিত্তি। পাপ সম্বন্ধে, অপরাধ সম্বন্ধে নির্লজ্জতা বাহাদুরী দেখানোর পর্য্যায়ে গিয়ে উঠল। সমস্ত ধর্ম্মনীতি, মনুষ্যত্ব টাকার তলে চাপা পড়ল।

রুশিয়া আর আমেরিকার দৌলতে ব্রিটিশ যুদ্ধ শেষ করে বেরিয়ে এল দুর্ব্বল রক্তশূন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ঢেঁকিবাহন চার্চ্চিলকে গদি থেকে নামিয়ে এটলীকে বসালে গদিতে।

ভারতের জনসাধারণের, দলনির্ব্বিশেষে, তখন একটি মাত্র ইচ্ছা—ইংরেজ ভারত ছাড়ো। গান্ধীজী ঐ রব তুলেছিলেন 'কুইট ইণ্ডিয়া'। কোটি কোটি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'ল 'কুইট ইণ্ডিয়া'—ভারত ছাড়ো। ইংরেজ দেখলে যে এই প্রবল জনমতের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে টেঁকা অসম্ভব। বললে হাঁ, এবার আমরা ভারত ছাড়ব। কিন্তু সে কি 'ছাড়া' রে বাবা! সয়তানের গুড়ের ফোঁটা। এত দিন মুসলমানদের তাতিয়ে তাদের দিয়ে অদ্ভুত উদ্‌ভুটে এক দাবি খাড়া করেছিল—যার মাথামুণ্ডু কিছু নেই—যে হিন্দু আর মুসলমান দুটো আলাদা ধর্ম্ম নয় শুধু দুটো আলাদা জাত—সুতরাং মুসলমানদের জন্যে পাকিস্থান চাই। জিন্না বললেন, ছাড়ো ভারত, তবে তোমরা মুরুব্বি থেকে ভারত ভাগ ক'রে আমাদের পাকিস্থান দিয়ে তবে ছাড়ো—ডিভাইড এণ্ড কুইট। এই দাবি বীভৎস চরমে তোলার ব্যবস্থাও (মুসলমানদের উৎসাহ এবং জমি তোয়ের করিয়ে দিয়ে) করতে তারা ত্রুটি করে নি। ফলে ১৯৪৬, ১৬ই আগষ্ট "লড়কে লেয়েঙ্গে পাকিস্থান"-রূপী বর্ব্বর তাণ্ডব সভ্যতা-গর্ব্বিত ইংরেজ রাজের দ্বিতীয় প্রধান নগরী কলকাতার বুকের উপর প্রকাশ্যে দিবালোকে সুরু হয়ে গেল। নরনারী শিশুহত্যা হিন্দু মুসলমানের কাছে ছারপোকা, তেলাপোকা মারার সামিল হয়ে উঠল। নারীহরণ ধর্ম্মের অঙ্গ হয়ে উঠল। কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতায় পাঁচ হাজার অগ্নিকাণ্ড দিয়ে লঙ্কাকাণ্ড সুরু হ'ল। সে আগুন দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি। সমস্ত ভারত জুড়ে মানুষ পশুরও অধম হয়ে উঠল। ইংরেজ নিজের কৃতকার্য্যতায় মনে মনে নৃত্য করতে লাগল আর দুনিয়ার দরবারে 'আমাদের পশুত্বের কথা ভণ্ড হা-হুতাশে সোৎসাহে পেশ করতে লাগল। চার্চ্চিলের চর ওয়াভেল, দিল্লীতে বসে ল্যাজ নাড়ছিলেন, কলিকাতায় এসেও একদফা ল্যাজ নেড়ে গেলেন, কিন্তু বন্দুক-কামান-বোমা-বোমারুধারী ইংরেজ এই তাণ্ডবকে থামাতে পারলে না—থামতে দিলে না। কেমনা তারা চাইছিল যে অবস্থা এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক যে কংগ্রেসকেও বাধ্য হয়ে বলতে হয়, আচ্ছা, তাই সই, ভাগাভাগিই হোক। যাতে দু'জনে দু'জনের শত্রু হয়ে ওঠে আর দুই শত্রুতে চিরশত্রু হয়ে পাশাপাশি থেকে চিরদিন খেয়োখেয়ি করে এবং বৃটিশের মুরুব্বি-আনাটা বজায় থাকে।

মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মহাত্মাজী আশি বছরের বৃদ্ধ ভগ্নদেহ। তবু অতিমানুষিক বলে পদব্রজে বেরুলেন তিনি শান্তি অভিযানে—নোয়াখালিতে, বিহারে, দিল্লীতে। বললেন, থামাও প্রতিশোধ থামাও, নইলে প্রতিশোধের প্রতিশোধ তার প্রতিশোধ কোন কালেই থামবে না। ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি করে নিজেরাই মারা যাব। শত্রু হাসবে। পৃথিবীতে আমাদের চিরকলঙ্ক রয়ে যাবে। কেউ বাঁচবে না—থামাও প্রতিশোধ থামাও।

জবাহরলাল প্রমুখ নেতারা দেশের এই নিদারুণ অবস্থায় বিচলিত হয়ে ভাবলেন, আর ত চলে না, ভাইয়ে ভাইয়ে এই খুনাখুনি যদি ভাগাভাগিতে থামে তবে আপাতত তাই হোক। তার পর মুসলমান ভাইদের মাথা ঠাণ্ডা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এবারেও স্থিরপ্রজ্ঞ গান্ধীজী পই পই ক'রে বারণ করলেন কংগ্রেসকে—নিও না এই খণ্ডিত ভারত, এই দ্বি-জাতিরূপ মিথ্যা। কাটাকাটি তাতে থামবে না ; বরং আরও নূতন নূতন এবং জটিলতর দুর্দ্দশার উদ্ভব হবে—তা সামাল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ষাট বছর যে অখণ্ডভারতের জন্যে লড়ে এসেছ, আরও অল্প সময় তার জন্যে যুদ্ধ কর, সহ্য কর, কাপুরুষের মত নিজের ধর্ম্মত্যাগ করে নিও না এই সর্ব্বনাশ হাত পেতে। ইংরেজ জগতের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ১৯৪৮-এর জুনে ভারত ছাড়ার—এই ক'টা দিন অপেক্ষা কর। তাদের হাতের বণ্টন করা বিষপাত্র মুখে তুলো না, তুলো না। তারা যাক, তারপরে, উস্‌কে দেবার জন্যে পিছনে যখন ইংরেজ থাকবে না তখন আমরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেব। সাবধান, আরও সর্ব্বনাশ ডেকে এনো না।

কিন্তু শুনলে না কেউ তাঁর বুদ্ধির কথা। জবাহরলাল, প্যাটেল, আজাদ প্রভৃতি এই টুকুরো-স্বাধীনতাকে হাতছাড়া করতে পারলেন না। জবাহরলাল ত স্বপ্নে বিভোর—সব ঠিক হো জায়গা।

কিন্তু হায়! এই ছিন্ন ভারতের ঘৃণ্য-সমস্যার পাঁকে পড়ে তিনি হাবুডুবু খাচ্ছেন। চিৎকার করে পরিতাপের আর্ত্তনাদ উঠছে তাঁর গলায় 'হায় রে, স্বাধীন ভারত গড়ার স্বপ্ন আমার, এই খুনোখুনি, নারীহরণ, ধর্ম্মান্তরণ, পুনর্বসতি, কাশ্মীর, জুনাগর, হায়দ্রাবাদের হাবড়ে পড়ে হা হতোস্মি বলে ডাক ছাড়ছে!'

কিন্তু সুধু পরিতাপ ও আর্ত্তনাদে কি দেবে তাঁকে? তাঁর

মত আর কাকে রাখলেন তিনি তাঁর সঙ্গে—এই দুরন্ত দুর্দশার মধ্যেও যারা চরিত্রবলে চতুর্দ্দিকের সমস্যার বিরুদ্ধে, তাঁরই আদর্শ গড়ে তোলবার জন্যে, সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হবে? ধনপ্রাণ মান ভবিষ্যৎ সর্ব্বস্ব পণ করে যারা তাঁরই আহ্বানে অখণ্ডভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিল। তিল তিল করে, ভোগসুখসম্পদসৌভাগ্য বিসর্জ্জন দিয়ে যারা মার খেয়েছে, জেলে পচেছে, মরতে ভয় পায় নি—আজ কোথায় রইল তারা পড়ে! তারা কি শুধু তাঁর মরণের সঙ্গী, বিপদের বন্ধু ছিল, সম্পদের কেউ নয়, জীবনের আহবে তাদের স্থান নেই? যারা প্রাণ দিয়ে, দিল্‌সে, হিম্মৎ নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে এগিয়ে চলতে সাহায্য করত, হায়, তাদের আজ মহারথীরা ভুললেন কেন? কোথা থেকে পাবেন আর তাঁরা আদর্শ জয় করার মত কর্ম্মী দেশের এই সর্বনাশের দিনে?

আজ স্বাধীনতার নামে পরাধীন ভারতের সেই চিরন্তন শোষণযন্ত্র তার সমস্ত প্যাঁচকলসমেত ভারতের বুকের উপর জাঁতানো হয়েছে এবং সেই ইংরেজ বুরোক্রেসির কলে তৈরি আর স্বার্থসর্ব্বস্ব দেশের বিশ্বাসঘাতী সমস্ত ভৃত্যকুলকেই ত তিনি নিজের তাঁবেদারীতে এবং দেশের খবরদারীতে যথাপূর্ব্বং বহাল করেছেন। চিরকাল যারা নিজের ক্ষুদ্রতম স্বার্থেও দেশকে শত্রুর চরণে বলি দিতে লজ্জা পায় নি আজ অকস্মাৎ এক দিনে তারা "পৈতে পুড়িয়ে সন্ন্যাসী" হয়ে যাবে! যে মুহূর্ত্তে দেশের সব চেয়ে বেশী করে দরকার স্বার্থত্যাগী, নির্লোভ, চরিত্রবান মানুষের, দেশকে গড়ে তোলার জন্যে, সেই অবস্থায় কাদের হাতে সব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? যারা ইংরেজ প্রভুকে চির-স্থায়ী করার চেষ্টায় দেশের মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে—মেরেছে, ধরেছে, খুন করেছে, গুলি করেছে, ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, জেলে পুরেছে, ফাঁসী দিয়েছে, সেই আই-সি-এস, সেই পুলিসের হাতে, সেই মিলিটারির হাতে—যাদের দিয়ে ইংরেজ ভারতবাসীর গলায় শিকল পরিয়ে রেখেছিল—অন্য দেশে স্বাধীনতা এলে প্রথমেই যাদের চরম শাস্তি দিত। দেশদ্রোহিতার অপরাধে শাস্তি পাওয়া দূরে থাক, পেল তারা আশাতীত পুরস্কার; তারাই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে রইল; আর রইল তাদের বন্ধু কালোবাজারী মুনাফাখোর পেটমোটা ধনিকের দল—প্রথম গদিতে বসার উত্তেজনার মুখে, যাদের ফাঁসী দিতে চেয়েছিলেন জবাহরলালজী।

আত্মস্বার্থে দেশের সর্ব্বনাশ করতে যারা কোনোদিন কুণ্ঠিত হয় নি, আজও আত্মস্বার্থে তারা সে কাজে কখনই কুণ্ঠিত হবে না। এদের দিয়েই দেশের মঙ্গলসাধন, দুর্নীতি দমন, ভগ্ন-পতিত দেশের সংগঠন হবে? যে সরষেতে ভূত, সে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে? শিল্পে, বাণিজ্যে, শাসনে, রাষ্ট্রব্যাপারে দুর্নীতি যাদের স্বার্থে অভ্রভেদী হয়ে উঠল; সেই দুর্নীতি-পরায়ণরাই হ'ল দুর্নীতিদমনের অভিভাবক! এদের দ্বারাই জবাহরলালজী দুর্নীতি দূর করবেন? আজ কালোবাজার, ঘুষ, ঠকামি, জুয়াচুরিভরা নির্দ্দয় অর্থগৃধ্নুতা যেতেই পারে না এরা সব পূর্ব্বের ঘাঁটিতে বহাল থাকলে—এই পুলিস, এই আই-সি-এস, এই গণ্ডেরীরাম বাটপাড়িয়ার দল। অল্প কয়েকজন সজ্জন এদের মধ্যে আছেন এ দেখিয়ে কোন সান্ত্বনা আমাদের নাই। প্রচুর পরিমাণে সজ্জন নির্লোভ স্বার্থত্যাগী দেশপ্রেমিক মানুষ এই দুর্য্যোগে আমাদের বড় দরকার তা না হলে শুধু বক্তৃতার তোড়ে এ কায়েমী দুর্নীতি ভেসে যাবে না, যেতে পারে না। শুধু উপদেশে আর গলাবাজিতে কাজ হবে না, হতে পারে না। আর কার উপদেশই বা শুনবে লোকে? সর্ব্বত্যাগী মহাত্মা গান্ধী কেউ নন! লালচে পড়ে তাঁর কথাই বড় মেনেছে লোকে, তা অন্য কেউ।

জবাহরলাল আজ জাঁতিকলে পা দিয়েছেন। এই বুরোক্রেসির কল এমনি কায়দায় তৈরি যে, "যে যায় লঙ্কায় সেই নাকি হয় রাবণ"। তাই ভয় হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর মানস পুত্র সিংহশিশু জবাহরলাল আজ আই-সি-এস-এর খাঁচাকলে পড়ে তাদের তোষামোদের অহিফেন প্রভাবে পাছে বা তিনি সার্কাসের সিংহ হয়ে দাঁড়ান—তাঁর চির-জীবনের ধর্ম্ম পাছে বিস্মৃত হন, ভারতবাসীর কাছে পাছে সত্য ভঙ্গের দায়িক হন, বাস্তব পরিস্থিতির অজুহাতে ভারতের গলায় শিকল দিয়ে আবার তাকে টেনে নিয়ে ব্রিটিশ-রাখালের গোয়ালভুক্ত না করেন! অতএব সাধু সাবধান! কাণ্ডারী, হুঁশিয়ার!

আজ কোথায় জবাহরলালের সেই পণ "অখণ্ডভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই—নইলে কিছুতেই নিরস্ত হব না।" যার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সর্ব্বস্ব পণ করে তাঁর পিছনে ছুটেছিল। তাঁর নেতৃত্বে অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে ছুটেছিল তারা। আজ তাদের সেই বিশ্বাসের অছি হয়ে তিনি জনতার হাতে এ কি স্বাধীনতা তুলে দিলেন? এর জন্যই জীবন পণ করেছিলেন তিনি এবং তাঁর সৈনিকের দল—করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে? না, কখনই না, এই বুরোক্রেসির অধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে জবাহরলালের ঝাণ্ডার তলে ছোটে নি তারা। জবাহরলালরা কয়েকজন ইংরেজের কয়েকটা উঁচু আসন দখল করে বসবেন এবং দেশের জনতার উপর চির-অত্যাচারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চুটিয়ে রাজত্ব করতে থাকবেন এমন কথা ছিল না। তাঁরা কয়েকজন হবেন পূর্ব্বভৃত্যকুলের প্রভু এবং জনতাকে রেখে দেবেন সেই তাঁবেদারকুলের শাসনের তলে এই পরমাশ্বাস দিয়েই কি জনতাকে স্বাধীনতা-যুদ্ধে তিনি নামিয়েছিলেন? এরই নাম

জনগণের স্বাধীনতা? "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" এই যদি জনসাধারণের অবস্থা হয় তা হলে তারা কি দিয়ে অনুভব করবে যে তারা স্বাধীনতা পেয়েছে? তা যদি উপলব্ধি না করে তবে তারা স্বাধীন দেশের মানুষের মত ব্যবহার করবে কি ক'রে? দেশের সংগঠনে তারা অন্তরের সঙ্গে যোগ কি ক'রে দেবে? শুধুই গলাবাজির জোরে?

যে বিশ্বাসে জনতা এত দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে সে বিশ্বাস কাণ্ডারীর প্রতি বিশ্বাস, সে বিশ্বাস জনগণের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাসে বিশ্বাস। তাদের সে বিশ্বাস কাজে পরিণত না হলে তাদের শক্তি, তাদের বীর্য্য, তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযানের ইচ্ছাশক্তি, এক কথায় ইংরেজীতে যাকে বলে "morale" তা যে চূর্ণ হয়ে যাবে। এই জনতার ইচ্ছাশক্তি এবং ত্যাগের মূল্যেই না জবাহরলালজীরা আজ গদিতে বসেছেন? আজ তাঁর অনুগত দেশপ্রেমিকদল তাঁদের সহকর্ম্মী হতে পারবে না—দেশের সৃষ্টিকার্য্যে আনন্দে তারা যোগ দিতে পারবে না—দেবে তারা, যারা একদা আত্মস্বার্থে ব্রিটিশের কবলে দেশকে বিশ্বাসঘাতকতা করে সমর্পণ করেছে। হা অদৃষ্ট! যারা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শুনে অল্পদিন আগেও খেঁকিয়ে তেড়ে এসেছে, জাতীয় পতাকাকে প্রতি মুহূর্ত্তে অপমান করেছে এবং বিজাতীয় পতাকার তলে গিয়ে পুচ্ছ আন্দোলন করেছে, দেশের এই সর্ব্বনাশের অবস্থা, এই চরম দুর্নীতির অবস্থা নিজ হাতে ঘটিয়ে, নির্লজ্জ আত্মপ্রসাদে যারা মশগুল হয়েছে, তারাই আজ জাতীয় পতাকার অভিভাবক! তারাই দেশের দুর্নীতিদমনের কর্ত্তা! তাদেরই কপট কণ্ঠে আজ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, রাতের বেলার শব-বাহী মাতালের বিকৃত "হরি-বোল" ধ্বনির মত নিনাদিত হচ্ছে! হায় রে দুর্ভাগা দেশ!

হবে না, কিছুতে হতে পারে না জনগণের স্বাধীনতা এই পথে, এই পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতি সাম্রাজ্যবাদীদের কলে প্রস্তুত। এতে জনতার স্বাধীনতা, দেশের সকলের স্বাধীনতা আসবে না। এতে অল্প কয়েকজন সকলের উপর বুরোক্রেসির চালে রাজত্ব করার সুযোগ পাবে মাত্র। এমনি করে জনতার বিশ্বাস ভাঙতে থাকলে বাঁচবে না ভারত।

কংগ্রেস নায়কদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, কংগ্রেসকে থাকতে হবে সর্ব্বাধিনায়ক হয়ে। সমস্ত শাসন তারই নির্দ্দেশে, তারই কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হবে। তা না হয়ে কংগ্রেসের সেরা মাথাগুলি যদি চাকরী নিয়ে গিয়ে গদিতে বসেন তা হলে বাকি কংগ্রেস স্বভাবতই তাদের পরিচালক না হয়ে, তাদের পরিচারক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। ব্রিটিশ যদি লীগ আর কংগ্রেসের হাতে ভারতকে ছেড়ে দিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে কংগ্রেসের আইন-সঙ্গত পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত শাসন-নিয়ন্ত্রণে। তা না হলে, ব্রিটিশ গঠিত শাসন-ব্যবস্থার চক্রে যারা চাকরী নেবে দুর্নীতি-দমনে, বিপদ-বারণে, তাদের অসহায়তা থেকে রক্ষা করা কারও সম্ভব হবে না, এবং দেশ সেই শাসন-ব্যবস্থায় মকর-সঙ্কুল কাল-হ্রদে ডুবে মরবে, অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে তাই চোখে দেখতে হবে।

কাণ্ডারীর উপর জনতার যে অখণ্ড বিশ্বাস তা ভেঙে গেলে নির্বীর্য্য হয়ে পড়বে জনতা; তাদের হৃদয় ভেঙে গিয়ে হিম্মৎ ধুলোয় লুটোবে। জনতার প্রীতি ও শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত জবাহর এক দিন দেখতে পাবেন যে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। কেননা, সেই জনতার শক্তিই না তাঁর শক্তি?

হায়! জবাহরলালজী জনতার নায়কত্ব ছেড়ে কেন এ চাকরি নিতে গেলেন? জননায়ক জবাহরলালের চাকরি করা মানে কি নিজের ধর্ম্ম নষ্ট করা নয়? নেমে আসুন তিনি মেকী স্বাধীনতার তকমা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দৃঢ় প্রত্যয়ে জনতার মধ্যে। নেমে আসুন তিনি পূর্ণ-স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে—পূর্ণ করুন তাঁর পণ। 'তখ্‌তে' বসে নিজকে নিঃসহায় না মনে করে তিনি জনতার ক্ষেত্রে নেমে এসে তাদের নতুন করে চালনা করুন অভীষ্ট সিদ্ধির অভিমুখে। দেখবেন চল্লিশ কোটি হৃদয়ের প্রীতির রসায়নে তিনি আজও অমিত-বল, অজেয়।

ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস

শ্রীকস্তুরচাঁদ লালুয়ানী
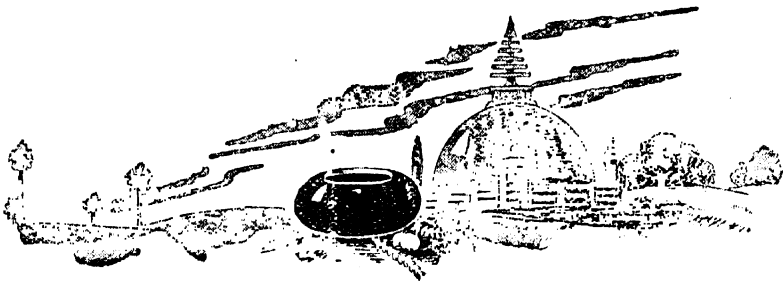
আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে মুদ্রার মূল্যহ্রাস গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিছুদিন আগে ফ্রাঙ্কের যে মূল্যহ্রাস করা হয়েছে তাতে করে দ্বিতীয় বার কয়েকটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং তার ফলে এই প্রসঙ্গ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনাও চলেছে। তাই ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসের তাৎপর্য্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলার আগে মুদ্রার মূল্যহ্রাস বিষয়ে দু-এক কথা বলা দরকার। মুদ্রার মূল্য দুই প্রকার—অন্তর্মূল্য এবং বহির্মূল্য। মুদ্রার অন্তর্মূল্য বলতে আমরা টাকার আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির কথা বুঝি, যেমন—এক টাকার বিনিময়ে আমরা কতটুকু চাল, কাপড় বা অন্যান্য সামগ্রী নিজের দেশে পেতে পারি। মুদ্রার বহির্মূল্য বলতে আমরা বুঝি এক টাকার পরিবর্ত্তে আমরা কি পরিমাণ সামগ্রী বিদেশ থেকে আনতে পারব। স্বদেশে আমরা যে সকল দ্রব্যসামগ্রী কিনি তার বেলায় কোন জটিলতার উদ্ভব হয় না; কারণ টাকার বদলে আমরা সহজেই সেগুলো কিনতে পারি। কিন্তু যখনই আমাদের বিদেশী পণ্যদ্রব্য কিনতে হয় তখন প্রথমে নির্দ্দিষ্ট বিনিময়হার অনুসারে টাকাকে রূপান্তরিত করতে হয় সেই দেশের মুদ্রায় এবং সেই বিদেশী মুদ্রা দিয়ে কিনতে হয় সেই দেশের দ্রব্য-সামগ্রী। এই ভাবে যে ডলার, ষ্টার্লিং বা অন্য বিদেশী মুদ্রায় টাকার রূপান্তর হয় এবং সেই বিদেশী মুদ্রার রূপান্তর হয় বিদেশী দ্রব্যসামগ্রীতে তাতেই যত রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। যত দিন বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন দেশের দ্রব্যমূল্য পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ছিল তত দিন কোন অসুবিধাই হয় নি। কারণ স্বর্ণমানের স্বয়ং সামঞ্জস্যশীল বিধানে বিভিন্ন দেশের আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা মোটামুটি বজায় থাকত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বর্ণমান ভেঙে পড়ল। তাই বিভিন্নদেশের দ্রব্যমূল্যের পারস্পরিক সম্বন্ধেরও অবসান ঘটল। যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার জের চলল যুদ্ধেরও পর পর্য্যন্ত। এইভাবে অর্থনৈতিক কারণে অথবা ভ্রান্তমুদ্রানীতির ফলে কোন কোন দেশের দ্রব্যমূল্য বর্দ্ধিত হ'ল এবং কোন কোন দেশের দ্রব্যমূল্য হ'ল আনুপাতিক ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত। এতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রবল বিপর্য্যয় উপস্থিত হ'ল। যেসব দেশের দ্রব্যমূল্য কম তারা আন্তর্জ্জাতিক বাজারে টিকে রইল আর অবস্থাগতিকে যে সব দেশে মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল দুনিয়ার বাজারে তাদের ঠাঁই মেলা মুশকিল হয়ে পড়ল। যেমন—মনে করা যাক, ১৯১৩ সনে এক টাকার বিনিময়-মূল্য ছিল এক শিলিং ছয় পেন্স, তখন পাঁচ টাকায় বা সাড়ে সাত শিলিঙে 'ক' সংখ্যক দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত। যুদ্ধের ফলে ১৯২০ সনে দ্রব্যমূল্য হ'ল দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৫ শিলিং। টাকা ষ্টার্লিং বিনিময়-হারে যদি কোন পার্থক্য না ঘটে তা হলে ১৯২০ সনে সেই 'ক' সংখ্যক দ্রব্যসামগ্রী কিনতে লাগবে দশ টাকা, অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্ব্ব মূল্যের দ্বিগুণ। অন্য দেশের সেই দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যে যদি বিশেষ পরিবর্ত্তন না হয়ে থাকে তা হলে ইংলণ্ডের পক্ষে দুনিয়ার বাজারে টিকে থাকা কঠিন। এই অবস্থায় ইংলণ্ডকে দ্রব্যমূল্য এমন ভাবে কমাতে হবে যাতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে টিকে থাকতে পারে। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উৎপাদন কার্য্যে সাহায্যকারীদের পারিশ্রমিক এত অপরিবর্ত্তনশীল হয়ে উঠল যে, খরচা কমান হয়ে দাঁড়াল অসম্ভব। এ অবস্থায় যদি উৎপাদনের খরচাই না কমে তা হলে দ্রব্যমূল্য কমান যাবে কি করে? অতএব ইংলণ্ডকে যদি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে টিকে থাকতে হয় তা হলে ষ্টার্লিঙের মূল্যকে আধাআধি কমিয়ে দিতে হবে এবং উপরের হারের নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্ত্তন করতে হবে:—

১৯১৩ সনে টাকা ষ্টার্লিং বিনিময়হার ১৲=১ শিঃ ৬ পেঃ; ক সংখ্যক সামগ্রীর মূল্য সাড়ে সাত শিঃ বা পাঁচ টাকা।

১৯২০ সনে টাকা ষ্টার্লিং বিনিময়হার ১৲=১ শিঃ ৬ পেঃ; ক সংখ্যক দ্রব্যের মূল্য ১৫ শিঃ বা ১০৲ টাকা।

এই অবস্থায় যদি বাজারে টিকে থাকতে হয় তা হ'লে যে ভাবেই হোক মূল্য ১৫ শিলিং হতে দেওয়া উচিত হবে না; মূল্যকে রাখতে হবে সাড়ে সাত শিলিঙে। তা হলে যুদ্ধ-পূর্ব্ব ৫৲ টাকার দ্রব্যসামগ্রী ৫৲ টাকাতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু আগেই বলেছি যে, দ্রব্যমূল্যহ্রাস কোনমতেই সম্ভবপর নয়; অতএব দ্রব্যমূল্য স্থির রেখে টাকা ষ্টার্লিং বিনিময়-হারেই উপযুক্ত পরিবর্ত্তন করা দরকার। এই পরিবর্ত্তন হবে নিম্ন-লিখিত প্রকার:—

টাকা ষ্টার্লিং বিনিময় হার যদি ১৲=৩ শিঃ বা ॥০ আনা =১ শিঃ ৬ পেন্স হিসাবে বেঁধে দেওয়া হয় তা হলে ১৫ শিঃ-এর ক সংখ্যক দ্রব্য মূল্য দাঁড়াবে টাকার হিসাবে ৫৲ টাকা বা যুদ্ধ-পূর্ব্ব মূল্যেরই সমান।

অর্থাৎ বিদেশে যুদ্ধ-পূর্ব্ব মূল্য বজায় রাখা সম্ভবপর হচ্ছে মুদ্রার মূল্যহ্রাস করে, বিদেশী মুদ্রার অনুপাতে দেশের মুদ্রাকে সস্তা করে দিয়ে। এই হ'ল মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাসের তাৎপর্য্য। মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস যদি ঠিকমত কাজ করে,

অর্থাৎ একে যদি ঠিকমত কার্য্যকরী হতে দেওয়া হয় তা হলে এতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসামঞ্জস্য ত দূর হবেই, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতাও আসতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা হয় না। এক দেশের মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশগুলোও আপন আপন মুদ্রার বহির্মূল্য কমিয়ে দিতে আরম্ভ করেন। এই প্রতিযোগিতায় মুদ্রা'হ্রাসের যেসব সুবিধা আছে তা উবে যায় এবং তার জায়গায় এসে পড়ে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, সংরক্ষণমূলক নীতি ইত্যাদি। ১৯২৯-৩৭ সনে পৃথিবীব্যাপী মহাসঙ্কটের আবির্ভাবে প্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনেকখানি অসামঞ্জস্য দেখা দিলে। এই অসামঞ্জস্যের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশই মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে। ১৯৩১ সনে ষ্টার্লিঙের বহির্মূল্য হ্রাস থেকে এর সূচনা হয়। ইংলণ্ডে এই মূল্যহ্রাসের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথম, যুদ্ধ-পূর্ব্ব মূল্য বজায় রাখায় পাউণ্ডের যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল তা দূর করা; এবং দ্বিতীয় রপ্তানী বাড়ান। পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ১৯২৪ সনের পর থেকে ইংলণ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্য কমে যায়; ফলে, বিদেশে ইংলণ্ডের যে পুঁজি খাটছিল তার কিছু কিছু উঠিয়ে আনতে সে বাধ্য হয়! ষ্টার্লিঙের মূল্যহ্রাসের পরই ঘটল ডলারের মূল্যহ্রাস; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংলণ্ডের মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পিছনে যেমন এক বিরাট অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পিছনে তা ছিল না। তাই এদেশের মুদ্রার মূল্যহ্রাস নিছক প্রতিযোগিতামূলক। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা মূল্যাবনতির ফলে ফ্রান্স এবং স্বর্ণমান-প্রতিষ্ঠিত দেশসমূহের মুদ্রার মূল্য আনুপাতিকভাবে বেশী হয়ে পড়ল। তাই অবশেষে ফ্রান্সকেও ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস করতে হ'ল। এই যে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা এতে কারও সুবিধা হয় না বরং সবারই ক্ষতি হয়। কতকটা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মত। বাজারে যদি একজন দোকানদার সস্তায় জিনিষ বিক্রি করে তা হলে তার বিক্রয়ের পরিমাণ হবে বেশী; কিন্তু সবাই যদি মূল্য কমিয়ে দেয় তা হলে কোন বিক্রেতারই কিছুমাত্র সুবিধা হবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এ ধরণের ব্যাপারই ঘটে।

২

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বহির্মূল্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যের ফলে বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটের পর সারা পৃথিবী জুড়ে যে এক বিরাট অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয় তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হতে পারে সেজন্য দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হবার আগেই বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিশারদগণ সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার এই চেষ্টার ফল। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্যেরা এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁরা দেশী-বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়-হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখবেন। এ ব্যাপারে যাতে কোন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয় সে বিষয়েও তাঁরা মনোযোগী থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে যদি কোন দেশের মুদ্রার বহির্মূল্য পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক হয়ে ওঠে তা হলে সেদেশ মুদ্রাভাণ্ডারের পরামর্শ অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রত্যেকটি সদস্যদলভুক্ত দেশকেই কিয়ৎপরিমাণ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বুঝাপড়া হয়েছে যে, এই স্বাতন্ত্র্যের কোন প্রকার অপব্যবহার করা চলবে না যাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যাহত হতে পারে। যদি কোন সদস্য এর বিরোধিতা করেন তা হলে মুদ্রাভাণ্ডার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং প্রয়োজন হলে সেই দেশকে সদস্যপদ থেকে বরখাস্ত করবেন।

ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস বর্ত্তমান সময়ের মুদ্রা-বিনিময়-হার বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাউণ্ডের সঙ্গে ফ্রাঙ্কের বিনিময়-হার ছিল ১ পাউণ্ড= ১৭৬.৭০ ফ্রাঙ্ক। জার্ম্মানীর কবল থেকে মুক্তি পাবার পর এই বিনিময়-হার হ'ল ১ পাউণ্ড=২০০ ফ্রাঙ্ক। এই অবস্থাই চলল ১৯৪৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত। এই সময় সরকারীভাবে ফ্রাঙ্কের যে মূল্য হ্রাস করা হয় তার ফলে দাঁড়াল ১ পাউণ্ড= ৪৮০ ফ্রাঙ্ক। গত জানুয়ারী মাসে সরকারীভাবে দ্বিতীয় বার ফ্রাঙ্কের বহির্মূল্যের যে পরিবর্ত্তন করা হয়েছে তার ফলে বিনিময়-হার হয়েছে নিম্নলিখিত প্রকার:—

১ পাউণ্ড=৮৬৪ ফ্রাঙ্ক।
১ ডলার=২১৪.৩৯২ ফ্রাঙ্ক।
স্পেনের ১ পেসেতা=১০.৯৫৮ ফ্রাঙ্ক।
ফরাসী ১ টাকা=৬৪.৮০ ফ্রাঙ্ক।

ফ্রান্স শুধু ফ্রাঙ্কের মূল্য হ্রাস করেই ক্ষান্ত হয় নি; সেই সেই সঙ্গে ফ্রাঙ্কের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এক খোলা বাজার প্রতিষ্ঠিত করবার সিদ্ধান্তও জ্ঞাপন করেছে। প্যারিসের টাকার বাজারের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে এই নূতন বাজার কাজ করবে এবং এই বাজারে মুদ্রার বিনিময়-হার নির্দ্ধারিত হবে চাহিদা ও সরবরাহ অনুযায়ী। এই বাজারে মার্কিন ডলার এবং অন্য কয়েকটি মুদ্রা, যাদের সহজেই ডলারে রূপান্তরিত করা চলে সেগুলোর কেনা-বেচা চলবে দৈনিক বিনিময়-হার অনুসারে। অবশ্য এই বিনিময়-হার নির্ভর করবে চাহিদা ও সরবরাহের উপর। অতএব সরকারী বিনিময়-হার থেকে খোলা বাজারের এই বিনিময়-হার পৃথক হয়ে পড়বে। ফ্রান্সের রপ্তানীকারিগণ তাঁদের রপ্তানী-দ্রব্যের মূল্য হিসাবে যে সব বিদেশী মুদ্রা পাবেন তার অর্দ্ধেক দিতে হবে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে সরকারী বিনিময়-হার অনুসারে—বাকি অর্দ্ধেক তাঁরা খোলা বাজা-

দৈনিক বিনিময়-হার অনুসারে বিক্রি করতে পারবেন। আমদানীকারিগণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী টাকা খোলা বাজারে কিনতে পারবেন। এ ছাড়া খোলা বাজারে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলিও সম্পন্ন হবে :—ভ্রমণকারীদের মুদ্রা পরিবর্ত্তন, মূলধন স্থানান্তর, ব্যক্তিগত ভাবে মুদ্রা প্রেরণ ইত্যাদি।

এই ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কতকটা অপরিহার্য্যও হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের ফলে ফরাসী দেশের রাজস্ব-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতিতে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়। মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য যে সব কর ধার্য্য করা হয় এবং যে-সকল মুদ্রাবিষয়ক ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাতে অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে। এ ছাড়া দীর্ঘদিন স্থায়ী শ্রমিক ধর্ম্মঘট, উৎপাদন হ্রাস, করভার বৃদ্ধি এবং পারিশ্রমিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন ফ্রান্সে উৎপাদন-বিষয়ক খরচ অনেক গুণ বেড়ে যায়। এতে ফ্রান্সের পক্ষে বিদেশী বাজারে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ান ত দূরের কথা, যুদ্ধের আগে ফ্রান্সের রপ্তানী-বাণিজ্য যা ছিল যুদ্ধের পর সেটুকু ফিরে পাওয়ার আশাও সুদূর-পরাহত হয়ে উঠল। ফ্রান্স থেকে যুদ্ধের আগে যে সব জিনিষ রপ্তানী হ'ত তাদের অধিকাংশই বিলাস-সামগ্রী। যুদ্ধোত্তর কালে এদের চাহিদা অসম্ভবরকম কমে যাওয়ায় অন্যান্য দেশের তুলনায় ফ্রান্সের সঙ্কট হ'ল আরও জটিল। তা ছাড়া যুদ্ধের দরুন ফ্রান্সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের খরচ অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় বিদেশী ভ্রমণকারীদের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। এতেও ফ্রান্সের আয়ে যথেষ্ট ঘাটতি পড়েছে। সর্ব্বোপরি, ফ্রান্সে বিদেশী মুদ্রার চোরাবাজার যে ভাবে গড়ে উঠেছিল তাতে সরকারী মুদ্রা-বিনিময়-হারের গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায়। এই সব কারণে ফ্রান্সের বহির্মূল্য পুনর্বিবেচনা করা ফরাসী সরকারের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য হয়ে উঠল।

এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই ফ্রান্স উপরি-উক্ত ব্যবস্থা দুটি গ্রহণ করে। এগুলির উদ্দেশ্য হ'ল রপ্তানী বাড়ান, আমদানী কমান এবং এই ভাবে দেশে নিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে যে সব অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছিল তা দূর করা। খোলা বাজার প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য হ'ল দেশের লুকানো সোনা এবং বিদেশী টাকাকে আকর্ষণ করা এবং এই ভাবে ফ্রান্সের বহির্মূল্যকে যথাযথভাবে নির্দ্ধারিত করা। অবশ্য এই সমস্ত উদ্দেশ্য কতখানি সফল হবে সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে। মঁসিয়ে ব্লুমের কথায়, "যত দিন ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস চলতে থাকবে তত দিন ফাটকা-বাজেরা আত্মপ্রকাশ করবে বলে মনে হয় না। এই মূল্য নিম্নতন স্তরে নেমে না আসা পর্য্যন্ত তারা অপেক্ষা করে দেখবে।" এই যুক্তিতে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কারণ আজও ফ্রাঙ্ক মূল্যাবনতির সর্ব্বশেষ স্তরে এসে পৌঁছয় নি, ১৯৪৫ সনে এর যা মূল্য ছিল ১৯৪৮ সনে তা হয়ে পড়েছে তদপেক্ষা অনেক কম। ভবিষ্যতে যে এর মূল্য আরও কমবে না এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে ফরাসী সরকার গত জানুয়ারী মাসে যে স্তরে ফ্রাঙ্কের বহির্মূল্য বেঁধে দিয়েছেন তা বজায় রাখা সম্ভব হবে বলেই তাঁরা আশা করেন এবং ভবিষ্যতে খোলা বাজারের সহায়তায় ফ্রাঙ্কের বহির্মূল্য পুনরায় গড়ে তোলা এঁদের উদ্দেশ্য।

এই ভাবে ফ্রাঙ্কের দুইটি বহির্মূল্য নির্দ্ধারিত হয়েছে—একটি সরকারী এবং অপরটি খোলা বাজারের। এতে বাইরের দেশগুলিতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তার আশঙ্কায় সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন। ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেছেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে একটা খোলা বাজার প্রতিষ্ঠা করার যুক্তি অনেকেই সমর্থন করতে পারেন নি। এবিষয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষ নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করেছেন :—

"এ বিষয়ে মুদ্রাকোষ অবাস্তব কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করতে চান না, বিশেষ করে বর্ত্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তা সমীচীন নয়। মুদ্রাবিনিময় হার বিষয়ে যদিও মুদ্রাকোষের সিদ্ধান্ত-গুলি প্রায় অপরিবর্ত্তনীয় তথাপি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা দৃষ্টে তাঁরা যথাসম্ভব কার্য্যকরী পন্থা নির্দ্দেশের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে মুদ্রাকোষ খোলাবাজার প্রতিষ্ঠা বা রপ্তানী-বাণিজ্যে প্রাপ্ত বিদেশী মুদ্রাকে সে বাজারে চালু করার পক্ষে যুক্তি দিতে পারেন না। কারণ এতে এক দিকে যেমন ফ্রান্সের বাণিজ্যিক স্বার্থ সিদ্ধ হওয়ার আশা নেই অন্য দিকে তেমনি মুদ্রাকোষের অন্যান্য সদস্যদের উপর এর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলেই মনে হয়।

মুদ্রাকোষের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে অন্যান্য দেশের মুদ্রার বহির্মূল্য যখন অপরিবর্ত্তিত আছে তখন যে-কোন একটি অঞ্চলের উপর কোনো দেশ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যহ্রাস চাপিয়ে দিতে পারে। যে দেশ এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে সেই দেশ যদি বাণিজ্যপ্রধান হয় তা হলে তার বাণিজ্য-ব্যবস্থায় বিপর্য্যয় ঘটবার সম্ভাবনা আছে এবং তাতে করে অন্যান্য দেশের মুদ্রার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনেকে শঙ্কিত হয়ে উঠবেন ; কারণ অন্তত সেই দেশের খোলা বাজারে সেই সব মুদ্রার মূল্য স্থির ভাবে না থাকার জন্য এইরূপ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে।

মুদ্রাকোষের কর্ত্তৃপক্ষ আরও মনে করেন যে, অন্যান্য দেশেও যদি অনুরূপ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় তা হলে মুদ্রা-বিনিময়-হারে এসে পড়বে এক বিরাট অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা এবং এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত

প্রত্যেক দেশকেই দুর্গতি ভোগ করতে হবে। যদিও ফ্রাঙ্কের অবস্থা এখন জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে তথাপি সহযোগিতার ভিতর দিয়ে যদি বিনিময়-হার স্থির করা হয় তা হলে সকল দেশের পক্ষে সেটিই হবে সব চেয়ে কল্যাণপ্রদ ব্যবস্থা।

ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসে ইংলণ্ড এবং আমেরিকাও গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ইংলণ্ডে অনেকেই আশঙ্কা করেন যে, ফ্রান্সের খোলা বাজারে যদি সস্তায় ষ্টার্লিং পাওয়া যায় তা হলে বিদেশীয়েরা সেই ষ্টার্লিং কিনে নেবে এবং তাতে ইংলণ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্য গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে ইউরোপের পুনর্গঠন-কার্যেও অন্তরায় উপস্থিত হতে পারে। তা ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশও নিজ নিজ দেশের মুদ্রার বিনিময়মূল্য কমাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতে পারে। যদি তাই হয়, এবিষয়ে যদি প্রতিযোগিতা সুরু হয় তা হলে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে তো ক্ষতিকর হবেই, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের ভবিষ্যৎও তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ অবশ্য একথা স্বীকার করেছেন যে, উল্লিখিত ব্যবস্থা বরাবরের জন্য গ্রহণ করা হয় নি। ফ্রাঙ্কের মূল্য স্থির অবস্থায় এলেই এই ব্যবস্থা পরিহার করা হবে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে চলেছি তাতে সময়ের গুরুত্ব খুবই বেশী। বর্তমান সময়ে যে ব্যবস্থায় কিছুমাত্র অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী এবং ভবিষ্যৎও তাতে অনিশ্চয়তাপূর্ণ হয়ে উঠবে। অবশ্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষ বা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু এক একটি দেশ যদি এ ভাবে স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকে তা হলে তাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের প্রতিষ্ঠা ক্ষুন্ন হবে।

ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসে আমাদের বহির্বাণিজ্যে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয় না। কারণ যুদ্ধের আগে আমরা ফ্রান্সে রপ্তানী করতাম তুলা, তৈলবীজ ও কফি এবং সেখান থেকে আমদানী করতাম বিবিধ বিলাস-সামগ্রী। বর্তমানে দেশেই তুলা এবং তৈলবীজের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে সম্প্রতি এগুলির রপ্তানীর প্রসঙ্গই ওঠে না। ওদিকে আমরা বিলাস-সামগ্রীর আমদানী প্রায় বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা আমরা নাড়াচাড়া করতে পারি, অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় বিলাসের সামগ্রী আমদানী করা চলতে পারে না। তবে ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসে আমাদেরও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত। একথা সকলেরই জানা আছে যে, যখন পৃথিবীব্যাপী মহাসঙ্কটের পর দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি দেশই নিজ নিজ মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস করেছিল, ভারতের টাকার মূল্য তখনও প্রায় যথাপূর্বংই ছিল। প্রায় বলছি এইজন্যে যে, টাকার মূল্য যেটুকু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল তা ষ্টার্লিঙের সঙ্গে এর যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার দরুন। ভারতের জনমত দাবী করেছে ১৲ টাকাকে ১ শিলিং ৪ পেন্সের সমান করার জন্য; সে জায়গায় সরকার স্থির করলেন ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে। তার পরে কত পরিবর্তনই না হয়েছে! ডলার ও ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস হয়েছে; যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পৃথিবীব্যাপী একটা বিরাট ওলটপালট দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের বিনিময়-হার আজও ঠিক আছে। ফ্রান্সের ন্যায় আমাদের দেশেও মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বেড়েছে, এমতাবস্থায় দেশের শিল্প-প্রসারের জন্য আমাদেরও রপ্তানী এবং আমদানী বাণিজ্যকে অবহেলা করলে চলবে না। তাই বলছি এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুসারে টাকার বহির্মূল্যেরও পরিবর্তন আবশ্যক। অবশ্য আমরা এমন কোন পরিবর্তনের কথা বলছি না যাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় অথবা আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের সম্মান ও প্রতিপত্তির হানি হয়। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে পারি না। তা ছাড়া ভারত শিল্পবাণিজ্যে আজও অনগ্রসর দেশ। এ কারণে আমরা সরকারী সহানুভূতি পাবার অধিকারী। এ অবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা টাকার বিনিময় হারকে কিছুতেই ১৲= ১ শিলিঙের বেশী করতে পারি না। সরকারী কর্তৃপক্ষ আজও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট। যদি অদূর ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয় তা হলে যুদ্ধের সময় চরম স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে আমরা যে সব বাজার বিদেশে গড়ে তুলেছি তা অচিরেই হারাতে হবে। এই ভাবে যদি আমরা নিজেদের রপ্তানী-বাণিজ্য নষ্ট করে ফেলি তা হলে বিদেশ থেকে পণ্যদ্রব্য আমদানী করবার টাকাই বা পাব কোথা থেকে? এইজন্য আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধে জাতীয় সরকারের অবিলম্বে সচেতন হওয়া উচিত। শিল্পের অগ্রগতি এবং আমাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া বা না হওয়ার উপর।

নাইলন

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

মনুষ্যসমাজে বস্ত্র প্রচলনের ইতিবৃত্ত মনুষ্যসভ্যতার ইতিহাসের মতই পুরাতন। মহেঞ্জোদরোতে যে কার্পাসবস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা যীশুখৃষ্টের জন্মেরও তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার বলিয়া অনুমিত হয়। যদিও প্রাচীন মনুষ্যসমাজ তাহাদের বস্ত্রের নিমিত্ত প্রকৃতির অফুরন্ত দানেরই মুখাপেক্ষী ছিল তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের বস্ত্রবয়ন-প্রণালী কম উন্নত ধরণের ছিল না। বিভিন্ন দেশের প্রাচীনতম ইতিহাসের যে সামান্য অংশ আমাদের কাছে উন্মুক্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, তদানীন্তন মনুষ্যগণ তিন প্রকার প্রাকৃতিক আঁশ বা তন্তুজাতীয় পদার্থসাহায্যেই তাহাদের বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিয়াছে—উদ্ভিজ্জ আঁশ, তুলা ও প্রাণীজ আঁশ, রেশম ও পশম। ন্যূনপক্ষে তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া বস্ত্রের নিমিত্ত এই তিন প্রকার আঁশেরই ব্যবহার চলিয়াছে। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে আরও অনেক প্রকার উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ আঁশের প্রচলন হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে আঁশ প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হয়। কৃত্রিম রেশম বা রেয়নই হইল এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম আঁশ। তৎপর নানাভাবে কৃত্রিম আঁশ প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানকালে বহুপ্রকার কৃত্রিম আঁশ জগতের বস্ত্রসমস্যার সমাধানকল্পে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

কৃত্রিমভাবে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার সময় বৈজ্ঞানিক-গণকে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়—তন্মধ্যে প্রস্তুত করিবার মূলবস্তুগুলি যাহাতে সহজলভ্য হয় এবং প্রস্তুত-প্রণালী যাহাতে ব্যয়বহুল না হয়। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বস্ত্রপ্রদানকারী আঁশের মধ্যে রেয়ন প্রস্তুতে এই সমস্ত গুণই কমবেশী রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা এখানে যে নাইলন সম্বন্ধে আলোচনা করিব তাহার প্রস্তুতির মধ্যেও উপরোক্ত সুবিধাগুলি বিশেষভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন কোন বিষয়ে নাইলন কৃত্রিম রেশম অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেমন কৃত্রিম রেশম প্রাকৃতিক রেশমকে সকল দিক দিয়া অতিক্রম করিয়াছে তদ্রূপ অদূর ভবিষ্যতে নাইলন ব্যবহারও প্রাকৃতিক পশমকে অতিক্রম করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, কৃত্রিম-ভাবে রেশম তৈয়ারীর প্রধান কথা হইল মাত্র উদ্ভিদরাজ্যের সেলুলোজের আণবিক গঠনবিধি পরিবর্তন করা; কিন্তু নাইলনের বেলায় এরকম কোন নীতি অনুসৃত হয় না। এই প্রকারে কৃত্রিম আঁশ বলিতে নাইলনই হইল সর্ব্বপ্রথম আঁশ যাহা প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মী মূল পদার্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। নাইলন আবিষ্কারের ইতিহাস বিশেষ চমকপ্রদ।

১৯২৭ সন হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডু পন্থ দ্য নেমুর (du pont de nemour) কোম্পানীর কেরোথার (carother) এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ সরল প্রাকৃতিক পদার্থ সাহায্যে কি করিয়া জটিল পদার্থের সৃষ্টি করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে থাকেন। প্রাকৃতিক পদার্থের গঠনবিধি সম্বন্ধে গবেষণা চালাইয়া কৃতকার্য্য হইবার পর তাঁহারা কয়লা, জল ও বায়ুর সংমিশ্রণে জটিল অণু সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর ব্যয় করিয়া ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে নাইলন নামে এক প্রকার কৃত্রিম সুতার আঁশ তৈয়ারী করেন। নাইলনের ভিতর অঙ্গার, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বিশেষভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। ১৯৩৯ সনের শেষের দিকে প্রচুর পরিমাণে নাইলন প্রস্তুত করিবার জন্য কলকারখানা স্থাপিত হয় এবং ১৯৪০ সনের মে মাসে সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত নাইলন মোজা বাজারে বাহির হয়। ১৯৪১ সনে ভার্জ্জিনিয়ায় আর একটি কল স্থাপিত হয়। ঐ স্থানে বৎসরে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড নাইলন সুতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৯৪১ ও ১৯৪২ সনে বৃটেনেও দুইটি কল স্থাপিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক রেশম, পশম ও চুলের ন্যায় নাইলন হইল একটি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, যদিও উহাদের কোনটির সঙ্গেই নাইলনের সাদৃশ্য তত বেশী নয়। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, নাইলন হইল প্রকৃতির অনুকরণে প্রস্তুত প্রোটিন ঘটিত এক বিশেষ গুণসম্পন্ন পদার্থ। নাইলন নামটিও প্রয়োগ করা হইয়াছে ব্যাপক অর্থে, যেমন হইয়াছে কাচ, প্লাষ্টিক প্রভৃতির। নাইলন নানা আকারে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, গুঁড়ার আকারে, দ্রবণ আকারে, সুতার আকারে প্রভৃতি। এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায় চারি শত প্রকারের নাইলন প্রস্তুত হইয়াছে।

যদিও অঙ্গার, জল ও বায়ুর সাহায্যেই নাইলন প্রস্তুত করা হয় তথাপি ইহার প্রস্তুত প্রণালী বিশেষ ভাবেই জটিল এবং বহুপ্রকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইয়া থাকে। জটিল রাসায়নিক ক্রিয়াদি এবং যন্ত্রপাতির বিস্তৃত বিবরণ রাসায়নিক এবং নাইলন-বিশেষজ্ঞদের এলাকাভুক্ত। এখানে মোটামুটি কি ভাবে জল, বায়ু এবং অঙ্গারকে নাইলনে রূপান্তরিত করা হয় তাহা

সংক্ষেপে বলা হইতেছে। বায়ুমধ্যস্থ নাইট্রোজেন গ্যাস ও জলমধ্যস্থ হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়া এমোনিয়া তৈয়ারী করা হয়। অঙ্গার হইতে প্রথমে আলকাতরা এবং তৎপর ফেনল তৈয়ারী করিয়া বায়ুর অক্সিজেন সাহায্যে উহাকে এডিপিক এসিডে পরিবর্ত্তন করা হইল। এইবার পূর্ব্বোক্ত এমোনিয়া, জলমধ্যস্থ হাইড্রোজেন এবং এডিপিক এসিড মিলিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হেক্সামিথিলিন ডাই-এমিন-এ রূপান্তরিত হইল। এই ডাই-এমিন হইতে পাওয়া যাইবে নাইলন-ঘটিত লবণ এবং তাহা হইতে উপযুক্ত প্রক্রিয়া সাহায্যে নাইলন পাওয়া যাইবে।

নাইলন সূতার এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে যাহার জন্য বস্ত্র ও নানা প্রকার কাজের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক। ইহার একটি গুণ হইতেছে যে, ইহাতে ছাতা ধরে না বা ভিজাইলে পচিয়া যায় না। ফলে যুদ্ধকালে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জঙ্গলে খাদ্যাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত নাইলন বস্ত্র ও জাল ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার স্থিতি-স্থাপকতা ও দৃঢ় সংলগ্নধর্ম্মিতার জন্য গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি তৈয়ারীর নিমিত্ত ইহা ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, একই আয়তন বিশিষ্ট নাইলন মোজা রেশমের মোজা অপেক্ষা দীর্ঘ স্থায়ী হয় এবং ব্যবহারও বিশেষ আরামদায়ক ও তাপরক্ষক। একমাত্র ডু পণ্ট কোম্পানীই বৎসরে ৪৫ লক্ষ জোড়া মোজা তৈয়ারী করিয়া থাকে। কৃত্রিম রেশমের বিশেষ অসুবিধা হইল যে, উহা ভিজাইলে সূতার দৃঢ়তা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ফলে বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু নাইলন এ দোষমুক্ত। নাইলনের বিভিন্ন বস্ত্রখণ্ড সেলাই দিয়া জোড়া লাগাইবার প্রয়োজন হয় না; সামান্য উত্তাপ প্রয়োগ করিলে জোড়ার মুখ আপনা-আপনি মিশিয়া যায়। তাহা ছাড়া রেশম বা তুলার ন্যায় নাইলন সহজে অগ্নিপ্রজ্বলনশীল নহে। যুদ্ধকালীন কয় বৎসরে নাইলন দিয়া প্যারাসুটের দড়ি, জাল, সেলাইয়ের সূতা, টুথ ব্রাস, চুলের ব্রাস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। তবে নাইলন ব্যবহারে কোন কোন বিষয়ে যে অসুবিধা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না, বৈজ্ঞানিকগণ অবশ্য এই সমস্ত দোষ মুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কৃত্রিম রেশমের যুগ অস্তমিত হইয়া নাইলন যুগের সুপ্রভাত নানা দিক দিয়া ঘোষিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কম্যুনিজ্ম্ কোন্ পথে ?

শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায়

একটি মাত্র দেশে রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করেই প্রোলেটেরিয়েট্-বৈপ্লবিক যুগের অবসান ঘটেছে। সে বিপ্লব মূলগতভাবে মার্ক্সীয় নীতি অনুসারে, বিশেষ করে তার গঠনতান্ত্রিক দিক অনুসরণপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় নি। এমন কি প্রাথমিক অংশে মার্ক্সীয় বৈপ্লবিক পন্থাও অনুসৃত হয় নি। মার্ক্সীয় নীতি অনুসারে যদি প্রোলেটেরিয়েট্ বিপ্লব শক্তিসঞ্চয় করত তা হলে তার সূচনা হওয়া উচিত ছিল ইংলণ্ডে, যেখানে যন্ত্রশিল্পের ইমারৎ গড়ে উঠেছে। রুশ-বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি দুর্ঘটনা মাত্র— কয়েকটি আকস্মিক ঘটনার সংমিশ্রণেই তা সম্ভব হয়েছিল। বস্তুতঃ এ বিপ্লব ঐতিহাসিক স্বৈরবাদের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অস্বীকার করে। অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ণীত ঐতিহাসিক প্রসারের নিশ্চিত ফল না হওয়ায় সে বিপ্লব জগদ্ব্যাপী কোন অদূর বিপ্লবের ইঙ্গিত দিতে পারে নি। পক্ষান্তরে ১৯২১ সন থেকেই অন্যান্য দেশে সে বিপ্লবের বিস্তৃতির পথ রুদ্ধ হয়েছে।

তখন থেকে রাশিয়াতেও সে বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়া প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্যার সম্মুখীন হয়েই লেনিন আবিষ্কার করলেন যে মার্ক্স এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নি। মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক রচনাবলী সবই সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা। ধনতন্ত্রবাদের শরীরব্যবচ্ছেদ নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন মার্ক্স—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ধনতন্ত্রবাদের পরস্পরবিরোধিতা সাধারণের সামনে প্রকট করা। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—সময়ের স্রোতে পরস্পর বিরোধিতার টানাপোড়েনের বিপাকে ধনতন্ত্রবাদের বিরাট ইমারৎ ভেঙে পড়বে, আর সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে থেকে জন্ম নেবে সর্ব্বজয়ী সাম্যবাদ। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ তিনি করেছিলেন বটে, কিন্তু সাম্যবাদী পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করে যেতে পারেন নি। দ্রব্যাদি নির্ম্মাণের বিভিন্ন শক্তির প্রসারের দ্বারাই তা স্থিরীকৃত হতে পারত। ধনতন্ত্র-বাদের শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্ত করতে পারে কেবলমাত্র সামগ্রিক বিপ্লব; তার পর ভবিষ্যৎ আপনা থেকেই তার পথ বেছে নেবে। অর্থনীতিবিদ্ বলে মার্ক্সের যা কৃতিত্ব

সে শুধু সমালোচকরূপে। তাঁর বিপুল পরিমাণ রচনার কোন স্থানে সামাজিক পরিকল্পনা বা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে ইঙ্গিত নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে-কোন পরিকল্পনাই "ইউটোপিয়া" ছাড়া কিছু নয়—এই ছিল তাঁর মত। "New Economic Policy" প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন যে, মার্ক্সের রচনায় সাম্যবাদী অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি কথাও লিপিবদ্ধ হয় নি।

বিপ্লবোত্তর রাজনীতি সম্বন্ধেও মার্ক্সের কোন রচনা নেই। বুর্জোয়া শাসনের ভিত্তিমূলকে শিথিল করে দেওয়ার জন্য তিনি প্রোলেটেরিয়েট্ একনায়ত্বের আদর্শের জন্ম দিয়েছেন। তারপর কি ঘটবে, কেমন করে বিপ্লবোত্তর সমাজকে রাষ্ট্রিক নীতি অনুসারে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে শাসন করা হবে—সে প্রশ্নের উত্তর তিনি সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছেন ইতিহাসের অজানা শক্তির হাতে। রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে—এই অলীক কথার সৃষ্টি করে তিনি রাজনীতির মূল কথাটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। নূতন সমাজব্যবস্থায় পারস্পরিক অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি "এনার্কিষ্ট" আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন—"from each according to his ability, to each according to his need"—লেনিনের মতে এই আদর্শ 'ব্যর্থ স্লোগান মাত্র'। ষ্টালিনের ব্যবস্থায় মার্ক্সীয় নীতিকে নিম্নলিখিত ভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে—"from each according to his ability, to each according to his work." যদি মার্ক্সীয় নীতিকে ব্যর্থ স্লোগানমাত্র বলা হয়, তা হলে তার রূপান্তরকে, যদিও মোটামুটি তাকে একই বিবৃতি বলে মনে হবে, একেবারে অর্থহীন বলা চলে না; বস্তুতঃ এর অর্থই নতুন সমাজব্যবস্থায় অসাম্য ও অসমবণ্টনকে স্বীকার করা। কাজের মূল্যনির্দ্ধারণের কোন উপযুক্ত মাপকাঠি নেই। যাদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি তারাই কেবলমাত্র সে মূল্য নির্দ্ধারণ করতে পারবে, এবং এখন তার ফল কি দাঁড়িয়েছে সে কথা সকলেরই জানা আছে।

রাশিয়ায় বিপ্লবোত্তর রাজনীতিক-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রনায়কদের ইচ্ছানুসারে করা হয়েছে। তাদের কোন লিখিত ভিত্তি নেই, মার্ক্সবাদের সঙ্গে সংযোগ অতি সামান্য। সুতরাং এই ব্যবস্থাদ্বয়কে সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদী বলা অন্যায়। পক্ষান্তরে নতুন সমাজব্যবস্থা কেমন হবে মার্ক্স তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না দেওয়ায় যে-কোন ব্যবস্থার ওপরেই খুশীমত লেবেল সেঁটে দেওয়া চলে এবং কেউই প্রমাণ করতে পারবে না যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং সোভিয়েট অর্থনীতি সাম্যবাদী নয়। সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে সংঘাত তা কাউকেই উৎসাহিত করতে পারবে না। এই হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা আজ আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন স্বীকার করিয়েছে—বিশেষ করে তাদের, যারা কেবলমাত্র ঘটনা-সংঘাতকেই প্রগতির ধারা বলে মানে না, যারা সেই সংঘাতের তাৎপর্য্য নির্ণয় করতে চায় বিচারশীলতাকে মাপকাঠি করে।

বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক বিপ্লব—কোন্‌টা গ্রহণ-যোগ্য এখন সে প্রশ্ন অবান্তর; এক দিকে বিকৃত অত্যাচারী বিলীয়মান ধনতন্ত্রবাদের কদাকার বাস্তব রূপ—যার ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পেরেছে ফাসিষ্ট স্বেচ্ছাচার, আর অপরপক্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সমতার বেদীতে স্থাপিত নতুন আদর্শ—এ দুয়ের মধ্যে বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে না। স্থির চিত্তে ভেবে দেখা উচিত এখন আমাদের চোখ ফেরাতে হবে কোন্ দিকে? আমরা অনুপ্রাণিত হব নতুন ব্যবস্থার আদর্শে অথবা চলতি সাম্যবাদের অভিনব বাস্তবতায়, যাকে আমরা রুশীয় সাম্যবাদ বলি।

পূর্ব্বে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে এই বেছে নেওয়ার সমস্যার সহজ সমাধান ছিল, কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগে স্বাধীন চিন্তা-শীল ব্যক্তিমাত্রেই যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তার সমাধান ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র প্রচলিত সাম্যবাদই যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে তা নয়, অভিজ্ঞতার ফলে সেই আদর্শই সন্দেহের উদ্রেক করেছে। আমাদের বিচার্য্য বিষয় এই যে, তেমন আদর্শকে কি অনুসরণ করা চলে, আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় যে আদর্শের প্রতি সোপানে হোঁচট খেতে হচ্ছে? ওদিকে বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠেছে; এবং নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য্য সকলেই আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছেন। এই ভাব-সংঘাত আজ প্রতি বিপ্লবী চিন্তাশীল মাত্রেরই মনে আলোড়ন তুলেছে, ফলে সাম্যবাদী আন্দোলনের আজ এক সঙ্কটকাল উপস্থিত।

তবু আজও অনেকে আশা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে; প্রয়োজনীয়তার অজুহাতে অনেকে রুশীয় রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম্মের নৈরাশ্যজনক বিফলতাকেও মেনে নিচ্ছে, ভাবছে অন্যান্য দেশে বিপ্লবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হয় তো সে বিফলতার বীজ আর থাকবে না। কিন্তু সেই ভাবী আশাবাদকে টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয় না, যখন দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রতিক্রিয়াশীলতার দূষিত আবহাওয়ায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের সমস্ত সম্ভাবনা। সেই থেকে সুরু হয় আত্মজিজ্ঞাসা—অন্তরের অন্তরতম মূল অনুসন্ধান করে দেখার পালা। তার ফলে আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে সে প্রভেদ দেখতে পাই, বাস্তব ও বিচারবুদ্ধিপ্রবণ দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাহায্যে। এক দিকে দেখা যায়, সর্ব্বগ্রাসী শক্তির আশাদীপ্ত বিশ্বাস, অপর দিকে নূতন সমাজব্যবস্থার সমস্যা—যা প্রোলেটেরিয়েট নয় তেমন অংশকে সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং স্বভাবতঃই

আন্দোলন হয়ে পড়েছে দুর্বল ; সে অংশের কাজ বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের পথ প্রশস্ততর করা নয়, তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নূতন "রুশ জাতীয় রাষ্ট্র" নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও সুবিধার জন্য যে-কোন পন্থা অবলম্বন বা যা কিছু করবে তাতেই অংশীদার হওয়া এবং এই জাতীয়-রাষ্ট্রই নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে বিশ্বের সমক্ষে প্রচার ও দাবি করছে।

এই সঙ্কটের প্রথম আসামী হ'ল কম্যুনিষ্ট ইন্টারনেশন্যাল, আগামী বিশ্ববিপ্লবের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হবার জন্য যার জন্ম হয়েছিল। প্রাক্-বৈপ্লবিক ও বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদের সমস্যাগুলির পারস্পরিক বিরোধিতার ফলে সে প্রতিষ্ঠান টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে। শক্তি করায়ত্ত করে একমাত্র সাম্যবাদীদল রাশিয়ার কম্যুনিষ্টরা আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে দিকপালস্বরূপ হয়ে উঠল। অন্যান্য দেশের সাম্যবাদী দলগুলি স্বেচ্ছায় প্রাক্-বৈপ্লবিক সমস্যাসমূহের সমালোচনা থেকে বিরত হ'ল—যদিও সেইসব সমস্যার গুরুভারে আজও তাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত। রাশিয়ার কম্যুনিষ্টরা কেবলমাত্র চল্‌তি সাম্যবাদ নয়, সাম্যবাদী থিয়োরীর প্রভু বলে নিজেদের প্রচার করছে। অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপ্লবোত্তর চল্‌তি শাসনব্যবস্থার স্বেচ্ছাপ্রণয়ন রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের মার্ক্সীয় বিধিব্যবস্থার যথেচ্ছ ব্যবহারে শক্তি দিয়েছে। প্রথম প্রোলেটেরিয়েট বিপ্লবের পর উক্ত শাসন-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় সুখসুবিধা বিশ্ববিপ্লবের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটিমাত্র দেশের সমাজ-তান্ত্রিকতা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের আদর্শ প্রচারে প্রবলতম অন্তরায় হয়েছে।

সোভিয়েট রিপাবলিক বাস্তব পক্ষে একটি জাতীয়-রাষ্ট্র—যদিও এক নতুন ধরণের—এবং এইজন্যই আন্তর্জাতিক শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে রাশিয়া এসে পড়েছে একেবারে কেন্দ্রস্থলে। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানতে পেরেছি যে, সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ রাষ্ট্রিক ধনতন্ত্রবাদের এক ইঞ্চি ওপরে উঠতে পারে নি। রাশিয়ার সাম্যবাদী জাতীয়-রাষ্ট্র বর্ত্তমান শোচনীয় বিধিব্যবস্থা রক্ষণের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। দুই ধরণের জাতীয়-রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতা বিদূরণের কোন খোলা পথ নেই। যথা ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এরা পরস্পরবিরোধী—যদিও আজকাল রাজনীতিতে পারস্পরিক শক্তিসঙ্ঘাতে সকল আদর্শই রাহুগ্রস্ত হতে বসেছে। আজ এই দুই ধরণের জাতীয়-রাষ্ট্র পরস্পরবিরোধী দুটি বিভিন্ন শিবিরে তাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করেছে—সে বিরোধ বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের সঙ্ঘর্ষ নয়, সে বিরোধ আত্মসুখ এবং সুযোগ-সুবিধার বিরোধ, স্বার্থের সঙ্ঘাত—যার ফলে পৃথিবীতে আজ জলস্থলব্যাপী আর একটি বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। পৃথিবীব্যাপী সভ্যতা ও সংস্কৃতির আজ এক মহা-সঙ্কট কাল উপস্থিত, এই ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। এ সঙ্কট পার হবার কি কোন পথ নেই? ইতিহাস কি সভ্যতার বুকে আর একটি চিতাগ্নি-রেখা আঁকবার আয়োজন করছে?

যদি এই আসন্ন সঙ্কট পার হতে হয় তা হলে আমাদের সাম্যবাদী আদর্শের ফাঁকিকে কাটিয়ে উঠতে হবে। মানুষের জ্ঞানের উপর, তার শক্তির উপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে, মানব-মনের সৃষ্টিশক্তিকে স্বীকার করতেই হবে। বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে কার্ল মার্ক্সের অদূরদর্শী ভবিষ্যৎ-বাণীর বিরুদ্ধে—নতুন সমাজসৃষ্টির অগ্রদূতেরা মনোনিবেশ করবেন সমাজগঠন-ব্যবস্থার ও সামাজিক পরিকল্পনার দিকে, এবং তাঁরা যুক্তির সঙ্গে পরিকল্পনাকে, ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক কল্যাণ ও প্রগতিকে মিলিত ও সংযুক্ত করে পৃথিবীতে নব যুগ আনয়ন করবেন।

মেঘের গুহায় ঘুমায়েছে চাঁদ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নির্জ্জনে ঘনবনে
বিরামবিহীন নৃত্যের মত আশার স্বপন যত
মৌনমাতাল হৃদয়ে আমার করে কোলাহল কত!
ছিন্ন প্রহরে পথের প্রান্তে তোমারে পড়েছে মনে:
পথে প্রেতায়িত দিগ্‌বধূগণ অবগুন্ঠিতা রহে,
খদ্যোত-ছাওয়া পল্লব দোলে মৃদুল গন্ধ বহে।
বাণীহীন মোর অন্তর তলে প্রদীপের সম জ্বলে
অনাদিকালের কথা।

মেঘের গুহায় ঘুমায়েছে চাঁদ: ঝরা বকুলের ব্যথা
এই ভিজে রাতে করিতেছি অনুভব,
থেমে গেছে সব পৃথিবীর কলরব;
সময় সাগরতীরে
আমি একা। রাঙা করবীর সম ধীরে
নুয়ে পড়ে স্মৃতি তব
যৌবন বায়ে। তুমি নাই—মিছে অভিনয় অভিনব!
কালের যাত্রা অনধিগম্য প্রাণের বিবর্ত্তনে।

পুস্তক-পরিচয়

পাহাড়িয়া কাহিনী—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

নানা দেশের নানা উপকথা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু আসামের পাহাড়ে পাহাড়ে খাসিয়া, লুসাই, গারো, মিকির, কাছাড়ীদের মধ্যে যে-সব রূপকথা প্রচলিত আছে তাহার সন্ধান এতদিন আমরা করি নাই। খাসিয়া জৈন্তিয়া লুসাই পর্ব্বতের অধিবাসীরা আমাদের প্রতিবেশী। এই আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করিতে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব-প্রকাশিত "বিচিত্র মণিপুর" এবং "আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী" সেই চেষ্টার ফল। 'খাম্বা ও থইবি'র উপাখ্যান "বিচিত্র মণিপুরে" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "পাহাড়িয়া কাহিনী"তে লেখক আসামের পার্ব্বত্য জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রচলিত সাতটি গল্প সঙ্কলন করিয়াছেন। চয়ন করিতে তিনি ইংরেজী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বটে, এ-সব গল্প কিন্তু সম্পূর্ণ অনুবাদ নয়। জৈন্তিয়া পাহাড়ের রাজধানী জোয়াইয়ে এবং অন্যান্য স্থানে আদিবাসী বন্ধুদের মুখে লেখক এই সব উপাখ্যানের অনেকগুলি শুনিয়াছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া তিনি রচনার মধ্যে সহানুভূতির সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। এই দরদ কাহিনীগুলিকে সত্যই উপভোগ্য করিয়াছে। লোকসাহিত্য নৃতত্ত্বের একটি অঙ্গ। বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত উপকথাগুলির তুলনামূলক আলোচনা জাতিসমূহের মধ্যে বিচিত্র সম্পর্কের সন্ধান দেয়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি সুন্দর এবং তথ্যপূর্ণ ভূমিকায় এই সব পার্ব্বত্য আদিবাসীর পরিচয় দিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন, "এর তিনটি গল্প (মিকির উপাখ্যান 'হারাটা কুর'র', কাছাড়ী উপকথা 'রাজহংস-কুমারী' আর গারো রূপকথা 'সতী-সিংউইল') পৌরাণিক রূপকথা হিসাবে অতি সুন্দর। এদের বিষয়বস্তু অতি প্রাচীন। দেবকন্যার সঙ্গে মানুষের প্রেম ও মিলন, বিচ্ছেদ, কচিৎ পুনর্মিলন এবং এই আশয় নিয়ে উপাখ্যান বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।"

প্রত্যেকটি উপাখ্যানের উপক্রমণিকায় যে আদিম জাতির মধ্যে সে কাহিনী প্রচলিত গ্রন্থকার সেই জাতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই পরিচয় উপক্রমণিকাগুলিকে মূল্যবান করিয়াছে।

দুইটি মিকির, দুইটি কাছাড়ী, একটি গারো, একটি খাসিয়া এবং একটি লুসাই উপাখ্যান "কাহিনী"র মধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি আখ্যানের মধ্যেই একটি বিশেষ মনোহারিত্ব আছে। রচনার গুণে এই কাহিনী-সপ্তক শিশু এবং বয়স্ক পাঠক উভয়েরই মনোরঞ্জন করিবে।

রামরাম বসু, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৬, ৭, ৯। মূল্য এক টাকা।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য; রামকমল ভট্টাচার্য্য; জয়গোপাল তর্কালঙ্কার; মদনমোহন তর্কালঙ্কার; গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার; রাধামোহন সেন;

বোসার্ট প্রোডাকসনের

'প্রিয়তমা'

GE 7266

এসো আরো কাছে

কুঞ্জের গুঞ্জন শোন ঐ

অজিত চট্টোপাধ্যায়

GE 7267

Good Evening

১ম ও ২য় ভাগ

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

GE 7268

স্মরণের এই বালুকা-বেলায়

তোমার বিরহ (আধুনিক)

মজুমদার-স্বামী প্রোডাকসনের

'সর্বহারা'

GE 7264

ও চাঁদ বদনী

ফুল কলিরে কয়

GE 7265

সুন্দরী লো মাই

হামরা দোনো জনে হায়

এম্‌, জি, পিকচার্সের

'বিশ বছর আগে'

GE 7277

কথাটি বলিস্‌ না রে

GE 7278

মায়াজাল বুনছে মনে

GE 7279

একি দোলা লাগে প্রাণে

হৃদয় দিয়ে কি পাব না

চিত্রবাণী লিমিটেডের

'মহাকাল'

GE 7280

এ জীবনে সুখ যেন

কে গো আমার মনের

GE 7281

পরীদের জলসায়

আমরা বেদের দল

এম পি প্রোডাকসনের

'অনির্বাণ'

VE 2553

কানন দেবী

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে

তোমায় সাজাব যতনে কুসুম রতনে

MAGIC NOTES TRADE MARK

কলাম্বিয়া

গ্রামোফোন কোং লিঃ

কলিকাতা ★ বোম্বাই ★ দিল্লী ★ লাহোর ★ করাচী

CB/F.7/48

ব্রজমোহন মজুমদার; নীলরত্ন হালদার সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২, ১৩, ১৭। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র রচয়িতা রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩), বাঙালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র (১৮১৮ খ্রীঃ) 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, প্রথম বাংলা অভিধানকার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৫৪) এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী রূপে পরিচিত প্রসিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮৩২) চরিত প্রথম গ্রন্থখানিতে আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য (১৮৪০-১৯৩২) প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় আছে। দু-খানি পুস্তকেরই চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে। নূতন সংস্করণে বহু নূতন উপকরণের সন্নিবেশ আছে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে চারিটি সংস্করণ প্রকাশেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ঘূর্ণাবর্ত্ত শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। ডি, এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা

প্রথমেই একটি মুসলমান চরিত্র লইয়া বইটি আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আগ্রহের সহিতই পড়িতে আরম্ভ করি, কিন্তু অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই নিরাশ হইয়া পড়িতে হয়। মুসলমান-সমাজের পারিবারিক জীবনের বাতাবরণ সৃষ্টি করার উপযোগী ভাষা এবং খানিকটা অভিজ্ঞতা দুই-ই লেখকের আছে, কিন্তু উপন্যাসকে দাঁড় করাইতে হইলে যে মাত্রাজ্ঞানের দরকার বর্ত্তমান পুস্তকে সেটির অভাব আছে। একে উপন্যাসের গতি ঘটনা বা সংলাপের মধ্য দিয়া নয়, বর্ণনার মধ্য দিয়া—যাহাতে স্বভাবতই একটা ক্লান্তি আসে, এর ওপর বর্ণনাও অযথা এত দীর্ঘ যে ধৈর্য্য রাখা দায় হইয়া উঠে। সমস্ত বইখানির মধ্যে মাত্র দুই জায়গায় 'ইণ্টারেষ্ট' একটু জমিয়া উঠিয়াছে—যেখানে কতকগুলা মতবাদ লইয়া বিতর্ক চলিতেছে এবং যেখানে কলিকাতার দাঙ্গার কথা আসিয়াছে; শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেও মাত্রাধিক্যের জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

প্লটও নিতান্ত দুর্ব্বল—টানিয়া বুনিয়া মেলানো। মাঝে মাঝে নাটকীয় ঝলক আনিবার চেষ্টা আছে—যেমন ধীরা ও নীরার পিতৃগৃহ ত্যাগের মধ্যে; কিন্তু চরিত্রগুলি সুসমঞ্জস হইয়া ফুটিয়া না ওঠায় এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির অভাবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

লেখকের উদ্দেশ্য ভাল—সাম্প্রদায়িকতার উপরে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সখ্য স্থাপন করা। কিন্তু উদ্দেশ্য ভাল হইলেও মুসলমান সম্প্রদায়কে চটাইবার ভয়ে বা অনিচ্ছায় লেখক যে-ভাবে চরিত্র তথা ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হিন্দু পাঠকের মনে পীড়া দিবে। এক শ্রেণীর লোক এ ব্যাপারটাকে উদারতা বলিয়া কাটাইতে চান, কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যাহারা মনে করেন এটা হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক—কাপুরুষতাজনিত তোষণ-নীতি।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র— শ্রীদুর্গাদাস বসু, পৃষ্ঠা ৭৩, মূল্য ১৲।

ভারতীয় গণপরিষদের নির্ব্বাচিত খসড়া প্রণয়ন সমিতি ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের খসড়া ইংরেজীতে প্রণয়ন করিয়া জনমত সংগ্রহের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন; বর্ত্তমান পুস্তিকাকে উহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা চলে। মোটামুটি শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। তবে ইহা এত সংক্ষিপ্ত যে ইংরেজী জানা অভিজ্ঞ পাঠক ইহা পড়িয়া তৃপ্ত হইবেন না। মূল ইংরেজী ২১৪ পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য ১৲ এবং এই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পুস্তিকার মূল্যও তাহাই নির্দ্ধারিত হওয়ায় পাঠক মহলে ইহার যথোচিত প্রচারের সম্ভাবনা কম, যদিও ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ভাষার ভিত্তিতে বঙ্গদেশ—শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৫২, মূল্য ১৲।

ভাষার ভিত্তিতে ভারতের প্রদেশসমূহ পুনর্গঠিত হওয়া উচিত একথা মহাত্মা গান্ধী হইতে সুরু করিয়া প্রায় সকল দেশনেতাই স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ কার্য্যে প্রধান বাধা পুরাতন প্রদেশ-বিভাগগুলি, যদিও এরূপ বিভাগ-ব্যবস্থা ইংরেজের শাসন-সৌকর্য্যার্থেই হইয়াছিল। সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তা স্বীকার করিলেও প্রাদেশিক ভাষা ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা চলে না। স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক রাষ্ট্রে (গণপরিষদের খসড়া গঠন আইনে প্রদেশগুলি State বা রাষ্ট্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে) সেগুলির স্ব স্ব ভাষায় শিক্ষাদান ইত্যাদি হইবে, সুতরাং আইনের রক্ষাকবচ সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠদের নানা অসুবিধায় পড়িতে হইবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের সহানুভূতির অভাব থাকিলে প্রথমোক্তদের দুর্দ্দশার চরম হইবে। বিহার ও আসামের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলসমূহের সেই দুর্দ্দিন আসিয়াছে। এই সকল অঞ্চল, যথা—মানভূম, ধলভূম, পুরুলিয়া, সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের অংশবিশেষ, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, শ্রীহট্টের আসাম প্রদেশস্থ অঞ্চলগুলি ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণ অধিকাংশই বঙ্গভাষাভাষী বাঙালী, কিন্তু নানা কারণে আজ উক্ত অঞ্চলসমূহ অপর প্রদেশের অঙ্গীভূত এবং উহার ফলে অর্থাৎ বিহারী ও অসমীয়াদের সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার জন্য নানা ভাবে সেখানকার বাঙালীরা অপমানিত ও উৎপীড়িত। নূতন করিয়া স্বাধীন ভারতের আইন প্রণয়ন ও প্রদেশ বা রাষ্ট্রগঠনের সময় এই ত্রুটি সংশোধনের নিতান্তই প্রয়োজন। সময় খুবই অল্প এবং ইহার মধ্যেই সমস্ত বাঙালী জাতিকে স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। খণ্ডিত বাংলার জীবনমরণ এই সমস্যার সমাধানের উপরে বহুলাংশে নির্ভর করিবে। এই পুস্তিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

প্রথম প্রশ্ন—দ্বিতীয় সংস্করণ: শ্রীরাইমোহন সাহা। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা। দাম চার টাকা।

উপন্যাস। সংকীর্ণ জাতিভেদের মূলে আঘাত করিয়া লিখিত। উপন্যাসের প্রধান নায়ক মানবতার পূজারী। সাম্য, মৈত্রী ও কল্যাণের পথে তার অগ্রগতি। প্রেমকে লেখক উচ্চ আসন দিয়াছেন। জাতিভেদ মানুষের নিজেদের সুবিধার জন্য সৃষ্ট। কথাটা তিনি যুক্তি ও নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া দেখাইয়া গেলেও কোথাও বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দেন নাই বরং প্রাচীনপন্থীদের সন্দর্ভকে কৌশলে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। নায়কনায়িকাদের জবানীতে এই কথাটাই লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে, সমাজ যেন মানুষকে মানুষ বলিয়াই গ্রহণ করে। পুস্তকের চরিত্রগুলি তিনি এমন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের জীবনের পরিণতির প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই পাঠকের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমাদের সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি সহজ এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে কেমন জটিল করিয়া

লে। উপন্যাসখানির স্থানে স্থানে লেখক সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

পরিশেষে কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিব। যেমন—মায়ার বিধবা মাতার আত্মহত্যা করিবার প্রয়াসের দৃশ্যটি। পরেশকে স্বমতে আনয়ন করিতে না পারিয়া হঠাৎ একখানা বঁটি দ্বারা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা যে ভাবে দেখান হইয়াছে তাহা অশোভন লাগিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটির উল্লেখ করিলাম। আশা করি ভবিষ্যতে লেখক এদিকে একটু দৃষ্টি দিবেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

মহাসূর্য্য—কিরণ। সেবুার পাবলিশার্স। কলিকাতা। দুই টাকা।

"স্বপ্ন দেখি আসমুদ্র হিমাচল এ ভারত জুড়ে
কোটি কণ্ঠে সমুত্থিত মহাগীতি নব জীবনের।"

নবজীবন-স্বপ্নে অধিকাংশ কবিতা সমুজ্জ্বল। ভাঙনের গান চারিদিক হইতে কবির কানে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ করে নাই—"নূতন সৃষ্টি-বোধনের গান" শুনবার জন্য তিনি উৎকর্ণ।

সৈনিক—অজয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভেন্যু। কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। দেড় টাকা।

কবিতা-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বাংলাদেশে বড় একটা হয় না। "সৈনিকের" দ্বিতীয় সংস্করণ ই জনপ্রিয়তার প্রমাণ। কবি গীতিকার রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গম্ভীর ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়া এই কবিতাগুলিতেও গীতিধারা বহিয়া চলিয়াছে।

নতুন দিন—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা। আট আনা।

কবিতাগুলির রোমান্টিক সুর, মধুর কোমল ভাষা হৃদয় স্পর্শ করে।

যৌবনোত্তর—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা। আট আনা।

কবির ভাবনা স্বপ্নচিত্রে ফুটিতে চাহিয়াছে। ভাষায় ও ছন্দে আছে কোমল লাবণ্য।

প্রেমের ডালি—শ্রীরসিকলাল দে। শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী কার্য্যালয়, এলাটা, হুগলী। মূল্য ৷৷০।

ধর্ম্মভাবান্বিত গান ও কবিতা। অধিকাংশ শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয়।

যুদ্ধ তখনও হয় নাই শেষ—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯৩।৪ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

কয়েকটি প্যারডি ও কৌতুক-কবিতা। কষ্টকৃত কৌতুক।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কলির দধীচী—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

যুগমানব মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে বহু পুস্তক বাহির হইয়াছে ও হইবে। তাঁহার অমর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা, বাণী ও কীর্ত্তিকাহিনী জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক আবালবৃদ্ধবনিতা দেশবাসীর কর্ত্তব্য। সংক্ষেপে যাহাতে তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি ও তাঁহার প্রধান বাণীগুলি, তাঁহার সাধনা ও উপদেশ সম্বন্ধে জানা যায় সেই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তদনুষ্ঠিত একটি প্রায়োপবেশন-পঞ্জিকা ও তাঁহার প্রিয় সঙ্গীতাবলী গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে। মহাত্মাজীর কয়েকখানি চিত্র ও মলাটের রঙীন চিত্রখানি ও উৎকৃষ্ট বোর্ড-বাঁধাই পুস্তকের সৌকর্য্যসাধন করিয়াছে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ শীল

দেশের কাজে যারা দিল সব (নাটক)—শ্রীসতীকুমার নাগ। প্রকাশক—জাতীয় গ্রন্থঘর, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি কিশোর-নাটক। ভূতের গল্প এবং রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনী প্লাবিত কিশোর-সাহিত্যে এই ধরণের বলিষ্ঠ দেশাত্মবোধক কিশোর-নাটকের প্রয়োজন খুব বেশী। নাটকের গল্পাংশ সুন্দর এবং প্রচুর নাটকীয় সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়—লেখক তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দুর্ব্বল ঘটনা বিন্যাসের জন্য চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি অপেক্ষা বর্ণনা এবং বক্তব্য বিস্তারের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক থাকায় নাটকখানি আশানুরূপ রস-নিবিড় হয় নাই। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, কিন্তু নাটকের সংলাপ ধারালো এবং সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। সুজিতকুমার নাগের 'মাগো আমার ইচ্ছে করে বনের পথে যেতে" গানখানি চমৎকার।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

ধর্ম্মবিজয়ী অশোক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

দেশবিদেশের ঐতিহাসিকগণের এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে যে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অশোক। কলিঙ্গ যুদ্ধে অনুষ্ঠিত ধ্বংস-লীলার মর্ম্মান্তিক দৃশ্য তাঁহাকে যোদ্ধা সম্রাটদের দিগ্বিজয়-নীতির পরিবর্ত্তে ধর্ম্মবিজয়-নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে প্রণোদিত করে এবং তিনি হিংসার পরিবর্ত্তে 'অবিহিংসা' এবং শত্রুতার পরিবর্ত্তে প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচারকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। এই নৃপতিশ্রেষ্ঠের ধর্ম্মবিজয়-নীতি একদা সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে ইরাণ, আসীরিয়া, সিরিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানে প্রচারিত হইয়া সমগ্র এশিয়াখণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেক নরনারীকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তকে লেখক অশোকের সেই ধর্ম্মবিজয়-নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। অশোকের রাষ্ট্রনীতিও ছিল ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবোধবাবু বর্ত্তমান পুস্তকে তাঁহার সেই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রনীতির যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ধর্ম্মবিজয় ও অহিংসানীতি, অহিংসা ও রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মনীতির পরিণাম—এই চারিটি অধ্যায়ে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার প্রধান উপজীব্য হইয়াছে অশোকের শিলালিপিসমূহ। লেখকের মতে এগুলি তাঁহার আত্মজীবনীস্বরূপ। এগুলির সাহায্যে তিনি সম্রাট্ অশোকের জীবন ও কৃতির নবভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান পুস্তকে লেখক যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা

প্রশংসনীয়। প্রচলিত ধারণা এই যে কলিঙ্গযুদ্ধের পর অশোক সম্পূর্ণরূপে সংগ্রামবিমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু লেখক অশোকের শিলালিপি ইত্যাদি বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তিনি পররাজ্যজয়লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'রাজ্যরক্ষামূলক' বা defensive যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন না। লেখকের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য এই যে, সম্রাট অশোক ব্যক্তিগত ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। সকল ধর্ম্মের, এমনকি বৌদ্ধধর্ম্মবিরোধী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে। সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক নীতিগুলি চুনিয়া চুনিয়া তিনি প্রচার করিয়াছিলেন এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—যাহাকে বলা যাইতে পারে 'সর্ব্বধর্ম্মসার'। সুতরাং তাঁর "বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের কাহিনী নিতান্তই অমূলক।"

প্রবোধবাবুর পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও রত্নখনি স্বরূপ। স্বল্পপরিসরের মধ্যে ইহার যথার্থ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক। স্থানে স্থানে অশোকের চরিত্রবর্ণনায় তিনি আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু প্রতিপদে সংযমের রাশ টানিয়া রাখিয়াছেন—ভুলিয়া যান নাই যে, তিনি ইতিহাসই লিখিতেছেন, উপন্যাস লিখিতে বসেন নাই। পরলোকগত ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়ার সুচিন্তিত ভূমিকাটি এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

আমাদের বাপুজী—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। 'ভারতী বুক ষ্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

বইখানি প্রধানতঃ ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখা এবং সেজন্যই লেখককে বিশেষ যত্নের সহিত মহাত্মা গান্ধীর জীবন হইতে এমন সব ঘটনা নির্ব্বাচন করিতে হইয়াছে যাহা শিশুমনে সাড়া জাগাইতে সক্ষম হয়। বইখানি পড়িলে গান্ধীজীর সমগ্র জীবনের চিন্তা ও কর্ম্মের সঙ্গে তাহাদের একটা মোটামুটি পরিচয় হইবে। লেখকের ভাষা সহজ, সরল এবং গান্ধীজীর জীবন-কথা বর্ণনা করিয়াছেন তিনি কথকতার ভঙ্গিতে। সময় সময় উচ্ছ্বাসের একটু মাত্রাধিক্য পরিলক্ষিত হইলেও রচনার মধ্যে আগাগোড়া যে আন্তরিকতার স্পর্শ রহিয়াছে তাহা পুস্তকখানিকে শিশু এবং বয়স্ক সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

পুস্তকের গোড়ায় 'মহাত্মা' শব্দের যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা লেখক করিয়াছেন, পুস্তকের কাহিনী অংশের তুলনায় তাহা একটু গুরুগম্ভীর হইয়াছে। এই অংশটুকু বাদ দিলেই ভালো হইত। পুস্তকে গান্ধীজীর বিভিন্ন অবস্থার কতকগুলি ছবি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

পাটের অনুকল্প

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

চুকাই এক প্রকার গুল্মজাতীয় গাছ। উহার কাঁচা ছাল এত শক্ত যে কিছুতেই উহা ছেঁড়া যায় না। এই ম্যালভাসী বা জবা-গোত্রীয় গাছের ছালের আঁশ বা তন্তু পাটের চেয়েও শক্ত, তাহা হইতে অধিকতর উজ্জ্বল। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের রিসার্চ ইন্‌সটিটিউটের টেষ্ট অনুসারে এই আঁশ পাটের অনুকল্প ("জুট সাবসটিটিউট") বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

এই চুকাইকে "মেস্তা"ও বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে "চুকৈর" বলেন। বাংলার কোনও কোনও স্থানে, বিশেষতঃ মেদিনীপুর এবং চব্বিশ পরগণা জেলায় সব্জী-বিক্রেতারা এবং স্থানীয় বীজ বিক্রেতারা ইহাকে "টক ট্যারস" বলে। শীতকালে কলিকাতার বৈঠকখানা বাজার, বহুবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট এবং অন্যান্য বাজারগুলিতে দালের বড়ির আকারের গাঢ় লাল বর্ণের চুকাইয়ের ফলগুলি বিক্রয় হইয়া থাকে।

মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের কোন কোন স্থানে এবং পঞ্জাবেও এই গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহার ফুলগুলি দেখিতে ঠিক কার্পাস ফুলের মত।

চাষের জন্য মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ইহার বীজ বপন করা হয়। এই গাছ খুব রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে। অতিরিক্ত উত্তাপে যখন জমির রস শুকাইয়া যায় তখন ইহার চারাগাছগুলির পাতা ম্লান ও শীর্ণ হইয়া গেলেও প্রথম বারিপাতে সজীব হইয়া উঠে। বর্ষায় জমিতে জল দাঁড়াইয়া গেলেও গাছগুলি সহজে নষ্ট হয় না। যে অঞ্চলের জমি পাট চাষের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত সেখানে পাটের অনুকল্প হিসাবে চুকাই আঁশ উৎপাদন ভালভাবে হইতে পারে। চুকাই গাছ জাগ দিবার পর, পাটের চেয়েও সহজে আঁশ বাহির হয়।

চুকাই গাছের কতকগুলি বিশেষত্ব হইতে দেখা যায় উহা পশ্চিম বঙ্গের উচ্চ জমিতে বপন করিবার উপযোগী। পশ্চিম বাংলায় পাটের উৎপাদন কম; ইহা এ প্রদেশের একটি ঘাটতি উৎপন্ন দ্রব্য। নানা দিক হইতে বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ চুকাই আঁশ সম্বন্ধে তৎপর হইতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিও এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। অনুসন্ধিৎসুগণ খাদিপ্রতিষ্ঠান সোদপুর আশ্রমে চুকাই গাছ দেখিতে পাইবেন। ইহার আঁশ প্রভৃতির কার্য্যালয় ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতায় এবং সোদপুরে বিভর্ণ...

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা